মুসলমানের জিন্দেগী

হাফেজ মাওলানা মুফতী মহিউদ্দীন কাছেম



মুসলমানের জিন্দেগী

হাফেজ মাওলানা মুফতী মহিউদ্দীন কাছেম
উস্তাদ, মাদ্‌রাসা মারকাযুন্ নূর ঢালকানগর, ঢাকা
ইমাম, বিক্রমপুর গার্ডেন সিটি, সদরঘাট, ঢাকা

প্রকাশনায়
আল্লাহর দান লাইব্রেরী
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মুসলমানের জিন্দেগী

হাফেজ মাওলানা মুফতী মহিউদ্দীন কাছেম ▸ মোবাঃ : ০১৭১২৬৮২১৯১

প্রকাশ কাল : ১১ই জিলক্বদ ১৪২৯ হিজরী ▸ প্রকাশক : মুহাম্মদ ইসমাইল

মোবাঃ ০১১৯১৪৭৯৯৬১ ▸ সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ৪০০ টাকা মাত্র

MUSALMANAR ZINDEGY (GUIDE LINES FOR LIFE)
WRITTEN BY HAFAZ MAOLANA MUFTI MOHEUDDIN KASAM
PUBLISHED BY ALLAHER DAN LIBRARY
ISLAMI TOWER, 11/1 BANGLABAZAR (UNDER GROUND), DHAKA-1100
PRICE : TK. 400 ONLY

ISBN : 984-8439-05-7

অবতরণিকা

بسملا محمدلا ومصليا امابعد

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই। তাঁর অপার মহিমায় আমার মত একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির মাধ্যমে **"মুসলমানের জিন্দেগী"** নামক বইটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

আজ আমার নামে প্রকাশিত বইটির আত্মপ্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তটিতে আমার সেই শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের কথা স্মরণ না করাটা রীতিমত অকৃতজ্ঞতার শামিল হবে বলে মনে করি। যেই শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের মমতাময় ছায়াতলে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আমি এ পথে অগ্রসর হয়েছি। বিশেষ করে আমি আরো কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি সেই শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের যাঁর মমতাময় হৃদয়ের উষ্ণ পরশ আমার যৎকিঞ্চিত সাফল্যের পিছনে অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে। আল্লাহ পাক শ্রদ্ধেয় আব্বাজানকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন এবং শ্রদ্ধেয় আম্মাজানকে হায়াতে তয়্যিবা দান করুন।

বর্তমানে আমরা এমন একটি চরম নষ্ট সময়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি যে দুনিয়ার তাবৎ বৈরী শক্তি যখন আজ বাংলার স্নিগ্ধ শ্যামল ধর্মীয় পরিবেশ কলুষিত করতে উদ্যত। মানুষ যখন দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে পাপ পংকিলতার তিমীর অন্ধকারে। নবেল, নাটক, অশ্লীল ম্যাগাজীন হচ্ছে এখন নিত্য দিনের পাথেয়। এহেন সংকটময় মুহূর্তে আমার পরকালের মুক্তির আশায় জাতিকে আলোর দিশা স্বরূপ উপহার দিলাম **"মুসলমানের জিন্দেগী"** নামক বইটি।

আল্লাহ পাক এই বইটিকে আমার এবং সকল পাঠক পাঠিকার পরকালের সেই বিভীষিকাময় আজাব থেকে মুক্তির পাথেয় হিসাবে কবুল করুন। –আমীন।

এ বইয়ের পান্ডুলিপি রচনার সময়ে অনেকটা সহকারীর দায়িত্ব পালন করেছে আমার স্ত্রী হাফেজা মুনতাহা, ছোট বোন হাফেজা মোমেনা এবং ছোট ভাই হাফেজ মুহাম্মাদুল্লাহ। আল্লাহ পাক তাদের সকলকে ইহকালে এবং পরকালে সুখময় জীবন দান করুন।

এই বই রচনায় বিভিন্ন গ্রন্থাদি, আলোচনা এবং প্রবন্ধ প্রয়োজনমত কাজে লাগিয়েছি। যেসব লেখা থেকে উপকৃত হয়েছি এসব আকর তথ্যের লেখক-প্রকাশকের কাছে সবিনয়ে ঋণ স্বীকার করি।

পরিশেষে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তথাপি ভুল ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং যদি কোন সুহৃদয় পাঠকের নিকট ভুল ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তবে ত্রুটি নির্দেশসহ অভিমত ও পরামর্শের আবেদন রইল।

– মহিউদ্দীন কাছেম ফরিদী

উৎসর্গ

যার স্নেহ, ভালবাসা, ত্যাগ, তিতীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে লেখা শিখিয়েছেন এবং ইলমে দ্বীন দান করেছেন। শুধু তাই নয় বরং যে আমার জীবনের সর্ব প্রথম উস্তাদ, যাঁর কাছে আমি ১২ পারা কোরআন শরীফ হেফজ করেছি সেই শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের হায়াতে তায়্যিবা এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ কামনায় এবং শ্রদ্ধেয় আব্বাজান যার আদর ভালবাসা এবং অসামান্য প্রচেষ্টা ও কুরবানীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক আমাকে ইলমে দ্বীন দান করেছেন। সেই শ্রদ্ধেয় আব্বাজান **শাইখুল হাদীস আল্লামা আঃ রাজ্জাক কাছেমী** ছাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাগফিরাত এবং রফয়ে দারাজাত কামনায়

এবং

ঐ সকল শ্রদ্ধাভাজন যাদের রাশি রাশি অনুগ্রহ অনুকম্পা আমাকে এ পথে চলতে সাহায্য করেছে। সেই শ্রদ্ধেয় বড় মামা জনাব আলহাজ্জ এডভোকেট **শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ,** মেজ মামা জনাব আলহাজ্জ হাফেজ শেখ মোঃ আবু মুসা, সেজ মামা জনাব আলহাজ্জ শেখ মোঃ ইসহাক, ছোট মামা জনাব আলহাজ্জ শেখ মোঃ আবু দাউদ এবং শ্রদ্ধেয় মামা প্রফেসার জনাব আলহাজ্জ ডাঃ নুরুল হুদা এর ইহকালীন ও পরকালীন উন্নতি কামনায়।

– লেখক



সূচিপত্র

১ম অধ্যায়

আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর উত্তম নাম সমূহের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা ২১
শিরক ও বিদ'আত-এর আলোচনা ৩৯
মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়াবলী ৪১

২য় অধ্যায়

গুনাহ্ সম্পর্কিত আলোচনা ৫০
গুনাহের ক্ষতিসমূহ ৫০
গুনাহ্ মাপের শুভ সংবাদ সম্পর্কিত চল্লিশ হাদিস ৫০
গুনাহের কারণে ইহলৌকিক ক্ষতিসমূহ ৫৭
ইবাদত ও নেক কাজের দরুন দুনিয়ার ফায়দাসমূহ ৫৮
অট্টহাসির ক্ষতিসমূহ ৫৯
কবীরা গুনাহসমূহ ৬০
গীবতের ভয়াবহতা ও ক্ষতি ৮৩

৩য় অধ্যায়

নাজাছাত এর বিধি-বিধান ৮৬
অপবিত্র বস্তু পবিত্র করার পদ্ধতি ৮৭
নাপাক বিছানা ঘামে ভিজে গেলে তার হুকুম ৮৯
ফ্লোর বা কার্পেট পাক করার পদ্ধতি ৯০
জানাবাত সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা ৯৪

৪র্থ অধ্যায়

হায়েজ, নিফায ও ইস্তিহাযা সম্পর্কে আলোচনা ৯৫
হায়েজ সম্পর্কে আলোচনা ৯৫
নিফাস সম্পর্কে আলোচনা ১০৩
ইস্তিহাযা সম্পর্কে আলোচনা ১০৫
হায়েজ, নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ১০৬
ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশার হুকুম ১০৭

৫ম অধ্যায়

অযু সম্পর্কে আলোচনা ১০৮
হাদীসের আলোকে অযুর ফযীলত ১০৮
অযু ছাড়া নামায হয় না ১১২
অযু অবস্থায় মারা গেলে শহীদের সওয়াব ১১৩
অযুর মধ্যে হাতে আংটি থাকলে তার বিধান ১১৪
নামাযের পূর্বে অযুর বিজ্ঞান দর্শণ ১১৪
নামাযের পূর্বে মিছওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান ১১৫
সুইজারল্যান্ডের জনৈক ডাঃ এর বক্তব্য ১১৭
নামাযের আগে মেছওয়াক করার গুরুত্ব ১১৮
কোন বৃক্ষের মেছওয়াক উত্তম ১১৮
অযু সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা ১১৯
গোসলের আলোচনা ১২০
গোসলের ফরজসমূহ ১২০
গোসলের সুন্নতসমূহ ১২০
গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ ১২০
ফরজ গোসলের প্রকারভেদ ১২১
ওয়াজিব গোসল ১২১
ছুন্নত গোসল ১২১
মুস্তাহাব গোসল ১২১
গোসল সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা ১২২
গোসলের সুন্নাত সমূহ ১২৩
তায়াম্মুমের আলোচনা ১২৭
তায়াম্মুমের ফরজ ১২৭
তায়াম্মুমের সুন্নাত সমূহ ১২৭
তায়াম্মুমের কতিপয় বিধান ১২৮

৬ষ্ঠ অধ্যায়

নামাযের আলোচনা ১৩২
নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা ১৩২
হাদীসের আলোকে নামাযের ফযীলত ১৩৩
নামায না পড়ার আযাব ১৪০
নামাযের ফরজ সমূহের বর্ণনা ১৪১

নামাযের পূর্বশর্ত বা বাহিরের ফরজ সমূহ ১৪১
নামাযের ভিতরের ফরজ সমূহ ১৪৫
নামাযের সুন্নাত তরীকা ও প্রচলিত ভুলসমূহ ১৪৯
নামাযের প্রারম্ভে যা লক্ষণীয় ১৪৯
নামাযের শুরু লগ্নে লক্ষণীয় ১৫০
দন্ডায়মান অবস্থায় ১৫১
রুকু অবস্থায় ১৫২
রুকু থেকে উঠার সময় ১৫২
সিজদায় যাওয়ার সময় ১৫৩
সিজদা অবস্থায় ১৫৩
দরমিয়ানী বৈঠক ১৫৪
দ্বিতীয় সিজদায় গমন ও তা থেকে দন্ডায়মান হওয়া ১৫৫
আখেরী বৈঠক ১৫৫
সালাম ফিরানোর নিয়ম ১৫৫
মুনাজাত করার নিয়ম ১৫৬
হাদীসের আলোকে নামায ১৫৬
নামাযে মহিলাদের সতন্ত্র সুন্নাতসমূহ ১৬৬
সিজদায়ে সাহূর আলোচনা ১৬৭
সালাতুত্তাসবীহ নামায ১৭০
সংক্ষিপ্ত সালাতুত তাসবীহ ১৭১
ছালাতুল হাজত-এর আমল ১৭১
এস্তেখারার নামায ১৭২
তওবার নামায-এর আমল ১৭৩
তাহাজ্জুদের নামাযের আলোচনা ১৭৩
রাত্রি জাগরণের উপায়সমূহ ১৭৭
তাহাজ্জুদের আদবসমূহ ১৭৮

৭ম অধ্যায়

রোযার আলোচনা ১৮০
রোযার তাৎপর্য ও রোযাদারের করণীয় ১৮০
ফাজায়িলে রমাজান ১৯০
রমজানে করণীয় কাজসমূহ ১৯২
রামাজানের মাসায়িল ১৯২

সংক্ষেপে রমযানের জরুরী মাসায়িল ১৯৬
রমযানের রোযা কার উপর ফরজ ১৯৬
ঈদুল ফিতরের দিনের সুন্নাত আমল ২০০
ঈদুল ফিতর সম্পর্কিত -মাসায়েল ২০০
রোযা সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা ২০২

৮ম অধ্যায়

সদকায়ে ফিতর এর আলোচনা ২০৪
সদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য ২০৪
সদকায়ে ফিতরের শর্ত ২০৪
ফিতরা কোন সময় ওয়াজিব হয় ২০৬
মাসায়েলে ফিতরা ২০৭

৯ম অধ্যায়

হজ্জের আলোচনা ২০৯
হাদীসের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব ও যাদের ওপর হজ্জ ফরজ ২১০
সাধ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার শাস্তি ২১০
মাহরম ছাড়া মহিলাদের হজ্জে যাওয়া হারাম ২১১
রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজার ও কবর যিয়ারত ২১১
হজ্ব আদায়ে যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয় ২১১
ইহরাম বিষয়ক ভ্রান্তিসমূহ ২১২
তাওয়াফ অবস্থায় ভ্রান্তিসমূহ ২১৫
সাঈ-সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি সাঈর দোয়া ২১৮
সাফা পাহাড়ের দোয়া ২১৮
সাঈতে ইজতিবা ২১৮
নফল সাঈ ২১৯
হুইল চেয়ারে সাঈ ও তওয়াফ ২১৯
হজ্বের ইহরাম ২১৯
মিনা'র দ্বন্দ্ব-কলহ ২১৯
সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা ২২০
মুযদালিফা ও মুযদালিফায় যাওয়ার পথের ভ্রান্তিসমূহ ২২০

১০ম অধ্যায়

মাসায়েলে কুরবানী ২২২

কুরবানী বিষয়ক ভুল ভ্রান্তি ২২৯
আকীকা ও খতনা বিষয়ক ভুলভ্রান্তি ২৩৭
আকীকার হুকুমকে গুরুত্ব না দেওয়া ২৩৯
খাতনা বিষয়ক ভুলত্রুটি ২৩৯
নবজাতককে কেন্দ্র করে যে সব ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে ২৪০

১১তম অধ্যায়

যাকাতের বর্ণনা ২৫১

১২তম অধ্যায়

মেহমান সম্পর্কে আলোচনা ২৫৮
মেহমানের অধিকার ২৫৮
অতিথি আপ্যায়নে ইসলামের বিধান ২৬০

১৩তম অধ্যায়

মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা ২৬৫
বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার ২৬৫
ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা ২৭৫
আলকুরআনে নারী ২৮২
হাদীস শরীফে নারী ২৮৩

১৪তম অধ্যায়

মহিলাদের বিশেষ নছীহাত ২৮৫
মহিলাদের জান্নাতে যাওয়ার সহজ উপায় ২৮৬
মহিলাদের বোরকা পরিধান করে মার্কেটে যাওয়া ২৯৩

১৫তম অধ্যায়

পর্দা ও মহিলাদের বিশেষ আলোচনা ২৯৫
পুরুষ এবং নারী কার কার সাথে দেখা দিতে পারবে ২৯৫
পুরুষদের জন্য মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ ২৯৬
মহিলাদের জন্য বাইয়াত হওয়া ২৯৭
শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের চাকুরী ২৯৮
স্বামীর চাপের মুখে স্ত্রীর চাকুরী করা ২৯৯
১২টি উত্তম গুণাবলী ২৯৯
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার বিরল দৃষ্টান্ত ৩০৪

মা হিসেবে নারীর করণীয় ৩০৬
গর্ভাবস্থায় ঔষধ ব্যবহারে মায়েদের করণীয় ৩১২
সাফল্যের কিছু উপায় ৩১৪
বদমেযাজ নারীতে অগণিত ছওয়াব ৩১৬
স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ৩২০
গৃহ ব্যবস্থাপনায় নারীর প্রতি ৪০ টি নির্দেশনা ৩২৬
সুখময় দাম্পত্য জীবন গঠনে নারীর করণীয় ৩৩০
স্ত্রী প্রহারের ইসলামী নীতি ৩৩৪
স্বামীরা কেমন স্ত্রী পছন্দ করে ৩৩৭
গর্ভবতী মহিলার খাবার ও বিশ্রাম ৩৪১
বউ-শাশুড়ী সম্পর্ক ৩৪২
প্রেম-ভালবাসার প্রকৃতি ও গণ্ডি ৩৪৪
অবৈধ প্রেম-প্রীতি প্রসঙ্গ ৩৪৬
স্বামীর সংসারে স্ত্রীর দায়িত্ব ৩৪৯
মহিলাদের স্বতন্ত্র কিছু আদব ৩৫৪
পিতা-মাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব ৩৫৫
মহিলাদের অযাচিত আবদার ৩৫৫
নেকী অর্জনের সহজ উপায় ৩৫৮
প্রেম-ভালবাসার করুণ পরিণতি ৩৬২
বউয়ের সাথে শাশুড়ীর দ্বন্দ্বের কারণ ও প্রতিকার ৩৬৮
শাশুড়ীর সহিত বিবাদ নয় ৩৭১
দাম্পত্য জীবনে যাবতীয় ঝগড়া বিবাদ থেকে আত্ম রক্ষার উপায় ৩৭৩
মহিলাদের জন্য বিশেষ ১০টি সুন্নত ৩৭৫
পরিবারে অশান্তি হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার ৩৭৬
স্ত্রী অবাধ্য হলে করনীয় ৩৮১
স্ত্রীকে শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ৩৮২
স্ত্রী প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর করণীয় ৩৮৩
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাগ এলে স্বামীর করণীয় ৩৮৪
স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার ৩৮৫
স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার ৩৮৬
স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ৩৮৬
শ্বশুর বাড়িতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলে থাকার নিয়ম ৩৮৭
পুত্র-বধূর প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর করণীয় ৩৮৮

স্ত্রীর উপর স্বামীর হকসমূহ ৩৯০
স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সমূহ ৩৯২
শরীয়াতের দৃষ্টিতে আদর্শ স্বামী ৩৯৫
নারীদের সৌন্দর্য চর্চার হুকুম ৩৯৬
স্বামীর উদ্দেশ্যে নারীর সাজসজ্জা ৩৯৮
লজ্জা নারীর অবিচ্ছেদ্য ভূষণ ৪০০

১৬তম অধ্যায়

মহিলাদের ফযিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে ১০০ হাদীস ৪০৬
মুমিন নারীর উত্তম গুণাবলী ৪২৫
সফল নারীর গুণাবলী ৪২৬
হাদীসের আলোকে নারীর ফযিলত ও মর্যাদা ৪৩৩

১৭তম অধ্যায়

সন্তান লালন-পালন ৪৩৬
সন্তানের চারিত্রিক প্রতিপালনে করণীয় ৪৩৬
শিশুদের কান্নার কারণ ও প্রতিকার ৪৪১
কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলত ৪৪৪
মায়ের দুধ শিশুর হক ৪৪৬
শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়সীমা ৪৪৭
সন্তানকে শাসন করার পদ্ধতি ৪৪৯
সন্তানকে শাসন করার পদ্ধতি ৪৪৯
শিশুদের বদ স্বভাব প্রতিরোধে মায়ের করণীয় ৪৫১
শিশুদেরকে শাস্তি দানের পরিমাণ ৪৫২

১৮তম অধ্যায়

ফযীলতপূর্ণ দিবস ও রজনী ৪৫৫
আশুরার ফজিলত ও করণীয় ৪৬২
সফর মাস ৪৬৬
প্রচলিত কুসংস্কার ও সময়ের শুভ-অশুভ ৪৬৬
যিলহজ্ব মাস, করণীয় ও বর্জনীয় আমলসমূহ ৪৭১
ঈদুল ফিতর ও আমাদের করণীয় ৪৭৬
ঈদের দিনের কুপ্রথা ৪৭৮
পবিত্র ঈদুল ফিতর যেভাবে উদযাপন করবেন ৪৭৯

ইসলামে ঈদের প্রবর্তন ৪৭৯
ঈদের দিনের রসম-রেওয়াজ ৪৭৯
পবিত্র ঈদে নারীদের করণীয়-বর্জনীয় ৪৮০
শাবান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত ৪৮৪
মাহে রজবের তাৎপর্য ৪৯৩
ইসলাম পূর্ব মাহে রজব ৪৯৬
লাইলাতুল কদর (শবে কদর) ৫০২

১৯তম অধ্যায়

লেবাস-পোশাক ৫০৭
লেবাস-পোশাকে ইসলামী নির্দেশনা ৫০৭
পোষাক-পরিচ্ছদে আধুনিক বিচ্যুতি ৫১৬
বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয় ৫১৯
বেপর্দা মেয়ের প্রতি পিতার করণীয় ৫২০
পিতা-মাতার আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা ৫২১

২০তম অধ্যায়

নারীদের সৌন্দর্য চর্চার হুকুম ৫২২
সাজ সজ্জার ইসলামী বিধান ৫২৪
বিউটি পার্লারের ক্ষতি সমূহ ৫২৫
ফ্যাশনের সীমারেখা ২৩৫
মাথার চুল কাটা ৫২৬
বব কাটিং চুল ৫২৬
চুল বৃদ্ধির জন্য কাটা ৫২৬
রোগ ব্যাধির জন্য চুল কাটা ৫২৭
ভ্রু চিকন করা ৫২৭
মহিলাদের গোফ-দাড়ী এবং চেহারার লোম পরিস্কার করা ৫২৭
হাত পায়ের লোম পরিস্কার করা ৫২৭
শরীরে চিত্রাংকন করা ৫২৭
পর চুল ব্যবহার করা ৫২৭
মেকআপ সামগ্রীর হুকুম ৫২৭
লিপষ্টিক ব্যবহার ৫২৮
পলকে রং লাগানো ৫২৮
মাশকারা ব্যবহার করা ৫২৮

নেইল পলিশ ৫২৮
গুপ্ত লোম পরিষ্কার করা ৫২৯

২১তম অধ্যায়

সুদের আলোচনা ৫৩০
সুদের প্রকারভেদ ৫৩০
কুরআন ও হাদীসে সুদ ৫৩০
সুদের ভয়াবহ চিত্র ৫৩১
সুদখোরের পরিণাম ৫৩২
সুদের গুনাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লা'নত ৫৩৩
সুদ দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি ৫৩৪
সুদভক্ষণকারী যে সমস্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় ৫৩৪
সুদ খোরের ভয়াবহ পরিণতি ৫৩৬

২২তম অধ্যায়

ইলম হাসিল করার উপায় ৫৩৭
মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব ৫৩৮
শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের পার্থিব শিক্ষা অর্জন করা ৫৪০
মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার কুফল ৫৪০

২৩তম অধ্যায়

চিত্ত বিনোদন ৫৪৩
শরীয়তের দৃষ্টিতে চিত্ত বিনোদন ও খেলাধুলা ৫৪৩
আল কুরআনের দৃষ্টিতে ক্রীড়া-কৌতুক ৫৪৩
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রিয়খেলা ৫৪৬
তীর বর্ষার খেলা ৫৪৬
সাহাবাদের যুগে খেলাধুলা ৫৪৭
ইসলামের দৃষ্টিতে বিনোদন ৫৪৮
আজকের চিত্ত বিনোদন ও খেলাধুলা ৫৪৯
খেলাধুলার মৌলিক বিধান ৫৪৯
বর্তমানে খেলার অপকারিতা ৫৫০

২৪তম অধ্যায়

তাযকিয়ার গুরুত্ব ৫৫২
হক ও বাতিল পীরের পরিচয় ৫৫৩

২৫তম অধ্যায়

মৃত্যু ৫৫৫

২৬তম অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ ৫৬৩
জান্নাতের আলোচনা ৫৬৩
জান্নাতের নহর সমূহের বর্ণনা ৫৬৪
জান্নাতের কৃক্ষরাজি এবং উদ্যান সমূহের বর্ণনা ৫৬৫
জান্নাতের ফলের বিবরণ ৫৬৬
জান্নাতের খানা পরিবেশন ৫৬৭
জান্নাতে খানা পরিবেশন কারীদের বর্ণনা ৫৬৭
জান্নাতের পোশাকের বর্ণনা ৫৬৭
জান্নাতে অলংকারাদীর বর্ণনা ৫৬৮
জান্নাতের চেয়ার টেবিল এবং বিছানার বর্ণনা ৫৬৮
জান্নাতের রমনীগণ ও হুরের বিবরণ ৫৬৮
ফায়দাজান্নাতের বালাখানার বর্ণনা ৫৭১
জান্নাতীদের বিবরণ ৫৭১
বেহেশতী রমণীগণের গুণ-সৌন্দর্য ৫৭৩
নেককারগণের জন্য বেহেশতের নিয়ামতসমূহ ৫৭৭
জাহান্নামের বিবরণ ৫৮৩
জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল ৫৮৮

২৭তম অধ্যায়

দোয়া দূরুদ ও মুনাযাত ৫৯০
দরূদ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ৫৯০
সালাম সংক্রান্ত হাদীস সমূহ ৫৯৪
গোটা সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ আমল ৫৯৭
দোয়ার আদব ৫৯৭
দোয়া কবূলের সময় ৫৯৯
দোয়া কবূল হওয়ার আশাব্যঞ্জক স্থান ৬০১
যাদের দোয়া গৃহীত হয় ৬০২
দোয়া কবূল হওয়ার লক্ষণ ৬০৩
একটি পূর্ণ দোয়া ৬০৪
প্রভাত ও সন্ধ্যায় পড়ার দোয়া ৬০৪

শুধু প্রভাতে পড়ার দোয়া সমূহ	৬১৯
তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দোয়া	৬২০
দোয়ায়ে কুনুত	৬২১
জানাযা নামাযের দোয়া	৬২২
হিদায়াত লাভের দোয়া সমূহ	৬২৩
মুসাফাহার দোয়া	৬২৬
কোলা-কুলি করার সময় পঠিত দোয়া	৬২৬
খানা বিষয়ক দোয়া সমূহ	৬২৬
খানা সামনে আসলে এই দোয়া পড়বে	৬২৬
খানার শুরুতে বলবে	৬২৭
খানার শেষে বলবে	৬২৭
খানা পাত্রে নেয়ার সময় এই দোয়া পড়া	৬২৭
শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ভুলে গেলে পরে পড়ার দোয়া	৬২৭
মাখ্লূকের সর্ব প্রকার অনিষ্ট ও অপকারিতা হইতে হেফাযতের দোয়া	৬২৭
শোয়ার সময়ের দোয়া সমূহ	৬২৯
শোয়ার মধ্যে ভাল বা মন্ধ স্বপ্ন দেখে জেগে গেলে তার দোয়া	৬২৯
ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে বা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার দোয়া	৬৩০
ঘুম থেকে উঠার পর দোয়াসমূহ	৬৩০
অযু করার পূর্বের ও পরের দোয়া সমূহ	৬৩২
ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর থেকে বের হবার দোয়াসমূহ	৬৩৪
ঘর হতে বাহিরে যাওয়ার দোয়া	৬৩৪
বিপদ মুক্তির দোয়া	৬৩৪
বিপদ মুক্তির জন্য ৪০ দিন পড়লে ফল লাভ হয়	৬৩৫
বিপদ মুক্তির জন্য পরিক্ষীত আরেকটি দোয়া	৬৩৫
কোন কাজ কঠিন হলে পড়ার দোয়া	৬৩৬
মুছিবতের সময় পাঠ করার দোয়া	৬৩৬
বালামুসীবত থেকে মুক্তির লাভের দোয়া	৬৩৬
কঠিন বিপদ আপদ ও শত্রুর কবল হইতে হেফাযতের দোয়া	৬৩৭
দুখ ও মনোকষ্টের সময়ে পড়ার দোয়া	৬৩৭
সর্ব রকম আসমানী-যমীনি বালা-মুসীবত হইতে হেফাযতের দোয়া	৬৩৭
বিপদগ্রস্তকে দেখে নিরাপত্তার জন্য দোয়া	৬৩৭
বিপদাপদ ইহতে নিরাপদ জিন্দেগী দোয়া	৬৩৮
রোগ ও অসুস্থ কালীন সময়ের দোয়া সমূহ	৬৩৮

অসুস্থ হলে রোগ মুক্তির দোয়া ৬৩৯
দরূদে শিফা ৬৩৯
রোগ মুক্তির আয়াতসমূহ আয়াতের শিফা ৬৩৯
মাথা বেদনা থেকে আরোগ্যের দোয়া ৬৪০
কঠিন কঠিন রোগ হইতে হেফাযতের দোয়া ৬৪০
রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ৪০ বার এই আয়াত পড়বে ৬৪০
রোগীকে ডান দিকে ফিরায়ে দিয়ে দোয়া পড়বে ৬৪১
কর্জ হতে পরিত্রাণ এর দোয়া ৬৪১
ঋণ পরিশোধ ও চিন্তা পেরেশানী দূর হওয়ার দোয়া ৬৪১
ঋণ পরিশোধের জন্য খুবই উপকারী দোয়া ৬৪২
রিযিক বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের দোয়া সমূহ ৬৪২
ঋণ ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হতে মুক্তির দোয়া ৬৪৩
ঋণ পরিশোধ ও শত্রু দমনের দোয়া ৬৪৪
দুশ্চিন্তা ও ঋণ মুক্তির দোয়া ৬৪৪
ঋণ পরিশোধের জন্য দোয়া ৬৪৪
জীবিকা অর্জন ও দারিদ্র মোচনের তসবীহ ৬৪৫
ঋণ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া ৬৪৫
খারাপ ব্যধি থেকে মুক্তির দোয়া ৬৪৫
খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্তির দোয়া ৬৪৫
বরকতময় জীবিকা লাভের দোয়া ৬৪৬
গুনাহ মাফের দোয়া ৬৪৭
সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার ৬৪৭
ইস্তেগফার ৬৪৭
আল্লাহ্‌র নিকট হতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের ব্যবস্থাকারী দোয়া ৪৪৭
গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি লাভের দোয়া ৪৪৮
মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার দোয়া ৪৪৮
কবর যিয়ারতের দোয়া ৬৪৯
চাঁদ দেখার দোয়া ৬৪৯
ইফতারের দোয়া ৬৪৯
মজলিস শেষে পাঠ করার দোয়া ৬৫০
গন্তব্য স্থান দেখে পাঠ করার দোয়া ৬৫০
ফেরার পথে পাঠ করার দোয়া ৬৫১
বাড়ী থেকে বের হওয়ার দোয়া ৬৫১

বাড়ীতে প্রবেশের দোয়া ৬৫১
বাজারে প্রবেশের সময় পড়ার দোয়া ৬৫২
সফরে যাত্রা করার দোয়া ৬৫২
যানবাহনে আরোহনের দোয়া ৬৫৩
সফরকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দোয়া ৬৫৪
নতুন কাপড় পরার সময় পড়ার দোয়া ৬৫৬
আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়ার দোয়া ৬৫৬
ঈমানের সহিত মৃত্যুলাভের দোয়া ৬৫৬
নতুন ফল দেখে পড়ার দোয়া ৬৫৭
ঈমানের সাথে মৃত্যুর দোয়া ৬৫৭
ঈমানের সহিত মৃত্যুর ১ম আমল ৬৫৭
ঈমানের সাথে মৃত্যুর ২য় আমল ৬৫৮
ঈমানের সাথে মৃত্যুর ৩য় আমল ৬৫৮
ঈমানের সাথে মৃত্যুর ৪র্থ আমল ৬৫৯
ঈমানের সাথে মৃত্যুর ৫ম আমল ৬৫৯
জাহান্নাম হতে মুক্তির দোয়া ৬৬০
যে দোয়ার ছাওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত লেখা হয় ৬৬১
গুরুত্ব পূর্ণ একটি দোয়া ৬৬১
মুনাফিকী ও রিয়া হতে বাঁচার দোয়া ৬৬১
আল্লাহ্‌র মহব্বত, আল্লাহ্‌র ওলীদের মহব্বত ও
নেক্ আমলের তওফীক হাসিলের দোয়া ৬৬১
দ্বীনের উপর অটল থাকার দোয়া ৬৬২
কবরের আযাব, দোযখ, ধন-দৌলতের খারাবি ও
অভাব-অনটনের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া ৬৬২
হোদায়েত, তাক্ওয়া-পরহেয্গারী, দুশ্চরিত্র হতে হেফাযত ও
ধন-সম্পদ লাভের দোয়া ৬৬৩
আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য ৬৬৩
জামে' দোয়া সর্বমুখী ভালাইর দোয়া) ৬৬৩
লা-হাওলা ওয়ালা-কুউআতা ইল্লা বিল্লাহ এর আমল ৬৬৪
শিরকে খফী সূক্ষ শিরক হতে রক্ষাকারী দোয়া ৬৬৫
এক আযীমুশ-শান্ ওযীফা ৬৬৬
অতি উপকারী কতগুলি বিষয় ৬৬৯
এক মিনিটে এক খতম কোরআনের ছাওয়াব ৬৬৯

এক হাজার আয়াতের ছাওয়াব	৬৬৯
এক শত নফল হজ্জের ছাওয়াব	৬৬৯
আগুন ও সব ধরনের বিপদ হইতে নিরাপদ থাকার দোয়া	৬৭০
বিশেষ মুনাজাতসমূহ	৬৭১
স্ত্রী-সংসর্গে যাবার দোয়া	৬৭৭
প্রসবকালীন পড়ার দোয়া	৬৭৭
সন্তান ভূমিষ্টকালীন দোয়া	৬৭৮
সন্তান লাভের জন্য দোয়া	৬৭৯
সহজে প্রসব হওয়ার জন্য	৬৭৯
রূযী-রোযগার বৃদ্ধির দোয়া	৬৭৯
বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া	৬৮০
বৃষ্টির আগমন দেখে পড়ার দোয়া	৬৮০
অতিবৃষ্টিতে পড়ার দোয়া	৬৮০
মেঘের গর্জন ও বিদ্যুত চমকানো-কালীন পড়ার দোয়া	৬৮১
ঝড়-ঝঞ্জাকালীন পড়ার দোয়া	৬৮১
ক্রোধ প্রশমনের দোয়া ও পন্থা	৬৮২
চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ এর সময় পড়ার দোয়া	৬৮২
আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা	৬৮৩
বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে আশ্রয় কামনা	৬৮৪
মাতা-পিতার জন্য রহমতের দোয়া	৬৮৪
প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্যের দোয়া	৬৮৪
অপমৃত্যু ও যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার দোয়া	৬৮৪
বালা-মুসীবতের সময়কালীন দোয়া	৬৮৫
দুর্দশা হতে মুক্তি লাভের সহজ উপায়	৬৮৫
১০টি বিষয়, যেগুলোর প্রাবন্ধির দ্বীনের অন্যান্য হুকুম পালন করার তওফিক হবে	৬৮৭
আমলের তৌফিক কিভাবে হয়	৬৮৯
আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধি করার উপায়	৫৮৯
অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির আমল	৬৯০
কু-দৃষ্টি হতে বাঁচার জন্য কয়েকটি পরামর্শ	৬৯৪
শয্যাত্যাগ ও মসজিদে গমনের সুন্নাতসমূহ	৬৯৫
মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ	৬৯৫
মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নাত সমূহ	৬৯৬

খাওয়ার সুন্নাত সমূহ ৬৯৬
আত্মার দশটি ধ্বংসাত্বক গুপ্ত ব্যাধি ৬৯৬
জ্বীনের থেকে রক্ষার আমলসমূহ ৬৯৯

২৮তম অধ্যায়

প্রচলিত কুসংস্কার ৭০১
বিবাহের সংশোধনযোগ্য রসমসমূহ ৭০১
ছেলে পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিবাহের সংশোধনযোগ্য বিষয়সমূহ ৭০৩
মেয়ে পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিবাহের সংশোধনযোগ্য বিষয়সমূহ ৭০৪

২৯তম অধ্যায়

আহকামে তাবলীগ ৭০৫

৩০তম অধ্যায়

দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা ৭১৯

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
👇
https://t.me/islaMic_fdf

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী

১. زبدة القارى فى حل مشكلات البخارى جـ ١-٢
২. توضيح الاثار فى حل مهمات شرح معانى الاثار
৩. انفس النفنيس فى حل مهمات علوم الحديث
৪. এমন মানুষ মিলবে না আর
৫. আদর্শ নারীর আদর্শ জীবন
৬. নারীর ইসলামী জীবন
৭. দোয়ার ফযিলত
৮. বারো চান্দের ফযিলত
৯. পরকালের জীবন
১০. জান্নাত জাহান্নাম
১১. মীযাননুছছরফ ও মুনশায়িব
১২. নাহ্‌বেমীর (বাংলা)
১৩. গুলিস্তা (বাংলা)
১৪. খেলাফতে রাশেদা
১৫. ইসলামে চিত্তবিনোদন
১৬. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-১
১৭. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-২
১৮. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-৩
১৯. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-৪
২০. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-৫
২১. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-৬
২২. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-৭
২৩. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-৮
২৪. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-৯
২৫. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-১০
২৬. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-১১
২৭. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-১২
২৮. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-১৩
২৯. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-১৪
৩০. খুৎবাতে হাকিমুল উম্মত-১৫

১ম অধ্যায়

الاسماء الحسنى

উত্তম নামসমূহের আলোচনা

রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আল্লাপাকের ৯৯ টি নাম হেফজ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ الْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ الْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ الرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ الْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ الْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِيُّ الْمَتِيْنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِى الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْيِى الْمُمِيْتُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ الْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِى الْمُتَعَالِى الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوْرُ الرَّؤُوْفُ مَالِكُ الْمُلْكِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمُغْنِىُ الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ النُّوْرُالْهَادِى الْبَدِيْعُ الْبَاقِى الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ

আসমাউল হুসনা বা আল্লাহর উত্তম নাম সমূহের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা

(১) اَللّٰهُ (আল্লাহ) আল্লাহ তাআলার জাতি নাম।

ফযীলত ঃ দৈনিক যে ব্যক্তি এক হাজার বার يَا اَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহু) পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর থেকে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংকোচ দুর হয়ে যাবে,

এবং সংকল্প ও বিশ্বাসের শক্তি লাভ করবে, অনুপায় চিকিৎসাহীন তথা যে রোগের চিকিৎসা নেই এমন রোগী বেশি বেশি يَا اَللّٰهُ (ইয়া আল্লাহু) দৈনিক পড়বে, এবং তার পর আরোগ্যের জন্য দোয়া করবে, এতে সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে।

(২) اَلرَّحْمٰنُ (আর্‌রহমানু) অর্থ দয়াময়।

ফযীলত ঃ দৈনিক যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার يارحمن (ইয়া-রাহ্‌মানু) পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার অন্তর থেকে সর্বপ্রকার কর্কশতা ও গাফলতী দূর হয়ে যাবে।

(৩) اَلرَّحِيْمُ (আররাহীম) অর্থ দয়াবান বা বিশেষ দয়ার অধিকারী।

ফযীলত ঃ দৈনিক যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর ১০০ বার يارحميم (ইয়া-রাহীমু) পড়বে, ইন্‌শাআল্লাহ সকল দুনিয়াবী বালা-মসীবত থেকে বেঁচে থাকবে, এবং সকল সৃষ্টি তার উপর মেহেরবান হয়ে যাবে।

(৪) اَلْمَلِكُ (আলমালিকু) অর্থ রাজা, বাদশা।

ফযীলত ঃ দৈনিক ফজরের নামাযের পর যে ব্যক্তি ১০০ বার يا ملك (ইয়া-মালকু) পড়বে, অল্লাহ তা'আলা তাকে ধনী করে দেবেন।

(৫) اَلْقُدُّوْسُ (আল্‌কুদ্দু'ছ) অর্থ অতি পাক ও পবিত্র।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নাম পড়তে থাকবে, ইন্‌শাআল্লাহ সকল প্রকার বালা-মসিবত থেকে নিরাপদে থাকবে, আর যে ব্যক্তি ১১৫ বার এ নাম পড়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে ফুঁক দেবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সুস্থতা দান করবেন।

(৬) اَلسَّلَامُ (আস্‌সালামু) অর্থ শান্তিময় ও নিরাপদ, অর্থাৎ কোনরূপ অশান্তি তাঁকে স্পর্ক করতে পারেনা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নাম পড়তে থাকবে, ইনশাআল্লাহ সকল প্রকার বালা-মসিবত থেকে নিরাপদে থাকবে, আর যে ব্যক্তি ১১৫ বার এ নাম পড়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে ফুঁ দেবে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে সুস্থতা দান করবেন।

(৭) اَلْمُؤْمِنُ (আল মু'মিন) অর্থ নিরাপত্তা দাতা, নিরাপদকারী,

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি কোন ভয়ের সময় ৬৩০ বার এ নামটি পড়বে ইনশা আল্লাহ সর্ব প্রকার ভয় ভীতি ও ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যে ব্যক্তি এ নামটি পড়বে বা লিখে নিজের কাছে রাখবে, তার বাহ্যিক ও ভিতরগত উভয় দিকই আল্লাহর আশ্রয়ে থাকবে।

(৮) اَلْمُهَيْمِنُ (আলমুহাইমিনু) অর্থ নেগাহবান, রক্ষক।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি গোসল করে দু'রাকাত নামাজ পড়বে, এবং খাছ দিলে ১০০ বার এ নাম পড়বে, আল্লাহ তাআলা তার বাহির ও ভিতর পবিত্র করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি ১১৫ বার পড়বে, তাহলে ইন্‌শা আল্লাহ গোপন বস্তু সম্পর্কে সে অবগত হবে।

(৯) اَلْعَزِيْزُ (আল্ আযিযু) অর্থ প্রভাবশালী, অন্যের উপর বিজয়ী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ৪০ দিন পর্যন্ত ৪০ বার এই নাম পড়বে, আল্লাহতা'আলা তাকে সম্মানিত ও অমুখাপেক্ষী করে দেবেন, আর যে ব্যক্তি ফজরের নমাযের পর ৪১ বার পড়তে থাকবে, সে ইন্‌শা আল্লাহ তা'আলা কারো কাছে ঠেকায় পড়বেনা, এবং সে ব্যক্তি বেইজ্জতির পর ইজ্জত ও সম্মান লাভ করবে।

(১০) اَلْجَبَّارُ (আল্‌জাব্বারু) "অর্থ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনকারী।

ফযীলত ঃ যে, ব্যক্তি দৈনিক সকাল সন্ধা ২২৬ বার এ নাম পড়বে, ইন্‌শা আল্লাহ জালিমদের জুলুম ও প্রতিশোধ থেকে হিফাযতে থাকবে, আর যে চান্দির আংটিতে এ নাম নকশা করে পরিধান করবে, ইনশা আল্লাহ লোকের অন্তরে তার ভয়-ভীতি, মহত্ব ও মান মর্যাদা সৃষ্টি হবে।

(১১) اَلْمُتَكَبِّرُ **(আল্ মুতাকাব্বির)** অর্থ অহংকারের অধিকারী অর্থাৎ, যাঁর অহংকার করা শোভা পায়।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি এ নামটি দৈনিক পড়বে, আল্লাহতা'আলা তাঁকে ইজ্জত সম্মান, ও বৃহত্তদান করবেন, আর যদি সকল কাজের শুরুতে এ নাম বেশি বেশি পড়ে, তাহলে ইনশা আল্লাহ ঐ কাজে সফলকাম হবে।

(১২) اَلْخَالِقُ (আল্ খালিক্কু) অর্থ প্রকল্পক, স্রষ্টা।

ফযীলত ঃ য, ব্যক্তি ক্রমাগত সাত দিন পর্যন্ত ১০০ বার এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ সকল প্রকার বালা-মসীবত থেকে নিরাপদ থাকবে, যে ব্যক্তি সর্বদা এই নাম পড়তে থাকবে, আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরশতা সৃষ্টি করে দেন যিনি ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে ইবাদত করেন আর ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জল ও আলোকিত থাকে।

(১৩) اَلْبَارِئُ (আল বারিউ) অর্থ ত্রুটিহীন স্রষ্টা,

ফযীলত ঃ যদি বন্ধ্যা নারী (ক্রমাগত) সাত দিন রোজা রেখে এবং পানি দ্বারা ইফতার করার পর ২১ বার পড়ে,البارئ المصور (আল বারিউল, মুছাওয়ীরু) অর্থ, ত্রটিহীন স্রষ্টা ও নকশা অংকনকারী) তবে ইনশা আল্লাহ তার পুত্র সন্তান লাভ হবে।

(১৪) اَلْمُصَوِّرُ (আল, মুছাও্ য়ীরু) অর্থ প্রকল্পক ও নকশা অংকনকারী, ডিজাইনার।

(১৫) اَلْغَفَّارُ (আলগাফফারু) অর্থ বড় ক্ষমাশীল 'অর্থৎ, যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ মার্জনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি জুমার নামায পড়ার পর ১০০ বার এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার উপর ক্ষমার চিহ্ন সমূহ প্রকাশ হতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি দৈনিক পড়বে, يَاغَفَّارُ اِغْفِرْلِىْ (অর্থ ঃ হে গুনাহ ক্ষমাকারী আমাকে ক্ষমা করুন)। আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা প্রাপ্ত লোকদের দলে অন্তর্ভূক্ত করবেন।

(১৬) اَلْقَهَّارُ (আল্ ক্বাহ্হারু) অর্থ, সকল বস্তু যাঁর ক্ষমতার অধীনে। অর্থাৎ, ক্ষমতা প্রয়োগে যাঁর কোন বাঁধা নেই।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়ার ভালবাসায় গ্রেফতার সে বেশি বেশি এ নাম পড়বে তাহলে ইন্শা-আল্লাহ দুনিয়ার ভালবাসা তার অন্তর থেকে চলে যাবে, এবং আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

(১৭) اَلْوَهَّابُ (আল্ ওহ্হাবু) অর্থ বড় দাতা, অর্থাৎ যার দান অবারিত।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি অভাব অনটনে পতিত হয়, সে বেশি বেশি এ নামটি পড়বে, বা লিখে নিজের কাছে রাখবে, বা চাশতের নামাজের শেষ সেজদায় ৪০ বার এ নামটি পড়বে, এতে আল্লাহ তা'আলা ইনশা আল্লাহ তাকে অভাব অনটন থেকে বিস্ময়কর পন্থায় নাজাত দান করবেন, আর যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন সম্মুখীন হয় তবে ঘর বা মসজিদের চত্বরে তিন বার সেজদা করে হাত উঠাবে, এবং ১০০ বার এ নামটি পড়বে। ইনশা আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজন পুরা হয়ে যাবে।

(১৮) اَلرَّزَّاقُ (আররাজ্জাকু) অর্থ রিযিক দাতা,

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পূর্বে আপন ঘরের চার কোণে ১০ বার করে এ নামটি পড়ে ফুঁক দেবে, ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রিযিকের দরজা খুলে দেবেন এবং দারিদ্রতা ও রোগ আদৌ তার ঘরে আসবেনা, ডান কোণা থেকে (এ আমল) শুরু করবে এবং চেহারা কেবলার দিকে রাখবে।

(১৯) اَلْفَتَّاحُ (আলফাত্বাহু) অর্থ সৃষ্টির মীমাংসাকারী, বিপদ মুক্তকারী, যার দয়ার ভান্ডার খোলা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি শেষ রাতে অজুর সাথে ৯৯ বার এ নামটি পড়বে, আল্লাহ তা'আলা ইনশা আল্লাহ তার হৃদয়কে নূর ও রহস্য সমূহের স্থান বানিয়ে দেবেন।

আর যে ব্যক্তি জুমার রাতে এ নামটি এত পরিমাণ পড়বে যে, পড়তে পড়তে সে আত্মহারা হয়ে যাবে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরকে ইন্‌শা আল্লাহ কাশফ ও ইলহাম তথা স্বর্গীয় বাণী দ্বারা সম্মানিত করবেন।

(৩০) اَلْعَدْلُ (আল, আদলু) অর্থ ন্যায় বিচারক, অর্থাৎ তিনি যা উচিত তাই করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি জুমার দিন বা জুমার রাতে রুটির বিশটি টুকরায় اَلْعَدْلُ (আলআদলু) লিখে খাবে ইনশা আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবকে তার অনুগত করে দেবেন।

(৩১) اَللَّطِيْفُ (আল লাত্বীফু) অর্থ অনগ্রহকারী, সুক্ষ্মদর্শী।

অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ১৩৩ বার يَالَطِيْفُ (ইয়া-লাত্বীফু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার খাদ্যে রবকত হবে এবং তার সকল কাজ ভালভাবে পূর্ণ হবে।

যে ব্যক্তি অভাব অনটন, দারিদ্রতা, দুঃখ-কষ্ট, রোগ, নির্জনতা, পরিক্ষা বা অন্য কোন বিপদে পতিত হয় সে উত্তমরুপে দু'রাকাত নামায পড়বে, এবং আপন উদ্দেশ্য অন্তরে হাজির রেখে ১০০ বার এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার উদ্দেশ্য পুরা হবে।

(৩২) اَلْخَبِيْرُ (আল্ খাবীরু) অর্থ জ্ঞানী, অর্থাৎ যিনি গুপ্ত ভেদ সম্পর্কে অবগত, ভিতরের বিষয়জ্ঞাতা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ৭ দিন পর্যন্ত এ নাম বেশি বেশি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার উপর গুপ্ত খবর প্রকাশ হতে থাকবে

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির কামনায় গ্রেফতার হয় সে বেশি বেশি এ নামটি যিকির করবে, ইনশা-আল্লাহ তার থেকে মুক্তি লাভ করবে।

(৩৩) اَلْحَلِيْمُ (আল্ হালীমু) অর্থ ধৈর্যশীল অর্থাৎ যিনি অপরাধ দেখেও সহজে শাস্তি দেন না।

ফযীলত ঃ যে ব্যাক্তি এ নামটি কাগজে লিখে পানি দ্বারা ধুয়ে যে জিনিসের উপর ঐ পানি ছিটিয়ে দিবে বা মর্দন করবে, ইনশা আল্লাহ ঐ জিনিসে কল্যাণ ও বরকত হবে, এবং বালা-মসিবত থেকে হিফাজতে থাকবে।

(৩৪) اَلْعَظِيْمُ (আল আজীমু) অর্থ ঃ বিরাট, বহু সম্মানী, মহান

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি নামটি বেশি বেশি যিকির করবে ইনশা আল্লাহ তা'আলা তার ইজ্জত সম্মান ও শ্রেষ্ঠতা লাভ হবে।

(৩৫) اَلْغَفُوْرُ (আলগাফুরু) অর্থ দয়াময়, ক্ষমাশীল, অর্থাৎ যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি এ নামটি বেশি বেশি যিকির করবে ইনশা আল্লাহ তার সকল দুঃখ কষ্ট ও পেরেশানী দূর হয়ে যাবে, এবং ধন-সম্পদ ও ছেলে সন্তানের মধ্যে বরকত হবে।

হাদীস ঃ যে ব্যক্তি সিজদার মধ্যে يَارَبِّ اِغْفِرْلِىْ (ইয়া-রাব্বিগ ফিরলী) তিন বার বলবে, আল্লাহ তা'আলা তার ভবিষ্যত ও অতীতের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেবেন।

(৩৬) اَلشَّكُوْرُ (আশ শাকুরু) অর্থ কৃতজ্ঞ অর্থাৎ যিনি অল্পে বেশি পুরস্কার দেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি জীবিকার সংকীর্ণতা বা অন্য কোন দুঃখ-কষ্ট, পেরেশানীতে পতিত হয় সে এ নামটি দৈনিক ৪১ বার পড়বে, ইনশা আল্লাহ তা থেকে রেহাই লাভ করবে।

(৩৭) اَلْعَلِىُّ (আল আলীয়্যু) অর্থ সর্বোচ্চ সমাসীন, সর্বোপরি, উচ্চ ও উন্নত।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি এ নামটি সর্বদা পড়তে থাকে এবং লিখে নিজের কাছে রাখবে, ইনশা আল্লাহ তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি, প্রফুল্ল অবস্থা এবং উদ্দ্যেশ্য সফল হবে।

(৩৮) اَلْكَبِيْرُ (আল কাবীরু) "অর্থ ঃ বিরাট, মহান, অর্থাৎ ধারণার উর্ধে বড়।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি আপন পদ থেকে বরখাস্ত ও পদচ্যুত হয়ে যাবে, সে সাতটি রোযা রাখবে এবং দৈনিক ১০০০ (এক হাজার) বার يَاكَبِيْر (ইয়া-কাবীরু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ সে আপন পদে পূনর্বহাল হয়ে যাবে এবং উচ্চতর মর্যাদা লাভ করবে।

(৩৯) اَلْحَفِيْظُ (আলহাফীজু) অর্থ ঃ বড় রক্ষাকারী, রক্ষা কর্তা। অর্থাৎ যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ্য রাখেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি يَا حَفِيْظُ (ইয়া হাফীজু) যিকির করবে এবং লিখে নিজের কাছে রাখবে সে ইনশা আল্লাহ সকল প্রকার ভয় ভীতি এবং ক্ষতি থেকে হেফাজতে থাকবে।

(৪০) اَلْمُقِيْتُ (আল মুক্বীতু) অর্থ ঃ খাদ্যদাতা, অন্নদানকারী, আহার দানকারী, দৈহিক ও আত্মিক শক্তি দাতা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ছোট মাটির পাত্রে ৭ বার এ নামটি পড়ে ফুঁক দেবে এর পর উহা থেকে নিজে পানি পান করবে বা অন্য কাউকে পান করাবে ঘ্রাণ নেবে, তবে ইন্‌শা আল্লাহ উদ্দেশ্য লাভ হবে।

(৪১) اَلْحَسِيْبُ (আল্ হাসীবু) অর্থ হিসাব পীরক্ষক, সবার জন্য যথেষ্ট, যিনি অন্যের জন্য যথেষ্ট হন, যিনি যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তির কোন মানুষ বা বস্তুর পক্ষ থেকে ভয় ভীতি হয় সে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করে ৮ দিন পর্যন্ত সকালে ৭০ বার পড়বে اَلْحَسْبِى اَللّٰهُ الْحَسِيْبُ (আল হাস্‌বী আল্লাহুল হাসীবু) ইনশা আল্লাহ সে সকল জিনিসের ক্ষতি ও অনিষ্ট থেকে হেফাজতে থাকবে।

(৪২) اَلْجَلِيْلُ (আল জালীলু) অর্থ গৌরাবান্বিত, মহিমান্বিত, "অর্থাৎ যার মহিমার তুলনা নেই।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি মৃগনাভি ও জাফরান দ্বারা এ নামটি লিখে নিজের কাছে রাখবে এবং বেশি বেশি يَاجَلِيْلُ (ইয়া জালীলু) যিকির করবে, আল্লাহ তাআলা ইনশা আল্লাহ তাকে ইজ্জত, সম্মান ও পদমর্যাদা দান করবেন।

(৪৩) اَلْكَرِيْمُ (আলকারীমু) অর্থ বড় দাতা, অনুগ্রহকারী, আশার অতিরিক্ত দাতা, "অর্থাৎ, যিনি বিনা সওয়ালে দান করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক শোয়ার সময় يَا كَرِيْمُ (ইয়া কারীমু) পড়তে পড়তে ঘুম যাবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ওলামা, সালেহ তথা আলেম ও সৎ লোকদের মাঝে ইজ্জত দান করবেন।

(৪৪) اَلرَّقِيْبُ (আররাক্বীবু) অর্থ ঃ নীরিক্ষণকারী, অর্থাৎ যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ্য রাখেন এবং সর্বদা লক্ষ্য রাখেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক আপন ছেলে সন্তান, পরিবার বর্গ, ধন সম্পদ, ও আসবাব পত্রের উপর এ নামটি ৭ বার পড়ে ফুঁক দেবে এবং সাথে সাথে يَا رَقِيْبُ (ইয়া রাক্বীবু) এর যিকির করবে ইনশা আল্লাহ সে সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে হেফাজত থাকবে।

(৪৫) اَلْمُجِيْبُ (আল্ মুজিবু) অর্থ উত্তর দাতা, ডাকে সাড়া দাতা, দোয়া কবূল কারী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি يَامُجِيْبُ (ইয়া মুজীবু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার দোয়া সমূহ আল্লাহর দবরারে কবূল হওয়া আরম্ভ হবে।

(৪৬) اَلْوَاسِعُ (আল ওয়াছিউ) অর্থ সম্প্রসারণকারী, অসীম অর্থাৎ যার দান জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য সম্প্রসারিত ও বিপুল।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি يَاوَاسِعُ (ইয়া ওয়াছিউ) এর যিকির করবে ইনশা আল্লাহ তা'আলা তাকে বাহির ও ভিতর উভয় দিক দিয়েই ধনী ও স্বনির্ভরতা দান করবেন।

(৪৭) اَلْحَكِيْمُ (আল হাকীমু) অর্থ প্রজ্ঞাবান, তত্বজ্ঞানী, হিকমত ওয়ালা, অর্থাৎ যিনি সকল কাজ উত্তম রূপে ও নিখুঁত ভাবে করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি يَاحَكِيْمُ (ইয়া হাকীমু) পড়বে ইনশা আল্লাহ তা'আলা তার উপর ইলম ও জ্ঞানের দরজা খুলে দেবেন

যে ব্যক্তির কোন কাজ পূর্ণ না হয় সে পাবন্দীর সাথে এ নামটি প্রতিদিন পড়তে থাকবে, ইনশা আল্লাহ কাজ পূর্ণ হয়ে যাবে।

(৪৮) اَلْوَدُوْدُ (আলওয়াদূদু) অর্থঃ "শ্রেষ্ঠ বন্ধু, যিনি বান্দার কল্যাণকে ভাল বাসেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ১০০০ এক হাজার বার يَا وَدُوْدُ (ইয়া ওয়াদূদু) পড়ে খাবারের উপর ফুঁক দেবে, অতঃপর স্ত্রীর সাথে বসে ঐ খাবার খায় ইনশা আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে এবং পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

(৪৯) اَلْمَجِيْدُ (আল মাজীদু) অর্থ ঃ অসীম অনুগ্রহকারী, বড় বুযূর্গ, মহান উচ্চ, বুযূর্গী ওয়ালা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি কোন কষ্টদায়ক রোগ, অগ্নী (এক প্রকার রোগ,) কুষ্ঠ রোগ ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয় সে ১৩, ১৪, ১৫, তারিখের রোযা রাখবে এবং ইফ্তারের পর খুব বেশি এ নামটি পড়বে, অতঃপর পানির উপর ফুঁক দিয়ে পান করবে, ইনশা আল্লাহ ঐ রোগ দূর হয়ে যাবে।

(৫০) اَلْبَاعِثُ (আল বাইছু) অর্থ, প্রেরক, রাসূল প্রেরণ কারী, রিযিক প্রেরণকারী, পুনরুত্থানকারী, অর্থাৎ কবর হতে হাশরে প্রেরণকারী। মৃত দেরকে জীবিতকারী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক শোয়ার সময় বুকের উপর হাত রেখে ১০১ বার يَا بَاعِثُ (ইয়া বাইছু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার অন্তর ইলম ও জ্ঞান দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

(৫১) اَلشَّهِيْدُ (আশ শাহীদু) অর্থ সর্বদা বিদ্যমান, বান্দাদের কাজের সাক্ষী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তির স্ত্রী বা ছেলে সন্তান নাফরমান তথা অবাধ্য হয়, সে সকাল বেলা তাদের কপালে হাত রেখে ২১ বার يَاشَهِيْدُ (ইয়া শাহীদু) পড়ে ফুক দেবে, ইনশা আল্লাহ (তারা) বাধ্য হয়ে যাবে।

(৫২) اَلْحَقُّ (আল হাক্কু) অর্থ সত্য প্রকাশক, হক, অর্থাৎ যিনি প্রজ্ঞা অনুসারে কাজ করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি চার কোণা বিশিষ্ট কাগজের চার কোণে اَلْحَقُّ (আল হাক্কু) লিখে সেহরীর সময় ঐ কাগজটি হাতের তালুতে রেখে আসমানের দিকে উঠিয়ে দোয়া করবে ইনশা আল্লাহ হারানো ব্যক্তি বা আসবাবপত্র পাওয়া যাবে এবং ক্ষতি থেকে হেফাজতে থাকবে,

(৫৩) اَلْوَكِيْلُ (আল্ ওয়াকীলু) অর্থ কাজকারক, অর্থাৎ যিনি বান্দাহদের কাজের যোগান দেন। কামিয়াবী দানকারী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি কোন আসমানী বালা মসীবতের ভয়ের সময় বেশি বেশি يَاوَكِيْلُ (ইয়া ওয়াকীলু) যিকির করবে এবং এ নামটিকেই নিজের কার্য সমাধান কারী মনে করবে সে ইনশা আল্লাহ সকল প্রকার বিপদ থেকে হেফাজতে থাকবে।

(৫৪) اَلْقَوِىُّ (আলক্বাওয়ীয়ু) অর্থ শক্তিবান, শক্তির আধার, শক্তিশালী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি প্রকৃত মজলুম, দুর্বল ও পরাজিত হয়, সে ঐ জালিম ও শক্তিশালী দুশমনকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বেশি বেশি এ নামটি পড়বে ইনশা আল্লাহ সে তার থেকে নিরাপদ থাকবে।

উল্লেখ্য যে, উত্তম স্থান ব্যতীত ও অন্যায়ভাবে এ আমল ও তদ্‌বীর ব্যবহার করা আদৌ উচিত নয়।

(৫৫) اَلْمَتِيْنُ (আল মাতিন) অর্থ দৃঢ়, শক্ত, বড় ক্ষমতাবান, অর্থাৎ যার উপর কারো ক্ষমতা নেই।

ফযীলত ঃ যে মহিলার দুধ না হয় তাকে اَلْمَتِيْنُ (আলমুতীন) কাগজের উপর লিখে ধুয়ে পান করাবে, ইনশাআল্লাহ তার খুব দুধ হবে।

(৫৬) اَلْوَلِىُّ (আল ওয়ালীয়্যু) অর্থ ঃ অভিভাবক, যিম্মাদার, বন্ধু, যিনি মুমিনদের ভালবাসেন ও সাহায্য করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি আপন স্ত্রীর অভ্যাস, চরিত্র ও চাল চলনে সন্তুষ্ট না হয় সে যখন তার স্ত্রীর সামনে যাবে এবং এ নামটি পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার স্ত্রী উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়ে যাবে।

(৫৭) اَلْحَمِيْدُ (আলহামীদু) অর্থ প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ক্রমাগত ৪৫ দিন পর্যন্ত নির্জনে বসে ৯৩ বার يَا حَمِيْدُ (ইয়া হামীদু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার সকল প্রকার কু-অভ্যাস ও অসৎ চরিত্র দূর হয়ে যাবে।

(৫৮) اَلْمُحْصِىُ(আল মুহছী) অর্থ হিসাব রক্ষক, সংখ্যা ও গণনা রক্ষাকারী, বান্দারা যা করে তিনি তার পুংখানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি রুটির ২০ টি টুকরায় দৈনিক ২০ বার এ নামটি পড়ে ফুঁক দেবে, এবং তা খাবে ইনশা আল্লাহ সকল সৃষ্ট জীব তার অনুগত হয়ে যাবে।

(৫৯) اَلْمُبْدِئُ (আল মুবদীউ) অর্থ বিনা নুমনায় স্রষ্টা, আদি সৃষ্টিকারী, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি সেহরীর সময় গর্ভবতী নারীর পেটের উপর হাত রেখে ৯৯ বার يَامُبْدِئُ (ইয়া মুবদীউ) পড়বে, ইনশাআল্লাহ তার গর্ভস্রাবও হবে না, আবার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেও সন্তান হবে না।

(৬০) اَلْمُعِيْدُ (আল মু'য়ীদু) অর্থ দ্বিতীয় বার সৃষ্টিকারী, পুনরায় সৃষ্টিকারী, মৃত্যুর পর পুনঃ সৃষ্টিকারী, যার পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে।

ফযীলত ঃ হারানো ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এ আমল ও তদবীর করবে যখন ঘরের সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন ঘরের চার কোণে ৭০ বার করে يَا مُعِيْدُ (ইয়া মু'য়ীদু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ ৭ দিনের মধ্যে হারানো ব্যক্তি ফিরে আসবে বা খোজ পাওয়া যাবে।

(৬১) اَلْمُحْيِى (আলমুহ্য়ী) অর্থ, জীবন দাতা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি অসুস্থ হয় সে বেশি বেশি اَلْمُحْيِى (আলমুহয়ী) যিকির করবে, বা এ নামটি পড়ে অন্য রোগীকে ফুঁক দেবে ইনশা আল্লাহ সে সুস্থ হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি ৮৯ বার اَلْمُحْيِى পড়ে নিজের শরীরে ফুঁক দেবে সে ইনশা আল্লাহ সকল প্রকার বন্দীত্ব ও বন্ধ থেকে নিরাপদে থাকবে।

(৬২) اَلْمُمِيْتُ (আলমুমীতু) অর্থ মৃত্যুদানকারী মৃত্যু দাতা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তির নফস তথা আত্মা নিজ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণে না হয়, সে ঘুমের সময় বুকের উপর হাত রেখে اَلْمُمِيْتُ আলমুমীতু পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে যাবে, এতে ইনশা আল্লাহ তার আত্মা বাধ্য হয়ে যাবে।

(৬৩) اَلْحَىُّ (আল হাইয়্য) অর্থ চিরঞ্জীব, চিরজীবন্ত।

ফযীলত ঃ- যে ব্যক্তি দৈনিক ৩০০০ (তিন হাজার) বার اَلْحَىُّ (আলহাইয়্য) এর যিকির করবে, সে ইনশা আল্লাহ আদৌ অসুস্থ হবে না।

যে ব্যক্তি এ নামটি চীনা পাত্রের উপর মৃগনাভী ও গোলাপের পানি দ্বারা লিখে মিঠা পানি দ্বারা ধুয়ে পান করবে বা অন্য কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করাবে ইনশা আল্লাহ সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করবে।

(৬৪) اَلْقَيُّوْمُ (আলক্বাইয়্যুমু) অর্থ স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব সত্তার কারক ও ধারক।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি اَلْقَيُّوْمُ (আলক্বাইয়্যুমু) নামটি যিকির করবে ইনশা আল্লাহ লোকদের মাঝে তার ইজ্জত, সম্মান ও বিশ্বাস্ততা বাড়বে।

আর যদি নির্জনে বসে এ নমটি যিকির করে ইনশা আল্লাহ তার অন্তর প্রফুল্ল অবস্থা হয়ে যাবে।

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ (ইয়া হাইয়্যু, ইয়াক্বাইয়্যুম) যিকির করবে ইনশা আল্লাহ তার বিষন্নতা ও অলসতা দূর হয়ে যাবে।

(৬৫) اَلْوَاجِدُ (আল ওয়াজিদু) অর্থ যিনি যা চান তা পান।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি আহার করার পূর্বে يَاوَاجِدُ (ইয়া ওয়াজিদু) এর যিকির করবে তার ঐ খাদ্য তার অন্তরের মধ্যে বল, শক্তি ও আলোর কারণ হবে।

(৬৬) اَلْمَاجِدُ (আল মাজিদু) অর্থ বড় দাতা, সম্মানিত মহৎ।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি একাকি এ নামটি এত বেশি পড়বে যে, পড়তে পড়তে অনুভূতিহীন হয়ে যায়, ইনশা আল্লাহ তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নূর প্রকাশ হতে থাকবে।

(৬৭) اَلْوَاحِدُ الْاَحَدُ (আল ওয়াহিদুল্ আহাদু) অর্থ তিনি এক অদ্বিতীয়, একক, যাঁর কোন অংশ বা অংশীদার নেই।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০০ (এক হাজার) বার اَلْوَاحِدُالْاَحَدُ পড়বে ইনশাআল্লাহ সৃষ্টি জীবের ভালবাসা পাবে এবং ভয়-ভীতি চলে যাবে।

যে ব্যক্তির ছেলে সন্তান হয় না সে এ নামটি লিখে নিজের কাছে রাখবে ইনশা আল্লাহ তার সৎ সন্তান জন্ম লাভ করবে।

(৬৮) اَلصَّمَدُ (আস্সামাদ) অর্থ মুখাপেক্ষিহীন, যে কারো সাহায্য প্রত্যাশী নয়, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নয় এবং সকলেই তার মুখাপেক্ষী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি সেহরীর সময় সেজদায় কপাল রেখে ১১৫ বা ১২৫ বার এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সাধুতা লাভ হবে।

আর যে ব্যক্তি অজুর সাথে এ নামটির যিকির চালু রাখবে সে ইনশা আল্লাহ সৃষ্টি জীব থেকে মুক্ত ও বেপরোয়া হয়ে যাবে।

(৬৯) اَلْقَادِرُ (আলক্বাদিরু) অর্থ ক্ষমতাবান, ক্ষমতা প্রয়োগে কারো মুখাপেক্ষী নয়, শক্তি ধর।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামাজ পড়ে ১০০ বার القادر পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার দুশমনদেরকে অপমানিত ও সম্মানহীন করবেন (যদি সে ব্যক্তি হকের উপর হয়)

যদি কোন ব্যক্তির কোন কঠিন কাজ বা কোন কাজে কঠিনতার সম্মুখীন হয়, তবে ৪১ বার يَاقَادِرُ পড়বে, ইনশা আল্লাহ ঐ কঠিনতা দূর হয়ে যাবে।

(৭০) اَلْمُقْتَدِرُ (আলমুক্বতাদিরু) অর্থঃ ক্ষমতাশীল, সার্বভৌম, যার বিধান চরম, সকলের উপর যার ক্ষমতা রয়েছে।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে বেশি বেশি اَلْمُقْتَدِرُ (আলমুক্বতাদিরু) এর যিকির করবে বা কমপক্ষে বিশ বার পড়বে ইনশা আল্লাহ তার সমস্ত কাজ সহজ ও ঠিক ভবে সামাধা হয়ে যাবে।

(৭১) اَلْمُقَدِّمُ (আলমুক্বাদ্দিমু) অর্থ উন্নতি দানকারী, যিনি নিকটে করেন এবং যাকে চান আগে বাড়ান।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধের সময় বেশি বেশি اَلْمُقَدِّمُ (আলমুক্বাদ্দিমু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ তা'আলা তাকে (সামনে অগ্রসর হওয়ার) ক্ষমতা দান করবেন, এবং দুশমনদের থেকে নিরাপদে রাখবেন,

আর যে ব্যক্তি সব সময় يَامُقَدِّمُ (ইয়া মুক্বাদ্দিমু) এর যিকির করবে, সে আল্লাহ তাআলার অনুগত ও বাধ্য হয়ে যাবে।

(৭২) اَلْمُؤَخِّرُ (আল মুয়াখখিরু) অর্থ যিনি দূরে রাখেন বা যাকে চান পিছে করেন, অবনতি দাতা।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি اَلْمُؤَخِّرُ (আলমুয়াখখিরু) এর যিকির করবে ইনশা আল্লাহ তার সাচ্চা ও খাঁটি তাওবা নসীবে হবে।

আর যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার এ নামটি পাবন্দীর সাথে ও গুরুত্ব সহকারে পড়বে ইনশা আল্লাহ সে আল্লাহ তা'আলার এত নৈকট্য লাভ করবে যে, আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত তার কোন আরামই হবে না।

(৭৩) اَلْاَوَّلُ (আল আউয়ালু) অর্থ প্রথম, অনাদি প্রধান, সবার চেয়ে প্রথমে।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তির ছেলে হয় না সে ৪০ দিন পর্যন্ত ৪০ বার দৈনিক اَلْاَوَّلُ পড়বে, ইনশা আল্লাহ খুব তাড়াতাড়ি সে শান্তির সাথে আপন বাড়িতে ফিরে আসবে।

(৭৪) اَلْاٰخِرُ (আল আখিরু) অর্থ সর্ব শেষ, অনন্ত।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০০ এক হাজার বার اَلْاٰخِرُ (আল আখীরু) পড়বে তার অন্তর থেকে গায়রুল্লাহ এর ভালবাসা দূর হয়ে যাবে এবং ইনশা আল্লাহ সারা জীবনের (পাপসমূহ তথা) ভুলত্রুটির বদলা হয়ে যাবে, এবং শুভ সমাপ্তি তথা ঈমানের উপর মৃত্যু বরণ করবে।

(৭৫) اَلظَّاهِرُ (আজ্জাহিরু) অর্থ যিনি প্রকাশ্য প্রকট গুণে ও নিদর্শনে প্রকাশ্য।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি ইশরাকের নামাযের পর ৫০০ বার اَلظَّاهِرُ (আজ্জাহিরু) এর যিকির করবে, আল্লাহ তা'আলা তার চোখে দৃষ্টি শক্তি ও অন্তরে নূর দান করবেন।

(৭৬) اَلْبَاطِنُ (আল বাত্বিনু) অর্থ যিনি গুপ্ত সত্ত্বা, অপ্রকাশ্য, অদৃশ্য।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক ৩৩ বার اَلْبَاطِنُ (আলবাত্বিনু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার উপর আভ্যন্তরীন তথা আধাত্মিক রহস্যাবলী প্রকাশ হতে থাকবে এবং তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার প্রেম ও ভালবাসার সৃষ্টি হবে।

যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায আদায় করে নিম্মের দোয়াটি পড়বে ইনশা আল্লাহ তার সকল প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ হয়ে যাবে। দোয়াটি এই ঃ

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ (হুয়াল আউয়ালু ওয়াল আখিরু ওয়াজ্জাহিরু ওয়াল বাত্বিনু ওয়া হুয়া আলাকুল্লি শাইইন ক্বাদীরুন)

অর্থ ঃ তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।

(৭৭) اَلْوَالِىْ (আলওয়ালী) অর্থ মুরববী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে اَلْوَالِىْ (আল ওয়ালী) যিকির করবে, সে ইনশা আল্লাহ আকস্মিক বালা মসিবত থেকে হেফাজতে থাকবে।

নতুন মৃৎপাত্রে এ নামটি লিখে তাতে পানি ভরে (ধুয়ে) ঐ পানি ঘরে ছিটিয়ে দেবে, এতে ইনশা আল্লাহ ঐ ঘর সকল প্রকার বালা মসিবত থেকে হেফাজত থাকবে।

কাউকে বশ করতে হলে ১১ বার এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ সে অনুগত হয়ে যাবে।

(৭৮) اَلْمُتَعَالِى (আল মুতাআলীয়্) অর্থ সর্বোপরি।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে اَلْمُتَعَالِى (আলমুতাআলীয়্) যিকির করবে, ইনশা আল্লাহ তার সকল প্রকার কঠিনতা দূর হয়ে যাবে।

যে মহিলা ঋতু অবস্থায় এ নামটি বেশি বেশি করে পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

(৭৯) اَلْبَرُّ (আল বাররু) অর্থ মুহসিন, অনুগ্রহকারী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি মদ পান, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপাচারে লিপ্ত থাকে, দৈনিক ৭ বার সে এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার মধ্যে থেকে ঐ গুনাহ সমূহের বাসনা চলে যাবে।

যে ব্যক্তি আপন সন্তান ভুমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ৭ বার এ নামটি পড়ে ফুঁক দেবে এবং আল্লহ তা'আলার সোপর্দ করবে, সে সন্তান সাবালক হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার বালা-মসিবত থেকে হেফাজতে থাকবে।

(৮০) اَلتَّوَّابُ (আত তাউওয়াবু) অর্থ তওবা গ্রহণকারী, অর্থাৎ যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহ করেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি চাশতের নামযের পর ৩৬০ বার এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ সে সাচ্চা ও খাঁটি তওবা করার তাওফিক লাভ করবে।

যে ব্যক্তি খুব বেশি বেশি এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার সকল কাজ সহজ হয়ে যাবে।

যদি এ নমাটি কোন জালিম এর উপর ১০ বার পড়ে ফুঁক দেয়, ইনশা আল্লাহ ঐ জালিম ও অত্যাচারী থেকে রেহাই পাবে।

(৮১) اَلْمُنْتَقِمُ (আলমুনাতাক্বিমু) অর্থ প্রতিশোধ গ্রহণকারী,

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি হকের উপর থাকা সত্ত্বেও দুশমন থেকে প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি না থাকে তবে ৩ জুমআ পর্যন্ত বেশি বেশি يَامُنْتَقِمُ ইয়া মুনতাক্বিমু পড়বে, ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্বয়ং তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নেবেন।

(৮২) اَلْعَفُوُّ (আল্ আফুউ) অর্থ বড় ক্ষমা শীল।

পযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে اَلْعَفُوُّ (আলআফুউ) পড়বে, ইনশা আল্লাহ, আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন।

(৮৩) اَلرَّؤُفُ (আররাউফু) অর্থ বড় দয়ালু।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি করে يَارَؤُفُ (ইয়া রাউফ) এর যিকির করবে ইনশা আল্লাহ সৃষ্টি জীব তার উপর মেহেরবান ও সদয় হয়ে যাবে।

আর যে ব্যক্তি ১০ বার দরূদ শরীফ এবং ১০ বার এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তার রাগ দূর হয়ে যাবে, আর অন্য রাগান্বিত ব্যক্তির উপর এ নামটি পড়ে ফুঁক দিলে তার রাগ দূর হয়ে যাবে।

(৮৪) مَالِكُ الْمُلْكِ (মালিকুল মুলকি) অর্থ রাজ্যাধিপতি, অর্থাৎ তার রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি يَامَالِكَ الْمُلْكِ (ইয়া মালিকুল মুলকি) সর্বদা পড়তে থাকবে এবং সে কারো মুখাপিক্ষী থাকবেনা।

(৮৫) ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (জুলজালালি অল ইকরামি) অর্থ মহিমা ও সম্মানের অধিকারী, সম্মান ও প্রতিপত্তি দানকারী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি বেশি বেশি يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (ইয়াজাল জালালী ওয়াল ইকরামি) পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইজ্জত সম্মান দান ও সৃষ্ট জীব থেকে বেপরওয়া করে দেবেন।

(৮৬) اَلْمُقْسِطُ (আল মুক্বছিত্ব) অর্থ অত্যাচার দমনকারী, উৎপীড়ক হতে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক এ নামটি পড়বে, সে ইনশা আল্লাহ শয়তানী কুমন্ত্রণা থেকে হেফাজতে থাকবে।

যদি কোন বৈধ ও বিশেষ উদ্দেশ্যে ৭০০ বার এ নামটি পড়ে, ইনশা আল্লাহ তার ঐ উদ্দেশ্য লাভ হবে।

(৮৭) اَلْجَامِعُ (আল জামিউ) অর্থ কেয়ামতে বন্দাদের একত্রকারী, অথবা সর্বগুণের অধিকারী।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু বান্ধব বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে, সে চাশতের সময় গোসল করে আকাশের দিকে মুখ করে ১০ বার يَاجَامِعُ (ইয়াজামিউ) পড়বে এবং একটি আঙ্গুল বন্ধ করবে, শেষে উভয় হাত মুখের উপর ফিরাবে, ইনশা আল্লাহ তারা খুব তাড়াতাড়ি একত্র হয়ে যাবে।

যদি কোন বস্তু হারিয়ে যায় তখন নিম্নের দোয়াটি পড়বে ইনশাআল্লাহ ঐ বস্তু মিলে যাবে।

اَللّٰهُمَّ يَاجَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّارَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ ضَالَّتِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়া জামিয়ান্নাসি লিয়াউমিল লারাইবাফীহি, ইজমা' দ্বাল্লাতী)

বৈধ ভালবাসা অর্জনের জন্যও এই দোয়া ফলদায়ক।

(৮৮) اَلْغَنِىُّ (আলগানিয়্যু) অর্থ বেনিয়াজ, ধনী, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নয়।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক ৭০ বার করে يَاغَنِىُّ (ইয়া গানিয়্যু) পড়ে ফুঁক দিবে ইনশা আল্লাহ ঐ রোগ বা বালা-মসিবত থেকে উদ্ধার হবে।

(৮৯) اَلْمُغْنِىُ (আলমুগনীয়ু) অর্থ ধন দান কারী, যিনি কাউকেও কারো মুখাপেক্ষী হতে বঁচিয়ে রাখেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি দৈনিক প্রথমে ও শেষে ১১ বার করে দুরূদ শরীফ পড়ে ১১১১ বার এ নামটি পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বাহ্যিক ও ভিতরগত উভয় দিক দিয়েই ধনাঢ্য বানাবেন, চাই ফজরের নামাযের পর এ আমল করা হউক, চাই ইশার নামাযের পর এ আমল করা হউক এর সাথে সূরায়ে মুযাম্মিলও তেলাওয়াত করবে।

(৯০) اَلْمَانِعُ (আলমানিউ) অর্থ বিপদে বাধাদানকারী।

ফযীলত ঃ যদি স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য ও ঝগড়া হয়ে তিক্ততা ও বিষন্নতার সৃষ্টি হয়, তখন বিছানায় শোয়ার সময় ২০ (বিশ) বার এ নমটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ তাদের ঝগড়া ও তিক্ততা দূর হয়ে যাবে এবং পরস্পর মিল ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে।

যে ব্যক্তি খুব বেশি বেশি এ নামটি যিকির করবে, ইনশা আল্লাহ সে সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে হেফাজতে থাকবে,

যদি কোন বিশেষ ও বৈধ উদ্দেশ্যে পড়ে, তবে ইনশা আল্লাহ উহা লাভ হবে।

(৯১) اَلنَّافِعُ (আন নাফিউ) অর্থ যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি নৌকা বা অন্য কোন যান বাহনে উঠার পর يَانَافِعُ (ইয়ানাফিউ) বেশি বেশি পড়তে থাকবে, ইনশা আল্লাহ সকল প্রকার বালা মসিবত থেকে হেফাজতে থাকবে।

যদি কোন ব্যক্তি যে কোন কাজ শুরু করতে ৪১ বার يَانَافِعُ (ইয়া নাফি) পড়ে নেয়, ইনশা আল্লাহ তার কাজ আপন ইচ্ছানুযায়ী পূর্ণ হবে।

যে ব্যক্তি স্ত্রীর সাথে সহবাস করার সময় এ নামটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ সে সৎ সন্তান লাভ করবে।

(৯৩) اَلنُّوْرُ (আন নূরু) অর্থ আলোক, প্রভা, প্রভাকর, নূর।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি জুমআর রাতে ৭ বার সূরায়ে নূর এবং এক হাজার একবার এ নামটি পড়বে ইনশা আল্লাহ তার অন্তর আল্লাহর নূরে নূরান্বিত হয়ে যাবে।

(৯৪) اَلْهَادِىُ (আল হাদীয়ু) অর্থ পথ প্রদর্শক, (যারা তাঁর দিকে যেতে চায় তাদেরকে)।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি হাত উঠিয়ে আকাশের দিকে চেহারা ফিরিয়ে বেশি বেশি يَاهَادِىُ (ইয়াহাদীয়্যু) পড়বে এবং পরে চেহারায় হাত ফিরিয়ে নিবে, ইনশা আল্লাহ সে পূর্ণ হেদায়েত লাভ করবে এবং সে আধ্যাত্মিক গুরুদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

(৯৫) اَلْبَدِيْعُ (আলবাদীউ) অর্থ অদ্বিতীয়, অনুপমা অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন।

ফযীলত ঃ যে ব্যাক্তি কোন পেরেশানী বা মসিবত বা অন্য যে কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখিন হয়ে ১০০০ (এক হাজার বার) يَابَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ (ইয়া বাদীয়ূছ্ছামা ওয়াতিওয়াল আরদ্বি) পড়বে ইনশা আল্লাহ সে তা থেকে নাজাত পাবে।

আর যে ব্যক্তি এ নামটি অযূর সাথে পড়ে শুইয়ে যায়, ইনশা আল্লাহ সে যে কাজের উদ্দেশ্যে ও ইচ্ছা করেছে তা স্বপ্নে দেখবে।

আর যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর يَابَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِيَا بَدِيْعُ (ইয়াবাদীয়াল আজায়িবি বিল খাইরি ইয়া বাদী উ) ১২০০ বার ১২ দিন ক্রমান্বয়ে পড়বে, যে কাজ ও উদ্দেশ্যে পড়বে ইনশা আল্লাহ এ আমল শেষ হওয়ার তারিখের পূর্বেই তার উদ্দেশ্য লাভ হয়ে যাবে। (ইহা পরীক্ষিত)

(৯৬) اَلْبَاقِى (আলবাক্বী) অর্থ যিনি সর্বদা থাকবেন, সৃষ্টি ধ্বংসের পরও যিনি থাকবেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি জুমআর রাতে এ নামটি ১০০০ বার পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সকল প্রকার ক্ষতি থেকে হেফাজত রাখবেন এবং তার সকল সৎ কজ কবূল হবে।

(৯৭) اَلْوَارِثُ (আলওয়ারিছু) অর্থ উত্তরাধিকারী, সবাই শেষ হবে আর তিনি সবারই ইত্তরাধিকারী হবেন।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের সময় ১০০ বার يَاوَارِثُ (ইয়া ওয়ারিছ) পড়বে, ইনশা আল্লাহ সে সকল প্রকার পেরেশানী ও বালা-মসিবত থেকে হেফাজতে থাকবে এবং তার শুভ সমাপ্তি তথা ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে।

আর যে ব্যক্তি মাগরীব ও ইশার মধ্যখানে এ নামটি ১০০০ (এক হাজার) বার পড়বে, ইনশাআল্লাহ সে সর্ব প্রকার হয়রানী ও পেরেশানী থেকে হেফাজতে থাকবে।

(৯৮) اَلرَّشِيْدُ (আররাশীদু) অর্থ কারো পরামর্শ বা বলা ব্যতীত যাঁর কাজ উত্তম ও ভাল হয়, সৎপথ-প্রদর্শক।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তির আপন কোন কাজ বা উদ্দেশ্যের তাদবীর বুঝে না আসে, সে মাগরীব ও ইশার মধ্য খানে ১০০০ (এক হাজার) বার يَارَشِيْدُ (ইয়ারাশীদু) পড়বে, ইনশা আল্লাহ হয়ত স্বপ্নে তাদবীর দেখবে, বা অন্তরে ঐ কাজের তাদবীর উদয় হবে।

যদি দৈনিক এ নামটির যিকির করে তবে ইনশা আল্লাহ সকল প্রকার কঠিনতা দূর হয় যাবে এবং কাজ কর্ম ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উন্নতি লাভ করবে।

(৯৯) اَلصَّبُوْرُ (আসসাবূরু) অর্থ বড় ধৈর্যশীল।

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে ১০০ (একশত) বার এ নামটি পড়বে, সে ইনশাআল্লাহ ঐ দিনের সকল বালা-মসিবত থেকে হেফাজতে থাকবে, দুশমন ও হিংসুকদের মুখ বন্ধ থাকবে।

যে ব্যক্তি যে কোন প্রকার বিপদেই পতিত হউক, সে এক হাজার বিশ বার এ নমটি পড়বে, ইনশা আল্লাহ সে বিপদ রেহাই পাবে এবং অন্তরে প্রশান্তি লাভ করবে।

শিরক ও বিদ'আত-এর আলোচনা

আল্লাহ তা'আলা আমাদের, ভূ-মন্ডল ও নভোমন্ডল সবকিছুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। তিনি সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু আবিস্কার করতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি-কোন বিজ্ঞানী মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচার জন্য কোন ট্যাবলেট আবিস্কার করেছেন; বরং এটা ১০০% গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারা যায়, শুধু বিজ্ঞানী কেন, সারা পৃথিবীর মানুষকে নিয়েও যদি ট্যাবলেট তৈয়ার করার পরিকল্পনা নেয়া হয়, তা হলেও কেউ মৃত্যু নিয়ন্ত্রক হিসেবে কোন ঔষধ তৈয়ার করতে পারবে না।

যেহেতু সবকিছুর মালিক ও নিয়ন্ত্রক একমাত্র মহান আল্লাহ, তাই যাবতীয় প্রয়োজন তাঁর কাছেই চাইতে হবে। অন্য কারো কাছে-তিনি ওলী হোন বা গাউছ কুতুব হোন সাহায্য প্রার্থনা করা জায়িয নয়।

আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, বহুলোক মাজারে গিয়ে পীরের কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে বলে, হে বাবা! আমার কোন সন্তান নেই। আমাকে একটি সন্তান

দান কর। হে বাবা! আমার ব্যবসায় উন্নতি দাও। এভাবে অনেক কিছু চেয়ে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)

এখন প্রশ্ন হল, মাজার বা দরবেশ কি কোন খোদা? যদি তিনি খোদা না হন, তাহলে তার নিকট চাওয়া-পাওয়া কি আছে? এটা জাহিলী কর্ম ছাড়া আর কিছু নয়।

বরং মহান আল্লাহ যাবতীয় সকল হাজত সরাসরি তাঁর নিকটই চাইতে বলেছেন। তিনি কোন মাজার বা পীরের দরবারে চাওয়া-পাওয়ার কোন এজেন্সী দেননি। কিংবা চাওয়া-পাওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে স্বীয় স্থলাভিষিক্তও বানান নি। মূলতঃ এ মাজার বিশ্বাস হিন্দুয়ানী আকীদা, যা মুসলমানদের ঈমানের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিধ্বংসী।

অনেকে ওলীদের কবরে বা মাজারে সিজদাহ করে। এটা ঈমানধ্বংসী শিরক। কবর বা মাজার সিজদাহর জায়গা নয়। সিজদাহ একমাত্র মহান আল্লাহর প্রাপ্য অধিকার।

আবার অনেকে কবরে ও মাজারে মোমবাতি জ্বালায়, পর্দা টাঙ্গায়, টাকা-পয়সা তুলে শিন্নী করে। এগুলো বিদ'আত-কুসংস্কার। এসব শিরক ও বিদ'আত থেকে মুসলমানদের বাঁচতে হবে।

শিরক ও বিদ'আতের পরিচয়

শিরক ঃ 'শিরক' শব্দের অর্থ হচ্ছে-অংশীদার বানানো। ইসলামী পরিভাষায় শিরক বলা হয়, কাউকে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর সমগুণ সম্পন্ন মনে করা। যেমন, কোন ব্যক্তি যদি মৃত ওলীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলে-পীর বাবা! আমাকে একটি সন্তান দান করুন, আমাকে সকল বিপদ-আপদ হতে মুক্তি দিন, তাহলে সে মহান আল্লাহর সহিত পীর বাবাকে সমতুল্য সাব্যস্ত করে শিরক গুনাহ করল।

কেননা, কোন হাজত পেশ করতে হয় একমাত্র মহান আল্লাহর নিকট। সে যখন আল্লাহর কাছে না চেয়ে পীর বাবার কাছে চাইল, এতে করে আল্লাহ ও পীর বাবাকে সমান অধিকার দিল। যেন পীর বাবা ও আল্লাহ দুই খোদা (নাউযুবিল্লাহ)। এর দরুণ সে শিরক গুনাহ করেছে।

যদি উক্ত ব্যক্তি ওলীর দরবারে সে রকমভাবে সরাসরি না চেয়ে এভাবে মনের ভাব প্রকাশ করত যে, হে আল্লাহ! উনি আপনার বিশিষ্ট ওলী, উনার ওসীলা ধরে দোয়া করছি, আমাকে একটি সুসন্তান দান করুন, তাহলে তার

কোন গুনাহ হবে না। অথচ সরাসরি পীর বাবা বা ওলীর কাছে চেয়ে সে শিরক গুনাহ করল।

কাল কিয়ামতের দিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরক করণেওয়ালা উম্মত ব্যতীত সকল উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য শাফা'আত করবেন। শিরকের গুনাহ মাফ করা হবে না বলে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

কুফর, শিরক ও বিদ'আত-এ সকল অপকর্ম জাহিলিয়াতের প্রথা ও শয়তানের কাজ। এ সমস্ত কাজ ঈমান ধ্বংসের কারণ। সকলের অবগতির জন্য নিম্নে যাবতীয় প্রকারের ধ্বংসাত্মক শিরক গুনাহ সমূহের বিবরণ পেশ করা হল।

শিরকের কাজ সমূহ ঃ

নিম্নলিখিত কাজ গুলো শিরক। শিরকের গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না বলে পবিত্র কুরআনে রয়েছে। তাই এসব হতে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য-

(১) কোন বুযুর্গ বা পীর সম্বন্ধে এ রকম আকীদাহ রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের সব অবস্থা জানেন।

(২) ফালনামাধারী বা গণক-ঠাকুরদের নিকট অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করা বা তাদের কথা বিশ্বাস করা।

(৩) কোন জীবিত বা মৃত পীর-বুযুর্গকে দুরদেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি তা শুনতে পাচ্ছেন।

(৪) কোন পীর-বুযুর্গ, জ্বিন-পরী, দেও-দানব বা ব্রাহ্মণ-পুরোহিতকে লাভ-লোকসানের মালিক মনে করা।

(৫) কোন পীর-বুযুর্গের কবরের নিকট আওলাদ বা অন্য কোন উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করা।

(৬) পীর, কবর বা মাজারকে সিজদাহ করা।

(৭) কোন পীর-বুযুর্গের নামে শিন্নী-সদকা দেয়া বা মান্নত করা।

(৮) কোন পীর-বুযুর্গের দরগাহ-মাজার বা কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করা।

(৯) আল্লাহর হুকুম ছেড়ে বা আল্লাহর নাফরমানী করে অন্য কারো আদেশ বা সামাজিক প্রথা পালন করা।

(১০) কারো সামনে মাথা নীচু করে কদমবুচি করা বা কারো সম্মানার্থে হাত বেঁধে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা।

(১১) মুহাররমের সময় তাযিয়া বানানো।

(১২) কোন বুযুর্গের নাম নিয়ে জানোয়ার যাবেহ করা।

(১৩) পীরের বাড়ী কিংবা কোন বুযুর্গের দরগাহ বা মাজারকে কা'বা শরীফের মত আদব বা তাযীম করা।

(১৪) কোন পীর-বুযুর্গ বা অন্য কারো নামে ছেলের নাক-কান ছিদ্র করা, আংটি পরান, চুল রাখা, টিকি রাখা ইত্যাদি।

(১৫) আলী বখশ, হুসাইন বখশ ইত্যাদি নাম রাখা।

(১৬) কোন জিনিসের বা ব্যারাম-পীড়ার ছুত লাগে কিংবা রোগ ইত্যাদির স্বয়ং সংক্রমণ হয় বলে বিশ্বাস করা।

(১৭) মুহাররম মাসে পান না খাওয়া, ঐ মাসকে উপলক্ষ করে নিরামিষ খাওয়া, খিচুড়ী খাওয়া ইত্যাদি।

(১৮) নক্ষত্রের তাছীর মানা বা তিথি পালন করা।

(১৯) ভাল-মন্দ বার বা তারিখ জিজ্ঞাসা করা বা পালন করা। যেমন-অনেকে জিজ্ঞাসা করে-এই চাঁদে বিবাহ শুভ কিনা? কোনদিন নতুন ঘরে যেতে হয়? রবিবারে বাঁশ কাটা যায় কিনা? ইত্যাদি।

(২০) গণকের নিকট বা যার ঘাড়ে জ্বিন সওয়ার হয়েছে, তার নিকট গিয়ে বা হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট জিজ্ঞাসা করা বা বিশ্বাস করা।

(২১) কোন জিনিস হতে কুলক্ষণ ধরা বা কুযাত্রা মনে করা। যেমন-যাত্রা মুখে কেউ হাঁচি দিলে বা হোঁচট খেলে কিংবা যদি কাক ডাক দেয়, অনেকে সেটাকে কুযাত্রা মনে করে থাকে।

(২২) কোন দিকে যাত্রা করার সময় ঘরের দুয়ারে 'মা খাকি' বলে সালাম করে বিদায় গ্রহণ করা।

মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়াবলী

প্রত্যেক মুমিন-মুসলমানের জন্য আল্লাহ তা'আলা, তাঁর সকল ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, নবী-রাসূল, পরকাল, তাক্বদীর এবং তাক্বদীরের ভাল-মন্দের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ফরজ। এটাই ঈমানে মুফাস্সালের সার কথা।

আল্লাহ তা'আলা সম্মর্কে 'আকীদা বিশ্বাসের অন্তর্ভূক্ত বিষয় সমূহ হচ্ছে-

(ক) আল্লাহর রুবুবিয়্যাত।

আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়্যাতকে বিশ্বাস করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে-তিনিই হচ্ছেন রব(প্রতিপালক), 'খালিক (সৃষ্টিকর্তা), বাদশাহ, সকল কাজেরই মহানিয়ন্ত্রক।

(খ) আল্লাহর উলুহিয়্যাত।

আল্লাহ তা'আলার উলুহিয়্যাতকে বিশ্বাস করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে- তিনিই হচ্ছেন সত্য ইলাহ। তিনি ব্যতীত সব মা'বুদই বাতিল ও অসত্য।

(গ) আল্লাহর নাম ও সিফাত।

আল্লাহ তা'আলার সব পবিত্র নাম ও সিফাত বিশ্বাস করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর বহু পবিত্র নাম ও উন্নত সিফাতে কামেলা বা পরিপূর্ণ গুণাবলী রয়েছে-যার বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান।

(ঘ) আল্লাহর ওয়াহ্দানিয়্যাত।

বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ 'তা'আলার ওয়াহ্দানিয়্যাত বা একত্ববাদকে। এর অর্থ হচ্ছে-তাঁর রুবুবিয়্যাত, উলহিয়্যাত এবং যত পবিত্র নাম ও সিফাত রয়েছে, তাতে কোন শরীক বা অংশীদার নেই।

(ঙ) আল্লাহর জ্ঞান, সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা।

বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ পাকের জ্ঞান, সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা এবং সেই গুণাবলীকে-যা আয়াতুল কুরসী সহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে রয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে মহান আল্লাহ বলেন-

"আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করে আছেন। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি নিদ্রাও যান না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে। সবই তাঁর মালিকানাধীন। এমন কে আছে যে, তাঁর দরবারে তাঁরই অনুমতি ব্যতীত সুপারিশ করতে পারে? সামনে-পিছনে যা কিছু আছে, সবই তিনি জানেন। তাঁর জানা বিষয়সমূহের কোন জিনিসই তাদের জ্ঞানসীমার আয়ত্বাধীন হতে পারে না। অবশ্য কোন বিষয়ের জ্ঞান যদি তিনি নিজেই কাউকে জানাতে চান (তবে তা অন্য কথা)। তাঁর সিংহাসন সমগ্র আকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে আছে। আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত করে দিতে পারে না। বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন এক মহান শ্রেষ্ঠতম সত্তা।" (সূরাহ বাকারা, আয়াত ঃ ২৫৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-"তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তিনি জানেন। তিনিই রাহমান ও রাহীম। তিনিই আল্লাহ-যিনিছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বাদশাহ। অতীব মহান ও পবিত্র। শান্তির ধারক। নিরাপত্তার আধার। রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজয়ী, মহাশক্তিধর এবং নিজ বড়ত্ব গ্রহণকারী। লোকেরা যেসব শিরক করছে, তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ- যিনি সৃষ্টিকর্তা, পরিকল্পনাকারী,

আকার-আকৃতি রচনাকারী। তাঁর অনেক সুন্দর-সুন্দর নাম রয়েছে। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সব কিছুই তাঁর প্রশংসা করে। তিনি অতীব পরাক্রমশালী ও মহাপ্রজ্ঞাময়।" (সূরা হাশর, আয়াত ঃ ২২-২৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-"তিনি যা-ই চান, সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা-সন্তান দান করেন, যাকে চান পুত্র-সন্তান দান করেন। আবার যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমের সন্তানই দান করেন। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছুই জানেন এবং সব বিষয়েই ক্ষমতাবান।"

(সূরা শুরা, আয়াত ঃ ৪৯-৫০)

তিনি আরো ইরশাদ করেন- "বিশ্বলোকের কোন জিনিসই আল্লাহর অনুরূপ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন ও দেখেন। আকাশ মণ্ডল ও যমীনের সকল ধনভান্ডারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। যাকে তিনি চান প্রচুর রিযিক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।"

(সূরা শুরা, আয়াত ঃ১১-১২)

(চ) আল্লাহ রিযিকদাতা।

বিশ্বাস করতে হবে যে, রিযিক দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন-"যমীনে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, যার রিযিকের ব্যবস্থা আল্লাহর উপর ন্যস্ত নয় এবং যার স্থায়ী- অস্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে তিনি অবহিত নন। এসব কিছুই এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।"

(সুরা হুদ, আয়াত ঃ ৬)

(ছ) আল্লাহ আলিমুল গায়িব।

বিশ্বাস করতে হবে যে, মানুষ ও বিশ্বভূবনের সকল প্রকাশ্য বিষয় আল্লাহ পাক যেমন জ্ঞাত, এ সকল কিছুর গুপ্ত ও অপ্রকাশ্য বিষয়সমূহও তিনি সম্যকভাবে জ্ঞাত। মহান আল্লাহ বলেন-"গাইবের সব চাবিকাঠি আল্লাহরই কাছে রয়েছে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না। স্থল ও সমুদ্র ভাগে যা কিছু আছে, তার সবই তিনি জানেন। বৃক্ষচ্যুত একটি পাতাও এমন নেই-যার সম্পর্কে আল্লাহ জানেন না। যমীনের অন্ধকারাচ্ছন্ন পর্দার অন্তরালের একটি দানাও এমন নেই, যে সম্পর্কে তিনি জানেন না। আর্দ্র ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিস এক সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।" সূরা আন'আম, আয়াতঃ ৫৯)

মহান আল্লাহ আরো বলেন-"কিয়ামতের সময়ের জ্ঞান আল্লাহরই কাছে রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন-মায়ের গর্ভে কি লালিত হচ্ছে। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কি কামাই করবে। না কেউ জানে, তার মৃত্যু হবে কোন যমীনে। আল্লাহই সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়েই তিনি ওয়াকিফহাল।" (সূরাহ লুকমান, আয়াত ঃ ৩৪)

(জ) কুরআন আল্লাহর কালাম।

বিশ্বাস করতে হবে যে, কুরআনে কারীম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালাম। এর মাধ্যমে তিনি হক কথা বলেছেন। আল্লাহ পাক জিবরাঈল (আঃ) এর কাছে তা অর্পন করেছেন, এরপর জিবরাঈল (আঃ) সেই অর্পিত কথাগুলো নাযিল করেছেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট।

মহান আল্লাহ বলেন-"হে মুহাম্মদ! এদেরকে বলুন-এ কুরআনকে 'রুহুল কুদুস' পবিত্র আত্মা অর্থাৎ জিবরাঈল) ঠিক ঠিক ভাবে আপনার রবের কাছ থেকে ক্রমাগতভাবে নাযিল করেছেন।" (সূরা নাহল, আয়াতঃ ১০২)

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন-"এটা (কুরআন) আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বাণী। এটা নিয়ে আমানতদার 'রুহ' জিবরাঈল আপনার দিলে অবতরণ করেছেন, যেন আপনি সাবধানকারীগণের (নবী) অন্তর্ভূক্ত হতে পারেন।" (সূরা শূ'আরা, আয়াত ঃ ১৯২-১৯৫)

(ঝ) আল্লাহ মহিয়ান ও গরিয়ান।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাত ও সিফাত (সত্তা ও গুণাবলী) দ্বারা সমগ্র সৃষ্টির উপরে মহিয়ান ও গরিয়ান।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হচ্ছে, "বস্তুতঃ তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠতম সত্তা।" (সূরা বাক্বারা, আয়াত ঃ ২৫৫)

আল্লাহ পাক আরো বলেন-"তিনি তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। তিনি জ্ঞানী এবং সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।" (সূরা আন'আম, আয়াত ঃ ১৮)

(ঞ) সব কিছুই আল্লাহর সৃষ্টি।

বিশ্বাস করতে হবে যে, এ নিখিল বিশ্ব, ভূমন্ডল-নভোমন্ডল সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। আল্লাহ পাক বলেন- "তিনি আসমান ও যমীন ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সিংহাসনে আসীন হয়েছেন এবং বিশ্বলোকের পরিচালনা করছেন।" (সূরা ইউনুস, আয়াতঃ ৩) কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা

আল্লাহ তা'আলার সিংহাসনে আসীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে-তাঁর মহান সত্তা স্বীয় আজমত ও জালালতের (বিরাটত্ব ও বড়ত্বের) জন্য যেমনটি শোভনীয়, ঠিক তেমনিভাবে আরশের উপরে সমাসীন হওয়া। এর অবস্থা ও রূপরেখা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। মর্যাদাগতভাবে সমুন্নত হওয়া

আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা সদা তাঁর সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। আরশ হতে তিনি সৃষ্টির সব অবস্থা সম্পর্কেই জ্ঞাত আছেন। তিনি

তাদের কথা শুনেন। তাদের কার্যকলাপ দেখতে পান। তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সকলকে রিযিক দান করেন। নিঃস্ব ও অভাবী ব্যক্তির অভাব পূরণ করেন। যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নেন। যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অপমানিত করেন। তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ নিহিত। সব কিছুর উপরই তিনি ক্ষমতাবান।

যার এত বড় শান, তিনি প্রকৃত অর্থেই তাঁর সৃষ্টির সাথে রয়েছেন। যদিও তিনি প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির উর্ধালোকে আরশে সমাসীন আছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"বিশ্বের কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন এবং দেখেন।" (সূরা শুরা, আয়াতঃ১১)

(ট) আল্লাহ দুনিয়ার আকাশে আসেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে খবর বা তথ্য জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। তারপর দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন, "আমাকে যে ডাকে, তার ডাকে আমি সাড়া দেই। আমার কাছে যে চায়, তাকে আমি দান করি। যে আমার কাছে ক্ষমা চায়, তাকে ক্ষমা করে দেই। (বুখারী, ৯ঃ২৫/মুসলিম, ১ঃ৫২১)

(ঠ) আল্লাহ বিচার-ফায়সালা করবেন।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত দিন অর্থাৎ শেষ বিচারের দিন বান্দাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করার জন্য আত্মপ্রকাশ করবেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "পৃথিবীকে যখন চুর্ণ-বিচুর্ণ করে বালুকাময় বানিয়ে দেয়া হবে এবং আপনার রব আত্মপ্রকাশ করবেন, আর ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় থাকবে, জাহান্নামকে সেদিন সবার সামনে উপস্থিত করা হবে, সেদিন মানুষ সম্বিত ফিরে পাবে। কিন্তু তখন তার বোধশক্তি ফিরে পাওয়ায় কি লাভ হবে?" (সূরা ফাজর, আয়াত ২১-২৩)

(ড) আল্লাহ যা ইচ্ছা, করতে পারেন।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ সব কিছু করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখেন। মহান আল্লাহ বলেন-"আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, তাই সম্পন্ন করেন।"

(সূরা বুরুজ, আয়াতঃ ১৬)

আল্লাহর ইচ্ছা সম্পর্কে আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা দু'রকমের। (১) কাউনিয়্যাহ। (২) শারইয়্যাহ।

১। কাউনিয়্যাহঃ এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হয়। তবে জিনিসটি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারটি জরুরী নয়। আর এটা দ্বারাই আল্লাহর 'মাশিয়াত' বা ইচ্ছা বুঝানো হয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "আল্লাহ চাইলে তারা পরস্পরে লড়াই করতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ যা চান, তা-ই করেন।" (সূরা বাক্বারা আয়াতঃ ২৫৩)

আরো ইরশাদ হচ্ছে, "যদি আল্লাহই তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান, (তাহলে কোন নসীহতই কাজে আসবেনা।) তিনিই হচ্ছেন তোমাদের রব।"

(সূরা হুদ, আয়াতঃ ৩৪)

২। শরইয়্যাহঃ এ ধরনের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য নয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত জিনিস বা বিষয়টি তাঁর পছন্দনীয় হতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-"আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান।" (সূরা নিসা, আয়াতঃ ২৭)

আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার কাউনী ও শরয়ী উভয় ইচ্ছাই তাঁর হিকমতের অধীন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কাউনী ইচ্ছানুযায়ী যা ফয়সালা করেন, অথবা শরয়ী ইচ্ছানুযায়ী বান্দা (মাখলুক) যে ইবাদত করে, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর হিকমত নিহিত রয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর হিকমতের কিছু আমরা বুঝতে সক্ষম হই বা না হই অথবা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি এ ক্ষেত্রে অক্ষম হলেও কিছু যায় আসে না। (সর্বাবস্থাতেই তিনি সবচেয়ে বড় হাকিম) মহান আল্লাহ বলেন-"আল্লাহ কি সবচেয়ে বড় হাকীম নন?"

(সূরা তীন, আয়াত ঃ ৮)

আল্লাহ পাক আরো বলেন- "যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের কাছে আল্লাহর চেয়ে উত্তম হুকুমের অধিকারী আর কে হতে পারে?"

(সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৫০)

(ঢ) আল্লাহর ভালবাসা।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওলীগণকে ভালবাসেন। তারাও আল্লাহকে ভালবাসেন।

আল্লাহ পাক বলেন-"(হে নবী!) লোকদের বলে দিন, তোমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ৩১)

আল্লাহ পাক আরো বলেন-"(তোমাদের কেউ যদি নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যায়, তবে যাক না) আল্লাহ আরো এমন জাতির উত্থান ঘটাবেন-যাদেরকে আল্লাহ

ভালবাসবেন আর তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ঃ ৫৪)

আল্লাহ তা'আলা কাদেরকে ভালবাসেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক আরো বলেন-"আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদেরকে ভালবাসেন।"

(সূরা আল ইমরান, আয়াত ঃ ১৪৬)

তিনি আরো বলেন-"তোমরা ইনসাফ করো। আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।" (সূরা হুজুরাত, আয়াতঃ ৯)

তিনি আরো ইরশাদ করেন- "তোমরা ইহসান করো। আল্লাহ মুহসিন বান্দাগণকে ভালবাসেন।" (সূরা বাক্বারা, আয়াতঃ ১৯৫)

আরো বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা সেসব কাজ ও কথাকে পছন্দ করেন, যেগুলোর নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। আর যেগুলো অপছন্দ করেন, সেসব তিনি নিষেধ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন-"তোমরা যদি কুফরী করো, তাহলে (মনে রেখো-) আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। আর তোমরা শোকর করলে, তিনি তোমাদের জন্য তা পছন্দ করে।"

(সূরা যুমার, আয়াত ঃ ৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন- "তাদের জিহাদে বের হয়ে যাবার যদি ইচ্ছা সত্যিই থাকতো, তবে তারা সে জন্য কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতো।) কিন্তু তাদের সংকল্পবদ্ধ হওয়াটাই আল্লাহর পছন্দ ছিল না। তাই আল্লাহ তাদেরকে **অবসাদগ্রস্ত** করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, বসে থাকো বসে থাকা অন্যান্য লোকদের সাথে।" (সূরা তাওবা, আয়াতঃ ৪৬)

(ণ) আল্লাহ সন্তুষ্টি।

বিশ্বাস করতে হবে যে, যারা ঈমানদার এবং নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ পাক বলেন-"তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এ সন্তুষ্টি তার জন্যই-যে ব্যক্তি স্বীয় রবকে ভয় করে।" (সূরা বাইয়িনাহ, আয়াত ঃ ৮)

(ত) বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা কাফির-বেদ্বীন ও অন্যান্য এমন লোকদের উপরই গজব নাযিল করেন, যারা গজবের উপযুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন-"যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, দোষ-ত্রুটি ও খারাপের আবর্তে তারা নিজেরাই নিমজ্জিত। তাদের উপর আল্লাহর গজব পড়েছে।" (সূরা ফাতহ, আয়াত ঃ ৬)

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন-"কিন্তু যারা মনের সন্তোষ সহকারে কুফরী গ্রহণ করে নিয়েছে, তাদের উপরই আল্লাহর গজব। এসব লোকদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।" (সূরা নাহল, আয়াত ঃ ১০৬)

(থ) আল্লাহর অঙ্গ।

বিশ্বাস করতে হবে যে, মহান আল্লাহর কুদরতী হাত, পা, চেহারা, চক্ষু রয়েছে। তবে সেগুলো কোন মাখলুকের মত নয় এবং সেগুলো সম্পর্কে কোন রকম কল্পনা বা ধারণা করা যেতে পারে না; বরং তাঁর মহান শানের মতই এগুলো অতুলনীয়। আমাদের বুঝ শক্তির বাহিরে। তার সম্যক উপলব্ধিতে আমরা অক্ষম।

(দ) আল্লাহর দিদার।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহর মু'মিন বান্দাগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে পাবেন এবং আল্লাহ পাকের এ মহান দিদার হবে বেহেশতের বড় নিয়ামত। মহান আল্লাহ বলেন-"সেদিন (কিয়ামতের দিন) কিছু সংখ্যক চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হবে। নিজেদের রবের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখবে।"

(সূরা ক্বিয়ামাহ, আয়াত ঃ ২২-২৩)

(ধ) মহান আল্লাহ অতুলনীয়।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার সিফাতে কামালের (পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর) কোন দৃষ্টান্ত নেই। আল্লাহপাকের শানের জন্য যা লায়েক, এগুলো তেমনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "কোন কিছুই তাঁর মত নয়। তিনি সব কিছুই শুনেন এবং দেখেন।" (সূরা শূরা, আয়াত ঃ ১১)

(না) আল্লাহর তন্দ্রা-নিদ্রা নেই।

বিশ্বাস করতে হবে যে, নিদ্রা-তন্দ্রার মত জৈবিক দুর্বলতা থেকে মহান আল্লাহ সর্ম্পূণ মুক্ত ও পবিত্র। আল্লাহ পাক বলেন-"না তন্দ্রা, না নিদ্রা তাঁকে (আল্লাহকে) স্পর্শ করতে পারে।" (সূরা বাক্বারা, আয়াতঃ ২৫৫)

(প) আল্লাহ পূর্ণ ন্যায়বিচারক।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর "কামালে আদল" (পরিপূর্ণ ইনসাফ)- এর গুণে কারো প্রতি যুলুম করেন না। তিনি তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আয়ত্বের গুণে গুণান্বিত হওয়ার কারণে বান্দাদের কর্মকান্ডের ব্যাপারে গাফেল ও উদাসীন নন। তিনি মহান ইনসাফগার।

(ফ) আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতা অসীম।

বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও ক্ষমতা অসীম। এ কারণে আকাশ ও যমীনের কোন জিনিসই তাকে অক্ষম-অপারগ বানাতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন-"আল্লাহ যখন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেনঃ 'হয়ে যাও'। অমনি তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন, আয়াত ঃ ১১)

আরো বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে আল্লাহ পাক কখনো ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-"আমি পৃথিবী ও আকাশমন্ডল এবং এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সব জিনিসকে ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি। এতে কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি।"

(সূরা ক্বাফ, আয়াতঃ ৩৮)

এখানে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমানের অন্তর্ভূক্ত সিফাত ও গুণাবলীর কথা পেশ করা হয়েছে। সেগুলোর ব্যাপারে নির্ভর করা হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহর উপর।

বস্তুতঃ কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে, তার সবই হক ও সত্য। এসব বিষয়ের উপর সকল মুসলমানের দৃঢ় ঈমান ও অটল বিশ্বাস রাখা কর্তব্য।

২য় অধ্যায়

গুনাহ্ সম্পর্কিত আলোচনা

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

(১) গুনাহ্ করার ফলে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও আখেরাতের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয়ে যায়। (২) গুনাহ্ করার ফলে অন্তরে একটি দাগ পড়ে যায়, যা তওবা করার দ্বারা মুছে যায়। অন্যথায় বাড়তে থাকে। (তখন উক্ত অন্তর নির্মল আয়নার মত অকার্যকর হয়ে যায় (৩) গুনাহ্ করার কারণে আল্লাহর গযব নাযিল হয় (৪) গুনাহ্ করার দ্বরা রিযিক কমে যায় (৫) গুনাহ্ করার দ্বারা অনেক সময় নেক আমলের উপকারিতা বরবাদ ও বিনষ্ট হয়ে যায় (৬) গুনাহ্ করার কারণে অন্তরের দৃঢতা ও দ্বীনের মজূতী চলে যায় (৭) নির্লজ্জ কাজকর্ম দ্বারা প্লেগ এবং এমন সব নতুন নতুন রোগ-বালাতে আক্রান্ত করা হয়, যা পূর্বেকার লোকদের মধ্যে ছিল না। (৮) যাকাত না দেওয়া ফলে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, বা বৃষ্টি কমে যায় (৯) নাহক বিচার ও ওয়াদা ভঙ্গ করার কারণে শত্রু লেলিয়ে/চাপিয়ে দেওয়া হয়। (১০) মাপে কম দেওয়ার কারণে দুর্ভিক্ষ-দারিদ্রতা ও শাসকদের অত্যাচারে আক্রান্ত করা হয়। (১১) খেয়ানত করার ফলে অন্তরে শত্রুদের প্রতি ভয় সৃষ্টি করা হয় (১২) দুনিয়ার মুহাব্বাত ও মৃত্যুর অপ্রস্তুতি অন্তরে ভীরুতা সৃষ্টি করে এবং শত্রুদের অন্তর হতে ভয় ভীতি দূর করে দেয়।

সুতরাং কোন অবস্থাতেই গুনাহের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না। চাই অন্তরে গুনাহ। হোক বা হাত পায়ের গুনাহ্ এবং আল্লহর হক সম্পর্কিত হোক কিংবা

দানা-পানি দিয়ে খুব হৃষ্ট-পুষ্ট ও শক্তিশালী করবে। কেননা, সেটা পুলসিরাতে তোমাদের সওয়ারী হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ যেসব স্থানে গরু ইত্যাদি জবাই করার প্রতি আইনগত বিধি-নিষেধ রয়েছে, সেখানে তা মেনে চলবে।

গুনাহ মাপের শুভ সংবাদ সম্পর্কিত সর্বশেষ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চল্লিশ হাদিস

১। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ যখন কোন মুসলমান বা মু'মিন বান্দা অযু করার সময়

মুখমন্ডল ধৌত করে তখন সে চোখে যতো খারাপ জিনিস দেখেছে এর সব গুনাহ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে পড়ে যায়। তারপর যখন সে হস্তদ্বয় ধৌত করে তখন তার হাত যতো পাপ কাজ করেছে, এর গুনাহ ঝরে যায় বা পানির শেষ বিন্দুরশাথে ঝরে যায়। তারপর সে যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে তখন পায়ের দ্বারা কৃত সকল পাপ পানির সাথে বা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে পড়ে যায় এমনিভাবে সে ব্যক্তি সম্পূর্ন নিস্পাপ হয়ে যায় (মুসলিম)

২। হযরত আলী (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কষ্ট করেঅযু করা ও মসজিদে গমন করা এবং এক নামাযের পর অপর নামাযের জন্য অপেক্ষা করা সব গুনাহকে ধূয়ে মুছেনিয়ে যায়

(আবু ইয়ালা, হাকিম)।

৩। হযরত আবু মুসা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের একত্রিত করবেন। তখনই আলেম জ্ঞানী ব্যক্তিদের একত্রিত করে বলবেন, "হে আলেম জ্ঞানিগণ, আমি সাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে আমারইলেম দীন দান করি নি। যাও তোমাদেরআমি ক্ষমা করে দিয়েছি "। অন্য বর্ণনায় আছে, "তোমাদের ক্ষমা করার উদ্দেশ্যে ইলেম ও প্রজ্ঞা-- তোমাদের প্রদান করেছি" (তাবরানি)। অন্য হাদিসে আছে কেউ ইসলামি আহরনে নিয়োজিত হলে তার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয় (তিরমিযী)

৪। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে মুয়াযযিনকে ক্ষমা করা হয়। শুস্ক ও আর্দ্র যারা আযান শুনতে পায় সবাই তার জন্য ইস্তিগফার করে।

(মুসনদে আহমদ)

৫। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শুনে বলে, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়াকোন ইলাহ নেই তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আমি আল্লাহকে রব (পালনকর্তা) হিসাবে,ইসলামকে দ্বীন হিসাবে এবং মুহম্মদকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসুল হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট"। তার সকল গুনাহ ক্ষমাকরে দেয়া হবে (মুসলিম ও আবু আওয়ান)।

৬। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, শীতকালে একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। তখন শীতের কারণে বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়েছিল। তিনি গাছের একটি ডালাহাতে নিয়ে নেড়ে এর পাতা ঝরালেন এবং

বলেলন, "হে আবু যার, যখন আল্লাহর কোন মুসলমান বান্দা নামায আদায়করতে দাড়ায় এবং এর মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তখন তার পাপরাশি এ বৃক্ষের পাতা ঝরার ন্যায় ঝরে পড়ে।

(বাশারাতুল মাহবুব বি-তাগফিরাল যুনুব, হাদীস ২৬)

৭। হযরত আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফযরের সালাতের পর দ্বিতীয় পা অগ্রসর করা ও কারো সাথে বাক্য বিনিময় করার পূর্বে দশবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ-দাহু লা-শারিককালাহ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহয়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদির" এ দোয়া পাঠ করবে, আল্লাহ তার জন্য দশটি নেকি লিখে দেবেন তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করবেন ওতার দশটি মর্যদা বৃদ্ধি করে দেবেন। ওই দিন সে সকল বিপদ মুক্ত থাকবে, শয়তান থেকে সুরক্ষিত থাকবে, শুধুমাত্র শিরিক ব্যতিত অপর কোন গুনাহ তাকে অনুসরণ করবে না।

(তিরমিযী)

৮। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন রসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামবলেছেন॥যে ব্যক্তি সকাল বেলায় নামাযের পরে একশ' বার আল্লাহর তসবিহ পাঠ করবে এবং একশ বার "লা-হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ" পাঠ করবে, আর সকল গুনাহক্ষমা করে দেয়া হবে যদি ও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমান হয়। (নাসায়ী)

৯। হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রাঃ) বলেন, আমি রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি সকাল বেলা নামাজের পর কারো সাথে বাক্য বিনিময়ের আগে একশ বার কুলহু আল্লাহু আহাদ (সূরা ইকলাস) পাঠ করবে তার ততো বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

(ইবনুস সুন্নী)

১০। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদুবে আলইহিম ওয়া লাদ দাল্লীন' বলে,তখন তোমরা 'আমিন' (হ আল্লাহ কবুল করো) বলো। কারন যার কথা ফিরিশতার কথার সাথে মিলে যায়, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বোখারী)

১১। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি আমার প্রিয় হাবিবকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়তে দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ঃ যে ব্যক্তি

মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাআত নামায আদায় করবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। (তাবরাণী)

১২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রাত্রে পার্শ্ব পরিবর্তন কালে যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' দশবার, 'সোবাহানল্লাহ' দশবার এবং 'আমান্তু বিল্লাহে ওয়া কাফারতু বিত্তাগুত' দশবার পড়ে গুনাহর কাযের ভয় থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কোন গুনাহর কাজ না করে, তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (তবরিনী)

১৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ নিদ্রিত ব্যক্তিকে তার রুহু ফেরতদেবার পর যদি সেনিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে, তার গুনাহ সাগরের ফেনা পরিমান হলেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় দোয়াটি হচ্ছেঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শরিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদির। (বাশারাতুল মাহবুব, হাদিস ৬০)

১৪। হযরত আবু মালিক আশআরি (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঘুম তেকে জেগে তার স্ত্রীকে জাগিয়ে তুলে, যদি স্ত্রীর ঘুম বেশি হয় তবে তার মুখমন্ডলে পানির ছিটা দিয়ে তাকে জাগ্রত করে এবং উভয় একত্রে রাত্রের কিছু সময় আল্লাহর যিকির করে, মহান আল্লাহ তাদের উভয়ের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (তাবরিন)

১৫। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকাল সন্ধায় 'সুববাহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' একশ বার পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (হাকিম)

১৬। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পরের নামায রীতিমত আদায় করবে, তার পাপরাশি সমুদ্রের ফেনার পরিমান হলেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (ইবনে মাজহা, তিরমিযী)

১৭। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দিনে ও রাতে নামাযের হিফাযতকারী আল্লাহর নিকট দোয়ার হস্ত প্রসারিত করলে, সকাল সন্ধ্যায়, দিনের প্রথমাংশে ওদিনের শেষাংশে সর্বদা সে আল্লাহকে তার প্রতি কল্যানকামী পাবে। আল্লাহ তার ফিরিশতাদের বলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি দিনের প্রথমাংশে ও শেষাংশে আমার বান্দা কে ক্ষমা করে দিচ্ছি। (তিরযিমি)

১৮। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি পাপ করে ফেলার পর পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায়ের পর যদি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তার কৃত পাপক্ষমা করে দেন। এ কথা বলার পর তিনি সুরা আলে-ইমরানে ১৩৫ নম্বর আয়াতটির তিলাওয়াত করেন (এর অর্থ) "তারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজের প্রতি যুলুম করে ফেললে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন ? তারা যা করে ফেলেছে, জেনে শুনে এর পুনরাবৃত্তি করে না।" (তিরমিযী)

১৯। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভালভাবে অযু করে নামাযে উপস্তিত হয় এবং নীরবে ইমামের খোতবা শ্রোবণ করে, আর এক জুমআ পর্যন্ত সময়ের সকল পাপ এবং আরো বড়তি তিন দিনের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ)

২০। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, কবিরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকলে এক নামায অপর নামাযের মধ্যবর্তী, এক জুমআ অপর যুমআর মধ্যবর্তী ও এক রমযান অপর রমযনের মধ্যবর্তী সকল পাপের ক্ষমাকারি। (মুসলিম)

২১। হযরত আবু উমামা (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে জুমআর দিনের গোসল চুলের গোড়া হতে সকল পাপ ধূয়ে বের করে দেয়। (তাবরানী)

২২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুমআর নামায শেষে একশ বার সোবাহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহি' পাঠ করে আল্লাহ তার এক লক্ষ পাপ ক্ষমা করে দেন এবংতার মাতাপিতার চব্বিশ হাজার পাপ ক্ষমা করে দেন।

(ইবনুস সুন্নী)

২৩। হযরত আনাস (রাঃ) বরেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন বান্দা-বান্দি দিনে-রাতে সত্তর বার 'ইস্তিগফার করে, তাহলে তার সাতশ পাপক্ষমা করে দেয়া হয়। সে বান্দা-বান্দি ধ্বংস হবে, যে দিনে-রাতে সাতশ-এরও বেশি গুনাহ করে। (বায়হাকী)

২৪। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি যুমআর দিন সকাল বেলায় "আসতাগাফিরুল্লাহা

ল্লাযি লা-ইলাহা ইল্লাহুয়াল হাইউল কাইউম ওয়া আতুবু ইলাইহি" তিন বার পাঠ করবে তার পাপ সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন।

(ইবনুস সুন্নী)

২৫। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে হাযির হয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলো ঃ আমার কি হবে। আমার কি হবে। তাকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বলো, আল্লাহুম্মা মাগফিরাতুকা আওসাউ মিন যুনুবী ওয়া রহমাতুকা আরজা ইন্দী মিন আমালী। অর্থাৎ 'হে আল্লাহ তোমার ক্ষমা আমার গুনাহ হতে মহত্তর, আমি তোমার রহমতের আশা করি আমার আমলের ভরসা করি না, ।সে ব্যক্তি এই দোয়াটি পাঠ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আবার পাঠ করো। সে আবার পাঠ করলো ।তিনি বললেন ঃ পুনরায় পাঠ করো, সে ব্যক্তি পুনরায় পাঠ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উঠো, আল্লাহ তোমার পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। (হাকিম)

২৬। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ রমযানের রোযা ফরয করেছেন এবং রাতে কিয়াম সুন্নত করেছেন।তোমাদের যে কেউ ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে রমযানের রোযা পালন করবে ও রাতে কিয়াম করবে সে তার মায়ের গর্ভ হতে সদ্য প্রসুত সন্তানের ন্যায় পাপরাশি হতে মুক্ত হবে। (নাসায়ী)

২৭। হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্ব) রোযা পালন করা সম্পর্কে রাসূলকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, "গত বছরের ও এর পূর্বেকার গুনাহ মাফ হয়" (তাগফিরাল যুনুব ১০০)।

২৮। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা পালন করে এবং তার পর শাওয়াল মাশে ছয়টি রোযা পালন করে সে তার মায়ের গর্ব হতে সদ্য প্রসুত সন্তানের ন্যয় নিস্পাপ হয়ে যায়। (তাবরানী)

২৯। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে র্বণনা করেছেন ঃ মহিয়ান গরীয়ান আল্লাহ শা' বান মাসের ১৫তারিখ রাতে তাঁর সকল সৃষ্টি সম্পর্কে অবহিত হন। অতঃপর তিনি মুশরিক অথবা ঈর্ষা পোষনকারী ব্যতীত সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন (তাবরানী)। আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে

ব্যক্তি ঈমানের সাথে সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রে জেগে ইবাদত করে তার পিছনের সব গুনাহ মাফ করা হয়। (বোখারি ১৭৭৭)

৩০। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি পবিত্রকুরআনের তিনশ আয়াত তেলাওয়াত করলে আল্লাহতায়ালা তাঁর ফিরিশতাদেরবলেন ঃ হে আমার ফিরিশতাকুল, আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলেছি যে, আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

(ইবনুস সূন্নী)

৩১। হযরত আনাস (রাঃ) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন ঃ যখন কিছু লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর স্মরন (যিকির) করে, তখন আকাশ হতে একজন আহবানকারী ডেকে বলে, তোমাদের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে তোমাদের সকল পাপ পূণ্যে --- রপান্তরি করে দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ)

৩২। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন বান্দা যদি রাতে অথবা দিনে কিছু সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যিকির করে তবে তার আমলনামায় যত পাপ আছে সবই ক্ষমা করা হয় এবং তার আমলনামায় সমপরিমান নেকি দেয়া হয়। (আবু ইয়ালা)

৩৩। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'সোবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' দিনে একশ বার পাঠ করে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয়। (বোখারি, মুসলিম)

৩৪। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর তেত্রিশ বার সোবাহানল্লাহ, তেত্রিশ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং চৌত্রিশ বার আল্লাহ আকবার বললে তার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমান হয়। (মুসলিম)

৩৫। হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর আসতাগফিরুল্লাহি ওয়া আতুব ইলাইহি' পাঠ করে তার পাপ যতই হোক তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। (তাবরানী)

৩৬। হযরত আব্বাস (রাঃ) ইবনে আবদুল মুত্তালিব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন আল্লাহর ভয়ে কোন বান্দার

চামড়া সংকোচিত হয়ে কেপেঁ উঠে, তখন শুকন গাছের পাতা ঝরার ন্যায় তার পাপরাশি ঝরে যায়। (বায়হাকী)

৩৭। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'ব্যক্তি আল্লাহর মহব্বতে মুসাফা করলে তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। অন্য বর্ণনায় রয়েছেঃ দু'জন মুসলমান মুসাফা করলে ও নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপর দরূদ পাঠ করলে তারা উভয়ে পৃথক হওয়ার পূর্বেই মহান আল্লাহ তাদের উভয়ের জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (আবু ইয়ালা)

৩৮। হযরত আবু সাইদ (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুমিন ব্যক্তি বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্শ্চিন্তায় পতিত হলে, এমনকি তার গায়ে একটি কাঁটা ফুটলেও তজ্জন্য আল্লাহতায়ালা তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেন (বোখারী)। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসূলের বাণীতে আছে ঃ মু 'মিন এর যান-মাল ও ইযযতের উপরে বিপদ আসতে থাকে অবশেষে সেআল্লাহর সাথে মিলিত হয় বে-গুনাহ অবস্থায়। (তিরমিয়ী)

৩৯। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি অসিয়ত করে অর্থাৎ মৃত্যুর পর মালের উত্তরাধিকারী নির্ধারন করে মৃত্যুবরণ করলে সে সঠিক ও সুন্নত তরিকার উপর মৃত্যুবরণ করলো। সে মুত্তাকী ও শহীদের মর্যদায় এবং গুনাহ হতে মুক্ত ও নিস্পাপ হয়ে মারা গেলো। (ইবনে মাজাহ)

৪০। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি কোন মৃতকে গোসল করালে ও তার আমানত রক্ষা করলে এবংতার মাঝে যা কিছু দেখেছে তা প্রকাশ না করলে, গোসলদাতা এমনভাবে নিস্পাপ হয়ে যায় যেন সে মাতৃগর্ভ হতে সদ্য প্রসুত সন্তান। (মুসনাদে আহমদ ও তাবরানী)

গুনাহের কারণে ইহলৌকিক ক্ষতিসমূহ

❖ ইলমে দ্বীন থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

❖ উপার্জন কমে যায়।

❖ আল্লাহ পাকের স্মরণে আতংকিত হয়ে পড়ে।

❖ অধিকাংশ কাজে সমস্যায় পড়ে যায়।

❖ মানুষের প্রতি আতংকিত হয়ে যায়। বিশেষতঃ নেককারদের দেখতে আতংক অনুভব করে।

❖ অন্তর অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।

❖ দিলের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, কখনো পূর্ণ শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

❖ ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

❖ হায়াত কমে যায়।

❖ তাওবা করার তাওফীক হয় না।

❖ অল্প দিনেই গুনাহের ভয় অন্তর থেকে দূর হয়ে যায়।

❖ আল্লাহ পাকের কাছে অপদস্থ হয়ে যায়।

❖ অন্য লোক তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এ কারণে তারা অভিসম্পাত করে।

❖ জ্ঞানবুদ্ধি কমে যায়।

❖ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ থেকে তার প্রতি অভিসম্পাত বর্ষিত হতে থাকে।

❖ ফিরিশতাদের দোয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

❖ বিভিন্ন উৎপাদন কমে যায়।

❖ লাজ-শরম চলে যায়।

❖ আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব দিল থেকে দূর হয়ে যায়।

❖ তার থেকে নি'আমতসমূহ ছিনিয়ে নেয়া হয়।

❖ ব্যাপকভাবে বালা-মুসীবাতে আক্রান্ত হয়।

❖ শয়তান তার উপর চেপে বসে।

❖ অন্তর সর্বদা অস্থির থাকে।

❖ মউতের সময় মুখে কালিমা উচ্চারিত হয় না।

❖ আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যায় এবং এ কারণে তাওবা ছাড়াই ইন্তিকাল করে। (বেহেশতী জেওর, প্রথম খণ্ড পৃঃ-৩৭)

ইবাদত ও নেক কাজের দরুন দুনিয়ার ফায়দাসমূহ

❖ আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পায়।

❖ বিভিন্ন রকম বরকত লাভ হতে থাকে।

❖ কষ্ট ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়।

❖ সহজে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়।
❖ শান্তিময় জীবন লাভ হয়।
❖ প্রয়োজনের সময় বৃষ্টি বর্ষিত হয়।
❖ সর্বরকম বালা-মসীবাত দূর হয়ে যায়।
❖ আল্লাহ্ পাক নেককারের প্রতি দয়াশীল ও তার সাহায্যকারী হয়ে যান।
❖ নেককারের অন্তর মযবূত রাখার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম করা হয়।
❖ প্রকৃত সম্মান - মর্যাদা লাভ হয়।
❖ মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।
❖ সকলের অন্তরে তার প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি হয়।
❖ পবিত্র কুরআন তার জন্য শিফা (প্রতিষোধক) হয়ে যায়।
❖ মালের ক্ষতি হলে তার উত্তম প্রতিদান লাভ হয়।
❖ দিন দিন নিআমত বৃদ্ধি পেতে থাকে।
❖ সম্পদ বৃদ্ধি পায়।
❖ অন্তরে শান্তি ও প্রশান্তি আসে।
❖ তার দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশধররাও উপকৃত হয়।
❖ দুনিয়ার জীবনেই অদৃশ্য সুসংবাদ লাভ হয়।
❖ মউতের সময় ফিরিশতাগণ খোশখবরী শুনিয়ে দেন।
❖ হায়াতে বরকত বৃদ্ধি পায়।
❖ ক্ষুধা ও দরিদ্রতা থেকে মুক্ত থাকে।
❖ অল্প জিনিসে অধিক বরকত লাভ হয়।
❖ মহান আল্লাহ্ পাকের গোসা তার প্রতি থাকে না।

(বেহেশতী জেওর, প্রথম খণ্ড পৃঃ- ৩৮)

অট্টহাসির ক্ষতিসমূহ

* ফকীহ আবুল লাইছ ছামারকান্দী (রাঃ) বলেন অট্ট হাসি পরিত্যাগ করা জরুরী, কেননা এর দারা ৮ ধরনের ক্ষতি সাধিত হয়-

১। বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট সমালোচনার পাত্র হওয়া।
২। অজ্ঞ এবং মূর্খ ব্যক্তিদের এমন ব্যক্তিদের উপর প্রাধান্য পাওয়া।

৩। অজ্ঞ ব্যক্তিদের অজ্ঞতা বেড়ে যাওয়া এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞান কমে যাওয়া।

৪। পূর্ববর্তী গুনাহ ভুলে যাওয়া।

৫। ভবিষ্যতে গুনাহ করার দুঃসাহস সৃষ্টি হওয়া।

৬। মৃত্যু এবং পরকালের স্মরণ কমে যাওয়া।

৭। অধিক হাসি পরবর্তীতে কান্নার কারণ হওয়া।

৮। এমন ব্যক্তির হাসি অন্যকেও গোনাহে লিপ্ত করার কারণ হওয়া।

আল্লাহ পাক আমাদের অট্টহাসি বর্জন করার তৌফিক দান করুন।

কবীরা গুনাহসমূহ

*** আল্লাহ পাকের সাথে শরীক স্থাপন করা এবং কুফরী করা।**

মহা আল্লাহ জাল্লা শানুহু পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছে, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ অর্থাৎ, আল্লাহ পাক শিরকের অপরাধ কখনো ক্ষমা করবেন না। (সূরা নিসা, আয়াত- ৪৮)

এছাড়া অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ একথাও বলে দিয়েছেন, اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফর বহুত বড় গুনাহ। (সূরা লুকমান, আয়াত- ১৩)

হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদের "আকবারুল কাবায়ের" বা সবচাইতে বড় গুনাহ সম্পর্কে বলে দিবো? শুনে রাখো, তা হলো আল্লাহ পাকের সাথে কাউকে শরীক করা।

*** রিয়া তথা ইবাদতে লোক দেখানো মনোভাব।**

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইবাদতের ক্ষেত্রে 'রিয়া' বা লোক দেখানো মনোভাব পোষণকারীদের নিন্দাবাদ করে ইরশাদ করেছেন, اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُوْنَ অর্থাৎ ঐ সকল লোক 'বিয়া' তথা লোক দেখানো মনোভাব পোষণ করে থাকে। (সূরা আল মাউন, আয়াত-৬)

এছাড়া সূরা কাহাফ-এর মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا

অর্থাৎ (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক করো না। (সূরা কাহাফ, আয়াত ১১০)

হাদীস শরীফে জনাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ الرِّيَاءُ، يَقُوْلُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِذَا جَزَى النَّاسَ بِاَعْمَالٍ لَّهُمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاؤُوْنَ فِى الدُّنْيَا اُنْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً

অর্থঃ আমি তোমাদের থেকে যে সকল বিষয়ে আশঙ্কা করছি তন্মধ্যে সর্বাধিক আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে শিরকে আসগার বা ছোট শির্ক তথা রিয়াকারী বা লোক দেখানো মনোভাব। মহান আল্লাহ কিয়ামত দিবসে যখন লোকদেরকে তাদের নেক আমলের প্রতিদান দিতে থাকবেন তখন বলবেন, তোমরা আজ ঐ সকল লোকদের কাছে যাও যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা আমল করতে, গিয়ে দেখো তোমরা তাদের কাছে থেকে তোমাদের আমলের কোন প্রতিদান লাভ করতে পার কিনা।

(মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুয যাওয়াজির, প্রথম খণ্ড ৬২ পৃষ্ঠা)

*** অহেতুক রাগ ও হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।**

*** অহংকার ও আত্মগরীমা করা।**

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক নিজের বড়ত্ব (অহংকার) প্রদর্শনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبْرٍ

অর্থ ঃ যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

(মুসলিম যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১১০ পৃষ্ঠা, শরীয়াত ও তাসাউফ ১৯৬ পৃষ্ঠা)

*** ধোকা দেয়া।**

*** মুনাফেকী করা।**

*** যুলুম করা, নাফরমানী করা।**

*** অহংকারী মনোভাব নিয়ে লোকদের থেকে দূরে থাকা এবং তাদেরকে হীন মনে করা।**

*** নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজনীয় কাজে খুব বেশি লিপ্ত থাকা।**

* শরীয়ত বিরোধী কাজ পছন্দ করা।

* দুঃস্থতার ভয় করা।

* তাকাদীরে লিখনের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া।

* আমীর শ্রেণীর লোকদের দর্শন লাভ করা এবং শুধু আমীরীর কারণে তাদের সম্মান করা।

* দুঃস্থদের সাথে তাদের দুঃস্থতা নিয়ে হাসি-তামাশা করা।

* লোভ অর্থাৎ সম্পদ জমা করার ক্ষেত্রে হারাম পথ থেকে বিরত না থাকা।

* পার্থিব দিক থেকে একে অপরের আগে বেড়ে যাওয়া, এবং তা নিয়ে গর্ব করা।

* কোন সৃষ্টির সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নাজায়েয সৌন্দর্য অবলম্বন করা।

* নিজের পার্থিব স্বার্থে কাউকে গুনাহে লিপ্ত দেখেও চুপ থাকা (সন্তুষ্ট থাকা)।

* এমন বিষয়ে প্রশংসা পছন্দ করা যা সে করে না।

* নিজের দোষের পরিবর্তে অপরের দোষ তালাশে লিপ্ত হওয়া।

* নিআমত ও ইহসানকে ভুলে যাওয়া।

* দ্বীনের চাহিদাকে পিছনে ফেলে নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া।

* শুকুর আদায় না করা।

* আল্লাহ পাকের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট না থাকা।

* আল্লাহ পাকের হকসমূহ এবং মানুষের প্রতি তাঁর দেয়া বিধানকে হালকা মনে করা।

* আল্লাহপাকের বান্দাদের সাথে উপহাস করা এবং তাদেরকে ছোট ও হীন জ্ঞান করা।

* প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং সত্যকে পরিহার করা।

* গোপনে না জায়েয কৌশল অবলম্বন করা।

* শুধুমাত্র দুনিয়ার জীবনকেই কামনা করা।

* সত্যের মুকাবিলা করা।

* কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কুধারণা পোষণ করা।

* হক কথাকে প্রবৃত্তির চাহিদার ভিত্তিতে উপেক্ষা করা অর্থাৎ বক্তা দুশমন হওয়ার কারণে কিংবা বক্তা তার কাছে পছন্দনীয় কিংবা বক্তা তার কাছে পছন্দনীয় নয় বিধায় হক কথাকে উপেক্ষা করা।

*** গুনাহের কাজে খুশি হওয়া।**

*** সগীরা গুনাহ্ বার বার করা।**

*** নেককাজ করে সে কারণে প্রশংসা কামনা করা।**

*** দুনিয়ার জীবনের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া এবং তার উপর সন্তুষ্টি থাকা।**

*** আল্লাহ পাক এবং আখিরাতকে ভুলে যাওয়া।**

*** প্রবৃত্তির চাহিদায় কারো প্রতি নাজায়েয গোস্বা করা অথবা অন্যায় প্রতিশোধ গ্রহণ করা।**

*** আল্লাহ পাকের রহমতের উপর ভরসা করে গুনাহ্ করা এবং মহান আল্লাহর গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে নির্ভয় থাকা।**

*** আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া।**

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেউ আল্লাহপাকের রহমত থেকে নিরাশ হয় না। (সূরা ইউসুফ, ৮৭ আয়াত)

জনাব রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ وَاَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِىْ (الحديث)

অর্থ ঃ আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন, বান্দা আমার ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করে আমি সে ধারণা অনুযায়ী তার সাথে আচরণকারী এবং বান্দা যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি।

(বুখারী, মুসলিম যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৪৯ পৃষ্ঠা)

*** আল্লাহ্ পাকের প্রতি কু ধারণা পোষণ এবং তার রহমত থেকে একেবারে নিরাশ হয়ে যাওয়া।**

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

مَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ إِلَّا الضَّالُّوْنَ

অর্থ ঃ প্রতি পালকের রহমত থেকে তো কেবলমাত্র পথভ্রষ্ট লোকই নিরাশ হয়ে থাকে। (আমি কেন নিরাশ হব?) (সূরা হিজর ৫৬ আয়াত)

হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ হচ্ছে,

اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سُوْءُ الظَّنِّ بِاللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

অর্থ ঃ মহান আল্লাহর প্রতি কু ধারণা পোষণ করা বহু বড় গুনাহ।

(দায়লামী, ইবনে মাজাহ, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৫০ পৃষ্ঠা)

*** দুনিয়ার জন্য দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা করা।**

এ ব্যাপারে জনাবে রাসূলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ করেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ تَعَالٰى لَا يَتَعَلَّمُهٗ اِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (يَعْنِىْ رِيْحَهَا)

অর্থ ঃ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য যে ইলম শিক্ষা করা হয়, সেই ইলম যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য না শিখে দুনিয়ার আসবাব অর্জন ও স্বার্থ হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।

(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, যাওয়াজির, প্রথম খণ্ড ১৫১ পৃষ্ঠা)

*** ইলম গোপন করা।**

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَابِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

অর্থ ঃ নিঃসন্দেহে আমার অবতারিত পরিষ্কার বিধান ও হিদায়াতের বানীসমূহ যারা গোপন করে, সে বাণীসমূহ আমি লোকদের জন্য কিতাবে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়ার পর তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ পাকের অভিশম্পাত এবং অভিসম্পাতকারীদের অভিসম্পাত। (সূরা বাকারা আয়াত ৫৯)

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইলম গোপন করা অত্যন্ত বড় গুনাহ।

জনাবে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهٗ فَكَتَمَهٗ اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّنَ النَّارِ

অর্থ ঃ যাকে এমন কোন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে বিষয়ের ইল্‌ম তার আছে তা সত্ত্বেও সে তা গোপন করলো, বললো না, তবে এরূপ ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরিয়ে টানা হবে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, বাইহাকী, হাকিম যাওয়াজির প্রথম খণ্ড ১৫৩ পৃষ্ঠা)

*** ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করা।**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَا يَنْفَعُهُ عِلْمُهُ

অর্থ ঃ কিয়ামতের দিনে ঐ আলিম সবচাইতে কঠিন আযাবে নিপতিত হবে যাকে তার ইল্‌ম কোন ফায়দা দেয়নি (সে তার ইলমের উপর আমল করেনি)

(তাবারানী, বায়হাকী, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৫৬ পৃঃ)

*** আলিমগণের অবমূল্যয়ন ও তাদেরকে হীন মনে করা।**

জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِهِمْ اِلَّا مُنَافِقٌ ذُوالشَّيْبَةِ فِى الْاِسْلَامِ وَذُوالْعِلْمِ وَاِمَامٌ مُقْسِطٌ

অর্থ ঃ তিন প্রকার লোক এমন আছে যাদেরকে মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউই হীন মনে করে না, ১. বয়োবৃদ্ধ মুসলমান, ২. আলিম, ৩. ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা বাদশাহ। (তাবরানী, তিরমিযী, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৫৯ পৃঃ)

* মহান আল্লাহ ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর মিথ্যা আরোপ করা"।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

অর্থ ঃ যেসব লোক আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে (হে নবী!) আপনি কিয়ামতের দিবসে তাদের চেহারা কালো দেখতে পাবেন।

(সূরা-যুমার, আয়াত-৬০)

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর জেনে বুঝে মিথ্যা আরোপ করবে (অর্থাৎ আমি বলিনি এমন কথা আমার কথা বলে প্রচার করে) সে যেন জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নেয়। (বুখারী, মুসলিম যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৬১ পৃঃ)

*** দ্বীনের মাঝে কোন খারাপ পদ্ধতি আবিষ্কার করা।**

*** সুন্নাতকে একেবারে ছেড়ে দেয়া।**

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

سِتَّةٌ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ (وَفِيْهِ) التَّارِكُ لِسُنَّتِىْ

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহু এবং প্রত্যেক নবী (আঃ) ছয় ধরনের মানুষের প্রতি অভিসুম্পাত বর্ষণ করে থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো ঐ ব্যক্তি, যে আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করে।

এতে বুঝা গেলো যে, কোনরূপ অপারগতা বা উযর ব্যতীত সুন্নাতে মুআয়াক্কাদা ছেড়ে দেয়া গুনাহের কাজ।

(ইবনে হিব্বান, হাকিম, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৬৫ পৃঃ)

*** তাকদীর অস্বীকার করা।**

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

অর্থ ঃ আমি প্রতিটি বস্তুকেই একটি নির্ধারিত পরিমাণে সৃষ্টি করেছি। (সূরা ক্বামার, আয়াত-৪৯)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَقَادِيْرَ الْخَلْقِ قَبْلَ اَنْ يَّخْلُقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ وَعَرْشُهٗ عَلَى الْمَاءِ

অর্থ ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই মখলুকের তাকদীর লিখে দিয়েছে যখন তার আরশ ছিলো পানির উপর। (মুসলিম, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৭২ পৃঃ)

*** ওয়াদা করে সে মতে কাজ না করা।**

আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেছেন–

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً

অর্থ ঃ ওয়াদা পূর্ণ করো। নিঃসন্দেহে এ সম্পর্কে কিয়ামতের দিবসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (সূরা ইসরা-৩৪ আয়াত)

*** গুনাহগারের সাথে মহব্বাত ও নেককারদের সাথে শত্রুতা।**

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

لَاتُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيٌّ

অর্থ ঃ তুমি শুধু নেককার মুসলমান ছাড়া অন্য কাউকে দোস্ত ও সাথী বানিও না এবং তোমার খানাও যাতে কোন নেককার, পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া কেউ না খায়। (ইবনে হিব্বান, তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৪২৬ পৃঃ)

*** আল্লাহ পাকের নেককার বান্দাদের কষ্ট দেয়া এবং তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা।**

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ পাকের ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا

অর্থ ঃ ঐ সকল লোক যারা ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার মহিলাদেরকে কোনরূপ বৈধ কারণ ছাড়া কষ্ট দেয়, তারা অপবাদ ও পরিষ্কার গুনাহের বোঝা বহন করছে।

অর্থাৎ সে কষ্ট যদি কোন কথার দ্বারা দেয়া হয়ে থাকে তবে তা অপবাদ আর যদি কোন কাজের দ্বারা কষ্ট দেয়া তবে তা সাধারণ গুনাহের অন্তর্ভুক্ত।

(সূরা আহযাব, আয়াত ৫৮, মা'আরিফুল কুরআন,মুফতী মুহাঃ শফী রহঃ ৭ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ)

বুখারী শরীফের এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ

অর্থ ঃ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর (বন্ধুর) সাথে শত্রুতা পোষণ করে তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি।

*** যমানাকে খারাপ বলা।**

রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন,

يَسُبُّ ابْنُ اٰدَمَ الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ وَبِيَدِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ فِىْ رِوَايَةٍ اُقَلِّبُ لَيْلَهٗ وَنَهَارَهٗ وَاِذَا شِئْتُ قَبَضْتُهُمَا

অর্থ ঃ (আল্লাহ পাক বলেন), মানুষ যামানাকে মন্দ বলে, অথচ আমি নিজেই তো যামানা, অর্থাৎ তার মাঝে সর্বরকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন আমিই করে থাকি, আর আমার হাতেই রয়েছে রাত ও দিন, অপর এক বর্ণনায় এভাবে বর্ণিত আছে যে, আমিই রাত-দিন পরিবর্তন করে থাকি এবং আমি যখন ইচ্ছা করবো সে রাত-দিনকে স্থবির করে দিবো অর্থাৎ খতম করে দিবো।

(বুখারী শরীফ, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৮৭ পৃঃ)

*** এমন কথা বলা যার ফলে ফাসাদ ও ক্ষতি সাধিত হয়।**

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيْهَا فَيَنْزِلُ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

বান্দা কখনো এমন বেহুদা কথা বলতে থাকে যার কারণে সে জাহান্নামের অতল গহ্বরে এতটাই নিমজ্জিত হয়ে যায়, যার ব্যবধান মাশরিক থেকে মাগরিবের দূরত্বের চাইতেও অধিক। এর মর্ম হচ্ছে, কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়া মনে একটা কিছু আসলেই তা মুখে বলে দেয়া উচিত নয়, কারণ অনেক সময় ভুল কথা এবং নাজায়েয কথা মুখে এসে যায়, এরপর যদি তা মাফ করিয়ে নেয়া না হয় তবে এর ফলে জাহান্নামের অনেক নীচে নিমজ্জিত করে দেয়া হবে।

(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃঃ)

*** ইহসানকারীর ইহসান ভুলে যাওয়া।**

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন- وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

অর্থ ঃ আমার নেয়ামতের শোকর আদায় কর, অকৃতজ্ঞ (না শোকর) হয়ো না। (সূরা বাকারা, আয়াত ১৫২)

*** প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শুনেও দরুদ শরীফ না পড়া।**

"কারো বড় গুনাহ করার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং কোন গুনাহের কাজে সাহায্য করা।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন-

وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ ঃ তোমরা গুনাহ ও জুলুমের (সীমালংঘনের) ক্ষেত্রে সহায়তা করো না। (সূরা মায়েদাহ দ্বিতীয় আয়াত, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃঃ)

*** খারাপ কাজ ও লজ্জাস্কর কথা নিজের স্বভাবে পরিণত করা যার ব্যাপারে লোক সর্বদা ভীত থাকে।**

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَاللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ النَّاسُ اَوْتَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهٖ

অর্থ ঃ মর্যাদার দিক থেকে কিয়ামতের দিনে সবচাইতে নিকৃষ্ট লোক হবে সে ব্যক্তি যার লজ্জাস্কর ও বেহুদা কথার কারণে তা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।

(বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ১৯৫ পৃঃ)

*** কুরআন শরীফ অথবা ধর্মের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক করা।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

لَاتُجَادِلُوْا فِى الْقُرْاٰنِ فَاِنَّ الْجِدَالَ فِيْهِ كُفْرٌ

অর্থ ঃ তোমরা কুরআন শরীফ নিয়ে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। কুরআন শরীফ নিয়ে এরূপ করা কুফরী।

(দায়লামী, বায়হাকী, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২০২ পৃঃ)

*** রাস্তায় পায়খানা করা।**

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ تَغَوَّطَ عَلٰى حَافَّةِ نَهْرٍ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَيُشْرَبُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি এমন নদী বা জলাশয়ের তীরে পেশাব-পায়খানা করে যার পানি দ্বারা অযূ করা হয় এবং তা পান করা হয়, ঐ ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ। (যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২০৬ পৃঃ)

"শরীর বা কাপড়ে পেশাব লাগা থেকে সতর্ক না হওয়া"। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ بَلٰى اِنَّهُ لَكَبِيْرٌ اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَكَانَ لَا يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهٖ

অর্থ ঃ এ কবর দুটির অধিবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। এ শাস্তি এমন বড় কোন বিষয়ে নয় যে, তা থেকে বেঁচে থাকা যেতনা, তবে পাপ হিসেবে অবশ্যই তা গুরুতর। এদের মধ্যে একজন চোগলখুরী করে বেড়াত, আর অপরজন পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না।

(বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য-যাওয়জির ১ম খণ্ড, ২০৭ পৃঃ)

*** কোন ফরয ছেড়ে দেয়া।**

*** প্রয়োজন ছাড়া (কারো সামনে) সতর খুলে উলঙ্গ হওয়া।**

*** ঋতুবতি স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।**

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ اَتٰى حَائِضًا فِىْ فَرْجِهَا اَوِ امْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতি স্ত্রীর সাথে সহবাস করল কিংবা স্ত্রীর পায়ুপথে যৌনাচার করল কিংবা কোন গনকের নিকট গিয়ে তার কথা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অবর্তীণ অহীকে অস্বীকার করল (কুফরী করল) অর্থৎ কাফের যেসব কাজ করে তথা কুফরী তা নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ। (আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২১৬)

*** ইচ্ছা করে কোন ফরয নামায ছেড়ে দেয়া।**

মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

مَا سَلَكَكُمْ فِىْ سَقَرَقَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ

অর্থ ঃ (হে জাহান্নামীরা) কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামে আনয়ন করল? তারা বলবে! আমরা নামায পড়তাম না এবং দরিদ্রদেরকে খাদ্য দিতাম না, (যাদের হক আদায় করা জরুরী ছিল) আর আমরা সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধে ত্রুটি অন্বেষণকারীদের সাথে তা করে বেড়াতাম।

(সূরা মুদ্দাসসির, আয়াত ৪২-৪৫, মা'আরেফুল কুরআন ৮ম খণ্ড ৩০৬ পৃঃ)

*** বিনা ওযরে সময় আসার পূর্বে নামায পড়া কিংবা সময় চলে যাওয়ার পর (কাযা) পড়া।**

*** বড় কোন রমণীর চুল অন্য রমণীর চুলের সাথে মিলিয়ে দেয়া এবং নিজ চুলের সাথে অন্যের চুল সংযোজন করা বা অনুরূপ করার জন্য হুকুম দেয়া।**

*** অন্যের গায়ে উল্কি এঁকে দেয়া বা দাগ দেয়া এবং ঐ কাজ নিজের জন্য কাউকে দিয়ে করানো।**

*** অন্যের দাঁতকে সূক্ষ্ম ও ধারাল করা এবং অন্যকে দিয়ে নিজের জন্য করানো।**

*** অন্যের ভ্রু উৎপাটন (প্লাগ) করা এবং নিজের ভ্রু উৎপাটন করানো।**

*** নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া।**

*** কবরস্থানকে নামাযের স্থান বানানো।**

*** কবরস্থানে (কবরের উপর) বাতি জ্বালানো।**

*** কবরকে পূজা করা।**

*** কবরকে তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করা।**

*** কবরকে চুম্বন করা।**

*** কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া।**

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বক্তব্য আলোচিত হয়েছে এভাবে-

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরস্থানে গমনকরী এবং কবরস্থানকে সিজদার স্থানে পরিণতকারী এবং কবরে বাতি প্রজ্বলনকারীর প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হিব্বান, যাওয়াজিব ১ম খণ্ড ২৪৫ পৃঃ)

*** ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও কোন নারীর একাকী সফর করা।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اِلَّا وَمَعَهَا اَبُوْهَا اَوْ اَخُوْهَا اَوْ زَوْجُهَا اَوِابْنُهَا اَوْ ذُوْرَحْمٍ مَحْرَمٍ مِنْهَا

অর্থ ঃ যে নারী আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্য হালাল নয় (অর্থাৎ হারাম) তিন দিনের পথ (৪৮মাইল) পরিমাণ পথ ভ্রমণ করবে, এ অবস্থায় যে তার সাথে থাকবে না তার পিতা বা ভাই অথবা স্বামী কিংবা সন্তান, অথবা অন্য কোন মাহরাম ব্যক্তি। মোট কথা নারীর জন্য ৭৭ কি.মি. পথ বা তার চেয়ে বেশি পথ একাকি ভ্রমণ করা হারাম।

(বুখারী মুসলিম, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২৪৬ পৃঃ)

*** অশুভ ফাল (গণনার) ভিত্তিতে সফর করা থেকে বিরত না থাক।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

ঐ ব্যক্তি কখনো উচু মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না যে গণক সাজে অথবা তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে গোশত বণ্ডন করে অথবা পাখি বাম দিকে উড়ে গেলে (অশুভ লক্ষণ মনে করে) সফর থেকে বিরত থাকে আর ডান দিকে উড়ে গেলে (শুভ লক্ষণ মনে করে) সফরে যায়।

(বিশুদ্ধ সূত্রে তাবারানী বর্ণনা করেন, বাইহাকী, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২৪৮ পৃঃ)

*** উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে জুমুআর নামায না পড়া।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

জুমু'আর নামায ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস থেকে বিরত থাকা উচিত। অন্যথায় আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিবেন, এতে তারা সার্বক্ষণিকভাবে অলসদের কাতারে শামিল হয়ে যাবে। (মুসলিম, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২৪৯ পৃঃ)

*** প্রাপ্ত বয়স্কা ও সুস্থবোধ পম্পন্ন পুরুষ বা নপুংশাকের জন্য নিখুঁত রেশম পরিধান করা।**

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لَاتَلْبَسُوا الْحَرِيْرَفَاِنَّهٗ مَنْ لَبِسَ فِى الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِى الْاٰخِرَةِ

অর্থ ঃ তোমরা রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না! কেননা যে দুনিয়াতে রেশমী বস্ত্র পরিধান করবে সে আখেরাতে তা পরিধান করা থেকে বঞ্চিত থাকবে।

(বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য, যাওয়াজির ২৫২ পৃঃ ১ম খণ্ড)

*** প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের স্বর্ণ-রৌপ্যের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা।**

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ইরশাদ করেন

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِفَلَا يَلْبَسْ حَرِيْرًا وَلَا ذَهَبًا

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন রেশমী বস্ত্র এবং স্বর্ণ ব্যবহার না করে।

(আহমাদ, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২৫৪ পৃঃ)

*** সমাজে প্রচলিত নারীর জন্য নির্ধারিত বিষয়গুলো পুরুষের অবলম্বন করা যেমন-পোশাক-আশাক, কথাবার্তা এবং চালচলন, অনুরূপভাবে সমাজে প্রচলিত পুরুষালী বিষয়গুলো নারীর অবলম্বন করা।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ পুরুষের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন, যে পুরুষের বেশভূষা গ্রহণ করেছে এবং ঐ নারীর প্রতিও অভিশাপ বর্ষণ করেছেন যে নারীর বেশভূষা ধারণ করেছে।

*** নারীর জন্য পাতলা কাপড়ের পোশাক পরিধান করা।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِلَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَاوَكَذَا۔

দুই শ্রেণীর জাহান্নামীকে এখনো আমি দেখিনি, (এক) ঐ শ্রেণীর লোকেরা যাদের হাতে সর্বদা গরুর লেজের ন্যায় বক্র লাঠি থাকবে (হকিস্টিক) যার দ্বারা এরা মানুষকে প্রহার করবে। (দুই) ঐ সব নারী যারা পোশাক পরবে (এত সূক্ষ্ম-পোশাক) যেন তারা বস্ত্রহীনা, মানুষের অন্তরে খাহেশের (ঝড়) সৃষ্টিকারী, পর পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্টকারী নিজেও (পরকীয়া প্রেমে) অন্যের প্রতি আকৃষ্ট। (সাজসজ্জার আধিক্যে) তাদের মাথা উটের পিঠের ঝুক পড়া উচু অংশের ন্যায়, তারা জান্নাতে যেতে পারবে না। এমন কি জান্নাতের সুঘ্রাণও অনুভব করতে পারবে না, অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ (এতদূর) বহু দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম শরীফ থেকে মিশকাত ৩০৬ পৃঃ)

*** লুঙ্গি, পাজামা, কাপড়, আস্তিন অথবা পাগড়ীর শিমলা (পিছনে ঝুলানো অংশ) অহংকারবশতঃ লম্বা করা।**

*** দাম্ভিকতার সাথে চলাফেরা করা।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَااَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِى النَّارِ

অর্থ ঃ টাখনুর নীচে (পরিহিত) কাপড়ের যে অংশ ঝুলে থাকবে তা জাহান্নামে যাবে। তবে মহিলাদের টাখনুকে ঢেকে রাখার হুকুম রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা জমিনে দম্ভভরে পদচারণা কর না, তোমরা তো জমিনকে বিদীর্ণ করতে পারবে না। এবং উচ্চতায় পাহাড়কে স্পর্শ করতে পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৭)

*** জিহাদ বা অনুরূপ কোন যথাযথ প্রয়োজন ব্যতীত দাঁড়িতে কালো খিযাব ব্যবহার করা।**

অহেতুক কালো খিযাব ব্যবহার প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

يَكُوْنُوْنَ قَوْمٌ يَخْضِبُوْنَ فِىْ اٰخِرِالزَّمَانِ بِالسَّوَادِكَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يَرِيْحُوْنَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

অর্থ ঃ আখিরী যামানায় কিছু লোক এমন হবে যারা কবুতরের লেজের ন্যায় কালো খিযাব ব্যবহার করবে, তারা জান্নাতের খুশবুও পাবে না।

আবু দাউদ, নাসাঈ, সহীহ ইবনে হিব্বান ও হাকেম, ইমাম হাকেম এটিকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হাদীস মনে করেন কেউ কেউ হাদীসটিকে দুর্বল মনে করেন, (তাদের মতে) উক্ত হাদীসের রাবীদের মধ্যে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর নাম নেই। (যাওয়াজির ২৬১ পৃঃ)

* গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়ে থাকে এরূপ বলা এবং গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব বিশ্বাস করা।

* (মৃত্যু শোকে) মুখে আঘাত করা।

* জামার বুক ছিঁড়তে থাকা।

* বিলাপ করা।

* বিলাপ শ্রবণ করা।

* মসীবতের সময় (বিপদকালে) ধ্বংসের জন্য দোয়া করা।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

যে গালে আঘাত করে, জামার বুক ফাঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে (বিলাপ করে) সে আমার উম্মত ভুক্ত নয় (অর্থাৎ সে পূর্ণ মুসলমান নয় বরং পাপী) (বুখারী, মুসলীম, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ২৬২ পৃঃ)

* যাকাত প্রদান না করা।

* ওযর ব্যতীত বিলম্বে যাকাত দেয়া।

* প্রকৃত ঋণগ্রস্ত অভাবী ব্যক্তির পিছনে ঋণদাতার লেগে থাকা অথবা ঋণী ব্যক্তিকে আটক করে রাখা।

* যাকাতের মধ্যে খিয়ানত করা।

* মানুষের অধিকার সমূহের নিরাপত্তা না থাকা সত্ত্বেও তাদের থেকে ট্যাক্স আদায় করা এবং অন্যান্য চার্জ বাবদ পারিশ্রমিক আদায় করা।

* সম্পদ ও উপার্জনে সক্ষমতার জন্য আমীর পদের লোকদের লালসা এবং অধিক সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যের নিকট সদকা চাওয়া।

প্রিয়বনী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيْهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْئَلَتُهُ فِيْ وَجْهِهِ خُمُوْشٌ اَوْخُدُوْشٌ اَوْ كُلُوْحٌ قِيْلَ وَمَا الْغِنٰى؟ قَالَ خَمْسُوْنَ دِرْهَمًا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ

যে ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছু চায় অথচ তার অভাব নেই, সে কিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় প্রচুর যখমের চিহ্ন বিদ্যমান

থাকবে, আরয করা হলো, অভাব না থাকার মানে কি? তিনি ইরশাদ করলেন, পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রা কিংবা তৎসম মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা।

(সুনানে আরবাআ, হাকেম যাওয়াজির ১ম খণ্ড ৩০৪ পৃঃ)

*** কারো কাছে এত বেশি পরিমাণ চাওয়া যে, সে প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে যায়।**

*** দুঃস্থ ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজন এবং অধিনস্থ অক্ষম দাসদাসী কিছু চাইলে দেয়ার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও না দেয়া।**

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ ذِىْ رَحِمٍ يَأْتِىْ ذَارَحْمَهٗ فَيَسْأَلُهٗ فَضْلًا اَعْطَاهُ اللّٰهُ اِيَّاهُ فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ اِلَّا اَخْرَجَ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يَتَلَمَّظُ فَيُطَوَّقُ بِهٖ

অর্থ ঃ যদি কোন আপনজন কোন আপনজনের নিকট গিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত বস্তু হতে কিছু চায়, আর সে তা দিতে কার্পণ্য করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে এমন একটি সাপ বের করবেন যে ঐ (কৃপণ) ব্যক্তিকে কুড়েকুড়ে খাবে, অতঃপর ঐ সম্পদ তার গলায় বেড়ী বানিয়ে লটকে দেয়া হবে। (তাবরানী, কবীর, হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রাযীঃ) সূত্রে উত্তম সনদে বর্ণিত।) (যাওয়াজির ১ম খণ্ড ৩০৯ পৃঃ)

*** দান করে খোঁটা দেয়া।**

আল্লাহ তা'আলার বাণী-

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْاصَدَ قٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদের দান-খয়রাতকে খোটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে বরবাদ করো না। ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে খরচ করে।

(সূরা আল বাকারা ২৬৪ আয়াত, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ৩১১ পৃঃ)

*** কারো প্রয়োজনীয় মুহূর্তে কিংবা অক্ষম অবস্থায় নিজের কাছে পানি থাকা সত্ত্বেও পানি না দেয়া।**

*** রমযানের কোন রোযাকে অকারণে ছেড়ে দেয়া।**

*** বিনা ওযরে স্ত্রী সহবাস বা এ ধরনের কোন রোযা ভঙ্গকারী কর্ম করে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা।**

*** স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত স্ত্রীর নফল রোযা পালন করা।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَايَحِلُّ لِامْرَأَةٍ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌالَّابِاِذْنِهٖ وَلَا تَأْذَنُ فِىْ بَيْتِهٖ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

অর্থ ঃ কোন নারীর জন্য এটি হালাল নয় (বরং হারাম) যে, সে তার স্বামী উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ব্যতীত রোযা পালন করবে, আর স্বামীর গৃহে তার অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে কোনরূপ প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

(বুখারী, মুসলিম, যাওয়াজির ১ম খণ্ড ৩২৫ পৃঃ)

*** আইয়্যামে তাশরীক ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে রোযা রাখা।**

*** নির্দিষ্ট সময়ে মান্নতকৃত ই'তিকাফ ভঙ্গ করা।**

*** স্ত্রী সহবাস বা অনুরূপ কোন কার্য দ্বারা ই'তিকাফ ভঙ্গ করা।**

*** ই'তিকাফকারী বা অন্য কারো জন্য মসজিদে স্ত্রী সহবাস করা।**

*** সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মৃত্যুর পূর্বে হজ্জ পালন না করা।**

*** হজ্জ অথবা উমরাহ চলাকালীন অবস্থায় ইহরাম খোলার আগে ইচ্ছকৃতভাবে স্ত্রী সহবাস করা।**

*** হজ্জ উমরা পালনের মাঝে জানা থাকা সত্ত্বেও কোন খেচর প্রাণী শিকার করা।**

*** বাইতুল্লাহ শরীফ অবমাননা করা।**

*** মক্কার হারাম প্রাঙ্গণে কোন গুনাহ করা।**

*** সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করা।**

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ وَجَدَ سَعَةً اِلَاْنْ يُّضَحِّىَ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে, তা সত্ত্বেও সে কুরবানী না করে সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (যাওয়াজির ১ম খণ্ড ৩৪৫ পৃঃ)

*** কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে নিজে গ্রহণ করা।**

مَنْ بَاعَ جِلْدَ اُضْحِيَّتِهٖ فَلَا اُضْحِيَّةَ لَهٗ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে, তার কুরবানী হয় না।

*** প্রাণীকে ভালভাবে জবাই না করে কষ্ট দেয়া।**

*** গাইরুল্লাহকে মাবুদ (উপাস্য) মনে না করে, গাইরুল্লাহর নামে পশু যবাই করা, কারণ গাইরুল্লাহকে মা'বূদ মনে করলে তো সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।**

* নেশাদার ঘাষ-লতা আফীম, বাঙ অথবা পাক পবিত্র নেশাদার বস্তু খাওয়া যেমন-মিশক আম্বর, জাফরান, উত্যাদি।

* একান্ত অনন্যোপায় না হয়ে প্রবহমান রক্ত পান করা।

* নিতান্ত নিরূপায় না হয়ে শূকরের গোশত খাওয়া।

* একান্ত অপারগ না হয়ে মৃত জন্তুর গোশত খাওয়া।

* কোন প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা।

* নাপাক বস্তু খাওয়া।

* আর্বজনা বা দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খাওয়া।

* কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকারক কিছু খাওয়া।

* সুদ খাওয়া।

* সুদ খাওয়ানো।

* সুদের বিষয় লেখা।

* সুদের ব্যাপারে চেষ্টা-তদবীর করা।

* সুদের বিষয়ে যে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করা।

* অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় করা ও অবৈধ রুজী-রোজগার খাওয়া।

* উচ্চ মূল্যের আশায় দ্রব্য-সামগ্রী আবদ্ধ রাখা।

* অবুঝ শিশুকে বিক্রি বা অন্য কোন উপায়ে তার মা থেকে পৃথক করে দেয়া।

* দাম বেশি বলে পণ্যের মূল্য বাড়ানো।

* বিক্রির উপর বিক্রি করা, অর্থাৎ ক্রেতাকে (অন্যবস্তু ক্রয় করতে দেখে) এরূপ বলা যে, এসব জিনিস ক্রয় করবেন না, এর চেয়ে উত্তম জিনিস আমি আপনার নিকট বিক্রি করব।

* ক্রয়ের উপর ক্রয় করা, অর্থাৎ কোন কিছু বিক্রয়ের সময় বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রেতাকে এরূপ বলা যে, বিক্রি বন্ধ করে দিন, আমি আপনাকে এর চেয়েও বেশি মূল্য দিব।

* বেচাকেনার মধ্যে ধোঁকাবাজীর আশ্রয় নেয়া, যেমন দুধের আধিক্য বুঝানোর জন্য পশু দোহন না করা।

* মিথ্যা কসম করে ব্যবসায়িক পণ্য বিক্রি করা।

* পরিমাপে কম করা।

* ফেরত না দেয়ার মতলবে ঋণ গ্রহণ করা।

* পাওনাদার তাগাদা করার পর কোন ধনী ব্যক্তির ওযর না থাকা সত্ত্বেও টাল-বাহানা করা।

* ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা।

* গুনাহের কাজে অর্থ-সম্পদ খরচ করা হোক তা এক পয়সা কিংবা ছোট কোন গুনাহ।

* পড়শীকে কষ্ট দেয়া, যদিও সে অন্য ধর্মাবলম্বীয় হয়। (তার গোপনীয়তা ক্ষুণ্ন করে) ঘরের ভিতরে উঁকি মারা অথবা এমনভাবে গৃহ নির্মাণ করা যাতে তার কষ্ট হয়।

* জমিনের সীমানা পিলার বা সীমা নির্দেশক চিহ্ন পরিবর্তন করা।

প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন-

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা লা'নত বর্ষণ করেন ঐ ব্যক্তির উপর, যে দুই জমিনের সীমা নির্ণয়ক (মধ্যবর্তী আইল) অথবা রাস্তার চিহ্ন মুছে ফেলে।

* অন্ধকে ভুল পথ দেখানো।

* কোন পথ বা গলি যদি জনপথ না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্টদের অনুমতি ছাড়া সেটি ব্যবহার করা।

* জনপথের অনুচিত বা মারাত্মক কোন ক্ষতি করা।

* এক শরীক অপর শরীকের খিয়ানত করা।

* জোর-যুলুম করে কারো সম্পদ দখল করা।

* শ্রমিকের দ্বারা কাজ করিয়ে তার পারিশ্রমিক না দেয়া বা বিলম্বে দেয়া।

* হারানো বস্তু পেয়ে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী ঘোষণা না দিয়ে সেটি ব্যবহার করা, এমনকি তার মালিক হয়ে যাওয়া।

* হারানো বস্তুর মালিকের সন্ধান পাওয়া সত্ত্বেও (মালিকের নিকট বিষয়টি গোপন রাখা।

* ভুল অসিয়ত করে কারো হক নষ্ট করা।

* প্রয়োজন ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিবাহ না করা।

* ফিতনার আশঙ্কা থাকা অবস্থায় পর নারীকে কামনার দৃষ্টিতে দেখা।

* অনুরূপভাবে পর নারীকে স্পর্শ করা।

* পর নারীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা এ অবস্থায় যে তাদের সাথে উভয়ের কোন একজনের এমন কোন মাহরাম আত্মীয় নাই, যার কারণে তারা

অপরাধ করা থেকে বেঁচে থাকবে। অনুরূপভাবে স্বামীর অনুপস্থিতিতে পরস্ত্রীর সাথে নির্জনে অবস্থান করা।

* দাড়িবিহীন বালকের প্রতি কামভাব নিয়ে তাকানো, ফিতনার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও।

* অনুরূপ বালককে কামভাব নিয়ে স্পর্শ করা।

* গীবত করা।

* গীবত শুনতে রাজী থাকা এবং একে ঠিক মনে করে চুপ থাকা।

* কাউকে মন্দ নামে ডাকা।

* কোন মুসলমানকে উপহাস করা।

* চোগলখুরী করা।

* কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

* ওলী (অভিভাবক) তার মেয়ে বা বোনকে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ করতে বাধা প্রদান করা।

* এক ব্যক্তি এমন স্থানে বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করেছে যেখানে বিবাহ করা বৈধ ও শুদ্ধ, উভয় পক্ষের অভিভাবকগণও সম্মত আছেন, কেউ অস্বীকার করেন নাই এমন স্থানে (অপর কেউ) বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো।

* স্ত্রীকে স্বামীর বিপক্ষে উত্তেজিত করা।

* বংশগত কারণে অথবা দুধ পান করার কারণে কিংবা অন্য কোন সম্পর্কের কারণে কোন মহিলা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার পরও এ পর্যায়ের কোন মহিলাকে বিবাহ করা। এক্ষেত্রে তার সাথে সহবাস করা হোক বা না হোক।

* তালাক দাতার স্ত্রীকে হালাল করার জন্য (হিলা করতে) রাজী হওয়া।

* তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর উক্ত শর্ত (হিলা) মেনে নেয়া।

* স্বামীর জন্য স্ত্রীর সাথে কৃত সহবাস ও অন্যান্য গোপন রহস্য প্রকাশ করা।

স্বামীর গোপন রহস্য স্ত্রীর প্রকাশ করা।

* স্ত্রী বা বাঁদীর পায়ুপথে সঙ্গম করা।

* অন্যের উপস্থিতিতে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা।

* এমন মনোভাব নিয়ে বিবাহে মহর ধার্য করা যে স্ত্রী মহর চাইলেও মহর আদায় করবে না।

* একাধিক স্ত্রীর বেলায় একজনকে অন্যায়ভাবে অগ্রাধিকার দেয়া।

* স্ত্রীর জরুরী হকসমূহ আদায় না করা; যেমন মহর, খোরপোষ ইত্যাদি।

* নিজ স্বামীর জরুরী হক আদায় না করা; যেমন শরয়ী কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও স্বামীকে আনন্দ উপভোগে বাধা দেয়া।

* কোন শরয়ী সমস্যা ব্যতীত মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা।

* মুসলমান ভাইয়ের থেকে এভাবে বিমুখ থাকা যে যখন সে তার সাথে মিশতে আসে তখন মুখ ঘুরিয়ে নেয়া।

* স্বামীর অনুমতি থাকলেও নারীর জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে এবং সাজগোজ করে বাইরে যাওয়া।

* স্ত্রীর জন্য স্বামীর নাফরমানী করা।

কোন কষ্ট ও সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া।

* চারমাস বা তদপেক্ষা বেশি সময় স্ত্রী সহবাস না করার কসম খাওয়া।

* নিজ বিবাহিতা স্ত্রীকে এমন কোন নারীর সাথে উপমা দেয়া যে তার জন্য চিরস্থায়ী হারাম। যেমন-স্ত্রীকে বলা যে তুমি আমার নিকট আমার মাতার পৃষ্ঠ দেশের ন্যায় (হারাম)।

* সৎ পুরুষ ও সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচার বা সমকামিতার অপবাদ দেয়া।

* কোন মুসলমানকে গালি দেয়া এবং তাকে অসম্মান করা।

* নিজে গালি না দিলেও পিতা-মাতাকে অন্যে গালি বা অভিশাপ দেওয়ার কারণ হওয়া।

* কোন মুসলমানকে অভিশাপ দেয়া।

* ইদ্দত পূরণের ক্ষেত্রে খিয়ানত করা।

* ইদ্দত পালনকারীনী মহিলার ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই শরয়ী কোন ওযর বা প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হওয়া।

* স্বামীর মৃত্যু ব্যথায় শোক পালন না করা।

* শরীয়তের নীতি অমান্য করে স্ত্রীর খোরপোষ ও পোষাকাদি না দেয়া।

* নিকট আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

* এক পশুকে অন্য পশুর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত করে দেয়া।

* আত্মহত্যা করা।

* হত্যাকাণ্ড প্রতিহত করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তথায় উপস্থিত থেকে প্রতিহত না করা।

* কোন মুসলমানকে ভীতি প্রদর্শন করা।

* কোন মুসলমানের দিকে অস্ত্র ইত্যাদি তাক করা।

* যাদু শিক্ষা করা।

* যাদু শিক্ষা দেয়া।

* গণক পেশা অবলম্বন করা।

জ্যোতিষী পেশা অবলম্বন করা।

* অশুভ লক্ষণ মান্য করা।

* পাখীর সাহায্যে (ফালনামা) শুভাশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা।

* জাগতিক হাল অবস্থা জানার জন্য নক্ষত্রের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা।

* হস্তরেখার সাহায্যে ভালমন্দ জানার চেষ্টা করা।

* জ্যোতিষীর নিকট গমন করা।

* ফাল গণনাকারীর নিকট গমন করা।

* অশুভ লক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে অশুভ লক্ষণ গণনাকারীর নিকট যাওয়া।

* হস্তরেখাবিদের নিকট ভাল-মন্দ জানার উদ্দেশ্যে যাওয়া।

* সৎলোককে সরিয়ে তদস্থলে তার চেয়ে তুলনামূলক কম সৎলোককে বিচারক নিয়োগ করা।

* মযলূমকে সাহায্য করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সাহায্য না করা।

* যালিমের যুলুমকে সমর্থ করে তার নিকট যাওয়া।

* যালিমকে যুলুম করার কাজে সাহায্য করা।

* কোন মুসলমানকে অসম্মান করা এবং তার দোষ তালাশ করা এমন কি তাকে মানুষের সামনে অপমান-অপদস্থ করা।

* জনসমক্ষে সাধু সাজা, আড়ালে পাপ করা, পাপ যদিও ছোট হয়।

* ব্যভিচার করা।

* লাওয়াতাত (পুং মৈথন) করা।

* কোন জন্তুর সাথে মৈথুন করা।

* পরনারীর সাথে মৈথুন করা।

* নারীর সাথে এমন আচরণ করা (পুরুষ নারীর সাথে যে আচরণ করে থাকে)।

* ব্যভিচার করার জন্য কোন নারীকে আটক করা।

* শরাব পান করা, নেশা যদি নাও হয়।

* নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা।

* সম্পদ ছিনতাই করার জন্য আক্রমণ করা।

* ব্যভিচার করার জন্য হামলা করা

* ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য হামলা করা।

* কারো ঘরের ভিতরে মালিকের অনুমতি ছাড়া ছিদ্র দিয়ে দেখা।

* যে ব্যক্তি তার কথা শোনাতে চায়না,তার সে কথার দিকে কান লাগানো।

* জীবন ও সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকা সত্ত্বেও নেক কাজের হুকুম না করা।

* প্রতিশ্রুতি অনুপাতে কাজ না করা।

* সালামের উত্তর না দেয়া।

* মনে এ ইচ্ছা পোষণ করা যে লোকজন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

* খিয়ানতকারীকে লুকিয়ে রাখা (আশ্রয় দেয়া)।

* মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি প্রকাশ করে দেয়া।

* জেনে বুঝে কারো অধিকার (হক) ক্ষুণ্ন করার জন্য মিথ্যা শপথ করা।

* যে কোন ধরনের মিথ্যা কসম করা।

* মান্নত পূর্ণ না করা। মান্নত যদি সওয়াবের হয়, যেমন কেউ মান্নত করল যে, যদি অমুক কাজ হয়ে যায় তবে আল্লাহর নামে নফল নামায পড়বে, অথবা বিশেষ শর্তের ফলে কাজটি আবশ্যক হয় পড়েছে।

* অসত্য ও অন্যায় পক্ষকে সহযোগিতা করা।

* ঘুষ গ্রহণ করা যদিও সঠিক ফয়সালা (রায়) করেই নেয়া হোক।

* অন্যায় পন্থায় ঘুষ দেয়া।

* ঘুষ লেনদেনের ক্ষেত্রে মাধ্যম হওয়া।

* সুপারিশের পরিবর্তে উপহার বা উপঢৌকন গ্রহণ করা।

* কোন আলোচনার মাঝে বিঘ্ন সৃষ্টির লক্ষ্যে অহেতুক বিদ্রূপাত্মক কথা বলে ফেলা।

* বণ্টনকারী বণ্টন কার্যে কোনরূপ পক্ষপাতিত্বের আশ্রয় নেয়া।

* মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

* মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ করা।

* জুয়াখেলা, একাকীভাবে কিংবা বাজী ধরার মাধ্যমে

* বিশেষ কোন সুন্দরী রমণীর রূপ-সৌন্দর্যের আলোচনা করা। যদিও অশ্লীল কোন ইঙ্গিত না করা হোক।

* প্রেম-প্রীতির কবিতা পাঠ করা।

* এমন কোন কবিতা বলা বা আবৃত্তি করা যাতে কোন মুসলমানের কুৎসা বিদ্যমান।

* এমন কোন কবিতা আবৃত্তি করা যাতে অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা আছে।

* এমন কবিতা আবৃতি করা, যাতে গর্হিত মিথ্যার ছড়াছড়ি।

* কবীরা গুনাহ থেকে তাওবা না করা।

* কোন আনসারী সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

* কোন সাহাবীকে গালি দেয়া।

* জানা সত্ত্বেও নিজের নয় এমন জিনিস নিজের বলে দাবী করা।

বেগানা মহিলাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

গীবতের ভয়াবহতা ও ক্ষতি

গীবত হচ্ছে-কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা। তা সত্য হলেই গীবত বলে গণ্য হবে। আর সত্য না হলে, তাহাকে বুহতান বা অপবাদ- যা আরো মারাত্মক। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গীবতের ক্ষতির কথা বর্ণনা করেছেন। গীবত কারীকে আপন ভাইয়ের মৃতদেহের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে উপমা দিয়েছেন। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-"কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণা কর।" (হুযূরাতঃ ১২)

হাদীস শরীফে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাক, গীবত ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য।

গীবতের এমন জঘন্যতার কারণ হচ্ছে, মানুষ ব্যভিচার করে আল্লাহর কাছে নিষ্ঠার সহিত তওবা করলে আল্লাহ তা'আলা তা কুবুল করেন। কিন্তু গীবত হচ্ছে হক্কুলইবাদ (বা বান্দার হক)। বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা না করবে, পাপীর এই পাপ মোচন হবে না।

হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "গীবত হচ্ছে কারো অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে এমন সব কথা বলা, যেগুলো

শুনলে সে অপছন্দ করবে।" এসব দোষচর্চা সে ব্যক্তির দেহ, বংশ, কথা, কাজ, ধর্ম, দুনিয়া, আখেরাত এমনকি তার পোষাক-পরিচ্ছদ ও আরোহনের জন্তুর সাথে সম্পর্কিত হলেও তা গীবত বলে পরিগণিত হবে।

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন, যদি একথাও বলা হয় যে, অমুক ব্যক্তির গায়ের পোশাকটি লম্বা অথবা খাটঃ আর এর দ্বারা তাকে হ্যায় প্রতিপন্ন করা হয়, তা হলে এটাও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে। অতএব, কোন ব্যক্তির পোশাক সম্পকে এতটুকু বলার দ্বারা যদি গীবত হয়, তা হলে স্বয়ং সেই ব্যক্তির দোষচর্চা ও সমালোচনা করা কত জঘন্য ও মারাক হবে!

বর্ণিত আছে, একদা বেটে একত্মজন মহিলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে কোন প্রয়োজনে উপস্থিত হয়। প্রয়োজন শেষে মহিলা বিদায় নেয়ার পর হযরত আয়িশা (রাঃ) বললেন, 'মহিলাটি কি বেটে'। হুযূর বললেন ঃ 'হে আয়িশা! এ দ্বারা তুমি সেই মহিলার গীবত করলে।"

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমরা অপরের গীবত করা থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কর। কারণ, গীবতের ভিতর তিনটি মারাত্মক বিপদ রয়েছেঃ এক. গীবতকারী ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না। দুই. তার কোন নেক আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। তিন. তাকে অসংখ্য পাপরাশির বোঝা বহন করতে হয়।"

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন-হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ "মিরাজের রাত্রিতে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম, যারা নিজেদের মুখমন্ডল বিরাট আকারের ধারাল নখের দ্বারা আঁচড়াতে ছিল এবং গলিত পঁচা লাশ ভক্ষণ করছিল। জিবরাঈল (আঃ) কে এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বললেন- "মরা দুনিয়াতে (অন্যের গীবত করে) মরা লাশের গোশত খেত।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো (গীবত করে তার) গোশত ভক্ষণ করেছে, কিয়ামতের দিন তার সম্মুখে গীবতকৃত ব্যক্তির গোশত পেশ করা হবে এবং বলা হবে-এই নাও দুনিয়াতে যার জীবিত অবস্থায় গোশত ভক্ষণ করেছিলে, এখন তার মৃতদেহের গোশত ভক্ষণ করা। অতঃপর তাকে এই পঁচা গোশত খেতে বাধ্য করা হবে।"

আবু হাফস কবীর (রহঃ) বলেন-"এক রামজান মাস রোযা না রাখা এতটুকু জঘন্য নয়-যতটুকু জঘন্য একজন লোকের গীবত করা।"

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-"তোমরা গীবত থেকে সতর্ক থাক এবং পুরোপুরিভাবে তা পরিহার কর। কেননা, গীবত ব্যভিচারের চাইতেও জঘন্য।" কারণ, এই পাপী আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে, আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন, কিন্তু গীবতের জন্য গীবতকৃত ব্যক্তির মার্জনা ব্যতীত আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। অতএব, গীবত হয়ে গেলে প্রথমতঃ বান্দার নিকট থেকে মাফী হাসিল করা উচিত, সেই সঙ্গে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তওবা করা উচিত, যাতে আল্লাহর হুকুমের অমান্যতাও মাফ হয়ে যায়। তাহলেই পূর্ণ মুক্তির আশা করা যেতে পারে।

হাদীসে ভুলক্রমে কেউ গীবত করে ফেলে, তাহলে গীবতকারী ব্যক্তির উচিৎ, মজলিস থেকে উঠার পূর্বেই তওবা ও ইস্তিগফার করা এবং যার গীবত করেছে-সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাহার করে তার প্রশংসা করা। যাতে যার গীবত করা হয়েছে, তার কাছে নিন্দাবাদ পৌঁছার পূর্বেই তওবা হয়ে যায়। এভাবে তার তওবা তাড়াতাড়ি কবুল হবে। অন্যথায় বান্দা মাফ না করা পর্যন্ত তার এই অপরাধ ক্ষমা হবে না।

গীবত করাও যেমন নাজায়িয, গীবত শুনাও নাজায়িয ও গুনাহ। তাই কারো সামনে অন্য কারো গীবত হতে থাকলে, ক্ষমতা থাকলে তা বাধা দেয়া উচিত। অন্যথায় তাকে ঘৃণা করে সেখান থেকে প্রস্থান করা কর্তব্য।

গীবত করা অনেকের নিকট ঘি-ভাতের মত মজাদার অনূভূত হয়। অথচ তার দরুণ যে তার আমল নামার নেকী বরবাদ হচ্ছে এবং গুনাহে ভরে যাচ্ছে, সেই অনুভূতি পর্যন্ত নেই। এভাবে নিজের বিরাট ক্ষতি নিজে করা চরম মূর্খতা বৈকি! তাই অপরের গীবত ও দোষচর্চা থেকে আমাদের সাবধান থাকা উচিত।

৩য় অধ্যায়

নাজাছাত এর বিধি-বিধান

মাসআলা ঃ নাপাক দু'প্রকার (১) নাপাকে গালীযা, (২) নাপাকে খফীফা। নাপাকে গলীযা অর্থ ঃ অত্যন্ত বেশী নাপাক, একটু লেগে গেলেই তা ধৌত করার আদেশ রয়েছে। নাপাকে খফীফা অর্থ অল্প এবং হালকা নাপাক।

মাসআলা ঃ রজ, মানুষের প্রশ্রাব-পায়খানা, বীর্য, কুকুর, বিড়ালের প্রশ্রাব-পায়খানা শুকরের গোশত লোম ও হাড্ডি ইত্যাদি, ঘোড়া, গাধ, মেষ, ছাগল প্রভৃতি সমস্ত পশুর মল, হাঁস, মোরগ এবং পান কৌড়ির মল, গাধা, খচ্চর ইত্যাদি হারাম পশুর প্রশ্রাব নাপাকে গলীযা।

মাসআলা ঃ দুধ পানকারী শিশুর প্রশ্রাব-পায়খানাও নাপাকে গলীযা।

মাসআলা ঃ অবৈধ পাখির পায়খানা এবং গরু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি বৈধ পশুর প্রশ্রাব এবং ঘোড়ার প্রশ্রাব নাপাকে খফীফা।

মাসআলা ঃ মোরগ,মুরগী, হাঁস, পানকৌড়ি ছাড়া অন্য হালাল পাখির পায়খানা পবিত্র। যেমন, কবুতর, চড়ুই, শালিক, ইত্যাদি, চামচিকার প্রশ্রাব এবং পায়খানা দোনটাই পবিত্র।

মাসআলা ঃ পাতলা প্রবাহিত গলীযা এক দিরহাম পর্যন্ত শরীরে অথবা কাপড়ে লেগে গেলে তা মাফ। ভুলে অথবা অন্য কোন কারণে যদি এক দিরহাম পর্যন্ত নাপাক নিয়ে নামায পড়ে তখন নামায হয়ে যাবে, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ঐ নাপাক বস্তু নিয়ে নামায পড়া মাকরূহ। ভুলবশত যদিও এক দিরহামের বেশী নাপাক নিয়ে নামায পড়ে তাহলে নামায হবে না। পুণরায় আবার পড়তে হবে। নাপাকে গলীযা যদি ঘন হয় যথা পায়খানা, মুরগী ইত্যাদির লেদ যদি ওজনে সাড়ে চার মাশা বা তার চেয়ে কম হয় তা ধৌত না করে নামায পড়া বৈধ হবে। এর থেকে বেশি হলে ধৌত করা ব্যতীত নামায পড়া জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ নাপাকে খফীফা যদি শরীরে অথবা কাপড়ে লেগে যায় তবে যে অংশে লেগেছে সে অংশের চার ভাগের এক ভাগের কম হয় তা নিয়ে নামায পড়া বৈধ হবে। যদি পূর্ণ চার ভাগের এক ভাগ অথবা তার চেয়ে বেশি হয় তা সাথে নিয়ে নামায পড়া বৈধ হবে না। কাপড়ের অংশ যেমন, আস্তিন, কল্লি, আঁচল ইত্যাদি। শীরের অংশ যেমন ঃহাত, পা, ইত্যাদি। যদি এ সমস্ত থেকে চার ভাগের এক ভাগ অথবা তার থেকে বেশি হয় তা নিয়ে নামায পড়া জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ কোন জামা-কাপড়ে অপবিত্র তৈল লাগলে যদি তার পরিমাণ এক দিরহাম থেকে কম হয়। তবে তা পবিত্র। কিন্তু যদি দুই এক দিন পর তা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক দিরহাম থেকে বেড়ে যায় তখন তা ধৌত করা জরুরী। ধৌত করা ব্যতীত নামায পড়লে নামায বৈধস্ত হবে না।

মাসআলা ঃ মাছের রক্ত অপবিত্র নয়। যদি কোন জামা কাপড়ের বা শরীরে লেগে যায় তার দ্বারা কোন অসুবিধা হবে না।

অপবিত্র বস্তু পবিত্র করার পদ্ধতি

মাসআলা ঃ নাপাক দু'প্রকার ঘন এবং পাতলা। ঘন (গাঢ়) নাপাক যেমন ঃ পায়খানা, রক্ত, জামা-কাপড় অথবা শরীরে লাগলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল এই যে, নাপাকের জায়গা এমনভাবে ধৌত করবে যেন কোন আলামত না থাকে। যদি একবার ধৌত করার দ্বারা দাগ চলে যায়। তবুও পবিত্র হয়ে যাবে। তিন বার ধৌত করা ওয়াজিব হবে না, যদি একবার ধৌত করায় দাগ চলে গেলে পুণরায় আরও দুবার ধৌত করা এবং দুবারে দাগ চলে গেলে তৃতীয়বার ধৌত করা মোস্তাহাব। সারকথা হল, একবার অথবা দু'বার দাগ চলে গেলে পবিত্র হয়ে যাবে। তবে তিনবার করা মোস্তাহাব।

মাসআলা ঃ যদি এমন কোন অপবিত্র বস্তু লেগে থাকে যে, তিন চার বার ধৌত করা সত্বেও এবং ঐ অপবিত্র বস্তু চলে গিয়ে পবিত্র হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কিছু নিদর্শন অথবা দুর্গন্ধ থেকে যায়, তাতে কোন অসুবিধা নেই। সাবান ইত্যাদি লাগিয়ে দাগ অথবা দুর্গন্ধকে পরিপূর্ণ ভাবে পরিষ্কার করা ওয়াজিব নয়।

মাসআলা ঃ পানি জাতীয় তরল নাপাক লাগলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল, কমপক্ষে তিনবার ধৌত করবে ও প্রত্যেকবার খুব উত্তমভাবে ভাল করে নিংড়াবে। তৃতীয়বার খুব ভালভাবে নিংড়াবে ভালভাবে না নিংড়ালে কাপড় পবিত্র হয় না।

মাসআলা ঃ পানির দ্বারা ধৌত করার দ্বারা যে রূপ পবিত্র করা হয় ঐ রকম ভাবে যে সমস্ত বস্তু পানির মত তরল এবং পবিত্র তা দ্বারাও ধৌত করে পবিত্র করা যায়। যথা গোলাপ জল, আরকে গাও জবান, খেজুর গাছের রস, আখের রস, তালগাছের রস, ছিরকা ইত্যাদি। কিন্তু তৈল জাতীয় পদার্থ দ্বারা ধৌত করলে পবিত্র হবে না। অপবিত্রই থেকে যাবে। যেমন ঃ দুধ-ঘি তৈল ইত্যাদি।

মাসআলা ঃ এমন বস্তুতে যদি নাপাকী লাগে যা নিংড়ানো সম্ভব নয় যেমন ঃ খাট, মাদুর, পাটি, চাটাই, মাটির পাত্র, কলসি, বাসন, চিনা মাটির বাসন, পাত্র,

বোতল, জুতা ইত্যাদি তবে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল, একবার ধৌত করে এমনভাবে রেখে দিবে যে, সমস্ত পানি ঝরে পড়ে যায়। পানি ঝরা বন্ধ হলে পুণরায় আবার ধৌত করবে। এইভাবে ৩বার ধৌত করলে ঐ বস্তুটি পবিত্র হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ জুতা অথবা চামড়ার মোজায় রক্ত, পায়খানা, গোবর ঘন বীর্য ইত্যাদি ঘন নাপাক লাগলে তা যদি মাটিতে খুব ভালভাবে ঘষে অথবা শুকনা হলে নখ দিয়ে যদি খুঁটে উঠিয়ে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে ফেলা হয় এবং কিঞ্চিত পরিমাণ নাপাক না থাকে। তবে তা সে অবস্থায় ই পবিত্র হয়ে যাবে। ধৌত না করলেও চলবে। কিন্তু প্রশ্রাবের মত তরল নাপাক লাগলে তা ধৌত করা ছাড়া পবিত্র হবে না।

মাসআলা ঃ কোন কোর্তা কাপড় এবং শরীরে ঘন বা পাতলা নাপাক লাগলে ঐ নাপাক ধৌত করা ছাড়া কোন পদ্ধতিতেই পবিত্র হবে না।

মাসআলা ঃ কাঁচের আয়না, ছুরি, চাকু, স্বর্ণ, রৌপ্যের অলংকার, পিতল তামা, লোহা ইত্যাদি দ্বারা তৈরি প্লেট, বাসন, বদনা, কলসী ইত্যাদি অপবিত্র হলে উক্ত দ্রব্যাদি খুব ভাল ভাবে মুছে, ঘসে অথবা মাটির দ্বারা মেজে ফেলার দ্বারাই পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু এ জাতীয় কারুকার্জ বস্তু উল্লেখিত পদ্ধতিতে পানির সাহায্যে ধৌত করা ছাড়া পবিত্র হবে না।

মাসআলা ঃ জমিনের উপর/মাটির উপরিভাগে কোন অপবিত্র বস্তু পড়ে যদি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, নাপাকের কোন আলামতের লেশ মাত্রও নেই। তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে। তখন ঐ জমিনের উপর নামায পড়া জায়েয হবে। কিন্তু ঐ মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না। যে ইট অথবা পাথর সুরকী চুন দিয়ে জমিনের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে তাও ঐ রূপভাবে শুকালে পবিত্র হয়ে যাবে। ঐ জমিনের উপরিভাগে নামায পড়া জায়েয হবে, কিন্তু তায়াম্মুম করা বৈধ হবে না।

মাসআলা ঃ যে ইটকে সুরকী, চুন ছাড়া শুধু বিছানা হয়েছে। তাতে নাপাক লেগে শুকিয়ে গেলে তা পবিত্র হবে না।

মাসআলা ঃ যে ঘাস জমিনের সাথে সম্পর্ক তাও জমিনের হুকুমের মত। শুধু শুকালে এবং অপবিত্র জিনিসের আলামত চলে গেলে পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু কর্তন কৃত ঘাস ধৌত করা ছাড়া পবিত্র হবে না।

মাসআলা ঃ অপবিত্র ছুরি, চাকু, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদি উত্তপ্ত অগ্নির মধ্যে ফেলে পোড়ালেও তা পবিত্র হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ যদি হাতে কোন অপবিত্র বস্তু লাগে এবং কোন ব্যক্তি জিহ্বা দিয়ে তিনবার চেটে নেয়, তবে তা পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ করা নিষেধ। শিশু মায়ের বুক হতে দুধ পান করার সময় বমি করলে উক্ত জায়গা অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু যদি শিশু বমি করে আবার সেই জায়গা তিনবার চেটে চুষে থাকে। তখন মায়ের শরীর পবিত্র হয়ে যাবে। আবশ্য শিশু কে এরকম করতে দেওয়া সমুচিত নহে।

মাসআলা ঃ মাটির কোন নতুন হাড়ি কলস অথবা বদনা লোটা যদি নাপাক চুষে থাকে। তবে সে অবস্তায় শুধু ধৌত করার দ্বারা পবিত্র হবে না। তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল; তখন ঐ পানি ফেলে পুণরায় নতুন পানি ভর্তি করে রেখে দিবে। এরূপ বারবার যখন ভর্তি করে রাখবে। যখন দেখবে, যে, পানির মধ্যে নাপাকের (রং অথবা গন্ধ) কোন আলামতই দেখা যায় না। তখন তা পবিত্র হবে।

মাছায়েল ঃ অপবিত্র মাটির দ্বারা যদি হাড়ি, পাতিল, কলসী প্রস্তুত করা হয় তবে তা শুকানোর আগ পর্যন্ত অপবিত্র থাকবে। আগুন দিয়ে পোড়ান হলে পবিত্র হয়ে যাবে।

মাছায়েল ঃ মধু, চিনি অথবা মিসরির শিরা তৈল অথবা ঘি ইত্যাদি অপবিত্র হলে উক্ত দ্রব্যাদি পবিত্র করার নিয়ম হল যে পরিমাণ তৈল অথবা শিরা সেই পরিমাণ পানি তাতে মিশ্রন করে উত্তাপে পানিটা উড়ায়ে দিবে যখন সব পানি উড়ে যাবে তখন পুণরায় আবার ঐ পরিমাণ পানি মিশ্রন করে জ্বাল দিবে এরূপ তিনবার করার দ্বারা ঐ তৈল বা শিরা পবিত্র হয়ে যাবে। দ্বিতীয় নিয়ম হল তৈল ঘি ইত্যাদির সাথে তার পরিমাণ মত পানি মিলিয়ে তাতে নাড়াচাড়া দিলে তেলটা উপরে ভেসে উঠবে। এরপর ধীরে ধীরে কোন পদ্ধতিতে উপর হতে তৈলটা উঠিয়ে নিবে। এভাবে তিনবার করলে ঐ তৈল বা ঘি পবিত্র হয়ে যাবে। যদি জমাটকৃত ঘি হয়, তবে পানি মিশ্রন করে রৌদ্রে অথবা আগুনের তাপের উপর রাখবে। ঘি গলে উপরে ভেসে উঠলে তারপর উল্লেখিত পদ্ধতিতে নিবার উঠালে উক্ত ঘি তৈল পবিত্র হয়ে যাবে।

নাপাক বিছানা ঘামে ভিজে গেলে তার হুকুম

নাপাক বিছানার উপর ঘুমানোর পর ঘামে বিছানাটি বেশি ভিজে যাওয়ার কারণে যদি তার ভিজা ভাব কাপড় এবং শরীরে লেগে যায় তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। তা না হলে নাপাক হবে না।

(আহসানুল ফাতওয়াঃ খণ্ড-২ পৃষ্ঠা-৯৯)

ফ্লোর বা কার্পেট পাক করার পদ্ধতি

ফ্লোর শুকিয়ে গেলে পাক হয়ে যায়। তবে মসজিদের পবিত্রতার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব জলদী করা উচিত। এ জন্য সেই ফ্লোর ধূয়ে পাক করতে হবে। তিনবার ধোয়া যথেষ্ট।

আর কার্পেট ইত্যাদি তিনবার ধূয়ে পাক করতে হবে। তার পদ্ধতি এমন হবে যে, যদি তা নিংড়ানো কষ্টসাধ্য হয় তাহলে তাকে প্রথমে পানি দ্বারা ভালভাবে ধূয়ে উঁচু কোন স্থানে ঝুলিয়ে রাখবে। যখন কার্পেট থেকে পানির ফোঁটা পড়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন পুনরায় পানিতে ধূয়ে আবার ঝুলিয়ে দিবে। একইভাবে তিনবার করতে হবে। আর যদি নিংড়ানো কষ্টসাধ্য না হয় তাহলে তিনবার ধুয়ার পরপর নিংড়াতে হবে।

(প্রমাণ দুররুল মুখতার ঃ খণ্ড-১, পৃঃ-২৪০-৪৩, বাহহরুর রায়েক ঃ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-২৩৬-৩৮, আহসানুল ফাতওয়াঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯২)

মাছায়েল ঃ অপবিত্র রং দ্বারা কাপড়কে রঙ্গালে তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল উক্ত কাপড়টি কয়েক বার ধৌত করতে হবে কমপক্ষে ৩বার। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত রঙ্গিন পানি ঐ কাপড় থেকে বের হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধৌত করতে হবে। যখন দেখবে যে আর রং বের হচ্ছে না তখন ঐ কাপড়কে পবিত্র বলে গণ্য করা হবে।

মাসআলা ঃ গাভী, মেষ ইত্যাদির গোবর শুকালে তা যদিও অপবিত্র থাকে তবে তা রান্নার কাজে ব্যবহার করা বৈধ এবং যে ধোয়া বের হয় তা অপবিত্র নহে। সুতরাং হাতে অথবা কাপড়ে ধোয়া, লাগলে তা অপবিত্র হবে না। এবং উক্ত গোবরকে পুড়িয়ে যে ছাই বের হবে তাও অপবিত্র নয়। সুতরাং যদি ঐ ছাই শরীরে কাপড়ে বা রুটি ইত্যাদিতে লাগে তবে তাতে তোন ক্ষতি নেই।

মাসআলা ঃ বিছানার যদি কোন এক কোণায় অপবিত্র থাকে এবং বাকী পুরা অংশ পবিত্র, এখন ঐ পবিত্র অংশে নামায পড়া জায়েজ আছে, কোন অসুবিধা নেই।

মাসআলা ঃ যে সমস্ত জমিন ঘর/উঠান/আঙ্গিনা গোবর দিয়ে লেপন করা হয়েছে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। সুতরাং ঐ ঘর/জমিনের উপর অন্য কোন পবিত্র বস্তু না বিছিয়ে নামায পড়া জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ যে সমস্ত জমিনকে গোবর দিয়ে লেপন করা হয়েছে তা শুকিয়ে গেলে, ঐ জমিনের উপরিভাগে ভিজা কাপড় বিছিয়েও নামায পড়া জায়েয আছে। যদি এরূপ ভিজা হয় যে, গোবর কাপড়ে লেগে যাওয়ার সম্বাবনা আছে। তখন ঐ অবস্থায় ঐ জমিনের উপর নামায পড়া দুরস্ত হবে না।

মাসআলা ঃ পা ধৌত করে খুব ভালভাবে মুছে যদি অপবিত্র স্থান দিয়ে হেটে যায় এবং পায়ের নিদর্শন মাটিতে পড়ে থাকে তবে তাতে পা অপবিত্র হবে না। কিন্তু যদি পায়ের সাথে এত পানি লেগে থাকে যে ঐ পায়ের সাথে ঐ অপবিত্র মাটি অল্প অল্প লেগে যায় তবে পা অপবিত্র হয়ে যাবে। পা ধৌত না করে নামায পড়া দুরস্ত হবে না।

মাসআলা ঃ অপবিত্র বিছানায় যদি শয়ন করে তাতে শরীর অথবা কাপড় অপবিত্র হবে না। কিন্তু যদি শরীর থেকে এত বেশি ঘাম নির্গত হয় যার দ্বারা শরীর এবং কাপড় ভিজে বিছানার নাপাকের সাথে মিশ্রণ হয়ে যায়। তবে ঐ ঘাম অপবিত্র হয়ে যাবে এবং ঐ ঘাম যে অঙ্গে অথবা কাপড়ে লাগবে তাও অপবিত্র হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তি অপবিত্র মেহেদী হাতে অথবা পায়ে লাগায় তা পবিত্র করার পদ্ধতি হল, হাত পা খাব ভাল ভাবে ধৌত করবে (কমপক্ষে তিন বার) যখন ধৌত করা পানির সাথে রং বের না হয় তখন হাত-পা পবিত্র হয়ে যাবে। হাতে পায়ে শুধু রংয়ের চিহ্ন থাকলে কোন ক্ষতি হবে না। তা উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব নয়।

মাসআলা ঃ অপবিত্র মুরমা চোখে লাগালে তা ধৌত করে পবিত্র করা ওয়াজিব নয়। যদি চোখের মধ্যে হতে কিছু অংশ চোখের বাহিরে আসে, সুতরাং তা ধৌত করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ অপবিত্র তৈল মাথায় অথবা দেহে লাগালে, তিনবার ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যাবে। সাবান অথবা অন্য কিছুর সাহায্যে ঐ তৈলকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন নেই।

মাসআলা ঃ ভাত, আটা-ময়দা ইত্যাদি কোন শুকনা-খাদ্য বস্তু যদি কুকুর অথবা বানরে মুখ দিয়ে নষ্ট করে থাকে তখন তাতে সমস্ত ভাত, রুটি ইত্যাদি অপবিত্র হয় না। যতটুকু স্থানে তার মুখ অথবা মুখের লালা লেগেছে ততটুকু অপবিত্র হয়েছে। ততটুকু পরিমাণ খাদ্য বস্তু ফেলে দিলে বাকী অংশ অবিত্র হয়ে যাবে এবং তা খাওয়া জায়েয হবে।

মাসআলা ঃ কুকুরের লালা এবং গোশত অপবিত্র, সুতরাং কুকুর পানিতে মুখ দিলে অথবা কোন ব্যক্তির দেহ চুষলে সেই পানির পাত্র এবং দেহ অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু জিবিত কুকুরের দেহের উপর অংশ শুকনা হোক অথবা ভিজা হোক নাজাসাত নয়। সুতরাং কুকুরের দেহে যদি কারও কাপড় লেগে যায় তবে সে কাপড় পবিত্র। কিন্তু যদি নাপাক কুকুরের দেহে লেগে থাকে তখন তার দেহ অপবিত্র হবে এবং তা কোর্তায় লাগলে কোর্তা অপবিত্র বলে গণ্য হবে।

মাসআলা ঃ গোবর দিয়ে আঙ্গিণা লেপার সময় অথবা গোবরে হাত লাগিয়ে হাত তিনবার পরিষ্কার করে ধৌত করার আগে যদি কোন মাটির বদনা অথবা কলসীতে হাত দেয়, তখন ঐ বদনা/কলসী এবং তার সমস্ত পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। পানি ফেলে দিতে হবে এবং বদনা ও কলস পবিত্র করার যে নিয়ম উপরে বর্ণনা করা হয়েছে সে পদ্ধতিতে পবিত্র করবে।

মাসআলা ঃ ভিজা কাপড় পরিধান করা অবস্থায় বায়ু বের হলে তাতে কাপড় অপবিত্র হবে না বরং পবিত্রই থাকবে।

মাসআলা ঃ অপবিত্র পানিতে ভিজা কাপড়ের সাথে পবিত্র কাপড় জড়িয়ে রাখলে যদি কাপড় খানা এতটুকু পরিমাণ ভিজে যায় যে, তাতে নাপাকের কিছু গন্ধ অথবা রং এসে পড়েছে বা নিংড়ালে অথবা এক ফোটা পানি নির্গত হয় অথবা হাত ভিজে যায়। তখন ঐ পবিত্র কাপড় ও অপবিত্র হয়ে যাবে। শুধু একটু একটু ভিজা ভিজা দেখালে তাতে কাপড় খানা অপবিত্র হবে না। অবশ্য যদি ঐ অপবিত্র কাপড়টি প্রশ্রাব ইত্যাদি কোন নাপাক দ্বারা ভিজা হয় তবে পবিত্র কাপড়টিতে সামান্য পরিমাণ চিহ্ন অথবা ভিজা ভিজা লাগলেই তা অপবিত্র হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ যদি কোন একটি কাঠের এক পিষ্ঠ পবিত্র এবং অপর পিষ্ঠ অপবিত্র হয় এবং তা এতটুকু মোটা হয় যা চিরে দুটি কাঠ বের করা যায়। তবে ঐ কাঠের পবিত্র পিঠে নামায পড়া জায়েয হবে। যদি ঐ পরিমাণ অনুযায়ী মোটা না হয় তবে পবিত্র পিষ্ঠেও নামায পড়া জায়েয হবে না।

মাসআলা ঃ দু পাটটা কাপড়ের এক পাটটা যদি অপবিত্র এবং অন্য পাটটা পবিত্র হয় এবং দোন পাটটা এক সাথে সিলাই করা হয় যখন পবিত্র পাটটার উপরিভাগে নামায পড়া বৈধ হবে না। কিন্তু সেলাই করা না হলে অপবিত্র পাটটা নিচে রেখে পবিত্র পাটটার উপরিভাগে নামায জায়েজ হবে।

মাসআলা ঃ নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত না ধুয়ে পাত্রের পানিতে হাত দিবে না। পানি পবিত্র হোক কিংবা অপবিত্র হোক। যদি পানি বদনা, লোটা ইত্যাদি ছোট পাত্রে থাকে তখন বাম হাত দিয়ে ঐ পানির পাত্রকে কাত করে পানি ঢেলে সর্বপ্রথম ডান হাত ৩বার ধৌত করবে। তারপর বদনা ডান হাতে নিয়ে কাত করে পানি ঢেলে বাম হাত ৩বার ধৌত করবে। পানি যদি মোটা কোন বস্তুর মধ্যে হয় যাকে কাৎ করা সম্ভব হবে না। তখন কোন ছোট পাত্রের সাহায্যে উক্ত জিনিস থেকে পানি উত্তোলন করে উল্লেখিত নিয়ম অনুসারে উভয় হাত ধৌত করবে। কিন্তু মটকা হতে পানি উঠাবার সময় এটা খেয়াল করবে যে, যেন পানিতে আঙ্গুল না ভিজে। যদি কোন ছোট্ট পাত্র যা মিলে এবং

এতটুকু ভক্তি থাকে যে, হাত পবিত্র আছে তাতে অপবিত্র হয়নি। তখন বাম হস্তের আঙ্গুলগুলোকে একেবারে চিপে কোশ্ বানাবে এবং যতটুকু সম্ভব কম অংশ পনিতে ডুবাবে। এবং কিছু কিছু পনি উত্তোলন করে ডান হাতকে তিন বার ধৌত করবে। তারপরে ডান হাত পবিত্র হয়ে গেলে, তারপর যতবার ইচ্ছা পানিতে ডুবিয়ে পানি উঠিয়ে বাম হাত ধৌত করবে। যদি হাত অপবিত্র হয় তখন কোন প্রকারেই মটকার মধ্যে হাত অথবা আঙ্গুল ঢুকাবে না, অন্য কোন পদ্ধতিতে পানি উত্তেলন করে সর্বপ্রথম হাতকে পবিত্র করবে তারপর পবিত্র হস্তের দ্বারা পানি উত্তোলন করে অন্য যে কর্ম থাকে করবে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ যদি পবিত্র রুমাল, গামছা বা তোয়ালিয়া নিকট থাকে তখন সেগুলোর শুকনো অংশ ধরে অন্য অংশ পানির ভিতর ভিজিয়ে মটকার বাইরে আনবে এবং তা হতে যে পানি নির্গত হবে সে পানির দ্বারা ডান হাত তিনবার ধৌত করবে। সাবধান! কোন অবস্থায় যেন ভিজা অংশে যেন ডান হাত অথবা বাম হাত না লাগে এ নিয়মে ডান হাতকে পবিত্র করে তা দ্বারা পানি উত্তোলন করে পরে বাম হাত তিন বার ধৌত করবে। খবরদার এভাবেও ডান হাত এবং বাম হাত ধৌত করার সময় দু হাত যেন একসাথে না মিলে।

মাসআলা ঃ প্রশ্রাব অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে যে নাপাকী বের হয়। তা হতে পবিত্র হওয়া সুন্নত। অর্থাৎ পায়খানা করলে মলদ্বার ছাড়া যদি অতিক্রম করে না থাকে। তখন ঐ অবস্থায় শুধু ঢিলা কুলূফ দিয়ে এস্তঞ্জা করা সুন্নত। এ অবস্থায় শুধু পানি দিয়েও পরিষ্কার করা যায়। ঢিলা দিয়ে কুলুফ ব্যবহার করে তার পর পানি দিয়ে ধৌত করা মোস্তাহাব।

মাসআলা ঃ পায়খানা যদি পায়খানার রাস্তার এপাশ-ওপাশ না লাগে এবং এ অবস্থায় যদি পানি দিয়ে ধৌত না করে বরং পাথর বা ঢিলা দ্বারা পরিষ্কার করে নেয়। যার কারণে ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং দেহ পরিষ্কার হয়ে যায় তখন এও বৈধ আছে। কিন্তু এ পরিচ্ছন্নতার বিপরীত। অবশ্য যদি পানি না থাকে অথবা কম থাকে তখন তা অক্ষমতার কারণ।

মাসআলা ঃ পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করার জন্য স্ত্রী কিংবা পুরুষ কারও সামনে লজ্জা স্থানকে খোলা দুরস্ত নেই। সুতরাং গোপন বা নির্জন জায়গা পাওয়া না গেলে পানি দিয়ে এস্তেঞ্জা করে শুধুমাত্র ঢিলা দিয়ে ভালভাবে এস্তেঞ্জা করে অযু করে নামায পড়ে নিবে। তবুও লজ্জা স্থানকে খুলবেনা। লজ্জা স্থানকে খোলা বড় গোনাহের কাজ।

মাসআলা ঃ হাড্ডি, অপবিত্র বস্তু গোবর, লেদী কয়লা, কাঁচ, পাকা ইট, খাদ্যদ্রব্য, কাগজ ইত্যাদি দিয়ে এবং ডান হাত দিয়ে এস্তেঞ্জা করা অন্যায় এবং নিষেধ। অবশ্য যদি কোন ব্যক্তি করে ফেলে তবে দেহ পবিত্র হয়ে যাবে।

জানাবাত সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা

মাসআলা ঃ স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করায় গোসল ফরয হয়ে যায় এবং তারা উভয়েই গোসল না করা পর্যন্ত শরীয়ত অনুযায়ী তাদের পবিত্র ধরা হয় না। অনুরূপভাবে স্বপ্নে মনি নির্গত হওয়া অথবা যে কোন উপায়ে উত্তেজনার সাথে মনি নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ অবস্থাটিকে জানাবাতের অবস্থা বলে, যার সম্পর্কে বহু হুকুম রয়েছে। এখানে বিশেষ জরুরী কয়েকটি মাসআলা বর্ণনা করা হলো ঃ

মাসআলা জানাবাত অবস্থায় শয়ন করা, পানাহার করা জায়েয আছে, তবে উত্তম হলো লজ্জাস্থান ধৌত করে এবং অযু করে পানাহার ও শয়ন করা। তবে অযু না করলে কমপক্ষে তায়াম্মুম করে নিবে। এতে নাপাকি হালকা হবে। তবে জানাবাত অবস্থায় এমনভাবে (ঘুমে) পড়ে থাকা যে নামাযই কাযা হয়ে যায়, খুবই খারাপ। এমন ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। অনুরূপভাবে একবার সহবাস করার পর দ্বিতীয় বার সহবাস করার জন্যে সমস্ত লজ্জাস্থান ধুয়ে নেওয়া ও অযু করে নেওয়া উত্তম।

মাসআলা ঃ জানাবাত অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা, স্পর্শ করা জায়েয নয়, হারাম। হায়েয ও নেফাসের নাপাকিতে কুরআন সম্পর্কে যে আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে জানাবাত অবস্থায়ও ঐ একই আহকাম।

মাসআলা ঃ হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য গোসলের যে পদ্ধতি জানাবাতের গোসলেরও ঠিক একই পদ্ধতি। খুব খেয়াল রেখে লজ্জাস্থানের অংশগুলো ভাল করে ধৌত করবে কারণ মনি শুকিয়ে গেলে খুব জলদি ধৌত করায় তা দূর হয় না, তাই ঐ অংশ নাপাক থেকে যায়। তদ্রূপ লক্ষ্য রাখবে যেন শরীরের কোন অংশ শুকনা না থাকে তাহলে গোসল হবে না। এজন্যই নাকের নরম অংশ পর্যন্ত ধৌত করা এবং কুলি করাও ফরয।

৪র্থ অধ্যায়

হায়েজ, নিফায ও ইস্তিহাযা সম্পর্কে আলোচনা

হায়েজ সম্পর্কে আলোচনা

حيض হায়েজ এটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল প্রবাহ নিঃসরণ, ঋতুস্রাব, মাসিক, রজঃস্রাব ইত্যাদি।

পরিভাষায় হায়েজ বলা হয় এমন রক্তকে যা প্রাপ্তা বরস্কা মহিলার জরায়ূ থেকে রীতিসিদ্ধ সময়ে বের হয়, সন্তান প্রসবের কারণে নয়।

* হায়েযের রক্ত মোট ছয় প্রকার।

কালো, লাল, হুলুদ, মলিন, সবুজ ও মেটে। (দরসে তিরমিযী- ১/৩৬১)

* **মাসআলা ঃ** হায়েজ সর্বনিম্ন ৩ দিন এবং সর্বোচ্চ ১০ দিন। যদি ৩ তিন ৩ রাত্রির কম বা ১০ দিনের বেশি রক্তশ্রাব হয় তাহলে তা হায়েজ নয়; বরং ইস্তি হাযা বা রোগ বলে গণ্য হবে। (বাহার)

মাসআলা ঃ হায়েজহ্গ্রস্ত মহিলাকে কোরআন পড়ে ফুঁক দেওয়া জায়েয আছে। (আহছানুল ফতোয়া-২/৬৮)

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলার ৭ দিন রক্ত আসার কথা ছিল কিন্তু কোন মাসে ৫ দিন পরেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তবে ৫ম দিন থেকেই নামায পড়বে তবে নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া ওয়াজিব। কিন্তু পাঁচ দিন অতিক্রম হওয়ার পূর্বে সহবাস করা জায়েজ নেই।

(আহছানুল ফাতোয়া- ১/ ৬৮)

* যে কাপড় পরা অবস্থায় হায়েজ অতিক্রম হয়েছে যদি কাপড়ে হায়েজের রক্ত না লাগে তাহলে শুধু হায়েজ এসেছে এ কারণে ঐ কাপড় খুলে ধৌত করা জরুরী নয়। (মুফাচ্ছল-১/৪৪)

* হায়েজের রক্তও অন্যান্য রক্তের মত। সুতরাং যদি তা কাপড়ে লেগে যায় তাহলে তা ধৌত করা জরুরী। অবশ্য যদি রক্ত ধোয়ার পরে রঙ থেকে যায় তাহলে কোন সমস্যা নেই। অবশ্য জাফরান বা এ জাতীয় কোন কিছু দ্বারা ঐ রঙ পরিবর্তন করে ফেলাই উত্তম। কেননা হায়েজর রঙ দেখতে অপছন্দনীয়। (মাফাচ্ছল-১/৪৩)

* হায়েজা মহিলার জন্য তার স্বামীর খেদমত করা এবং এক সাথে থাকা, খাওয়া-দাওয়া করা নিষেধ নয়। (মুফাচ্ছল-১/১৬১)

* হায়েজা মহিলার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং মাথার চুল আঁচড়িয়ে রাখা মুস্তাহাব। (মুফাচ্ছল- ১/১৬৫)

* মাসআলা ঃ সন্তান প্রসবের পূর্বে মহিলার যৌনাঙ্গ থেকে যে এক ধরনের পানি বের হয় মূলত এই পানি হায়েজ বা নেফাসের নয়; বরং এটা এক ধরনের নাপাক পানি। এর কারণে নামায মাফ হবে না; বরং ঐ অবস্থায়ও নামায পড়া ফরয। ঐ পানি যদি নামাযের এক ওয়াক্ত সময়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে বের হয় এবং কোন একটা মুহূর্তও খালি না তাহলে তাকে মাজুর গণ্য করা হবে। সুতরাং ঐ অবস্থায় নামায পড়লেও তা ছহীহ হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে কোন ধরনের গদি রাখলে যদি মহিলার কষ্ট না হয় এবং গদির কারণে ঐ নাপাক পানি যৌনাঙ্গের বাহিরে না আসে তাহলে গদি রাখা ওয়াজিব।

(ইমদাদুল আহকাম-১/৩৬৪)

* হায়েজ অবস্থায় নামাযের সময় জায়নামাযে বসে তাছবীহ পাঠ করা মুস্তাহাব।

* হায়েজ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে উঠে যদি দেখে যে, হায়েজ বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে ঘুমের সময় থেকেই পবিত্রতা ধরা হয়। যেমন-কোন মহিলা যদি হায়েজ অবস্থায় এশার নামায না পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি হায়েজ বন্ধ হয়েছে সুতরাং এশার নামায তাকে কাযা করতে হবে।

* পবিত্র অবস্থায় যদি কোন মহিলা এশার নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, হায়েজ শুরু হয়ে গেছে, তবে এ ক্ষেত্রে ফজরের ওয়াক্তের শুরুতে হায়েজ শুরু হয়েছে, সুতরাং এশার নামায কাযা করতে হবে। (ফাতোয়ায়ে শামী- ১/২৯১ মুহীতুল বুরহানী-১/৪০১)

* যদি কোন মহিলার প্রতি বারে ৭দিন রক্ত আসার অভ্যাস ছিল কিন্তু কোন মাসে যদি এর থেকে বেশি যেমন ৮/৯ দিন রক্ত আসে তাহলে তা হায়েজ হিসাবেই গণ্য করা হবে সুতরাং এই মাসে ১০ দিন পর্যন্ত নামায ছেড়ে দিতে হবে, তবে নিয়মিত অভ্যাসের থেকে বেশি দিন রক্ত প্রবাহিত হয়ে যদি ১০ দিনেও তা বন্ধ না হয় বরং ১১/১২ বা তার থেকেও বেশি দিন রক্ত আসে তাহলে প্রতিমাসের নিয়মিত অভ্যাসের দিন পর্যন্ত হায়েজ ধরা হবে এবং এর পরবর্তী দিনগুলোতে প্রবাহিত রক্তকে ইস্তেহাযা ধরা হবে। সুতরাং এক্ষেত্রে নিয়মিত অভ্যাসের পর থেকে যদি নামায ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহলে তা কাযা করতে হবে। (বাদায়ে ঃ ১/১৫৮ আলমগীরী- ১/৩৬ শামী-১/৩০০)

* ইনজেকশন বা ঔষুধ সেবন করার কারণে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে পবিত্রতা অর্জন করার পর স্ত্রী সম্ভোগ জায়েয। তবে হায়েয যেহেতু মহিলাদের

নিয়মিত একটি বিষয় শারীরিক দিক থেকে সুস্থ থাকার বড় কারণ। তাই বিশেষ প্রয়োজন এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত ঔষুধ বা ইনজেকশনের মাধ্যমে হায়েয কালে স্ত্রী সম্ভোগ না করাই উচিত।

(মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-১/৩১৮ মুগনী-১/৪৫০৬)

* অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে স্রাব বন্ধের ঔষুধ খেয়ে মাসিকের নির্ধারিত দিনেও তওয়াফ করে হজ্ব পালন করলেও মহিলার হজ্ব ও উমরা সহীহ হিসেবে গণ্য হবে।

(মুছান্নাাফে আব্দুর রাযযাক খঃ ১ পৃঃ ৩১৮, ফাতাওয়া আলমগীরী খঃ ১ পৃঃ ৩৮)

১। হায়েজ প্রতি মাসে একই তারিখে শুরু হওয়া জরুরী নয়; বরং কখনো এগিয়ে আসতে পারে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হরে যে, পূর্ববর্তী হায়েজ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী হায়েজ আসার মাঝে কমপক্ষে ১৫ দিন ব্যবধান থাকা আবশ্যক। সুতরাং পবিত্রতার ১৫ দিনের পূর্বে রক্ত দেখা দিলে তা হায়েজ হিসাবে গণ্য হবে না। বরং ইস্তেহাজা হবে। অর্থাৎ এ সময় স্রাব চালু থাকলেও প্রতি ওয়াক্তে ওযু করে নামায আদায় করতে হবে এবং রমযান মাস হলে রোযা রাখতে হবে। (আলমগীরী- ১/৩৬ খুলাছা-১/২৩২)

* হায়েজ শুরুর পরে হায়েজের নির্ধারিত সময়ের মাসে হায়েজ কখনো কখনো বন্ধ থাকতে পারে। ধাধারাহিকভাবে রক্ত প্রবাহিত হওয়া জরুরী নয়।

(শামী-১/২৮৪)

* যৌনাঙ্গে কুরছুফ রাখা অর্বস্থায় যদি তার উপর সাদা আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শুকানোর পরে তা হুলুদ বর্ণ ধারণ করে তাহলে ঐ আদ্রতা হায়েজ হিসাবে গণ্য হবে না। (আলমগীরী-১/৩৬)

* অনুরূপভাবে যদি কোন মহিলা যৌনাঙ্গে রাখা কুরসুফের উপর হলুদ বা লাল বর্ণের আর্দ্রতা প্রত্যক্ষ করে কিন্তু শুকিয়ে যাওয়ার পরে কুরসুফ সাদা পরিলক্ষিত হয়। তাহলে এ ক্ষেত্রে পূর্বের আদ্রতা হিসাবে ইহাকে হায়েজ হিসাবেই গণ্য করা হবে। কেননা এক্ষেত্রে মূল নীতি হল যৌনাঙ্গে কুরসুফ রাখা অবস্থায় যখন তা ভিজা থাকে সে সময়ের রং হিসাবেই হায়েজ বা সুস্ততা নির্ণয় করা হবে। কুরসুফ শুকানোর পরে যে রং ধারণ করে সে হিসাবে হুকুম দেওয়া যাবে না। (আলমগীরী- ১/৩৬)

* বিবাহিতা মহিলার গুপ্তাঙ্গে সর্বদা কুরছুফ বা এ জাতীয় কোন কিছু বেঁধে রাখা মুস্তাহাব। তবে হায়েজ অবস্থায় তা ব্যবহার করা সুন্নাত। কিন্তু কুমারী মহিলার জন্য হায়েজ অবস্থায় কুরছুফ ব্যবহার করা মুস্তাহাব।

(বাহরুররায়েক ১/১৯৩)

* কুরছুফ যদি যৌনাঙ্গের উপরের অংশে বাঁধা হয় তবে সে ক্ষেত্রে রক্তে যদি কুরসুফের ভিতরের অংশ ভিজে যায় তাহলে হায়েজ শুরুর বিধান কার্যকরী হবে। যদিও কুরসুফের বহিরের অংশ শুকনা থাকে। তবে কুরছুফ যদি মহিলার যৌনাঙ্গের ভিতরের অংশে বাঁধা হয় এবং কুরসুফ যদি মোটা হয় তাহলে এক্ষেত্রেও কুরছুফের শুধু ভিতরের অংশ ভিজে গেলেই হায়েজের বিধান কার্যকরী হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কুরছুফ যদি পাতলা হয় তাহলে শুধু কুরসুফের ভিতরের অংশ ভিজার দ্বারা হায়েজের বিধান শুরু হবে না।

(আল মুহীতুল বুরহানী- ১/৪০০)

* সহবাসের পরে গোছলের সময় মহিলাদের সমস্ত চুলে পানি পৌছানো ফরজ। সমস্ত চুল ধোয়া ব্যতীত মহিলা পবিত্র হয় না।

(আপকে মাছায়েল আওর উনকি হল- ৫১)

* হায়েজ-নেফাছ কোন রোগ নয়; বরং মেয়েদের প্রাকৃতিক নিয়ম। ইচ্ছা করে হায়েজ-নেফাছ বন্ধ করলে ক্ষতি হয়। তাই ঔষধ খেয়ে হায়েজ নেফাছ বন্ধ করা নিষিদ্ধ। (রহীমিয়া- ৬/৪০৪)

* রক্ত যোনীমুখ অতিক্রম করে যোনী কপাটে পৌছার পূর্বে যদি ঔষধ সেবন করে বা অন্য কোন উপায়ে হায়েজ-নেফাছ বন্ধ করে দেয় তাহলে সংশ্লিষ্ট মহিলা ঋতুমুক্ত হিসাবে গণ্য হবে এবং যথারীতি নামায-রোযা আদায় করতে হবে। (বাদায়ে-১/৩৯ বাহার-১/১৯৩)

১। **মাসআলা ঃ** নামায অবস্থায় যদি কোন মহিলার হায়েজ শুরু হয় তাহলে তার করণীয় হল তৎক্ষনাৎ নামাজ ছেড়ে দিবে। আর শুরুকৃত নামাজ যদি ফরজ হয় তাহলে পরবর্তীতে উক্ত নামাজ কাযা করতে হবে না। কিন্তু নামাজটি যদি সুন্নত বা নফল হয় তবে পবিত্র হওয়ার পরে তার কাযা করতে হবে।

(সুনানে দারিমী ঃ খঃ ১ পৃঃ ১৭৭ মাবছুত ঃ খঃ ২ পৃঃ ১৫ শামী ঃ ১ খঃ পৃঃ ২৭১ আলমগীরী ঃ খঃ ১ পৃঃ ৩৮ ফাতহুল কাদীর ঃ খঃ ১ পৃঃ ১৫২)

২। **মাসআলা ঃ** হায়েজ-নিফাছ অবস্থায় যদি কোন মহিলা সিজদায়ে তিলাওয়াত শ্রবণ করে তাহলে সিজদা করতে হবে না।

(সুনানে দারিমী ঃ খঃ ১ পৃঃ ৪৬৮ হেদায়াঃ খঃ ১ পৃঃ ১৬৩)

৩। **মাসআলা ঃ** যদি কোন মহিলা শেষ রাত্রে পড়ার আশায় বিতরের নামায রেখে শুয়ে যায়, কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ মহিলার যদি শেষ রাত্রেই হায়েয শুরু হয়ে যায় তাহলে ঐ বিতরের নামায কাযা করতে হবে না। (শামী ঃ ১/২৯১)

৪। **মাসআলা ঃ** হায়েজ-নিফাস অবস্থায় যদি ভুলে নামায পড়ে ফেলে তবে কিছুই করতে হবে না এবং ভুলে যাওয়ার কারণে সে গুনাহগারও হবে না।

৫। **মাসআলা ঃ** হায়েয অবস্থায় জিকর-আযকার করা জায়েয আছে।

(তিরমিজী ঃ হাদীস ঃ ১৩১ শামী ঃ ১/২৯০ বাদায়েউস কানায়ে ১/১৪৯)

মাসআলা ঃ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রতিমাসে যে রক্ত বালেগা মহিলাদের পেশাবের রাস্তা দিয়ে বের হয় তাকে হায়েয বা ঋতু বলে। শরীয়তে এ সম্পর্কে বিশেষ আহকাম রয়েছে।

মাসআলা ঃ নয় বছর অপেক্ষা ছোট মেয়েদের হায়েয আসে না। এ কারণে ৯ বছরের পূর্বে কোন বালিকার রক্তস্রাব দেখা গেলে তা হায়েয নয় বরং ইস্তিহাযা অর্থাৎ রোগের কারণে প্রবাহিত রক্ত।

মাসআলা ঃ সাধারণতঃ ৫৫ বছরের পরে মহিলাদের হায়েয আসে না। তবে যদি এ বয়সের পর রক্ত আসে এবং রক্তের রং একেবারেই লাল অথবা কালো হয় তবে তাকে হায়েযই ধরা হবে। আর যদি হলুদ, সবুজ বা মেটে রংয়ের হয় এবং পূর্বেও এ রংয়ের হায়েয আসার অভ্যাস থেকে থাকে তবে তাকে হায়েযের রক্তই ধরতে হবে। তবে অন্য কোন রং হলে উহা হায়েয নয়; বরং ইস্তিহাযা।

মাসআলা ঃ রক্ত থেকে শরীর ও কাপড়কে রক্ষা করার জন্য উত্তম ব্যবস্থা হল লজ্জাস্থানের উপর তুলা অথবা কোন ছেঁড়া পুরাতন কাপড় রেখে বেঁধে দেওয়া (যাকে আরবী ভাষায় কুরসুফ বলে)।

মাসআলা ঃ কুরসুফ ব্যবহার করার পর রক্তের যে রং ধারণ করে সেটাই ধর্তব্য হবে। উদাহরণতঃ কুরসুফ ভিজাবস্থায় লাল এবং শুকনাবস্থায় সাদা হলে হায়েয, আর যদি ভিজাবস্থায় সাদা এবং শুকানোর পর হলুদ রংয়ের হয় তবে তা হায়েয নয়; বরং ইস্তিহাযা।

মাসআলা ঃ হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা তিন দিন তিন রাত্রি। এর চেয়ে কম হলে তা হায়েয নয়; বরং ইস্তিহাযা বা রোগ বলে গণ্য হবে।

মাসআলা ঃ লাগাতার রক্ত আসতে থাকা জরুরী নয়, যদি শুরু থেকেই কিছু বিলম্ব করে রক্ত এসে তা বন্ধ থেকে পুনরায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন আসে তবে শরীয়তে এ ধরনের রক্তকে লাগাতার রক্ত হিসেবে গণ্য করা হবে।

মাসআলা ঃ হায়েযের সর্বোচ্চ সীমা ১০দিন দশ রাত্রি। তদপেক্ষা বেশি দিন রক্ত আসলে তা ইস্তিহাযা বা রোগ বলে গণ্য হবে।

মাসআলা ঃ মহিলাদের হায়েযাবস্থায় যেমন নামায ফরয হয় না তেমনি পবিত্র হওয়ার পরও ঐ নামাযগুলো কাযা করতে হয় না।

মাসআলা ঃ কোন মহিলা নামাযে রত অবস্থায় হায়েয আসলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং তখন নামায আর আদায় করবে না। এ নামায যদি ফরয হয়

তবে উহা মাফ, আর সুন্নত বা নফল হলে পবিত্রতা অর্জনের পর কাযা করবে।

মাসআলা ঃ যে নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে হায়েয শুরু হয়েছে, সে ওয়াক্তের নামায আদায় না করে থাকলে তা মাফ হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ কোন মহিলা হায়েযাবস্থায় সেজদায়ে তেলাওয়াতের আয়াত শুনলে তার উপর সেজদা করা ওয়াজিব নয়।

মাসআলা ঃ পবিত্র অবস্থায় কোন মহিলা রোযা রাখার পর দিনের একেবারে শেষ প্রান্তে হায়েয আসলে, এমতাবস্থায় তার রোযা ভেঙ্গে যাবে; পুনরায় উক্ত রোযা আদায় করতে হবে। ফরয বা নফল যে কোন রোযা হোক না কেন সর্বত্রই এ নিয়ম প্রযোজ্য।

মাসআলা ঃ রোযাদারদের সাথে সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য যেদিন হায়েয থেকে পবিত্র হবে ঐদিন পানাহার বর্জন করবে এবং পরবর্তীতে রোযা আদায় করবে।

মাসআলা ঃ রমযান মাসে সুবহে সাদিকের পর কোন মহিলার হায়েয বন্ধ হয়ে গেল এবং সে এ সময়ের মধ্যে কোন কিছু পানাহার করে নাই তবে এমতাবস্থায় শুধু নিয়্যাত করে ঐ দিনের রোযা রাখলে তা শুদ্ধ হবে না; বরং পরবর্তীতে উহার কাযা আদায় করতে হবে। কারণ সে দিনের শুরুলগ্নে অপবিত্র ছিল।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েয নেই। তবে ১ আয়াতের চেয়ে কম বা আয়াতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পাঠ করা কোন কোন উলামায়ে কেরামের মতে জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ এ অবস্থায় কোন মহিলা বাচ্চাদেরকে কুরআন শরীফ বানান করে শিক্ষা দিতে পারবে, তবে একশ্বাসে পূর্ণ এক আয়াত পড়তে পারবে না; বরং শ্বাস ভেঙ্গে ভেঙ্গে কিছু কিছু করে পাঠ করবে।

মাসআলা ঃ পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এবং খানা শেষ করে আল-হামদুলিল্লাহ বলায় কনো অসুবিধা নেই। কারণ এখানে কুরআন তেলাওয়াত উদ্দেশ্য নয়; বরং বরকত ও শুকরিয়া আদায় করাই উদ্দেশ্য।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় কুরআন শরীফ স্পর্শ করা যেমন জায়েয নেই অনুরূপভাবে কোথাও কুরআনের আয়াত লিখিত থাকলে তা স্পর্শ করাও জায়েয নেই। তবে যদি এমন কোন কিতাব হয় যার মধ্যে কুরআনের আয়াত অপেক্ষা অন্য লিখা বেশি আছে তবে উহাতে হাত লাগান যাবে, তবে আয়াতের উপর হাত রাখবে না।

মাসআলা ঃ কোন বর্তন, পিরিচ অথবা কাগজের উপর শুধুমাত্র কুরআনের আয়াত লেখা থাকলে উহাতে হাত লাগান জায়েয নেই। তবে পৃথক কোন কাপড় দিয়ে উহা ধরা যাবে।

মাসআলা ঃ পবিত্র কুরআনের গিলাফ (জুঝদান) যদি কুরআন শরীফ থেকে আলাদা হয়, সাথে লাগান না থাকে তবে তা দ্বারা কুরআন শরীফ ধরা জায়েয। অনুরূপভাবে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন কাপড় দ্বারাও পবিত্র কুরআন ধরা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ কুরআন শরীফের সাথে সংযুক্ত জুঝদান এবং যে কাপড় শরীরের সংগে যুক্ত আছে যেমন মেয়েদের দোপাট্টা, উড়না বা কুর্তার আস্তিন ইত্যাদি দ্বারা কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয নেই।

মাসআলা ঃ বিনা অযুতে কুরআন শরীফে হাত লাগানো সম্পর্কে একই হুকুম। তবে বে-অযু অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া জায়েয।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় আল্লাহ পাকের যিকির, দুরুদ শরীফ, ইস্তিগফার ইত্যাদি পাঠ করা জায়েয আছে। সমস্ত অজিফাগুলো যথারীতি আদায় করবে। অবশ্য কুরআন শরীফ পাঠ করবে না।

মাসআলা ঃ সুযোগ মত বিভিন্ন সময় দোয়া, ইস্তিগফার পড়তে থাকবে। এভাবে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতসমূহ দোয়া হিসেবে পাঠ করা জায়েয আছে। যেমন- "রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখেরাতি হাসানা তাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার"।

মাসআলা ঃ যে কাগজের উপর কোন দোয়া লেখা থাকে তাতে হাত লাগানো যাবে, কিন্তু দোয়ার আয়াত বা শব্দগুলোর উপর হাত রাখবে না।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় দ্বীনী কিতাবাদি শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া সবকিছুই জায়েয, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে হাত লাগানো ভাল নয়।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নয়।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় কোন জিনিস মসজিদ থেকে হাত বাড়িয়ে নেওয়া বা দেওয়া জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ মসজিদের ছাদ এবং মসজিদের তলাগুলোও মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

মাসআলা। মসজিদের নিকটবর্তী এমন কোন স্থান যেটা মসজিদের আওতার বাইরে, সেখানে নাপাকী অবস্থায় থাকতে কোন অসুবিধা নেই।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে উঠাবসা, চলাফেরা, খানাপিনা সব কিছুই জায়েয, তবে সহবাস করা হারাম।

মাসআলা ঃ হায়েয অবস্থায় স্বামীর সঙ্গে শয়ন করা এবং সহবাসে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর কাপড় দ্বারা আবৃত রেখে বাকী শরীরে অনাবৃত শরীরের সঙ্গে লাগানোও জায়েয আছে। আরবীতে উহাকে 'মুবাশারাত' বলে। তবে যদি সহবাসে পতিত হওয়ার ভয় থাকে তবে এ সমস্ত কার্য থেকে একেবারেই দূরে থাকা জরুরী। কারণ এ অবস্থায় সহবাস করা হারাম।

মাসআলা ঃ তবে যদি (আল্লাহ না করেন) এ অবস্থার মধ্যে সহবাস হয়ে যায়, তবে তওবা ও ইস্তিগফার একান্ত জরুরি। আর সর্বোত্তম হলো তাওবার সাথে সাথে কিছু সদকাও প্রদান করা।

মাসআলা ঃ যদি কোন মহিলার হায়েযের মুদ্দাতানুযায়ী হায়েযের দিন উপস্থিত হয় আর তার স্বামী যদি তখন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চায় কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে জানায় যে, তার হায়েয শুরু হয়ে গেছে তবে এমতাবস্থায় স্ত্রীর কথা মেনে নেওয়া স্বামীর জন্য জরুরী, যদিও স্ত্রী দ্বীনদার না হয়।

মাসআলা ঃ পূর্ণ ১০ দিন হায়েয চলার পর যদি তা বন্ধ হয়ে যায় তবে গোসল করার পূর্বেই সহবাস করা জায়েয, কিন্তু উত্তম হলো গোসল করার পর সহবাস করা,

মাসআলা ঃ ১০ দিনের পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে গোসল না করা পর্যন্ত বা এক ওয়াক্তের নামায পরিমাণ সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয নেই। তবে এক ওয়াক্ত নামায পরিমাণ সময় চলে গেলে গোসল ব্যতীতই তার সাথে সহবাস করা জায়েয।

মাসআলা ঃ হায়েযের গোসলে শরীর এবং ছতরের স্থানসমুহ খুব ভাল করে ডলে মলে ধোবে। বিশেষতঃ সমস্ত শরীর কাপড় ইত্যাদি দ্বারা পরিষ্কার করবে যাতে শুকনা রক্তের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট না থাকে। একজন আনসারী মহিলা হায়েযের গোসল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে একান্ত উত্তমভাবে গোসল করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মাসআলা ঃ লক্ষ্য রাখবে, গোসলের সময় শরীরের সামান্য স্থানও যেন শুকনা না থাকে। নচেৎ শরীর পাক হবে না।

মাসআলা ঃ মাথার চুল বাঁধা অবস্থায় থাকলে গোসলের সময় তা খোলার প্রয়োজন নেই; বরং চুলের গোছাগুলো ভালভাবে ভিজিয়ে ও ধুয়ে দিলেই যথেষ্ট। তবে বেনি খুলে ধুয়ে নেওয়া ইত্তম।

মাসআলা ঃ গোসলের পদ্ধতি হলো- প্রথমে হাত ধৌত করে শরীরের যে সমস্ত স্থানে নাপাকি রয়েছে তা পরিষ্কার করে সুন্নাত তরীকায় অযু করবে, তারপর সমস্ত শরীর ধৌত করে ফেলবে।

মাসআলা ঃ ফরয গোসলের মধ্যে কুলি করা এবং নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছান ফরয।

নেফাস সম্পর্কে আলোচনা

নেফাস ঃ نفاس (নেফাস) শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হল প্রসূতি-অবস্থা প্রতিযোগিতা।

পরিভাষায় নেফাস বলা হয়, সন্তান প্রসবের পর মহিলার যৌনাঙ্গ থেকে যে রক্ত বের হয়। (ইনায়াহ ঃ ১/১২১)

মাসআলা ঃ বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় নেফাস বলে।

মাসআলা ঃ নেফাসের সর্বোচ্চ সীমা ৪০ দিন; তদপেক্ষা বেশি দিন রক্ত আসলে তা নেফাস নয়; বরং তা ইস্তিহাযা।

মাসআলা ঃ নেফাসের সর্বনিম্ন সময়ের কোন সীমা নেই। একদিন বা সামান্য সময়ের জন্যও উহা আসতে পারে; বরং যদি সন্তান জন্মের পর এক ফোঁটা রক্তও না আসে তাও সম্ভব।

মাসআলা ঃ সন্তান প্রসবের পর সর্বাবস্থায় গোসল করা ওয়াজিব। রক্ত আসলে রক্ত বন্ধ হওয়ার পর আর রক্ত না আসলে নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর।

মাসআলা ঃ এ সময় যদি গোসল করায় কঠিন রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে অথবা গোসল করার সাহসই না হয় তবে গোসলের নিয়তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। পরে হিম্মত আসার পর বা অসুস্থতার আশংকা কেটে গেলে গোসল করবে।

মাসআলা ঃ জমজ দুই শিশু প্রসব হলে প্রথম বাচ্চা থেকেই নেফাস গণনা করা হবে।

মাসআলা ঃ অস্ত্রপচার করে বাচ্চা বের করা হলে যদি লজ্জাস্থান থেকেই রক্ত আসে তবে তাকে নেফাসই মনে করা হবে। অন্যথায় উহা নেফাস নয়।

মাসআলা ঃ নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে হায়েয শুরু হওয়ার মাঝে কমপক্ষে শরয়ী নিয়মানুযায়ী ১৫ দিন পবিত্র থাকা জরুরী। যদি ১৫ দিনের পূর্বেই হায়েয এসে পড়ে তবে তা হায়েয নয়; বরং ইস্তিহাযা।

মাসআলা ঃ নেফাসের সময় নামায মাফ হয়ে যায়। উহা আর আদায় বা কাযা কিছুই করা লাগে না।

মাসআলা ঃ যখনই নামায ফরয হবে তখনই গোসল করে নামায শুরু করে দিবে। সময় থাকলে তা আদায় নামায হিসেবে গণ্য হবে; নচেৎ কাযা হবে।

মাসআলা ঃ নামাযের ওয়াক্ত সামান্য সময় বাকী থাকলে সুন্নত ছেড়ে দিয়ে ফরয পড়ে নিবে।

মাসআলা ঃ ফরয এবং ওয়াজিব (যেমন-বেতের) নামাযেরই কেবল কাযা আছে; সুন্নতের কাযা নেই। অবশ্য কারো ফজরের নামায কাযা হয়ে গেল এবং সে (সূর্য) ডুবার পূর্বে উহার কাযা করলে ফজরের সুন্নতও পড়বে।

মাসআলা ঃ নেফাস অবস্থায় রোযা রাখবে না। তবে পবিত্র হওয়ার পর কাযা করা জরুরী।

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় নেফাস আসলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং পরে উহার কাযা আদায় আবশ্যক হবে।

মাসআলা ঃ গোসল করতে পারে এতটুকু সময় থাকা জরুরী, তবে গোসল করা জরুরী নয়। কারণ সুবহে সাদেকের পরে গোসল করলেও কোন ক্ষতি নেই।

মাসআলা ঃ গর্ভবতী রোযাদার মহিলার যদি রোযার কারণে বাচ্চার জীবনাশংকার হয় তবে রোযা রাখবে না। পরে কাযা করবে।

মাসআলা ঃ গর্ভবতী অথবা দুগ্ধপানকারিনী মহিলারা নিজের বা স্বীয় বাচ্চার জীবনাশংকা থাকলে রোযা রাখবে না, পরে কাযা করবে।

মাসআলা ঃ নেফাসের গোসলের ঐ একই পদ্ধতি যা পূর্বে হায়েযের গোসল এ বর্ণিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ জানা গেছে যে, অনেক জায়গায় মহিলাগণ নেফাসের ৪০ দিনের অনেক পূর্বে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলেও নেফাসের দিনগুলোর পূর্ণ ৪০ দিন পর্যন্ত নেফাসের অবস্থায়ই কাটায় এবং নিজেকে নাপাক মনে করে। এটা একেবারেই অনুচিত। এভাবে থাকা নাজায়েয এবং হারাম; বরং যখনই রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে এবং পুনরায় আর রক্ত আসার সম্ভবনা না থাকবে তখনই গোসল করে নামায শুরু করবে।

ইস্তিহাযা সম্পর্কে আলোচনা

استحاضة (ইস্তেহাযা) এটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হল- রক্ত প্রদর।

পরিভাষায়, নারীর রোগের কারণে জরায়ুর বাইরের মুখের নিকট অবস্থিত একটি শিরা থেকে যে রক্ত বের হয়, তাকে ইস্তেহাজা বলে।

মাসআলা ঃ হায়েযের দিনগুলোর মধ্যে কোন মহিলার রক্ত তিন দিনের কম প্রবাহিত হয়ে ১৫ দিন বন্ধ থাকলে প্রথমোক্ত রক্ত ইস্তিহাযা। আর তা ১০ দিনের চেয়ে বেশি আসলেও এ দশদিনের রক্ত ইস্তিহাযা।

মাসআলা ঃ ইস্তিহাযা অবস্থায় সমস্ত ইবাদত করাই সহিহ আছে। নামাযও মাফ নেই। যদি লাগাতার রক্ত আসতে থাকে তাহলে প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তে নতুন অযু করে নামায পড়তে থাকবে।

মাসআলা ঃ রক্ত আসার কারণে কাপড় নাপাক হয়ে গেলে নামাযের জন্য পৃথক কাপড় রাখবে এবং নামায শেষে খুলে ফেলবে।

মাসআলা ঃ নামায পড়া অবস্থায় কাপড় নাপাক হয়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই, নামায হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য ওয়াক্তের নামাযের জন্য উক্ত কাপড় ধৌত করা জরুরী। (প্রতি ওয়াক্তের জন্য এরূপ করবে)।

মাসআলা ঃ শরীরের হুকুম কাপড়ের হুকুমের অনুরূপ। তবে নামাযের সময় শরীর অপবিত্র হয়ে গেলে পরে শরীর ধৌত করবে।

মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে ইস্তিহাযা অবস্থায় রোযা রাখা জরুরী।

মাসআলা ঃ হজ্জ ও ওমরার সমস্ত কার্যাবলী যেমন-তওয়াফ, সায়ী ইত্যাদি করায় কোন অসুবিধা নেই। তেমনি মসজিদে যাওয়া, ইতেকাফ করা, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা এবং স্পর্শ করাও জায়েয।

মোটকথা হলো, শরীয়তের হুকুম-আহকাম আদায় করার ক্ষেত্রে মুস্তাহাযা এবং পাক মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

মাসআলা ঃ অনুরূপভাবে যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সময় রক্ত আসে আর বসে পড়ার সময় না আসে তবে বসে নামায পড়া জরুরী।

মাসআলা ঃ ইস্তিহাযা অবস্থায় মহিলাদের রক্ত চালু থাকলেও শরীয়ত অনুযায়ী যখন তাকে পাক হিসেবে গণ্য করা হবে, তখন পুরুষের জন্য (এ অবস্থায়ও) সহবাস করা জায়েয আছে, এতে কোন গোনাহ নেই।

হায়েজ, নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ

১। কুরআন শরীফ পড়া। (আল বাহরুর রায়েক ঃ ১/১৯৯)

২। কুরআন শরীফ স্পর্শ করা।

(শামী ঃ ১/১৭৩ বাহরুর রায়েক ঃ ১/২০১ মুলতাকাল আবহুর ১/৪১)

* অবশ্য কুরআন শরীফ যদি গিলাফে পেচানো থাকে বা ভিন্ন কোন কাপড়, রুমাল দিয়ে স্পর্শ করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য গিলাফ হল যা কুরআন থেকে ভিন্ন থাকে, সুতরাং চামড়ার বাধাইকৃত মলাট গিলাফ হিসাবে গণ্য হবে না। (হিদায়া-১/৬৪)

* অনুরূপভাবে গায়ের জামা বা ওড়না দ্বারাও কুরআন শরীফ স্পর্শ করতে পারবে না। অবশ্য গা থেকে ভিন্ন কোন কাপড় দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয আছে।

(আল বাহরুর রায়েক- ১/২০১)

৩। মসজিদে প্রবেশ করা। (আলবাহরুর রায়েক- ১/১৯৫)

৪। নামায পড়া রোযা রাখা অবশ্য রোযা পরে কাযা করতে হবে।

৫। মসজিদে প্রবেশ করা, বাইতুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করা। যদি হায়েজ অবস্থায় তওয়াফ করে তবে কঠিন গোনাহগার হবে। (বাহরুর রায়েক ঃ ১/১৯৭)

মাসআলাহ ঃ কোন শিক্ষিকা যদি হায়েজ অবস্থায় হয় তাহলে এক এক শব্দ করে ছাত্র ছাত্রীদের কে শিক্ষা দিতে পারবে, তবে লক্ষ রাখতে হবে, ঐ শব্দগুলি যাতে ছোট কোন আয়াতের সমপরিমাণও না হয়।

৬। সহবাস করা। (আল বাহরুর রায়েক ঃ ১/২০০)

* হায়েজ যদি ১০ দিনের পূর্বে এবং মেয়েদের সাধারণ অভ্যাসেরও পূর্বে বন্ধ হয় তাহলে তার সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত সহবাস করা জায়েয হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার পূর্বের অভ্যাসের সময় অতিক্রম না করে।

* হায়েজ যদি ১০ দিনের পূর্বে তবে পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হয় তাহলে গোসলের পূর্বে বা একওয়াক্ত নামাযের সময় অতিক্রম করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করতে পারবে না।

* অবশ্য হায়েজ যদি পরিপূর্ণ ১০ দিনের পরে বন্ধ হয় তবে সেক্ষেত্রে তার সাথে গোসলের পূর্বেই সহবাস করা জায়েয আছে। কিন্তু গোসলের পরে করা মুস্তাহাব। (আলবাহরুর রায়েক ঃ ১/২০২৩)

* যদি কোন মহিলা নফল রোযা রাখা অবস্থায় তার হায়েজ শুরু হয় তবে তার রোযা কাযা করতে হবে। (আল বাহরুর রায়েক- ১/২০৫)

ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশার হুকুম

ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের সাথে মেলামেশার অবস্থা তিনটি

১। সঙ্গমের মাধ্যমে ফায়দা নেয়া।

২। নাভির উপরে ও হাটুর নিচে মেলামেশার মাধ্যমে ফাঁয়দা নেওয়া।

৩। নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাটুর উপর পর্যন্ত যৌনাঙ্গ দ্বারা এবং গুহ্যদ্বার ব্যতীত মেলামেশা করা।

হুকুম

প্রথম প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। চাই মেলামেশা পুরুষাঙ্গ দ্বারা হোক কিংবা চুমুর দ্বারা হোক, অথবা স্পর্ষ-আলিঙ্গনের দ্বারা হোক এবং চাই কাপড়ের উপর দিয়ে হোক কিংবা কাপড় ছাড়া হোক, সর্ববস্থায় জায়েয আছে।

তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ নাভির নিচ থেকে নিয়ে হাঁটুর উপর পর্যন্ত কোন স্থানেই কোনরূপ কাপড়ের অন্তরাল ছাড়া কোন প্রকার ফায়দা নেয়া জায়েয নেই।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ঋতু (হায়েজ) নারীর আগের গোনাহের জন্য কাফফরা স্বরূপ। প্রথম দিন যদি সে আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লিহাল (সর্ববস্থায় আল্লাহর প্রশংসা)' বলে এবং আল্লাহর কাছে নিজের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবেন এবং পুলসিরাত পার হওয়া তার জন্য সহজ করে দিবেন। শর্ত হল, এই দিনগুলিতে আল্লাহর স্বরণ থেকে গাফেল না হতে হবে।

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) বলেন, এই ফজিলত ঐসব নারীর জন্য যারা নেককার এবং স্বামীর অনুগত। (দুররাতুন নাসিহীন)।

৫ম অধ্যায়

অযু সম্পর্কে আলোচনা

হাদীসের আলোকে অযুর ফযীলত

হাদীস শরীফে ওযুর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে এক হাদীসে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি–

اِنَّ اُمَّتِىْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يُطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَلْ

অর্থ ঃ আমার উম্মতগণ হাত পা মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ও নুরানী অবস্থায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অযূর ক্রিয়ায় তাদের ঐ অবস্থা হবে।

(বোখারী শরীফ)

হাদীস ঃ অপর হাদীসে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে বসে নামাযের অপেক্ষা করতে থাকে ঐ সময়টুকু তার জন্য নামাযের মধ্যেই গণ্য হয়। যে পর্যন্ত সে অযু ভঙ্গ না করে। এক ব্যক্তি হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, অযু ভঙ্গকারি কি জিনিষ? তিনি বলেন, বায়ু বের হওয়া। (বোখারী শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তুমি শয়নের জন্য প্রস্তুত হবে তখন নামাজের অযুর ন্যায় অযু করে নাও তার পর ডান পার্শ্বের উপর শুয়ে পড় এবং এই দোয়া পাঠ কর। (বোখারী শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু মালিক আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা হল ঈমানের অংশ। আল্‌হামদুলিল্লাহ শব্দটি পাল্লাকে ভরে দেয়। সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ পাল্লাকে ভরে দেয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান ভরে দেয়। সালাত হল আলো। সাদকা হল প্রমাণিকা, ধৈর্য হল জ্যোতি, কোরআন তোমার পক্ষে, কিন্তু বিপক্ষে দলিল। প্রত্যেক মানুষ প্রত্যহ আপন সত্তাকে ব্যবহার করে তখন কেউ সত্তার উদ্ধারকারী হয় আর কেউ হয় ধংসকারী। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত ইমরান মাওলা হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হয়রত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি মসজিদের চত্বরে অবস্থিত ছিলেন এমন সময়ে আসরের নামাযের জন্য মুয়াজ্জিন আসলেন। হযরত উসমান (রাঃ) আযুর পানি আনতে নির্দেশ দিলেন অতঃপর অযু করলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর কসম আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাব যদি আল্লাহর কিতাবে একটি আয়াত না থাকত তাহলে কখনোই আমি তোমাদেরকে হাদীস শুনাতাম না। আমি শুনেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মুসলিম ব্যক্তি অযু করবে এবং অযুকে সুন্দরভাবে আদায় করবে অতঃপর নামায আদায় করবে সে ব্যক্তির এ নামায ও তার পূর্ববর্তী নামাযের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত ইমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) অযুর কাজ সেরে বললেন, আল্লাহর রাসূলের একটি হাদীস আমি তোমাদেরকে শুনাব। আল্লাহর কসম যদি আল্লাহর কিতাবের মধ্যে একটি আয়াত না থাকত তাহলে আমি তোমাদেরকে কখনোই হাদীসটি শুনাতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি যখন অযু করে এবং অযুকে উত্তমরূপে আদায় করে তারপর নামায আদায় করে তখন তার নামায ও পূর্ববর্তী নামাযের মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ওরওয়া বলেন, আয়তটি হল "আমি যে সকল স্পষ্ট নির্দেশ ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্যে কিতাবে তা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়ার পরেও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদেরকে লানত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আমর ইবনে সাঈদ ইবনুল আস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন মুসলিম ব্যক্তির যখন ফরজ নামাযের ওয়াক্ত হয় আর নামাযের অযুকে উত্তমরূপে আদায় করে নামাযের বিনয় ও রূকুকে উত্তম রূপে আদায় করে তাহলে যতক্ষণ না যে কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হবে আর এই নামায তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আর এ অবস্থা সর্বযুগেই বিদ্যমান। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত ইমরান মাওলা হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর নিকট অযুর পানি

আনলাম। অতঃপর তিনি অযু করলেন, তারপর তিনি বললেন, লোকজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীস বর্ণনা করে থাকে আমি ওসব জানিনা তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তিনি আমার এ অযুর ন্যায় অযু করেছেন। তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এভাবে অযু করবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর তার নামায আদায় ও মসজিদের দিকে গমনের সওয়াব থাকবে অতিরিক্ত।

(মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত উসমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ যেভাবে আদেশ করেছেন সেভাবে অযুকে পূর্ণভাবে করে তার পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামায তাদের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

(মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামাযের জন্য অযু করে এবং পরিপূর্ণভাবে অযু করে অতঃপর ফরজ নামাযের উদ্দেশ্যে হেঁটে গিয়ে লোকজনের সাথে নামায আদায় করে আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তির গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত ইমরান মাওলা হযরত উসমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উসমান (রাঃ) খুব উত্তমরূপে অযু করলেন তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লামকে দেখেছি, তিনি উত্তমরূপে অযু করেছেন, তারপর বলেছেন, যে ব্যক্তি এ নিয়মে অযু করে এবং তারপর কেবল নামাযের উদ্দেশ্যে তাড়িত হয়ে মসজিদের দিকে বেরিয়ে যায় তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন মুসলমান কিংবা বলেছেন কোন মুমিন বান্দা যখন ফরজ উযু করে তখন তার মুখ ধোয়ার সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যার দিকে তার দুই চোখের দৃষ্টি পড়েছিল এবং যখন দুই হাত ধোয়া তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায় যেগুলো তার দুই হাতে ধরে ছিল এবং যখন দুই পা ধোয়া হয়ে যায় তখন পানির সাথে অথবা বলেছেন, পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায়

যেগুলোর দিকে তার দুই পা অগ্রসর হয়েছিল, ফলে (অযু শেষে) লোকটি তার সমুদয় গুনাহ থেকে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে উঠে। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি অযু করে এবং তা উত্তমরূপে। তাঁর দেহ থেকে সমুদয় গুনাহ বের হয়ে যায় এমন কি তাঁর নখের ভিতরে থেকেও (গুনাহ) বের হয়ে যায়। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি কিছু সংখক লোককে হাউজে থেকে ফিরিয়ে দিতে থাকব যেমনিভাবে লোকে তার হাউজ থেকে অন্যের উট ফিরিয়ে দেয়, সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন কি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ তোমাদের এমন চিহ্ন হবে যা অন্য কোন উম্মতের হবে না। অযুর বদৌলতে তোমাদের মুখমণ্ডল নূরানী ও হাত-পা দীপ্তিমান অবস্থায় তোমরা আমার কাছে আসবে। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এটা মুমিনদের গর্ব, ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলব। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখোনো (পৃথিবীতে) আসেনি তারা আমাদের ভাই। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি তাদেরকি আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন, কেন যদি কোন ব্যক্তির কপার ও হাত-পা সাদা যাক্ত ঘোড়া ঘোর কালো ঘোড়ের মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারবেনা? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তারা (আমার উম্মত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, অযুর কারণে তাদের মুখমণ্ডল হবে নূরানী এবং হাত পা দীপ্তিময়। তার হাউজের পরে আমি হব তাদের অগ্রনায়ক, জেনে রাখো কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউজ থেকে হাটিয়ে দেয়া হবে যেমনিভাবে হারানো উটকে হটিয়ে দেয়া হয়। আমি তাদেরকে ডাকব এসো এসো। তখন বলা হবে, এরা আপনার পরে (আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিলো। তখন আমি বলব, "দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা"। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন। আমি কি তোমাদেরকে এমন (কাজের) কথা বলব না, যার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পাপ রাশি দূর করে দেবেন এবং মর্যাদা উঁচু করে দেবেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন– হ্যাঁ, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাহল, অসুবিধা ও কষ্ট সত্ত্বেও পরি পূর্ণভাবে অযু করা, মসজিদে আসার জন্য বেশি পদ চারণা এবং এক নামাযের পর অন্য নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। জেনে রাখো, এটাই হল দ্বীনকে আটকে রাখা। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে কাল বিচার দিবসে সে মুসলসান হিসেবে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ করবে তার উচিত এ নামাযসমূহের সংরক্ষণ করা যেখানে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবীকে হিদায়াতের সকল পথ বলে দিয়েছেন, আর এ সমস্ত নামায হলো হিদায়াতের পথ সমূহের অন্যতম, তোমরা যদি এই সকল নামায জামাতে আদায় কর। যেমন একদল লোক জামায়াত ছেড়ে ঘরে নামায আদায় করল তাহলে তারা নবীর সুন্নতকে ছেড়ে দিল। তোমরা যদি নবীর সুন্নত ছেড়ে দাও, তাহলে অবশ্যই গুমরাহ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি উত্তম রূপে পবিত্র হয়ে মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়ে নামায আদায় করে তাহলে তার প্রতি কদমে একটি করে নেকী লেখা হবে এবং তার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং একটি গুনাহ মাফ করা হবে। তারপর একমাত্র প্রকাশ্য মুনাফিক ছাড়া আর কাউকে জামায়াত থেকে বাদ পড়তে আমরা দেখিনি। অনেক লোক দুজনের কাঁধে ভর করে হেঁচড়িয়ে মসজিদে আসতো এবং তাদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। (মুসলিম শরীফ)

অযু ছাড়া নামায হয় না

ওযু ছাড়া নামায হয় না। ওযু নামাযের পূর্ব শর্ত যা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন–

হাদীস ঃ হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পবিত্রতা ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। আর হারাম মালের দানও গ্রহণযোগ্য হয় না। (মুসলিম)

নামায হচ্ছে মহান আল্লাহর শাহী দরবারে বান্দার সবিনয় উপস্থিতি। তাই পাক-পবিত্র অবস্থায় নিজেকে আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করতে হবে। আর এজন্যই শরীয়ত অযুর নির্দেশ দিয়েছে। তাই বিনা অযুতে নামায হবে না। এতদা সত্ত্বেও কেউ যদি বিনা অযুতে অথবা গোসল ফরজ থাকা অবস্থায়

নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে এটা হবে আল্লাহ তা'আলার সাথে উপহাসের শামিল। তাই কেউ এমন করলে তার মন্দ পরিণতি তথা কাফির হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। তেমনিভাবে আল্লাহ যেহেতু পূত-পবিত্র, তাই তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু দান করতে চাইলে তা হালাল ও পবিত্র উপার্জন থেকে হতে হবে। অর্নথায় এটাও হবে আল্লাহর শানে গোস্তাখী। তাই এমন কাজ করে পুন্যের আশা করা যাবে না। তবে এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন মানুষের কাছে যদি কারো অর্থ সম্পদ অবৈধভাবে এসে গিয়ে থকে, যেমন প্রতারণার মাধ্যমে কেউ কারো টাকা পয়সা আত্মসাৎ করেছিল। এখন আল্লাহর ভয়ে পাপ মুক্তির জন্য এ টাকা সে ফেরত দিতে চায়, কিন্তু মালিক অথবা তার উত্তরাধিকারীদের কোন সন্ধান সে পাচ্ছে না অথবা ব্যাংকের টাকার উপর তার হাতে কিছু সুদের টাকা আসল। আর এ টাকা সে নিজের জন্য কোন প্রকার সওয়াবের আশা না করে বিপন্ন মানুষের জীবন রক্ষা, অক্ষম মুমূর্ষ রোগের চিকিৎসা-সেবা ইত্যাদিতে ব্যয় করে দিতে পারে। অনুরূপভাবে যার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছিল, এ টাকা তার নামে দান করে দিয়ে নিজে দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারবে। হয়তো বা আল্লাহ তায়ালা তাকে তার এ সদিচ্ছার বদৌলতে মাফ করে দিতে পারেন, আর প্রাপকও আখিরাতে এর পুণ্য পেয়ে তাকে দায়মুক্ত করে দিতে পারে।

অযু অবস্থায় মারা গেলে শহীদের সওয়াব

হাদীস ঃ হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত। তিনি তাকে বলেছেন, হে বৎস! তুমি যদি সর্বদা অযু অবস্থায় থাকতে পার তাহলে তাই কর। কেননা, মালাকুল মওত যখন বান্দার রূহ কবজ করে আর সে অযু অবস্থায় থাকে তখন তার জন্য শাহাদাতের মর্যাদা লিখে দেয়া হয়।

অযুতে হাত পায়ের অঙ্গুলী খেলাল করা

হাদীস ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন অযু কর তখন তোমার হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করে নাও। (তিরমিযী)

অযুর মধ্যে হাতে আংটি থাকলে তার বিধান

হাদীস ঃ হযরত আবু রাফি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের অযু করতেন তখন তাঁর হাতের আংটিটি নাড়াচাড়া করতেন। (ইবনে মাজাহ)

অযুর সময় যেহেতু অযুর অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে ধুতে হয় যাতে কোন অংশ শুকনা না থাকে তাই আংটির নীচে পানি পৌঁছার ধারণা থাকলেও তা নাড়াচাড়া করে নেয়া সুন্নত। আর যদি নাড়াচাড়া না করে আদৌ পানি না পৌঁছে, তাহলে আংটি সঞ্চালন করা ওয়াজিব। মহিলাদের নাকে কোন অলংকার থাকলে তারও একই বিধান, অর্থাৎ, অযুর সময় তা নাড়াচাড়া করতে হবে। কানে কোন অলংকার থাকলে গোসলের সময় তা নেড়ে নিবে, যাতে ছিদ্রের ভিতরে পানি পৌঁছতে পারে।

নামাযের পূর্বে অযুর বিজ্ঞান দর্শণ

অযু ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। ইসলামের দ্বিতীয় রোকন নামায শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত অযু এ অযুতে রয়েছে ফরজ, কিছু সুন্নাত, কিছু মুস্তাহাব আমল। অযুর মধ্যে হাত, পা, মুখমণ্ডল ধৌত ও মাথা মাসেহ করা ফরজ। গবেষণায় দেখা গেছে যে, এর সবগুলোই বিজ্ঞান সম্মত, যা মানুষের শারিরীক সুস্থতা ঠিক রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখিত বিষয়ের মধ্যে মুখমণ্ডল ও আঙ্গুল দুটি মূল কারণ। এ দুটো অংগের মাধ্যমে এক দেহ থেকে অন্য দেহ এবং এক অঙ্গ থেকে অন্য অঙ্গে রোগ সংক্রমন করতে পারে বলে বিজ্ঞানিরা মনে করেন। এ দুটি অঙ্গ অপরিষ্কার অপবিত্র থাকলে বিভিন্ন রোগের জীবাণু লেগে থাকতে পারে। যার কারণে দেহে বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ে আর এগুলো পুত-পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে রোগ সংক্রমনের কোন ভয় থাকে না। ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান অযুর মাধ্যমে এক একটি অঙ্গকে পূত পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে, এতে করে দেহে রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম থাকে। অযুর অন্যতম মুস্তাহাব হলো ঘাড় মাছেহ করা। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এ ক্ষুদ্রতম মুস্তাহাবের উপকারিতাও দারুনভাবে প্রকাশ পেয়েছে, মাসেহ করার শরঈ নিয়ম হলো ভেজা হাতের পিটকে ঘাড়ের উপর রাখা এ ঘাড়ের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে একটি ইন্দ্রিয় যন্ত্র যার নাম স্পেইনাল কোড। এ স্পেইনাল কোড মানব দেহের ব্রেন ও হার্টের সংযোগকারী যন্ত্র বিশেষ। হার্ট ও ব্রেন যোগাযোগ রক্ষায় এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই

স্পেইনাস কোডকে ঠাণ্ডা রাখতে ঘাড় মাসেহের বিকল্প নেই। প্রত্যহ পাঁচবার মাসেহ করলে শরীরের এ অঙ্গ দু'টো সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। হাতের উল্টা পিঠ অপর পিঠের চেয়ে অধিক ঠাণ্ডা ও সংবেদনশীল বিধায় উল্টা পিঠেই মাসেহ করা উত্তম। এ জন্য উল্টা পিঠ দিয়েই মাসেহ করার বিধান রাখা হয়েছে। তাহলে বুঝতে বাকি নেই যে, একটি সাধারণ মাস্তাহাব মানুষের কি উপকার সাধন করছে। এভাবে অযুর অন্যান্য ফরজ ও সুন্নত, মুস্তাহাবগুলোর মধ্যে মানুষের বৃহৎ বৃহৎ উপকারিতা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ধরা পড়েছে। গ্রন্থ কলেবর সংক্ষিপ্ত করণের লক্ষে সেগুলো বর্ণনা করলাম না, শুধুমাত্র অযুর সুন্নতের মধ্যে মিসওয়াকের উপকারীতা ও আধুনিক বিজ্ঞান তথ্য পেশ করছি।

নামাযের পূর্বে মিছওয়াক ও আধুনিক বিজ্ঞান

প্রকৃতি কখনো মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধে নয়। বরং তা সর্বদাই মানব স্বভাবের অনুকূলে। শুধু তাই নয়, মানুষ যখন দুনিয়ার চাকচিক্য ও ভোগ বিলাসিতায় ডুবে গিয়ে এক সময় নানাবিধ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হয় এবং তা থেকে নিস্কৃতির কোনরূপ উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় প্রকৃতির দিকে ফিরে আসে, প্রকৃতি তখনও মানুষকে পূর্বের ন্যায় উপকার করে থাকে। চমকদার ও মহামূল্যবান হীরার টুকরাকে ফেলে সামান্য এক টুকরা কাঁচ খন্ড গ্রহণ করা যেমনিভাবে বুদ্ধিহীনতা ও বোকামীর কাজ, ঠিক তেমনি মুসলমানের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহান সুন্নাত মেছওয়াকের ন্যায় স্বভাব অনুকূলের আমলটিকে পরিত্যাগ করে ব্রাশ ইত্যাদি গ্রহণ করাও তদ্রুপ অজ্ঞতা ও মুর্খতার কাজ। যখন থেকে আমরা এ মহান নেয়ামতটিকে হাতছাড়া করেছি, তখন থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত আমরা নানা ভাবে পেরেশান হচ্ছি। হাজার হাজার টাকা ব্যায় করেও দৈহিক সুস্থতার উৎস মূলে ফিরে যেতে সক্ষম হচ্ছিনা। মিছওয়াক সম্পর্কে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর পণ্ডিত সুলভ উক্তি এ ভাবে করেছেন– যে দিন থেকে আমরা মেছওয়াকের ব্যবহার ত্যাগ করেছি সেদিন থেকেই ডেন্টাল সার্জন এর সূত্রপাত হয়েছে। এবার আসুন আমরা একটু পরীক্ষা করে দেখি, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত মানুষের স্বভাব সুলভ কিনা? এ সুন্নাত আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক, না পথ প্রদর্শক? এ সুন্নাত আমাদেরকে পাথরের যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, না বিজ্ঞানের নিকটবর্তী করে দেয়? ফায়সালা পাঠকদের হাতে ছেড়ে দেয়া হল, সামনে আলোচ্য কথাগুলো গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়ুন এবং ফায়সালা করুন।

নামাযের পূর্বে মিছওয়াকের গুরুত্ব হল, প্রকৃত পক্ষে নামায যেহেতু মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গুণকীর্তন করা, তাই নামাযের সময় মুখ পরিষ্কার হওয়া অত্যাবশ্যক। যদি আহারের পর মিছওয়াক বিহীন অযু করে নামায আদায় করা হয়, তাহলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো জিহ্বায় লেগে নামাজের একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

তাছাড়া নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় নামাযী ব্যক্তির মুখ থেকে যদি দুর্গন্ধ বের হয়, তাহলে তার দ্বারা অণ্য নামাযীদেরও কষ্ট হয়ে থাকে। তাই মিছওয়াক দ্বারা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে নেয়া উচিৎ। মিছওয়াক করার সময় মুখ এমনভাবে (RAYS) হিল্লোলিত হয়, যার দ্বারা কোরআন তেলাওয়াত তাছবীহ তাহলীল ইত্যাদিতে পাওয়া যায় অনাবিল শান্তি। নামায হয় মহান সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে হাজিরা দেয়া, আর সেই বিশেষ সময়ে যদি মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, তাও লজ্জার ব্যাপার বটে।

রাত ও মিছওয়াক

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত্রে ঘুম থেকে জেগে মিছওয়াক করতেন। রাত্রে শয়নকালে মিছওয়াক করা ছিল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান অভ্যাস। (যাদুল মাআদ)

জনৈক ইঞ্জিনিয়ার বলেন, ওয়াশিংটনের (আমেরিকার) একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার একদা আমাকে বললেন, আপনি শয়নকালেও মিছওয়াক করবেন। আমি বললাম, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি বললেন, বর্তমান যুগের রিচার্স একথা বলে যে, মানুষ ভক্ষণ করে তার ময়লা কুলির দ্বারা পরিপূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়না। তিনি আরো বলেন, সাধারণতঃ মানুষের দাঁত নষ্ট হয় শয়নকালে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরই বা কাররণ কি? তিনি বললেন, আপনি প্রত্যক্ষ করে থাকবেন যে, দিনের বেলা মানুষ কখনোকথা বলছে কখনো আহার করছে, আবার কখনো পান করছে। তাই দিনের বেলায় মুখের শীতলতার কারণে রক্তসমূহ/রক্তমস্ত, রক্তলসিকা, তার কাজ করার সুযোগ পায় না। কিন্তু রাতের বেলা যখন মুখ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তার সুযোগ এসে যায় কাজ করার। এ কারণেই দাঁত রাতের বেলা অধিক খারাপ হয়। তিনি আরো বলেন, সকালে "টুথপেস্ট" ব্যবহার করেন বা না করেন, রাতে শোয়ার সময় অবশ্যই মিছওয়াক করে ঘুমাবেন। বিজ্ঞ ডাক্তার সাহেবের মুখে একথা শুনে আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ পড়ে নিলাম। কেননা এটাই তো আমাদের রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা অযু অবস্থায় শয়ন করতেন আর মিসওয়াক ব্যতীত কখনো তিনি অযু করতেন না। যদি কেউ খাবার শেষে অযু করে এবং মিসওয়াক করে তাহলে সে দাতের রোগ থেকে রেহাই পাবে। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারের পূর্বে হাত ধৌত করতেন, আর খাবার শেষে কুলি করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষেরা খানা খেয়ে কুলি না করেই চলে যায়, অথচ সে ব্যক্তি যদি মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে থাকে তাহলে তার প্রভাব মুখের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ যাবৎ অবশিষ্ট থাকে। আর যদি কুলি করার অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে মহা ক্ষতির হাত থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। তাছাড়া দিনে অন্ততঃ পাঁচবার অযু করতে হয়, আবার পৃথকভাবে মুখ পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। এভাবে মানুষ (Letronice system) বিশেষ পদ্ধতিতে প্রতিনিয়ত মুখ, হাত, পা ইত্যাদি পরিষ্কার করে থাকে।

সুইজারল্যান্ডের জনৈক ডাঃ এর বক্তব্য ঃ জনৈক ব্যবসায়ী বলেন, আমি এক সময় সুইজ্যারল্যান্ডে ছিলাম, সেখানে সাক্ষাত হল একজন নওমুসলিমের সাথে, আমি তাকে পীল বৃক্ষের মিসওয়াক উপহার দিলাম। মিসওয়াকটি পেয়েসে মহা আবেগে আপ্লুত হয়ে তাকে চোখে মুখে লাগাতে লাগল। আনন্দের আতিশয্যে দুচোখ বেয় অশ্রু ধারা বইতে লাগল।

অতঃপর সে পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল। তাতে দুই ইঞ্চি পরিমাণ একটা মিসওয়াক সযত্নে জড়ানো ছিল। মিসওয়াকটি বের কর বলতে লাগল– আমি যখন মুসলমান হয়েছিলাম, তখন এক মুসলমান ভাই এটি আমাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। আমি অতি সাবধানতার সাথে এটা ব্যবহার করতে থাকি। এটুকু তারই অবশিষ্ট অংশ। এখন আপনি আমার উপর খুব বড় ইহসান করেছেন। অতঃপর সে তার জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আমার দাঁত ও দাঁতের মাড়িতে এমন কঠিন রোগ হয়েছিল যে, তদানীন্তন ডাক্তারের চিকিৎসা ছিল দূরহ ব্যাপার। অগ্যতা আমি শুরু করেছিলাম এ মিসওয়াক ব্যবহার করা। কিছুদিন পর পেলাম সেই ডাক্তারকে। আমার দাঁত দেখে তো ডাক্তার হতবাক, জিজ্ঞেস করল আপনি এমন কি ব্যবহার করেছেন, যার ফলে আপনি এত দ্রুত আরোগ্য লাভে সক্ষম হয়েছেন। বললাম আমিতো শুধু আপনার দেয়া ওষুধ ব্যবহার করেছি। ডাক্তার বললেন, কখনো নয়, আমার ঔষধে এত দ্রুত আরোগ্য সম্ভব নয়। বরং আপনি চিন্তা করে বলুন, আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে মনে হলো, আমি তো মুসলমান। আমি না মেসওয়াক ব্যবহার করেছি। অতঃপর তা যখন ডাক্তারকে দেখালাম দেখে ডাক্তার খুবই আশ্বস্থ হলেন এবং নতুনভাবে রিসার্চ শুরু করে দিলেন।

গুরু নানক স্মপর্কে একথা প্রচলিত আছে যে, তিনি সর্বদা হাতে মিছওয়ার্ক রাখতেন, আর মেছওয়াক্ করতেন। তিনি বলতেন, হয়তো এ লাকরী গ্রহণ করো নতুবা রোগকে বরণ কর। দেখুন, কত সুক্ষ্ম কথা তিনি বলেছেন যে, মেছওয়াক দ্বারা রোগ-ব্যাধি দূরীভূত হয়, নতুবা অসুস্থ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

নামাযের আগে মেছওয়াক করার ফযীলত

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে নামাযের পূর্বে মিসওয়ার্ক করে নেয়া হয় সে নামায বিনা মিসওয়াকে আদায়কৃত নামাযের উপর সত্তর গুণ মর্যাদা রাখে। (বায়হাকী)

মানুষের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় সব সময় খোলা ও অনাবৃত থাকে, সেগুলোতে ধুলা-বালি এবং অনেক সময় রোগ জীবাণু প্রবেশের আশংকা থাকে। যেমন হাত, পা, মুখ, নাক ও চোখ ইত্যাদি। তাই অযুর সময় এসব অঙ্গকে ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে মুখের অভ্যন্তরভাগে খাদ্য কণা ইত্যাদি আটকে মানুষের নিজের স্বার্থে এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নামাযের পূর্বে অযুর সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিরাট ফজিলতের কথা উম্মতকে জানিয়ে দিয়ে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

মেছওয়াক করার গুরুত্ব

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি যদি আমার উম্মতের উপর কষ্টের আশংকা না করতাম তবে প্রত্যেক নামাযের (অযুর) সময় মিসওয়াক করে নিতে (ওয়াজিব পর্যায়ের) নির্দেশ দিয়ে দিতাম।

অর্থাৎ উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনা করে তিনি এ দুটি কাজকে ওয়াজিব পর্যায়ে ফেলেননি। কিন্তু সুন্নাত অবশ্যই রয়ে গিয়েছে।

কোন বৃক্ষের মেছওয়াক উত্তম

হাদীস ঃ হযরত মুআয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যয়তুনের মেসওয়াক কতইনা উত্তম। এটা হচ্ছে

পবিত্র বৃক্ষের অংশ, এটা মুখকে দুর্গন্ধ মুক্ত রাখে এবং মুখের ক্ষতও দূর করে। এটা হচ্ছে আমার মিসওয়াক এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণের মিসওয়াক। (কানযুল উম্মল ঃ তাবরানী বরাতে)

অযু সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা

মাসআলা ঃ যৌবনের উত্তেজনায় প্রথম যে পানি বের হয় উহাকে মযী বলে। আর যখন আনন্দ ও মধুরতায় মন ভরে উঠে তখন যে পানি বের হয় উহাকে মনী বলে।

মাসআলা ঃ মযী ও মনী চেনার উপায় হলো, মনী বের হওয়ার পর মন ভরে যায় এবং উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে আসে, কিন্তু মযী বের হওয়ার পর উত্তেজনা কমেনা বরং আরও বেড়ে যায়। তাছাড়া মযী পাতলা হয় এবং মনী গাঢ়। মযী বের হওয়ার কারণে গোসল ফরয হয় না। তবে অযু ভেঙ্গে যায়। আর মনী বের হলে গোসল ফরয হয়।

মাসআলা ঃ পেশাবের পরে মাটি বর্ণের যে গাঢ় পানি বের হয় উহাকে অদী বলে। মযী ও অদী বের হলে অযু ভেঙ্গে যায়।

মাসআলা ঃ পুরুষের স্পর্শে কিংবা কুচিন্তার কারণে মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে পানি আসলে অযু ভেঙ্গে যাবে। উত্তেজনার সময় যে পানি বের হয় উহাকে মযী বলে। মযী বের হলে নির্ভরযোগ্য মতে অযু ভেঙ্গে যায়।

মাসআলা ঃ রোগের কারণে মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে শ্লেষ্মার মত লাচা জাতীয় যে পানি বের হয় উহা নাপাক।

মাসআলা ঃ পেশাব অথবা মযীর ফোঁটা পেশাবের স্থান থেকে বের হয়ে ছিদ্রের বাইরে চলে এসেছে, কিন্তু এখনও পেশাব উপরের চামড়ার ভিতরেই রয়ে গেছে তাহলে অযূ ভেঙ্গে যাবে। অযু ভাঙ্গার জন্যে পেশাব চামড়ার বাইরে আসা জরুরী নয়।

মাসআলা ঃ অযু করার পর গুপ্তাঙ্গ খুলে গেলে কিংবা কারো গুপ্তাঙ্গে দৃষ্টি পড়লে অযু নষ্ট হবে না।

মাসআলা ঃ অযু করার পর পেশাবের জায়গা স্পর্শ করলে (মহিলা-পুরুষ কারো) অযু নষ্ট হবে না।

গোসলের আলোচনা

গোসলের ফরজসমূহ

১। কুলি করা।

২। নাকের ছিদ্রে পানি পৌঁছান।

৩। সমস্ত শরীর ধৌত করা। (আলমগীরী ১ম খঃ ১৮পৃ)

গোসলের সুন্নতসমূহ

১। একবার কুলি করা।

২। একবার নাকের ছিদ্রে পানি পৌঁছান।

৩। সমস্ত শরীর একবার ধৌত করা।

৪। খাতনা করা হয় নাই এমন লিঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করা কঠিন ও কষ্ঠ করা না হয়।

৫। নাভির ভিতরের অংশ ধৌত করা।

৬। কান এবং নাকের অলংকারের ছিদ্রে পানি পৌঁছান।

৭। দাড়ির গোড়ার চামড়া ধৌত করা।

৮। গোঁফের গোড়ার চামড়া ধৌত করা।

৯। ভ্রুর গোড়ার চামড়া ধৌত করা।

১০। মহিলাদের লজ্জাস্থানের ঐ অংশ ধৌত করা যা প্রশ্রাবের পর সাধারণত ধৌত করা আবশ্যক।

১১। পানি ঢেলে গোসল করার মসয় কানের ভাজে পানি পৌঁছান।

গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ

১। (জানাবাত) শুক্রক্ষরণ এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয় আর এটা দুই কারণে হয়ে থাকে।

(ক) উভয় রাস্তা দিয়ে লিঙ্গ প্রবেশ করান ব্যতীত খাহেশাতের সাথে উত্তেজিত হয়ে বীর্য বের হওয়া স্পর্শ করার দ্বারা কিংবা দেখার দ্বারা অথবা স্বপ্নদোষের দ্বারা অথবা হস্ত মৈথুনের দ্বারা ঘুমন্ত অবস্থায় হোক কিংবা জাগ্রত অবস্থায় অবস্থায় এর দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়।

(খ) লিঙ্গ প্রবেশ করানোর দ্বারা হয়ে থাকে অর্থাৎ উভয় রাস্তার যে কোন এক রাস্তা দিয়ে লিঙ্গের অগ্রভাগ প্রবেশ করলে উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হয় বিশুদ্ধ মতানুসারে বীর্য বের হোক বা না হোক।

২। হায়েজের দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়।

৩। নেফাসের দ্বারা গোসল ওয়াজিব হয়।

মাসআলা ঃ কোন মহিলার যদি বাচ্চা প্রসব হয় কিন্তু রক্ত প্রকাশ না পায় বিশুদ্ধ মতানুসারে তার উপরও গোসল ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী ১ম খঃ ২০পৃঃ)

ফরজ গোসলের প্রকারভেদ

যথা (১) জানাবাত শুক্রক্ষণ (২) হায়েয (৩) নেফাছের গোসল।

ওয়াজিব গোসল

১. মৃত ব্যক্তির গোসল।

২. নাপাক অবস্থায় যদি কোন কাফের মুসলমান হয় তার উপরও গোসল ওয়াজিব।

ছুন্নত গোসল

১. জুমার দিন ২. উভয় ঈদের দিন ৩. আরাফার দিন ও ৪. এহরামের সময় গোসল করা। যখন কোন কাফের যুনুবী (নাপাক) অবস্থা ব্যতীত মুসলমান হয় তখন গোসল করা মুস্তাহাব। (আলমগীরী ১ম খঃ ২২পৃঃ)

মুস্তাহাব গোসল

১. মক্কায় পৌছার জন্য গোসল করা।

২. মুজদালেফায় অবস্থান করার জন্য গোসল করা।

৩. মদীনায় প্রবেশ করার জন্য গোসল করা।

৪. কোন পাগল ভাল হওয়ার পর গোসল করা।

৫. কোন বালক বয়সের হিসাবে যখন বালক হয় তখন গোসল করা।

৬. শবে বরাতের রাত্রে গোসল করা।

৭. শবে কদরের রাত্রে।

৮. সূর্য গ্রহণ ও চন্দ্র গ্রহণের নামাযের জন্য গোসল করা।

৯. বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য।

১০. ভয় দূর করার জন্য।

১১. অন্ধকার দূর করার জন্য।

১২. ধুলি ঝড় দূর করার জন্য।

১৩. মাহফিলে যাওয়ার জন্য যেন ময়লা ও ঘামের দুর্গন্ধের দ্বারা মানুষের কষ্ট না হয়।

১৪. নতুন কাপড় পরিধান করার জন্য।

১৫. মুর্দা গোসল দেওয়ার পর।

১৬. ছফর হতে আসার পর।

১৭. মুস্তাহাযা মহিলার জন্য।

১৮. অজ্ঞান হওয়ার পর পুণরায় জ্ঞান ফিরলে উল্লেখিত ছুরাতে গোসল করা মুস্তাহাব। (খানিয়া ১ম খঃ ২৩পৃঃ)

গোসল সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা ঃ

মাসআলা ঃ গোসলের সময় পেশাবের জায়গার অগ্রভাগের চামড়ার ভিতরে পানি পৌঁছানো ফরয। যদি পানি না পৌঁছে তাহলে ফরয গোসল শুদ্ধ হবে না। তদ্রূপ পুরুষের মুসলমানী করানোর পূর্বে পেশাবের জায়গায় চামড়ার ভিতরে পানি না পৌঁছালে ফরয গোসল আদায় হবে না।

মাসআলা ঃ পুরুষ কিংবা মহিলার জাগ্রত কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় কামোত্তেজনার সঙ্গে মনী (বীর্য) বের হওয়ার ফলে গোসল ফরয হয়।

মাসআলা ঃ পুরুষাঙ্গের সুপারী পরিমাণ অংশ মহিলার যৌনাঙ্গের ভিতরে প্রবেশ করলে পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপর গোসল ফরয হয়ে যায়। যদিও মনী বের না হয়।

মাসআলা ঃ প্রতি মাসে মহিলার সামনের রাস্তা দিয়ে যে রক্ত বের হয় উহাকে হায়েয বলে। এ রক্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ারপর গোসল করা ফরয। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যে রক্ত আসে উহাকে নেফাস বলে। ইহা বন্ধ হওয়ার পরে ও গোসল করা ফরয।

মাসআলা ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ের সঙ্গে সহবাস করলে মেয়ের উপর গোসল করা ফরয হয় না। কিন্তু অভ্যাস গড়ে তোলার জন্যে গোসল করানো উচিত।

মাসআলা ঃ নিজের যৌনাঙ্গ হতে মনী বের হওয়ার পর গোসল করে নিল। গোসল শেষে আবারও মনী বের হলো, তাহলে তার পুনরায় গোসল করা ফরয।

মাসআলা ঃ যদি রোগের কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে পুরুষ অথবা মহিলার বীর্যপাত হয় এবং উত্তেজনা, কামভাব ও চাহিদা আদৌ না থাকে তাহলে গোসল ফরয হবে না। তবে অযু নষ্ট হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ যার উপর গোসল ফরয সে যদি গোসলের পূর্বে পানাহার করতে চায় তাহলে প্রথমে হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করবে এবং কুলি করে নিবে। তারপর পানাহার করবে।

মাসআলা ঃ যার উপর গোসল ফরয এমন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা, কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ও পড়া নিষিদ্ধ।

মাসআলা ঃ যদি কামভাবের সাথে বীর্য স্বীয় স্থান হতে পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু আঙ্গুল অথবা অন্য কিছু দ্বারা ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কামভাব চলে যাওয়ার পর বীর্য নির্গত হয় তাহলে গোসল করা ফরয।

মাসআলা ঃ যার গোসলের প্রয়োজন হয়, তার জন্যে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ও পড়া এবং মসজিদে প্রবেশ করা জায়েয নাই। আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা, দরূদ শরীফ পাঠ করা জায়েয আছে।

মাসআলা ঃ তাফছীরের কিতাব গোসল ও অযুবিহীন স্পর্শ করা মাকরূহ এবং কুরআন শরীফ স্পর্শ করা একেবারে হারাম।

মাসআলা ঃ মূত্র রোগী প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে এস্তেঞ্জা করবে এবং কাপড়ের যে অংশে পেশাবের ফোটা লাগে উহা অবশ্যই ধৌত করে নিবে। কিংবা প্রতি ওয়াক্তে লুঙ্গী ও পায়জামা পরিবর্তন করবে।

গোসলের মাসআলা

মাসআলা ঃ জুমুআ এবং ঈদ যদি একই দিনে হয় এমতাবস্থায় এক গোসলই উভয়টির জন্য যথেষ্ঠ হবে। (আলমগীরী ১ম খঃ ২৩পৃঃ)

মাসআলা ঃ ফজরের পূর্বে কেউ যদি গোসল করে এবং এর দ্বারাই জুমার নামায আদায় করে ইমাম আবু ইউছুফ (রাঃ) এর নিকট সে জুমার গোসলের ফজিলত পাবে না। (আলমগীরী ১ম খঃ ২৩পৃঃ)

গোসলের সুন্নাত সমূহ

১। বিসমিল্লাহ্ বলে গোসল খানায় প্রবেশ করা।

২। উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিন বার ধৌত করা।

৩। মেছওয়াক করা।

৪। ইস্তেঞ্জার স্থান ভাল করে ধৌত করা।

৫। শরীরের কোন স্থানে নাপাক লেগে থাকলে তা দূর করা।

৬। উভয় পা ধৌত করা ব্যতীত নামাযের অযুর ন্যায় অযু করা।

৭। গোসলের মধ্যে লজ্জাস্থান প্রথমে ধৌত করা সুন্নত তাতে নাপাকী থাকুক বা না থাকুক।

৮। শরীর ধৌত করার পূর্বে অযু করে লওয়া অযু থাকুক বা না থাকুক বিশুদ্ধ অভিমত হল মাথাও মাছেহ করে নিবে। (আলমগীরী ১ম খঃ ১৯পৃঃ)

৯। তিন বার মাথায় ও সমস্ত শরীরে পানি বিশুদ্ধ মতানুসারে প্রথম বার পানি ঢালা ফরজ বাকী দুবার সুন্নত।

১০। প্রথমে নিয়ত করা এবং এরূপ বলা যে আমি অপবিত্রতা দূর করার জন্য গোসল করছি।

১১। অতঃপর উভয় হাত ধৌত করার সময় বিসমিল্লাহ।

১২। অতঃপর ইস্তেঞ্জা করা।

১৩। পানি প্রয়োজনের অধিক বা কম খরচ না করা।

১৪। গোসলের সময় কিবলার দিকে মুখ না করা।

১৫। প্রথম বার পানি ঢালার পর সমস্ত শরীর মেজে নেয়া।

১৬। লোকের অগোচরে গোসল করা।

১৭। গোসলের সময় অবশ্যই করো সাথে কথা না বলা।

১৮। গোসলের পর মোটা কাপড় অর্থাৎ তোয়ালে গামছা ইত্যাদি দিয়ে সমস্ত শরীর মুছে নেওয়া। (আলমগীরী ১ম খঃ ১৯পৃঃ)

১৯। গোসল শেষ হওয়ার পর গোসলখানা হতে বের হয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে নিম্মের দোয়াটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ *

উচ্চারণ ঃ আল্লহুম্মাজ আলনী মিনাত্তা ওয়াবীনা ওয়াজা আলনী মিনাল মুতাত্তহ্হিরীন।

মাসআলা ঃ গোসলখানা সাধারণতঃ অপরিষ্কার থাকে। সুতরাং পায়খানার ন্যায় গোসল খানায় ও প্রবেশের সময় প্রথমে বার পা রাখবে এবং বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা রাখবে এবং বিছমিল্লাহ বলে গোসল খানায় প্রবেশ করবে তবে গোসল খানা যদি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং তার ভিতর পায়খানা না থাকে তখন প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় যে পা ইচ্ছা প্রথমে রাখতে পারবে।

(আহছানুল ফতোয়া ২য় খঃ ৩৭ পৃঃ)

গোসলকারী প্রথমে মনে মনে নিয়ত করবে যে, আমি এই গোসল অপবিত্রতা হতে দূর হওয়ার জন্য করছি। অতঃপর বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে। অতঃপর পেশাব পায়খানার স্থান ধৌত করবে। তাতে নাপাক থাকুক বা না থাকুক সর্বাবস্থায় এই দুইটি প্রথমে পরিষ্কার করতে হবে। অতঃপর শরীরের কোন স্থানে লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। অতঃপর অযু করে নিবে। কিন্তু এরূপ স্থানে দাঁড়িয়ে যদি গোসল করা হয় সেখানে গোসলের পানি পায়ের স্থানে জমা হয় তখন গোসলের পর উক্ত স্থান

হতে সরে পুনরায় পা ধৌত করতে হবে। এমতাবস্থায় অযু করে পা বাকী রেখে দিবে। অযু করার পর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে। অতঃপর তিনবার পানি ঢালবে। অতঃপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালরে। অতঃপর সমস্ত শরীরে পানি বহায়ে দিবে। (প্রথম বার পানি ঢালার পর সমস্ত শরীর ভালরূপে মেজে নিবে।)

অতঃপর উক্ত স্থান হতে সরে পাক স্থানে এসে পা ধৌত করে নিবে। অযুর সময় ধৌত করে থাকলে পুনরায় ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

(বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৫৫ পৃঃ, আলমগীরী ১ম খঃ, ৫২ পৃঃ)

মাসআলা ঃ বসে গোসল করা উত্তম। এর মধ্যে অধিক পর্দা রক্ষা হয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে গোসল করতেন।

(আহসানুল ফতোয়া ঃ ২য় খঃ ৩৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ গোসল করা অবস্থায় কালেমা বা অন্য কোন দোয়া পাঠনা করা উত্তম। এ সময় কিছুই পড়বে না। (বেহেশতি জেওর ঃ ৫৫ পৃঃ)

মাসআলা ঃ গোসলখানার ভিতর উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে কাপড় খোলার আগে বিসমিল্লাহ বলবে আর লুঙ্গি গামছা ইত্যাদি বেঁধে গোসল করলে কাপড় বাঁধার পর বিসমিল্লাহ বলবে। (আহসানুল ফতোয়া ২য় খঃ ৩৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ নাকের হাড় যে স্থান হতে আরম্ভ হয়েছে উক্ত স্থান পর্যন্ত (ফরজ) গোসলের সময় পানি পৌঁছানো ফরজ।

(আহসানুল ফতোয়া ২য় খঃ ৩৭ পৃঃ, আলমগীরী ১ম খঃ ১৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ নাকের ভিতর যদি শুকনা আবর্জনা লেগে থাকে তাতে গোসল পূর্ণ হবে না কেননা তার নীচে পানি পৌঁছে না। (আলমগীরী ১ম খঃ ১৮পৃঃ)

মাসআলা ঃ নখের ভিতর যদি গোলা আটার খামিরা লেগে থাকে তাতেও গোসল পূর্ণ হবে না। তবে নখের ভিতরের ময়লা গোসলের প্রতিবন্ধক নয়; একই ভাবে শুকনা ও ভিজা মাটি ও গোসলের প্রতিবন্ধক নয়।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ চর্ম কার এবং এ কারিগরের নখে যদি রং মোম ইত্যাদি লেগে থাকে তা গোসলের জন্য প্রতিবন্ধক অর্থাৎ এর দরুন গোসল পূর্ণ হয় না কারো মতে পরিষ্কার করা কষ্টসাধ্য ও জরুরতের কারণে তা গোসলের প্রতিবন্ধক নয়।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ মহিলাদের চুল যদি খোলা থাকে তার ভিতর পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ শরীরের কোন স্থানে যদি মাছের চামড়া অথবা চিবানো রুটি লাগা থাকে আর তার নিচে পানি না পৌঁছে তাতে গোসল আদায় হবে না। তবে শরীরের কোন স্থানে মশা মাছির মল লেগে থাকলে গোসল হয়ে যাবে।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য তার পাতলা দাড়ির ভিতর পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ পুরুষের জন্য তার দাড়ির ভিতর পানি পৌঁছানো ওয়াজিব যেমন ভাবে দাড়ির গোড়াতে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। পুরুষের চুল জটা বাঁধা থাকলে এর ভিতরেও পানি পৌঁছানো ওয়াজিব।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ মহিলারা তাদের মাথায় যদি এমন গাঢ় খুশবু ব্যবহার করে যা চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হয় এমতাবস্থায় উক্ত খুশবু দূর করা তার উপর ওয়াজিব। যেন পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছতে পারে।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কানের বালি এবং আংটি যদি টাইট হয় তা নাড়া চাড়া করে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। (আরমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কানে যদি অলংকার না থাকে আর উপর হতে পানি ঢেলে গোসল করার সময় যদি অনায়াসে কান বা নাকের ছিদ্রে পানি পৌঁছে যায় এতেই যথেষ্ট হবে; কিন্তু পানি যদি না পৌঁছে তাতে পানি পৌঁছাতে হবে অন্যথায় গোসল আদায় হবে না। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ নাকের বালির ছিদ্রে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব। খুব ভাল করে পানি পৌঁছানোর জন্য উহাঁতে আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ সারা শরীরে চুল পরিমাণ স্থানও যদি শুকনা থাকে এতে গোসল আদায় হবে না এমনিভাবে ফরজ গোসল এর সময় নাকে পানি দেওয়া বা কুলি করতে ভুলে গেলে গোসল আদায় হবে না। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৫৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ গোসলের পর কোন জায়গা শুকনা থেকে গেলে পুণরায় গোসল করা ওয়াজিব নয় শুধুমাত্র শুকনা স্থানটা ধৌত করে নিলে চলবে। শুধু ভিজাহাত বুলায়ে নেয়া যথেষ্ট নয় বরং সামান্য পানি উক্ত স্থানে গড়িয়ে দিলে হবে। কুলি বা নাকে পানি দেয়া ভুলে গেলে শুধু কুলি করে নিলে এবং নাকের ছিদ্রে পানি দিলেই যথেষ্ঠ হবে। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৫৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কান এবং নাকের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবে কেননা কানের ভাজে কিংবা নাকের ছিদ্রে যদি পানি না পৌঁছে তাতে গোসল আদায় হবে না।

(বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৫৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ দাঁতের ফাঁকে যদি সুপারির কণা আটকায়ে থাকে তা খেলাল করে বের করে ফেলবে এর দরুণ যদি দাঁতের ফাঁকে পানি না পৌঁছে তাতে গোসল আদায় হবে না। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৫৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারো চোখের কিনারায় কেতর হয়ে যাদি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে, তা উঠানো ব্যতীত তার নীচে পানি পৌঁছে না এমতাবস্থায় তা উঠিয়ে ফেলা তার উপর ওয়াজিব। উঠানো ব্যতীত অযু গোসল কোনটাই আদায় হবে না। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৫৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ এক মহিলা অপর মহিলার সামনে নাভি হতে হাটুর নীচ পর্যন্ত স্থান খোলা গুনাহ। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৫৬ পৃঃ)

তায়াম্মুমের আলোচনা

তায়াম্মুমের ফরজ

১। নিয়ত করা।

২। সমস্ত মুখ মাছেহ করা।

৩। উভয় হাত কনুইসহ মাছেহ করা।

তায়াম্মুমের সুন্নাত সমূহ

১। তায়াম্মুমের শুরুতে বিছমিল্লাহ পড়া। (আলমগীরী ১ম খঃ ৪৫ পৃঃ)

২। তারতীবের খেয়াল রাখা অর্থাৎ প্রথমে চেহারা তার পর কনুইসহ উভয় হাত মাছেহ করা। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৫ পৃঃ)

৩। দুই রুকনের মধ্যে বিলম্ব না করা। (আলমগীরী ১ম খঃ ৪৫ পৃঃ)

৪। উভয় হাত মাটিতে মারার পর সামনের দিকে বাড়ানো।

৫। এবং পিছনের দিকে টানা। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৫ পৃঃ)

৬। মাটিতে হাত মারার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা রাখা।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৫ পৃঃ)

৭। মাটিতে হাত মারার পর হাত উঠিয়ে উভয় হাতকে ঝাড়া।

৮। দাড়ি খেলাল করা।

(আহসানুল ফতোয়া ২য় খঃ ৫৮ পৃঃ, ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৫ পৃঃ নুরুল ইজযাহ)

তায়াম্মুমের কতিপয় বিধান

মাসআলা ঃ উভয় হাত মাটিতে মেরে প্রথমে সামনের দিকে বাড়াবে তারপর পিছনের দিকে টানবে অতঃপর উভয় হাত উঠিয়ে ঝাড়িয়ে নিবে এই পরিমাণ ঝাড়বে যেন মাটি ঝরে যায় অতঃপর এর দ্বারা এরুপ ভাবে মুখ মাছেহ করবে যেন কোন অংশ বাকী না থাকে তারপর পুণরায় উভয় হাত মাটিতে মারবে এবং উভয় কনুইসহ মাছেহ করবে। আমাদের (হানাফী) মাশায়েখগণ বলেন যে বাম হতের চার আঙ্গুলের মাথা দিয়ে ডান হাতের উপরের দিক কনুই পর্যন্ত মাছেহ করবে। অতঃপর বাম হাতের পাতা দিয়ে ডান হাতের নিচের দিক কবজি পর্যন্ত মাছেহ করবে এবং হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরের দিক মাছেহ করবে বাম হাতের মাছেহও এরূপভাবেই করবে এর মধ্যেই অধিক সতর্কতা। (আলমগীরী ১ম খঃ ৪৬ পৃঃ) অতঃপর আঙ্গুলগুলো খেলাল করে নিবে। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ নামায পড়ার ইচ্ছা ব্যতীত কাউকে শিখানোর উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করলে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া জায়েয হবে না।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৩১ পৃঃ)

মাসআলা ঃ যার উভয় হাত কবজি পর্যন্ত কাটা তায়াম্মুমের সময় তার বাহুতে মাছেহ করবে যার বাহু ও কাটা সে কাটা স্থানটি মাছেহ করবে আর যার হাত কনুইর উপরের অংশে কাটা তার মাছেহ করা ওয়াজিব নয়।

(আলমগীরী ১ম খঃ ৩১ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারো যদি উভয় কব্জি কাটা হয় সে তার হাত জমিনে ঘসিয়ে নিবে এবং মুখ দেয়ালে নিয়ে নিবে তার জন্য এটাই যথেষ্ট তবু সে নামায ছাড়তে পারবেনা। (আলমগীরী ১ম খঃ ৩৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ তায়াম্মুমের সময় উভয় অঙ্গে উত্তম রূপে মাছেহ করা ওয়াজিব এটাই পছন্দনীয় অভিমত কেউ যদি ভ্রুর নিচে এবং চোখের উপর মাছেহ না করে তার তায়াম্মুম ছহীহ হবে না। তায়াম্মুমের সময় আংটি চুড়ি খুলে ফেলা আবশ্যক। (ফতোয়ায়ে আরমগীরী ১ম খঃ ৪০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ আমাদের (আহনাফের) নিকট ওয়াক্ত আসার পূর্বেও তায়াম্মুম করা জায়েয এবং তায়াম্মুমের দ্বারা একাধিক ফরয ও নফল পড়া জায়েয।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারো যদি প্রবল ধারনা হয় যে, শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে এবং পানির স্থান যদি উক্ত ব্যক্তি হতে এক মাইলের ভিতর থাকে

এমতাবস্থায় শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব এটাই ছহীহ্ অভিমত। আর পানি পাওয়ার স্মভাবনা যদি না থাকে তবে দেরী না করে মুস্তাহাব ওয়াক্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিবে। (অলমগীরী ১ম খঃ ৪৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারো যদি উভয় হস্ত পদ কাটা থাকে এবং মুখেও জখম থাকে এমতাবস্থায় তাহারাত ব্যতীত সে নামায পড়ে নিবে তায়াম্মুম করতে হবে না এবং উক্ত নামাযগুলো পুণরায় দুহরাতেও হবে না এটাই বিশুদ্ধ অভিমত।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারো যদি এমন অবস্থা হয় যে, অযু করলে তার পেশাব বাড়তে থাকে তায়াম্মুম করলে এমন হয় না, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ মুক্তাদীর জন্য ঈদের জামায়াত ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে তায়াম্মুম করা জায়েয অন্যথায় জায়েয নয়।

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ৪৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কেউ যদি জঙ্গলে থাকে এবং সে মোটেই জানে না যে পানি কোথায় আছে এবং জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোকও নেই যার নিকট সে জানতে পারে, এমতাবস্থায় তার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। আর যদি লোক পাওয়া যায় এবং সে শরয়ী এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়ার সংবাদ দেয় এবং তারো এরূপ বিশ্বাস হয় যে, সংবাদটি সত্য অথবা মানুষতো পাওয়া যায়নি তবে কোন নিদর্শনের দ্বারা তার মন যদি এমন সাক্ষ্য দেয় যে এ স্থানে শরয়ী এক মাইলের ভিতর অবশ্যই পানি আছে এমতাবস্থায় পানি এ পরিমাণ তালাশ করা তার জন্য অবশ্যক, যাতে তার এবং তাদের সাথীদের কোন প্রকার কষ্ট বা ক্ষতি না হয়। তালাশ করা ব্যতীত তায়াম্মুম করা জায়েয নয় আর যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে শরয়ী এক মাইলের ভিতর পানি আছে এমতাবস্থায় তার জন্য পানি খুঁজে তা ব্যবহার করা ওয়াজিব। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৬ পৃঃ)

শরয়ী এক মাইল ইংরেজি এক মাইলের চেয়ে সামান্য বড়। ইংরেজি এক মাইল হয় ১৭৬০ গজে আর শরয়ী এক মাইল হয় ১৯৮০ গজে। এ মাইলের চেয়ে অধিক দূরে যদি পানির লক্ষণ পাওয়া যায় এত দূরে যেয়ে পানি সংগ্রহ করা ওয়াজিব নয় এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নেয়া জায়েয।

(বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৬ পৃঃ)

মাসআলা ঃ অসুখের দরুন পানি যদি ক্ষতিকর হয় অর্থাৎ অযু কিংবা গোসল করলে অসুখ বেড়ে যাবে অথবা দেরীতে আরোগ্য হবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম

করা জায়েয তদ্রুপ ঠাণ্ডা পানি যদি ক্ষতিকর হয় আর গরম পানি পাওয়া সম্ভব না হলে তখন তায়াম্মুম করা জায়েয। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ শরঈ কারণে যে পর্যন্ত পানি দ্বারা অযু করা সম্ভব না হয় সর্বদা তায়াম্মু করতে থাকবে যত দিনই অতিবাহিত হোক না কেন। মনে কোন প্রকার সংকোচ বা ওয়াছওয়াছা আনবে না। অযু এবং গোসলের দ্বারা যতটুকু পবিত্রতা অর্জন হয় তায়াম্মুমের দ্বারাও ততটুকু পবিত্রতা অর্জন হয়। এরূপ ধারণা করতে নেই যে, তায়াম্মুমের দ্বারা পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন হয় না।

(বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কোথাও যদি এরূপ শীত বা বরফ পড়ে যে গোসল করার ফরে মরে যাবে বা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার অশংকা হয় এবং কোন আসবাব পত্র না পায় যার দ্বারা গোসলের পর গরম হয়ে যাবে এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয।

(বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৭ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কারো যদি গোসল করলে ক্ষতি হয় অযু করলে ক্ষতি না হয় এমতাবস্থায় গোসলের স্থলে তায়াম্মুম করবে এবং গোসলের তায়াম্মুমের পর যদি অযু ভেঙ্গে যায় তখন অযুর স্থলে অযুই করতে হবে অযুর স্থলে তায়াম্মুম করতে পারবে না। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ গোসলের জন্য কেউ যদি তায়াম্মুম করে ঐ তায়াম্মুম করা জায়েয, তেমনি ভাবে গোসলের পরিবর্তে ও তায়াম্মুম করা জায়েয যে মহিলা হায়েয এবং নেফাছ হতে পবিত্র হয়েছে অপরাগ অবস্থায় তার জন্যও তায়াম্মুম করা জায়েয অযু এবং গোসলের তায়াম্মুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই উভয়টির একই নিয়ম। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৯ পৃঃ)

মাসআলা ঃ তায়াম্মুম করার সময় মনে মনে এরূপ ইচ্ছা করে নিবে যে, আমি পবিত্রতা অর্জন করার জন্য তায়াম্মুম করছি অথবা নামায পড়ার জন্য তায়াম্মুম করছি। এতেই তায়াম্মুম ছহীহ হয়ে যাবে। এরূপ ইচ্ছা করা অবশ্যক নয় যে, আমি অযুর জন্য কিংবা গোসলের জন্য তায়াম্মুম করছি। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৭০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কেউ যদি কোরআন শরীফ স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে তায়াম্মুম করে উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া জায়েয নয় তবে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যদি তায়াম্মুম করা হয় উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা অন্য ওয়াক্তের নামায পড়া ও কোরআন স্পর্শ করা জায়েয হবে। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৭০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কোন অসুস্থ ব্যক্তির যদি দুই এক বার এরূপ অভিজ্ঞতা হতে থাকে যে, অযু করলে তার ঠাণ্ডা লেগে যায় এমতাবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার জন্য তার অভিজ্ঞতা বা কোন বিজ্ঞ ডাক্তারের রায়ই যথেষ্ঠ।

(আগলাতুল আওয়াম ৪৪ পৃঃ)

মাসআলা ঃ পানি ব্যবহারের দ্বারা জান মালের কোন প্রকার ক্ষতি না হলে পানি ব্যবহার করা ওয়াজিব। পানির মূল্য স্বভাবিক মূল্যের চেয়ে অধিক হলে তাও ক্ষতির মধ্যে গণ্য। এমতাবস্থায় তার উপর অযু করা অবশ্যক নয় তায়াম্মুম করা জায়েয হবে। (আলমগীরী ১ম খঃ ৪০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ জমিন অথবা যে সমস্ত বস্তু মাটি জাতীয় তাতে তায়াম্মুম জায়েয যেমন মাটি, বালি, পাথর, চুনা, সিমেন্টের মসলা, পাকা মেঝে, পাকা ছাদ সুরমা ইত্যাদি। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৮ পৃঃ)

মাসআলা ঃ পাথরে যদি মোটেই ধুলি না থাকে তাতেও তায়াম্মুম জায়েজ হবে। এমনকি পানি দ্বারা ধৌত করা হলেও তাতে তায়াম্মুম জায়েজ। হাতে ধুলি লাগা আবাশ্যক নয়। পাকা ইটেও তায়াম্মুম জায়েয তাতে ধুলি থাকুক না থাকুক। (বেহেশতি জেওর ১ম খঃ ৬৯ পৃঃ, আলমগীরী ১ম খঃ ৪০ পৃঃ)

১। যে সব কারণে অযু ভঙ্গ হয় সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়।

২। পানি ব্যবহারে যদি পূর্ণ সক্ষম হয় যা তার প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত তখনও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী ১ম খঃ ৪৫ পৃঃ)

৬ষ্ঠ অধ্যায়

নামাযের আলোচনা

নামাযের গুরুত্ব ও ফায়দা

১। নামায বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করার সর্বোত্তম আমল।

২। নামায নমাযী ব্যক্তির পাপ মোচন করে দেয়।

৩। নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সব থেকে বেশি নৈকট্য অর্জন হয়।

৪। কেয়ামতের দিবসে নামায নামাযী ব্যক্তির জন্য নূর হবে।।

৫। যে ব্যক্তি ভালভাবে নামায আদায় করবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে তার রিযিকের সমস্যা দূর করে দিবেন।

৬। যে ব্যক্তি ভালভাবে নামায আদায় করবে আল্লাহ পাক কবরের আযাব থেকে তাকে মুক্তি দিবেন এবং অন্যান্য হিসাবও তার জন্য সহজ হয়ে যাবে এবং পরিশেষে এই নামাযই তার নাজাতের ওছীলা হবে।

৭। নামায নামাযী ব্যক্তিকে সমস্ত গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং নামাযী ব্যক্তির অন্তরে এক ধরনের প্রশান্তি আনয়ন করে।

ফায়দা ঃ কোরআন-হাদীস বিশ্লেষণ করলে অসংখ্য আয়াত এবং হাদীস দ্বারা আমরা নামাযের ফযিলত জানতে পাই। তা থেকে আমরা বুঝতে পাই নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ফযীলতপূর্ণ একটি ইবাদত। একারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে মুমিনের জন্য মেরাজ বলে আখ্যা দিয়েছে। নামাযের মাধ্যমেই বান্দা মহান প্রতিপালক আল্লাহপাকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, যে নামাযের ফযীলত সম্পর্কে অগণিত হাদীসে এবং আয়াত রয়েছে যে নামায মানুষের সকল পেরেশনী মুক্তকরে দিবে যে, মানুষের রিযিকের সমস্যার সমাধান করে দিবে, যে নামায মানুষকে যাবতীয় গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবে, যে নামায মানুষকে ভয়াবহ কবরের আযাব থেকে মুক্তি দিবে সে নামায হল ঐ নামায যে নামায সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ইরশাদ করেছেন- صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّىْ

তোমরা এমনভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে তোমরা নামায পড়তে দেখ" অথাৎ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়েছেন ঠিক সেভাবে যদি আমরা নামায পড়তে পারি তাহলে তখনই আমরা

পূর্বে বর্ণিত ছওয়াবের অধিকারী হতে পারব। এজন্য আমাদের কর্তব্য, আমরা যেন আমাদের নামাযে যে সমস্ত ত্রুটি রয়েছে তা শুধরিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামায পড়েছে, সেভাবে নামায পড়ার চেষ্টা করি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, আমরা দুনিয়াবী কোন কাজে যদি একবার ব্যর্থ হই তাহলে বার বার চেষ্টা করতে থাকি যেমন কোন ব্যক্তি যদি জেনারেটর লাগায় কিন্তু তাতে আলো না হয় তা হলে সে মিস্ত্রির মাধ্যমে হোক বা যে কোন ভাবে তা ঠিক করে যথাযথ করার চেষ্টা করে, একবার না হলে বারবার করে জেনারেটরের যে ফল তা ভোগ করার চেষ্টা করে কিন্তু নামায এমন একটি ইবাদত যার মাধ্যমে আমরা দুনিয়া-আখেরাতের অনেক ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারি। কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে নামায আমাদের ইহকালীন যে সমস্ত কাজে আসার কথা ছিল তা আসছেনা। অথচ এই নামাযের মাধ্যমেই হযারাতে ছাহাবায়ে কিরাম এ ধরনের সমস্যার সমাধান করেছেন। কিন্তু নামায আমাদের বেলায় তেমন ফলপ্রস হচ্ছে না। তাহলে আমরা নিঃশংকোচে বলতে পারব যে, এই নামায মূলত যে ভাবে হওয়ার দরকার ছিল সে ভাবে হচ্ছে না। তাহলে আমাদের মধ্য কি অনুশোচনা অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় যে, হায় আমরা দুনিয়ার অন্ধকার দূর করার জন্য তো জেনারেটার এক বারের জায়গা বার বার খুলে ঠিক করছি, কিন্তু ভয়াবহ কবর সংকটময় কিয়ামত দিবসের মুক্তির চাবিকাঠি নামাযকে কি আমাদের পরিপূর্ণ সুন্নত তরীকায় আদায় করতে একটু চেষ্টা করা উচিত নয়? বিষয়টি অবশ্যই ভাবনার। কেননা নামাযের তো দুই ধরণের ফায়দা কিছু দুনিয়াতে কিছু আখেরাতে যখন আমাদের এই নামায দুনিয়ার সাধারণ সমস্যার সমাধান করছে না তাহলে আমরা কি ভাবে নিশ্চিন্তায় থাকতে পারি যে, এই নামায কবরের ভয়াবহ আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করবে। তাই পুরুষ হোক বা নারী সকলের দায়িত্ব নিজেদের নামাযকে পরিপূর্ণ সুন্নাতী নামায বানানোর জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা। আল্লাহ পাক আমাকে এবং সকল পাঠক পাঠিকাদেরকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বর্ণনা অনুপাতে নামায আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

হাদীসের আলোকে নামাযের ফযীলত

হাদীস ঃ হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) একদা আছরের নামায আদায় করতে দেরী করে ফেললেন। হযরত ওরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রহঃ) তাঁকে বললেন, হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) নামায পড়তে এরূপ বিলম্ব করলে হযরত আবু মাছউদ আনসারী (রাঃ) তাঁকে রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস

করেছিলেন, হে মুগীরা! আপনি কি অবগত আছেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে পাঠিয়েছিলেন? তিনি প্রত্যেক নামায তার ওয়াক্তমত পড়লেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনার প্রতি আল্লাহর আদেশ হল আপনি এই নির্ধারিত সময়সমূহে নামায আদায় করবেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) একথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, হে ওরওয়াহ! চিন্তা করে কথা বলুন। স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে নামাযের সময় নির্ধারণ করেছেন কি? তিনি বললেন, হাঁ। নিশ্চয়ই হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রাঃ)-এর ছেলে বশির তাঁর পিতা হতে এটা আমাকে শুনিয়েছেন। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও প্রমাণিত হয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছর নামায এরূপ বিলম্বে পড়তেন না যেরূপ বিলম্বে তিনি ঐ দিন পড়েছিলেন।

হাদীস ঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম কোন আমল আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওয়াক্ত অনুযায়ী নামায আদায় করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর? আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। এ পর্যন্ত ক্ষান্ত করা হল, আমি আরো জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও উত্তর দিতেন।

হাদীস ঃ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ছিলাম। একদা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের প্রতি দৃষ্টি করে রাসূলুল্লাাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে এইরূপ স্পষ্টরূপে দেখতে পাবে যেমন এই পূর্ণিমার চাঁদকে দেখছ কোন প্রকার ভিড় ও কোলাহল ছাড়াই দেখতে পারে; কিন্তু এই নেয়ামত হাসিলের জন্য সূর্য উদয়ের ও অস্তের পূর্ববর্তী নামায দ্বয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

হাদীস ঃ হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি এবং আমার সাথীগণ যারা আবিসিনিয়া হতে জাহাজ যোগে মদিনায় এসেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান হতে দূরে অবস্থান করতাম তাই আমরা দুই একজন করে পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকতাম, একদা আমি ও আমার কয়েকজন

সাথী তাঁর খেদমতে পৌছলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কাজে আবদ্ধ ছিলেন, তাই এশার নামায পড়তে বিলম্ব হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাত অধিক হওয়ার পর মসজিদে আসলেন এবং নামাযান্তে সকলকে অপেক্ষা করতে আদেশ করে বললেন, তোমরা ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ গ্রহণ কর, তোমাদের উপর আল্লাহর অতি বড় নেয়ামত যে তোমরা ব্যতীত অন্য কোন উম্মত এ সময় নামায পড়ে নাই। হযর আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি শুনে সন্তুষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরলাম।

হাদীস ঃ হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঠাণ্ডা সময়ের নামাযদ্বয় আদায়ে অভ্যস্ত হবে সে ব্যক্তি বেহেশতী হবে।

হাদীস ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একাকী নামায পড়া অপেক্ষা জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ফযীলত সাতাইশ গুন বেশি সওয়াব।

হাদীস ঃ হযরত আবূ ছাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, প্রত্যেকের জন্য একাকী নামাযের চেয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা পঁচিশ গুণ সওয়াব বেশি, রাতের ও দিনের ফেরেশতারা ফজরের নামাযে সম.বত হন, তিনি এরপর বলতেন র্যদি চাও পাঠ কর। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (অর্থাৎ ফেরেশতাদের উপস্থিতর সময়)।

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন; "রাস্তায় চলতে এক ব্যক্তি রাস্তার উপর একটি কাটা ওয়ালা ডাল দেখতে পেয়ে সরায়ে ফেলল, আল্লাহ তার গোনাহ ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে পুরুস্কৃত করলেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ যথা- প্লেগে মৃত এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, লোকেরা যদি জানত আযান দেয়ার ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর কি সওয়াব তাহলে লটারী ছাড়া অন্য উপায় না পেলে তারা অবশ্যই লটারী করত, যদি তারা প্রখন রোদ্রে মসজিদে আসার সওয়াব জানত তবে তারা অবশ্যই তার জন্য দৌড়িয়ে যেত, যদি তারা এশা ও ফজরের নামাযের ছওয়াব জানত তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও মসজিদে আসত।

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মোনাফেকদের উপরই ফজর এবং এশা সর্বাপেক্ষা ভারী। লোকেরা যদি ফজর ও এশার জামায়াতের ফজিলত জানত, তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ নামাযদ্বয়ের জামায়াতে উপস্থিত হত।

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কাছে পালাক্রমে একদল ফেরেশতা রাতে এবং একদল ফেরেশতা দিনে আসতে থাকেন এবং তাঁরা উভয় দল ফজর ও আসরের নামাযে একত্র হন। এর পর যারা তোমাদের মাঝে রাত যাপন করেছিলেন তাঁরা উর্দ্ধ লোকে চলে যান। এরপর তাঁদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তোমরা আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে এল? তখন তাঁরা বলেন, আমরা যখন তাদেরকে রেখে আসি তখনও তারা নামায আদায় করছিলেন আর যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম তখনও তারা নামায আদায় করছিলেন। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক নামাযে কোন কোন লোককে অনুপস্থিত পান, তখন তিনি বললেন, আমি সংকল্প করেছিলাম যে, কোন একজনকে এই মর্মে আদেশ করি, যে সে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করুক এবং আমি তাদের পিছনে যাই যারা নামাযে আসেনি তারপর আমি নির্দেশ দেই যে তাদের ঘর কাঠের আঁটি দ্বারা তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেয়া হোক। তারা যদি জানতো যে, এখানে আসলে উটের গোশত ভর্তি মোটা হাঁড় পাওয়া যাবে তবে নিশ্চয়ই এই সালাতে অর্থাৎ এশার সালাতে উপস্থিত হতো। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মুনাফেকদের জন্য সব চাইতে ভারী নামায হলো এশা ও ফজরের নামায। তারা যদি এ'দুই নামাযে কী মর্যাদা আছে জানতে পারতো তবে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এ দুই ওয়াক্ত নামাযে উপস্থিত হতো, আমি মনস্থ করেছিলাম যে আমি নামায সম্পর্কে আদেশ করি যে, ইকামত দেওয়া হোক। এরপর একজনকে নির্দেশ করি যে সে লোকদের নিয়ে নামায কায়েম করুক তারপর আমি লাকড়ীর বোঝাসহ একদল লোক নিয়ে সে সব লোকের ঘরে চলে যাই যারা নামাযে উপস্থিত হয় না। অতঃপর তাদের ঘর আগুন দিয়ে তাদেরসহ জ্বালিয়ে দেই। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চল্লিশ দিন

যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াতে নামায পড়বে তার জন্য দুটি পরওয়ানা লেখা হয়। একটি জাহান্নাম হতে রক্ষা পাওয়ার ও অপরটি মোনাফেকী হতে মুক্ত থাকা। (তিরমিযী)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুময়া থেকে আরেক জুময়া পর্যন্ত এবং এক রমযান হতে অন্য রমযান পর্যন্ত এই সব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে, যদি সে কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে বলত, তোমাদের মধ্যে কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে এবং সে যদি তাতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে, তবে তার শরীরে কোন ময়লা তাকতে পারে? তারা বললেন, কোন ময়লাই থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত এই। আল্লাহ তায়ালা এ নামায দ্বারা পাপ মোচন করেন। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক বেতের (অর্থাৎ বিজোড়) তিনি ভালবাসেন বেতেরকে সুতরাং হে কোরআন ধারীগণ! তোমরা বেতের নামায পড়বে। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)

হাদীস ঃ হযরত খারেজা ইবনে হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে বললেন, আল্লাহ তায়ালা একটি নামায দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন, তা তোমাদের জন্য লাল উট অপেক্ষাও উত্তম, তা হল বেতের নামায। আল্লাহ পাক তা তোমাদের জন্য এশা এবং ফজর নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে নির্ধারণ করেছেন। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

হাদীস ঃ হযরত সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ রাত জাগরণ কষ্টসাধ্য ভারী ব্যাপার অতএব তোমাদের কেউ যখন বেতের নামায পড়বে তখন দু'রাকায়াত (নফল) পড়ে নিবে। অতঃপর যদি রাতে, উঠতে পারল তবে তা ভাল কথা, অন্যথায় এ দুরাকায়াত তার (রাতের নামাযের) পক্ষে যথেষ্ঠ হবে। (দারেমী)

হাদীস ঃ হযরত বিবি উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এক দিন ও রাতে

বার রাকায়াত নামায পড়বে, তার জন্য বেহেশতের একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। নামাযগুলো হলো ঃ চার রাকায়াত যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে, দুই রাকায়াত পরে, দুই রাকায়াত মাগরিবের পরে, দুই রাকায়াত এশার পরে এবং দুই রাকায়াত ফজরের পূর্বে। (তিরমিযী শরীফ)

কিন্তু মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে, হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে কোন মুসলমান বান্দা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ফরয ব্যতীত প্রত্যহ বার রাকায়াত নফল নামায পড়বে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (মিশকাত শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফজরের দুই রাকায়াত নামায দুনিয়া ও উহার সমস্ত জিনিস অপেক্ষা উত্তম। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বরাবর যোহরের পূর্বে চার রাকায়াত এবং পরে চার রাকায়াত নামায পড়েছে, তাকে আল্লাহ তায়ালা দোযখের প্রতি হারাম করে দিবেন।

(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

হাদীস ঃ হযরত আবু আইযূব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যোহরের পূর্বে চার রাকায়াত নমায যার মধ্যখানে নামায থাকবে না (অর্থাৎ এক সাথে চার রাকায়াত) উহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে।

(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

হাদীস ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যোহরের পূর্বে চার রাকায়াত নামায পড়তেন এবং বলতেন যে ইহা এমন একটি সময় যাতে আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়ে থাকে। অতএব, আমি ভালবাসী যে, সে সময় আমার একটি নেক আমল তথায় উঠুক। (তিরমিযী শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক অনুগ্রহ বর্ষণ করুন তার উপর যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে চার রাকায়াত নামায পড়েছে।

(আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

হাদীস ঃ হযরত তাবেয়ী মাকহুল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম ধরে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বে দুই রাকায়াত অপর বর্ণনায় চার রাকায়াত নামায পড়েছে তার সে নামায 'ইল্লিয়্যীনে' উঠানো হবে। (মিশকাত শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত হোযায়ফা (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি এটাও বাড়িয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, মাগরিবের পর দু'রাকায়াত তাড়াতাড়ি পড়বে, কেননা উহা ফরজের সাথে উপড়ে উঠানো হয়। উক্ত হাদীস দু'টি ইমাম রযীন রেওয়ায়েত করেছেন এবং বায়হাকী অতিরিক্ত অংশ হুযায়ফা হতে অনুরূপ শাআবুল ঈমানে। (মিশকাত শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আমর ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমবাসা ইবনে আবূ সুফিয়ান তাঁর সেই রোগের সময় যেই রোগে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন। যা বড়ই আনন্দদায়ক, তিনি বলেন, হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি দিবা রাত্র বার রাকায়াত নামায আদায় করবে তার প্রতিদান তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর তৈরী করা হবে। হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ কথা শুনেছি তখন থেকে এই সালাতগুলো কখনো ছাড়িনি। হযরত আমবাসা (রাঃ) বলেন, আমি যখন হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) থেকে একথা শুনেছি, তখন থেকে আমিও তা ছাড়িনি। হযরত আমর ইবনে আউস (রাঃ) বলেন, আমি যখন থেকে আমবাসা (রাঃ) এর নিকট থেকে একথা শুনেছি, তখন থেকে এই নমাযগুলো ছাড়িনি। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত মান ইবনে সালিম বলেন, আমি যখন হযরত আমর ইবনে আউস (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি শুনেছি, তখন থেকে সেই নামায আমিও ছাড়িনি। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি মাদুর ছিল, যা দিয়ে রাতের বেলায় তিনি হুজরা বানিয়ে নিতেন এবং সেখানে নামায আদায় করতেন। লোকেরাও তাঁর নামাযের সাথে (মুকতাদী হয়ে) নামায আদায় করতে লাগলেন। আর দিনের বেলা তিনি সেটা বিছিয়ে দিতেন। এক রাতে তাড়া হুড়ার সাথে নামাযের জন্য ফিরে এলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বললেন, লোক সকল তোমরা এমন আমল গ্রহণ করবে যা তোমরা সামর্থ রাখ।

কেননা, আল্লাহ পাক নিশ্চয় শোয়ার দ্বারা 'ক্লান্তি' বোধ করবেন না, অথচ অবশেষে তোমরাই আমল করতে করতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহ পাকের নিকট সমাধিক প্রিয় আমল হল যা নিয়মিত পালিত হয়। যদিও তা কম হয়। আর (বর্ণনাকারী বলেন) মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার পরিজন কোন আমল শুরু করলে তাকে তারা স্থায়ী রূপ দিয়ে দিতেন।

(মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল অধিক নিয়মানুবর্তিতা সম্পন্ন আমল যদিও তা কম হয়। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন কোন আমল শুরু করতেন তখন তাকে স্থায়িত্ব দানে অভ্যস্ত ছিলেন। (মুসলিম শরীফ)

হাদীস ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কারও নামায যা বসা অবস্থায় পড়েছে। (সওয়াবের বেলায়) তাঁর দাঁড়িয়ে পড়া নামাযের অর্ধেকের সমতুল্য। (মুয়াত্তা মালেক)

মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিশাল জামাত-জাল হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।

নামায না পড়ার আযাব

যে ব্যক্তি নামাযে অলসতা করে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালা ১৪টি শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। ৫টি দুনিয়াতে ৩টি মৃত্যুর সময় ৩টি কবরে এবং ৩টি কবর হতে উত্থানের পর হাশরের ময়দানে।

দুনিয়ার পাঁচটি শাস্তি; যথা ঃ (ক) তার জীবনে কোন বরকত থাকবে না, জীবিকা নির্বাহেও সে বরকত পাবে না। (খ) তার চেহারা হতে নেক্করদের জ্যোতিঃ মুছে ফেলা হবে। (গ) বেনামাযী যে নেককাজই করুকনা কেন, আল্লাহ তায়ালার নিকট তার গ্রহণ যোগ্যতা নিতান্তই কম হবে। (ঘ) সাধারণতঃ তার দোয়া কবুল হয় না। (ঙ) সে কোন নেক বান্দার দোয়া হতেও কোন ফল লাভ করবে না।

মৃত্যুকালিন তিনটি শাস্তি হলো; যথা ঃ (ক) বেনামাযীর মৃত্যু অত্যন্ত বেইয্যতীর সাথে হবে। (খ) সে মৃত্যুর সময় ক্ষুধার্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। (গ) এস্তেসকার রোগীর ন্যায় তার পিপাসা এত বেশী বৃদ্ধি পাবে যে, সাগর পরিমাণ পানি পান করালেও তার পিপাসা নিবৃত্ত হবে না।

কবরে তিনটি শাস্তি হলো; যথা ঃ (ক) বেনামাযীর কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে যে, তার একদিকের পাঁজড় অন্য দিকের পাজড়ের ভিতর ঢুকে

যাবে। (খ) বেনামাযীর কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকবে। (গ) বেনামাযীর কবরে একটি বিষাক্ত সাপ নিয়গ করা হবে যার দুই চোখ আগুনের এবং নখগুলো লোহার হবে। প্রতিটি নখ একদিনের পথ অর্থাৎ ১২ ক্রেশ পরিমাণ লম্বা হবে। তার আওয়াজ বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর হবে। সে মৃত ব্যক্তির সাথে কথা বার্তা বলবে এবং নিজেকে "মুর্জাউন আজরা" বলে পরিচয় দিবে। সে বলবে, তোমাকে কঠিন শাস্তি দেয়ার জন্যই আমাকে নিয়োগ করা হয়েছে। আমি তোমাকে আঘাতের পর আঘাত করতে থাকব। ফজরের নামায না পড়ার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত, যোহরের নামায না পড়ার কারণে আসার পর্যন্ত, আসরের নামায না পড়ার কারণে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, মাগরিবের নামায না পড়ার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার নামায না পড়ার কারণে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আঘাত করতে থাকব। কিয়ামত পর্যন্ত এ ভাবেই বেনামাযীর আযাব হতে থাকবে।

কিয়ামতের তিনটি শাস্তি; যথা ঃ (ক) কিয়ামতের দিন বেনামাযীর হিসাব অত্যন্ত কঠিন ভাবে গ্রহণ করা হবে। (খ) বেনামাযীর উপর আল্লাহ তায়ালা নারায (নাখোশ) থাকবেন। (গ) বেনামাযীকে বেইয্যতীল সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অন্য আরেকটি রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, বেনামাযীর ললাটে তিটি লাইন লেখা হবে। যথা ঃ (ক) হে আল্লাহর হক নষ্টকারী! (খ) হে আল্লাহর অভিশপ্ত! (গ) তুমি দুনিয়াতে যতখানি আল্লাহর হক নষ্ট করেছ এখন ততখানি আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত থাক।

নামাযের ফরজ সমূহের বর্ণনা

নামাযের পূর্বশর্ত বা বাহিরের ফরজ সমূহ

নামায শুরুর পূর্বে ৭টি ফরজ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে ঃ (১) শরীর পাক করা। (২) কাপড় পাক রাখা। (৩) নামাযের স্থান পাক হওয়া। (৪) সতর আবৃত রাখা। (৫) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। (৬) নিয়ত করা। (৭) ওয়াক্ত মত নামায পড়া।

এই ফরজগুলো সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

১। শরীর পাক করা ঃ ওজুর প্রয়োজন হলে ওজু করতে হবে। গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল সেরে নিতে হবে। শরীয়ত সম্মত কারণে ওজু-গোসল করতে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করে নিতে হবে।

এ সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী বিষয় জেনে রাখা উচিৎ। যেমন-

(ক) অনেকের শরীর দুর্বল। রাতে গোসল করলে তাদের সর্দি কাশি বা অন্য কোনো রকম শারীরিক ক্ষতি হয়। এ ধরণের কেউ কেউ সহবাসজনিত বা অন্য কোনো কারণে নাপাক হলে শরীর খারাপের ভয়ে গোসল করেন না এবং ফজরের নামায ইচ্ছাকৃত ভাবে ছেড়ে দেন। পরে দিনের বেলা গোসল করে নামায কাজা আদায় করে। এরকম করা উচিৎ নয়। নির্দিষ্ট সময়ে নামায পড়া আল্লাহ তা'আলার হুকুম। আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। জানা উচিৎ ওজরবশতঃ তায়াম্মুম উজু ও গোসলের স্থলাভিষিক্ত। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেয়া উচিৎ। নামায ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়।

(খ) সুন্নত তরীকা অনুযায়ী গোসল করলে যদি্ শরীর অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে, তবে শুধু ফরজগুলো আদায় করে নিলেই গোসল হয়ে যাবে। যেমন- একবার গড়গড়া করে কুলি করে নাকে ভালোভাবে পানি দিয়ে শরীরের প্রতিটি লোম সম্পূর্ণ ভিজে যায়, এভাবে সারা শরীরে একবার পানি প্রবাহিত দিলেই গোসল হয়ে যাবে। গোসলের পরে পুনরায় ওজু করার প্রয়োজন নেই।

(গ) যদি শরীরের অর্ধেক অংশ ধুলে ক্ষতি হয় আর বাকী অর্ধেক ধুলে ক্ষতি না হয়, তবে এরকম অবস্থায় তায়াম্মুম করতে হবে।

(ঘ) গোসলের সময় মেয়েদের জন্য চুলের বেনী খোলার প্রয়োজন নেই। চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছালেই যথেষ্ট হবে।

(ঙ) ফোঁড়া কিংবা কোনো ক্ষতের কারণে শরীরের কোনো অংশে পট্টি বা ব্যান্ডেজ বাঁধা থাকলে ঐ স্থানের উপর ভেজা হাতে মাসেহ করে নিতে হবে।

(চ) চুলকানী বা অন্য কোনো চর্মরোগের কারণে চুলকালে কারো কারো শরীর থেকে রস নির্গত হয়। রস গড়িয়ে পড়ে না। অথচ কাপড়ে লাগলে দাগ পড়ে। এরকম দাগ এক দেরহাম পরিমাণের চেয়ে বেশী হলেও কাপড় নাপাক হয় না। ওজুও ভঙ্গ হয় না।

(ছ) যে ব্যক্তির এমন কোনো রোগ আছে, যে রোগের কারণে তার ওজু রাখা সম্ভব হয় না, যেমন-প্রমেহ রোগের কারণে ফোঁটা ফোঁটা মনি নির্গত হওয়া বা বমি নির্গত হওয়া অথবা বহুমূত্র রোগের কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব নির্গত হয়, কিংবা এ জাতীয় অন্য যে কোনো রোগ থাকলে, ঐ ব্যক্তিকে প্রতি ওয়াক্তের নামাযের আগে তাজা ওজু করে ঐ অবস্থায়ই নামায পড়ে নিতে হবে। ঐ নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ওজু থাকবে। আর যতক্ষণ তার ঐ রোগ থাকবে, ততক্ষণ তার কাপড়ও নাপাক হবে না। বিনা সন্দেহে তার পরিধানের কাপড়সহ সে নামায পড়তে পারবে। এ সব নিয়ম না

জানার কারণে কোনো কোনো লোক উপরোক্ত রোগে আক্রান্ত হলে নামায ছেড়ে দেয় এবং বলে-'আমার ওজু থাকে না। আমি নামায পড়বো কেমন করে।' শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী এরকম অবস্থায় শরীর নাপাক হয় না। একথা জানার পরও দ্বিধা সন্দেহে লিপ্ত হওয়া চরম মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়।

২। কাপড় পাক রাখা ঃ নামায পড়তে চাইলে কাপড় পাক রাখতেই হবে। কাপড় পাক করার মাসয়িল সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেয়া ভালো, যেমন-

(ক) এক দিরহামের বেশী পরিমাণ নাপাকী নামাযীর সঙ্গে থাকলে তার নামায হবে না।

(খ) রাস্তাঘাটের পানি কাদার ছিটে ফোঁটা কাপড়ে লাগলে কাপড় নাপাক হবে না।

(গ) সাধারণ বৃষ্টির পানি পাক।

৩। নামাযের স্থান পাক হওয়া ঃ নামাযের জায়গা পাক হতে হবে। নামাযীর পা রাখবার স্থান পাক হওয়া সর্ব সম্মতভাবে ফরজ। সিজদার স্থানও পাক থাকা ফরজ। সিজদা অবস্থায় দুই হাত দুই হাঁটু এবং বগল ও বুকের মাঝখানের স্থানও পাক হওয়া জরুরী।

এ সম্পর্কে আরো দু'একটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন। যেমন-

(কা) নাপাক স্থানে পাতলা কাপড় বিছিয়ে নামায পড়লে যদি কাপড়ের নীচের স্থান দৃষ্টিগোচর হয়, তবে এ অবস্থায় নামায হবে না। তবে ঐ স্থানের উপর শক্ত মোটা কাপড় বা মোটা জায়নামায বিছিয়ে পড়লে নামায হয়ে যাবে।

(খ) কোনো কাপড়ের অর্ধেক পাক আর অর্ধেক নাপাক হলে কাপড়টি ভাঁজ করে পাক অংশ উপরে রেখে নামায পড়তে পারবে।

৪। সতর আবৃত রাখা ঃ সে সমস্ত ঢেকে রাখা ফরজ নামাযের মধ্যে সেগুলো ঢেকে রাখতে হবে। পুরুষদের জন্য নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। আর স্ত্রীলোকের জন্য মুখমন্ডল, দুই হাতের কব্জি এবং দুই পায়ের টাখনু (গীরা) ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখা ফরজ।

এ সম্পর্কে আরো কিছু নিয়ম কানুন জেনে রাখা একান্ত জরুরী-

(ক) কোনো স্ত্রীলোক যদি এতো বেশী পাতলা আঁচল বা উড়নি দিয়ে মস্তক আবৃত করে-যাতে করে মাথার চুলের এক চতুর্থাংশ দেখা যায়, তবে তার নামায হবে না।

(খ) স্ত্রীলোকের নামাযে হাতের কব্জির উপরের অংশ খোলা থাকলে নামায হবে না। প্রকৃত কথা এই যে, স্ত্রীলোকদের যে সমস্ত অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরজ, ঐ সমস্ত অঙ্গের চার ভাগের এক ভাগ নামাযের মধ্যে অনাবৃত হলেই নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(গ) মেয়েদেরকে মোটা চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর আবৃত করে নিয়ে নামায পড়তে হবে।

(ঘ) অপরের দৃষ্টি থেকে নিজের গুপ্তস্থান ঢেকে রাখা ফরজ। নামায পড়ার সময় কেউ যদি নিজের গুপ্তস্থান দেখে ফেলে, তবুও তার নামায হয়ে যাবে, কিন্তু মাকরূহ তাহরীমী হবে। আর অন্য কেউ তার গুপ্ত স্থান দেখে ফেললে, তার নিজের নামায হবে না।

৫। কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো ঃ কাবা শরীফ যেদিকে, সেদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। এ সম্পর্কে আরো কিছু কথা জানার আছে। যেমন-

(ক) কেউ কোনো নতুন জায়গায় উপস্থিত হলে অথবা দূরের পথ পাড়ি দিতে কোনো যানবাহনে থাকা অবস্থায় নামাযের সময় যদি কেবলা কোন দিকে তা স্থির করতে না পারে, তবে কাছে উপস্থিত কাউকে জিজ্ঞেস করে কেবলা সম্পর্কে তাকে জেনে নিতে হবে।

(খ) জিজ্ঞাসা করবার লোক না পাওয়া গেলে মনে মনে কেবলা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। তারপর যেদিক কাবা শরীফ আছে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয়-সেদিকে মুখ ফিরিয়েই নামায পড়ে নিতে হবে। নামাযের পর যদি জানতে পারে যে, যেদিকে মুখ করে সে নামায পড়েছে সেদিক কেবলা ছিলো না-তবুও তার নামায হয়ে যাবে। পুনরায় তাকে সঠিক কেবলামুখী হয়ে নামায পড়তে হবে না।

(গ) মনে মনে চিন্তা করেই যদি কেউ কোনো একদিকে মুখ করে নামায পড়ে নেয়, তবে তার নামায হবে না। যদিও পরে জানা যায় যে, তার কেবলা ঠিকই ছিলো। কারণ, কেবলা না জানা থাকলে মনে মনে চিন্তা করে কেবলা ঠিক করাই শরীয়তের নিয়ম।

৬। নিয়ত করা ঃ নিয়ত করা মানে সংকল্প স্থির করা। কোন ওয়াক্তের কোন নামায পড়া হচ্ছে, সে সম্পর্কে মন স্থির করতে হবে। যেমন, কেউ যদি মনে মনে খেয়াল করে-আমি আল্লাহর ওয়াস্তে জোহরের নামায বা আছরের নামায পড়ছি, তবুও তার নিয়ত করা হয়ে যাবে। মনে মনে নিয়ত করা ফরজ। মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা ফরজ নয়।

এ সম্পর্কে কিছু কথা জেনে নেয়া ফরজ। যেমন-

(ক) সুন্নত, নফল এবং তারাবীহ নামাজে আল্লাহর ওয়াস্তে নামায পড়ছি, এরকম খেয়াল করে নামায শুরু করলেই নামায হয়ে যাবে। সুন্নত, নফল অথবা তারাবীহ নির্দিষ্ট করে না বললেও চলবে।

(খ) ফরজ নামাযের বেলায় ফজর, জোহর, বা আছর কোন ওয়াক্তের নামায পড়া হচ্ছে, তা নির্দিষ্টভাবে খেয়াল করে নিতে হবে।

(গ) ইমামের জন্য ইমামতের নিয়ত করা শর্ত নয়। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ওয়াক্তের ফরজ নামায একাই পড়তে শুরু করে দেয়, ঐ সময় যদি অন্য কোনো নামাযী এসে তাকে অনুসরণ করে ইক্তিদা করে নামাযে শরীক হয়, তবুও তার নামায হয়ে যাবে। কিন্তু মুক্তাদীর (অনুসরণকারীর) ইক্তিদার (অনুসরণের) নিয়ত করা শর্ত। মুক্তাদীকে এই ইমামের অনুসরণ করলাম এরকম খেয়াল অবশ্যই করতে হবে।

(ঘ) জোহরে ওয়াক্তে নামাযে দাঁড়িয়ে যদি কেউ ভুল বশতঃ আসর নামায পড়ছি এরকম কথা মুখে উচ্চারণ করে, তবুও তার নামায হয়ে যাবে। কারণ, মুখের নিয়ত ফরজ নয়, মনের নিয়ত ফরজ।

(ঙ) নিয়তের সঙ্গে সঙ্গে তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবর) বলে নামায শুরু করতে হবে।

৭। ওয়াক্ত মতো নামায আদায় করা ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য নির্দিষ্ট ওয়াক্ত (সময়) আছে। ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। আবার ওয়াক্ত শেষ হলে নামায কাজা হয়ে যাবে। প্রত্যেক নামাযের নিষিদ্ধ সময় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং খেয়াল রাখতে হবে, যেনো সকল প্রকার নামায মোস্তাহাব সময়ে আদায় করা যায়।

নামাযের ভিতরের ফরজ সমূহ

এতক্ষণ নামাযের পূর্বে যে ৭টা কাজ ফরজ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখন নামাযের ভিতরে যে কাজগুলো ফরজ, সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

নামাযের ভিতরে অর্থাৎ নামায অবস্থায় ৬টি কাজ ফরজ। যেমন- (১) তাকবীরে তাহরীমা, (২) কিয়াম, (৩) কিরাআত, (৪) রুকু, (৫) সিজদা এবং (৬) কা'দায়ে আখীরা।

এখন এই ফরজগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে-

১। তাকবীরে তাহরীমা ঃ 'আল্লাহ আকবার' বলাকে তাকবীর বলে। সর্বপ্রথম যে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করা হয়, তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে।

এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে নেয়া দরকার। যেমন-

(ক) তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের পর নামাযীর জন্য খাওয়া দাওয়া, কথা বলা এবং দুনিয়ার যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায়।

(খ) ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর উচ্চারণ করতে হবে।

(গ) তাকবীরে 'আল্লাহু' উচ্চারণ করবার সময় আলিফ অক্ষর যদি টেনে উচ্চারণ করা হয় কিংবা আকবর উচ্চারণকালে যদি 'বা' অক্ষর টেনে উচ্চারণ করা হয়, তবে নামায বাতিল হয়ে যাবে। ভালো ক্বারীর নিকট থেকে তাকবীরের সঠিক উচ্চারণ শিখে নিতে হবে।

(ঘ) তামা'আতে নামায পড়বার সময় মুক্তাদী যদি ইমামের আগে তাকবীর উচ্চারণ করে, তবে মোক্তাদীর নামায হবে না।

২। কিয়াম ঃ কিয়াম অর্থ দাঁড়ানো। দাঁড়িয়ে ফরজ ও ওয়াজিব নামায আদায় করা ফরজ।

এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা জেনে রাখা জরুরী। যেমন-

(ক) ফরজ ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরজ।

(খ) সুন্নত ও নফল নামাযে দাঁড়ানো ফরজ নয়। কিন্তু সুন্নত বা নফল নামায বসে পড়লে অর্ধেক ছাওয়াব পাওয়া যায়। আবার ফজরের আগের দুই রাক'আত সুন্নত এবং তারাবীহ নামায বসে না পড়াই উচিৎ।

(গ) দাঁড়াবার সময় দুই পা সোজা কেবলামুখী করে দাঁড়াতে হবে। দুই পায়ের মাঝখানে ৪ আঙ্গুল-বেশীপক্ষে ১ বিঘত ফাঁক রাখতে হবে। মেয়েরা দুই পা এক সঙ্গে মিলিয়ে সামান্য ২/১ আঙ্গুল ফাঁক রেখে দাঁড়াবে। তাঁরা দু পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুলের বেশী ফাঁক রাখবে না।

(ঘ) শারীরিক অসুস্থতা অথবা অত্যাধিক দুর্বলতার কারণে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম না হলে, বসে নামায পড়া যায়। বসে না পড়তে পারলে শুয়েও নামায পড়া যায়। এরকম অবস্থায় ঘাড়ের ইশারায় রুকু-সিজদা করতে হবে। সিজদার সময় বাস, ট্রেন বা অন্য কোনো যানবাহনে নামায আদায় কালে দাঁড়ানো সম্ভব না হলে বসে নামায পড়তে হবে।

(ঙ) বসে নামায পড়তে সক্ষম না হলে শুয়ে নামায আদায় করতে হবে।

শুয়ে নামায পড়ার দুইটি নিয়ম আছে।

(১) পশ্চিম দিকে পা মেলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়বে।

(২) উত্তর দিকে মাথা রেখে ডান কাত হয়ে কিবলার দিকে মুখ রেখে শোবে অথবা দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে বাম কাত হয়ে কেবলা মুখী হয়ে শুয়ে নামায পড়বে। অবশ্য উত্তর দিকে মাথা রাখাই উত্তম।

৩। **কিরাত ঃ** কিরাআত অর্থ-নামাযে কুরআন শরীফ পাঠ করা। কুরআন শরীফের যে কোন স্থান থেকে বড় আয়াত হলে ১ আয়াত এবং ছোট আয়াত হলে ৩ আয়াত পরিমাণ পড়া ফর্‌জ। আর বিশেষ ভাবে সূরা ফাতিহা পড়া এবং এর অন্য সূরা মিলানো (ফরজের শেষের ২ রাক'আত ছাড়া সব নামাযের) সব রাক'আতে ওয়াজিব।

এ সম্পর্কে আরো জেনে রাখা প্রয়োজন, যেমন-

(ক) জামা'আতে নামায পড়ার সময়ে ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর কিরাআত বলে বিবেচিত হয়। জামা'আতে মোক্তাদীগণের জন্য কিরাআত পড়া নিষেধ।

(খ) একাকী নামায আদায়কারীদের জন্য সব ওয়াক্তে ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে কিরাআত ফরজ।

(গ) সুন্নত, নফল এবং বিতির নামাযের সকল রাক'আতে কিরাআত ফরজ।

(ঘ) জামা'আতের ইমাম হলে ফজর, মাগরিব এবং ইশার নামাযে সশব্দে কিরাআত পড়তে হবে। জুমু'আ এবং দুই ঈদের নামাযে ও সশব্দে কিরাআত পড়তে হবে, যেনো অন্যেরা শুনতে পায়। জোহর এবং আছর নামাযে নিজের কান পর্যন্ত পৌঁছে, এরকম আওয়াজে কিরাআত পড়তে হবে।

(ঙ) রমজান মাসে জামা'আতে তারাবী এবং বিতির নামাযের তিন রাকা'আতই ইমাম সশব্দে কিরাআত পড়বেন।

(চ) একাকী নামায আদায়কারী জোহর এবং আসরে চুপে চুপে (নিজের কানে শোনা যায় এমন আওয়াজে) কিরাআত পড়বে। মাগরিব, ইশা, ফজর এবং তারাবীহ নামাযে ইচ্ছা করলে চুপে চুপে অথবা সশব্দে কিরাআত পড়তে পারবে।

(ছ) কাজা নামাযে চুপে চুপে কিরাআত পড়া বাঞ্চণীয়।

(জ) মেয়েদের জন্য সব নামাযেই নিজের কানে শোনা যায়, এরকম আওয়াজে কিরাআত পড়তে হবে। জোরে পড়া নিষেধ।

৪। **রুকু ঃ** নামাযে রুকু করা অর্থাৎ পিঠ বাঁকিয়ে সামনের দিকে মাথা নত করা ফরজ।

এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নিয়মগুলো জেনে রাখতে হবে। যেমন-

(ক) দাঁড়িয়ে নামায আদায়কালে রুকু করলে এমনভাবে পিঠ বাঁকিয়ে দাঁড়াতে হবে, যাতে করে দুই হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

(খ) বসে নামায পড়লে এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে রুকু করতে হবে, যেনো মাথা হাঁটু বরাবর সমান হয়।

(গ) রুকু অবস্থায় দুই হাতে দুই হাঁটু চেপে ধরে মাথা এবং পিঠ এক বরাবর রাখতে হবে।

(ঘ) মেয়েদের জন্য কোনো রকমে দুই হাত শরীরের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে হাঁটু পর্যন্ত হাত পৌঁছলেই রুকু আদায় হয়ে যাবে।

(ঙ) কুঁজো কোনো ব্যক্তি যাকে রুকু অবস্থাতেই দাঁড়াতে হয়, তাকে শুধুমাত্র মাথা কিছুটা ঝুঁকিয়ে রুকু আদায় করতে হবে।

৫। সিজদা ঃ সিজদার অর্থ মাটির উপর কপাল রাখা।

এ সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী জেনে রাখা উচিৎ। যেমন-

(ক) সিজদার সময় কপাল এবং নাক উভয়টিই মাটিতে স্থাপন করতে হবে। নাক না লাগিয়ে শুধুমাত্র কপাল মাটিতে লাগালে মাকরূহের সহিত সিজদা আদায় হবে। কিন্তু কপাল না লাগিয়ে শুধু নাক লাগালে সিজদা আদায় হবে না।

(খ) কপালে জখম বা কোনো রকম ব্যথা থাকলে শুধু নাক মাটিতে লাগালেও সিজদা আদায় হবে।

(গ) সিজদার সুন্নত নিয়ম- দুই হাত, দুই হাঁটু, দুই পা এবং কপাল, শরীরের এই সাতটি অঙ্গ মাটিতে রাখা। দুই পা এবং কপাল মাটিতে রাখা ফরজ।

(ঘ) সিজদার সময় দুই পা একই সঙ্গে মাটি থেকে উঠে গেলে (একটি আঙ্গুলও যদি গোটা সিজদার সময়ে মাটিতে না থাকে) নামায নষ্ট (বাতিল) হয়ে যাবে।

(ঙ) কপাল মাটিতে ঠেকলে পাগড়ীর প্যাচের সহিত সিজদা করা যায়েয। (বৈধ)। পরিধেয় কাপড়ের কোনো অংশ এবং গায়ের চাদর বা চাদরের অংশ সিজদার স্থানে পড়ে গেলে, তার উপর সিজদা করা জায়েয।

(চ) তোষক বা এ জাতীয় নরম কোন বস্তুতে সিজদা করলে এ অবস্থায় জোরে দাবিয়ে সিজদা করতে হবে।

(ছ) অত্যাধিক ভীড়ের কারণে একই নামাযের জামা'আতে শরীক সামনের নামাযীর পিঠের উপর কপাল স্থাপন করলেও সিজদা আদায় হয়ে যাবে।

(জ) সিজদা পর পর দুইবার দিতে হবে। দুই সিজদাই ফরজ।

(ঝ) যদি সিজদার সময় পায়ের সমস্ত আঙ্গুল খাড়া না রেখে পায়ের পিঠ মাটিতে লাগিয়ে রাখে, তবে নামায জায়েয হবে না। উভয় পায়ের কমপক্ষে একটি আঙ্গুল কেবলামুখী করে খাড়া রাখতে হবে।

(ঞ) দাঁড়াবার স্থান অপেক্ষা সিজদার স্থান যদি আধাহাত বা বারো আঙ্গুল উঁচু হয়, তবে সিজদা আদায় হবে। কিন্তু সিজদার স্থান আধাহাতের বেশী উঁচু হলে সিজদা সঠিক ভাবে আদায় হবে না।

৬। কা'দায়ে আখীরা ঃ কা'দায়ে আখীরা নামাযের শেষ বৈঠককে বলা হয়। দুই রাকাত বিশিষ্ট নামায হোক বা তদাপেক্ষ বেশী রাক'আত বিশিষ্ট নামায হোক, নামাযের শেষ বৈঠকে বসা ফরজ।

এ সম্পর্কে নিম্ন বর্ণিত মাস'আলা জেনে রাখা প্রয়োজন যেমন-

(ক) তাশাহহুদ পরিমাণ সময় পর্যন্ত বসে থাকা ফরজ। অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি থেকে আবদুহু ওয়া রাসূলুহু বলা পর্যন্ত সময়।

(খ) ফরজ, নফল-সব রকম নামাযেই শেষ বৈঠকে বসা ফরজ।

সংক্ষিপ্ত সার ঃ নামাযের ফরজ সংক্রান্ত এতক্ষণের আলোচনায় আমরা জানতে পারলাম যে, নামাযের বাইরে এবং ভিতরে মোট ফরজ ১৩ টি। যেমন-

(১) শরীর পাক করা। (২) কাপড় পাক রাখা। (৩) নামাযের স্থান পাক হওয়া। (৪) সতর আবৃত রাখা। (৫) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো। (৬) নিয়ত করা। (৭) ওয়াক্ত মতো নামায পড়া। (৮) তাকবীরে তাহরীমা বলা। (৯) কিয়াম করা। (১০) কিরাআত পড়া। (১১) রুকু করা। (১২) পর পর দুইবার সিজদা করা। (১৩) নামাযের শেষ বৈঠকে বসা।

নামাযের সুন্নাত তরীকা ও প্রচলিত ভুলসমূহ

নামাযের প্রারম্ভে যা লক্ষণীয়ঃ

নামাযের প্রারম্ভেনিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়ঃ

১। কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়ানো।

২। এদিক-সেদিক বাঁকা বা কুজো না হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৩। দন্ডায়মান অবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গায় নিবদ্ধ রাখা।

৪। গর্দান বাঁকা করে থুতনী বক্ষের সাথে লাগানো মাকরূহ।

৫। কোন কারণ ছাড়া বাঁকা হয়ে দাঁড়ানো অনুচিৎ। বরং এমন ভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে-যাতে দৃষ্টি সিজদার জায়গায় পড়ে।

৬। পায়ের আঙ্গুলগুলো সম্পূর্ণ কিবলা মুখী করতে হবে। উভয় পা-ও কেবলা বরাবর সোজা থাকবে। পা ডানে বামে বাঁকা রাখা সুন্নাতের খিলাফ ও মাকরূহ।

৭। উভয় পাঁয়ের মাঝখানে পুরুষদের কমপক্ষে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে। আর মহিলাগণ অনুর্দ্ধ চার আঙ্গুল ফাঁকা রাখবে।

৮। পুরুষেরা জামা'আতের সাথে সাঁরি বদ্ধ ভাবে নামায পড়ার সময় কাতার সোজা রাখতে হবে।

৯। জামা'আতের সময় এদিকেও লক্ষ রাখা চাই যে, মাঝখানে কোন প্রকার ফাঁক যেন না থাকে। ডানে-বামে দেখে যেদিকে মুসল্লী কম, সেদিকে দাঁড়াতে হবে। অন্যান্য মুসল্লীদের বাহুর সাথে নিজের বাহু বরাবর হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে।

১০। পুরুষের লুঙ্গি পায়জামা, তথা যে কোন পরিধেয় বস্ত্র সর্বাবস্থায় টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে রাখা নাজায়েয। কাজেই পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর উপরে হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরী। আর মহিলারা আপাদমস্তক ঢেকে নামায পড়বে। পরিধেয় বস্ত্র পায়ের পাতা পর্যন্ত পরবে। মহিলাদের নামাযে শুধু মাত্র চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ খোলা থাকতে বা উঠতে-বসতে খুলে যেতে পারবে না।

১১। নামায পড়ার সময় পুরুষদের হাতের কব্জি ছাড়া বাকী অংশ জামার আস্তিন দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে। অনেকে জামার আস্তিন গুটিয়ে নামায পড়ে থাকে, এটা অনুচিৎ। তেমনিভাবে পুরুষদের জন্য হাফ হাতা ওয়ালা জামা বা শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নামায পড়া মাকরূহ।

১২। যে সব কাপড় পরিধান করে সে লোক সমাজে যেতে লজ্জাবোধ করে, সে ধরনের ময়লা-বা ছেড়া কাপড় পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ।

নামাযের শুরু লগ্নে লক্ষণীয়

১। নামায শুরু করার সময় প্রথমে মনে মনে নিয়ত করে নিবে যে, আমি অমুক নামায পড়তেছি। তবে নিয়তের বাক্যবলী মুখে উচ্চারণ করা জরুরী নয়, মুস্তাহাব।

২। তাকবীরে তাহরীমাহ বলার সময় পুরুষেরা হাত কানের লতি বরাবর উত্তোলন করবে। এ সময় হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী থাকবে। আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক থাকবে। আর মহিলাগণ হাতের তালু কিবলা মুখী করে কাঁধ বরাবর হাত তুলবে। তাদের হাতের আঙ্গুল সর্বাবস্থায় মিলিত থাকবে।

ভুলঃ অনেক পুরুষেরা হাত তুলতে ভুল করে থাকে, যেমন-হাতের তালু কিবলার দিকে না ফিরিয়ে নিজের কানের দিকে ফিরায়, কিংবা হাত দ্বারা পুরা কান ঢেকে ফেলে, অথবা হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন না করে কেবল ইশারা করে,

কিংবা আঙ্গুল দ্বারা কানের লতি টিপে ধরে ইত্যাদি। উপরোক্ত কাজগুলো সম্পূর্ণ ভুল, এগুলো বর্জন করা কর্তব্য। তেমনি ভাবে অনেক মেয়েরা হাতের তালু শরীরের দিকে ফিরিয়ে হাত তুলে-এটা ভুল ও পরিত্যাজ্য।

৩। উপরোল্লেখিত নিয়মে হাত উত্তোলন করে তাকবীরে তাহরীমাহ "আল্লাহু আকবার" বলার পর পুরুষেরা ডান হাতের বৃদ্ধ এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি এটে ধরবে। আর অবশিষ্ট তিন আঙ্গুল বাম হাতের উপর স্বাভাবিকভাবে রাখবে।

৪। বর্ণিত নিয়মে উভয় হাত নাভীর নীচে বাঁধবে।

আর মহিলাগণ ডান হাত বাম হাতের উপর স্বাভাবিক ভাবে রেখে সীনার উপর স্থাপন করবে।

দন্ডায়মান অবস্থায়

১। যদি কেউ একা একা নামায পড়ে, অথবা ইমামতি করে, তাহলে প্রথমে সে ছানা (সুবহানাকাল্লাহুম্মা....) পড়বে, তারপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সম্পূর্ণ সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে। সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলবে। এরপর বিসমিল্লাহ...সহ যে কোন একটি সূরা বা কিরাআত পাঠ করবে। আর ইমামের পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ার সময় শুধু ছানা পড়ে নীরব থাকবে। মনযোগ সহকারে ইমামের তিলাওয়াত শুনবে। মুক্তাদীর জন্য আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ ও সূরা-কিরাআত পড়তে হবে না।

২। নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ার সুন্নাত তরীকা এই যে, প্রত্যেক আয়াত শেষে ওয়াকফ করবে।

সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যান্য সূরা বা আয়াতের ক্ষেত্রে এ নিয়ম অবলম্বন করা জরুরী নয়।

৩। যথা সম্ভব বিনা কারণে শরীরের কোন অংশ নাড়াচাড়া করবে না। বরং নাড়া-চাড়া না করে স্থির থাকা শ্রেয় ও উত্তম। তবে চুলকানী ইত্যাদি কারণে অগত্যা সঞ্চালন করতে হলে, এক হাত দ্বারা সংক্ষেপে তা সেরে নেয়ার চেষ্টা করবে।

৪। দাঁড়ানো অবস্থায় সমস্ত শরীরের ভর এক পায়ের উপর রেখে অন্য পাঁ ছেড়ে দেয়া এবং বক্র ভাবে দাঁড়ানো আদবের খিলাফ। সুতরাং তা বর্জন করা বাঞ্চনীয়। তাই দাঁড়ানোর সময় উভয় পায়ে সমান ভর দিয়ে দাঁড়াবে। তবে কোন (শরীয়ত সম্মত) উজরের কারণে এক পায়ের উপর ভর রাখতে হলে, অপর পাটি পা বক্র না হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫। নামায রত অবস্থায় হাই তোলার উপক্রম হলে, তা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে।

৬। দাঁড়ানো অবস্থায় চেহারার রুখ কিবলার দিকে থাকবে। চোখের দৃষ্টি সিজদার স্থানের প্রতি নিবদ্ধ থাকবে। এদিক-সেদিক বা সামনের দিকে তাকানো পরিহার করবে।

রুকু অবস্থায়

রুকুর সময় নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে–

১। পুরুষগণ রুকু করার সময় কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ এমন ভাবে অবনত করবে যাতে কোমর, পৃষ্ঠ দেশ ও মস্তক এক বরাবর হয়ে যায়। এর চাইতে বেশী অবনত করবে না, কমও করবে না। দৃশ্যটা সমতল ছাদের ন্যায় হবে।

২। মস্তক এতটুকু অবনত করবে না যাতে থুতনী বুকের সাথে লেগে যায় এবং এতটুকু উঁচু করবে না-যার ফলে গর্দান পিঠ হতে উপরে উঠে যায়। বরং গর্দান ও কোমর একই বরাবর থাকবে।

৩। পদযুগল সোজা রাখবে তা বাঁকা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

৪। উভয় হাতের তালু উভয় হাঁটুর উপর থাকবে। এ সময় হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক ফাঁক রেখে আঙ্গুলসমূহ দিয়ে হাঁটুকে আঁকড়ে ধরবে।

৫। রুকু অবস্থায় হাঁটু এবং উরুও বক্রতাহীন সোজা থাকবে এবং হাত ও শরীরের মাঝে ফাঁক থাকবে।

৬। দন্ডায়মান অবস্থার ন্যায় রুকুর সময়ও পুরা শরীরের ভর উভয় পায়ের উপর সমানভাবে রাখবে, এবং পায়ের টাখনুদ্বয় একটি অপরটির মুখামুখী থাকবে।

আর মহিলাগণ মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে হাতের আঙ্গুল সমূহের মাথা হাটু পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং হাত শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখবে।

৭। ইতমিনানের সহিত কম পক্ষে তিন বার سبحان ربى العظيم পড়বে। তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় রুকুতে অবস্থান করা সুন্নাত এবং এক তাসবীহ পরিমাণ সময় অবস্থান করা ওয়াজিব।

৮। এ সময় চোখের দৃষ্টি উভয় পায়ের মাঝখানে বা বৃদ্ধা আঙ্গুলের দিকে নিবদ্ধ থাকবে।

রুকু থেকে উঠার সময়

১। রুকু থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কোন প্রকার বক্রতা না রেখে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।

২। এ সময় দৃষ্টি সিজদার জায়গায় নিবদ্ধ থাকবে।

৩। রুকু থেকে সোজাভাবে না দাঁড়িয়ে সামান্য পরিমাণ মাথা উত্তোলন করেই সিজদায় গমন করলে নামায শুদ্ধ হবে না। কারণ, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং কমপক্ষে এক তাসবীহ্ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। ওয়াজিব তরক্ হলে, সিজদায়ে সাহু দিতে হয়, আর ইচ্ছা করে ওয়াজিব ছাড়লে নামাযই হয় না। সুতরাং এহেন অভ্যাস ত্যাগ করা আবশ্যক। সোজা হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সিজদায় যাবে না।

সিজদায় যাওয়ার সময়

সিজদায় যাওয়ার সময় নিম্ন বর্ণিত নিয়মগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবেঃ

১। হাঁটুকে ভাঁজ করে সিজদার দিকে এমনভাবে ধাবিত হবে-যাতে বক্ষদেশ সোজা থাকে-বাঁকা না হয় বা সম্মুখে ঝুঁকে না যায়।

২। হাঁটুদ্বয় মাটি স্পর্শ করার আগ পর্যন্ত শরীর ও বক্ষদেশ সোজা থাকবে। হাটুদ্বয় মাটিতে লাগানোর পর বক্ষ দেশ সামনের দিকে অবনত করবে।

৩। সিজদার সময় প্রথমে হাঁটুদ্বয়, তারপর হস্তদয়, তারপর নাক ও কপাল মাটিতে রাখবে।

বর্তমানে উল্লেখিত নিয়ম ও আদবের প্রতি চরম অবহেলা ও উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। অনেকেই সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমেই বক্ষদেশ ঝুঁকিয়ে দিয়ে রুকু করতে করতে সিজদায় যায়- যা বর্ণিত নিয়মের পরিপন্থী। বিশেষ ওযর ব্যতীত এরূপ করা অনুচিৎ।

সিজদা অবস্থায়

১। সিজদায় থাকাকালীন সময় মাথা উভয় হাতের মাঝখানে এভাবে রাখবে-যাতে উভয় হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলি কানের লতি বরাবর থাকে।

২। এ সময় হাতের আঙ্গুল সমূহকে এলোমেলো না রেখে একটিকে আরেকটির সাথে মিলিয়ে কিবলামুখী করে রেখে দিবে।

৩। পুরুষগণ উভয় হাতের কনুই মাটি হতে আলাদা রাখবে। তা দ্বারা মাটিতে ভর দেয়া সমীচীন নয়।

৪। বাহুদ্বয় পাজর হতে আলাদা রাখবে। তা এতখানি প্রশস্তও করবে না-যাতে পার্শ্ববর্তী মুসল্লীদের কষ্ট হয়।

৫। উরুকে পেট হতে আলাদা রাখবে। মহিলাগণ উভয় পা ডান দিকে বিছিয়ে বাম পা ডান পায়ের নীচ দিয়ে বের করে দিবে। মেয়েরা কনুই মাটিতে

বিছিয়ে পেট উরুর সহিত মিলিয়ে এবং বাহু পাজরের সহিত লাগিয়ে রেখে জড়সড় হয়ে সিজদা করবে।

৬। সিজদায় থাকা অবস্থায় নাক ও কপাল মাটির সাথে লেগে থাকবে এবং এগুলোকে মাটি হতে আলাদা রাখবে না।

৭। পায়ের গোড়ালী উপরের দিকে করে সোজা রাখবে-এবং আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক থাকবে।

৮। উভয় পা মাটির সাথে সর্বক্ষণ লেগে থাকবে। কোন অবস্থাতেই তা মাটি হতে আলাদা করা যাবে না। অনেকে সিজদার সময় পা জমিনের সাথে কিছুক্ষনও লাগিয়ে রাখে না। এতে সিজদা আদায় হবে না। ফলে নামায বিনষ্ট হয়ে যাবে। তাই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকা জরুরী।

৯। ধীরস্থিরভাবে কমপক্ষে ৩ বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى বলবে। এ পরিমাণ সময় সিজদাতে অপেক্ষা করা সুন্নাত। আর অন্ততঃ এক তাসবীহ পরিমাণ সময় সিজদায় অবস্থান করা ওয়াজিব। এর আগে সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করা নিষেধ।

দরমিয়ানী বৈঠক

১। প্রথম সিজদা, শেষ করার পর স্থির ভাবে বসবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। সোজা হয়ে বসার পূর্বে মাথা সামান্য উত্তোলন করেই পুনরায় দ্বিতীয় সিজদায় গমন করা ওয়াজিবের খিলাফ, এতে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা এবং কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ সময় দেরী করা ওয়াজিব।

২। দরমিয়ানী বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে এর উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রেখে তার আঙ্গুল গুলোকে কিবলামুখী করে দিবে। অনেকে উভয় পা খাড়া রেখে তার উপর বসে-এটি সুন্নাত নিয়মের খিলাফ। সুতারাং তা বর্জনীয়।

মহিলাগণ উভয় পা ডানদিক দিয়ে বের করে দিয়ে মাটির উপর বসবে।

৩। এ সময় চোখের দৃষ্টি কোলের দিকে নিবদ্ধ থাকবে।

৪। বসা অবস্থায় হাতদ্বয় উরুর উপর (হাটু পর্যন্ত) রাখবে। হাতের আঙ্গুল গুলো হাটুর অগ্রভাগ পর্যন্ত পৌঁছাবে, এর বেশী নয়। কারণ, আঙ্গুল নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়।

৫। উল্লেখিত বৈঠকে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ দোয়াটি ১ বার পড়া মুস্তাহাব।

দ্বিতীয় সিজদায় গমন ও তা থেকে দন্ডায়মান হওয়া

১। দ্বিতীয় সিজদায় গমন কালীন সময় প্রথম দুই হাত তারপর নাক ও কপাল মাটিতে রাখবে।

২। এ সিজদাটি আকৃতি ও অবস্থার দিক থেকে প্রথম সিজদার অনুরূপ।

৩। সিজদা হতে উঠার সময় প্রথমে নাক, এর পর কপাল, এর পর হস্তদ্বয় মাটি হতে উত্তোলন করবে। পরিশেষে হাঁটু উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাবে।

৪। জলসা অথবা সিজদা হতে উঠার সময় হাত দ্বারা মাটিতে ভর দেয়া যাবে না। তবে শারীরিক অসুস্থতা অথবা বার্ধক্য জনিত ওজরের কারণে তা করতে পারে।

৫। এভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর বাকী নিয়ম পূর্বের মতই, তবে ছানা ও আউযুবিল্লাহ আর পড়তে হবে না।

আখেরী বৈঠক

১। দরমিয়ানী বৈঠকে বসার যে নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে, আখেরী বৈঠকে সেই নিয়মেই বসবে।

২। তাশাহহুদ পড়া কালীন সময় اشهد ان لا اله পর্যন্ত উপনীত হওয়ার পর তর্জনী উঁচু করে উপরের দিকে ইশারা করবে এবং الا الله বলার সময় নামিয়ে ফেলবে। এটা মুস্তাহাব।

৩। তর্জনী উঠানোর সময় হালকা বাঁধাও মুস্তাহাব। তার নিয়ম হল-বৃদ্ধা এবং মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ মিলিয়ে বৃত্তাকার করবে। কনিষ্ঠা ও অনামিকা আঙ্গুলদ্বয় গুটিয়ে নিবে এবং তর্জনী উঁচু করবে। তর্জনী উঁচু করার সময় বরাবর আকাশের দিকে না উঠিয়ে কিবলার দিকে ইঙ্গিত করবে।

সালাম ফিরানোর নিয়ম

১। উভয় দিকে সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে 'আাসসালামু, বলার সময় চেহারা কিবলামুখী থাকবে, এরপর আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলার সময় চেহারা ডানে বা বামে ঘুরাতে হবে। সুতরাং অনেকে যে দ্বিতীয় সালাম ডান দিক থেকে শুরু করে, এটা ঠিক নয়। সালাম ফিরানোর সময় মুখ মন্ডল এ পরিমাণ ফিরাবে-যাতে পিছনের লোক সামনের লোকের গন্ড দেশ দেখতে পায়।

২। এ সময় চোখের দৃষ্টি কাঁধের দিকে থাকবে।

৩। ডান দিকে সালাম ফিরাবার সময় মনে মনে নিয়ত করবে যে, আমি ডান দিকস্থ সকল মানুষ, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদেরকে সালাম দিতেছি। তদ্রূপ বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময়ও অনুরূপ নিয়ত করবে আমি

বামদিকস্থ সকল মানুষ, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের সালাম করছি। আর ইমাম সাহেব যেদিকে আছেন, সেদিকে সালাম ফিরাতে ইমামকে সালাম দেয়ার নিয়ত করবে। আর ইমাম সাহেব মধ্যখানে থাকলে, উভয় সালামে ইমামে নিয়ত করবে।

মুনাজাত করার নিয়ম

১। মুনাজাত করার সময় হস্তদ্বয় বক্ষদেশ বরাবর উত্তোলন করবে। হস্ত দ্বয়ের মাঝখানে ২/১ আঙ্গুল ফাঁক থাকবে। বেশী ফাঁক রাখা অনুচিত।

২। হস্তদ্বয় মুখের সামনে তালু আসমানের দিকে করে রাখবে।

৩। কবূল হওয়ার ইয়াকীন নিয়ে একাগ্রতার সাথে দোয়া করবে।

৪। আল্লাহ পাকের প্রশংসা ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদের মাধ্যমে দোয়া শুরু ও শেষ করবে এবং দোয়া শেষে আমীন বলবে।

৫। দোয়ার পর হস্তদ্বয় মুখ-মন্ডলে মুছে নিবে।

হাদীসের আলোকে নামায

১. নিয়াত করা। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّانَوٰى

"আমলের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তার নিয়ত অনুযায়ী আমলের ফলাফল পাবে।

সুতরাং নামাযের সর্বপ্রথম ফরয হল নিয়ত খালেস করা, নিয়ত হল অন্তরের সংকল্প করা যে, আমি ফযরের বা যোহরের ফরয পড়ছি। এর উচ্চারণ জরুরি নয়। অন্তরের সংকল্প ছাড়া শুধু মুখের উচ্চারণে নিয়ত আদায় হয় না। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা প্রমাণিত নেই। সুতরাং মুখে নিয়ত করাকে সুন্নাত বলা ভুল। তবে অন্তরের সংকল্পের পাশাপাশি মুখের নিয়তের ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। কিন্তু আরবী ভাষায় নিয়ত করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা নিতান্তই ভুল এবং প্রচলিত লম্বা আরবী নিয়ত করতে গিয়ে তাকবীরে উলা থেকে বঞ্চিত হওয়া বা জোরে জোরে উচ্চারণ করে অন্যের মনোযোগ নষ্ট করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(আল বাহরুর রায়েক ১/২৭৭)

২. তাকবীরে তাহরীমা বলা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতেন তখন الله اكبر বলে নমায শুরু করতেন।

৩. তাকবীর বলার সময় উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠানো এবং উঠানোর সময় হাতের আঙ্গুলিসমূহ খোলা (ও কেবলামুখী করে) রাখা।

(সহীহ মুসলিম ২/২৬৯, ২৯১, হাদীস ৩৯১, ৪০১, জামে তিরমিযী ২/৫, হাদীস -২৩৯)

৪. তাকবীরের পরে ডান হাত বাম হতের উপর (অর্থাৎ ডান হাতের কাব্জি বাম হাতের কব্জির উপর) রেখে হাত বাঁধা।

(শাওকানী, নাইলুল আওতার ২/১৮৮)

৫. নাভীর নিচে হাত বাঁধা। অনেকে নাভীর উপরে হাত বাঁধার কথাও বলেছেন।

৬. 'কিয়াম' অবস্থায় সেজদার স্থানে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে এদিকে সেদিকে তাকাতে বারণ করতেন এবং খুশূখুযূর সাথে নামায আদায় করার আদেশ করতেন।

৭. অতপর অনুচ্চাস্বরে কোন দোয়া বা সানা পড়া। সাধারণত ফরয নামাযে নিম্নোক্ত সানা পড়তেন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

এ ছাড়া এরো কিছু দোয়াও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত তাহাজ্জুদ নামাযে পড়তেন।

(ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়দ ১/১৯৭-১৯৯)

ফরয নামাযে উপরোক্ত সানাটি পড়া খুলাফায়ে রাশেদীনেরও আমল ছিল।

(মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়া, আল মুনতাকা মিন আখবরিল মুস্তাফা ১/৩৭০)

৮. সানার পরে 'তাআওউযু' ও 'তাসমিয়াহ' পড়া। তাআওউযের প্রসিদ্ধ শব্দ হল -اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১১৫; সহীহে মুসলিম, হাদীস ২৬১০; ইবনুল জাযায়ী আন নাশ্ র ফিল কিরাআতিল আশর ১/২৪৩)

তাআওউযের আরেকটি শব্দও সহীহ্ হদীসে আছে, কিন্তু সেটি তাহাজ্জুদের নসামাযের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। 'তাসমিয়াহ'র শব্দ নির্ধারিত। আর তা হলো- بسم الله الرحمن الرحيم

৯. আমলে মুতাওয়ারাস' (উম্মাহের অবিছিন্ন কর্মধারা) দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম 'আউযুবিল্লাহ' অনুচ্চস্বরে পড়তেন।

১০. সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বিসমিল্লাহ' ও অনুচ্চস্বরে পড়তেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়েছেন, কিন্তু এসব বর্ণনা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের আপত্তি রয়েছে। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিসমিল্লাহ উচ্চস্বরে পড়া তাঁর সুন্নাত নয়।

(ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলফা বাইনাল মুসলিমীন ৫০-৫১)

১১. এরপর সূরায়ে ফাতেহা পড়তেন।

১২. সূরায়ে ফাতেহা সমাপ্ত হলে 'আমীন বলতেন।

১৩. 'আমিন' কি উচ্চস্বরে বলবে, না অনুচ্চস্বরে? আস্তে কেরাআতের নামাযে অনুচ্চস্বরে বলবে। উম্মাহর কর্মধারা তা-ই প্রমাণ করে। কিন্তু উচ্চস্বরে কোরাআতের নামাযে রাসূলের আমল কী ছিল- এর ব্যাপারে বর্ণনা বিভিন্ন ধরণের। সহীহ হাদীসে উভয়টিই পাওয়া যায়, তবে বিভিন্ন আলামত ও লক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনুচ্চস্বরে বলাই রাসূলের মূলনীতি ছিল; তবে আমীন বলা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কখনো কখনো উচ্চস্বরেও বলেছেন (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৬৬, 'কুনুত ফিল ফজর' এর আলোচনায়)

১৪. সূরায়ে ফাতেহার পরে অন্য কোন সূরা পড়তেন। তবে ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে ফাতেহার পরে কোন সূরা পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়দ ১/২৩৯)

১৫. কেরাআত তারতীলের সাথে পরিস্কার করে পড়তেন।

১৬. কখনো অনেক দীর্ঘ কেরআতে পড়তেন এবং কখনো সফর ইত্যাদির কারণে অতি সংক্ষিপ্ত কেরআত পড়তেন। সাধারণত মাঝারি ধরণের কেরাআত পড়তেন। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০২)

ফজরের নামাযের কেরাত

হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) এর বর্ণনা মতে ফরজরে নামাযে ষাট থেকে একশ আয়ত পড়তেন। হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবীজী ফজরের নামাযে সূরা 'কাফ' এবং এ জাতীয় সূরা পড়তেন।

(সহীহ মুসলিম, হাদীসে-৪৫৮(১৬৯); মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২০৩৩২)

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণত ফজরের নামাযে 'তিওয়ারে মুফাসাসাল'-এর সূরাসসমূহ পড়তেন।

যোহরের নামাযের কেরাত

যোহরের নামাযে কখনো দীর্ঘ কেরআত পড়তেন এবং কখোন সূরা 'আ'লা ও সূরা 'গাশিয়া' (বা এই পরিমাণ) পড়তেন। কোন কোন সহীহ হাদীসে দুই রাকাআতে সূরা 'আলিফ-লাম-মীম সাজদা' এর সমপরিমাণ (যা ত্রিশ আয়াতসম্বলিত) পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

আসরের নামাযের কেরাত

আসরের কেরাআত যোহরের কেরাআতের প্রায় অর্ধেক হত (যদি যোহরের কেরাআকে দীর্ঘ ধরা হয়) বা তার সমান হত (যদি যহরেরে কেরাআতকে দীর্ঘ ধরা হয়) বা তার সমান হত (যদি যোহরের কেরাআত মাঝারি ধরা হয়)।

(ইবনুল কায়্যিম ১/২০৩)

মাগরিবের নামাযের কেরাত

মাগরিবের নামাযে 'কিসারে মুফাসসাল'- এর সূরাসহমূহ পড়তেন, তবে সর্বদা এমন করতেন না। কেননা মাগরিবের নামাযে বড় সূরা যথা ঃ সূরা সফফাত, হা-মীম দুখান, মুরসালাত ও আ'লা ইত্যাদি পড়াও বর্ণিত আছে।

(ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২০৩-২০৫/ আযযাইলায়ী, নাসবুর রায় ২/৫-৬)

ঈশার নামাযের কেরাত

বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইশার নামাযে 'আওসাতে মুফাসাসাল' এর সূরাসমূহ পড়তেন। একবার হযরত মু'আজ (রাঃ) ইশার নামাযে অনেক দীর্ঘ কেরাআত পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাহুআলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যখন ইমামতি করবে তখন–

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ـ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى- وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

ইত্যাদি সূরা পড়বে। কেননা তোমার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল, কোন প্রয়োজনে গমনকারী ব্যক্তিরাও নামায পড়ে থাকে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭০১-৭০৫, সহীহ মুসলিম ২/৩৮১, হাদীস ৪৬৫; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৪৩০৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৯৯৭-৯৯৮)

জুমুআর দিন ফজরের নামাযে সূরা 'আলিফ লাম মীম তানযীল' ও সুরা 'দুহর' পড়তেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৯৯১; সহীহ মুসলিম হাদীস-৮৮০)

জুমুআর দিন ফজরের নামাযের কেরাত

জুমুআর নামাযে কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'জুমু'আ' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'মুনাফিকূন' এবং কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'আ'লা' এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'গাশিয়া পড়তেন।

দুই ঈদের নামাযের কেরাত

দুই ঈদের নামাযে কখনো প্রথম রাকাআতে সূরা 'আ'লাও দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা 'গশিয়া' পড়তেন এবং কখনো সূরা 'কাফ' ও সূরা 'কামার' পড়তেন।

তবে উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের উদ্দেশ্য এই নয় যে, নামাযের কেরাআত উল্লেখিত সূরাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেননা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন 'মুফাসসালের' ছোট বড় কোন সূরা এমন নেই যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফরয নামাযে পড়তে শুনিনি।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস-৮১৪)

বরং মুফাসসালের বাইরে কুরআনে কারীমের অন্যত্র থেকে পড়াও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

১৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামগণকে বিশেষভাবে মুকতাদীদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখার আদেশ করতেন। তিনি ইরশাদ করেন-

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ

"যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি অন্যের ইমামতি করবে তখন সে যেন সংক্ষেপে করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকে এবং যখন সে একাকী নামায পড়বে তখন যে পরিমাণ দীর্ঘ করতে চায় করবে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৭০৩, সহীহ মুসলিম ২/৩৮৩-৩৮৪, হাদীস ৪৬৮)

একবার কোন ব্যক্তি তাঁর নিকট অভিযোগ করল যে, অমুক ইমাম খুব দীর্ঘ কেরাআত পড়েন, যার কারণে আমি হয়ত জামাআতে শরীক হতে পারবে না। নবীজী তা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং বললেন-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ (وَالْمَرِيضَ)

"হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে কতক ব্যক্তি এমন আছে, যারা মানুষের আগ্রহ নষ্টকারী। তোমাদের কেউ যখন ইমামতি করবে তখন সে যেন সংক্ষেপ

করে। কেননা তোমাদের পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল, প্রয়োজনে গমনকারী (ও অসুস্থ) ব্যক্তি থাকে।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৯০, সহীহ মুসলিম ২/৩৮২, হাদীস ৪৬৬)

১৮. তিনি ইমামের পেছনে ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়বেন।

(ইবনে তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ২৩/৩১৫, ৩২০)

কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ

যে ব্যক্তির ইমাম আছে ইমামের কেরাআতই তার কেরাআত হবে।

১৯. ফজরের উভয় রাকাআত, মাগরিব, ইশার প্রথম দুই রাকাআত, জুমুআ, দুই ঈদ, ইস্তিসকা ও সুর্যগ্রহণের নামাযে উচ্চস্বরে কোরাআত পড়া। অন্যান্য ক্ষেত্রে অনুচ্চস্বরে পড়া। তাহাজ্জুদের নামাযে সাধারণত কিছুটা উচ্চস্বরে তেলাওয়াত করা।

২০. ফজরের নামাযে সাধারণত প্রথম রাকাআত দ্বিতীয় রাকাআতের তুলনায় দীর্ঘ করা (যাতে মুকতাদীরা পুরো জামাআত পায়) এং যোহর আসরেও এমন করা। তবে যোহর আসরের উভয় রাকাআতের কেরাআত সমান হওয়ার কথাও সহীহ হাদীসে রয়েছে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৭৯ ইলাউস সুনান ৪/২৪-২৬)

২১. কেরাআত সমাপ্ত হলে কিছুটা বিশ্রাম নেওয়া, (যাতে শ্বাস ফিরে আসে) এরপর তাকবীর দিয়ে রুকূতে যাওয়া।

২২. রুকূতে উভয় হাত হাঁটুর উপর এমনভাবে রাখা যেন তা ধরে রাখা যায়। আঙ্গুলিসমূহ ফাঁক করে রাখা, উভয় হাত পাঁজর থেকে দূরে রাখা। মাথা উঁচুও না করা, নিচুও না করা, বরং পিঠের সমান্তরালে রাখা। এত সোজা হতে যে, পিঠে পানি ঢেলে দিলে তা স্থির থাকবে। রুকূতে ৩ বার سبحان ربى العظيم বলা।

রুকূ অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে আদায় করা। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

"ঐ নামায যথেষ্ট নয়, যাতে ব্যক্তি রুকূ সেজদায় আপন মেরুদণ্ড সোজা করে না।"

(সুনানে আবু দাউ, হাদীস-৮৫৫, জামে তিরমিযি, হাদীস-২৬৫, সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস-৫৯১, ৬৬৬)

আরো ইরশাদ করেছেন-

أَسْوَءُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِىْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ ! وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ : لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا

"নিকৃষ্টতম চুরি হল নামাযে চুরি করা। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নামাযে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, নামাযে রুকু-সেজদা পূর্ণাঙ্গভাবে জরে না"।

(মুসনাদে আহমদ ৫/৩১০, হাদীস-২২১৩৬, সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস-১৮৮৮)

২৩. রুকু থেকে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলতে বলতে উঠা ও অত্যান্ত শান্ত ভাবে সোজা হয়ে দাড়ানো। এরপর رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ বা اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা।

২৪. 'কওমা' থেকে তাকবীর বলতে বলতে সেজদায় যাওয়া। প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, এরপর চেহারা ভূমির উপর রাখা। কোন কোন বর্ণনায় প্রথমে হাত তারপর হাঁটু রাখার কথাও এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে তা সহীহ নয়। এ ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্যও রয়েছে। (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল ১/২১৫-২২৪; হাবিবুর রহমানআযমী (রহঃ), মাকালাতে আবুল মাআসির ১/১৪৯-১৭৪)

২৫. সেজদাতে কপাল ও নাক ভালভাবে জমির উপর রাখা। চোহারা উভয় হাতের মাঝে এবং উভয় কব্জি কান বরাবর, কখনো কাঁধ বরাবর রাখতেন। উভয় বাহু পাঁজর থেকে দূরে এবং কনুই জমি থেকে উঁচু রাখতেন, এমন কি নিচ দিয়ে ছাগলছানা অতিক্রম করতে চাইলে যেন অতিক্রম করতে পারে।

সেজদায় ৩ বার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى পড়া। নফল নামাযের সেজদায় দোয়াও করা। কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী কখনো ফরয নামাযেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদায় দোয়া করতেন।

২৬. তাসবীহর পরে তাকবীর বলতে বলতে সেজদা থেকে উঠা এবং অত্যান্ত শান্ত হয়ে বসা। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া রাখা। ডান পায়ের অঙ্গলিসমীহ কেবলামুখী করে রাখা।

২৭. 'জলসা' এর পর প্রথম সেজদার মত দ্বিতীয় সেজদা করা। এরপর তাকবীর বলতে বলতে দ্বিতীয় রাকাআতের জন্য সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া। সেজদা থেকে ওঠার সময় প্রথম মাথা এরপর হাত এরপর হাঁটু ওঠানো। ওঠার সময় জমিতে ভর না দেওয়া। উরুর উপর ভর দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া এবং প্রথম বা তৃতীয় রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদার পরে না বসা। এটাই রাসূলের সাধারণ

রীতি ছিল। কোন কোন বর্ণনায় দ্বিতীয় সেজদার পরে বসার কথা উল্লেখ আছে এবং ওঠার সময় (জমিতে) ভর দিয়ে ওঠার কথাও উলেখিত হয়েছে কিন্তু এই বিষয়ক সকল হাদীস ও সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদির সমষ্টিগত বিচারে প্রতীয়মান হয় যে, তা কখনো ওযরবশত।

(ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৩২, ইবনে তাইমিয়া, মাজমাউল ফাতওয়া ২২/৪৫১; আল বানুরী, মাআরিফুস সুনান ৩/৭৪-৮১)

২৮. রুকুদে যাওয়ার সময়, রুকূ থেকে উঠে এবং প্রথম বৈঠক থেকে উঠে তৃতীয় রাকআতের শুরুতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'রাফয়ে ইয়াদাইন' করতেন কি না বা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও হাত ওঠাতেন কি না- এ ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন ধরণের সারসংক্ষেপ হল, তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য কোথাও 'রাফয়ে য়াদাই' না করাও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের কিছু ক্ষেত্রে বিশেষত রুকূতে যেতে এবং রুকূ থেকে উঠতে 'রাফয়ে য়াদাইন' করাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(ইবনে তাইমিয়া, রিসালাতুল উলাফাহ বাইনাল মুসলিমীন-৫৫-৫৬; ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মায়াদ ১/২৬৬, ইবনে দাকীকুল ঈদ, আল ইমাম ফী মারিফাতি আহদীসিল আহকাম আযযাইলায়ী, নাসবুর রায়াহ ১/৩৯৩, কাশ্মীরী, নাইলুল ফারকাদাইন, ফী মাসআলাতি রাফায়িল য়াদাইন, বাসতুল য়াদাইন লিনাইলি ফারকাদান, আল বানুরী, মাআরিফুস সুনান শরহু জামিয়িত তিরমিযি ২/৪৫১-৫০১; উসমানী, ইলাউস সুনান ৩৫/৬-৯১)

২৯. দ্বিতীয় রাকআত প্রথম রাকআতের মতই আদায় করা, তবে এর শুরুতে সানা ও তাআওউযু পড়তেন না।

৩০. দ্বিতীয় রাকআতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে তাশাহহুদের (আত্তাহিয়্যাতুর) জন্য বসা। এখানেও এভাবেই বসা যেভাবে দুই সেজদার মাজখানে বসা হয়।

৩১. তাশাহহুদের প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধতম বর্ণনা হল

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

৩২. তিন রাকাআত বা চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে তাশাহহুদের পরে কিছু পড়তেন না। তৃতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন।

৩৩. তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাআতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাতেন না।

৩৪. তৃতীয় (শেষ রাকাআত হলে) বা চতুর্থ রাকাআতে দ্বিতীয় সেজদা থেকে তাকবীর বলতে বলতে বসতেন।

৩৫. 'আখেরী বৈঠকে' বসার বিভিন্ন পদ্ধতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু যে পদ্ধতিটিকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) নামাযের প্রত্যেক বৈঠকের জন্য মাসনূন পন্থা বলেছেন এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিয়ম বলেছে ন তা হলো, বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে তার আঙ্গুলিসমূহ কেবলামুখী রাখা। এ থেকে এবং অন্যান্য আলামত থেকে প্রতীয় মান হয় যে, অন্য পদ্ধতিগুলো বিশেষ অবস্থায় বা কোন উযরবশত হত।

(বাদরুদ্দন আইনী, উমদাতুল কারী, ৬/১০২-১০৩, কাশ্মীরী, ফয়যুল বায়ী ২/৩১০-৩১২, বানূরী, মা'আরেফুস সুনান ৩/১৬০-১৬৬)

৩৬. তাশাহুদের সময় উভয় হাত উরুর উপর রাখা। ডান হাত ডান উরুর উপর এবং বামহাত বাম উরুর উপর রাখা। কোন কোন বর্ণনায় উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখার কথা আছে। এর অর্থ হল হাত উরুর সম্মুখভাগে এমনভাবে রাখা, যেন অঙ্গুলিসমূহ হাঁটু স্পর্শ করে। কোন কোন বর্ণনায় বাম হাতের পাতা একদম বাম হাঁটুর উপরে রাখার উল্লেখ এসেছে। বলাবাহুল্য এমনটি মাঝে মাঝে করে থাকতেন। (ফাতহুল মুলহিম শরহু সহীহি মুসলিম ২/১৬৯)

৩৭. তাশাহুদের মধ্যে ডান হাতের অঙ্গলিসমুহ ব্যাপারে সহীহ হাদীসসমূহে বিভিন্ন তরীকা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুইটি হাদীস উল্লেখ করা হল-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ وَيَقُوْلُ هٰكَذَا حَلَقَ بِشْرٌ (الرَّاوِيْ) لِإِبْهَامِ وَالْوُسْطٰى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

'হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজুর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে বসার অবস্থা বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং ডান হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। ডান কনুই ডান উরুর সমান্তরালে রাখলেন। দুই অঙ্গুলি গুটালেন ও একটি গোলক বানালেন এবং আমি তাঁকে এভাবে ইশারা করতে দেখেছি, বর্ণনাকারী বিশ্‌র মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি

দ্বারা গোলক তৈরী করলেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন'।

(সুনাানে আবু দাউদ, হাদীস-৯৫৭)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضـ قَالَ ؛ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ اَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ الَّتِىْ تَلِى الْاِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যখন তিনি নামাযে বসতেন তখন তাঁর ডান হাতের পাতা ডান উরুর উপর রাখতেন, সকল অঙ্গুলি গুটিয়ে ফেলতেন এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির কাছের অঙ্গুলিটি দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম হাতের পাতা বাম উরুর উপর রাখতেন।"

(সহীহ মুসলীম, হাদীস-৫৮০, (১৪৪) মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী, মুয়াত্তা ১৮৭)

৩৮. আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ শরীফ পড়া। কেননা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর তাঁদেরকে নিম্নোক্ত দরূদটি শিখিয়ে দেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

এই দুরূদকে দরূদে ইবরাহীমী বলা হয়। সহীহ হাদীসে এর বিভিন্ন শব্দ বর্ণিত হয়েছে। যে কোন শব্দ অলম্বন করা যেতে পারে। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নামাজে এই দরূদ পড়তেন।

(ইমাম শাফেয়ী, কিতাবুল উম্ম ১/১৪০,বায়হাকী সুনানে কুবরা-২/১৪৭)

৩৯. দুরূদের পরে দোয়া করা। এ ব্যাপারে রাসূলের ইরশাদ হল, হামদ ও সানা অর্থাৎ তাশাহহুদ ও দরূদের পরে প্রার্থনা কর।

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস- ১৭৪৬৮; জামে তিরমীযি হাদীস ৩৪৭৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস-১৯৫১)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এই স্থলে পড়ার জন্য তাকে নিম্নোক্ত দাআটি শিখিয়েছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(সহীহ বুখারী, হাদীস-৮৩৪)

৪০. দোয়ার পর উভয় দিকে সালাম ফিরাতেন। ডান দিকেও, বাম দিকেও।

সালামের শব্দ হল ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ

'সালাম বেশি দীর্ঘ না করা সুন্নাত'। (জামে তিরমিযী, হাদীস-২৯৭)

এ থেকে বোঝা যায়, সালাম দীর্ঘ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল না।

৪১. নামায সমাপ্ত হওয়ার পর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া ও যিকির নিজেও পড়তেন এবং পড়ার নির্দেশও দিতেন এবং বলতেন, রাতের শেষ প্রহরে ও ফরয নামাযের পরে দোয়া অধিক কবূল হয়ে থাকে।

(জামে তিরমিযী, হাদীস-৩৪৯৯)

ফরয নামাযের পরে কখনো কখনো হাত উঠিয়ে দোয়া করেছেন। (আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ, সালামু রাসাইল, ফী ইসতিহবাবিদ দোয়ায়ি বাদাস সালাওয়াতিল মাকতূবাহ, শামসুদ্দিন নূর, আততুহফাতুলমাতলুবাহ ফিসতিহবাবি রাফয়িল য়াদাইন ফিদ দোয়া বাদাল মাকতুবাহ)

নামাযে মহিলাদের সতন্ত্র সুন্নাতসমূহ

১। তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কাধ পর্যন্ত উঠাবে। তবে হাত কাপড়ের বাঁইরে বের করবে না। (বেনায়া ২/১৯৭ মারাকিউল ফালাহ ঃ ১৪১)

২। উভয় হাত বুকের উপর স্তনের নিচে বাধবে এবং হাত বাধার ক্ষেত্রে শুধু ডান হাতের হাতিলী বাম হাতের পিঠের উপর রেখে দিবে। (বাহার ঃ ১/৩২১)

উভয় হাতের বাঝুদ্বয় পার্শদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে রাখবে।

(মারাকিউল ফালাহ ঃ ১৪১)

৩। উভয় পায়ের টাখনুকে দাঁড়ানো, রুকু এবং সেজদা অবস্থায় মিলিয়ে রাখবে। (উমদাতুল ফিকহ ঃ ২/১১৪)

৪। রুকুর মধ্যে বেশি ঝুকবেনা। অর্থাৎ হাতের আঙ্গুলের মাথা হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়াই যথেষ্ট। এর থেকে বেশি ঝুকার প্রয়োজন নেই। হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে। (উমদাতুল ফিক্হ ঃ ২/১১৪ মারাকিউল ফালাহ ১৪১)

৫। সেজদা অবস্থায় মহিলাগণ পদ্দ্বয় খাড়া রাখবে না। (বাহরুর রায়েক ঃ ১/৩২১) বরং বাম নিতম্বের উপর বসে উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে। (মোরাকিউল ফালাহ ঃ ১৪১) খুব মিলে সিজদা করবে যাতে করে পেট রানের সাথে মিলে যায়। (বেনায়া ঃ ২/২৮৯৭) উভয় হাতের কনুই জমিনের উপর বিছিয়ে দিবে। (বাদায়ে ১/২১০) উভয় হাতের বাজু পার্শদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে জমিনের উপর রাখবে। (উমদাতুল ফিকহ ঃ ২/১৪) এবং ডান রান বাম রানের উপর রাখবে। (মারাকিউল ফালাহ ১৪১)

৬। নামাযের বৈঠকসমূহে উভয় পা ডান দিকে বের করে দিবে। হাত রানের উপর রাখবে এবং আঙুলসমূহ খুব মিলিয়ে রাখবে।

(বাহার ঃ ১/৩২১ উমদাতুল ফিকহ ২/১১৪)

বিঃদ্রঃ মহিলাগণ নামাযের প্রতিটি রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে আঙুলগুলো খুব মিলিয়ে রাখবে।

৭। তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলারা তাদের দুহাত শরীরের সাথে মিলিয়ে আঙ্গুলির পেট কেবলামুখি রেখে বুক পর্যন্ত ওঠাবে। যাতে আঙ্গুলির মাথা কাঁধ বরা বর হয়। (মুজামে কাবীর, তবরানী ঃ ২২/১৯-২০ শামী ঃ ১/৪৮২)

সিজদায়ে সাহুর আলোচনা

সিজদায়ে সাহুর সালাম শুধু একদিকে

সিজদায়ে সাহুর জন্য কেবল ডান দিকে এক সালাম দিয়ে সিজদা করতে হয়। যদি কেউ ভুলে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে, তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

يَجِبُ لَهُ بَعْدَ سَلَامٍ وَاحِدٍ عَنْ يَمِيْنِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ الْمَعْهُوْدُ بِهِ يَحْصُلُ التَّحْلِيْلُ وَهُوَ الْأَصَحُّ

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ঃ ১ম খঃ ১২৫ পৃঃ)

মাসবুক উভয়দিকে সালাম ফিরিয়ে দিলে

কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় রাকায়াতে ইমাম সাহেবের সাথে নামাযে শরীক হয়ে তিন রাকায়াত নামায আদায় করার পর ইমাম সাহেবের সাথে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে দেয়। পার্শ্বের এক ব্যক্তি তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আপনার নামায বাকী রয়েছে। এ কথা বলার পর তারও স্মরণ হয় যে, তার নামায বাকী রয়ে গেছে। এরপর ঐ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নিপের অবশিষ্ট নামায সিজদায়ে সাহুর মাধ্যমে সমাপ্ত করে।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে পার্শ্বের ব্যক্তি বলার সাথে সাথে যদি ঐ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি অল্প সামান্য সময় অপেক্ষা করে নিজে স্মরণ করে দাঁড়ায়, তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যবে এবং সিজদায়ে সাহূ করে নিলে নামায মারূহও হবে না।

(ফতোয়ায়ে দারুল উলূমঃ ৪র্থ খঃ ৩৮৬ পৃঃ)

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় সিজদায়ে সাহূ তরক করলে

কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কিংবা অনিচ্ছায় যদি সিজদায়ে সাহূ তরক করে তাহলে কি তার নামায ছহীহ হবে? অনিচ্ছায় এবং ভুলে সিজদায়ে সাহূ না করলেও উভয় অবস্থায়ই নামায পুনরায় পড়ে নেয়া ওয়াজিব। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সিজদায়ে সাহূ তরকের ক্ষেত্রে হুকুমের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

(ফতোয়ায়ে দারুল উলূম ৪র্থ খঃ ৩৮৪ পৃঃ)

দু'ঈদে অতিরিক্ত তাকবীর না দিলে বা কম হলে

দু'ঈদের অতিরিক্ত ছয় তাকবীর ওয়াজিব। প্রথম রাকায়াতে তাকবীরে তাহরীমা এবং দ্বিতীয় রুকূর তাকবীর ছাড়া প্রতি রাকায়াতে অতিরিক্ত তিনটি করে তাকবীর দেয়া ওয়াজিব। যদি এ ছয় তাকবীর থেকে কোন একটি তাকবীর দেয়া না হয়, তাহলে ওয়াজিব তরক হয়ে যাবে। আর ওয়াজিব তরক হলে সিজদায়ে সাহূ অপরিহার্য হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু দু'ঈদের নামাযে সিজদায়ে সাহুর বিধান নেই। এ জন্য নামায হয়ে যাবে।

وَالسَّهْوُ فِىْ صَلَاةِ الْعِيْدِ وَالْجُمُعَةِ وَالْمَكْتُوْبَةِ وَالتَّوْبَةِ وَالتَّطَوُّعِ سَوَاءٌ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ عَدَمُهُ فِى الْاُوْلَيَيْنِ لِدَفْعِ الْفِتْنَةِ الخ

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১২৮ পৃঃ)

মাগরিব, এশা বা ফজরের নামাযে সূরা আস্তে শুরু করলে

যদি কোন ব্যক্তি মাগরিব, এশা বা ফজরের নামাযের প্রথম রাকায়াতে সূরায়ে ফাতেহা উচ্চঃস্বরে না পড়ে নিম্নস্বরে পড়ে এবং পিছন থেকে জোরে সূরায়ে ফাতেহা পড়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় বা নিজেরই স্মরণ হয়। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি এবং সকল মুক্তাদির নামায দুরস্ত হয়ে যাবে। যেহেতু এ অবস্থায় সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব ছিল, ইমাম সাহেব তা আদায় করেছেন। অতএব, নামায বিনা মাকরূহে আদায় হয়ে যাবে।

وَالْجَهْرُ فِيْمَا يُخَافَتُ فِيْهِ لِلْاِمَامِ (الى قوله) يَجِبُ السَّهْوُ بِهِمَا الخ

(ফতোয়ায়ে দারুল উলূম ৪র্থ খঃ ৩৮২ পৃঃ)

সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব কি না সন্দেহ হলে

নামাযের মাঝে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হলে সিজদায়ে সাহূ করে নেয়াই উত্তম।

وَاعْلَمْ اَنَّهٗ اِذَا شَغَلَهٗ ذٰلِكَ الشَّكُّ فَتَفَكَّرَ قَدْرَ اَدَاءِ رُكْنٍ وَلَمْ يَشْتَغِلْ حَالَةَ الشَّكِّ الخ وَيَجِبُ عَلَيْهِ سُجُوْدُ السَّهْوِ فِىْ جَمِيْعِ صُوَرِ الشَّكِّ

(ফতোয়ায়ে দারুল উলূম ৪র্থ খঃ ৩৭৮ পৃঃ)

প্রথম রাকায়াতে এক সিজদা করলে করনীয়

যদি কোন ব্যক্তি ভুলে নামাযের প্রথম রাকায়াতে এক সিজদা করে দাঁড়িয়ে যায়। এখন স্মরণ হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি যে সময় স্মরণ হবে ঐ সময়ই দ্বিতীয় সিজদাটি আদায় করে নিবে এবং শেষে সিজদায়ে সাহূ করে নিতে হবে।

وَلَايَجِبُ السَّهْوُ اِلَّا بِتَرْكِ وَاجِبٍ اَوْ تَاْخِيْرِهٖ اَوْ تَاْخِيْرِ رُكْنٍ اَوْ تَقْدِيْمِهٖ الخ

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১২৬ পৃঃ)

প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ শরীফ পড়লে

ফরয, ওয়াজিবঅথবা সুন্নত নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূর শরীফ ইত্যাদি পড়লে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে। তবে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহর ক্ষেত্রে দুটি অভিমত রয়েছে। তবে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিবের অভিমতটিই উত্তম। এ ছাড়া প্রথম বৈঠকের কথা ভুলে গিয়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেলে আর বসবে না। নামায শেষে সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিবের অভিমতটিই উত্তম। এ ছাড়া প্রথম বৈঠকের কথা ভুলে গিয়ে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে গেলে আর বসবে না। নামায শেষে সিজদায়ে সাহূ করে নিতে হবে।

وَلَوْسَهَا عَنِ الْقُعُوْدِ (الخ) مِنَ الْفَرَائِضِ وَلَوْ عَمَلِيًّا (الى) وَالصَّحِيْحُ اَنَّهٗ لَايَعُوْدُ (الخ) وَلَايَزِيْدُ فِى الْفَرْضِ عَلَى التَّشَهُّدِ فِى الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى اِجْمَاعًا (الخ) وَمَا اُلْحِقَ بِهٖ كَالْوِتْرِ وَالسُّنَنِ الرَّوَاتِبِ وَاِنْ نَظَرَ صَاحِبُ الْبَرِّ فِيْهَا

(ফতোয়ায়ে আলমগীরী ১ম খঃ ১২৭ পৃঃ)

ফজরের দ্বিতীয় রাকায়াতে দাঁড়িয়ে বসে গেল

কোন ব্যক্তি ফজরের ফরয নামাযের দুই রাকায়াত আদায় করার পর বৈঠক না করেই যদি দাঁড়িয়ে যায় এবং তৃতীয় রাকায়াতে সূরা ফাতেহাসহ অন্য সূরা বা আয়াত তেলাওয়াতের পর স্মরণ হয়, তাহলে তৎক্ষণাৎ বসে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করে নিবে। নামায সহীহ ও বৈধ হয়ে যাবে।

وَلَوْسَهَا عَنِ الْقُعُوْدِ الْاَخِيْرِ كُلِّهِ اَوْ بَعْضِهِ عَادَ (رالخ) مَالَمْ يُقَيِّدْهَا بِسَجْدَةٍ لِاَنَّ مَا مَا دُوْنَ الرَّكْعَةِ مَحَلُّ الرَّفْضِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ لِتَاخِيْرِ الْقُعُوْدِ الخ

(ফতোয়ায়ে দারুল উলূম ৪র্থ খঃ ৩৯৭ পৃঃ)

তাশাহ্হুদের স্থানে ফাতেহা পড়া

ভুলক্রমে তাশাহ্হুদের স্থানে সূরা ফাতেহা পড়ে তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে তাশাহ্হুদ পড়বে এবং সিজদায়ে সাহূ দিবে।

قَالَ فِى الْهِنْدِيَّةِ وَاِذَا قَرَأَ الْفَاتِحَةَ مَكَانَ التَّشَهُّدِ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ

(আহসানুল ফতোয়া ৪র্থ খঃ ৩৬ পৃঃ)

মাসবূক ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে ইমামের সাথে সালাম ফিরায়

মাসবূক ব্যক্তি যদি ভুলক্রমে ইমামের সালামের সাথে সাথে এভাবে সালাম ফিরায় যে, ইমামের "আসসালামু" এর মীম আর মাসবূক ব্যক্তির উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে না। আর যদি মাসবূক ব্যক্তির সালাম একটু দেরী হয়, যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত মাসবূকের উপর সিজদায়ে সাহূ ওয়াজিব হবে। (আহসানুল ফতোয়া ৪র্থ খঃ ৩৬ পৃঃ)

আর মাসবূক ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ইমামের সাথে সালাম ফিরায়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। (আহসানুল ফতোয়া ৪র্থ খঃ ৩৬ পৃঃ)

সালাতুত্তাসবীহ্ নামায

এ আমলটি করলে- অগ্র-পশ্চাতের, নতুন-পুরাতন, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, ছগীরা-কবীরা, গোপনে-প্রকাশ্যে যত প্রকার গুনাহ আছে সব গুনাহ আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন।

এ নামাযের নিয়ম হলো- (এ নমায ৪ রাকাত বিশিষ্ট) প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা পাঠ করবে প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর অন্য যে কোন সূরা পাঠ করবে প্রথম রাকাতে কিরাত শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার (সুবানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার) বলবে, এরপর রুকুর তাসবীহ পাঠ করার পর ১০ বার, রুকূ থেকে উঠে ১০ বার, সিজদায় গিয়ে ১০ বার, সিজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে ১০ বার, সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগে বসে ১০ বার এভাবে ৪ রাকাত নামায পড়বেন। প্রতি রাকাতে ৭৫ বার করে ৪ রাকাতে মোট ৩০০ বার (সুবানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার) এই তাসবিহটি পাঠ করবেন।

সংক্ষিপ্ত সালাতুত তাসবীহ

উম্মে সুলাইম বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কিছু বাক্য শিখিয়েছেন, নামাযের মধ্যে সেগুলো পড়ে যে কোন দোয়া করলে আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করেন।

২ রাকাত নামাযের যে কোন রোকনে ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আলহামদুলিল্লাহ, ১০ বার আল্লাহু আকবার পড়া। যেহেতু সিজদারত অবস্থা আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়। তাই সিজদাতে পড়াই উত্তম।

ছালাতুল হাজত-এর আমল

যে কোন প্রকার হাজত বা প্রয়োজন দেখা দিলে চাই তাহার সম্পর্ক আল্লাহর সঙ্গে হউক কিংবা মানুষের সঙ্গে–

প্রথমত ঃ সুন্নত মোতাবেক সুন্দর ভাবে অযু করবে। তারপর খুব দিল্ লাগাইয়া নিবিষ্ট মনে, এতমীনানের সাথে দুই রাকআত নামায পড়বে। অতঃপর আল্লাহপাকের কিছু হাম্‌দ ও ছানা (প্রশংসা) করবে। তারপর দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ নিম্নের দোয়াটি কম পক্ষে একবার অথবা যত বার ইচ্ছা পাঠ করবে। শেষে নিজের খাস্ উদ্দেশ্যের জন্য মহান দারবারে দরখাস্ত পেশ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَاَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, যিনি পরম সহিষ্ণু, পরম কৃপাময়। পরম পবিত্র আল্লাহ তা'আলা, যিনি মহান আরশের মালিক এবং সর্বপ্রকার সৎ ও মহৎ গুণাবলী, জগত সমূহের মালিক ও লালনকর্তা আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ্, আমি আপনার নিকট ঐ সকল জিনিসের প্রার্থনা করি যে সকল জিনিসের দ্বারা নিশ্চিত ভাবে আপনার রহমত নাযিল হয়, যাহার বরকত অবধারিত ভাবে আপনার ক্ষমা নসীব হয় এবং সর্ব প্রকার ভালাই দৌলত ও সর্ব রকম পাপাচার হইতে হেফাযত প্রার্থনা করি। হে আরহামুর রাহীমীন ! সকল মেহেরবান অপেক্ষা বড় মেহেরবান! আমার সর্ব রকম গুনাহ মাফ করিয়া দিন, সকল পেরেশানী দূর করিয়া দিন, আমার যত হাজত ও প্রয়োজন আছে যাহা আপনার

নিকট পছন্দীয় এবং গ্রহণযোগ্য তাহা সমাধা করিয়া দিন; আমার কোন গুনাহ্ই ক্ষমাহীন এবং কোন হাজত বা কোন পেরেশানীই সমাধাহীন রাখিবেন না।

(তিরমিযী শরীফ ১ম খণ্ড, ১০৮-১০৯)

এস্তেখারার নামায

কখনও যদি কোন কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সংশয় বা দোদুল্যমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, এ কাজ করিব কি করিবনা, তখন এস্তেখারার নামায পড়িয়া এস্তেখারার দোয়া পাঠ করিবেন। অতঃপর যাহা বা যে দিকটি অন্তরের ভিতর প্রবল জোরদার মনে হয় তাহাই করিবেন।

আল্লামা শামী (রঃ) হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আন্হুর বর্ণানায় এস্তেখারার নামায সাত বার পড়ার কথা লিখিয়াছেন।

হাদীস শরীফে আছে ঃ মশওয়ারা (পরামর্শ) করিয়া কোন কাজ করিলে লজ্জা ও অনুশোচনর সম্মুখীন হইবেনা এবং আল্লাহপাকের পক্ষ হইতে ভাল-মন্দ জানিয়া লওয়ার জন্য এস্তেখারা করিয়া নিলে ব্যর্থকাম হইবেনা। এস্তেখারার মধ্যে নিজের দুর্ভাগ্য ও বদ্নসীবি ব্যতীত আর কিছু নয়।

স্মরণ রাখার দরকার যে, এস্তেখারার মধ্যে কোন স্বপ্ন দেখা অথবা ডানে-বাঁয়ে কোন রকম ফড়্কানি অনুভব হওয়া আদৌ জরুরী নহে; বরং সোজা কথা এই যে, অন্তরে যাহা প্রবল মনে হয়, বস্, তাহাই করিবে। যদি কোথাও কাহারও বিবাহের পয়গাম পাঠাইতে হয় কিংবা অন্য কোন কাজ করিতে হয়, তখন এস্তেখারা করিয়া নিবে, এস্তেখারা ব্যতীত করিবে না। ইনশাআল্লাহ, তাহা হইলে কখনও কোন কাজ করিয়া পেরেশানী ও দুর্ভোগে পতিত হবে না।

এস্তেখারার তরীকা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ- وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّلِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْلِىَ الْخَيْرَحَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ

যখন 'হাযাল্-আমরা' পড়িবে তখন উদ্দেশ্যের খেয়াল করিব। যদি সন্দেহ-সংশয় দূর না হয় তবে সাতদিন পর্যন্ত এস্তেখারা করিতে থাকিবে। যদি বিলম্বে করা সম্ভব না হয় তাবে একই সঙ্গে দুই রাকআত করিয়া ৭বার নফল নামায পড়িয়া লইবে। প্রতি দুই রাকআতের শেষে সালাম ফিরাইবে। অতঃপর উপরোল্লেখিত দোয়া পাঠ করিবে।

তওবার নামায-এর আমল

ইহাকে 'ছালাতুত্-তওবা' বলে। শরীআতের খেলাফ কোন কাজ, কোন পাপ হইয়া গেলে দুই রাক্আত নফল নামায পড়িয়া খুব কাকুতি-মিনতির সহিত আল্লাহপাকের দরবারে তওবা করিবে এবং খুব লজ্জিত হইবে। হাদীস শরীফে আছে, তোমাদের কাঁধ। কান্না না আসিলে চেহারার মধ্যে ক্রন্দনকারীদের মত ভাব-ভঙ্গি পয়দা করিয়া কাঁদিতে চেষ্টা কর এবং পাক্কা নিয়ত করিবে যে, আর কখনও গুনাহ করিবনা। এরূপ আমল করিলে সেই গুনাহ পরম করুনাময়ের অপার কৃপায় মাফ হইয়া যায়।

তাহাজ্জুদের নামাযের আলোচনা

(تَهَجُّد) তাহাজ্জুদ শব্দটি নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর বিরোধী দুই অর্থে ব্যবহার হয়।

শরিয়তের পরিভাষায় ইশার নামাযের পর থেকে সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত যে নফল নামায পড়া হয় তাকে সালাতুল লাইল বা তাহাজ্জুদের নামায বলা হয়। নফল নামাযের মধ্যে তাহাজ্জুদের ফজীলত সবথেকে বেশি।

আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا

অর্থাৎ তারা রাত্রি যাপন করে তাদের পালনকর্তার সামনে সেজদা করা অবস্থায় ও দণ্ডায়মান অবস্থায়।

অন্য আয়াতে ঈমানদারগণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন।

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ

তারা শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রতিপালককে ডাকে আশায় ও আশংকায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।

উক্ত আয়াতে তাহাজ্জুদের কথাই বলা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا

যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সেজদার মাধ্যমে অথবা দাঁড়ায়ে এবাদত করে, পরকালের আশংকা রাখে এবং তার পালন কর্তার রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি সমান, যে এরূপ করেনা। বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করেম, যারা বুদ্ধিমান।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে সহজ হিসাবের কামনা করে তার উচিত হবে আল্লাহ যেন তাকে রাত্রির অন্ধকারে সেজদায় রত ও দাঁড়ানো অবস্থায় পান। তার মধ্যে পরকালের চিন্তা এবং রহমতের প্রত্যাশাও থাকা দরকার। (কুরতুবী)

মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি একদা নবীজীর সংগে সফরে ছিলাম। সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এমন কোন আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি বেহেশত লাভ করতে পারি এবং দোযখ থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কোন অংশীদার স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে যাকাত প্রদান করবে, রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই। (তা এই যে) রোযা ঢাল স্বরূপ। (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়) এবং সদকা মানুষের জাহান্নামের আগুন নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের নামায। এই বলে কোরআন মাজীদের আয়াতে তেলাওয়াত করলেন।

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

হযরত আসমা বিনতে ইয়াবীদ থেকে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী মানবমণ্ডলীকে একত্রিত করবেন, তখন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক আহবানকারী যার আওয়াজ সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, দাঁড়িয়ে আহবান করবেন যে, হাশর ময়দানে সমবেত জনমণ্ডলী! আজ তোমরা জানতে পারবে যে, আল্লাহ পাকের নিকটে সর্বাধিক সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী কে? অনন্তর সে

ফেরেশতা تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ (যার পাশ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক) এরূপ গুণের অধিকারী লোকগণকে দাঁড়াতে আহবান জানাবেন। এ আওয়াজ শুনে যেসব লোক দাঁড়িয়ে পড়বেন। তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য।

(ইবনে কাসীর)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়। কেননা এটা তোমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য দানকারী, মন্দ কাজের কাফফারা এবং গোনাহ থেকে নিবৃত্তকারী।

(মাজহারী)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা সালামের সম্প্রসারণ কর, ক্ষুধার্তদের খানা খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমে থাকে তখন নামায পড় বিনিময়ে আল্লাহ পাক তোমাদের জান্নাত দান করবেন।

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জান্নাতে এক ধরনের এমন স্বচ্ছ ঘর থাকবে যার বাহিরাংশ ভিতর থেকে এবং ভিতরাংশ বাহির থেকে পরিলক্ষিত হবে। এক ব্যক্তি দাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সোল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সুন্দর ঘর কাদের জন্য? উত্তরে বললেন, যারা নরম ভাষায় কথা বলবে এবং ক্ষুধার্তদের খানা খাওয়াবে, রমজান মাসে রোযা রাখবে, এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আল্লাহর জন্য নামায পড়বে আল্লাহ পাক এই ঘর তাদের জন্য নির্মাণ করেছেন।

(তিরমিযী)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতি রাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন শেষ রাতে প্রথম আসমানে এসে ঘোষণা করতে থাকেন কে আছ আমার নিকট দোয়া করবে আমি তা কবুল করব, কে আমার নিকট চাইবে আমি তাকে তার কাংক্ষিত বস্তু দিব, কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (বুখারী, মুসলিম)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّ النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

ঐ দুই চক্ষুকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। এক ঐ চক্ষু যা মধ্যরাতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করেছে। দ্বিতীয় ঐ চক্ষু যা আল্লাহর রাস্তায়

পাহারাদারী করে রাত্রি যাপন করেছে। এছাড়াও অসংখ্য হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের ফজীলত প্রমাণিত হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত বেশি নামায পড়তেন যে, হুযুরের পা মোবারক ফুলে যেত। হযরাতে ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করতেন ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাক তো আপনার জীবনের আগে-পরের সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন এর পরেও আপনি এতে কষ্ট করেন কেন? হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আমি কি আমার প্রতিপালকের শুকুরগোযার বান্দা হবনা। অনুরূপভাবে হযারাতে ছবাহাবায়ে কিরামের জীবনে অনেক ঘটনা এমন রয়েছে যে, পুরা রাত তারা নামাযে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাবেয়ীদের জীবনেও অনেক ঘটনা এমন বিদ্যমান আছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রাঃ) ৫০ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছেন।

হযরত আলি বিন হুছাইন (রঃ) জীবনে কোন দিন তাহাজ্জুদের নামায ছাড়েন নি। আল্লামা জাহাবী (রাঃ) লিখেন যে, তিনি দিন-রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার কর্মধারা এমনি ছিল। হযরত রাবেয়া বছরী (রঃ) রাতে ওযু করে প্রথমে স্বামীর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতেন আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? যদি স্বামী বলত না, তাহলে পুরা রাত তিনি নামাযে কাটিয়ে দিতেন এবং এই বলে দোয়া করতেন হে আল্লাহ, সমস্ত মানুষ ঘুমিয়ে আছে। তারকারাজিও অস্তমিত হয়েছে। দুনিয়ার বাদশাহের দরজাও বন্ধ হয়ে গেছে এখন শুধু আপনার দরজা খোলা আছে, অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ আল মুনকাদির দিনে রোযা রাখতেন এবং রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ত তখন দির্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতেন রাত কতইনা আরামের সময় চারদিকে আঁধারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। প্রত্যেক প্রেমিক তার প্রেমিককে কাছে পেয়ে উপভোগ করছে এক স্বর্গিয় শান্তি। কিন্তু হে আল্লাহ এই মুহূর্তে আমার আপনার ইবাদতই পছন্দনীয়। আহ! যদি আমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতাম। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) রাতের প্রথম অংশে লেখালেখি করতেন এবং দ্বিতীয় অংশে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং তৃতীয়াংশে আরাম করতেন। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ) রাত-দিন ৩০০ শত রাকাত নফল নামায পড়তেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ৩০/৪০/৪৫/৫০ বছর পর্যন্ত এশার ওযু দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। হযরত মালেক বিন দীনার (রঃ) বলেন, এক রাতে আমি তাহাজ্জুদের নামায না পড়ে

ঘুমিয়ে গেলাম। হঠাৎ স্বপ্নে দেখি এক অনিন্দ্য সুন্দরী মহিলা আমাকে একটি কাগজ হাতে দিয়ে বলল তুমি এটা খুব সুন্দর করে পড়তে পারবে? উত্তরে আমি বললাম হাঁ পারব। যার মধ্যে নিম্নেক্ত কবিতাগুলি লেখা ছিল ঃ যার অর্থ হল

অর্থাৎঃ ক্ষণিকের আনন্দ এবং আশা-আকাংক্ষা কি তোমাকে জান্নাতের পূত-পবিত্র হুরদের থেকে অমনোযোগী করে দিয়েছে? জান্নাতের জীবন অনন্ত কালের জন্য সেখানে মৃত্য হবে না। অনিন্দ্য সুন্দরী হুরদের সাথে সেখানে বিলাসিতার সবধরনের বস্তু বিদ্যমান থাকবে। সুতরাং ঘুম থেকে উঠে, তাহাজ্জুদের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত ঘুম থেকে অনেক উত্তম।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা আমরা চক্ষু বন্ধ করে একটু চিন্তা করি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযারাতে সাহাবাকেরাম তাবেঈন, তাবে তাবেঈন এবং চার মাজহাবের ইমামগণ সহ পূর্বের যামানার বড় বড় বুযর্গ ব্যক্তিগণ আল্লাহ পাকের ভয়ে পরকালের ভয়ে রাতের বেলা কিভাবে ইবাদত করতেন, কিন্তু আজ আমরা পরকালের ব্যাপারে কোন চিন্তা করছিনা, আমরা আমাদের রাতগুলি কিভাবে কাটাচ্ছি ইবাদত তো অনেক দূরে থাক কঠিন কঠিন নাফরমানি করতেও দ্বিধা করছিনা। এমন তো অনেকেই আছে, রাত দুটো তিনটা পর্যন্ত টি ভি, সিনেমা দেখতে থাকে এবং তার পরে ঘুম যায় এবং সকাল ১০ টার দিকে ঘুম ভাঙ্গে, তাহাজ্জুদ তো দূরে থাক ফজরের ফরয নামাজেরই খবর থাকে না। আহঃ পূর্বের সমস্ত মহামনিষীগণ তাদের রাত্রকে কিভাবে কাটিয়েছেন আর আমাদের মত গোনাহগাররা আমরা রাত কিভাবে কাটাই। তাই একটু চিন্তা করুন। পুরা রাত সম্ভব না হলেও রাতের কিছু অংশ আল্লাহর ইবাদতে কাটাবার চেষ্টা করুন।

অন্ধকার কবরের কথা চিন্তা করুন যেখানে কোন সাথী থাকবে না। বাতি থাকবে না। ভয়াবহ দোযখের কথা চিন্তা করুন এবং নিজের জীবনের গোনাহ থেকে চোখের পানি ফেলে তওবা করুন, আল্লাহ পাক আমাকে এবং সমস্ত পাঠক পাঠিকাদের তৌফিক দান করুন। আমীন।

রাত্রি জাগরণের উপায়সমূহ

(১) রাত্রে প্রয়োজন অতিরিক্ত না খাওয়া। কেননা অনেক বেশি পরিমাণ খানা খেলে রাত জাগতে কষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল, যাদের শরীর দুর্বল বা কম খেলে দুর্বল হয়ে যাওয়া বা অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে তাদের জন্য তাদের চাহিদা অনুপাতে আহার গ্রহণ করা উচিত।

(২) রাতে এত বেশি কষ্টের কাজ করবে না যাতে রাতে এমন ক্লান্তি আসে যার দরুন আর জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় না।

(৩) দিনে কাইলুলা করার প্রতি যত্নবান হতে হবে।

(৪) সমস্ত প্রকারের গোনাহের থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা গোনাহ করলে রাত্রী জাগরণের মত নিয়ামত অর্জন হয় না। হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রঃ) কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল যে, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যাতে আমি রাত্রী জাগরণ করে ইবাদত করতে পারি।

উত্তরে তিনি বললেন, সর্ব প্রকারের গোনাহ ছেড়ে দাও। কেননা যখন তুমি দিনে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে বিনিময়ে আল্লাহ পাক তোমাকে রাতে তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে ইবাদত করার তৌফিক দিবেন।

(৫) অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেক এবং নিজেকে বিদআতী কর্মকাণ্ড থেকে, দুনিয়ার চিন্তা-ফিকির থেকে সংযত রাখার চেষ্টা করবে। কেননা যে ব্যক্তি সারাক্ষণ দুনিয়ার ফিকিরে লিপ্ত থাকে রাত্রি জাগরণের বিয়ামত তার নছীব হয় না।

(৬) অধিক পরিমাণ আখেরাতের চিন্তা এবং জাহান্নামের ভয়ংকর দৃশ্য সব সময় নিজের মনে তাছাউউর করতে থাকবে।

(৭) রাত্রী জাগরণের ফজীলত সম্পর্কিত আয়াত এবং হাদীসগুলো পড়ার চেষ্টা করতে হবে। (এহয়ায়ে উলুমুদ্দীন)

তাহাজ্জুদের আদবসমূহ

(১) রাতে ঘুম থেকে জেগে প্রথমে কোরআনে পাকের কিছু তেলাওয়াত করে নিবে। এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, সূরা আলে ইমরানের ১০ আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব।

(২) তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়ে ওযু করার পূর্বে মেসওয়াক করে নিবে।

(৩) তাহাজ্জুদের পূর্বে আতর ব্যবহার করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা।

(৪) উপরোক্ত বিষয়গুলি অবলম্বন করার পর কেবলামুখি হয়ে জায়নামাযে বসে কোরআন্ হাদীসে বর্ণিত কিছু দোয়া পড়ে নিবে।

(৫) প্রতি দুই রাকাতের পরে সম্ভব হলে ১০০ বার তাছবীহ পড়ে নিবে।

(৬) নামাযে তারতীলের সাথে কেরাত পড়বে।

(৭) কেরাত উচ্চ আওয়াযে বা নিম্ন আওয়াজে যে কোন-ভাবে পড়ার অবকাশ রয়েছে। উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে অন্যের ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটে। অনেকে তাহাজ্জুদের জন্য উঠলে আশেপাশের অনেক লোকের ঘুম ভেঙ্গে দেয়, এটা উচিত নয়।

(৮) নামাযের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

(৯) নামাযের মাঝে যদি ঘুম আসে তাহলে ঘুমিয়ে যাওয়া উচিত। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি নামায পড়া অবস্থায় ঘুম আসে তাহলে ঘুমিয়ে যাবে। কেননা কোথাও ইস্তেগফারের পরিবর্তে নিজের উপর বদদোয়া না হয়ে যায়।

(১০) রাতে শোয়ার সময় তাহাজ্জুদের জন্য নিয়াত করে শয়ন করবে। কেননা ঘটনাক্রমে যদি উঠতে না পারা যায় তাহলে নিয়াতের কারণে আল্লাহ পাক ছওয়াব দান করবেন।

(১১) যদি কারো রাতে ওঠার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকে তাহলে বেতেরের নামায তাহাজ্জুদের নামাযের সাথে পড়বে।

তাহাজ্জুদের মাসআলা

১। তাহাজ্জুদের নামায মুস্তাহাব।

সাধারণত ফুকাহায়ে কিরামগণ তাহাজ্জুদের নামায মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। কিন্তু কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রঃ) সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলেছেন।

২। যে ব্যক্তি তাহাজ্জ্বাদের নামাযে অভ্যস্ত বিনা ওযরে তার জন্য তাহাজ্জ্বাদ ছেড়ে দেওয়া মাকরুহ।

৩। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাহাজ্জ্বাদের নামায দুই দুই রাকাত করে পড়া উত্তম।

৪। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ পড়া উত্তম।

৫। ছুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে রাতে উঠতে না পারে তাহলে এশার সুন্নাত পড়ে বেতেরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়্যাতে সাধ্যানুযায়ী নফল নামায পড়ে নেয় তাহলে তা তাহাজ্জুদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে।

৭ম অধ্যায়

রোযার আলোচনা

রোযার তাৎপর্য ও রোযাদারের করণীয়

রমযানের রোযা ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। রোযা শব্দটি ফারসী। এর আরবী ও শরয়ী পরিভাষা 'সওম'। সওম অর্থ নিবৃত্ত থাকা। আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনায় সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামাচার হতে বিনৃত্ত থাকাকে সওম (বহুবচনে সিয়াম) বলে।

সওম পালন মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতি আরোপিত অভূতপূর্ব কোন বিধান নয়। ইহুদী-খৃস্টানসহ পূর্ববর্তী সকল ধার্মাবলম্বীর প্রতিই সিয়াম সাধানার নির্দেশ ছিল। সকল আসমানী দ্বীনের অনুসারী অদ্যাবধি কোনও না কোনভাবে রোযা পালন করে থাকে। এমনকি পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের মধ্যেও উপবাস পালনের রেওয়াজ পরিলক্ষিত হয় বস্তুত রোযা রাখা বা সিয়াম সাধনা করা ধর্মমাত্রেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তেমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বনকারী (মুত্তাকী) হতে পার।" (সূরা বাকারা ১৮৩)

এ আয়াত দ্বারা আমরা তিনটি জিনিস জানতে পারি-(ক) রোযা ফরয হওয়া (খ) অপরাপর আসমানী ধর্মেরও রোযার বিধান থাকা এবং (গ) আরও জানতে পারি রোযার বিধান কেন দেওয়া হয়েছে এই প্রশ্নের উত্তর।

রমযানের রোযা কেন ফরয করা হয়েছে এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা অতি সংক্ষেপে ইরশাদ করেন 'যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার। অর্থাৎ বান্দাকে মুত্তাকী বানানোই সিয়ামের লক্ষ্য। এক মাস সিয়াস সাধনা দ্বারা বান্দার অন্তরে যদি তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয় তথা সে একজন মুত্তাকী হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয় তবেই তার সিয়াম সাধণা অর্থবহ হয়। অন্যথায় সেটা উপবাস মাত্র। হাদীসের ভাষ্য অনুসারে সে উপবাসের কোন মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে নেই। কাজেই রোযাদারের কর্তব্য প্রথমে তাকওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া,

তারপর সিয়াম সাধনার সাথে সাথে নিজের মধ্যে যাতে তাকওয়া বদ্ধমূল হয়ে যায় সে ব্যাপারে যত্নবান থাকা।

'তাকওয়া' মানে বেঁচে থাকা, আত্মরক্ষা করা। শরীয়তের পরিভাষায় যেসব বিষয় আখেরাতের পক্ষে ক্ষতিকর তা হতে আত্মরক্ষাকে তাকওয়া বলে। এর বিভিন্ন স্তর আছে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে শিরক্ ও কুফর পরিহার করা। মধ্যম স্তর হচ্ছে কবীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকা এবং সগীরাহ গুনাহ বার বার না করা, আর সর্বোচ্চ স্তর এই যে, দূষণীয় বিষয় হতে বেঁচে থাকার লক্ষ্যে বান্দা এমন অনেক জায়েয বিষয়কেও পরিহার করে চলবে যেগুলো করলে নাজায়েযে পতিত হওয়ার আশংকা থাকে। মনীষীগণ আপন-আপন উপলব্ধি অনুযায়ী তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

হযরত উমর (রাঃ) হযরত উবাই (রাঃ)-এর কাছে তাকওয়ার ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে হযরত উবাই (রাঃ) বললেন, আপনি কি কখনও কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ চলেছি। হযরত উবাই (রাঃ) বললেন, তা কীভাবে চলেছেন? তিনি বললেন, কাপড় চোপড় গুটিয়ে নিয়েছি এবং অতি সতর্কতার সাথে চলেছি। হযরত উবাই (রাঃ) বললেন, এটাই তাকওয়া।

খ্যাতনামা বুযুর্গ হযরত আবু ইয়াযীদ বুসতামী (রহঃ) বলেন, মুত্তাকী সেই ব্যক্তি যে কথা বলে তো আল্লাহর জন্য বলে, আর কাজ করে তো আল্লাহর জন্য করে। আবু সুলায়মান দারনী রহ. বলেন, মুত্তাকী হচ্ছে সেই সব লোক, আল্লাহ তাআলা যাদের অন্তর থেকে ভোগের আসক্তি তুলে দিয়েছেন।

কেউ বলেন, তাকওয়া এই যে, আল্লাহ তাআলা যা করতে নিষেধ করেছেন তোমাকে তাতে লিপ্ত পাবেন না আর যা করতে আদেশ করেছেন তোমাকে তার্তে লিপ্ত দেখবেন না।

মোদ্দাকথা ব্যক্তিক ও সামষ্টিক ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কথা ও কর্মে, প্রকাশ্যে ও গোপনে, সংকটে ও সাচ্ছন্দ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা হতে বেঁচে থেকে তাদের নিরঙ্কুশ আনুগত্য করে যাওয়ার প্রেরণাকেই তাকওয়া বলে। এই প্রেরণা কেবল তার অন্তরেই সঞ্চারিত হয়, যার হৃদয় সর্বদা আল্লাহ তাআলার ভয়ে প্রকম্পিত থাকে। তাই এক কথায় তাকওয়াকে 'আল্লাহ ভীতি' ও বলে। মুত্তাকি বা আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির অন্তরে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা এবং সেই বিশ্বাসজনিত ভীতির সাথেই তার যাবতীয় কাজ নির্বাহ হয়। ফলে তার সমস্ত কাজ হয় ন্যায়নিষ্ঠ ও নিখুঁত। এই ভীতি যার ভেতর যত বেশি থাকে মানুষে হিসেবে সে তত বেশি উন্নত হয়ে থাকে। ইরশাদ হয়েছে- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَاللّٰهِ اَتْقَاكُمْ "আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী।" তাই বলা হয়, মানুষের পক্ষে তাকওয়ার চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর কিছুই নেই। এটা সর্বপ্রকার কল্যাণের বিষয়।

হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কি ব্যাপার, আপনার বন্ধুবর্গের সকলের কাছ থেকেই কোন না কোন কবিতা পাওয়া যায়, কিন্তু আপনার কাছ থেকে কখনও কোন কবিতা শোনা যায়নি। তিনি উত্তরে ছোট্ট একটি কবিতা শুনিয়ে দিলেন, যার অর্থ মানুষ চায় তার সব আশা পূরণ হোক

কিন্তু কেবল তাই হয় যা আল্লাহ ইচ্ছা করেন। মানুষ বলে, এই আমার উপার্জন, এই আমার ধন, বস্তুত আল্লাহ ভীতিই তার শ্রেষ্ঠ উপার্জন।

পবিত্র রমযানের সিয়াম সাধনা দ্বারা এই আল্লাহ ভীতি ও তাকওয়া অর্জনের চমৎকার অনুশীলন হয়। কেননা রোযাদার ব্যক্তি দিনমান তার রোযার পরিচর্যা করে। কোন অবস্থায়ই যেন তার রোযা ভেঙ্গে না যায় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকে। প্রচণ্ড ক্ষুধায় অতি সুস্বাদু খাবারও যদি তার সামনে থাকে এবং কোন মানুষের চোখে পড়ার আশঙ্কা না থাকে, তবুও সে তাতে হাত বাড়ায় না। তার লোভাতুর মনকে সে নিয়ন্ত্রণ করে রাখে। ছাতি ফাটা পিপাসায় সে চাইলে ডুব দিয়ে পানি খেতে পারে, কারও দেখবার কোন সুযোগ নেই, কিন্তু রোযাদার ব্যক্তি তা খায় না দুর্দম যৌবনে প্রেয়সী স্ত্রীর নিবিড় সান্নিধ্যে যতই কামার্ত হয়ে উঠুক না কেন সে তার কামের অশ্বকে ঠিকই বশীভূত করে রাখে। কেন ? যেখানে কারও জেনে ফেলার কোন সম্ভাবনা থাকে না সেখানেও রোযাদার ব্যক্তি এতটা সংযম প্রদর্শন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ করে কেন? নিঃসন্দেহে এটা তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। সে চিন্তা করে, আমাকে যদি আর কেউ না দেখে আল্লাহ তাআলা ঠিকই দেখছেন। "তিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর আগোচরে নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু।" (সূরা সাবা ৩)

এভাবে রোযাদার ব্যক্তি দীর্ঘ এক মাস তার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ভয়ে তার স্বভাব-প্রকৃতিকে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টার ফলে মানবাত্মা আল্লাহ তাআলার তাবেদারিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে এবং দুনিয়ার বস্তু সামগ্রীকে যথেচ্ছা ভোগের যে পার্শবৃত্তি মানব-মনে বিরাজ করে তা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

অন্তরে তাকওয়ার চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য পাশব-বৃত্তির নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। পাশব বৃত্তি সম্পর্কে মানুষের দেহের সাথে। আর তাকওয়া অন্তরস্থ বিষয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আত্মার দিকে ইংগিত করে

বলেন, এখানেই তাকওয়ার অবস্থান। দেহ ও সংঘর্ষমান। একটি বলীয়ান হলে অন্যটি কাবু হয়ে পড়ে। দেহজ বৃত্তিসমূহ উদ্দীপিত থাকা অবস্থায় আত্মিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন অসম্ভব।

যথেচ্ছা পানাহার ও অসংযত যৌবনের দ্বারা দেহ যে বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি পায় এভাবে নিরন্তর চলতে থাকলে মানুষ ষড়রিপুর আগ্রাসনের শিকার হয় এবং এক সময় সে সম্পূর্ণরূপে দেহকবলিত হয়ে পড়ে। তখন আর তার উপর তার আত্মার কোন প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ থাকে না এ রকম মানুষ সর্বপ্রকার নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে ভোগ উন্মত্ত জীবে পরিণত হয়। তার অবস্থা হয় এ রকম, যেমন কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে, "তাদের অন্তকরণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে কিছু উপলব্ধি করতে পারে না; তাদের চোখ আছে, তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান আছে, তা দিয়ে শোনে না। তারা পশুর মত; বরং আরও অধম।"

এ শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে না কোন দরদি উপদেশদাতার মধুর ভাষণ কোন কাজে আসে, আর না আইনের কঠিন দণ্ডাদেশ ফলপ্রসূ হয়। উদরপূর্তিই তার এই সর্বনাশের মূল। তাই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে। "কোন মানুষ তার উদর সমপেক্ষা নিকৃষ্ট কোন পাত্র কখনও পূর্ণ করে না।"

(জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৮০)

সুতরাং মনুষ্যত্বকে ষড়রিপুর আগ্রাসন ও পাশবিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হলে সেই উৎস আঘাত হানা জরুরি, যেখান থেকে এ সবের যোগান হয়। অর্থাৎ যার উদরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাকে তার চাহিদা-মাফিক খাবার না দিয়ে যৎকিঞ্চিৎ দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় তার খাদ্য সরবরাহ বন্ধ রাখা হয়, তবে তার উৎসারিত শক্তিসমূহ, যথা-কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি নিস্তেজ হয়ে পড়তে বাধ্য। আর সেই অবকাশে যদি অন্তকরণকে আল্লাহ অভিমুখী করে রাখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে তার সামনে আল্লাহ তাআলার রহমত ও কুদরতের মহাদিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং ইলাহী গুণাবলির উৎস হতে রসদ সংগ্রহ করে মানবাত্মার শক্তি সঞ্চয় হবে। এখানেই সিয়াম সাধনার রহস্য নিহিত।

রোযাদার ব্যক্তি পরিমিত ইফতার ও সাহরী খেয়ে দিনভর উপোস থাকে। দিবাভাগের ক্রমাগত উপবাসের ফলে তার দেহে এক পর্যায়ের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়, যা তার বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগ হতে পরিস্ফুট হয়। ক্ষুদ্র-পিয়াসজনিত এই শারীরিক দুর্বলতা একদিকে পাশববৃত্তির রাশ টেনে ধরে এবং অন্যদিকে আত্মিক শক্তি ও মানবিকতার বিকাষে সহায়তা যোগায়। এটা বান্দার আত্মোপলব্ধির এক

মহেন্দ্রক্ষণ। এ সময় তার পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হয় যে, সে কতটা অক্ষম জীব এবং প্রতিটি মুহূর্তে সে আল্লাহ তাআলার করুণার কতটা মুখাপেক্ষী। সে বুঝতে সক্ষম হয় তার অস্তিত্ব এবং দৈহিক ও আত্মিক গুণাবলি আল্লাহ তাআলার কত বড় দান। সে আরও উপলব্ধি করতে পারে যে, নিখিল-বিশ্বের বস্তু-সামগ্রী, গ্রহ-নক্ষত্র আলো-বাতাস ইত্যাদি তার পক্ষে আল্লাহ তাআলার কত বড় রহমত। এই উপলব্ধি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। উপদেশদাতা ও কঠোর শাসক যা পারেনি কয়দিনের সিয়াম সাধনাজনিত উপলব্ধিই সেটা করে ফেলে। এর ছোঁয়ায় আত্মা জেগে উঠে এবং দেহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এখন থেকে দেহ দ্বারা আত্মা নয়; বরং আত্মা দ্বারাই দেহ নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলে দেহ তার সর্বগ্রাসী চাহিদা মেটাবার জন্য উন্মাতাল হতে পারে না; বরং রমযানের মত অন্য সময়ও সংযমী হয়ে চলে।

পানাহার ও যৌনাচারের ক্ষেত্রে যখন বান্দা সংযমী হয়ে ওঠে, যার প্রতি রয়েছে তার স্বভাবগত আসক্তি, তখন শয়তান এ পথে আর তাকে গুনাহে লিপ্ত করতে পারে না। বাধ্য হয়ে সে অন্য পথ খোঁজে। কিন্তু রোযাদার সিয়াম সাধনার মাধ্যমে কুচক্রী শয়তান সম্পর্কে সাবধানী হয়ে ওঠে। ফলে অন্য পথেও সে ব্যর্থ হয়। তাই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, 'রোযা ঢালস্বরূপ।' হ্যাঁ গুনাহ ও জাহান্নামের আযাব হতে আত্মরক্ষার জন্য রোযা ঢাল বৈকি। কেননা যে তিনটি জিনিস পরিহার দ্বারা রোযা সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রীগমন, মৌলিকভাবে তা বৈধ এবং রমযানের দিবাভাগ ছাড়া সারা বছরই তা ভোগের অনুমতি আছে। রোযা অবস্থায় যখন এই হালাল জিনিসই নিষিদ্ধ হয়ে যায়, তখন যেসব বিষয় মৌলিকভাবে হারাম, তা হারাম চিন্তা, হারাম কথা, হারাম আচরণ, হারাম উপার্জন, হারাম কর্ম ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তা কি করে হালাল হয়ে যেতে পারে ? নিয়ম তো এটাই যে, স্থান-কালের গুরুত্ব ভেদে পাপ-পুণ্যের গুরুত্বেও পার্থক্য হয়।

কজেই রমযানে যখন একটি নফল আমল অন্য সময়ের একটি ফরয এবং রমযানে একটি ফরয আমল অন্য সময়ের সত্তরটি ফরযের সমতুল্য গণ্য হয়, তখন এই অনুপাতে এর বিপরীত বা অবৈধ কর্মও তো সাংঘাতিক রকম নিষিদ্ধ বিবেচিত হবে। সুতরাং একজন সচেতন রোযাদার রমযানের দিবাভাগে যেমন উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের পরিহারে যত্নবান থাকে, তেমনি সে পূর্ণ রমযান মাস সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকার ব্যাপারেও সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন থাকবে। পূর্ণ এক মাসের এক অনুশীলন দ্বারা তার গুনাহ ও অবৈধ কাজ

পরিহার করার অভ্যাস গড়ে ওঠবে। ফলে সে একজন সাচ্চা মুত্তাকী ও পরহেজগার ব্যক্তিতে পরিণত হবে এবং রমযানের বাইরেও সে গুনাহ্-মুক্ত জীবন যাপন করবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে গুনাহ করে ফেলেছে তার কী হবে? সে গুনাহের ভার কি তার মাথায় থেকে যাবে? না, তা থাকবার নয়। কেননা সিয়াম সাধনা দ্বারা অর্জিত তাকওয়ার কারণে রোযাদার তার অতীত গুনাহ সম্পর্কেও সজাগ হয়ে যায়। এতদিন সে তার বিগত গুনাহ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কেননা তার হৃদয় ছিল ধুম্রাচ্ছন্ন। অন্তর্দৃষ্টি ছিল অস্বচ্ছ। সিয়াম সাধনার ফলে অধিক পানাহারজনিত সেই অন্ধকার ও আবিলতা হতে অন্তঃকরণ মুক্ত হয়ে ঈমানের আলোয় তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

অনুতাপদগ্ধ সেই রোযাদারের তওবা কি বৃথা যেতে পারে? হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পুণ্যের আশায় সওম পালন করে, তার বিগত পাপরাশি মার্জনা করা হয়।

রোযার উল্লেখিত কল্যাণ আপনা-আপনিই অর্জিত হয় না। এজন্য চাই ঐকান্তিক সাধনা ও পরম প্রযত্ন। অন্যথায় রোযাদারের রোযা অন্তসারশূন্য উপবাসে পর্যবসিত হবে।

রোযার বরকত লাভের জন্য কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী। যথা- মুখের হেফাযত। অনেকেই সময় ও অবসর কাটানোর লক্ষে। অহেতুক আলাপচারিতা ও গল্পগুজবে লিপ্ত হয়, যার সিংহভাগ থাকে অপরের নিন্দা ও মিথ্যাচার। সাধারণ অবস্থায়ও এসব গুরুতর পাপ। রোযা অবস্থায় সেই মহাপাপে লিপ্ত হয়ে সারা দিনের উপবাসকে পণ্ডশ্রমে পরিণত করাটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও তদনুযায়ী কাজ করা হতে বিরত থাকে না, তার পানাহার বর্জনের কিছু প্রয়োজন আল্লাহ তাআলার নেই।" (সহীহ বুখারী হাদীস ১৯০৩)

রোযা অবস্থায় অনেকের রাগের মাত্রা বেড়ে যায়। কারণে-অকারণে অন্যের প্রতি বিশেষত শিশুদের প্রতি ক্রোধ বর্ষণ করে। এটা খুবই নিন্দনীয়। ক্রোধ যদি আল্লাহ তাআলার জন্য না হয় তবে সেটা শয়তানী কাজ। এই অহেতুক ক্রোধ সাধারণ অবস্থায়ও পরিত্যাজ্য; যে কারণে রাগ উঠলে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এহেন ক্রোধের কোন অবকাশ রমযান মাসে নেই। এটা আত্মসংবরণের মাস 'শাহরুর সাবর।' আর ক্রোধই যখন পরিত্যাজ্য তখন অন্যের সাথে ঝগড়া-ফাসাদের তো কোন প্রশ্নই আসতে

পারে না। সুতরাং হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "কেউ যদি তোমার সংগে বিবাদে লিপ্ত হয়, তবে বলে দাও, আমি রোযাদার।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫১)

মোদ্দাকথা রোযাদারকে চোখ, মুখ কানসহ প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগের হেফাযত করত সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে হবে, যাতে না সে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষিত সাবধান বাণীর আওতায় পড়ে যায়।

উল্লেখ্য, কোন বৃহৎ লক্ষ্য কেবল নেতিবাচক বা বর্জনীয় কাজ দ্বারা অর্জিত হতে পারে না। নিতিবাচক কাজ দ্বারা কেবল আগাছা সাফ হয় ও বাধা অপসারিত হয়। এরপর যদি ইতিবাচক ও গঠনমূলক কাজ দ্বারা সেই শূন্য-ভূমিকে আবাদ করা না হয় তবে ফল ও ফসলের প্রাচুর্য লাভ তো হবেই না, উপরন্তু পুনরায় সেখনে আগাছা জন্ম নিয়ে পূর্ববর্তি সেই শ্রম সম্পূর্ণ পণ্ড করে দেবে। তাই রোযা অবস্থায় গুনাহ বর্জনের সাথে সাথে সময়টাকে ইতিবাচক কাজের সমারোহে পরিপূর্ণ করে তোলা চাই। এ জাতীয় কাজ নানা রকমের হতে পারে। যথা-যিকির-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, নফল নামায, দান-খয়রাত ইত্যাদি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসকে 'শাহরুল মুওয়াসাত' বা সহমর্মিতার মাস নামে অভিহিত করেছেন। কেন এক মাসের সওম পালন দ্বারা রোযাদার ক্ষুধার্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এর ফলে তার অন্তরে আর্ত-পীড়িত ও ব্যথিত মানব-গোষ্ঠীর প্রতি দরদ ও সহমর্মিতা জাগে। রোযাদারের উচিত তার এই জাগ্রত সহানুভূতিকে কাজে লাগানো ও ব্যথিতের ব্যথা উপশমে কার্যকর ভূমিকা রাখা। তা সান্ত্বনামূলক কথা, বুদ্ধি-পরামর্শ, কায়িক সহযোগিতা ও দান-দক্ষিণা বিভিন্নভাবেই হতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মাসে যে দান-খয়রাত করতেন, তাকে বেগবান বায়ুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কুরআন তেলাওয়াত এ মাসে বিশেষ আমল। এ মাসটাই হচ্ছে কুরআনের মাস। কাজেই এ মাসে যথা সম্ভব কুরআন পাঠের বরকত হাসিল করা উচিত।

মোটকথা ইতিবাচক ও নিতিবাচক সর্বপ্রকার আমলে মুখর করে তোলাতেই রোযাদারের সার্থকতা। যে রোযা এ রকম আমল দ্বারা পরিবৃত থাকে, সে সম্পর্কেই হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ তাআলা বলেন, রোযা আমারই জন্য এবং আমিই তার প্রতিদান দেব বা আমিই তার প্রতিদান হবো।"

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে, ' আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

রোযার রুকন ঃ পেট ও যৌনাঙ্গের (দৈহিক) এবং এতদুভয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি থেকে বিরত থাকা।

রোযার হুকুম ঃ ফরয ইবাদত আদায় থেকে দায়িত্বমুক্তি ও পরকালে সওয়াব লাভ।

রোযা ছয় প্রকারে বিভক্ত

১.ফরয, ২.ওয়াজিব, ৩. মাসনূন, ৪.মুস্তাহাব, ৫.নফল, ৬.মাকরূহ।

ফরয রোযা ঃ রমযানের রোযা (যথাসময় পালিত হোক অথবা ওযরবশত কাযা আদায়কৃত হোক) কাফফারার রোযা ও মান্নত রোযা (সুস্পষ্টতম বর্ণনা মোতাবেক)।

ওয়াজিব রোযা ঃ যে নফল রোযা কেউ রাখার পর ভঙ্গ করে ফেলেছে তার কাযা আদায়।

মাসনূন রোযা ঃ প্রত্যেক মাসে তিনটি করে রোযা রাখা, (এ রোযাগুলো প্রতি আরবী মাসে তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে হওয়া মুস্তাহাব।) প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা, শাওয়াল মাসের.ছয় রোযা রাখা, (এগুলো কেউ কেউ বলেছেন একত্রে রাখা উত্তম, আবার কেউ বলেছেন পৃথক পৃথকভাবে রাখা উত্তম) এবং এমন যে কোন রোযা, যা পালনে হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং সওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে।

নফল রোযা ঃ উপরোক্ত রোযাগুলো ব্যতীত এমন যে কোন রোযা, যার অপছন্দনীয়তা প্রমাণিত নয়।

মাকরূহ রোযা ঃ এটা আবার দু'প্রকার-মাকরূহ তানযীহী, মাকরূহে তাহরীমী। প্রথমটি যেমন ঃ কেবল আশুরার দিবসের রোযা রাখা, (তার পূর্ববর্তী দিন) নয় তারিখের রোযা ব্যতিরেকে। দ্বিতয়ীটি যেমন ঃ দুই ঈদের দিন ও তাশরীকের দিনগুলোতে (১১, ১২, ও ১৩ যিলহজ্জ) রোযা রাখা। কেবল জুমু'আর দিন রোযা রাখা অথবা কেবল শনিবার দিন রোযা রাখা মাকরূহ।

যে সকল রোযার জন্য রাত্রে নিয়্যত করা ও নিয়্যত নির্ধারণ করা শর্ত এবং যে সকল রোযার জন্য শর্ত নয়

যে সকল রোযার জন্য নিয়্যত নির্ধারণ করা ও রাত্রে নিয়্যত করা শর্ত নয় সেগুলো হচ্ছে রমযান মাসে পালিত রোযা, এমন মান্নত রোযা, যা পালনের দিন

বা তারিখ নির্ধারিত এবং নফল রোযা। সুতরাং এ তিন প্রকার রোযা বিশুদ্ধতম অভিমত মোতাবেক রাত্রি থেকে শুরু করে অর্ধ দিবসের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে রোযার নিয়্যত করার দ্বারা শুদ্ধ হয়ে যায়। অর্ধ দিবস মানে ফজরের শুরু সময় থেকে পূর্বাহ্ন পর্যন্ত। এ তিন প্রকার রোযা (ফরয বা নফল নির্ধারণ ব্যতীত) কেবল রোযা রাখার নিয়্যতে এমন কি নফল রোযার নিয়্যতে রাখলেও শুদ্ধ হয়। যদি রোযা পালনকারী ব্যক্তি মুসাফির অথবা অসুস্থ হয় তবুও বিশুদ্ধতম অভিমত মোতাবেক তার উক্ত রোযা শুদ্ধ হবে। সুস্থ ও মুকীম ব্যক্তি রমযান মাসে পালিত রোযা ভিন্ন কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যত করেছে সে রোযাই আদায় হবে। অসুস্থ ব্যক্তি (যার জন্য রমযানের রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি রয়েছে) রমযান মাসে অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যতে রোযা রেখে থাকলে (তার সেই ভিন্ন ওয়াজিব রোযা আদায় হবে, না-কি রমযানের রোযাই আদায় হবে) এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত কোনটি তা নিয়ে ফিকাহবিদদের মতভেদ রয়েছে। যে মান্নত রোযার দিন বা তারিখ নির্ধারিত, তা ভিন্ন কোন ওয়াজিব রোযার নিয়্যতে পালন করলে শুদ্ধ হবে না; বরং সে যেই ওয়াজিব রোযার নিয়ত করেছে সেটাই পালিত হবে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, যে সকল রোযা পালনে নিয়্যত নির্ধারণ করা ও রাত্রে নিয়্যত করা শর্ত সেগুলো হচ্ছে রমযানের রোযার কাযা, যে নফল রোযা কেউ রাখার পর ভঙ্গ করে ফেলেছে তার কাযা, সর্বপ্রকার কাফ্ফারার রোযা, যার দিন বা তারিখ নির্ধারিত নয়। যেমন কেউ বলল, যদি আল্লাহ তা'আলা আমার রোগীকে সুস্থ করে দেন তবে আমি আল্লাহর নামে একটি রোযা রাখব। অতঃপর তার রোগ-নিরাময় হয়ে গেল।

যে সকল উপায়ে নতুন চাঁদের উদয় প্রমাণিত হয় তার আলোচনা এবং সংশয়ের দিন রোযা রাখার বিধান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রমযানের নতুন চাঁদ দেখলে শা'বানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রমযান প্রমাণিত হয়। সংশয়ের দিনটি হচ্ছে, শা'বানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর রমযান প্রমাণিত হয়। সংশয়ের দিনটি হচ্ছে, শা'বানের ঊনত্রিশ তারিখের পরবর্তী দিন। কারণ, সেদিন (মেঘ বা ধোঁয়ার কারণে) চাঁদের উদয় সংশয়যুক্ত হলে তখন সে সম্পর্কে অবগতি ও অনবগতির দিকে সমান থাকে। এদিকে যে কোন প্রকারের রোযা রাখা মাকরূহ, তবে এমন নফল রোযা রাখা মাকরূহ হবে না, যা রোযা পালনকারী ব্যক্তি "নফল হলে তো নফল নয়তো

ফরয, ওয়াজিব বা অন্য কিছু"–এরূপ সংশয় ব্যতিরেকে কেবল নফল রোযারূপে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পালন করে। যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, সেই দিনটি রমযানের প্রথম তারিখ ছিল তবে সে যে রোযাটি রেখেছিল সেটা রমযানের রোযারূপে আদায় হয়ে যাবে। যদি সে "রমযান হলে তবে সে যে রোযাটি রেখেছিল সেটা রমযানের রোযারূপে আদায় হয়ে যাবে। যদি সে "রমযান হলে তবে রোযা, নইলে নয়" এরূপ সংশয় রেখে উপবাস করে তবে সে রোযাদার হবে না। শা'বানের শেষ দিকে এক দিন বা দু'দিন রোযা রাখা মাকরূহ। তবে এর চেয়ে বেশি হলে মাকরূহ নয়। সংশয়ের দিন মুফতী জনসাধারণকে রোযার নিয়্যত ব্যতিরেকে উপবাস থেকে অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেবেন। তারপর নিয়্যতের সময় পার গেলে এবং চাঁদের উদয়ের ব্যাপারে কোন কিছু নির্ধারিত না হলে তখন তাদেরকে পানাহারের হুকুম দিয়ে দেবেন। এদিন মুফতী, বিচারক ও যারা বিশিষ্ট রয়েছেন তারা রোযা রাখবেন। এখানে বিশিষ্ট বলে তাদেরকেই বুঝানো হয়েছে, যারা নিয়ত্যের দোদুলমানতা থেকে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয় এবং এও লক্ষ্য রাখতে পারে যে, সে রোযাটি অবস্থাভদে ফরয রোযায় পরিণত হতে পারে। যে ব্যক্তি একাই রমযানের চাঁদ অথবা ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখেছে, কিন্তু তার কথা উপেক্ষিত হয়েছে তার রোযা রাখা আবশ্যক। শাওয়ালের চাঁদ অথবা ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠেছে বলে তার একার দৃঢ় বিশ্বাস থাকলেও রোযা ভঙ্গ করা তার জন্য জায়েয হবে না। যদি সে উক্ত সময় দু'টির যে কোনটিতে রোযা ভঙ্গ করে ফেলে তবে তাকে রোযার কাযা করতে হবে, কিন্তু তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না; যদিও বিচারক কর্তৃক তার কথা উপেক্ষিত হওয়ার পূর্বেই যে রোযা ভঙ্গ করে থাকে না কেন, (তবুও তাকে সঠিক অভিমত মোতাবেক রোযার কাযা করতে হবে; কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না)

আকাশে মেঘ, ধুলা তদ্রূপ কোন অসুবিধা থাকলে তখন বিশুদ্ধ অভিমত মোতাবেক রমযানের ব্যাপারে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় এবং যদিও সে নারী অথবা ক্রীতদাস হয় অথবা সে এমন ব্যক্তি হয়, যে কাউকে অপবাদ দানের অভিযোগে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তারপর তাওবা করেছে। এজন্য সাক্ষ্য শব্দটি উচ্চারণ করা অথবা দাবীরূপে আরজি পেশ করা শর্ত নয়। ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে আকাশে (মেঘ বা ধোঁয়াজনিত) কোন অসুবিধা থাকলে তখন দু'জন স্বাধীন পুরুষ অথবা একজন স্বাধীন পুরুষ ও দু'জন স্বাধীনা নারীর পক্ষ থেকে দাবী স্বরূপ আরজি পেশ ব্যতিরেকে সাক্ষ্য আবশ্যক। এই বিশাল দলের পরিমাণ কতটুকু তা বিশুদ্ধতম অভিমত মোতাবেক দেশের

সরকারী বিচারকের অভিমত দ্বারা সাব্যস্ত হবে। এক ব্যক্তির সাক্ষ্য মোতাবেক (রমযানের রোযা শুরু করার পর) ত্রিশ রোযা পূর্ণ হয়ে গেল, অথচ ঈদুল ফিতরের চাঁদ আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়নি। এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হবে না। দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য মোতাবেক রমযানের রোযা শুরু করা হয়ে থাকলে (তখন ত্রিশ রোযা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও যদি চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হয়) তবে সে ক্ষেত্রে (রোযা ভঙ্গ করা বৈধ হওয়া, না হওয়ার ব্যাপারে) অগ্রাধিকার যোগ্য অভিমত নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু আকাশে কোন অসুবিধা থাকলে তখন (ত্রিশ-দিন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর) রোযা ভঙ্গ করার বৈধতার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই; যদিও কেবল এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রমযানের চাঁদ-উদয় সাব্যস্ত হয়ে থাকে না কেন। কুরবানীর চাঁদের বিধানও ঈদুল ফিতরের চাঁদের মতই। বাকী অন্যান্য চাঁদের ক্ষেত্রে উদয়-তারিখ নির্ণয়ের জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা এমন একজন স্বাধীন পুরষ ও দু'জন স্বাধীনা নারীর সাক্ষ্য দান শর্ত, যারা কাউকে অপবাদ দানের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়নি। যখন কোন এলাকার উদয়াচলে চাঁদের উদয় প্রমাণিত হয় তখন জাহের রেওয়ায়াত মোতাবেক সে এলাকার সকল মানুষের জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক। এটাই ফতোয়া। অধিকাংশ ফিকাহবিদের অভিমতও তা-ই। দিনের বেলায় নতুন চাঁদ দেখার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, চাই অপরাহ্নের পূর্বে দেখুক বা পরে দেখুক। সেই চাঁদটি গ্রহণযোগ্য অভিমত মোতাবেক আগত রাত্রির চাঁদ বলে গণ্য হবে।

ফাজায়িলে রমাজান

রমজান রহমত ও বরকতের মাস। গুনাহ মাফের মাস। জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাস। রিযিক বৃদ্ধির মাস। সাম্যের মাস। ৭০ গুণ সওয়াব বৃদ্ধির মাস। জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত থাকার মাস। জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকার মাস। শবে কদরের মাস। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাস। বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগীর মাস। মাহে রামাজান আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার বান্দাদের জন্য একটি বিশেষ উপহার, একটি বিশেষ সুযোগ, যেভাবে ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষ সুযোগ, যেভাবে দ্রব্যের ব্যবসা অধিক লাভজনক হয়, তেমনি রামজানের ইবাদতও একজন মুমিন বান্দার জন্য অধিক লাভজনক। হাদীস শরীফে আছে, রমজানের নফল ইবাদতের ছওয়াব ফরযের পরিমাণ দেয়া হয়, আর ফরজের ছওয়াব বৃদ্ধি পেয়ে সত্তর গুণ বেড়ে যায় (মিশকাত)।

যেভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন সরকার মাঝে মাঝে কোন কোন অন্যায়কারীদের বিশেষ ক্ষমার সুযোগ দিয়ে থাকে। তেমনি বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তার বান্দাদেরকে মাহে রামজানের মাধ্যমে বিশেষ সুযোগ দান করেছেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- এ মাস (রামজান)-এর প্রথম অংশ হচ্ছে রহমতের, মধ্যভাগ মাগফিরাতের আর শেষ ভাগ হলো দোযখ থেকে মুক্তির। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও ছওয়াবের বিশ্বাসের সহিত রমজানের রাত্রি যাপন করবে তারাবীহ ও নফল ইবাদত করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি ঈমান ও ছওয়াবের বিশ্বাসের সহিত রমজানের রাত্রি যাপন করবে তারাবীহ ও নফল ইবাদত করবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (বুখারী-মুসলিম)। কুরআনে কারীমের সূরা বাকারাতে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন- রমজান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

যারা রামাজানের চাঁদ দেখে তারা যেন অবশ্য অবশ্যই রোযা রাখে। অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, হে মুমিন সকল! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হয়েছে যেমনটি করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা) বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন- রোযা আমারই জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেব– (কেননা) বান্দা তার খাওয়া-দাওয়া তার সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখায় ছেড়ে দেয়। বাইহাকীর বর্ণনায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছে- রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে এবং তাদের সুপারিশ গৃহীত হবে (শু'আবুল ঈমান) তিনি আরো বলেন, জান্নাতের আটটি দরজার একটির নাম "রাইয়ান" যা দিয়ে শুধু রোজাদার প্রবেশ করতে পারবে। (বুখারী, মুসলিম) বর্ণিত হাদীসগুলো ছাড়া আরো বহু হাদীসে রামাজান মাস ও রোযাদারের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি শরীয়তের অনুমোদন অথবা কোন কঠিন রোগ ছাড়া রামাজানের একটি রোযা ছেড়ে দিল সে দি সারাজনম রোযা রাখে তবুও তার ক্ষতিপূরণ হবে না।

(তিরমিযী, আবু দাউদ)

আলোচিত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, রমজানের প্রতিটি মুহূর্তেই একজন মুসলিম নার-নারীর জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। তাই একজন মুসলিমের জন্য পুরো রামাজান কাটানো উচিত।

রমজানে করণীয় কাজসমূহ

১. গুরুত্বের সাথে নিয়মমাফিক প্রতিটি রোযা রাখবে। বিনা ওজরে রোযা ছাড়বে না। ২. সকল গুনাহ হতে তাওবা করবে এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করবে। ৩. জামাতের সাথে সকল ফরয নামায ও তারাবীহ নিয়মিত আদায় করবে। ৪. ইশরাক, আওয়াবিন, তাহাজ্জুদসহ অধিক হারে নফল নামায পড়বে। ৫. কুরআনে কারীম তিলাওয়াত এবং দ্বীনি বই-পস্তক পড়া অভ্যাসে পরিণত করবে। ৬. বেশি বেশি সুবহানাল্লাহু, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও অন্যান্য তাসবীহ পাঠ করবে। ৭. রোযা অবস্থায় সকল প্রকারের গুনাহের কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করবে। চোখ, নাক, কান, মুখ তথা শরীরের কোন অংগ দ্বারা যেন কোন ধরনের গুনাহের কাজ না হয়ে যায় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। ৮. আল্লাহর দরবারে জান্নাতুল ফিরদাউসের দোয়া এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির প্রার্থনা করবে। ৯. কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হবে না, কেউ গালি দিলে কিংবা ঝগড়া করতে চাইলে তাকে শুধু এতটুকু বলবে 'আমি রোজাদার'। ১০. সামর্থ্য অনুযায়ী অধিকহারে সদকা-খয়রাত করবে। রোযাদারদের ইফতার করাবে। আল্লাহ আমাদেরকে যথাযথভাবে রমজানুল মুবারকের ফযীলত অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

রামাজানের মাসায়িল

রমযানে নারীদের জন্য বিশেষ পরামর্শ ঃ রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে প্রতি বছর মাহে রমজান হাজির হয় মুমিনের দুয়ারে। প্রতি বছর এই মাস আসে ত্যাগের মহান দীক্ষা নিয়ে। এই মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে প্রত্যেকের জন্য সফলতা অর্জনের বিশেষ সুযোগ রয়েছে। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের ওপর রোযা ফরজ। রোযা রাখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে রোযার দায়িত্ব ও আমলী দিক দিয়ে নারীদের বিষয়টি একটু আলাদা। ঘরোয়া পরিবেশে রমযানের পূর্ণাঙ্গ দাবী পূরণ, আল্লাহর কৃত ওয়াদার সর্বোচ্চ প্রাপ্তি ও রমযানের পবিত্রতা রক্ষায় তাদের সুযোগ পুরুষদের তুলনায় একটু বেশি। কেননা পুরুষদের বিভিন্ন দিক সামাল দিতে গিয়ে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও রমজানের পরিপূর্ণ দাবি পূরণে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়। সাধারণত মহিলাদের বাইরের ব্যস্ততা কম। ঘরোয়া পরিবেশেই কাটে রোযার দিনগুলো। ফলে তাদের পক্ষে রমযানের পূর্ণ ফয়েজ ও বরকত লাভ করা সহজ।

রমযানের প্রতিটি মুহূর্তই আল্লাহর নিয়ামত লাভের শ্রেষ্ঠ সময়। বছরের এগার মাস হেলায় খেলায় কেটে গেলেও রমজানের একটি মাস গতানুগতিক

সেই ধারায় অতিবাহিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বিশেষত নারীদের যেখানে কিছুটা বর্ধিত সুযোগ রয়েছে তাদের জন্য তো নয়ই। এ জন্য নারীদের জন্য উচিত রমযানের পূর্বেই রমযান কাটানোর একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পূর্বপরিকল্পনা না থাকলে সময়ের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। প্রত্যেকেই চায় রমযানটি যথাযথভাবে উদযাপন করতে। আর রমযান উদযাপনের কাঙ্ক্ষিত সেই পরিকল্পনা প্রণয়নে নারীদেরকে যে কয়টির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এখানে আমরা তা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি।

১. ইবাদতে ভারসাম্য আনয়ন ঃ রমযানে প্রতিটি ইবাদতেই সত্তর গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যয়। রোযাই হচ্ছে রমযানের প্রধান ইবাদত। তবে রোযার চেয়ে নামাযের গুরুত্ব অনেক বেশি। রোযা রাখার ক্ষেত্রে মহিলারা এগিয়ে- এটা অবশ্যই খুশির কথা। কিন্তু অনেকেই আছেন রোযা রাখেন, কিন্তু নামায পড়েন না। এটা খুবই অন্যায়। অন্য সময় তো নামায পড়বেই, রমযানে তা আরো গুরুত্ব সহকারে সাদায় করবে। তাছাড়া অন্যান্য ইবাদতের মাত্রাও বাড়িয়ে দিতে হবে।

২. বাক্ সংযম ঃ অধিক বাকপ্রবণ বলে মহিলাদের একটি বদনাম আছে। পরচর্চা, কুৎসা, নিরর্থক বিষয় নিয়ে মাতামাতি ইত্যাদি তাদের চিরাচরিত অভ্যাস। কিন্তু এগুলো রোযার জন্য খুবই ক্ষতিকারক। না খেয়ে উপোস থাকা যেমন রোযার অংশ তেমনি বাক্ সংযমও। জিহ্বাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়ে পেটকে শাস্তি দেয়ার কোন ফায়দা নেই। তাই রমযানে মহিলাদের জন্য যথাসম্ভব বাক সংযম করা উচিত।

৩. শালীনতাবোধ ঃ নারীদেরকে বিশেষ প্রয়োজনে ঘরের বের হতে হয়। ইসলাম তাদেরকে পর্দার মাধ্যমে বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছে। রমযানে মহিলাদের বের হতে হলে এ বিধান বিশেষভাবে পালন করা জরুরি। অনেকেই রোযা রেখে খোলামেলাভাবে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। এটা তার রোযার পবিত্রতার জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমবি পর পুরুষের রোযা নষ্ট কিংবা হালকা করার জন্যও দায়ী। এ জন্য প্রয়োজনের তাগিদে বের হতে হলেও শালীনভাবে বের হওয়া উচিত।

৪. দান-সদকায় মনোযাগী হওয়া ঃ অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় রমযানে দান-সদকার ফযিলত বেশি। এ মাসে নফল ইবাদতের দ্বারা সওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে দান-সদকার গুরুত্ব অনেক। এ কাজটি নারীদের দ্বারাই ভালভাবে করা সম্ভব। সাংসারিক বিষয়াদি তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এক্ষেত্রে তাদের বেশ

সুযোগ রয়েছে। তাই রমযানে প্রত্যেক মহিলা গরীব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর কৃপা কুড়াতে পারেন।

৫. মার্জিত আচরণ ঃ রোযা রাখলে ক্ষুধা লাগবে, পিপাসা পাবে- এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর প্রভাব যেন কোনভাবেই আচরণে প্রকাশ না পায়। অনেকেই রোযা রেখে মেজাজ খারাপ করে রাখেন। বিশেষত মহিলারা সাংসারিক কাজের ব্যস্ততায় কারণে-অকারণে অন্যের ওপর অযথা রাগ দেখান। এটা খুবই বাজে কথা। এর দ্বারা রোযার পবিত্রতা নষ্ট হয় এবং রোযার প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা পোষণ করার শামিল। রোযার আসল শিক্ষাই হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সংযমী হওয়া।

৬. অহেতুক কাজ বর্জনঃ হাদীসে নিরর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকার কথা বলা হয়েছে। রোযা রেখে অনেকের দিন কাটতে চায় না এই অজুহাতে বিভিন্ন আজেবাজে কাজে সময় ব্যয় করেন- যেমন খেলাধুলা, টিভি, সিনেমা ইত্যাদি। কিন্তু এটা সমীচীন নয়। কেননা রাযাদারের সারাদিন হবে ইবাদতের শামিল। বাহ্যিক কোন ইবাদত না করলেও তার ধ্যান-ধারণা থাকবে ইবাদতের প্রতি। যথাযথভাবে রোযা আদায় ও এর পবিত্রতা রক্ষায় থাকবে সার্বক্ষণিক প্রয়াস। সময় কাটানোর কথা বলে গল্প-গুজব করে কিংবা অহেতুক কোন কাজে যেন মূল্যবান সময় ব্যয় না হয়।

৭. সংসারের শৃঙ্খলা বজায় রাখা ঃ বছরের অন্যান্য সময় থেকে রমযানের দিনগুলো কিছুটা ভিন্ন। এর রুটিনও ভিন্ন ধরনের। এই ভিন্নতার কারণে সাংসারিক কাজকর্ম কিংবা পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। তা নিরসন করার দায়িত্ব মহিলাদের। অন্যের সুবিধার কথা চিন্তা করে, নিজে কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করে হলেও সংসারে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। পরিবারে শান্তির আবহ থাকলে রোযা পালনে মানসিক প্রশান্তি বোধ হয়।

৮. সন্তান-অধিনস্থদের খোঁজ নেয়া ঃ অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে খুবই ধার্মিক। কিন্তু তার পরি বারের অন্যরা বিশেষত সন্তানেরা ধর্মকর্মের ধার ধারে না। রমযানে নিজে রোযা রাখেন, কিন্তু অন্যরা রাখেন না। যারা রাখেন না তাদের দায় তিনি এড়িয়ে যেতে পারবেন না। সন্তান-সন্ততি ও অধিনস্থদের রোযা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং এর ব্যবস্থা করে দেয়া গৃহকর্তী যিনি তারই দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আঞ্জাম না দিলে জবাবাদিহি করতে হবে।

৯. বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত ঃ রমযান হচ্ছে কুরআন নাযিলের মাস এ মাসের সঙ্গে রয়েছে কুরআনের নিবিড় সম্পর্ক। নফল ইবাদতের মধ্যে

কুরআন তেলাওয়াতের স্থান সর্বশীষে। রমযানে কুরআন তেলাওয়াতের সওয়াব আরও বেশি। বেশি কুরআন তেলাওয়াত করবেন আর যারা কুরআন পড়তে পারেন না তারা এ মাসে তা শিখে নিতে পারেন। মহিলাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে রমযানকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠে। প্রত্যেক মহিলার জন্য এ সুযোগ কাজে লাগানো চই।

১০. তালীম চালু করা ঃ ঘরোয়া পরিবেশ নারীরা একত্রিত হয়ে দ্বীনি জ্ঞান হাসিলের জন্য রমযান মাস হচ্ছে উপযুক্ত সময়। এ মাসে সাংসারিক ঝামেলা কিছুটা কম থাকায় প্রত্যেকেই ইচ্ছা করলে পারেন তালীমের পরিবেশ গড়ে তুলতে। প্রতিবেশি মহিলাদের নিয়ে একটি মজলিস করে এখানে দীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী চর্চা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বেহেশতী জেওর, জামে আহকামুন নিসা, ফাজায়েলে আমল ইত্যাদি কিতাবের সহায়তা নেয়া যায়।

১১. ইতেকাফ করা ঃ ইতেকাফ রমযান মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমল। মহিলারাও ইচ্ছে করলে ইতেকাফ করতে পারেন। তবে তা অন্দর মহলে পূর্ণ পর্দা বজায় রেখে। এর দ্বারা রমযানের দাবি যেমন ভালভাবে আদায় করা যায় তেমনি মহিমান্বিত রাত শবে কদরের ফয়েজ ও বকরত লাভে ধন্য হওয়া যায়। তাই মহিলাদের জন্য এ সুযোগ হাত ছাড়া করা উচিত নয়।

১২. অপচয় রোধ করা ঃ রমযানে যত খুশি খরচ কর; তাতে কোন বাধা নেই এ ধরনের একটি কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত। এর ওপর ভিত্তি করে রমযানে খরচের মাত্রা অপচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। কিন্তু এটা ঠিক নয় রমযানও অন্যান্য মাসের মতোই। এ মাসেও হিসেবে করে চলা উচিত। ইফতার ও সাহরীকে কেন্দ্র করে যে অপচয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে তা রোধ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের যত্নশীল হতে হবে।

১৩. ঈদ প্রস্তুতিতে সংযমী হওয়া ঃ রমযানের পরই আসে ঈদ। প্রথম রমযান থেকেই শুরু হয়ে যায় ঈদের প্রস্তুতি ও কেনাকাটা। এ ক্ষেত্রে মহিলাদের সরব উপস্থিতি অনেক সময় শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন করে। ঈদ শপিংয়ের নামে যে কালচার চালু হয়েছে তাতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদেরকে সংযমী হতে হবে। প্রয়োজনের তাগিদে বের হত হলেও তা যেন হয় শালীন ও মার্জিত। এখানে মাত্র কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হল। এছাড়াও মহিলাদের রমযান কাটানোর ক্ষেত্রে নানা দিক গুরুত্ব পাবে। মহিলারা নিজেদের আত্মবিবেচনার দ্বারাই তা আয়ত্ব করতে পারবেন। যা কিছু তাদের জন্য মঙ্গল ও কল্যাণের সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই সম্যক জ্ঞাত। তাদের প্রতি শুধু অনুরোধ থাকবে এই রমযান যেন কোনক্রমেই গতানুগাতিক ধারায় প্রবাহিত না হয়। বিশেষ সুযোগ

ও অপার সম্ভাবনা থাকার পরও যদি তারা রমযানকে তাদের নিজেদের সাফল্যের জিয়নকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে না পারেন তবে তা তাদের জন্য দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।

সংক্ষেপে রমযানের জরুরী মাসআলা

রমযানের রোযা ইসলামের একটি বড় রোকন। যে ব্যক্তি রোযা না রাখবে সে মহাপাপী হবে এবং তার ঈমান কমজোর হয়ে যাবে।

রমযানের রোযা কার উপর ফরজ ঃ পাগল ও নাবালেগ ব্যতীত সকল মুমিনের উপর রমযান শরীফের রোযা ফরজ করা হয়েছে। এখানে নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব, অন্ধ-বধির, শ্রমিকসহ সকল মুমিনের জন্য একটি মাস রমযানের রোযা পালন করা ফরজ।

* সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়্যতে পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থকার নাম রোযা।

* রোযার জন্য নিয়্যত করা ফরজ। তা মুখে বলার প্রয়োজন নেই। অন্তরে অন্তরে নিয়্যত করলেই ফরজ আদায় হয়ে যাবে। তবে অন্তরে নিয়্যত ও মুখে তা উচ্চারণ করলে আরো সুন্দর হয়।

* নিয়্যত ছাড়া সারাদিন না খেয়ে থাকলে স্ত্রী সহবাস বন্ধ করলেই রোযার সওয়াব পাওয়া যাবে না।

* সাহরী খাওয়ার সময় নিয়্যত করা উত্তম। যদি কেউ সকাল বেলা নিয়্যত করে সাহরী না খায় তবুও রোযা হয়ে যাবে। সকালে কিছু খেলে নিয়্যত করার কোন সুযোগ থাকে না।

* সকাল হতে পানাহার না করলে দিনের দ্বিপ্রহরের ১ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত রমযানের রোযার নিয়্যত করতে পারবেন।

* সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া বা স্ত্রী সহবাস করা জায়েজ। অনেকে অর্ধেক রাতে খানা খাওয়ার পর কিছু খাওয়া ও স্ত্রী সহবাস করা করা নাজায়েয মনে করেন এটা ঠিক নয়।

* রমযান মাসে কেউ নফল রোযার নিয়্যত করলে রমযানের রোযা আদায় হবে, নফল রোযা আদায় হবে না। কিন্তু পরে রমযানের রোযা ক্বাযা করে নিতে হবে।

* কারো যদি গত বছরের রমযানের রোযা ক্বাযা হয়ে থাকে, তবে এ বছরে এ বছরের রোযার নিয়ত করতে হবে। অন্য সময় গত বছরের রোযা রাখতে হবে।

* রমযান মাসে মান্নতের রোযা রাখা যাবে না। রমযানে যে কোন রোযার নিয়ত করলে রমযানের রোযাই আদায় হবে।

* ইয়াওমুশ স্পক (সন্দেহের দিন) ২৯ বা ৩০শে শাবান তারিখে সকালে নাস্তা একটু দেরীতে করতে হবে। কারণ এদিনে রমযান হলে রমযানের নিয়্যত করতে হবে।

* রমযানের চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে। আবার শওয়ালের চাঁদ দেখেই রোযা ভাঙ্গতে হবে। গুজবে কান দিয়ে রোযা রাখা বা. ভাঙ্গা যাবে না। অনুরূপ দ্বীনদার ২ জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষও দুই জন স্ত্রী লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলেই কেবল রোযা ভাঙ্গা যাবে।

* ক্বাযা রোযার নিয়ত সুবহে সাদিকের পূর্বেই করতে হবে। পরে নিয়্যত করলে রোজা আদায় হবে না।

* রমযান মাসে কেউ বেঁহুশ থাকলে পরে ক্বাযা আদায় করে নিতে হবে।

* কেউ সাহরী খাওয়ার পর যদি জানতে পারে সুবহে সাদিক হয়েছে তবে তার রোযা ক্বাযা করতে হবে। অনুরূপ সূর্য ডোবার আগে ভুলে ইফতার করলে তাকেও ক্বাযা করতে হবে। কিন্তু কাফফারা দিতে হবে না।

* রোযাদার ভুলে খানা খেয়ে ফেললে বা ভুলে সহবাস করে ফেললে তাকে ক্বাযা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

* মুখে দাঁতের রক্ত, থুথু হতে বেশি হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। অনুরূপভাবে অজু করার সময় পানি গলার মধ্যে প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

* কেউ নাক দিয়ে তৈল টেনে নিলে অথবা যদি কানের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা করে তৈল বা ঔষুধ নেয় তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাফফারা দরকার হবে না।

* এমনিভাবে কারও লিঙ্গের মধ্যে ঔষধ প্রবেশ করালে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে।

* যদি কেহ পায়খানার রাস্তায় অঙ্গুলি প্রবেশ করায় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যদি অঙ্গুলিতে পানি বা তৈল দ্বারা ভিজা হয়ে থাকে তবে রোযা ভঙ্গ হবে।

* স্ত্রীকে রোযা অবস্থায় চুম্বন করায় বীর্য বের হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কিন্তু স্বপ্নদোষে বীর্য বের হলে রোযা নষ্ট হবে না।

* কারো রোযা রাখা অবস্থায় ক্ষুধা বা পিপাসায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলে এবং সহ্য করতে না পারলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয।

* বার্ধক্যজনিত কারণে কেউ রোযা রাখতে না পারলে তার প্রত্যেক রোযার বদলে একজন মিসকীনকে দু বেলা খানা খাওয়াতে হবে। পুরো মাসের রোযার

কাফফারা একবারে দিতে পারে। রোযা রাখতে সক্ষম হলে পরে তাকে রোযা কাযা করতে হবে।

* রমযানে অসুখের কারণে বা সফরের অবস্থায় রোযা ছুটে গেলে যদি তার রোগ ভাল না হয় এবং মুসাফির সফর হতে মুকিম হওয়ার পূর্বে মারা যায় তবে তার রোযার ক্বাজা ওয়াজিব হবে না। অসিয়ত করে গেলে ক্বাযা আদায় করতে হবে, অন্যথায় নয়।

* রোযা অবস্থায় লোবান বা আগর বাতি জ্বালিয়ে তার ধোয়া গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপ বিড়ি-সিগারেট বা হুক্কার ধোঁয়া পান করলে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

* আপনা-আপনি যদি বমি হয় তবে রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছা করে মুখ ভরে বমি করে তবে রোযা নষ্ট হবে, কম করলে নষ্ট হবে না।

* রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু সেলাইন নিলে রোযা নষ্ট হবে।)

* রোযা অবস্থায় কাঁচা বা শুকনা মেসওয়াক দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা জায়েজ। কিন্তু কয়লা, মাজন, পেস্ট দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার সময় তা হলকুমের নিচে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

* বমি হলে রোযা নষ্ট হয়েছে মনে করে কেউ কিছু খেলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তখন না জানার কারণে ক্বাজা করতে হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

* রমযানে কোন কারণবশত রোযা ভেঙ্গে গেলে দিনের বেলায় তার জন্য খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয নয়। কিন্তু মুসাফির ও রোগীদের জন্য জায়েয তবে জনসম্মুখে খাওয়া ঠিক নয়।

* ইচ্ছাকৃত রমাযান মাসের রোযা ভেঙ্গে ফেললে একাধারে দুইমাস বা ৬০ দিন রোযা রাখতে হবে। তা একাধারে থাকতে হবে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে রোযা করা জায়েয নেই। রোগের কারণে রোযা ভাঙ্গলে পুনরায় আবার ৬০টি রোযা রাখতে হবে। একমাত্র মেয়েদের হায়েজ-নেফাসের জন্য মাফ।

* কারও যদি কাফফারা রোযা রাখার শক্তি না থাকে তবে একটি রোযার জন্য ৬০ জন মিসকীনকে ছাদকায়ে ফেতরার পরিমাণ গম, চাল বা অর্থ দিতে হবে।

* খানা না খাওয়ালে ৬০ জন মিসকিনকে ছাদকায় ফেতরার পরিমাণ গম, চাল বা অর্থ দিতে হবে।

* একজন মিসকিনকে পূর্ণ একটি ফিদয়ার কম দিলে ফিদয়া আদায় হবে না।

* রোযা রাখার উদ্দেশ্যে সাহরী খাওয়া সুন্নত। ক্ষুধা না থাকলে ২/১ টি খোরমা বা অন্য কোন কিছু খাবে। কিছু না হলে সামান্য পানি পান করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

* সাহরী দেরী করে খাওয়া ভাল, তবে এত দেরী করবে না যাতে সুবহে সাদিকের সময় হওয়ার আশংকা দেখা দেয়।

* সাহরী খাওয়ার সুযোগ না হলে সে অবস্থায় রোযা থাকতে হবে, এ অজুহাতে রোযা ভাঙ্গা জায়েয নেই।

* ইফতার করতে দেরি না করা উচিত। ইচ্ছাকৃত দেরি করা মাকরূহ।

* খেজুর দ্বারা ইফতার করা উত্তম। কিন্তু খেজুর না পেলে মিষ্টি জাতীয় জিনিস বা পানি দ্বারা ইফতার করা জায়েয।

* কোন রোগী ঈমানদার ডাক্তারের পরামর্শে রোগ বৃদ্ধির আশংকায় রোযা ভাঙ্গতে পারেন। কোন অমুসলিম ফাছেক ডাক্তার বা কবিরাজের কথায় রোযা ভাঙ্গা জায়েজ নেই।

* রোগী বর্তমান রোগ হতে মুক্তি পেয়েছেন কিন্তু শরীর খুব দুর্বল, রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা দেখা দিলে তার জন্য রোযা ভাঙ্গা জায়েজ।

* মুসাফিরের রোযা রাখতে কষ্ট না হলে রোযা রাখাই ইত্তম। কারণ ক্বাযা করলে রমযানের ফযীলত হতে মাহরুম হতে হয়। রোযা রাখতে কষ্ট হলে তা না রাখাই ভাল।

* গর্ভবর্তী মেয়েলোকের অথবা সদ্যপ্রসূত শিশুর জীবনের আশংকা দেখা দিলে তার জন্য রোযা না রাখা জায়েজ।

* কোন মেয়ে লোক ধাত্রীর চাকুরী নিলে বড় লোকের সন্তানকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব থাকলে শিশুর জীবনের আশংকা দেখা দিলে তার জন্য রমাযানের রোযা না রেখে পরে ক্বাযা করা জায়েয।

* মেয়েদের রোযার মধ্যে হায়েজ বা নেফাস হলে তদবস্থায় রোযা রাখা বৈধ নয়। পরে সে রোযার ক্বাযা আদায় করে নিবে।

ঈদুল ফিতরের দিনের সুন্নাত আমল

১। অতি প্রত্যুষে ঘুম হতে ওঠা।

২। মিসওয়াক করা এবং উত্তমরূপে গোসল করা।

৩। সামর্থ্য অনুযায়ী নতুন অথবা পরিষ্কার পোশাক পরিধান করা।

৪। সুগন্ধি, আতর ব্যবহার করা।

৫। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টান্ন খাওয়া। সম্ভব হলে খেজুর খাওয়া ভাল।

৬। আনন্দ প্রকাশ করা এবং হাস্যোজ্জ্বল থাকা।

৭। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়া।

৮। ফজরের পর যথাশীঘ্র ঈদগাহে উপস্থিত হওয়া।

৯। ঈদগাহে যাওয়ার সময় অনুচ্চ স্বরে নিম্নের এ তাকবীর পড়তে থাকা। "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।"

১০। ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

১১। ঈদের নামায মসজিদে না পড়ে খালি ময়দানে পড়া।

১২। ঈদগাহে এক পথে যাওয়া এবং অন্য পথে ফিরে আসা।

১৩। সামর্থ্য অনুযায়ী অধিকহারে নফল সদকা করা।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ঃ ১/১৪১-১৫০, মারাকিল ফালাহ " ২৮৯-২৯০, ফাতাওয়ায়ে শামী ঃ ২/১৬৮, বাদায়েউস সানায়ে ঃ ১/৬২৪-৬২৫)

ঈদুল ফিতর সম্পর্কিত মাসআলা-মাসায়েল

উপরে বর্ণিত সুন্নাত সমূহের মধ্যে ঈদগাহে যাওয়া সম্পর্কিত সুন্নাত ছাড়া অন্য আমলগুলো মহিলাদের জন্যও সুন্নাত। যেমন, মিসওয়াক করা, গোসল করা, উত্তম পোশাক পরা, আনন্দ-খুশি করা ইত্যাদি।

(তাহতাবী আলাল মারাকী পৃঃ ২৮৯)

ঈদের নামাযের পূর্বে ঘরে, মসজিদে বা ঈদগাহে বা অন্য কোথাও নফল নামায পড়া পুরুষ-মহিলা সকলের জন্য মাকরূহ তাহরীমী।

(তাহতাবী আলাল মারাকী ঃ ২৯০)

ঈদের নামাযের পরেও ঈদগাহে নফল নামায পড়া মাকরূহ। ঈদগাহ ব্যতীত অন্যস্থানে মাকরূহ নয়। (আদ্দুররুল মুখতার ঃ ২/১৭০)

যাদের উপর জুম'আ ফরয তাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব। অতএব, মহিলাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। সেহেতু যুবতী হোক বা বৃদ্ধা কেউই পুরুষদের সাথে জামাতে নামায আদায়ের জন্য ঈদগাহে যাবে না।

(বাদায়েউসসানায়ে-মাকতাবা যাকারিয়া ঃ ১/৬১৭)

ঈদের খুৎবা পাঠ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। ঈদগাহে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য চুপ থেকে খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। এমনকি ইমামের তাকবীরের সাথে মুসল্লীগণ তাকবীরও বলতে পারবে না।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ঃ ২/৭৭ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকঃ ৩/২৮৩, বাদায়েউস সানায়ে ১/৬১৯)

ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি করে মোট ছয়টি। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা, অতিরিক্ত তিন তাকবীরসহ মোট চার তাকবীর হয়। আর রুকুর তাকবীর ধরলে পাঁচ তাকবীর হয়। দ্বিতীয় রাকাতে ফাতেহা ও সূরা সমাপ্ত হওয়ার পর রুকুর তাকবীরসহ মোট চার তাকবীর। প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমাসহ একসাথে তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীরসহ চার তাকবীর সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আব্দুর রাহমান কাসেম বলেন, আমাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবীজী ঈদের দিন আমাদের নামায পড়ান এবং চারটি করে তাকবীর দেন। নামায শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে ইরশাদ করেন, ভুলো না যেন। তারপর হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী বন্ধ করে বাকি চার আঙ্গুলী দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, "জানাযার তাকবীরের মত (ঈদের নামাযেও) চারটি করে তাকবীর হয়ে থাকে।"

(তাহাবী শরীফ ঃ ২/৩৭১)

উল্লেখ্য যে, এ হাদীসটি সহীহ্। এর সকল রাবী 'সিকাহ' নির্ভরযোগ্য। ইমাম তাহাবী বলেন, এই হাদীসের সনদ বার তাকবীরের হাদীস থেকে অধিক সহীহ্।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১১৫০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৭৮; মাজমাউজ্জাওয়ায়েদ ঃ ২/২০৫)

ঈদের নামাযের পর আরবী ভাষায় দুটি খুতবা দেয়া মাসনূন এবং দুই খুৎবার মাঝে বসাও মাসনূন।

(সহীহ বুখারী ঃ হাদীস ৯৬২, ৯৬৩; মুসনাদুশ শাফী-কিতাবুল উম্ম ঃ ৫/৪৭৩)

গাইরে মুকাল্লিদ (রাঃ) সহীহ্ হাদীস ও মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত কর্মকে উপেক্ষা করে দুই ঈদের একটি করে খুতবা দেয়ার কথা বলেন। তাদের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভুল।

কেউ যদি প্রথম রাকাতে ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর শেষে নামাযে শরীক হয়, তবে ইমাম যদি রুকুতে না গিয়ে থাকে তাবে নামাযে শরীক হয়েই অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলে নিবে।

(বাদায়েউসসানায়ে ঃ ১/৬২২, আদ্দুররুল মুখতার ঃ ২/১৭৩)

যদি তাকবীর শেষ করার আগেই ইমাম রুকুতে চলে যায়, তাহলে যদি তাকবীর শেষ করে ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায়া তবে দাঁড়িয়ে তাকবীরগুলো বলে রুকুতে শরীক হবে।

আর যদি দাঁড়িয়ে তাকবীর বলতে গেলে ইমামকে রুকুতে পাওয়া না যায়, তাহলে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো না বলেই ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হয়ে রুকু অবস্থায় তাকবীরগুলো বলে নিবে।

(বাদায়েউসসানায়ে ঃ ১/৬২২, আদ্দুররুল মুখতার ঃ ২/১৭৪)

* আর যদি প্রথম রাকাতের রুকু না পায় তবে সালাম ফিরানোর পর এর রাকাত পড়ে নিবে। এ রাকাতে প্রথমে সানা পড়ে সূরা ক্বেরাতও পড়ে নিবে।

অতঃপর রুকুতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত তাকবীর বলবে।

কোন ইমাম যদি অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বা এর কোন একটি যথাস্থানে পড়তে ভুলে যায় তবে রুকুতে স্মরণ হলেও রুকু অবস্থায় পড়ে নিবে। তাকবীরের জন্য দাঁড়াবে না। যদি কেউ তাকবীর আদায়ের জন্য দাঁড়ায় তবে আবার রুকু করতে হবে এবং এক্ষেত্রে সাহু সিজদা দিতে হবে না। কারণ, ঈদের নামাযে সাহু সিজদার বিধান নাই।

(বদায়েউস সানায়ে ঃ ১/৬২২, ফাতাওয়া শামী ঃ ২/১৭৪)

রোযা সম্পর্কে গোপনীয় মাসআলা

মাসআলা ঃ একজন রোযাদার মহিলা ঘুমন্ত কিংবা বেঁহুশ অবস্থায় ছিল, কেউ এসে তার সঙ্গে সহবাস করল, তাহলে মহিলার রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে আর সহবাসকারীর কাযা-কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ কোন মহিলার সাথে জোরপূর্বক সহবাস করলে মহিলার রোযা কাযা করতে হবে। কাফফারা লাগবে না। পুরুষের কাযা-কাফফারা উভয়

লাগবে। আর যদি মহিলার শুরুতে সম্মতি না থাকলেও বীর্যপাতের পূর্বে সম্মত হয়ে যায় তাহলে মহিলার উপরও কাযা-কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

মাসআলা ঃ কোন মহিলাকে কাপড়ের উপর থেকে স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হয়ে গেল। যদি স্পর্শ করার সময় শরীরে কামভাব অনুভব হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ মহিলা তার স্বামীর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করার কারণে স্বামীর বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হবে না। আর যদি স্বামী উহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার ফলে স্ত্রী স্পর্শ করে থাকে এবং বীর্যপাত হয় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

মাসআলা ঃ যদি কাউকে সহবাস করতে দেখে, অথবা কারো লজ্জাস্থানে দৃষ্টি পড়ার কারণে কিংবা শুধু কল্পনার কারণে বীর্যপাত হয়ে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। কেবল গোসল ফরয হবে।

মাসআলা ঃ রোযা অবস্থায় মহিলার পেশাবের স্থানে ঔষধ কিংবা তেল ইত্যাদি ঢুকানো জায়েয নেই। কেউ এমন করলে রোযার কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

৮ম অধ্যায়

সদকায়ে ফিতর এর আলোচনা

মহান রামাজানুল মুবারকের মাস বিগত এগার মাসের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মেহেরবানী করে আমাদেরকে দান করেছেন। তাই দেখা যায়, অনেক বুযুর্গানে কিরাম এই মাসে দুনিয়াবী কোন কাজই করতেন না। আবার কেউ কেউ মোটেও ঘুমাতেন না। পুরো মাসটাই ইবাদতের মধ্যে বিনিদ্রভাবে কাটিয়ে দিতেন।

রমাজান মাসে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের ইবাদতের পদ্ধতি চালু রাখা হয়েছে। তার মধ্যে সদকায়ে ফিতর এবং ই'তিকাফ অন্যতম। আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সদকায়ে ফিতর কিছু আদায় হলেও ই'তিকাফের ব্যাপারে আমরা একেবারেই উদাসীন। নিম্নে উভয় বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব।

সদকায়ে ফিতরের উদ্দেশ্য ঃ ঈদের দিন অত্যন্ত মুবারক দিন এবং আল্লাহ পাকের মেহমানদারীর দিন। এদিন আমরা সকলে আল্লাহ পাকের মেহমান। তাই এদিন রোযা রাখা হারাম। ঈদ মুসলমানদের বড় একটা উৎসব। কিন্তু মুসলমানদের এই উৎসব অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত শুধু আনন্দ-ফুর্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এই উৎসবও একটা ইবাদত। তাই বিত্তশালীরা এদিন খেয়াল রাখবে, যেন গরীবদের কোন কষ্ট না হয়। বরং তারাও যেন সকলের সাথে আনন্দের মধ্যে শরীক হতে পারে। ধনীর সন্তানরা নতুন নতুন কাপড় পরবে, আনন্দ-ফুর্তি করবে, কোরমা-পোলাও খাবে আর গরীবের সন্তানরা ছেঁড়া ফাটা কাপড় পরে মলিন মুখে থাকবে, এ দিনটা তাদের উপোসে কাটবে- এটা কখনও ইসলামের শিক্ষা নয়। তাই ইসলাম সদকায়ে ফিতরের বিধান দিয়েছে। এতে বিত্তশালীকে বাধ্য করা হয়েছে যেন সে ঈদের আগেই দরিদ্র আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে ফিতরা আদায়েরর মাধ্যমে তাদেরকেও ঈদের খুশীতে শরীক করে। কারো মুখ যেন এদিন মলিন না থাকে।

সদকায়ে ফিতরের শর্ত ঃ সদকায়ে ফিতর ফরজ নয়, বরং ওয়াজিব। সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি শর্তঃ আযাদ হওয়া, মুসলমান হওয়া, এমন নেসাব পরিমান মালের মালিক হওয়া যা হাজতে আছলিয়া তথা মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হয় এবং ঋণ মুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে,

যাকাতের মত ঐ মালের উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। সদকায়ে ফিতর আদায়কারীর আকেল, বালেগ হওয়াও শর্ত নয়। নাবালেগ বাচ্চা এবং পাগলের সদকায়ে ফিতর আদায় করাও ওয়াজিব। অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দেবেন। যে বছর রামাজানের রোযা ফরয হয়েছিল, সে বছরই নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকায়ে ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কারো নিকট যদি প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী থেকে অতিরিক্ত মাল সামানা থাকে কিন্তু সে আবার ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে হিসাব করে দেখবে যে, ঋণ পরিশোধ করার পরে কিছু বাঁচবে কিনা? যদি এত পরিমাণ মাল বেঁচে যায়, যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়, তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতরও ওয়াজিব হবে। কারো নিকট দু'টো বাড়ি আছে। একটাতে সে থাকে, অপরটা খালি পড়ে আছে, অথবা ভাড়ায় খাটছে, তাহলে দ্বিতীয় এই বাড়িটি প্রয়োজনের অতিরিক্ত। সুতরাং তার দাম যদি এত হয়, যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতরও ওয়াজিব হবে। এমন বাড়ীওয়ালা ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়িয নয়। তবে যদি এমন হয় যে বাড়ির মালিকের অন্য কোন আয়ের পথ নেই; বরং ঐ বাড়ির ভাড়ার উপরেই নির্ভরশীল, তাহলে ঐ বাড়িও জরুরী সামানের মধ্যে গণ্য হবে এবং ফিতরা ওয়াজিব হবে না।

যার উপর যাকাত আদায় করা ফরজ, তার জন্য ফিতরা আদায় করাও ওয়াজিব। তবে পার্থক্য হল- যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সোনা-রূপা অথবা ব্যবসায়িক মালের নেসাবের মালিক হতে হয়, কিন্তু ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শুধু এই তিন প্রকারের মালই নয়; বরং তার নিসারের মধ্যে সব ধরনের মালের হিসাব করা হয়। তবে হ্যাঁ, উভয় নেসাবের জন্য শর্ত হল- তা জরুরতে আসলিয়া থেকে অতিরিক্ত হতে হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তির নিকট যদি নিত্য ব্যবহার্য কাপড় ছাড়া অতিরিক্ত কিছু কাপড়-চোপড় থাকে, অথবা দৈনন্দিন ব্যবহারের অতিরিক্ত কিছু তামা, পিতল, ষ্টীল, কাঁচ ইত্যাদির বরতন থাকে, অথবা অন্য কোন সামান থাকে, তাহলে এই সকল জিনিষের মূল্য যদি নেসাব পরিমাণ হয় বা তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে তার উপর যাকাত তো ফরজ নয়, কিন্তু ফিতরা ওয়াজিব হবে।

যে ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক নয়, সেও ইচ্ছা করলে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে পারে। বরং করাটাই উত্তম। কেননা, হাদীস শরীফে আছে-"ধনী ও সদকায়ে ফিতর আদায় করবে এবং গরীবও আদায় করবে"।

এই উভয়ের সম্বন্ধে বলা হয়েছে- "ফিতরা আদায় করার কারণে আল্লাহ তা'আলা ঐ মালদারকে পবিত্র বানিয়ে দেন এবং গরীবকে (অর্থাৎ মালিকে নিসাব নয়) আরো বেশী দান করেন তার আদায়কৃত ফিতরর তুলনায়।

ফিতরা কোন সময় ওয়াজিব হয় ঃ ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পরে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুতরাং কেউ যদি তুলুয়ে ফজর তথা সুবহি সাদিকের পূর্বেই মারা যায়, অথবা ফকির হয়ে যায়, তাহলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। কাজেই কেউ যদি সুবহে সাদিকের পরে মুসলমান হয় বা মালদার হয় অথবা কোন ছেলে-মেয়ে সুবহে সাদিকের পূর্বেই জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তাদের উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

রামাজানের পূর্বেই ফিতরাহ আদায় করা রামাজানের পূর্বে সদকায়ে ফিতর দেয়া যাবে কি না, দিলে আদায় হবে কিনা তাতে মত বিরোধ রয়েছে। সুতরাং রামাজানের পূর্বে না দেয়া ভাল। তবে রামাজান মাসে যে কোন সময় আদায় করলে তা আদায় হয়ে যাবে। চাই তা শুরুতে হোক বা শেষে হোক।

সদকায়ে ফিতর নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের নাবালেগ সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। আর বালেগ সন্তান যদি গরীব হয়, তার নিজস্ব কোন মাল সম্পদ না থাকে, তাহলে তার পক্ষ থেকেও আদায় করতে হবে।

স্ত্রী যদি নেসাবের মালিক হয়, তাহলে তার ফিতরাহ তাকেই আদায় করতে হবে। তবে স্বামী যদি আদায় করে দেয়, তাহলেও আদায় হয়ে যাবে।

যে রোযা রাখে নি, তারও ফিতরা আদায় করতে হবে ঃ কেউ যদি কোন কারণবশতঃ রোযা না রাখতে পারে, তাহলে ফিতরা কিন্তু মাফ হয় না। ফিতরা আদায় করার ব্যাপারে রোযা রাখা বা না রাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

বিবাহিত মেয়ে নিজে যদি মালদার হয়, তাহলে তার মাল থেকেই ফিতরা আদায় করতে হবে, চাই সে বালেগ হোক বা নাবালেগ। আর যদি মালদার না হয়, কিন্তু বালেগ হয়, তাহলে কারো যিম্মায় নয়। আর যদি মালদার না হয় কিন্তু নাবালেগ হয়, তাহলে পিতার যিম্মায়। আর যদি রুখসতী হয়ে থাকে, তাহলে পিতার যিম্মায় নয়।

ঈদের পরে ফিতরা আদায় করা ঃ কেউ যদি ঈদের দিন ফিতরা আদায় করতে না পারে, তাহলে তার জন্য ফিতরা মাফ হয়ে যাবে না। বরং পরবর্তীতে যে কোন সময় তাকে অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ঃ ফিতরার জন্য গম, গমের আটা, গমের ছাতু ইত্যাদি দিতে চাইলে পৌনে দু'কেজি বরং সতর্কতার খাতিরে পুরা দু'কেজিই দিয়ে দেয়া উত্তম। কেননা, বেশী দিলে কোন গুনাহ নেই। বরং উত্তম। চাউল, ছোলা, বাজরা ইত্যাদি দ্বারা ফিতরাহ দিতে চাইলে এত পরিমান দিতে হবে, যেন তার মূল্য দ্বারা পৌনে দু'কেজি গম বা আটা খরিদ করা যায়।

নিজের এলাকার হিসাব অনুযায়ী ফিতরাহ আদায় করা উত্তম। কেননা, অনেক সময় শহর ও গ্রামের মূল্যের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে।

যারা বিদেশে থাকে, তাদের ফিতরা ঃ আমাদের দেশের অনেক মানুষ বিদেশে থাকে, তারা বাড়ীতে বা আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি লিখে তাদের ফিতরাও আদায় করে দিতে বলে। এখন প্রশ্ন হল, তাদের ফিতরা কোন হিসেবে দেয়া হবে? এদেশের হিসাবে না কি ঐ দেশের হিসাবে? এর উত্তর হল, তাদের ফিতরা উন্নতমানের গমের পৌনে দু'কেজির হিসাবে আদায় করবো, অথবা তারা যে দেশে থাকে, সেখানে পৌনে দু'কেজি গমের মূল্য যা আসে, সে হিসাবেও দেয়া যেতে পারে। তবে সবচে উত্তম হল গম দিয়ে সদকারে ফিতর আদায় করা। আর মূল্য দিলে এমনভাবে দেয়া, যাতে গরীবদের ফায়িদাহ হয়।

(ফাতাওয়ায় রহীমিয়া-৩ঃ১১৩)

এখানে আমরা সামান্য কিছু মাসায়িল নিয়ে আলোচনা করলাম। এ ছাড়া আরো অগনিত মাসায়িল রয়েছে, যা এই স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনবোধে কোন হক্কানী আলেম কিংবা মুফতীর নিকট থেকে জেনে নিতে অনুরোধ রইল।

মাসায়েলে ফিতরা

* যদি কেউ করযদার (ঋণগ্রস্ত) থাকে, তবে ঋণ বাদে যদি মালিকে নেছাব হয় তবে ফিতরা ওয়াজিব হবে নতুবা নয়।

* ঈদের দিনে ছোবহে ছাদেকের আগে মারা গেলে তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মালিকে নেছাবের সন্তান ছোবহে ছাদেকের পূর্বে জন্ম নিলে তার ফিতরা দিতে হবে।

* ঈদের নামাযের আগে ছদকায়ে ফিতর দিয়ে পরিষ্কার হওয়া মুস্তাহাব। এর আগেও দিতে পারবে, পরে হলেও দিতে হবে।

* রমযানের মধ্যে ফিতরা দিয়ে দিলেও জায়েজ আছে।

* ধনীর পাগল সন্তানের পক্ষ হতেও ফিতরা দেয়া ওয়াজিব।

* এতিম সন্তান ধনী ছেলে তার মাল হতে ফিতরা দিতে হবে।

* বালেগ সন্তানের ফিতরা দেয়া পিতার উপর জরুরী নয়।

* পিতার ফিতরা সন্তানের দেয়া মুস্তাহাব।

* রোযা না রাখলেও মুমিনের জন্য ফিতরা দেয়া ওয়াজিব। এটা রোযার উপর নির্ভর নয়।

* একজনের ফিতরা একজনকে দেয়াই উত্তম। কয়েকজনকে তা ভাগ করে দেয়া জায়েয। কয়েকজনের ফিতরা একজনকে দেওয়া জায়েয।

* নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী গরীব ও মিসকিনদের ফিতরা দেয়া জরুরী।

* নিজ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনিকে ফিতরা দেয়া জায়েজ নয়।

৯ম অধ্যায়

হজ্জের আলোচনা

হাদীসের আলোকে হজ্জের গুরুত্ব ও ফযীলত

১. হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- ইসলামের ভিত্তি ৫টি। ১। এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল,

২। নামায কায়েম করা,৩। যাকাত আদায় করা, ৪। হজ্জব্রত পালন করা এবং ৫. রমযানের রোযা পালন করা। (বুখারী ১/৫)

২. হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- হে মানব সকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর হজ্জ ফরয করেছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ পালন করো। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতি বছরই কি হজ্জ পালন করতে হবে? লোকটি এভাবে তিনবার প্রশ্ন করল, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবারই চুপ থাকলেন অবশেষে তিনি বললেন আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে প্রতি বছরের জন্যই তা ফরয হয়ে যেত, কিন্তু তোমরা এতে সক্ষম হতে না। আমি তোমাদের জন্য যা রেখে যাই তাতেই ক্ষান্ত থাকো, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা অধিক জিজ্ঞাসা এবং নবীগণের সাথে মতবিরোধ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

অতএব আমি তোমাদের যা নির্দেশ দেই তা সাধ্যমত পালন করার চেষ্টা করো এবং যা নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো। (মুসলিম, হাদীস-১৩৩৭)

৩. হযরত আবু হোরায়রা র. থেকে আরো বর্ণিত, একদা রাসূল স. কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এরপর কোন আমল উত্তম জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এরপর কোন আমল উত্তম ? এই প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এরপর সর্বোত্তম আমল হলো মকবুল হজ্জ। (বুখারী, হাদীস- ১৫১৯)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হজ্জ পালন করে এবং এ সময়ে ঝগড়াঝাটি ও

পাপাচার থেকে বিরত থাকে সে সদ্যপ্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে (হজ্জ থেকে) প্রত্যাবর্তন করে। (বুখারী-হাদীস নং-১৫২১, মুসলিম হাদীস নং-১৩৫০)

৫. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা জিহাদকে তো সর্বোত্তম আমল মনে করি, আমরা কি এতে শরীক হবো? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না। বরং (নারীদের) সর্বোত্তম আমল হলো মাকবুল হজ্জ। (বুখারী-১৫২০, সহীহ ইবনে হিব্বান- ৩৭০২)

৬. হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম স. ইরশাদ করেন- তোমরা হজ্জের পর ওমরা এবং ওমরার পর হজ্জ করো। কেননা হজ্জ ওমরা দরিদ্রতা ও গুনাহ দূর করে যেমন রেতে লোহার মরিচিকা দূল করে। (জামে তিরমিযী ঃ ৮১০)

৭. হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- আল্লাহর দল তিনটি। গাজী, হাজী এবং ওমরা পালনকারী। (সূনানে নাছায়ী ঃ ২/২ মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৬০৮)

যাদের ওপর হজ্জ ফরজ

৭. হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত "আর এ ঘরের হজ্জ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য। যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার।" এই আয়াত সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! সামর্থ্যের অর্থ কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তরে বললেন- এর অর্থ বহন ও পাথেয় থাকা।

(মুস্তাদরাকে হাকেম ১/৬০৯)

(ইমাম তিরমিযী র. বলেন এটাই আহলে ইলমের অভিমত যে, কোন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় পাথেয় ও বাহনের ব্যবস্থা হলে তার ওপর হজ্জ ফরয হয়।)

সাধ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করার শাস্তি

৯. হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় পাথেয় ও বাহনের মালিক হলো- যার সাহায্যে সে বায়তুল্লায় পৌছতে সক্ষম- এতদসত্ত্বেও সে হজ্জ করল না সে ইহুদী হয়ে মরুক অথবা খ্রীস্টান হয়ে মরুক এতে কোন তফাৎ নেই। এটা এ কারণেই যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান- হজ্জ করা হলো মানুষের ওপর আল্লাহর প্রাপ্য যার সামর্থ রয়েছে।" (সুনানে তিরমিযি ১/১৬৭)

হজ্জ ফরজ হলে আদায় করতে বিলম্ব না করা উচিত

১০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করার ইরাদা করে সে যেমন দ্রুত তা সম্পন্ন করে। (সূনানে বাইহাক্বী ঃ ৪/৩৪০)

মাহরম ছাড়া মহিলাদের হজ্জে যাওয়া হারাম

১২। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কোন পুরুষ যেন মাহরাম ছাড়া কোন নারীর সাথে একাকী বৈঠক না করে এবং কোন মহিলা যেন মাহরাম পুরুষ বা স্বামী ছাড়া সফর না করে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল- ইয়া রাসূলাল্লাহ আমার স্ত্রী হজ্জে বের হয়েছে আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধের কারণে আটকে আছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো। (মুসলিম ঃ ১৩৪১)

১৩. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাশাদ ফরমান- তিনটি মসজিদ ছাড়া (ইবাদতের উদ্দেশ্যে) সফরে বের হয়ো না। আমার এই মসজিদ, বাইতুল্লাহ ও মসজিদে আকসা। আর কোন মহিলা যেন মহরাম পুরুষ অথবা স্বামী ছাড়া সফরে বের না হয়। (মুসলিম, ১/৪৩৩)

রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওজার ফযীলত ও কবর যিয়ারত

১৪. হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যখনই কোন মুসলমান আমার ওপর সালাম পাঠ করে তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন যাতে আমি তার সালামের জওয়াব দেই। (আবু দাউদ ১/২৭৯)

১৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- আমার ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী অংশ জান্নাতের একটি অংশ। (মুসলিম ১/৪৪৬)

হজ্ব আদায়ে যেসব ভুল-ভ্রান্তি হয়

হজ্বই একমাত্র ইবাদত যার নিয়ত করার সময়ই আল্লাহ তাআলার নিকট সহজতা ও কবুলের দোয়া করা হয়। অন্যান্য ইবাদত থেকে হজ্বের আমলটি যে কঠিন তা এ থেকেই সুস্পষ্ট। হজ্বের সঠিক মাসআলার জ্ঞান যেমন জরুরি, তেমনি তা আদায়ের কৌশল এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে করণীয় বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখাও জরুরী। হজ্বে যে সকল ভুল হতে দেখা

যায় তা সাধারণত উদাসীনতার কারণেই হয়ে থাকে। তাই নিম্নে সচরাচর হয়ে থাকে এমন কিছু ভুল উল্লখ করা হচ্ছে; যেন হাজীগণ এ সকল ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে সুষ্ঠরূপে হজ্ব আদায়ে সক্ষম হন। হজ্ব ফরয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে এমন কিছু ভুল ধারণা সাধারণ মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে যেগুলোর কারণে অনেকেই হজ্ব আদায়ে বিলম্ব করে বা ফরয হজ্ব আদায় না করেই মৃত্যুবরণ করে। এখানে শুধু ওই সব ভুল-ভ্রান্তি আলোচনা করা হবে যেগুলো সাধারণত হজ্ব আদায় করতে গিয়ে হয়ে থেকে।

ইহরামবিষয়ক ভ্রান্তিসমূহ

ইহরামের দুই রাকাত নামায

ইহরাম বাঁধার আগে দুই রাকাত নামায পড়ার নিয়ম আছে। তাই অনেককে দেখা যায়, এই দুই রাকাত নামাযের সুযোগ না পাওয়ার কারণে ইহরাম বিলম্বিত করতে থাকে। এমনকি এ নামায পড়তে না পারার কারণে কেউ কেউ ইহরাম ছাড়াই মীকাতের ভেতরে পর্যন্ত চলে যায় অথচ ইহরাম ছাড়া মীকাতের ভেতরে চলে যাওয়া জায়েয নয়। তারা যেহেতু ইহরামের আগে দুই রাকাত নামায আদায়কে জরুরি মনে করে তাই তারা এমনটি করে থাকে। অথচ ইহরামের আগে নামায পড়া সকল মাযহাবেই মুস্তাহাব; জুরুরি কিছু নয়। পক্ষান্তরে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা নাজায়েয। সুতরাং ইহরামের আগে নামাযের সুযোগ পেলে তো তা আদায় করা চাই, কিন্তু সুযোগ না পেলে সে কারণে ইহরাম বাঁধতে বিলম্ব করবে না।

ইহরাম বাঁধার নিয়ম

অনেকে মনে করে اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ এই নিয়ত করলেই ইহরাম বাঁধা পূর্ণ হয়ে যায়। এ ধারণা ভুল। এটি শুধু নিয়তের বহিঃপ্রকাশ। মূলত মনে মনে হজ্বের ইচ্ছায় ইহরামের সংকল্প করাই হল নিয়ত। এ নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা ভাল, জরুরি নয়। তবে এ নিয়ত করলেই ইহরাম পূর্ণ হয় না; বরং নিয়তের পর তালবিয়া পড়লে ইহরাম পূর্ণ হয়। অতএব বুঝা গেল, ইহরাম বাঁধার নিয়ম হল হজ্বের নিয়তে তালবিয়া পড়া।

অকারণে ইহরাম বাঁধায় বিলম্ব করা

কেউ কেউ আগে থেকেই ইহরাম বাঁধা ঝামেলা মনে করে এবং ভাবে যে, ইহরাম বেঁধে নিলেই তো ইহরামের নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়ে যাবে। বিমান যেহেতু জিদ্দায় অবতরণ করবে তাই জিদ্দায় ইহরাম বাঁধার ইচ্ছায় ইহরামকে

বিলম্বিত করে। অথচ মীকাতের বাইরের হাজ্বীদের জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই। উপমহাদেশ থেকে গমনকারী হাজ্বীদের জন্য মিকাত হল কারনুল-মানাযিল ও যাতুররকা যা অতিক্রম করেই জেদ্দায় যেতে হয়। যদি কেউ বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করে তবে ওই ব্যক্তির জন্য পুনরায় মীকাতে ফিরে এসে ইহরাম বেঁধে যাওয়া জরুরী। যদি তা না করে তবে দম ওয়াজিব হবে। যেহেতু বিমানে থাকা অবস্থায় মীকাতের জায়গা নির্ধারণ করা কঠিন, তাই বিমানে চড়ার আগে কিংবা বিমানে উঠেই ইহরাম বেঁধে নেওয়ার কথা বলা হয়।

সেলাইবিহীন কাপড় বা চপ্পলের জন্য ইহরাম বিলম্বিত করা

অনেকে ইহরামের কাপড় না পরে বিমানে উঠেন। পরে বিমানে উঠে যখন পরিধানের কাপড় বদলিয়ে ইহরামের কাপড় পরা কষ্টকর হয় কিংবা কাপড় লাগেজে থেকে যায় তখন তারা সেলাইবিহীন কাপড় পরতে না পারার কারণে ইহরাম বিলম্বিত করে এবং এক পর্যায়ে ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করায় দম ওয়াজিব হয়ে যায়। অথচ ওই লোক যদি সেলাই করা কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই ইহরাম বেঁধে নিত এবং বিমান থেকে অবতরণের পরেই ইহরামের কাপড় পরে নিত তবে তার অন্যায়টা দম ওয়াজিব হওয়ার মত বড় হত না। ইহরাম অবস্থায় এ কয়েক (১২ ঘণ্টার কম) ঘণ্টা সেলাই করা কাপড় পরে থাকার কারণে একটি পূর্ণ সাদকা ফিতর আদায় করে দিলেই চলবে।

ইহরামের কাপড় পরিবর্তন

কেউ কেউ মনে করে, যে কাপড়ে ইহরাম বাঁধা হয়েছে সে কাপড় হালাল (ইহরাম শেষ) হওয়ার আগ পর্যন্ত বদলানো যাবে না। এটা একটা ভুল ধারণা। ওই কাপড় নাপাক না হলেও বদলানো যাবে।

ইহরামের পুরো সময় ইযতিবা করা

অনেককে দেখা যায়, ইহরামের প্রথম থেকেই ইযতিবা (বাম কাঁধের উপর চাদর রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে পরিধান করা) করে থাকে এবং হালাল হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকাকে করণীয় মনে করে। এটি সম্পূর্ণ ভুল। এভাবে নামায পড়লে নামায মাকরূহ হবে।

আবার কেউ কেউ তওয়াফের সময় ইযতিবা করে পরবর্তী সাঈতেও ইযতিবা অবস্থায় থাকে এবং তওয়াফের মত সাঈতেইও তা করণীয় মনে করে। অথচ সাঈতে ইযতিবা'র বিধান নেই।

ইযতিবার সময় হল, যে তওয়াফের পর সাঈ করতে হয় শুধু সেই তওয়াফেই ইযতিবা করতে হয়। সুতরাং নফল তওয়াফের ইযতিবা নেই। কেননা নফল তওয়াফের পর সাঈ নেই।

একই সঙ্গে হজ্ব ও উমরার ইহরামের নিয়ত উচ্চারণ করা

কোন কোন তামাত্তু হজ্বকারী প্রথমে উমরার ইহরাম করতে হয় একথা জানা সত্ত্বেও হজ্ব ও উমরার নিয়ত উচ্চারণ করে ফেলেন। এ ভুলটি হাজ্বীদের বেশি হতে দেখা যায়। কেননা, তারা প্রায় নিজেরাই পরস্পর দেখাদেখি ইহরাম বেঁধে থাকেন।

হজ্বে-তামাত্তুর ক্ষেত্রে সহীহ মাসআলা হল, প্রথমে শুধু উমরার নিয়ত করবে। বাইতুল্লাহ পৌঁছে উমরার কাজ সেরে হালাল হয়ে তারপর আবার হজ্বের সময় হজ্বের নিয়তে ইহরাম বাঁধবে।

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের পর্দা

ইহরাম অবস্থায় যেহেতু নারী-পুরুষ সকলের জন্যই চেহারায় ইহরামের কাপড় লাগানো নিষেধ, তাই অনেকে মনে করে যে, ইহরাম বাঁধার পর চেহারার পর্দা করা যাবে না। ফলে পর্দানশীন মা-মোনদের অনেককেই পুরো হজ্বের সফরে ইহরাম অবস্থায় চেহারা খুলে চলাফেরা করতে দেখা যায়। অথচ চেহারায় কাপড়ের স্পর্শ ছাড়াও চেহারার পর্দা করা সম্ভব। এজন্য আজকাল ক্যাপ বিশিষ্ট নেকাব পাওয়া যায়; যা পরিধান করলে মুখের পর্দাও হয়ে যায়, আবার মুখে কাপড় না লাগানোর উপরও আমল হয়ে যায়।

প্রকাশ থাকে যে, ক্যাপবিশিষ্ট নেকাব পরিধান করলে বাতাসে কিংবা চলাফেরার সময় অনেক ক্ষেত্রে নেকাবের কাপড় চেহারায় লেগে যায়। এতে অনেকে বিব্রত হন, না জানি ইহরাম পরিপন্থি হল কিনা। কিন্তু মাসআলা হল, এত অল্প সময় লাগলে কোন অসুবিধা হয় না।

বাইতুল্লাহর প্রথম দর্শন

মুহরিম যখন বিরাট ত্যাগ-তিতিক্ষার পর অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাইতুল্লাহ শরীফের একেবারে নিকটে পৌঁছে যায় তখন আবেগের বশবর্তী হয়ে ইহরামের অবস্থার কথা ভুলে গিয়ে বাইতুল্লাহতে হাত লাগায়, আলিঙ্গন করে। যেহেতু বাইতুল্লাহর গিলাফে নিচ থেকে প্রায় ৭/৮ ফুট পরিমাণ চতুর্দিকেই সুগন্ধি লাগানো থাকে, তাই যে কোন অংশে হাত লাগানোর দ্বারাই হাতে সুগন্ধি লেগে যেতে পারে; যা ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। সুতরাং এ সময় আবেগের বশবর্তী না হয়ে হুঁশকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। একটু নিয়ন্ত্রণ করলেই এ বড় ভুল থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

বাইতুল্লাহর স্পর্শ ও আলিঙ্গন

অনেককে বাইতুল্লাহর কোন স্থান ফাঁকা পেলেই গিলাফ ধরতে, দেয়ালে চুমু দিতে, সীনা লাগাতে ও স্পর্শ করতে দেখা যায় অথচ বাইতুল্লাহর তিন স্থান

ব্যতীত অন্য কোন স্থান স্পর্শ করা বা চুমু দেওয়ার কোন বিধান নেই; কোন সাওয়াব ও নেই। স্থান তিনটি হল (১) হাজরে আসওয়াদ। হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা, চুমু দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমানিত। (২) রুকনে ইয়ামানী। বাইতুল্লাহর দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হল রুকনে ইয়ামানী। এই কোণে উভয় হাত দ্বারা শুধু স্পর্শ করা সুন্নত; চুমু নয়। (৩) মুলতাজাম। এটি হাজরে আসওয়াদ থেকে বাইতুল্লাহর দরজা পর্যন্ত স্থান। এখানে সীনা, গাল, উভয় হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরার কথা হাদিসে বর্ণিত আছে।

তাওয়াফ অবস্থার ভ্রান্তিসমূহ তওয়াফের দোয়া

অনেকেই তওয়াফের প্রতি চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট দোয়া পড়াকে জরুরি মনে করে। ফলে নির্ধারিত দোয়া শেষ হয়ে গেলে অন্য দোয়া পড়ে না। নির্দিষ্ট দোয়াটি নিজের মুখস্থ না থাকলে অন্যের সাহায্য নেয়। এটা ভুল। যদিও রুকনে ইয়ামানী ও হাজার আসওয়াদের মাঝে .....رَبَّنَا اٰتِنَا এই দোয়া পড়ার কথা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত; কিন্তু এ স্থানেও নির্দিষ্ট এই দোয়াটি পড়াও সুন্নত নয়; বরং উত্তম বলা যেতে পারে। আতএব তওয়াফে কোন নির্দিষ্ট দোয়া পড়া জরুরি নয়, এমনকি সুন্নতও নয়; বরং এ সময় মাসূর তথা কুরআন-হাদীসে বা সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত যে কোন দোয়াই পড়া যেতে পারে। এমনিভাবে অন্য যে কোন ভাল দোয়াও পড়া যেতে পারে। দোয়া আরবীতে করাও জরুরি নয়। নিজের ভাষায়ও করা যেতে পারে। তওয়াফে কোন নির্দিষ্ট দোয়া পড়া জরুরি মনে করার কারণে এখানে আরো কিছু ভুল হয়। যেমন অনেকে জামাতবদ্ধ হয়ে তওয়াফ করে এবং জামাতের মধ্যে একজন মুখস্থ বা দেখে দেখে উঁচু আওয়াজে দোয়া পড়ে আর তার সঙ্গে পুরো জামাত সমস্বরে দোয়া পড়তে থাকে। এ নিয়মে একাধিক আপত্তিকর বিষয় রয়েছে।

ক. সমস্বরে দলবদ্ধভাবে দোয়া পড়ার কারণে অন্যদের একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়।

খ. এভাবে দোয়া পড়া-পড়ানোর রেওয়াজ সালাফ থেকে প্রমাণিত নেই।

গ. আরো একটি বড় ক্ষতি হল, দলবদ্ধভাবে চলার কারণে মাতাফে ভিড় সৃষ্টি হয়। অন্যদের উপর অস্বভাবিক চাপ পড়ে। এতে অন্যদের ভীষণ কষ্ট হয়। অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা খুবই খারাপ।

যদি সকলেই নিজে নিজে চলত এবং দেখে দেখে দোয়া না পড়ত; যা মুখস্থ আছে তাই পড়ত তাহলে মাতাফে হঠাৎ যে চাপ সৃষ্টি হয় তা হয়ত হত না এবং সকলেই একাগ্রতার সাথে আল্লাহ তাআলার ধ্যানে নিমগ্ন থেকে দোয়া ও তওয়াফ করতে পারত।

তওয়াফে 'রমল' করা তথা বীরবেশে দ্রুতপদে চলা

অনেককে দেখা যায়, তওয়াফের ৭ চক্করেই রমল করে থাকে। আবার কেউ কেউ নফল তওয়াফেও রমল করে। মনে করে, রমল সকল ওয়াফে এবং তওয়াফের সব চক্করেই করতে হয়। অথচ এটি ভুল। কোন নফল তওয়াফে রমল করতে হয় না। রমল শুধু ওই তওয়াফেই করতে হয় যে তওয়াফের পর সাঈ আছে। আর এই তাওয়াফেরও সব চক্করে নয় শুধু প্রথম তিন চক্করে।

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, রমল করা সুন্নত। মাতাফে কোন কোন সময় অস্বাভাবিক ভিড় হয়। বিশেষ করে হজ্বের আগে দু' এক দিন এবং যিলহজ্বের ১০-১১ তারিখে। তখন মাতাফে চলাই মুশকিল হয়। সামান্য পড়া-চড়ার প্রভাব পড়ে অনেক দূর পর্যন্ত। কিন্তু আশ্চর্য হল, ওই কঠিন ভিড়েও কাউকে কাউকে রমল করতে দেখা যায়। এতে নিজেরও প্রচুর কসরত করতে হয় আর বিশাল জনমুদ্রের যে কি কষ্ট হয় তা তো বলাই বাহুল্য। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয় রমলটা তওয়ায়ের ফরয অংশ। এজন্যই বুযুর্গগণ বলেন' "যথাযথ হজ্ব করতে হলে সামান্য ইলম যথেষ্ট নয়; বরং প্রচুর ইলম এবং তার সঙ্গে অনেক বেশি আকলের প্রয়োজন"।

সুতরাং রমল ছাড়াও যেহেতু তওয়াফ আদায় হয়ে যায় তাই প্রচণ্ড ভিড়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে রমল করা যাবে না; বরং তখন স্বাভাবিকভাবে চলবে। চলতে চলতে কখনো সামান্য ফাঁকা পেলে এবং অন্যের কষ্ট না হলে স্বাভাবিক গতিতেই সামান্য লাফিয়ে লাফিয়ে রমলের ভান করবে। আর রমল শুধু পুরুষের জন্য। মহিলার জন্য রমল নিষিদ্ধ; কিন্তু কখনো কখনো মহিলাদেরকেও তা করতে দেখা যায়।

তওয়াফ অবস্থায় কাবা শরীফ বাম পাশে রাখা

তওয়াফকারী পুরো তওয়াফ অবস্থথায় বাইতুল্লাহকে বাম পাশে রেখে চলবে। শুধু রুকনে ইয়ামানী ছোঁয়ার সময় (যদি ছোঁয়াসম্ভব হয়) যেহেতু উভয় হাত কিংবা ডান হাতে বাইতুল্লাহ স্পর্শ করতে হবে তাই তখন বাইতুল্লাহর দিকে সিনা ফেরাতে পারবে। কিন্তু সিনা বাইতুল্লাহর দিকে রেখে রুকনে ইয়ামানী ছুঁয়ে ওই স্থান থেকেই আবার বাইতুল্লাহ বাম দিকে রেখে তওয়াাফ শুরু করবে। তারপর হাজারে আসওয়াদের নিকটে গিয়ে আবার সেদিকে ফিরবে। কিন্তু অনেক তওয়াফকারীকেই এর ব্যতিক্রম করতে দেখা যায়। যেমন

ক.হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানী ছাড়াও যখন অন্য দুই কোণ ছোঁয়ার চেষ্টা করে তখনও সিনা বাইতুল্লাহর দিকে হয়ে যায়। অথচ অন্য দুই

কোণ ছোঁয়ার কোন বিধান নেই। তদ্রূপ অনেকে আবেগের বশবর্তী হয়ে ফাঁকা পেলেই বাইতুল্লাহর দেয়ালে চুমু দেয় বা আলিঙ্গন করে। ফলে সিনা বাইতুল্লাহর দিকে হয়ে যায় অথচ তওয়াফ অবস্থায় এগুলো করাতো বৈধ নয়ই, তওয়াফের বাইরেও এমন করা প্রমাণিত নয়।

খ. দলবদ্ধভাবে চলতে গিয়ে বা দলের অন্যদের খবর নিতে গিয়ে কিংবা ভিড়ের কারণে অনেক সময় বাম পাশ বাইতুল্লাহর দিকে থাকে না এবং ওইভাবেই কিছু দূর চলতে থাকে অথচ এভাবে তওয়াফ আদায় হবে না। কারণ বাইতুল্লাহ বামদিকে না থাকলে তওয়াফ সহীহ হয় না। তাই কখনো কোন কারণে এর ব্যতিক্রম ঘটলে যেখান যথানিয়মে পুনরায় তওয়াফ করতে হবে।

রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করা

তওয়াফের মাঝে রুকনে ইয়ামানী উভয় হাতে কিংবা ডান হাতে শুধু স্পর্শ করা সুন্নত। তবে স্পর্শ করা সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের মত হাত বা কোন বস্তু দ্বারা ইশারা করে ওই বস্তু চুমু খাওয়া যাবে না। এ হুকুম শুধু হাজরে আসওয়াদের জন্যই নির্ধারিত। কিন্তু তওয়াফকারীদের অনেককেই রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতে না পারলে ওই বরাবর এসে হাত দ্বারা ইশারা করতে দেখা যায়। অনেকে আবার হাত দিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু খেয়ে থাকে। এ কাজটি ভুল এবং পরিত্যাজ্য।

তওয়াফের পর দুই রাকাত নামায

অনেককে দেখা যায় একের পর এক নফল তওয়াফ করতেই থাকে। একটি তওয়াফ শেষ হলে তওয়াফের দুই রাকাত নামায পড়ে না। তাদের এ আমল দেখে মনে হয়, তারা ধারণা করে এ দুই রাকাত নামায শুধু ফরয ও ওয়াজিব তওয়াফের পরই পড়তে হয়। নফল তওয়াফের পর এ নামায পড়া জরুরি নয়। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ফরয ও ওয়াজিব তওয়াফের মত সুন্নত ও নফল তওয়াফের পরও দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব।

তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকাত নামায পড়ার স্থান

এই দুই রাকাত নামায মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে পড়া সুন্নত। কিন্তু অনেককে দেখা যায়, মাকামে ইবরাহীমকে পেছনে রেখে মাকামে ইবারাহীমকে পেছনে রেখে মাকামে ইবরাহীম ও বাইতুল্লাহর মাঝের ফাঁকা জায়গায় পড়ে। একে তো এই স্থানে নামায পড়লে তওয়াফকারীদের চলাচলে খুব সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত এই দুই রাকাত নামায যে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত সে সুন্নতটিও আদায় হয় না।

মাকামে ইবরাহীমে দুই রাকাত নামায

অনেকে এ স্থানেই নামায আদায় করাকে জরুরি মনে করে বা এই স্থানকেই নামাযের একমাত্র জায়গা মনে করে। ফলে তাদেরকে জানবাজি রেখে সেখানে নামায আদায় করতে দেখা যায়। কেউ কেউ দুই একজনকে পাহারা ও সাপোর্টে রেখে নামাযে দাঁড়ায়। ফলে হাজার হাজার তওয়াফকারী ভীষণ চাপের মুখে পড়ে। এগুলো হলো মূর্খতা ও ইবাদতের নামে বাড়াবাড়ি। এতে সওয়াব হওয়াতো দূরের কথা গুনাহের বোঝা নিয়ে ফিরতে হয়। তওয়াফের পর দুই রাকাত নামায পড়া ওয়াজিব। কিন্তু মাকামে ইবরাহীমে পড়া সুন্নত। এ সুন্নত যেমন মাকামে ইবরাহীমের নিকটে পড়লে আদায় হয়; তেমনি মাকামে ইবরাহীমকে সামনে রেখে দূরে দাঁড়িয়ে পড়লেও আদায় হয়। অবশ্য ওই বরাবর ভিড় থাকলে মসজিদে হারামে যে কোন স্থানে পড়া যেতে পারে। এমনকি মসজিদে হারামের বাইরে হারামের এলাকায় পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। সুতরাং ওই স্থানে পড়ার সুন্নত আদায় করতে গিয়ে অন্যকে কষ্ট দিয়ে হারামে লিপ্ত হওয়া বোকামি নয় কি ?

সাঈ-সংক্রান্ত ভুল-ভ্রান্তি সাঈর দোয়া

তওয়াফের মত এখানেও প্রতি সাঈতে কিছু নির্দিষ্ট দোয়াকে জরুরি মনে করা হয়। ফলে জামাতবদ্ধ হয়ে একজন বলতে থাকে আর বাকিরা তার সঙ্গে সমস্বয়ে পড়তে থাকে। এতে ঠিক তওয়াফের মতই খারাবীগুলোর সম্মুখীন হতে হয়। অথচ এখানেও কোন দোয়া নির্দিষ্ট নেই। কুরআন-হাদীসের দোয়া বা ভাল অর্থবোধক যে কোন দোয়াই পড়া যেতে পারে।

সাফা পাহাড়ের দোয়া

অনেককে দেখা যায় সাত চক্করেই সাফা পাহাড়ে আসলেই মাসনুন দোয়াটি إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ.....لَآإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ ..... পড়ে; অথচ সাঈ শুর করার সময় শুধু প্রথমবারই সাফা পাহাড়ে চড়ে এই দোয়া পড়া সুন্নত।

সাঈতে ইজতিবা

অনেকে মনে করে তওয়াফের মত সাঈতেও ইযতিবা অর্থাৎ ডান বগলের নিচ দিয়ে বাম কাঁধের উপর চাদর পরিধান করা সুন্নত। তাই তারা সাঈতেও ইযতিবা করে থাকে। অথচ সাঈতে চাদর স্বাভাবিকভাবে পরে থাকতে হয়। সাঈতে ইযতিবা নেই।

নফল সাঈ

অনেকের ধারণা, নফল তওয়াফ করা যেমন সওয়াবের কাজ তেমনিভাবে নফল সাঈ করাও সওয়াবের কাজ। অথচ সাঈ শুধু উমরা ও হজ্বের ক্ষেত্রেই ইবাদত। অন্য সময় সাফা-মারওয়ার সাঈতে কোন নেকি নেই।

হুইল চেয়ারে সাঈ ও তওয়াফ

অনেকে সামান্য ওজরে কিংবা ভিড়ের ভয়ে পায়ে হেঁটে তওয়াফে সাঈ না করে হুইল চেয়ারে করে থাকে। সাধারণত ধনাঢ্য লোকদের মধ্যে এ রকম দেখা যায়। অথচ সামান্য অজুহাতে হুইল চেয়ারে তওয়াফ বা সাঈ করলে তা আবার পায়ে হেঁটে করা জরুরী। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে। অবশ্য হাঁটতে অক্ষম কিংবা এমন রোগী যে হেঁটে তওয়াফ বা সাঈ করলে তার অসুখ আরো বেড়ে যাবে তাদের জন্য 'হুইল চেয়ার' তওয়াফ করা বা সাঈ করা জায়েয।

হজ্বের ইহরাম

হারামে অবস্থানকারীদের অনেকে হজ্বের ইহরাম মসজিদে হারামে গিয়ে করাকে জরুরি মনে করে অথচ সেখানে ইহরাম বাঁধা জরুরি নয়; উত্তম। হজ্বের ইহরাম হোটেলে বা অবস্থানের জায়গাতেও করা যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

মিনা'র দ্বন্দ্ব-কলহ

মূলত 'মিনা' থেকে যেহেতু হজ্বের কাজ শুরু হয় তাই শয়তান সুযোগে থাকে যে হাজ্বের শুরুতেই এমন কাজ করিয়ে দিবে যার দ্বারা হজ্বের রূহ নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ঃ

ক. মিনাতে অবস্থানের জায়গা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হট্টগোল, গালিগালাজ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। আর এটা যেন মিনাতে হতেই হবে। ওই মাঠেও কি আরামে শোয়ার জন্য ইহরাম-পরিপন্থী কাজ করতে হবে ? এটা কি অসম্ভব যে, নিজেদের সিট তাঁবুর বাইরে রেখে অন্য ভাইদেরকে ভালভাবে জায়গা করে দিবে। সৌদির অনেক হাজী রাস্তাতেই মিনার দিনগুলো অতিবাহিত করে দেন। আর আমরা সেখানে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। অথচ পরবর্তী সময়ে দেখা যায়, তাঁবুর ভেতরেই সকলেরই ভালভাবে জায়গা হয়ে যায়। কুরআন মাজীদে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ 'হজ্বের সময় কোন ঝগড়া-বিবাদের অবকাশ নেই। তাই এ ব্যাপারে খুব সাবধান থাকা উচিত। অনেক বুযুর্গই মিনাতে শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য খুব সতর্ক হয়ে থাকেন।

সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা

সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা নাজায়েয। সৌদি সরকারের পক্ষ থেকেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যেন বাসগুলো সূর্য ডোবার অনেক আগেই মুযদালিফার দিকে রওনা হয়ে যায়। এটা মারাত্মক ভুল। মনে রাখতে হবে, সূর্যাস্তের আগে আরাফার ময়দান ত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হয়ে যায়। এমনিভাবে সূর্য ডোবার আগেই তফেওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে অনেককে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়; অথচ ওই সময় দোয়া ও মুনাজাতের মূল সময়। আর এ সময়টি অনেকেরই বড় গাফিলতিতে কাটে।

মুযদালিফা ও মুযদালিফায় যাওয়ার পথের ভ্রান্তিসমূহ

মাগরিব ও ইশা নিয়ে ভ্রান্তি

মাগরিব ও ইশা মুযদালিফায় গিয়ে একত্রে পড়া জরুরি। এটা তো ঠিক আছে। কিন্তু ভিড়ের কারণে অনেক গাড়ি ফজরের আগে মুযদালিফায় পৌঁছুতে পারে না। তখন মুযদালিফায় পড়ার আশায় এ দুই ওয়াক্ত নামায কাযা করে ফেলে; অথচ মাসআলা হল, মুযদালিফায় পৌঁছতে ইশার সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পথেই মাগরিব-ইশা পড়ে নেওয়া জরুরি। অন্যথায় এ দুই ওয়াক্ত কাযা করার গুনাহ হবে।

মুযদালিফার বাইরে অবস্থান

অনেক হাজী সাহেবকে মুযদালিফার বাইরে অবস্থান করতে দেখা যায় অথচ মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা এবং সুবহে সাদিকের পর কিছু সময় 'উকুফ' করা ওয়াজিব। তাই মুযদালিফার সীমানা ভালভাবে দেখে তার ভেতরেই অবস্থান করা জরুরী।

মুযদালিফায় পাথর সংগ্রহ

অনেক হাজী মুযদালিফা থেকে পাথর সংগ্রহ করা জরুরি মনে করে থাকে। ফলে মুযদালিফায় পৌঁছুতে দেরি হয়ে গেলে সুবহে সাদিকের পরও অনেককে পাথর কুড়াতে দেখা যায় অথচ সুবহে সাদিকের পর থেকে চারদিক ফর্সা হওয়া পর্যন্ত দোয়া-দরূদ যিকর-আযকারে মশগুল থাকা সুন্নত। এটিই উকুফে মুযদালিফার প্রধান সময়। আর এ সময় পাথর কুড়াতে ব্যস্ত থাকা অত্যন্ত ভুল কাজ। পাথর নেওয়ার উত্তম সময় হল মুযদালিফা থেকে মিনায় যাওয়ার পথে কিংবা মুযদালিফায় রাতে পৌঁছে গেলে তখনও কুড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে।

পাথর নিক্ষেপ

অনেকে সাথে অধিক পাথর মেরে থাকে। এটি শরীয়ত পরিপন্থী। এ থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

সামান্য ওজরে বিশেষত মহিলাদের ক্ষেত্রে একজনের পক্ষ থেকে বদলি হিসেবে অন্যকে দিয়ে পাথর মারানো হয় অথচ 'মাযূর' ব্যক্তি ও মহিলারাও রাতের বেলা অনায়াসে পাথর মারতে পারে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে পাথর মারালে তা আদায় হবে না। এক্ষেত্রে হাজীর জন্য আবার পাথর মারা ওয়াজিব। যদি না মারে তবে দম ওয়াজিব হবে।

অনেকে মনে করে ওই স্তম্ভগুলোই শয়তান। তাই ওসবকে জুতা-সেন্ডেলও মারতে দেখা যায় এটাও মূর্খতা। স্তম্ভগুলো-তো হল পাথর নিক্ষেপের জায়গা নির্ধারণের আলামত মাত্র। এখানে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাথরই নিক্ষেপ করা জরুরী। ব্যতিক্রম করার অবকাশ নেই।

অর্ধমাথা হলক করা

অনেককে মাথার অর্ধেক হলক করে বাকি অর্ধেক চুল রেখে দিতে দেখা যায়। এমন একজনকে জিজ্ঞস করলে তিনি বললেন, 'যেহেতু পরে আরেকটি উমরা করব তাই অর্ধেক হলক করেছি। এটাও ভুল। হজ্বের সময় তো নয়ই অন্য সময়ও এভাবে অর্ধেক হলক করা নিষেধ। তাই পরবর্তী সময়ে আরো উমরা করলেও প্রথমবারেই মাথা হলক করলে পূর্ণ মাথাই হলক করবে। পরে উমরা করলে ওই হলকের উপর শুধু খুর বা ব্লেড দিয়ে চেছে নিলেই চলবে। এছাড়া যদি চায় তো প্রথমবার চুল একেবারে ছোট করে কেটে নিবে। আর পরবর্তী উমরা করে হলক করবে।

পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উমরা

অনেকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অন্যের জন্য উমরা করে থাকে। এটা সম্পূর্ণ নাজায়েয। যে এমন করবে তার উমরা আদায় হবে না এবং যার পক্ষ থেকে করা হবে সেও কোন সওয়াব পাবে না।

ইহতিয়াতি দম

হাজীদের মধ্যে এ ব্যাপক প্রচলন রয়েছে যে, হয়ত অজান্তেই কত ভুল হয়েছে, যে কারণে দমও ওয়াজিব হয়েছে; তাই সতর্কতামূলক অনেকেই দম দিয়ে থাকে। এটিও ভুল। শরীয়তে শুধুই সন্দেহের ভিত্তিতে এ রকম সতর্কতামূক দম দেওয়ার কোন বিধান নেই। এটি শরীয়তের হুকুমের মধ্যে নিজ থেকে সংযোজনের শামিল। তাই তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

১০ম অধ্যায়

মাসায়েলে কুরবানী

কুরবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হাদীস শরীফে এ ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম হযরত ফাতেমা (রাঃ) কে তাঁর কুরবানীর নিকট উপস্থিত থাকতে বলেন এবং ইরশাদ করেন, এই কুরবানীর প্রথম রক্তবিন্দু প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তোমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এটা কি শুধু আহলে বাইতের জন্য নাকি সকল মুসলিমের জন্য ? তিনি উত্তরে ইরশাদ করেন, এই ফজীলত সকল মুসলিমের জন্য।"

(মুসনাদে বায্যার-আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ২/১৫৪)

অপর দিকে যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই ইবাদতটি পালন করে না তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তির কুরবানীর সামর্থ্য রয়েছে, কিন্তু কুরবানী করে না সে যেমন আমাদের ঈদগাহে না আসে।"

(মুস্তাদরাকে হাকেম, আত্তারহীব ২/১৫৫)

ইবাদতের মূলকথা হল আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রেরণা। তাই যে কোন ইবাদতের পূর্ণতার জন্য দুটি বিষয় জরুরি ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আদায় করা এবং শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক মাসআলা-মাসায়েল অনুযায়ী তা সম্পাদন করা। তাই এ সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কুরবানীর জরুরি কি মাসায়েল তা উপস্থাপিত হল। মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় মাসায়েল অনুযায়ী এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি আদায় করার তাওফীক দিন।

❖ ১. ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নরনারীর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্যপরিমাণ সম্পদ থাকবে তার কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা রূপা অলঙ্কার, ব্যবসায়িক পণ্য, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, সৌখিন বা অপ্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র-এসব কিছুর মূল্য কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

(ইবনে মাজা ২২৬; বাদায়ে ৪/১৯৬; শামী ৬/৩১২; আলমগীরী ৫/২৯২)

❖ ২. কুরবানীর নেসাব পুরো বছর থাকা জরুরী নয়; বরং কুরবানীর দিনগুলোয় থাকলেই তা ওয়াজিব হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২)

মাসআলা ঃ ৩ নাবালেগ সন্তানাদি (তেমনি যে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নয়) নেসাবের মালিক হলেও ওদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬)

❖ ৪ মুসাফিরের (যে ৪৮ মাইল দূরে যাওয়ার নিয়তে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে) কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

(কাযীখান ৩/৩৪৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫)

মাসআলা ঃ ৫. নাবালেগের পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া অভিভাবকদের উপর ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৫)

❖ ৬. গরীব ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু সে যদি কুরবানীর নিয়তে কোন পশু কিনে তাহলে তা কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২)

❖ ৭. মোট তিনদিন কুরবানী করা যায়। যিলহজ্বের ১০, ১১, ও ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তবে সম্ভব হলে যিলহজ্বের ১০ তারিখেই কুরবানী করা উত্তম।

(মুআত্তা মালেক ১৮৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮; ২৩; আলমগীরী ৫/২৯৫)

❖ ৮. কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোয় ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে পরে তার উমর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ভাগের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৩; কাযীখান ৩/৩৪৫)

❖ ৯. যে সব এলাকার লোকদের উপর জুমা ও ঈদের নামায ওয়াজিব তাদের জন্য ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোন ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায না হয় তাহলে ঈদের নামাযের সময় অতিক্রমের পর প্রথম দিনেও তাদের কুরবানী করা জায়েয।

(সহীহ বুখারী ২/৮৩২; কাযীখান ৩/৩৪৪; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮)

❖ ১০. ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতেও কুরবানী করা জায়েয। তবে দিনে কুরবানী করাই ভাল।

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৪/২২; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০; কাযীখান ৩/৩৪৫; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩)

❖ ১১. কুরবানীর দিনগুলোয় যদি জবাই করতে না পারে তাহলে খরিদকৃত পশুই সদকা করে দিতে হবে। তবে যদি (সময়ের পরে) জবাই করে ফেলে তাহলে পুরো গোশ্ত সদকা করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গোশ্তের মূল্য যদি জীবিত অবস্থার চেয়ে কমে যায় তাহলে হ্রাসপরিমাণ মূল্যও সদকা করতে হবে। অবশ্যই পশু সদকা করা বা পশুর মূল্য সদকা করা উভয়টির এখতেয়ার রয়েছে।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২১)

❖ ১২ উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন-হরিণ, বন্য গরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। (কাযীখান ৩/৩৪৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫)

❖ ১৩. যেসব পশু কুরবানী করা জায়েয সেগুলোর নর-মাদা সবই কুরবানী করা যায়। (কাযীখান ৩/৩৪৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫)

❖ ১৪. কুরবানীর পশুর বয়সসীমা ঃ উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয় কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, তা দেখতে ১ বছরের মত মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে। উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোন অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। (কাযীখান ৩/৩৪৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫-২০৬)

❖ ১৫. একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। একাধিক ব্যক্তি মিলে কুরবানী করলে কারোরটা সহীহ হবে না। আর উট, গরু, মহিষ-এ সর্বোচ্চ সাতজন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না।

(সহীহ মুসলিম ১৩১৮; মুআত্তা মালেক ১/৩১৯; কাযীখান ৩/৩৪৯; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭-২০৮)

❖ ১৬. সাতজনে মিলে কুরবানী করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হতে পারবে না। যেমন-কারো। আধাভাগ, কারো দেড়ভাগ। এক্ষেত্রে কোন শরীকের কুরবানীই সহীহ হবে না।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭)

❖ ১৭. উট, গরু, মহিষ সাতভাগে এবং সাতের কমে যেকোন সংখ্যা যেমন-দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানী করা জায়েয।

(সহীহ মুসলিম ১৩১৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭)

❖ ১৮ যদি কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে শুধু গোশ্ত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে বা লোক দেখানোর নিয়তে কুরবানী করে তাহলে কারো কুরবানী হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করতে হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৮-২০৯; কাযীখান ৩/৩৪৯)

❖ ১৯. কুরবানীর গুরু, মহিষ ও উটে আকীকার শরীক হতে পারবে।

(তাহতাবী আলাদুদর ৪/১৬৬; রদ্দুল মুহতার ৬/৩৬২)

মাসআলা ঃ ২০. শরীকদের কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না।

❖ ২১. যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একাকি কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে, আর সে ব্যক্তি ধণী হয় তাহলে ইচ্ছা করলে সে তাতে অন্যকে শরীক করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একাকি কুরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে সে টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি এমন গরীব হয় যায় উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় তাহলে সে অন্যকে শরীক করতে পারবে না। এমন গরীব ব্যক্তি যদি কাউকে শরীক করতে চায় তাহলে ক্রয়ের সময়ই নিয়ত করে নিবে। (কযীখান ৩/৩৫০-৩৫১; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০)

❖ ২২. কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম।

(মুসনাদে আহমদ ৬/১৩৬; আলমগীরী ৫/৩০০; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪; রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩; আলমগীরী ৫/২৯৭)

❖ ২৩. যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না। এমন পশুর কুরবানী জায়েয নেই।

(জামে তিরমিযী ১/২৭৫; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৭; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪; রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩; আলমগীরী ৫/২৯৭)

❖ ২৪. এমন শুকনো, দুর্বল পশু যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই।

(জামে তিরমিযী ১/২৭৫; আলমগীরী ৫/২৯৭; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪)

❖ ২৫. যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না এমন পশু দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয নেই।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৫; আলমগীরী ৫/২৯৮)

❖ ২৬. যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুর কুরবানী জায়েয নেই। পক্ষান্তরে যে পশুর অর্ধেক

শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু কুরবানী করা জায়েয।

(জামে তিরমিযী ১/২৭৬; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৪; আলমগীরী ৫/২৯৭)

❖ ২৭. যে পশুর লেজ বা কোন কান এক তৃতীয়াংশ বা তারও বেশি কাটা সে পশুর কুরবানী জায়েয নেই। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

(জামে তিরমিযী ১/২৭৫; মুসনাদে আহমদ ১/৬১০; ইলাউস সুনান ১৭/২৩৮; কাযীখান ৩/৩৫২; আলমগীরী ৫/২৯৭-২৯৮)

❖ ২৮. যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা একচোখ পুরো নষ্ট বা এক চোখের দৃষ্টিশক্তি এক তৃতীয়াংশ বা তারও অধিক নষ্ট হয়ে গেছে সে পশু কুরবানী করা জায়েয নেই।

(জামে তিরমিযী ১/২৭৫; কাযীখান ৩/৩৫২; আলমগীরী ২৯৭; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৪)

❖ ২৯. কুরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়ার পরে যদি আরেকটি কেনা হয় এবং পরে হারানোটিও পাওয়া যায় তাহলে কুরবানীদাতা গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তার দুটি পশুই কুরবানী করা ওয়াজিব। আর ধনী হলে কোন একটি কুরবানী করলেই হবে। তবে দুটি কুরবানী করাই উত্তম।

(সুনানে বায়হাকী ৫/২৪৪; ইলাউস সুনান ১৭/২৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪;১৯৯; কাযীখান ৩/৩৪৭)

❖ ৩০. পেটে বাচ্চাধারী পশু কুরবানী করা জায়েয। জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করতে হবে। তবে বাচ্চা দেওয়ার সময় আসন্ন হলে সেটা কুরবানী করা মাকরূহ।

(কাযীখান ৩/৩৫০; আলমগীরী ৫/৩-২)

❖ ৩১. কুরবানীর নিয়তে ভাল পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোন দোষ দেখা দেয় যে কারণে কুরবানী জায়েয হয় না। তাহলে ওই পশুর কুরবানী সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানী করতে পারবে।

(খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; ফাতাওয়া নাওয়াযেল ২৩৯; রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫)

❖ ৩২. যদি বিক্রেতা কুরবানীর পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করে আর পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তা-ই বোঝা যায় তাহলে বিক্রেতার কথার উপর নির্ভর করে পশু কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে।

(আহকামে ঈদুল আযহা, মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. ৫)

❖ ৩৩. বন্ধা পশুর কুরবানী জায়েয।

❖ ৩৪. কুরবানীদাতার নিজে পশু জবাই করা উত্তম। নিজে না পারলে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা পুরুষ হলে জবাইস্থলে তার উপস্থিত থাকা ভাল।

(মুসনাদে আহমদ ২২৬৫৭; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২-২২৩; আলমগীরী ৫/৩০০; ইলাউস সুনান ১৭/২৭১-২৭৪)

❖ ৩৫. অনেক সময় জবাইকারীর জবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ জবাই সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কেই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। (রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪)

❖ ৩৬. কুরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয নেই। যেমন- হাল-চাষ করা, আরোহণকরা, পশম কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কুরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না। যদি করে তবে পশমের মূল্য, হাল-চাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দিবে।

(মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬; নাইলুল আওতার ৩/১৭২; সুনান ১৭/২৭৭; কাযীখান ৩/৩৫৪; আলমগীরী ৫/৩০০)

❖ ৩৭. কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি জবাইয়ের সময় ঘনিয়ে আসে আর দুধ না দোহালে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহাবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে এতে দুধের চাপ কমে যাবে। তবে যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সদকা করে দিবে।

(মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬; ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭; রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯; কাযীখান ৩/৩৫৪; আলমগীরী ৫/৩০১)

❖ ৩৮. কয়েকজন মিলে কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইয়ের আগে কোন শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য তার স্থলে অন্যকে শরীক করা যাবে।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৬; কাযীখান ৩/৩৫১)

❖ ৩৯. কুরবানীর পশু বাচ্চা দিলে ওই বাচ্চা সদকা করে দেওয়া উত্তম। যদি সদকা না করে তবে কুরবানীর পশুর সাথে বাচ্চাকেও জবাই করবে এবং গোশত সদকা করে দিবে। (কাযীখান ৩/৩৪৯; আলমগীরী ৫/৩০১)

❖ ৪০. মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মত তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানীর ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে।

(মুসনাদে আহমাদ ১/১০৭, হাদীস ৮৪৫; ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮; রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬; কাযীখান ৩/৩৫২)

❖ ৪১. কুরবানীর গোশ্ত তিনদিনেরও অধিক জমিয়ে রেখে খাওয়া জায়েয।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪; সহীহ মুসলিম ২/১৫৯; মুআত্তা মালেক ১/৩১৮; ইলাউস সুনান ১৭/২৭০)

❖ ৪২ শরীকে কুরবানী করলে ওজন করে গোশ্ত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নেই।

(অদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭; কাযীখান ৩/৩৫১)

❖ ৪৩. কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনকে, আরেক তৃতীয়াংশ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেওয়া উত্তম। অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪; আলমগীরী ৫/৩০০)

❖ ৪৪. কুরবানীর গোশত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নাই। বিক্রি করলে পূর্ণমূল্য সদকা করে দিতে হবে।

(ইলাউস সুনান ১৭/২৫৯; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫; কাযীখান ৩/৩৫৪; আলমগীরী ৫/৩০১)

❖ ৪৫. জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে চামড়া,গোশত বা কুরবানীর পশুর কোন কিছুই পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না।

(সহীহ বুখারী ১/৩৩২; সহীহ মুসলিম ২/৪২৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৮; কাযীখান ৩/৩৫৪)

❖ ৪৬. ধারাল অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উত্তম। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩)

❖ ৪৭. জবাইয়ের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসাবে বা অন্য অঙ্গ কাটা মাকরূহ। (বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩)

❖ ৪৮. এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই করবে না। জবাইয়ের সময় প্রাণীকে অধি কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

❖ ৪৯. কুরবানীর গোশ্ত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয।

(ইলাউস সুনান ১৭/২৮৩; আলমগীরী ৫/৩০০)

মাসআলা ঃ ৫০. অন্যের ওয়াজিব কুরবানী কেউ দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। নতুবা ওই ব্যক্তির কুরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী যদি স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে করে তাহলে স্ত্রীর কুরবানী হয়ে যাবে। কেননা স্ত্রীর কুরবানী স্বামীর দিয়ে দেওয়াটা সমাজে প্রচলন রয়েছে। তাই অনুমতি না নিলেও চলবে। তবে অনুমতি নিয়ে নিলেই ভাল।

❖ ৫১. কুরবানীর জন্তু যদি চুরি হয়ে যায়, বা মরে যায়, আর কুরবানীদাতার উপর তা ওয়াজিব হয় তাহলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। আর যদি গরীব হয় (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তাহলে তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; খুলাসাতুল ফাতওয়া ৪/৩১৯)

❖ ৫২. পাগল পশু কুরবানী করা জায়েয। তবে যদি এমন পাগল হয় যে, ঘাস, পানি দিলে খায় না এবং মাঠেও চরে না তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয হবে না।

(আননেহায়া ফী গরীবিল হাদীস ১/২৩০; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; ইলাউস সুনান ১৭/২৫২)

❖ ৫৩. কুরবানীদাতার নিজ কুরবানীর গোশ্ত খাওয়া মুস্তাহাব।

(সূরা হজ্ব ২৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪; সহীহ মুসলিম ২/১৫৯; মুসনাদে আহমদ. হাদীস ৯০৭৮)

কুরবানী বিষয়ক ভুল ভ্রান্তি

কুরবানী আদায়ে যেবস ভুলত্রুটি হতে দেখা যায়

ইবাদত সহীহ ও কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি হল, সহীহশুদ্ধভাবে ইখলাসের সাথে নিয়তও নির্ধারিত নিয়মনীতি অনুযায়ী করা।

কুরবানীর ক্ষেত্রেও এ দু'টি শর্ত সমানভাবে প্রযোজ্য। সুতরাং কেউ যদি নিয়ত সহীহভাবে করল, কিন্তু শরয়ী তরীকা ও বিধান অনুযায়ী কাজটি সম্পাদন করল না তাহলে সেটি ইবাদত বলে গণ্য হবে না। যেমনিভাবে নিয়ত উল্টো হলেও তা ইবাদত গণ্য হয় না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "এগুলোর গোস্ত ও রক্ত আল্লাহর কাছে পৌছে না। তাঁর কাছে পৌছায় তোমাদের মনের তাকওয়া" সূরা হজ্ব ৩৭

এখানে প্রথম শর্তের বর্ণনা রয়েছে হাদীস এর কিতাবে কুরবানী অধ্যায়ে এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রচিত ফিকহের গ্রন্থাদিতে।

শর্ত দু'টির প্রথমটি যেহেতু অন্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাই সেটির ভুলত্রুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। দ্বিতীয় শর্তটি কর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর অনিয়ম ও ভুলত্রুটিগুলো সহজেই ধরা পড়ে।

আমাদের সমাজে সাধারণত কুরবানী আদায়ে যেসকল ভুলত্রুটি বেশি বেশি ঘটে থাকে নিম্নে সেগুলোর উপর কিছু আলোকপাত করতে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশনা অনুযায়ী এই ইবাদতটি পালন করে আমরা সকলেই যেন ফযীলত ও উত্তম প্রদিতান পেয়ে ধন্য হই।

কুরবানী ওয়াজিব হওয়া না-হওয়া বিষয়ক ভ্রান্তি

কুরবানীর নেসাব

আনেকে মনে করেন, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য যে ধরনের সম্পদ জরুরি যেমন-টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা, ব্যবসায়িক সম্পদ, তেমনি কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্যও একই শর্ত। ফলে কোন কোন সচ্ছল পরিবারের লোকজনকেও কুরবানী দিতে দেখা যায় না। এটি ভুল ধারণা। সঠিক মাসআলা হল, যে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির নিকট কুরবানীর দিনগুলোতে সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেকোন ধরনের সম্পদ থাকবে তার উপরই কুরবানী ওয়াজিব। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি, সৌখিন বা অপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, তা ব্যবহৃত হোক বা না হোক, এসব কিছুও কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য। কিন্তু যাকাতের বেলায় এগুলো ধর্তব্য হয় না। তাই টাকা পয়সা, সোনা-চাঁদি ও ব্যবসায়িক সম্পদ না থাকলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ, আসবাবপত্রের মূল্য নেসাব পরিমাণ হলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে।

(বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২; আলমগীরী ৫/২৯২)

কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার সময়

শুধু যিলহজ্বের ১০ তারিখে কুরবানীর নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে কুরবানী ওয়াজিব হবে না বলে ধারণা করা হয়। ফলে যিলহজ্বের ১১ বা ১২ তারিখে কারো কাছে হঠাৎ কোনভাবে নেসাব পরিমাণ সম্পদ আসলে সে আর কুরবানী করে না। যেমন-যে অবিবাহিত মেয়ের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় কুরবানীর পরদিন তথা যিলহজ্বের ১১ তারিখে তার বিয়ে হল, সেদিন স্বামী তাকে স্বর্ণ, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিল যা সাড়ে ৫২ তোলা রুপার পরিমান বা তার চেয়েও বেশি। তখন সে এই ভেবে কুরবানী করে না যে, কুরবানীর দিন তো আতিবাহিত হয়ে গেছে। এ ধারণা ভুল। মাসআলা হল, যিলহজ্বের ১০ তারিখ সুবহে সাদিক থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত মোট তিন দিন কুরবানী করা যায়। এ তিন দিনের মধ্যে যেকোন সময় কেউ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তাকেই কুরবানী দিতে হবে।

(নসবুর রায়া ৪/২১২-২১৩; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮; আলমগীরী ৫/২৯৫)

নিজের ওয়াজিব কুরবানী না দিয়ে মা-বাবার কুরবানী দেওয়া

ছেলে প্রতিষ্ঠিত হলে যখন মা-বাবা বার্ধক্যে পৌঁছে যায় এবং তাদের উপার্জন বন্ধ হয়ে যায়, তখন ছেলে কেবল তাদের পক্ষে থেকে কুরবানী দেয়। অথচ তার নিজের উপরও কুরবানী ওয়াজিব। সে নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় না করে মা-বাবার কুরবানী দেয় এবং মনে করে, এর দ্বারা তার দায়িত্ব আদায় হয়ে গেছে। এটি ভুল। ছেলের উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকলে নিজের কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে। এরপর যদি সামর্থ্যে কুলায় তাহলে ইচ্ছা হলে মা-বাবার পক্ষ থেকেও ভিন্ন কুরবানী দিতে পারবে। অবশ্য কেউ নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায়ের ক্ষেত্রে মা-বাবাকে সওয়াব পৌঁছানোর নিয়ত করলে তার ওয়াজিব কুরবানী আদায় হয়ে যাবে এবং মা-বাবাও সওয়াব পেয়ে যাবেন।

যৌথ পরিবারে শুধু কর্তার কুরবানী

যৌথ পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক উপার্জনকারী ব্যক্তি থাকে। যাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন মালিকানাধীন সম্পদ রয়েছে। কিন্তু যৌথ পরিবার বিধায় শুধু পরিবারের কর্তার কুরবানীই দেওয়া হয়। প্রত্যেক উপার্জনকারীর কুরবানী দেওয়া হয় না এটা ভুল। যৌথ পরিবার হোক বা ভিন্ন পরিবার হোক প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেই তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। যৌথ পরিবারের কর্তার কুরবানী দিলে তা পরিবারস্থ সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না।

কুরবানীর পশু ক্রয় ও শরিক নিয়ে বিভ্রান্তি

অধিক মূল্যের বা সবচেয়ে বড় পশু ক্রয়ের প্রতিযোগিতা

অজকাল বিত্তবান লোকদের মধ্যে কে কত বেশি মূল্যের পশু কিনতে পারে কিংবা কার কুরবানীর পশু কত বড় এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে উট কেনার প্রতিযোগিতা এবং পত্রপত্রিকায় ফলাও করে নাম ছাপা হতেও দেখা যায়। কোন কোন সময় এ ধরনের নজরকাড়া পশু এলাকায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করা হয়। এসব হল চরম মূর্খতা। কুরবানী কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি একটি গুররুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইবাদতের জন্য প্রথম শর্ত হল 'এখলাস' তথা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করা। নিজের বড়ত্ব প্রকাশ, লোকের বাহবা পাওয়া, লোক দেখানো মনোভাব ইত্যাদি থাকলে ওই ইবাদত কবুল হবে না।

অবশ্য একথা কারো অজানা নয় যে, কুরবানীর পশু যত বড় হবে এবং যত ভাল হবে তত বেশি নেকী হবে, যদি তা হয় কেবল আল্লাহ তাআলাকে রাজিখুশি করার নিয়তে।

কুরবানী দেওয়ার নিয়তে পশু কিনে পরে শরিক নেওয়া

যদি শরীকে কুরবানী করতে হয়, তাহলে পশু ক্রয় করার আগেই শরিক নির্ধারণ করে নেওয়া উত্তম। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত ক্রয়ের অন্য শরীক অন্তর্ভুক্তির নিয়ত করে নিবে। পরে কোন শরিক পাওয়া গেলে তাকে অন্ত র্ভুক্ত করে নিতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, ক্রয়ের সময় একা কুরবানী করার জন্য পশু ক্রয় করে, অতঃপর কোন কারণে অন্যকে শরিক করতে হয় এ অবস্থায় মাসআলা কি হবে তা অনেকেরই জানা নেই। তাই মাসআলাটি বিস্তারিত লেখা হল।

ক. পশু ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি এমন হয় যার উপর কুরবানী ওয়াজিব, তো যদিও তার জন্য পরবর্তীতে কাউকে শরিক কারার সুযোগ আছে, কিন্তু এমনটি না করাই উত্তম। করলে অন্যান্য শরিকদের অংশ পরিমাণ মূল্য সদকা করে দেওয়া উত্তম।

খ. যদি একা কুরবানী করার উদ্দেশ্যে পশু ক্রয়কারী ব্যক্তি এমন হয়, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না তো তার জন্য অন্য কাউকে ওই পশুর মধ্যে শরিক করা জায়েয নেই। কেননা যার উপর কুরবানী করা ওয়জিব নয় সে যদি কুরবানীর পশু ক্রয় করে এবং ক্রয়ের সময় অন্য কাউকে শরিক করার নিয়ত না থাকে, তাহলে তার পুরো পশুটিই কুরবানী করা জরুরী। যদি মাসআলা না

জানার কারণে বা অন্য কোন কারণে দ্বিতীয় কাউকে শরিক করে নেয়, তাহলে সে পরিমাণ মূল্য সদকা করে দেওয়া জরুরি।

(কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৭; তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৬২)

শরীক নির্বাচনে অসর্তকতা

শরিকে কুরবানী দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেককেই যাচাই-বাছাই ছাড়া শরিক নিতে দেখা যায়। অধিকাংশ উপার্জন হারাম এধরনের ব্যক্তিকেও শরিক নিয়ে নেওয়া হয়। অথচ এমন ব্যক্তিকে শরিক নিলে শরিকদের কারো কুরবানীই সহীহ হবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সাতের কম সংখ্যক শরিক

অনেকে মনে করেন, সাতজনের কমে শরিক নেওয়া যায় না। মনে করা হয়, একা কুরবানী করতে হবে নতুবা শরিক নিতে হলে অবশ্যই সাতজন পূর্ণ করতে হবে। এ ধারণা ভুল। এমনিভাবে কেউ কেউ শরিকসংখ্যা বিজোড় হওয়া জরুরি মনে করে। এটিও ভুল। সাত বা সাতের কমে যেকোন সংখ্যক শরিক নেওয়া যেতে পারে।

ত্রুটিযুক্ত কুরবানীর পশু

পশুর শিং ভাঙ্গা থাক বা একেবারই না থাকা ঃ অনেকে মনে করেন, পশুর শিং অল্পস্বল্প ভাঙ্গা থাকলেই ওই পশু দ্বারা কুরবানী সহীহ হবে না। তদ্রপ যে পশুর শিং উঠেনি সে পশু দ্বারাও কুরবানী হবে না। এ ধারণা ঠিক নয়। সহীহ মাসআলা হল, যে পশুর শিং একেবারেই গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যে কারণে মস্তিস্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুর কুরবানী জায়েজ নেই। পক্ষান্তরে যে পশুর শিং আংশিক ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারেই উঠেনি সে পশু দ্বারা কুরবানী করা জায়েজ।

(জামে তিরমিযী ১/২৭৬; সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬; রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৪ আলমগীরী ৫/২৯৭)

অন্তঃসত্ত্বা পশুর কুরবানী ঃ অনেকে অন্তঃসত্ত্বা পশুর কুরবানী না জায়েয মনে করে থাকে। অথচ এ ধারণা সহীহ নয়। এ ধরনের পশুর কুরবানী জায়েজ। তবে বাচ্চা দেওয়ার সময় আসন্ন হলে সেটা কুরবানী করা মাকরূহ।

(কাযী খান ৩/৩৫০; আলমগীরী ৫/৩০২)

কুরবানীর পশু জবাই সম্পর্কীয় ভ্রান্তিসমুহ ঃ হুজুরকে দিয়ে জবাই করানো জরুরি মনে করা। অনেকেই কুরবানীর পশু মসজিদের ইমাম বা হুজুরকে দিয়ে

জবাই করানো জরুরি মনে করে। অথচ এটি ভুল ধারণা। কুরবানীদাতা জবাই করতে জানলে নিজেই জবাই করা উত্তম।

(মুসনাদে আহমাদ হাদীস ২২৬৫৭; আলমগীরী ৫/৩০০; ইলাউস সুনান ১৭/২৭১-২৭৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২)

কুরবানীর আগে শরিকদের নাম পড়া ঃ সাধারণত কুরবানীর আগে সকল শরিকের নাম পিতার নামসহ পড়াকে জরুরি মনে করা হয়। ফলে অধিকাংশ জায়গায় পশুকে শুইয়ে বেধে জবাইয়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করার পরও জবাইকারীকে ওই নামের তালিকা পড়তে দেখা যায়। এ কাজটি নিতান্তই ভুল। শরিকদের নাম পড়া জরুরি নয়। এমনকটি জবাইকারী শরিকদের কথা না জেনে জবাই করলেও সকল শরিকের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। কেননা কাদের কুরবানী করা হচ্ছে তাতো নির্দিষ্টই আছে। এখন জবাইয়ের মুহূর্তে নামের তালিকা উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। জবায়ের আগে এভাবে নাম উচ্চারণ করাটা সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়। আর এমন অপ্রয়োজনীয় একটি কাজের জন্য পশুকে জবাইয়ের পূর্বে কতইনা কষ্ট দেওয়া হয়।

জবাইয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির সহযোগিতা ঃ অনেক ক্ষেত্রে জবাইকারী জবাই করতে গিয়ে সম্যায় পড়লে কসাই বা অন্য কেউ এসে ছুরি ধরে এবং বাকি জবাই পূর্ণ করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বিসমিল্লাহ বলতে শোনা যায় না। যদি প্রথম ব্যক্তির জবাই সম্পন্ন না হয় (অর্থাৎ দুই শাহরগ, শ্বাসনালী ও খাদ্যনালী এ চারটির কমপক্ষে তিনটি কাটা না হয়) তাহলে দ্বিতীয় জনকে অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলতে হবে। অন্যথায় জবাই অশুদ্ধ হয়ে যাবে। ওই পশুর গোস্ত খাওয়া হালাল হবে না। (রদ্দুল মুহ্তার ৬/৩৩৪৪)

ওজর ছাড়া ১১ বা ১৩ তারিখে কুরবানী করা ঃ সাধারণত যাদের একাধিক কুরবানী থাকে তাদেরকে ১০ তারিখে একটি এবং ১১ বা ১২ তারিখে অন্যটি কুরবানী করতে দেখা যায়। বিনা ওজরে এমন করা ঠিক নয়। বিনা ওজরে প্রথমদিন কুরবানী না করে পরে কুরবানী দেওয়া অনুত্তম।

(মুআত্তা মালেক ১৮৮; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮; আলমগীরী ৫/২৯৫)

পশু ঠাণ্ডা হওয়ার আগে চামড়া ছিলা ঃ অনেকেই পশু ঠান্ডা হওয়ার আগে পায়ের রগ কাটা এবং চামড়া ছিলা শুরু করে। এতে পশু কষ্ট পায়। এটি মাকরূহ। পশুকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া গুনাহ।

(জামে তিরমিযি ১/২৬০, সুনানে আবু দাউদ ২/৩৩; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩; আলমগীরী ৫/২৮৭)

গোস্ত বণ্টন ও দান

গোস্ত ওজন না করা ঃ অনেক শরিকে কুরবানী দিলেও গোস্ত অনুমান করে বণ্টন করে থাকে। অথচ শুধু অনুমান করে গোস্ত বণ্টন করা নাজায়েয।

(কাযী খান ৩/৩৫১; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭)

গোস্ত ওজন করাকে সংকীর্ণতা ভাবা ঃ অনেকে ওজন করে বণ্টন করাকে খুব অপছন্দ করে। এটাকে সংকীর্ণতা, বাড়াবাড়ি ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করে। অথচ এটি শরীয়তের হুকুম। না জেনে এমন মন্তব্য করা ঠিক নয়।

তিনভাগ করা জরুরি ভাবা ঃ অনেকে কুরবানীর গোস্ত তিনভাগ করে একভাগ নিজে রেখে, একভাগ আত্মীয়-স্বজন, পড়া-প্রতিবেশী ও একভাগ ফকীর মিসকীনকে দেওয়া জরুরি মনে করেন। অথচ এভাবে বণ্টন করা জরুরি নয়, তবে উত্তম। কেউ এতে ত্রুটি করলে কোন ক্ষতি হবে না। কেউ কেউ পুরো পশুকেই ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখে, কিছুই দান করে না। এটাও ঠিক নয়, অনুত্তম।

(সূরা হজ্ব ৩৬; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪; আলমগীরী ৫/৩০০)

কুরবানীর গোস্ত বিধর্মীদের দেওয়া ঃ অনেকে মনে করে, কুরবানীর গোস্ত হিন্দু বা বিধর্মীদেরকে দেওয়া জায়েয নেই। এ ধারণা ভুল। বিধর্মীদেরকেও কুরবানীর গোস্ত দান করা জায়েয।

(ইলাউস সুনান ১৭/২৮৩; আলমগীরী ৫/৩০০)

ভৃত্য ও কাজের লোকদেরকে কুরবানীর গোস্ত দেওয়া ঃ অনেকে কর্মচারী ও কাজের লোকদেরকে কুরবানীর গোস্ত দেওয়া ও খাওয়ানোকে নাজায়েয মনে করে। অথচ তাদেরকে পারিশ্রমিক হিসাবে না দিয়ে হাদিয়া দিলে কোন অসুবিধা নেই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের মত এদেরকেও কুরবানীর গোস্ত দেওয়া উচিত। তবে তার নির্ধারিত পারিশ্রমিক থেকে ভিন্নভাবে দিতে হবে।

চর্বি বিক্রি ঃ কুরবানীর পর ঢাকাসহ পুরো দেশে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুরবানীর পশুর চর্বি কেনা-বেচা হয়। অথচ কুরবানীর গোস্ত, চর্বি, ইত্যাদি বিক্রি করা নাজায়েয। কেউ বিক্রি করলে পুরো টাকা মিসকীনদেরকে সদকা করে দেওয়া জরুরি।

(ইলাউস সুনান ১৭/২৫৯;বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫; কাযী খান ৩/৩৫৪; আলমগীরী ৫/৩০১)

কুরবানীর দিনগুলোতে অন্য পশু জবাই করা ঃ অনেকের ধারণা, কুরবানীর তিন দিন কুরবানীর পশু ছাড়া অন্য কোন পশু জবাই করা যাবে না। এমনকি

হাঁস-মুরগী বা গুরু-ছাগলও নয়। এটি ভুল ধারণা। তবে কুরবানীর নিয়তে হাস, মুরগী ইত্যাদি (যেগুলো দ্বারা কুরবানী সহীহ নয়) জবাই করা ধনী-গরিব সকলের জন্যই করতে কোন সম্যা নেই।

(খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৪; বায্যাযিয়া ৬/২৯০; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩; আলমগীরী ৫/৩০০)

আকীকা না দিয়ে কুরবানী ঃ অনেকের ধারণা, আকীকা না দিলে কুরবানী দেওয়া যায় না। তাই অনেকে কুরবানীই করে না। আবার অনেকের উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী না দিয়ে আকীকা দেয়। অথচ এটি একেবারেই অমূলক। একটির সঙ্গে আপরটি শর্তযুক্ত নয়। তাই কোন কারণে আকীকা দেওয়া না হলেও ওয়াজিব কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে।

অনাদায়ী কুরবানী ঃ বিগত বছরের কুরবানী অনাদায়ী থাকলে অনেকেই পরবর্তী বছর কুরবানী দিয়ে থাকে। অথচ এভাবে বিগত বছরের কুরবানীর কাযা আদায় হয় না। এক্ষেত্রে নিয়ম হল, প্রতি বছরের কুরবানীর জন্য অন্তত কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সদকা করা।

(খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ৪/৩১১; মাবসুতে সারাখসী ১২/১৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০২; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০-৩২৯; ফাতহুল কাদীর ৮/৪৩২; মুলতাকার আবহুর ৪/১৭০)

হাজ্বী সাহেবের নামে কুরবানী ঃ অনেক হাজ্বী সাহেব দেশে তার কুরবানীর ব্যবস্থা করে যান। এটাকে তারা জরুরি মনে করেন। এক্ষেত্রে মাসআলা হল, যে হাজ্বী কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে তার উপর সাধারণ কুরবানী জরুরী নয়, হাঁ এরপরও যদি কেউ নফল নিসাবে কুরবানী দিতে চায় তবে সেটা ভাল। পক্ষান্তরে কোন হাজ্বী যদি মক্কায় হজ্বের আগে ১৫ দিন থাকার নিয়তে অবস্থান করে থাকে, তাহলে সে কুরবানীর দিনে যেহেতু মুকীম, তাই কুরবানী দেওয়ার সামর্থ্য থাকলে তার উপর সাধারণ কুরবানী করাও ওয়াজিব হবে। এই সাধারণ কুরবানী সে দেশেও দিতে পারবে। উল্লেখ্য, সাধারণ কুরবানী বলতে উদ্দেশ্য যা সকল সামর্থ্যবান মুসলমানই করে থাকেন, আর হজ্বের কুরবানীর মাসআলা তো জানাই আছে যে, তামাত্তু ও কেরান হজ্বে কুরবানী (দমে শুকর) ওয়াজিব। আর ইফরাদ হজ্বে কুরবানী নফল।

(কাযী খান ৩/৩৪৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫)

জবাইয়ের আগে চামড়া বিক্রি ঃ অনেক সময় চামড়া ক্রেতাদের পীড়াপীড়িতে পশু জবাইয়ের আগেই চামড়া বিক্রি করে ফেলে। এমনকি মূল্যও নিয়ে নেয়। এমনটি করা নাজায়েয। চামড়া ছিলার আগে বিক্রি করা জায়েয

নয়। তাই প্রয়োজনে জবাইয়ের আগে বিক্রির ওয়াদা করা যেতে পারে, বিক্রি করা যাবে না। (আলমগীরী ৩/১২৮; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৬৩)

কুরবানী সম্পর্কে বিভিন্ন মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করবে তার জন্য যিলহজ্জের চাঁদ ওঠার পর থেকে কুরবানী করা পর্যন্ত শরীরের কোন পশম চুল, নখ ইত্যাদি কাটা থেকে বিরত থাকা সুন্নাত। তবে এ কারণে যদি কারো নখ বগল ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কারের মেয়াদ ৪০ দিন অতিক্রম করে যায় তাহলে কুরবানীর অপেক্ষ্যা করবে না। বরং ৪০ দিনের মধ্যেই তা পরিষ্কার করে নিবে। সুতরাং এই সুন্নাতের উপর আমল করতে হলে জিলহজের চাঁদ ওঠার আগ থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

(মুছলিম ঃ ২/১৬০ শরাহ নববী ঃ ২/১৬০ শামীঃ ৬/৪০৭)

আকীকা ও খতনা বিষয়ক ভুলভ্রান্তি

আকীকার দিন তারিখ প্রসঙ্গ ঃ এ ব্যাপারে দু'ধরনের প্রান্তিকতা লক্ষ করা যায়। কিছু মানুষ রয়েছেন যারা ৭ম দিনে আকীকা করার প্রতি গুরুত্ব দেন না। ক্লিনিক, ডাক্তার, প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় টেষ্ট ইত্যাদির পিছনে হাজার হাজার টাকা খরচ করলেও যৎসামান্য টাকা খরচ করে আকীকা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ হাদিস শরীফে ৭ম দিনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নির্বাচিত সময়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু শরীয়ত যে বিষয়ে কোনো দিন তারিখ নির্ধাতি করে দেয়নি সেখানে খুব তোড়জোড় করতে দেখা যায়। (আলমাদখাল ৩/২৯২-২৯৩)

আবার কেউ কেউ ৭ম দিনে আকীকা করতে না পারলে মনে করে পরবর্তীতে আর আকীকা করা যায় না। অথচ মাসআলা হল, ৭ম দিনে করতে না পারলে ১৪তম দিনে, তাও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে আকীকা দিবে।

(মুসতাদরাকে হাকিম ৪/২৩৮; ইলাউস সুনান ১৭/১১৬; আলমুগনী ১৩/৩৯৬)

এটিও যদি সম্ভব না হয় তবে পরবতীর্তে যে কোন দিন আকীকা করবে এবং এক্ষেত্রেও ৭-এর হিসাবের প্রতি লক্ষ রাখা যেতে পারে। এর সহজ নিয়ম হল, যে বারে শিশুটি জন্মগ্রহণ করছে তার আগের দিন আকীকা করা। যেমন সোমবারে জন্মগ্রহণ করলে রবিবারে আকীকা করা।

আকীকা না করে কুরবানী করা ঃ এমনও শোনা যায় যে, আকীকা না হয়ে থাকলে তা আদায় করা পর্যন্ত নাকি কুরবানী দেওয়া যায় না। এ ধারণা ভুল। আকীকা দেওয়া না-দেওয়ার সাথে কুরবানীর কোনো সম্পর্ক নেই; বরং কারো

আকীকা না হয়ে থাকলেও ওয়াজিব কুরবানী অবশ্যই আদায় করতে হবে। আর সম্ভব হলে আকীকাও দিবে।

দাওয়াত অনুষ্ঠান করে নাম দেওয়া হয় "আকীকা" ঃ অনেকে সন্তানের জন্মগ্রহণকে কেন্দ্র করে দাওয়াত অনুষ্ঠান করে। হোটেল, রেস্তোরাঁ কিংবা হলরুমগুলোতে চুক্তি করে খানার আয়োজন করা হয়। সেখানে গোস্তের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রেস্তোরাঁ ওয়ালাদের উপরই থাকে। এ অনুষ্ঠানকে যদিও আকীকা অনুষ্ঠান নাম দেওয়া হয় তবুও এতে আকীকার সুন্নত আদায় হবে না। শরীয়তের শেখানো পদ্ধতিতে পশু জবাইয়ের মাধ্যমেই আকীকা করতে হবে।

(ইলাউস্ সুনান ১৭/১১৭; তুহফা ৭৫-৭৬)

আজকাল আকীকা অনুষ্ঠানের রেওয়াজ বেড়েছে, কিন্তু খাইরুল কুরূনে আকীকাকে কেন্দ্র করে দাওয়াত করে খাওয়ানোর প্রচলন ছিল না। এ প্রথা পরবর্তী যুগের। এ অনুষ্ঠানে অনেক ধরনের শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখা যায়। এগুলো না থাকলেও আকীকাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান না করাই শ্রেয়। কেননা সাহাবাও তাবেয়ীনের যুগে এর প্রচলন ছিল না। আকীকার গোস্ত কাঁচা বা রান্না করে গরীব-দুঃখী, আত্মীয়-স্বজনকে দিবে এবং নিজেরা খাবে।

(আলমাদখাল ৩/২৯২; তুহফা ৮০,৭২; ইসলামী ফিকহ ২/১০৫-১০৬)

আকীকা অনুষ্ঠানে উপঢৌকনের রেওয়াজ ঃ আকীকা অনুষ্ঠানে বাচ্চার জন্য বিভিন্ন উপঢৌকন আনার প্রচলনটিও ঠিক নয়। কেন না এতে কারও মুখলজ্জায় পড়ে উপঢৌকন দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। আর এভাবে কেউ কোন জিনিস দিলে তা নেওয়া ও ব্যবহার করা জায়েয হয় না। (মুসনাদে আহমদ ৫/১১৩)

মা-বাবার জন্য আকীকার গোশত খাওয়া ঃ এ ধারণাও কেউ কেউ রাখে যে, মা-বাবা সন্তানের আকীকার গোশত খেতে পারবে না। ফলে আকীকার গোস্ত মান্নতের মতো পুরোটাই বিতরণ করে দেওয়া হয়। এটা ঠিক নয়। আকীকার গোস্ত সন্তানের মা-বাবাও খেতে পারবে। (ইলাউস সুনান ১৭/১১৬; তুহফা ৭৮)

আকীকার প্রাণীর চামড়া ঃ আকীকার চামড়ার হুকুম কুরবানীর চামড়ার মতোই। কিন্তু অনেককে এ চামড়া কসাইকে পারিশ্রমিক হিসাবে দিয়ে দিতে দেখা যায়। অনেকে আবার চামড়াটি বিক্রি করে তার মূল্য নিজে ভোগ করবেন। এ সবই ভুল। আকীকার চামড়া কুরবানীর চামড়ার মতো ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারবে, তবে যদি তা বিক্রি করা হয় তাহলে এ টাকা গবীর-মিসকীনকে সদকা করে দেওয়া জরুরী।

(তুহফা ৮২-৩৮; ইলাউস সুনান ১৭/১১৭; আল মাদখাল ৩/২৯২)

আকীকার গোস্ত বণ্টন করা ঃ অনেকে মনে করে, আকীকার গোস্ত থেকে ফকীরকে দেওয়ার কোন নিয়ম নেই। এ গোস্ত আত্মীয়-স্বজন ও নিজেদের জন্য। এটি ভুল। আকীকার গোস্ত কুরবানীর গোস্তের মতোই ফকীর মিসকীনদের দেওয়ার নিয়ম আছে। (তুহফা ৭৯)

আকীকার প্রাণী ঃ অনেকে মনে করে, ছাগল ছাড়া আকীকা করা যায় না। এটি ভুল ধারণা। যে সব প্রাণী দ্বারা কুরবানী জায়েয সে সব প্রাণী দ্বারা আকীকা জায়েয। এমনকি গরু, মহিষ ও উটের এক সপ্তমাংশ দ্বারাও আকীকা করা যাবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ওই পশুর বাকি ছয় অংশও কুরবানী, আকীকা বা এ ধরনের পুণ্যের উদ্দেশ্যে হতে হবে। হাদীস শরীফে এসেছে, আনসারী সাহাবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উট জবাই করে আকীকা করা হয়েছিল। অবশ্য আকীকার জন্য গরু, মহিষ ও উটের চেয়ে ছাগল বা দুম্বাই উত্তম।

(মুসতাদরাকে হাকেম ৪/২৩৮; তুহফা ৭৭; ইলাউস সুনান ১৭/১১৬-১১৭)

নিজের আকীকার গোশত খাওয়া ঃ সন্তান বড় হয়ে যাওয়ার পর তার আকীকা করা হলে ওই সন্তান নিজের আকীকার গোশত খেতে পারবে না ভাবা হয়। এটিও ভুল ধারণা।

একটি ভ্রান্তি ঃ আকীকার দিনের একটি রেওয়াজ আছে যে, এদিনে সন্তানের হাতে কলম খড়ি দেওয়া হয়, দেওয়া হয় সোনা-রূপা ও টাকা-পয়সা। যেন বড় হয়ে সে পড়ালেখা শিখে অনেক অর্থ-বিত্ত গড়তে পারে। এগুলোর সাথে শরীয়তের কোনোই সম্পর্ক নেই। এগুলো নিছক কু-রসম, যা পরিত্যাজ্য।)আলমাদখাল ৩/২৯০)

আকীকার হুকুমকে গুরুত্ব না দেওয়া ঃ অনেকে আকীকার প্রতি গুরুত্ব দেয় না, এটা ঠিক নয়। কেননা আকীকা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। একাধিক সহীহ হাদীসে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

খাতনা বিষয়ক ভুলত্রুটি

খাতনা অনুষ্ঠান ঃ অনেকে সন্তানের খতনা উপলক্ষে খানাপিনার অনুষ্ঠান করে থাকে। খতনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান করাটা শরীয়তের কোনো হুকুম নয়।

সাহাবী হযরত উসমান বিন আবিল আস রা, কে খতনা উপলক্ষে দাওয়াত করা হলে তিনি সেই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং বলেন ঃ

إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُدْعَى لَهُ

অর্থ ঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমরা খতনাকে কেন্দ্র করে সমবেত হতাম না এবং আমাদেরকে এজন্য দাওয়াতও দেওয়া হত না"। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৭৪৫০ ৪/২১৭)

মনে রাখা আবশ্যক, খতনা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শরীয়ত বিরোধী অন্য কোনো জিনিস না পাওয়া গেলেও পূর্বোক্ত হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু আজকার অনুষ্ঠানে আরও অনেক ধরনের গুনাহের কাজ ঘটে থাকে। এতে করে এই অনুষ্ঠানের অবৈধতা আরও প্রকট আকার ধারণ করে।

কুদরতী খতনা ঃ কোনো সন্তান জন্মগতভাবে কিংবা ঘুমন্ত অবস্থায় কুদরতীভাবে খতনা হয়ে যায়। একে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়। নাম যাই দেওয়া হোক না কেন, কোনো ছেলের ব্যাপারে এমনটি ঘটলে তার থেকে পানি পড়া নেওয়া কিংবা তাকে আল্লাহ তা'আলার খাস বুযুর্গ ভাবা একটি হাস্যকর ব্যাপার।

খতনার পর চমড়া বেড়ে গেলে ঃ এক্ষেত্রে চামড়া বেড়ে অগ্রভাগ ঢেকে গেলেও পুনরায় খতনার প্রয়োজন মনে করা হয় না। অথচ একবার খতনা করার পর আবার কোনো কারণে চামড়া বেড়ে সামনের অধিকাংশ ঢেকে গেলে আবারও খতনা করা জরুরি। এর জন্য পূর্বের খতনা যথেষ্ট নয়।

নওমুসলিমের খতনা ঃ প্রাপ্তবয়স্ক কোনো বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তার খতনাকে জরুরি মনে করা হয় না অথচ সাবালক হলেও তার খতনা করা অপরিহার্য।

(সহীহ বুখারী-ফাতহুল বারী ১/৯১; আল ইসমিযকার ২৬/২৪৫; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৮২)

নবজাতককে কেন্দ্র করে যে সব ভুলভ্রান্তি ঘটে থাকে

উপরে দুইটি বিষয়ে হজ্ব ও কুরবানীর ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ওই দুই বিষয়ে ভ্রান্তির প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল সহীহ ইলম তথা শরয়ী ইলমের অনুপস্থিতিকে। কিন্তু এবারের বিষয়ের ভুল-ভ্রান্তির কারণ হল, এ বিষয়ে যে শরীয়তের কোনো আদেশ-নিষেধ থাকতে পারে এ জ্ঞানেরই অনুপস্থিতি। অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়েও যে শরীয়তের

আদেশ-নিষেধ থাকতে পারে এই বিষয়টিই অনেকের জানা নেই। মনে করা হয়, শরীয়ত তো শুধু নামায-রোযা ও এজাতীয় ইবাদতের নাম। সন্তান-সন্ততি ও তাদের লালন-পালনের সাথে শরীয়তের কোনো হুকুম সংশ্লিষ্ট নেই। সুতরাং এগুলো করতে হবে প্রচলিত নিয়মে কিংবা এগুলো যেহেতু মেয়েলি বিষয় তাই তাদের রেওয়াজ অনুযায়ী অথবা তথাকথিত সভ্যতার অনুকরণে বিজাতীয় তরিকায়।

গেড়ার ভুল এটাই। শরীয়তে নামায, রোযা ও হজ্ব, যাকাতের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে শরীয়তের কোনো নির্দেশ নেই; বরং মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্বেই রয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ। ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তান-সন্ততি প্রতিপালন ঘর-সংসার ইত্যাদি কোনোটিই ইসলামের আওতার বাইরে নয়। এসব কিছুর মধ্যেও আল্লাহর আদেশ-নিষেধ ও তার রাসূলের তরিকা রয়েছে, যেগুলো মান্য করে চললে এ কাজগুলো নেক কাজে পরিণত হয়। এই ইলমকে "ইলমুল হাল" বলা হয়। অর্থাৎ প্রর্ত্যেকে তার নিজ নিজ ক্ষেত্র ও অবস্থা সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশনার জ্ঞান অর্জন করবে। এটি ফরযে আইন। এটি না-জানা এবং জানার প্রয়োজন বোধ না করা গুনাহ। এর পর না-জানার কারণে যে সব ভুল-ভ্রান্তিতে নিপতিত হতে হয় বা কুরসমের শিকার হতে হয় তার গুনাহ তো আছেই। নিম্নে আজকের বিষয়ের কিছু প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরা হচ্ছে যেন এ সম্পর্কীয় সহীহ ইলম অর্জিত হয় এবং এক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

প্রসবকালীন ভ্রান্তি ঃ সন্তান প্রসবের সূচনা থেকেই নামায নেই মনে করা হয়; এর কয়েকটি স্তর আছে। যেমন

ক. সন্তান প্রসবের পূর্বে যখন সাদা স্রাব বের হয় তখনও নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায পড়তে হবে। স্রাব ধারাবাহিক নির্গত হতে থাকলে মাজুরের হুকুম ধর্তব্য হবে। কিন্তু কোনো কোনো মা-বোন এসময় নামায নেই মনে করেন। এটা ঠিক নয়।

খ. সন্তান পূর্ণ বের হওয়ার পর কিংবা অধিকাংশ বের হওয়ার পর থেকে নির্গত রক্তই কেবল নেফাস। সুতরাং এর পূর্বে কোনো কারণে রক্তক্ষরণ হলেও নামায বন্ধ হবে না এবং মাজুর হিসাবে নামায আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রেও অনেকে নামায ছেড়ে দেয়।

গ.সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরের রক্তের সাথে যেহেতু নামায বন্ধ হওয়ার সম্পর্ক, তাই কোনো কারণে যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও রক্তস্রাব চালু না হয়, তাহলে নামাযের বিরতি হবে না রবং স্রাব বের না হওয়া পর্যন্ত নামায

পড়তে হবে। অপারেশনের মাধ্যেম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোনো প্রসূতির স্রাব চালু না হলে তখনও তাকে নামায পড়তে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত যে সকল ক্ষেত্রে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে। তার উদ্দেশ্য হল, যেভাবে সমর্থ হবে সেভাবেই নামায পড়বে। যেমন, ইশারা করে হলেও নামায পড়বে। অবশ্য অধিক কষ্টের কারণে যদি ইশারাও সম্ভব না হয় এবং তখনও হুশ বাকী থাকে তাহলে পরবর্তিতে ওই নামায কাযা করে নিতে হবে। (তাবয়ীনুল হাকায়েক ১/৬১; আলবাহরুর রায়েক১/২১৮; রদ্দুল মুহতার ১/২৯৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/৩৭)

পুরুষের সহযোগিতা নেওয়া ঃ কেউ কেউ সন্তান জন্মগ্রহণের সময় কিংবা এ ধরনের ক্ষেত্রে পুরুষ ডাক্তার বা পুরুষ সহযোগী থাকাকে আপত্তিকর মনে করে না। অথচ মহিলা ডাক্তার, মহিলা সহযোগী ও ধাত্রীর ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে এ কাজে পুরুষের সরাসরি সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েজ। হাঁ স্বামী একা সহযোগিতা করতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ নয়। এটি শরীয়তবিরোধী হওয়া ছাড়াও মানবীয় রুচিরও পরিপন্থী। আজকাল আধুনিক হাসপাতালগুলোতে সিজারের জন্য মহিলা ডাক্তারের পাশাপাশি পুরুষ ডাক্তারও থাকে। কখনো বা ডাক্তার মহিলা থাকলে সহযোগী থাকে পুরুষ তাই ভর্তি করার পূর্বেই পূর্ণ মহিলা সার্ভিস আছে কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

(আলবাহরুর রায়েক ৮/১৯২; তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৮৫; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩৭)

বাচ্চার নাভি, সংযুক্ত নাড়ি ও অন্যান্য কর্তিত অংশ নিয়ে বিভ্রান্তি ঃ এসব কর্তিত অংশের এলাকাভেদে একেক ধরনের প্রচলন রয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় এমনও প্রচলন রয়েছে যে, ওই সব কর্তিত অংশ একটা নির্ধারিত সময় উনুনের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। এরপর তা পুকুর বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এগুলো সবই ভুল। মানুষের শরীরের কর্তিত সবকিছুই মাটির নিচে পুঁতে দেওয়াই নিয়ম।

উনুনের উপর ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। এতে সন্তানের নাভি শুকায় বলে ধারণা করা হয়, কিন্তু বাস্তবতার সাথে এর কোনোই মিল নেই।

(আল মুহীতুল বুরহানী ৩/১০৬; শরহুল মুহাযযাব ৫২১৩; ফাতহুল কাদীর ২/৭৬)

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান ৪০ দিন পর্যন্ত নাপাক থাকে। এ সময় সেখানে নামায, কুরআন তিলাওয়াত কিছুই জায়েয নেই। এধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঘরের কোনো স্থানে নাপাকি লাগলে পূর্ণ ঘরই নাপাক হয়ে যায় না। এমনিভাবে যেখানে নাপাকি লেগেছে নিয়ম অনুযায়ী ধুয়ে মুছে নিলে ওই স্থানও পবিত্র হয়ে

যায়। পবিত্র করার পর সেখানে নামায আদায় করা, কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা সবই জায়েয।

৪০ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মা অস্পৃশ্য থাকে ঃ কোথাও কোথাও এ প্রচলন রয়েছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মাকে রান্না-বান্না বা অন্য কোনো কাজেরই যোগ্য মনে করা হয় না। তার স্পর্শ লাগলেই সবকিছু নাপাক হয়ে যাবে ধারণা করা হয়; এটিও ভুল। জাহেলী যুগের ধারণা। চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাচ্চার মার স্রাব চালু থাকলেও তার ব্যবহৃত থালা-বাসন, পেয়ালা কিংবা তার হাতের স্পর্শ লাগা কোনো কিছুই নাপাক হয় না। স্বাভাবিক অবস্থার মতোই তার হাতের রান্না-বান্না খাওয়া বৈধ। তার ব্যবহৃত বাসনকোসন অন্যরাও ব্যবহার করতে পারবে।

(আদ্দুররুল মুখতার ১/২৯৯)

সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায-রোযা না করা ঃ নেফাসের সর্বোচ্চ মেয়াদ চল্লিশ দিন। সবচেয়ে কম সময়ের কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। এমনকি দু'চার ঘণ্টা বা এক দুই দিনও হতে পারে। কিন্তু কোনো কোনো মহিলা মনে করে যে, স্রাব চালু না থাকলেও সন্তান প্রসবের পর চল্লিশ দিন নামায-রোযা করা যায় না। এটি ভুল ধারণা। এ সময় স্রাবে অনিয়ম দেখা দিলে বিজ্ঞ মুফতী সাহেব থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। মাসআলা না জেনে নিজ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া জায়েয হবে না।

(আলহবাহরুর রায়েক ১/২১৯; আদ্দুররুল মুখতার ২/২৯৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়া১/২৩১)

ধাত্রীকে মায়ের মতো মাহরাম মনে করা ঃ ধাত্রীকে মায়ের মতো মনে করার বহুল প্রচলন রয়েছে। ভূমিষ্ঠ সন্তানটি কন্যা হলে পরবর্তীতে এ মেয়ের স্বামী স্ত্রী ধাত্রীর সাথে পর্দা করে না। আবার কোনো কোনো মেয়ে বড় হয়ে তার ধাত্রীর স্বামীর সাথে পর্দা করে না। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে ধাত্রী পূর্বের মতোই গায়রে মাহরাম। শিশুটি ছেলে হলে যেমন বড় হওয়ার পর ধাত্রীর সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ নাজায়েয, তেমনি শিশুটি মেয়ে হলে বড় হওয়ার পর ধাত্রীর স্বামীর সাথে তার দেখা-সাক্ষাৎ এবং বিয়ের পর তার স্বামীর সাথে ধাত্রীর সাক্ষাতও হারাম।

শরীয়তে কেবল নিজের জননী, দুধমা, শাশুড়ি ও পিতার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাত জায়েয। এছাড়া অন্য কোনো মহিলাকে মা ডাকলেও তার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ বৈধ নয়। সূরা নিসা ৩০

নবজাতক সম্পর্কীয় ভ্রান্তিসমূহ আযান-ইকামতে ছেলে-মেয়ের মধ্যে পার্থক্য করা ঃ ছেলের বেলায় আযান-ইকামত দেওয়া, মেয়ে হলে না দেওয়া বা ছেলের ডান কানে আযান বাম কানে ইকামত, আর কন্যা সন্তানের বেলায় এর উল্টো করা অথবা ছেলে হলে বাড়ির বাইরে গিয়ে উচ্চ স্বরে আযান দেওয়া আর মেয়ে হলে আযান ইকামত কিছুই না দেওয়া এসব কিছুই ভুল। নবজাতক ছেলে হোক বা মেয়ে, কানে আযান-ইকামত দেওয়ার বিধানে কোনো ভিন্নতা নেই। কিবলামুখী হয়া উভয়েরই ডান কানে আযান, বাম কানে ইকামত দেওয়া সুন্নত। মেয়ের ক্ষেত্রে না দেওয়া কিংবা ছেলের বেলায় বাড়ির বাইরে উচ্চ স্বরে দেওয়া শরয়ী নিয়ম নয়; বরং উভয়ের বেলায় আযান-ইকামত হালকা আওয়াজে দিবে। (ইলাউস সুনান ১৭/১২৩' আমালুল ইয়াওমি ওয়াললাইল ৫১৮; আউনুল মাবুদ ১৪/৭; মারাকিল ফালাহ ১০৭)

আযান দেওয়ার জন্য পুরুষ কিংবা হুজুর জরুরি মনে করা ঃ নবজাতকের কানে আযান দেওয়ার জন্য আলেম হওয়া জরুরি নয়। যে কোনো মুসলমান ব্যক্তিই আযান জানা থাকলে আযান দিতে পারে। এমনকি মহিলারাও এ আযান দিতে পারে। তবে অন্য পুরুষের শ্রুতিগোচর না হয় এমন আওয়াজে দিতে হবে। উল্লেখ্য, পুরুষ উপস্থিত থাকলে পুরুষেরই আযান দেওয়া উত্তম। (হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ ২/৮১)

কানে আযান দেওয়া নিয়ে অবহেলা ঃ আজকাল শহুরে পরিবেশে অধিকাংশ বাচ্চার জন্ম ক্লিনিক ও হাসপাতালে হয়ে থাকে। কিন্তু খুব কম সন্তানের কানেই আযান দিতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীনতা ও অবহেলা লক্ষ করা যায়। অথচ এটি নবী কারীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবাও তাবেয়ীনদের মধ্যেও এ সুন্নতের উপর আমল হত। মুহাদ্দিসগণ এর বিভিন্ন উপকারিতা বর্ণনা করেছেন। যেমন ভেজালের দুনিয়াতে পদার্পণ করার পরই সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ধ্বনি বাচ্চার মন-মস্তিষ্কে গ্রথিত করা, শয়তানকে আযানের ধ্বনি দিয়ে নবজাতক থেকে বিতাড়িত করা ইত্যাদি। এ ছাড়া এর আরও উপকারিতা রয়েছে। তাই সুন্নতের উপর আমলের নিয়তে করলে এ সকল কল্যাণ হাসিল হবে ইনশাল্লাহ।

কন্যা সন্তানের জননীকে অপয়া মনে করা ঃ যে মহিলার প্রথম কন্যা সন্তান হয় কিংবা একাধিক কন্যা সন্তান হয়, তাকে হতভাগা মনে করা হয় এটা জাহেলী যুগের ধারণা। ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের এই অবস্থা নিতান্তই মন্দ। (সূরা নাহল ৫৮-৫৯)

এ ছাড়া হাদীস শরীফে একাধিক কন্যা সন্তানের পিতা-মাতার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ রয়েছে।

(সূহীহ বুখারী হাদীস ১৪১৮; সহীহ মুসলিম হাদীস ২৬৩১, ২৬২৯,তুহ্ফা ৩৩-৩৫)

বাচ্চার কপালে টিপ দেওয়া ঃ অনেকে বদনযর থেকে হেফাযতের উদ্দেশ্যে শিশুর কপালে টিপ দিয়ে থাকে। এটি বদনযরকে রোধ করে না শিশুকে নানাবিধ অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য হাদীসে শেখানো যিকির ও দোয়াগুলোই কার্যকরী ও যথেষ্ট।

ছেলে শিশুর কান ফোঁড়ানো ঃ যে মহিলার একাধিক সন্তান মারা যায় তার পরবর্তী সন্তানকে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষার জন্য কান ফোঁড়ানো হয় এবং তাতে স্বর্ণের ছোট অলংকারও পরিধান করানো হয়। তাদের ধারণা, কান ফুঁড়িয়ে সন্তানকে ত্রুটিযুক্ত করে দিলে আল্লাহ একে আর নিবেন না। ফলে তার মৃত্যুও হবে না। এ ক্ষেত্রে আরও কিছু রেওয়াজ রয়েছে। যেমন বিভিন্ন মন্দ শব্দে এদের নাম রাখা, যথা বন্যা, পচা, আগুন, ধ্বস, মরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

এই বিশ্বাস শরীয়ত পরিপন্থী কুসংস্কার। প্রত্যেক প্রাণীর মৃত্যুর ক্ষণ নির্ধারিত। এসব পদ্ধতি অবলম্বন করাও মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে পারে না। এছাড়া উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলো এমনিতেই নাজায়েয ও হারাম। ছেলেদের কান ফোঁড়ানো এবং তাতে অলংকার পরানো নাজায়েয। এতে মহিলাদের সাদৃশ্য হয়। আজকাল এটি বিজাতীয় রীতিরও অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শরীফে এ ধরনের সাদৃশ্য অবলম্বনকারীর প্রতি অভিসাম্পত করা হয়েছে। তাছাড়া ছেলেদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। শিশু বাচ্চাদেরকে কান ফোঁড়ালে এবং স্বর্ণ পরিধান করালে এর গুনাহ মা-বাবার হবে। সন্তানের নাম রাখার ব্যাপারে শরীয়তের

নির্দেশনা হচ্ছে অন্তত ভাল অর্থবোধক নাম রাখা। খারাপ নাম রাখলে শরীয়তের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করা হয়। তদুপরি ভিত্তি হল কুসংস্কার। সুতরাং এ প্রচলনটি অবশ্যই বর্জনীয়।

(সহীহ বুখারী ২/৮৭৪; সুনানে আবু দাউদ ২/২৫৫৯; তুহ্ফা ৯৯)

জন্ম দিবস পালন করা ঃ যে তারিখে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে প্রতি বছর ওই দিনটিতে জন্মদিবস পালন করা বিজাতীয় সংস্কৃতি। শরীয়তে এ ধরনের অনর্থক কাজের কোনো কিছু না থাকলেও শুধু অনর্থক কাজ হওয়ার কারণে কিংবা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ হওয়ার কারণেই তা নাজায়েয। আহসানুল ফাতাওয়া ৮/১৫৪

নব জাতকের নাম রাখা নিয়ে ভ্রান্তি

আকীকা ছাড়া নাম রাখা ঃ সন্তানের নাম রাখার জন্য আকীকা করাকে পূর্বশর্ত মনে করা হয় এবং ভাবা হয় আকিকা না করলে সন্তানের নাম স্থিতিশীল হয় না। এজন্য কেউ কেউ আকিকার পূর্বে বাচ্চাকে "বাবু" বা এরকম অন্য কোনো শব্দ বলে ডাকে। অথচ নাম রাখা আকীকার সাথে শর্তযুক্ত নয়। আকিকা না করলেও সন্তানের নাম রাখা জায়েয। সাত দিনের পূর্বেও নাম রাখা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীর নাম পবির্তন করেছেন কিন্তু এ জন্য পুনরায় আকীকা করতে বলেননি। তারাও কেউ করেননি।

(সহীহ বুখারী ৬১৯২; সহীহ মুসলিম হাদীস ২১৪৯; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস ৫৯৫০; তুহফা হাদীস ১১১-১১২)

সন্তানের নাম নির্বাচনে ভ্রান্তি ঃ সন্তানের নাম নির্বাচনে শরীয়তের নির্দেশনা কী তা যেন অধিকাংশ মা-বাবাই জানেন না। আজকাল ছেলে-মেয়েদের নাম শুনে তাই মনে হয়। কেউ তো বিধর্মীদের অনুকরণে নাম রাখে এবং এটাকে স্টাইল মনে করে। আবার কেউ কেউ সন্তানের নাম পটল, লেবু, ঝন্টু, লাল মিঞা, কালু মিঞা ইত্যাদি রাখে।

কেউ প্রিয় সন্তানের নাম বিশ্বের সেরাগায়ক ও মডেলদের সাথে মিল করে রখে। যেখানে ইহুদি, খৃস্টান এমনকি হিন্দুদেরকেও নামের বাঁধাধরা নিয়ম নীতি মেনে চলতে দেখা যায়, সেখানে মুসলমানদের এই অবনতি। এগুলো দেখলে যে কেউ মনে করে মুসলমানদের কাছে সন্তানের নামকরণের কোনো নীতি নেই।

অথচ বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো। একমাত্র ইসলামই সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে উত্তম ও চমৎকার নীতিমালা দিয়েছে। এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি সুন্নত ছিল খারাপ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখা। এজন্য হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়টিকে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় হিসাবেও বিন্যস্ত করতে দেখা যায়। নিম্নে হাদীস ও সুন্নতের আলোকে নির্ণিত কিছু নীতি পেশ করা হল।

১. 'আব্দুল্লাহ' 'আব্দুর রহমান' নাম রাখা। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে,

إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُالرَّحْمٰنِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকটে সর্বাধিক পছন্দনীয় নাম 'আব্দুল্লাহ' ও 'আব্দুর রহমান'।

(সহীহ মুসলিম শরীফ ২১৩২; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২; আদ্দুররুল মখতার ৬/৪২৭; তুহফা ৯৯)

২. নবী, সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এবং পূর্ববর্তী অলি-বুজর্গদের নামে নাম রাখা। সহীহ মুসলিমে এ মর্মে একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে যার শিরোনাম হচ্ছে بَابُ التَّسَمِّيْ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ নবী, এবং সালেহীনের নামে নাম রাখা প্রসঙ্গ।

(সহীহ মুসলিম হাদীস ২১৩৫; তুহফা ১১০; রদ্দুল মুখতার ৬/৪১৭)

৩. ভালো অর্থবোধক নাম রাখা। হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

وَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوْا أَسْمَائَكُمْ

নিশ্চয় কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে, অতএব তোমাদের নাম সুন্দর কর।

(সুনানে আবু দাউদ হাদীস ৪৯৪৮)

এছাড়া ভালো অর্থবোধক নাম রাখা এ কারণেও অত্যাবশ্যকীয় যে, নামের প্রভাব ব্যক্তির মাঝে পড়ে থাকে। এটি হাদীস ও আমারে সাহাবা দ্বারা প্রমাণিত।

(তুহফা ১২২-১২৩; রদ্দুল মুহতার ৬/৪১৮)

৪. আল্লাহ তাআলার জন্য নির্ধারিত গুণবাচক নামসমূহের মধ্যে কোনোটি না রাখা।

যেমন- রব, খালেক, সামাদ, জাব্বার মুতাকাব্বির ইত্যাদি। তবে এগুলোর পূর্বে 'আব্দু' সংযোজন করে আব্দুর রব, আব্দুল খালেক, আব্দুস সামাদ ইত্যাদি নাম রাখা যাবে; বরং হাদীস শরীফে এরূপ আব্দু যোগ নাম রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আজকার আব্দু ছাড়া শুধু খালেক মালেক, রহমান, সামাদ, এভাবে ডাকার প্রচলন রয়েছে। এটি একটি নিন্দিত ও গর্হিত কাজ। এ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬২; তুহফা ১০৮)

৫. আব্দে আলী, আব্দুল কাবা, আব্দুন্নবী ইত্যাদি নাম না রাখা। শুধু আল্লাহ তাআলার নামের শুরুতেই 'আব্দু' শব্দ সংযোজন করে নাম রাখা যায়। অন্য কোনো শব্দের শুরুতে 'আব্দ' যোগ করে কারও নাম রাখা যায় না।

(তুহফা ১০০-১০৩)

৬. যে সব নাম শুনলে অমুসলিমদের নাম মনে হয় এ ধরনের নাম না রাখা। শাহান শাহ, সায়্যিদুল বাসার বা এ জাতীয় অর্থবোধক নাম না রাখা।

(তুহফা ১০১)

৭. ফেরআউন, কারূন, হামান এবং অভিশপ্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নাম না রাখা। (তুহফা ১০৫)

৯. নবী, রাসূল, ফেরেশতা-এ ধরনের বিশেষ পারিভাষিক শব্দ দ্বারা নাম না রাখা।

মেয়ের নাম বাবার সাথে এবং ছেলের নাম মায়ের সাথে মিলিয়ে রাখা ঃ অনেকের নাম নির্বাচনের সময় প্রধান শর্ত থাকে মেয়ের নাম বাবার নামের প্রথম অক্ষরের সাথে মিল করে রাখা। আর ছেলের নাম মায়ের নামের প্রথম অক্ষরের সাথে মিল করে রাখা, অথচ এটি নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নূন্যতম ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়। নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওই সব বিষয়ই লক্ষণীয় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

আরবী শব্দে বা কুরআন-হাদীসে ব্যবহৃত শব্দে নাম রাখা ঃ অনেকে মনে করে নামটি আরবী হলেই চলে। অর্থ যাই হোক না কেন। আর ওই শব্দ যদি কুরআন-হাদীসের হয়ে থাকে তবে তো আর প্রশ্নই নেই। নাম রাখার জন্য বড় দলিল হয়ে যায়। অথচ শরীয়তে নাম রাখার জন্য যে সকল নীতি দিয়েছে সেখানে স্পষ্ট রয়েছে যে, নামটি ভালো অর্থের হতে হবে। শুধু আরবী বা শুধু কুরআনের শব্দ বলেই তা নাম হিসাবে চয়ন করা যাবে না। অর্থের দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। কুরআন মজীদে জাহান্নাম, শয়তান, ফেরআউন ইত্যাদি শব্দও রয়েছে। তাই বলে কি এ সকল শব্দ দ্বারা নাম রাখা যাবে? কিন্তু

দুর্ভাগ্যবশত কোনো মুসলমান সন্তানের নাম শুধু শব্দটি কুরআনে আছে বলেই রেখে দেওয়া হয়। যেমন 'কাফির' (কাফের এর বহুবচন) 'ঝাফীর' (জাহান্নামীদের আর্ত চিৎকার) 'রিবা' (সুদ) নবীউল্লাহ' (আল্লাহর নবী) 'মুরসালীন' (রসূলগণ) 'আম্বিয়া' (নবীগণ) 'মহীন' (তুচ্ছ) ইত্যাদি নাম রাখতে দেখা যায়। আম্বিয়া সাধারণত মহিলাদের নাম রাখা হয়। এর অর্থ নবীগণ। কী আশ্চর্য ? কোন নবী নারী ছিলেন না। অথচ একজন মহিলার নাম রাখা হচ্ছে নবীগণ! পুরুষ হলেও নবী নয় এমন ব্যক্তির নাম কীভাবে নবী রাখা হয় ? আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে তো কোন নবী হওয়ার অবকাশই নেই। এ ভুলের মূল কারণ শরীয়ত ও আরবী নূন্যতম জ্ঞান না থাকা।

আনকমন নাম রাখা

আজকাল কেউ নাম চাইলেই বলে, হুজুর নামটা আনকমন হতে হবে। বলার ভঙ্গিতে মনে হয় ৪০-৫০ বছরে কারও নাম হিসাবে শোনেনি এমন নাম চাচ্ছেন। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে উত্তম নাম রাখলে তো নবী-রাসূল ও পূণ্যবান লোকদের নামই রাখতে হয়। কিন্তু এগুলো তো আনকমন নয়। বাধ্য হয়ে তখন খারাপ অর্থের আরবী শব্দ কিংবা পটল, ডিজেল ইত্যাদি নাম রাখে, যা আদৌ ঠিক নয়।

মুহাম্মাদ ও মুসাম্মাৎ সংযোজন ঃ ছেলেদের নামের শুরুতে মুহাম্মাদ সংযোজনকে জরুরি মনে করা হয়। এটি জরুরি নয়। আর মেয়েদের নামের শুরুতে মুসাম্মাৎ সংযোজন করা হয়। এর অর্থ দাড়াবে শরীফা নাম্মী। আচ্ছা বলুনতো নাম্মী শব্দটি কি নামের অংশ হতে পারে ?

নবজাতকের চুল কাটা নিয়ে ভ্রান্তি ঃ মনে করা হয় জন্মদিনে আকিকা না করলে চুলও কাটা যাবে না। কিন্তু বাস্তবতা হল আকিকার সাথে চুল কাটার কোনো সম্পর্ক নেই। দুটি ভিন্ন ভিন্ন হুকুম। সুতরাং কারও আকিকা করার সামর্থ্য না হলে ৭ম দিনে চুল কাটতে বিলম্ব করবে না। লক্ষণীয় যে, হাদীসে দিন-তারিখ নির্ধারিত করে এ হুকুমটি করা হয়েছে এতদসত্ত্বেও এ সুন্নতের উপর আমল করা হচ্ছে না। পক্ষান্তরে শরীয়ত যে ক্ষেত্রে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করেনি সেখানে আমরা নিজ থেকে দিন-তারিখ নির্ধারিত করে থাকি খুব কঠোভাবে। যেমন-ঈসালে সওয়াবের কোনো দিন তারিখ শরীয়তে নির্দিষ্ট নেই। অথচ সমাজের অনেকেই মৃত্যুর ৩য় দিন, ৭ম দিন ও ৪০ তম দিনে তা করাকে জরুরি মনে করে। তদ্রুপ যিয়ারতের জন্য দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই। কিন্তু অনেকে ঈদের দিন, শবে-বরাতে কবর যিয়ারতের জরুরি মনে করে। এসব কিছুই বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুন।

অনেকে ৭ম দিনের আগে আকিকা করবে না আগে মাথা কামাবে এ নিয়ে দ্বিধায় ভুগেন। অনেককে বলতে শুনি, আকিকার আগে মাথা কামানো যাবেই না। এটি ঠিক নয়। যে কোনোটি আগে বা পরে করা যেতে পারে। এ দুয়ের মধ্যে ধারাবাহিকতা জরুরি নয়। অবশ্য কোনটি আগে করা উত্তম এ নিয়ে ফিকহবিদদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশের মত হল আগে আকিকা করা পরে চুল কাটা উত্তম।। (ইলাউস সুনান ১৭/১২৬)

চুল সমপরিমাণ চাঁদি বা তার মূল্য সদকা না করা ঃ চুল সমপরিমাণ চাঁদি বা তার মূল্য সদকা করা সুন্নত। অনেকে এই সুন্নতটির প্রতি গুরুত্ব দেয় না। অথচ এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমানিত। সাহাবা, তাবেয়ীনের যুগেও এর উপর আমল ছিল। এটি ভিন্ন একটি সুন্নত।

(মুআত্তা মালেক ২/৫০১; তুহফা ৮৯-৯০; আততালখীসুল হাবীর ৪/১৪৮)

মাথার কিছু অংশে অল্প চুল রেখে দেওয়া ঃ কোথাও কোথাও এমন প্রচলন দেখা যায় যে, মাথা কামানোর সময় মধ্যখানে কিছু চুল রেখে দেয়। এভাবে কিছু চুল কেটে কিছু রেখে দিতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২; তুহফা ৯১)

১১তম অধ্যায়

যাকাতের বর্ণনা

যাকাতের সংজ্ঞা ঃ বিশেষ এক শ্রেণীর লোককে বিশেষ প্রকারের মালের মালিক বানিয়ে দেওয়াকে যাকাত বলে। স্বাধীন, মুসলমান, বালেগ, জ্ঞানসম্পন্ন ও নগদ (সোনা-রূপার) নেসাবের মালিকের উপর যাকাত ফরয। এই নগদ নেসাব কাঁচা সোনা, অলঙ্কার হতে পারে কিংবা তৎসম মূল্যের ব্যবসায়িক পণ্যও হতে পারে, যা ঋণ ও একান্ত প্রয়োজনের উদ্ধৃত্ত থাকে এবং প্রবৃদ্ধিশীল হয়; আর যদি সেই প্রবৃদ্ধি তাত্ত্বিকভাবেও হয় তবুও।

যাকাত প্রদান ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ঃ যাকাতের মূল নেসাব এক বছরকাল স্থায়ী হওয়া। বছরের মাঝখানে প্রাপ্ত লভ্যাংশ তারই নেসাবের সাথে যুক্ত হবে এবং মূল নেসাবের বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত মালের যাকাত দিয়ে দেবে। চাই লভ্যাংশ মাল ব্যবসায় থেকে অর্জিত হোক অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোন উপায়ে হোক। যদি কোন নেসাবের মালিক অগ্রিম কয়েক বছরের যাকাত দিয়ে দেয় তবে তাও শুদ্ধ হবে।

যাকাত প্রদান শুদ্ধ হতে হলে তার শর্ত হল অভাবী ব্যক্তিকে দেওয়ার সময় অথবা নিজের প্রতিনিধিকে (বণ্টনের জন্য) দেওয়ার সময় অথবা যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হয়েছে তা পৃথক করে রাখার সময় যাকাত প্রদানের নিয়্যত সম্পৃক্ত করতে হবে। নিয়্যতের এই সম্পৃক্ততা বিধানগতভাবে হলেও চলবে। উদাহরণত ঃ কেউ নিয়্যত ব্যতিরেকেই দিয়ে দিল, তারপর সেই মাল অভাবী ব্যক্তির হাতে থাকতে থাকতেই যাকাতের নিয়্যত করে নেয় তাতেও যাকাত প্রদান শুদ্ধ বলে গণ্য হবে। বিশুদ্ধতম অভিমত মোতাবেক, অভাবী ব্যক্তিকে প্রদত্ত মাল যাকাতের মাল বলে অভাবী ব্যক্তির জানা থাকা যাকাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। কাজেই যদি কেউ কোন অভাবী ব্যক্তিকে দান অথবা ঋণ বলে কিছু দেয় এবং তদ্বারা যাকাতের নিয়ত করে তবে তার যাকাত প্রদান শুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। যদি কেউ তার সমস্ত মাল সদকা করে দেয়, অথচ যাকাত প্রদানের নিয়্যত করেনি, তবে তার যাকাত আদায়ের ফরয মাফ হয়ে যাবে।

ঋণ স্বরূপ প্রদত্ত সম্পদের যাকাত কয়েক প্রকার। কেননা ঋণ কয়েক রকমের হয়ে থাকে।

১. গুরু ঋণ, ২. মধ্যম ধরনের ঋণ, ৩. লঘু ঋণ।

গুরু ঋণ ঃ যেমন, কর্জ ও ব্যবসায়ের মালের বিনিময়ে পরিশোধ্য সম্পদ। এরূপ ঋণ যদি এমন কোন লোকের কাছে থাকে, যে ঋণের কথা স্বীকার করে, চাই সে ঘোষিত দেউলিয়াই হোক না কেন, অথবা এমন কোন লোকের কাছে থেকে, যে ঋণের কথা অস্বীকার করে; কিন্তু (ঋণদাতার কাছে) ঋণ অস্বীকারকারীর বিপক্ষে সাক্ষী রয়েছে। এ ধরনের ঋণ যখন হস্তগত হবে তখন তার পূর্ববর্তী সময়ের যাকাতও আদায় করতে হবে। এরূপ ঋণের যাকাত তখনই আদায় করা ওয়াজিব হবে যখন ন্যূনতম চল্লিশ দেরহামের বেশি যা উসুল হবে তারও উপরোক্ত হিসাবে যাকাত প্রদান করবে।

মধ্যম ধরনের ঋণ ঃ যেমন ব্যবসার পণ্য নয়, এরূপ কোন মালের বিনিময়ে লভ্য অর্থ। যথা ব্যবহার্য কাপড়, সেবার জন্য রাখা গোলাম ও বসবাসের ঘরের মূল্য। এ ধরনের ঋণ নেসাব পরিমাণ উসুল না হওয়া পর্যন্ত তার যাকাত ওয়াজিব হবে না। সঠিক বর্ণনা মতে, যখন থেকে ক্রেতা উক্ত সামগ্রীর মূল্যের দেনাদার হয়েছে, তখন থেকে বছরের অতিবাহিত অংশ ধর্তব্য হবে।

লঘু ঋণ ঃ যেমন-মাল নয় এমন বস্তুর বিনিময়ে লভ্য সম্পদ। যথা মহর, অসিয়তলব্ধ সম্পদ, খুলা-র বিনিময়, ইচ্ছাকৃত হত্যার পর কেসাসের বদলে সন্ধির বিনিময়, রক্তপণ, মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলামের মুক্তিপণ, কোন গোলামের আংশিক মুক্তির পর বাকি অংশের মুক্তির জন্য প্রদেয় বিনিময়। এ ধরণের ঋণ এক নেসাব পরিমাণ উসুল না করা পর্যন্ত তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। নেসাব পরিমাণ ঋণ উসুল হওয়ার পর থেকে এক বছর অতিবাহিত হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) উপরোক্ত তিন প্রকার ঋণের ক্ষেত্রেই উসুলকৃত অংশ কম হোক বা বেশি হোক তার হিসাব মোতাবেক যাকাত আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব সাব্যস্ত করেছেন।

যাকাতের মাসআলাসমূহ ঃ যে মাল উসুল করা দুষ্কর ছিল তা হস্তগত হলে পূর্ববর্তী বছরগুলোর যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব হবে না। যেমন পলাতক গোলাম, হারানো মাল, লুট করে নিয়ে যাওয়া জিনিস, যার কোন সাক্ষ্য নেই, নদীতে পড়ে যাওয়া মাল, কোন মরু বিয়াবান অথবা কোন বিশাল বাড়ীতে পুঁতে রাখা সম্পদ, যার পুঁতে রাখার স্থান বিস্মৃত হয়ে গেছে, জরিমানাস্বরূপ নিয়ে যাওয়া মাল, অজ্ঞাত ব্যক্তির কাছে রাখা আমানত এবং এরূপ ঋণ, যার কোন সাক্ষ্য নেই।

কোন অভাবী ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য ঋণ যাকাতের নিয়্যতের মাফ করে দিলে, তদ্বারা যাকাত আদায় হবে না।

স্বর্ণ-রূপার যাকাতের পরিবর্তে তার মূল্য হিসাবে কোন আসবাব পত্র দিয়ে দিলে অথবা এমন কোন পণ্য দিয়ে দিলে, যা পাত্র বা বাটখারা দ্বারা মেপে লেনদেন করা হয় তবে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যদি স্বর্ণ-রূপার যাকাত স্বর্ণ-রূপা দ্বারাই প্রদান করা হয়, তবে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন তার ওজন ধর্তব্য হয়, তেমনি যাকাত আদায়ের ক্রেত্রেও তার ওজনের হিসাবই বিবেচিত হবে। আসবাব পত্রের মূল্যকে স্বর্ণ-রুপার সাথে যুক্ত করে এবং স্বর্ণের মূল্যকে রূপার সাথে যুক্ত করে হিসাব করতে হবে।

যদি বছরের শুরুতে ও শেষে যাকাতের নেসাব পূর্ণ থাকে, তবে বছরের মাঝখানে নেসাবে ঘাটটি দেখা দিলেও তাতে কোন অসুবিধা নেই। কেউ ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে কিছু পণ্যের মালিক হয়েছে, কিন্তু তা নেসাবের সমপরিমাণ নয় এবং সেই মাল ছাড়া তার কাছে অন্য কোন অতিরিক্ত মালও নেই, তবে বছরের শেষভাগে তার পণ্যের মূল্য নেসাব পরিমাণ হয়ে গেছে, এমতাবস্থায় সেই বছর উক্ত মালের যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে না।

স্বর্ণের নেসাব বিশ মিসকাল; (অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা) এবং রূপার নেসাব দশ দেরহাম, যার প্রতি দশটি দিরহামের ওজন হবে সাত মিসকাল; (অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা)।

কিছু মাল যদি নেসাবের উপর উদ্বৃত্ত হয় এবং তা নেসাবের এক পঞ্চমাংশ পরিমাণ হয় তবে সেই উদ্বৃত্ত অংশের হিসাবে তার যাকাত প্রদান করবে।

মিশ্রিত স্বর্ণ-রূপার মধ্যে যদি আসল স্বর্ণ-রূপার অংশ বেশি থাকে তবে তা খাঁটি স্বর্ণ-রূপার মতই গণ্য। জওহর ও মণি-মুক্তার কোন যাকাত নেই, তবে যদি ব্যবসায়ের নিয়্যতে এ সবের মালিক হয় তখন তা অন্যান্য ব্যবসায়িক পণ্যের মতই গণ্য হবে।

যদি কোন পাত্র-মাপা বা বাটখারা-মাপা পণ্যের এক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়, তারপর তার মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা হ্রাস হয় এবং পণ্যের মালিক উক্ত পণ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে দেয় তবে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

যদি সে উক্ত পণ্যের মূল্য থেকে যাকাত আদায় করতে চায় তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, যে দিন যাকাত ওয়াজিব হয়েছে সেদিনকার মূল্য ধর্তব্য হবে না। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দিন মানে যেদিন বছর পূর্ণ হয়েছে।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ) বলেন, যেদিন যাকাতের হকদারদেরকে যাকাত প্রদান করা হবে সেদিনকার মূল্য ধর্তব্য হবে। যে ব্যক্তি

সময় মত যাকাত আদায়ে গাফিলতি করেছে কিংবা সকল মাল দান করে দিয়েছে, তবে ইচ্ছাকৃত নষ্ট করেনি, এমন ব্যক্তিকে যাকাতের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। সুতরাং বছর পূর্ণ হওয়ার পর সকল মাল নষ্ট হয়ে গেলে যাকাত মাফ হয়ে যাবে এবং আংশিক মাল নষ্ট হলে সে হারে আংশিক যাকাতও মাফ হয়ে যাবে। আংশিক বিনষ্ট মাল যদি নেসাবের এক পঞ্চমাংশের চেয়ে কম হয় তবে যে পমিাণ যাকাত ওয়াজিব হয়েছিল তা বহাল থাকবে।

জোরজবরদস্তি করে যাকাত আদায় করা যাবে না এবং মৃত ব্যক্তি যদি তার সম্পদের যাকাত আদায় করতে অসিয়ত করে না যায় তবে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকেও যাকাত উসুল করা যাবে না। অসিয়ত করে যেয়ে থাকলে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে যাকাত আদায় করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ) যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার জন্য কৌশল অবলম্বন করাকে জায়েয বলেছেন এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এটাকে মাকরূহ সাব্যস্ত করেছেন।

যাকাতের হকদার

* অভাবী ব্যক্তি, অর্থাৎ, যার এই পরিমাণ মাল আছে যা নেসাব বা নেসাবের মূল্যের সমপরিমাণ হয় না। যদি সেই অভাবী ব্যক্তি সুস্থ ও উপার্জনে অক্ষম হয় তবুও।

* নিঃস্ব ব্যক্তি, অর্থাৎ যে কোন কিছুরই মালিক নয়।

* মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলাম।

* ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, যার কাছে ঋণের উদ্ধৃত্ত যাকাতের নেসাব পরিমাণ বা নেসাবের মূল্য পরিমাণ মাল নেই।

* আল্লাহর রাস্তায়, অর্থাৎ মুজাহিদ বাহিনী অথবা হাজীদের কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া ব্যক্তি।

*মুসাফির, যার নিজ আবাসভূমিতে সম্পদ আছে বটে, কিন্তু তার সাথে কোন মাল নেই।

* যাকাত আদায়ের কাজে সরকারের পক্ষ থেকে নিযুক্ত ব্যক্তি। এরূপ ব্যক্তি বা তার সহকারীদেরকে প্রয়োজন অনুপাতে যাকাতের মাল দেওয়া যাবে।

যাকাত প্রদানকালী ব্যক্তি উপরোক্ত সব শ্রেণীর লোককে যাকাত দিতে পারে এবং একাধিক শ্রেণীর লোক থাকা সত্ত্বেও কেবল এক শ্রেণীর লোককেও যাকাত দেওয়া জায়েয আছে।

যাদেরকে যাকাত দান করা শুদ্ধ নয়

১. কাফেরকে।

২. এরূপ সম্পদশালী ব্যক্তিকে, যে (নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদের উদ্বৃত্ত) যাকাতের নেসাব অথবা যে কোন মালের একটি নেসাবের সমপরিমাণ মূল্যের মালিক হয়।

৩. ধনী লোকের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে।

৪. বনূ হাশেম গোত্রের লোককে।

৫. বনূ হাশেম গোত্রের মুক্তিপ্রদত্ত গোলামকে।

ইমাম তহাবী (রহ) বনূ হাশেম গোত্রের লোককে যাকাত প্রদান জায়েয বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৬.-১১. যাকাত প্রদানকারীর উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন লোকদেরকে, তার স্ত্রীকে, গোলামকে, মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ ক্রীতদাসকে, তারই আংশিক মুক্তিপ্রদত্ত গোলামকে।

১২.-১৪. মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার কাজে, মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য, (কোন কাফফারা ইত্যাদিতে) মুক্ত করা হবে এরূপ কোন গোলামের মূল্য পরিশোধ করণার্থে।

যদি কেউ চিন্তা-ভাবনার পর কাউকে যাকাতের হকদার মনে করে যাকাত দিয়ে দেয় এবং পরে তার ব্যতিক্রম প্রকাশ পায়, এমতাবস্থায় যাকাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তারই ক্রীতদাস অথবা মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলাম না হয়ে থাকে তবে তার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

কাউকে যাকাতের মাল দিয়ে ধনী বানিয়ে দেওয়া মাকরূহ। অর্থাৎ কোন অভাবী ব্যক্তিকে এ পরিমাণ মাল দেওয়া,. যাতে তার ঋণ শোধ করার পর এবং তার পরিবার-পরিজনের প্রত্যেক সদস্যকে সেই মাল থেকে নেসাবের চেয়ে কম পরিমাণ মাল দিয়ে দেওয়ার পরও সেই অভাবী ব্যক্তির কাছে এক নেসাব পরিমাণ মাল উদ্বৃত্ত থেকে যায়। আর যদি এক নেসাব পরিমাণ উদ্বৃত্ত না হয় তবে মাকরূহ হবে না।

অভাবী ব্যক্তিকে এ পরিমাণ যাকাতের মাল দেওয়া মুস্তাহাব, যাতে তার পুনরায় হাত পাততে না হয়।

বছর পূর্ণ হওয়ার পর আত্মীয়, অপেক্ষাকৃত বেশি অভাবী, বেশি পরহেজগার ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে মুসলমানদের অধিকতর কল্যাণে নিয়োজিত লোকজন ব্যতীত অন্য কাউকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাতের মাল স্থানান্তরিত করা মাকরূহ।

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে একের পর এক নিকটতম দেখে যাকাত প্রদান করা, তারপর প্রতিবেশীদেরকে তারপর মহল্লাবাসীদেরকে, তারপর পেশাজীবীদেরকে, তারপর নিজ শহরবাসীকে যাকাত দেওয়া উত্তম।

শায়খ আবূ হাফ্স কাবীর (রহঃ) বলেন, যার আত্মীয়-স্বজন অভাবগ্রস্ত তার সদকা-খায়রাত কবুল হয় না, যে পর্যন্ত না সে তার অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে প্রথমে সদকা দান করে এবং তাদের প্রয়োজন পূর্ণ না করে।

যাকাত কখন কাদের ওপর ফরজ ঃ দশটি শর্ত পাওয়া গেলে যাকাত ফরজ হয।

❖ ইসলাম অর্থাৎ যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তির মুসলমান হওয়া।

❖ যাকাতদাতা আকিল অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া। জন্মগত পাগল বা আকস্মিক মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে পূর্ণ এক বছরকাল পাগল হয়ে থাকলে তার ওপর যাকাত ফরজ নয়।

❖ যাকাতদাতা বালিগ তথা পূর্ণ বয়স্ক হওয়া। নাবালকের ওপর যাকাত ফরজ নয়

❖ যাকাতদাতাকে স্বাধীন হতে হবে। ক্রীতদাসের ওপর যাকাত ফরজ নয়। কারণ তারা কখনও সম্পদের মালিক হয় না।

❖নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। (সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা সমমূল্যের সম্পদকে নিসাব বলা হয়।)

❖ সম্পদ মালিকের তত্ত্বাবধানে থাকা। অর্থাৎ মালিক হওয়ার পাশাপাশি তা তার দখলেও থাকতে হবে।

❖ নিসাব পরিমাণ সম্পদ নিত্যব্যবহার্য বস্তুর অতিরিক্ত হওয়া। পরিধানের বস্ত্র, বাসগৃহ, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদির ওপর যাকাত নেই।

❖ নিসাব পরিমাণ সম্পদ ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া।

❖ ধন-সম্পদ বর্ধিষ্ণু হওয়া অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধি বা ব্যবসার মাধ্যমে বর্ধিষ্ণু হওয়া অথবা বৃদ্ধির উপযোগী হওয়ার সুযোগ থাকা।

❖ নিসাব পরিমাণ সম্পদ বছর হিসেবে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

যে সমস্ত সম্পদের যাকাত দিতে হয় এরূপ বস্তু

* স্বর্ণ রৌপ্য ও টাকা-পয়সার যাকাত

* জমিতে উৎপন্ন শস্যের যাকাত বা ওশর।

* চারণভূমিতে প্রতিপালিত হালাল প্রাণীর যাকাত।

* ব্যবসায়ের পণ্য-দ্রব্যের যাকাত।

*খনি ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত প্রকৃতিক সম্পদের যাকাত।

* ফেতরার যাকাত।

যে সমস্ত সম্পদের যাকাত দিতে হয় না।

* যে মালের পূর্নাঙ্গ মালিকানা অর্জিত হয়নি।

* যে মালের নির্দিষ্ট কোন মালিক নেই।

* ওয়াকফকৃত জমি বা বস্তু।

* হারাম সম্পদ.(এর সবটুকুই সদকা করে দিতে হবে)

* নিসাব পরিমাণ ঋণ।

* যে সম্পদের নিসাব পূর্ণ হয়নি।

* যা বর্ধনশীল নয়।

* যে সম্পদ মৌল প্রয়োজন পূরণার্থে।

১২তম অধ্যায়

মেহমান সম্পর্কে আলোচনা

মেহমানের অধিকার

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন মেহমান আসলে তিঁনি নিজ হাতে তার আদর যত্ন করতেন।

হযরত আবু হোরায়াহ (রাঃ) বলেন আমার এ দু চক্ষু দেখেছে এবং এ দু কান শুনেছে, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে তার উচিত স্বীয় প্রতিবেশীর ইজ্জত সম্মান করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানরে ইজ্জত করে এবং তার জাযা দেয়। সাহাবাগণ আরজ করলেণ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাযা কি? তিঁনি এরশাদ করলেন, একদিন একরাত মেহমানের খেদমত করা, মেহমানদারী সাধারণত তিন দিন তিন রাত হয়ে থাকে। যদি তা বেশী হয় তবে মেহমানের জন্য তা হবে সদকাহ। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুখ হতে ভাল কথাই বের করে। অন্যথায় নীরব থাকে। (বুখারী, মুসলিম, আল আদাবুল মোফরাদ)

মেহমানদের পক্ষে কারো নিকট এত দিন অবস্থান করা। বৈধ নয় যে, মেযবান অতিষ্ট হয়ে পড়ে। (বুখারী, আল আদাবুল মোফরাদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরাশাদ করেন লোকেরা যেন দরজার বাইরে গিয়ে মেহমানকে অভ্যর্থনা জানায় এবং বিদায়ের সময় দরজা পর্যন্ত আগিয়ে দেয়। (ইবনে মাজা, বায়হাকী, মেশকাত, বোখারী)

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, দস্তরখানা বিছানোর পর সকলের খানা শেষে দস্তরখানা উঠাবার পূর্বে কেউ যেন (নিজের খানা শেষ হলেও) উঠে না পড়ে (যদি বাধ্য হয়ে এরুপ করতে হয় তবে ওজর পেশ করবে) কারণ, এভাবে উঠে গেলে সঙ্গের লোকেরা যাদের এখনও খানা শেষ হয়নি, তারাও লজ্জায় উঠে পড়বে। (বুখারী, জাদুল মায়াদ)

নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা নিজের ভাইকে প্রতিদান দাও। সাহাবাগণ আরজ বরলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কি

প্রতিদান দিব? তিঁনি এরশাদ করলেন, কেউ তার ভাইয়ের নিকট গিয়ে খানাপিনা করলে তার জন্য খায়ের ও বকরকতের দোয়া করা এটাই প্রতিদান।

(আবু দাউদ)

হযরত আবু কারীমাহ সামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, রাতে আগমনকারী মেহমানের আতিথেয়তা সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব (অর্থ্যাৎ যাদের নিকট মেহমান আসে তাদের উপর)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, ওলীমার দাওয়াত গ্রহন করা উচিত। মুসলিম শরীফের রেওয়াতে আছে ওলীমার দাওয়াত অথবা এ ধরনের অন্য দাওয়াত গ্রহন করা। (বুখারী, মুমলী, মেশকাত)

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তিকে (বিবাহ বা অন্য কোন উপলক্ষে) খানার দাওয়াত করা হয় তার উচিত সে দাওয়াত কবুল করা। সেখানে গিয়ে খাবার গ্রহণ করুক বা না করুক। (মুসলিম)

হযরত এমরান (রাঃ) বলেন, নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাসেকদের দাওয়াত কবুল করতে বারণ করেছেন। (মেশকাত)

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) বলেন, একবার নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মুখে খাবার পরিবেশন করা হল- অতপর আমাদের সামনে ও খাবার আনা হল। (আমাদের ক্ষুধা থাকা সত্বেও লৌকিকতা করে) আমরা বললাম, আমাদের প্রয়োজন নেই। রাসূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ক্ষুধাও মিথ্যাকে একত্রিত করো না।

(ইবনে মাজা ২, মেশকাত)

হযরত অহশী ইবনে হারব (রাঃ) বলেন, আমরা নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহার করি কিন্তু আমাদের পেট ভরে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা একসঙ্গে আহার কর না পৃথক পৃথক? আমরা বললাম, আমরা পৃথক পৃথক আহার করি, তিঁনি এরশাদ করলেন এক দস্তরখানে সকলে এক সঙ্গে আহার করবে এবং আহারের সময় বিসমিল্লাহ পড়বে। এতে তোমাদের আহারে বরকত হবে। (আবু দাউদ)

অতিথি আপ্যায়নে ইসলামের বিধান

অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে ইসলাম যে সব বিধি-বিধান ও দিকনির্দেশনা দিয়েছে, তার একটি বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল-

এক. মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখে, তার উচিত মেহমান ও অতিথিদের ইয্যত করা'।

(বুখারী শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯০৬, আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৬)

দুই. অতিথি আপ্যায়নে যে বিষয়টি প্রথম লক্ষ্য রাখতে হবে, তা হল দ্রুত খাবারের ব্যবস্থা ও প্রস্তুত করা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে- فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ 'অপেক্ষা না করে মেহমানদের সামনে) দ্রুত রান্নাকৃত গোছানা বাছুর (গোস্ত) হাজির করলেন।'

(সূরা হুদ ঃ আয়াত-৬৯)

সুতরাং অতিথিদের সামনে দ্রুত খাবার হাজির করা ইবরাহীমী আদর্শের বাস্তব নমূনা। একদিন একরাত পর্যন্ত মেহমানদের আতিথেয়তায় আড়ম্বরতা থাকা উচিত। আতিথেয়তা তিনদিন পর্যন্ত, এরপর মেহমানদারী করা সদকার অন্তর্ভুক্ত।

(বুখারী শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯০৬, আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫২৬)

তিন. মেহমানদের সামনে নিজে খানা হাজির করবে এবং নিজে মেহমানদের আপ্যায়ন করাবে। মাশায়েখদের অভ্যাস ছিল, কোনো আল্লাহ ওয়ালা অতিথি হয়ে আসলে, তাঁদের সামনে মাথায় খানা নিয়ে হাজির হওয়া তারা নিজের জন্য সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন।

চার. অতিথিদের সাথে আহার করার সময় এমন নিয়ত থাকতে হবে যে, আমি নিজের ভাইয়ের সহানুভূতি করছি, ইকরাম করছি। তার আতিথ্য গ্রহণের কারণে নিজেকে সৌভাগ্যশীল মনে করবে, আনন্দিত হবে। সেই সাথে জামাতবন্দীর বরকতে অংশগ্রহণের কথা স্মরণ করবে।

(ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৪)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'জামাআতের মাঝে বরকত আছে'। এটা কোনো মানবতার কথা নয় যে, মানব গোষ্ঠীর এক ভাই কারও সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে আর সে তাকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে যাবে। অথবা এক ভাই তার সামনে খাবার পেশ করেছে আর সে নফল রোযার অজুহাতে খাবার থেকে বিরত থাকবে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ হল- 'মানুষ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে নফল নামায-রোযার মর্যাদা অর্জন করতে পারে'।

পাঁচ. মেহমানের সামনে প্রথমে ফল-ফলাদী পেশ করবে, অতঃপর খাবার-দাবার। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

'এবং ফল-ফলাদী পছন্দমত বেছে নাও এবং পাখির গোশত যে পরিমাণ ইচ্ছা হয়'। (সূরা ওয়াকিআহ ঃ আয়াত-২০, ২১)

ছয়. হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) একবার হযরত সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) এবং তাঁর সাথী-সঙ্গীদের নিমন্ত্রণ জানালেন। তাঁদের জন্য তিনি পর্যাপ্ত খাবার-দাবারের আয়োজন করলেন। বিশাল খানার আয়োজন দেখে তাঁরা প্রশ্ন করলেন- 'হে আবূ ইসহাক! আপনি কি খোদাকে ভয় করেন না? এই বিশাল আয়োজন কি অপব্যয় নয়?' উত্তরে তিনি বললেন- ' মেহমানের খাদ্যে যত বড় আয়োজনই হোক না কেন, তাতে অপব্যয় হয় না'।

সাত. অতিথি আপ্যায়নের ক্ষেত্রে উপরে যা বর্ণিত হল, তা সম্পদশালীদের জন্য। যদি মেজবান দরিদ্র হন তাহলে আতিথেয়তার জন্য তার বিশাল আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই। এমন যেন না হয় যে, অতিথির আপ্যয়ন করতে গিয়ে তাকে ঋণের বোঝা বহন করতে হয় বা তার জন্য কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে নিজের বাড়ি নিমন্ত্রণ জানালে হযরত আলী (রাঃ) তিন শর্তে তার নিমন্ত্রণ কবূল করলেন। শর্ত তিনটি হল-

১. তুমি বাজার থেকে কিছু ক্রয় করতে পারবে না। ২. বাড়িতে যা আছে তা স্তুপ করতে পারবে না। অর্থাৎ, অতিরিক্ত খাবার পরিবেশন করতে পারবে না। ৩. নিজের পরিবার-পরিজনকে অতিরিক্ত কষ্টের মাঝে আবদ্ধ করতে পারবে না।

আট. হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামের একটি ঘটনা। একবার তাঁর বাড়িতে একজন মেহমান আসলে তিনি তার সামনে এক টুকরো রুটি এবং নিজের চাষাবাদের তৈরি তরকারী পেশ করে বললেন, 'এগুলো আহার কর। লৌকিকতায় আল্লাহ তাআলার লানত না হলে আমি তোমার সম্মানে লৌকিকতার আশ্রয় নিতাম'।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা যা উপস্থিত থাকত তা-ই অতি-থিদের সামনে পেশ করে দিতেন। শুকনো রুটির টুকরা, সাধারণ খেজুর মোটকথা যা হাতের নাগালে হত তাই পেশ করে দিতেন। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে

খাওয়ার জন্য প্রবেশ করল, সে চোর হিসেবে প্রবেশ এবং ডাকাত ও ছিনতাইকারী হিসাবে বের হয়ে আসল।'

(আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২.পৃষ্ঠা ৫২৫)

নয়. হযরত আয়েশা (রাঃ) আবূ ওয়ায়েল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- 'এক সঙ্গীসহ আমি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। তিনি আমাদের সামনে যবের রুটি ও এক প্রকার বিট লবণ পেশ করেন'। আমার সঙ্গী বলল, 'লবণের সাথে পুদিনার পাতা হলে মন্দ হত না'। হযরত সালমান (রাঃ) বের হয়ে গেলেন এবং লোটা বন্ধক রেখে পুদিনার পাতা নিয়ে আসলেন। আমাদের খানা শেষ হলে বন্ধুটি বলল, 'আল্লাহর প্রশংসা খাদ্য হিসেবে তিনি আমাদের জন্য যা ব্যবস্থা করেছেন, তার উপরই আমরা সন্তুষ্ট'। হযরত সালমান (রাঃ) বললেন- 'আল্লাহর ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকলে আমাকে লোটা বন্ধক দিতে হতো না।'

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, 'মেহমানের জন্য এত দীর্ঘ সময় ধরে মেজবানের বাড়ী অবস্থান করা ঠিক নয় যে, তার উপস্থিতির কারণে মেজবান অতিষ্ঠ হয়ে যায়'। (বুখারী শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৯০৬)

দশ. মেহমান মেজবানের মাঝে গভীর ও খোলামেলা সম্পর্ক হলে মেহমানের উচিত তার পছন্দ-অপছন্দের কথা মেজবানকে জানিয়ে রাখা। (মুসলিম শরীফ ঃ খণ্ড-২. পৃষ্ঠা-১৭৭)

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একবার 'জাফরানী'র অতিথি হয়ে এসেছিলেন। জুমার দিন উভয় নামায আদায় করতে রওয়ানা দিলে জাফরানী বাদীর কাছে এক টুকরা কাগজে প্রয়োজনীয় খাবারের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দেন, যেন এ অনুযায়ী সে খাবার প্রস্তুত করে রাখে।

একদিন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বাঁদীকে ডেকে তালিকাকৃত কাগজের টুকরায় নিজের পছন্দনীয় খানার একটি আইটেম যোগ করে দেন। জাফরানী দস্তরখানার উপর খাদ্যের নতুন আইটেম দেখে হতবাক হয়ে যান। বাঁদী জানায় যে, এই আইটেমটি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যোগ করে দিয়েছেন। জাফরানী বাঁদীকে বললেন- 'তালিকাটি নিয়ে আস তো দেখি।' তালিকা নিয়ে আসার পর তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর লেখা দেখে অত্যধিক আনন্দিত ও সন্তুষ্টি হয়ে বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- 'যে ব্যক্তি আপন ভ্রাতার বৈধ আকাংখা পূরণ করল, তার ক্ষমা নিশ্চিত। আর যে আপন মুমিন ভ্রাতাকে খুশী করল, সে আল্লাহ তাআলাকে খুশী করল'।

এগার. মেহমানের খাওয়া শেষ হলে নিজ হাতে তার তা ধৌত করে দেয়া উচিত।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এবং হযরত সাবিত বুনানী (রাঃ) একত্রে খেতে বসলেন। হযরত সাবিত (রাঃ)-এর দিকে হাত ধোয়ার পাত্র অগ্রসর করা হল, যেন তিনি হাত ধৌত করে নেন। তিনি হাত সংকোচন করে নিলেন। হযরত আনাস (রাঃ) বললেন, 'যদি তোমার ভাই তোমার ইকরাম ও সহানুভূতিতে এগিয়ে আসে তাহলে তার সম্মান কর এবং তুমি তা সাদরে গ্রহণ কর, ফিরিয়ে দিও না। কেননা, সে আল্লাহ তাআলার ইকরাম করছে।'

বার. খাবার শেষে মেহমানের সামনে খেলাল পেশ করা উচিত। কোনো কোনো মানুষের খেলালের তীব্র প্রয়োজন হয়। খেলাল করার মাধ্যমে দুই দাঁতের ভিতর থেকে যে খাদ্যকণা বের হয়ে আসে তা না খাওয়া উচিত। কেননা, এগুলো রোগব্যাধির কারণ হতে পারে। অবশ্য দাঁতের উপরে লেগে থাকা খাদ্যকণা খেয়ে ফেললে কোনো ক্ষতি নেই। খেলাল করার পর কুলি করে নেয়া উচিত।

তের. মেহমানের বিদায়ের সময় হলে সামর্থানুযায়ী মেহমানকে উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বিদায় কারা উচিত। এটা সম্ভব না হলে কমপক্ষে তার জুতা ঠিক করে দেয়া নিজের জন্য সৌভাগ্য ও গর্বের বিষয় মনে করা উচিত। মাস্নূন তরীকা হচ্ছে, পুরুষ মেহমানকে বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে বিদায়ী সম্ভাষণ জানানো'। (ইবনে মাজাহ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-২৪৯)

চৌদ্দ. দাওয়াত দেয়ার সময় মেজবান নিজ অন্তরে সাতটি নিয়ত করে নিবে–

১. দাওয়াতে আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুসরণ-অনুকরণের নিয়ত থাকবে।

২. সুন্নত প্রতিষ্ঠা করার নিয়ত থাকবে।

৩. নিজের ভাইয়ের সম্মান প্রদানের নিয়ত থাকবে।

৪. মুমিন ভাইয়ের অন্তর পরিতৃপ্ত ও খুশী করার নিয়তে দাওয়াত দিবে।

৫. মুমিনের অন্তরের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার নিয়তে দাওয়াত দিবে।

৬. মুমিনের সাথে সাক্ষাতের নিয়তে দাওয়াত দিবে।

৭. আল্লাহ তাআলার রেযা ও সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে দাওয়াত দিবে।

পনের. পাঁচ প্রকারের মানুষের দাওয়াত কবূল করা অনুচিত।

১. বিদআতীর দাওয়াত কবূল করা অনুচিত।

২. জালেম অত্যাচারী ও তার সহযোগীদের দাওয়াত কবূল করা অনুচিত।

৩. সুদখোরের দাওয়াত কবূল করা অনুচিত।

৪. প্রকাশ্যে ফিসকে জড়িত এমন ফাসেক ব্যক্তির দাওয়াত কবূল করা অনুচিত।

৫. যার অধিকাংশ সম্পদ হারাম উপার্জিত তার দাওয়াত কবূল করা অনুচিত। (ফাতাওয়ায়ে রশীদীয়া ঃ পৃষ্ঠা-৪৬৮)

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- 'কেবলমাত্র মুত্তাকী-পরহেযগারদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবে। (মিশকাত শরীফ ঃ পৃষ্ঠা-৩৬৯)

জালেম-অত্যাচারীদের নিমন্ত্রণ, তাদের খাবার-দাবার গ্রহণ মূলত ঃ তাদের জুলুমের সহায়তারই নামান্তর।

হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)-কে একবার তৎকালীন বাদশাহ বন্দী করে রাখেন। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ সময় তাঁকে যে খানা সরবরাহ করা হত, তা তিনি গ্রহণ করতেন না। এক নেকবখ্ত বৃদ্ধ এই অবস্থা দেখে নিজের পক্ষ থেকে হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ)-এর জন্য খানা সরবরাহ করলেন। এরপরও তিনি এই খানা গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন।

বন্দীদশা থেকে মুক্ত হওয়ার পর যখন ঐ বৃদ্ধের সাথে হযরত যুন্নুন মিসরীর সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি খাবার ফেরত দেয়ার কারণে জিজ্ঞাসা করলে হযরত জুননুন মিসরী বললেন- 'আমি অবগত ছিলাম যে খাবার তোমার বাড়ি থেকে সরবরাহ হচ্ছে, কিন্তু ঘটনা হল ঐ খানা এই জালিম বাদশাহর পাত্রে আসতো। এ কারণেই আমি সেই খানা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতাম এবং তা ফেরত পাঠাতাম'। হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে এক ব্যক্তি স্বর্ণের পাত্রে কিছু হালুয়া হাদিয়া হিসাবে পাঠাল। হযরত আলী (রাঃ) তা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠালেন এবং তিনি জানালেন, স্বর্ণের পাত্রে হালুয়া প্রেরণ করার জন্য তা গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

১৩তম অধ্যায়

মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা

বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার

খ্রীষ্টান ধর্মে নারীর অধিকার ঃ বিশিষ্ট ধর্মযাজক টায়টুলিয়ানের মতে নারী হচ্ছে শয়তানের প্রবেশদ্বার। নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহবানকারী। অন্যত্র বলা হয়েছে, নারীই সমস্ত অন্যায়ের মূল, তাদের থেকে দূরে থাকা বাঞ্ছনীয় এবং ঘর ও সমাজে যত অশান্তি সৃষ্টি হয় তা সব নারীর কারণেই হয়।

ইহুদী ধর্মে নারীর অধিকার ঃ ইহুদীধর্মে বলা হয়েছে একজন নারী অপেক্ষা পাপিষ্ঠ পুরুষ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কেননা নারী হল অপবিত্রা। সততা বলতে কোন বস্তু তাদের মধ্যে বিদ্যমান নেই। শুধু তাই নয় ইহুদী ধর্মে পিতাকে নিজ কন্যা নগদ মূল্যে বিক্রয় করার অধিকার পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পাশ্চাত্যের বহু দেশে বর্তমানের নারীদের জীবন পদ্ধতি অমানবিক। সেখানে নানাবিধ মানবেতর কাজ নারীকে দিয়ে করানো হয়। এতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে মুনীবের পক্ষ থেকে চাবুকের আঘাতও খেতে হয়।

হিন্দু ধর্মে নারীর অধিকার ঃ প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে- মৃত্যু, মড়ক, বিষ, সর্প, আগুন কোনটাই নারী অপেক্ষা মারাত্মক নয়। মনুর বিধানে বলা হয়েছে, পিতা ও স্বামীর কাছ থেকে নারীর চাওয়া-পাওয়ার কোন অধিকার সংরক্ষিত নেই। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকে চির বৈধব্যের জীবন যাপন করতে হবে। অন্যত্র ভারতীয় প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণ ঔরসে কুলীন সন্তানের আশায় শতাধিক স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণের সাথে শয্যাশায়িনী হতে পারবে। যার ফলে হিন্দু শাস্ত্রীয় ইতিহাস প্রমাণ করে, বিজয়ী নগরের তেলেগু রাজার ১২০০০ স্ত্রী ছিল, রাজা মানসিংহের ১৫০০ স্ত্রী ছিল। এগুলো হল ভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার ও জীবন পদ্ধতির আংশিক বর্ণনা যা মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ নারী জাতির জন্য প্রাপ্য অধিকার ক্ষুণ্ন করার নামান্তর। এবার ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার ঃ সৃষ্টির আদিতে এক খণ্ড মাটির অবলম্বনে জীবন লাভ করেন হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া। মানুষ সৃষ্টির ক্রম ইতিহাস সূচিত হয়েছিল তাদের এ দু'জন থেকেই। এরা ছিলেন একে অপরের সম্পূরক

সত্ত্বা। কিন্তু একথা তিক্ত হলেও সত্য যে, যুগ যুগ ধরে বিকৃত ধর্মের নিগড়ে পিষ্ট হয়ে সমাজের নারীগণ ছিল নিগৃহিত। শয়তানিয়্যাতের অনৈসর্গিক নির্যাতনে হয়ে গিয়েছিল মানুষের গণ্ডি থেকে বহিষ্কৃত। সেকালে তাদের কল্পনা করা হত মানুষের ব্যবহৃত অন্যান্য জড়পদার্থের মত, দেওয়া হত তাদেরকে জিন্দা কবর। কালক্রমে মানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হলে সমাজের এই অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত নারী শ্রেণী লাভ করে তাদের হৃত গৌরব ও ন্যায্য অধিকার। চরম অন্ধকারের বেষ্টনীতে নিমজ্জিত এই নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণে তিনিই সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের যেমন তাদের উপর অধিকার আছে, তেমনি তাদেরও তোমাদের উপর রয়েছে অনেক অধিকার। অনেক পাওয়া। পুরুষকে যেমন উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক তেমনি নারী জাতিকেও উদ্দেশ্য মূলকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। এমর্মে মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেছেন-

'হে মানব জাতি তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় কর, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক আদম থেকে আর আদম থেকে তাঁর জীবনসঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয়ের মাধ্যমে অগণিত নর-নারীকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।' শুধু এখানেই শেষ নয়, বরং ইসলাম নারীকে পর্যায়ক্রমে স্তর অনুসারে মর্যাদার সিংহাসনে সমাসীন করেছে।

প্রথমত ঃ

১। স্ত্রী হিসাবে নারীর অধিকার ও মর্যাদাঃ ইসলামপূর্ব যুগে অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায় স্ত্রীকে ভোগের পাত্র বা দাসী হিসাবে ব্যবহার করত, কিন্তু ইসলাম নারীর সমস্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে দূরে নিক্ষেপ করে নারীকে স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দান করেছে। এরশাদ হচ্ছে- 'স্ত্রীদেরও তেমনি অধিকার রয়েছে, যেমনি স্বামীদের অধিকার রয়েছে। তাদের উপর এবং তা যথাযথ পালন করতে হবে।' অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে-'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের জীবনসঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের সান্নিধ্যে (সংস্পর্শে) শান্তি পাও। হাদীসে এসেছে 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার নিজ পরিবারের কাছে উত্তম'।

২। কন্যা হিসাবে নারীর অধিকার ঃ ইসলামপূর্ব সেই বর্বর মূর্খ যুগে কন্যা সন্তানকে ঘৃণার পাত্র ও সমাজের বোঝা হিসাবে জীবন্ত কবর দেয়া হত। তাদের অন্তরের অবস্থাটা মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনের ভাষায় তুলে ধরেছেন– 'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখ কালো

হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে, তাই মহান আল্লাহ পিতাদের মনের ক্লিষ্টতা দূরীকরণে খোলা আকাশের নিচে কন্যা সন্তানের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করে ঘোষণা করলেনঃ 'জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল। মিরাস সূত্রে কন্যার অধিকার হিসাবে এরশাদ হচ্ছে-'একজন পুরুষ দু'জন মেয়ে লোকের সমান অংশ পাবে, আর যদি কন্যা সন্তান দুয়ের অধিক হয় তাহলে মোট সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ পাবে এবং যদি কন্যা সন্তান মাত্র ১ জন হয় তবে সে মোট সম্পদের অর্ধেক পাবে।' কন্যার মর্যাদা নিশ্চিতকরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন – 'যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে প্রাপ্ত বয়স্কা পর্যন্ত (সুশিক্ষা সহকারে) লালন পালন করল, কিয়ামতের দিন আমার ও তার মাঝে দূরত্ব থাকবে দুই আংগুলের মাঝে ফাঁকা সমপরিমাণ, অতঃপর আংগুল দুটি মিলিয়ে নিলেন।

৩। বোন হিসাবে নারীর মর্যাদা ঃ ইসলাম বোন হিসাবে নারীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়েছে। এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনজন বোনকে লালন-পালন করেছে এবং তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়ে নিজ পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেছে, আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

৪। শিক্ষা-দিক্ষায় নারীর অধিকার ঃ ইসলাম নারী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে, ইসলামে শিক্ষার কোন বৈষম্য নেই। হাদীসে এসেছে-'ইলমে দ্বীন অন্বেষণ করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ।' এখানে নারী-পুরুষের কোন ভেদাভেদ নেই। শিক্ষা সকলের জন্যই প্রজোয্য, তবে পর্দার মধ্যে থেকে।

৫। স্বামী নির্বচানে নারীর অধিকার ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিধবা নারী বা তালাকপ্রাপ্ত নারীকে তখনই বিবাহ দেয়া যাবে যখন সে অনুমতি প্রদান করবে। অনুরূপভাবে কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতিসাপেক্ষে বিবাহ দিতে হবে।

৬। নারীর অর্থনৈতিক অধিকার হিসাবে কুরআনে পাকে ইরশাদ হচ্ছে- 'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর দিয়ে দাও' অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- 'তোমরা তাদেরকে (বিবাহ বন্ধনের জন্য) অর্থের বিনিময়ে সম্বন্ধ করবে' এছাড়া পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদারিত্বও নারীদের ন্যায্য অর্থনৈতিক অধিকার।

৭। মা হিসাবে নারীর মর্যাদা ও অধিকার ঃ ইসলাম মা হিসাবে নারীকে যে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম বা জাতি আজ পর্যন্ত দিতে সক্ষম হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাতার মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে

বলেছেন– 'জান্নাত মায়ের পদতলে' মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছেন। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ৩০ মাস।' হাদীস শরীফে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরে মাতা সবচেয়ে সম্মান-মর্যাদা ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত।

জনৈক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আল্লাহর রাসুল (সঃ)! আমার কাছে সবচেয়ে বেশি সদ্ব্যব্যবহার পাওয়ার উপযোগী কে? জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার মাতা। লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? উত্তরে বললেন তোমার মাতা। লোকটি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মাতা। লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন তারপর কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থবার বললেন তোমার পিতা এবং পঞ্চমবারে বললেন, তোমার আপনজন-আত্মীয়স্বজন। যার দ্বারা এটাই প্রতিয়মান হয় যে, ইসলাম নারীকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে পৌছিয়েছে।

পক্ষান্তরে বর্তমান বিশ্বে নারী নির্যাতনের মানচিত্র ও তার প্রতিকার ঃ একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বর্তমান বিশ্বে আধুনিক সভ্যতা নারী জাতির মর্যাদা ও অধিকার সম্পূর্ণ রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার চাক্ষস প্রমাণ যুক্তরাষ্ট্র নিজেই। ১৯৯৩ সালে এই সভ্যদেশটিতে অবিবাহিত মেয়েদের গর্ভে ৩৩ লক্ষ শিশু সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। ১৯৯১ সালে বলপূর্বক ধর্ষিতার সংখ্যা ১লক্ষ ৭ হাজার, যাদের বয়স মাত্র ১২-১৮ বছরের মধ্যে। আর স্বেচ্ছায় ধর্ষিতার সংখ্যা যে কত তার কোন ইয়ত্তা নেই। তবে এক্ষেত্রে পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদেশ হওয়া সত্ত্বেও এসব পশুত্বের স্বভাব থেকে মুক্ত নয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের সেঞ্চুরী করতঃ বন্ধু মহলে মিষ্টি বিতরণ করে গোটা জাতীকে কলংকিত করেছে এবং দুঃখজনক হল, আজ একবিংশ শতাব্দীর শুরু অংশে নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তি আন্দোলন, নারী অধিকার এমনকি সমকামিতার অধিকার নিয়ে বিশ্বজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের মেয়েদের মত আমাদের দেশের মেয়েরাও রংঢংয়ে সেজেগুজে হোটেল-, রেস্তোরায় অফিস- আদালতে, হাটে-বাজারে, পার্কে-সিনেমায় এমন কি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যন্ত উলঙ্গ-অর্ধ উলঙ্গ হয়ে পর্দাহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার পরিণাম হচ্ছে ভয়াবহ যৌন কেলেংকারী। অথচ ইসলামের

বিধান হল ঃ 'নারীরা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিম্নগামী রাখে অতপর যৌনাঙ্গের হিফাজত করে এবং স্বামী ছাড়া পর পুরুষকে যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করায়।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খ ও বর্বর যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।'

প্রিয় পাঠক বন্ধুরা! উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলাম নারীকে যথেষ্ট মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। যা অন্য কোন জাতি বা ধর্ম এবং পৃথিবীর কোন মানব রচিত আইন আজ পর্যন্ত নারী জাতিকে দিতে পারেনি এবং পারবেও না।

অতএব নারী জাতির কাছে আরজ থাকবে যে, তারা যেন তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন। আল্লাহপাক সকলকে তৌফিক দান করুন। আমিন।

নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় নববী শিক্ষার মহান অবদান

নতুন-পুরাতন সকল জাহেলী সমাজ ব্যবস্থা এবং জাহেলিয়াতের ঝাণ্ডাবাহি সকল জাতি নারীর প্রতি যে অন্যায় ও অবিচার বিধিবদ্ধ করেছে, সমাজের অন্য কোন শ্রেণীর প্রতি তা করা হয়নি। বিভিন্ন জাতি মানব সমাজের এই দুর্বল শ্রেণীর লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হল, যে ভয়াবহ ও অমানবিক জুলুম এই জাতির প্রতি পাশ্চাত্য-সভ্যতা করেছে, অন্য কোন জাতি বা সভ্যতার ইতিহাসে তার নজির পাওয়া যায় না। এ নিপীড়ন এই দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি মর্মন্তুদ যে, খোদ নারী জাতিও এই জুলুম ও অবিচারের অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভাবছে আমাদের প্রতি ইনসাফ করা হচ্ছে। নারী স্বাধীনতার প্রতারণাপূর্ণ শ্লোগান শুনিয়ে তাদের নিশ্চিত করা হয়েছে যে, আমাদের অধিকার সংরক্ষিত হচ্ছে এবং আমাদের মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

অথচ পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী যা পেয়েছে তা হল, তাদেরকে সম্মানজনক নিরাপদ আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে জীবন-যাত্রা নির্বাহের দুর্বহ বোঝা তাদের অশক্ত কাঁধেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বাইরের পৃথিবীর যত নিম্নমানের কাজ আছে তা তাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়েছে। উপরন্তু এই সম্মান দেওয়া হয়েছে যে, ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা ব্যবসা চমকানোর জন্য 'সেলসগার্ল' ও

'মডেলগার্ল' হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে এবং পণ্যের গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে বাজারে, মার্কেটে, প্রকাশ্যে জনসমক্ষে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। ফলে নারীজাতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের 'শো পিস' এবং পুরুষের ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার একটি উপাদেয় মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। নিজের নারিত্ব, সতীত্ব, মর্যাদা ও পবিত্রতা এবং অন্যান্য অধিকারসমূহ বিসর্জন দিয়ে পাশ্চত্য সভ্যতা থেকে পাওয়া অমানবিক অবিচার এবং মর্মান্তিক লাঞ্ছনাকেই আমাদের মুসলমান নারীরা নিজেদের সম্মান মনে করছে। পাশ্চাত্যের প্রতারণার ইতিহাস যাদের জানা নেই তাদের জাষ্টিস মাওলানা মুহাম্মদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর 'হামারে আয়েলী মাসায়েল' ৬৭-৬৪ এবং 'ইসলাহী খুতুবাত' ১/১২৭-১৬১ পড়া উচিত।

এই মুহূর্তে কোন দীর্ঘ বা তুলনামূলক আলোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই এবং এখানে এর প্রয়োজনও নেই। এখানে আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, নারী জাতির অধিকারসমূহ নিরূপণ এবং তাদের যথাযথ মান-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও নির্দেশনারই মহৎ অবদান। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও তাঁর পবিত্র জীবন-চরিতের আলোকে নারী জাতির মান ও মর্যাদা কী, তাঁদের দায়িত্ব ও অধিকারসমূহ কী, শরীয়তে মুহাম্মাদিয়ার বদৌলতে নারী জাতি কী সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছে এবং নববী আদর্শ অবলম্বন করে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ কীভাবে নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত সুসজ্জিত করেছেন-এসব বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় ছোটবড় অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। এখানে আমি শুধু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের কিছু অমূল্য বাণী উল্লেখ করব। এতে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের কিছুটা আলোকপাত হবে।

১. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ 'নিঃসন্দেহে নারীগণ পুরুষদেরই মত।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৬; জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৩)

এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, মান-সম্মান, গৌরব-মর্যাদা, দায়িত্ব ও অধিকার ইত্যাদি সকল বিষয়েই নারীজাতি পুরুষের সাথে শরীক। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া শরীয়তের বিধি-বিধান উভয় শ্রেণীর জন্য একই। যেসব বিধানে তারতম্য রয়েছে তা উভয় শ্রেণীর খালেক ও মালেক মহান রাব্বুল আলামীনের আদেশ অনুসারেই হয়েছে। যার অসংখ্য হেকমতের মধ্যে একটি হল, নারীর সৃষ্টি রহস্য, স্বভাব ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, সতীত্ব ও পবিত্রতা এবং সম্মান ও

মর্যাদার ব্যাপারে পূর্ণ সচেতনতা এবং এর হেফাযত। অন্যথায় আদম সন্তান হওয়া, মুসলমান হওয়া এবং সমাজের অংশ হওয়ার দিক থেকে সব ধরনের অধিকারে মহিলাদের শরীক রাখা হয়েছে। শুধু নারী হওয়ার কারণে তাকে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। আর তা কীভাবেই বা সম্ভব! ইসলামের দৃষ্টিতে নাউযুবিল্লাহ নারী জন্ম কোন অপরাধ নয়; বরং নারী আল্লাহ তাআলার কাছে তেমনই মর্যাদাবান যেমন পুরুষ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّٰهِ اَتْقَاكُمْ "তোমাদের মধ্যে যে অধিক পরহেযগার সেই আল্লাহর নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত।" সূরা হুজুরাত

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

اِنِّىْ لَا اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

"আমি তোমাদের মধ্যকার কোন আমলকারীর আমল- সে পুরুষ হোক বা নারী, বিফল করি না।" (সূরা আলে ইমরান ১৯৫)

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেন, "জাহেলী যুগে আমরা নারীকে কোন বস্তু বলেই গণ্য করতাম না। কিন্তু যখন ইসলাম এসেছে এবং আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে মহিলাদের আলোচনা করেছেন তখন বুঝতে পেরেছি, আমাদের উপর মহিলাদের তেমনই অধিকার রয়েছে, যেমন তাদের উপর আমাদের।" – সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৪৩

২. অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

"ঈমানের দিক থেকে পূর্ণাঙ্গতম মুমিন সেই যার ব্যবহার ও চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে তারাই সর্বোত্তম, যাদের ব্যবহার তাদের স্ত্রীদের প্রতি সর্বোত্তম।" –জামে তিরমিযী, হাদীস ১১৬২

আরো ইরশাদ করেছেন-

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِىْ

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারাই যারা তাদের পরিবারের জন্য সর্বোত্তম।"

(জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৮৯৫)

৩. অন্য এক হাদীসে ইরশাদ করেন–

لايفرك مؤمنة إن كره منها خلقا

"কোন মুমিন যেন কোন মুমিন নারীর ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ না করে। তার একটি অভ্যাস পছন্দ না হলে অপর আরেকটি অভ্যাস পছন্দ হবে।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৬৯/৬৩)

এই হাদীসে স্বামীকে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, স্ত্রীর কোন আচরণ বা কোন অভ্যাস পছন্দ না হলে মন খারাপ করবে না; বরং এ কথা স্মরণ করবে যে, তার মধ্যে কোন না কোন ভাল গুণ তো অবশ্যই আছে। সুতরাং সেসব গুণের প্রতি লক্ষ করে ধৈর্যধারণ করা উচিত এবং তার সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিত।

৪. এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন-

مَاحَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟

"আমাদের উপর স্ত্রীদের কী হক রয়েছে?

জবাবে ইরশাদ করলেন –

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

"অর্থাৎ তুমি যেমন খাও, পান কর তাকেও তোমন খাওয়াবে ও পান করাবে। তার মুখে চড় মারবে না, তাকে মন্দ বলবে না এবং শাস্তিমূলকভাবে তাকে ঘর থেকে বহিষ্কার করবে না।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২১৪২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১৯৫০৯)

৫. বিদায় হজ্বে বিশেষভাবে মহিলাদের অধিকার আদায়ের তাকীদ করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন –

وَاتَّقُوا اللّٰهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللّٰهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللّٰهِ

"তোমরা নারীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর (তাদের ব্যাপারে আমার নির্দেশ গ্রহণ কর; তারা তোমাদের অধীন রয়েছে।) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারে তাদেরকে নিজেদের সাহচর্যে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর আইন অনুসারেই তারা তোমাদের জন্য হালাল হয়েছে। (অতএব আল্লাহর অঙ্গীকার এবং তাঁর আইনের প্রতি লক্ষ রেখে তাদের অধিকারসমূহ প্রদান কর।)"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২১৮/১৪৭)

৬. অপর হাদীসে ইরশাদ করেছে –

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ أو اختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فِيهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

"যার তিনটি কন্যা বা তিনজন বোন আছে অথবা দুইটি কন্য বা দুইজন বোন আছে এবং সে তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, সে জান্নাত লাভ করবে।"

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস ১০৯৯১; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৬; সহীহ ইবনে হিব্বান হাদীস ৪৪৬)

আরো ইরশাদ করেছেন–

مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ

"অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাকে কন্যা সন্তান দান করেছেন সে যদি তাদের লালন-পালন ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে ধৈর্য ও সবর করে তবে তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।" –জামে তিরমিযী হাদীস ১৯১৩

৭. মায়ের হকসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে এও বলা হয়েছে যে,

اَلْزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا

"তার সাথে থাক (এবং খেদমত কর।) কেননা জান্নাত তার পদতলে রয়েছে।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৫১১০; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৩১০৪)

মোট কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতির প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যাপারে আলাদা আলাদাভাবে পুরষদের সাবধান করেছেন এবং প্রত্যেকের হক সমূহ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান থাকার তাকীদপূর্ণ আদেশ করেছেন। পাশাপাশি নারীদেরকেও আদেশ করেছেন তারা যেন তাদের দায়িত্বসমূহ যথাযথ ভাবে আদায় করে।

পাশ্চাত্যের অনেক অমুসলিম পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অবদান এবং তাঁর নির্দেশনাসমূহের এই প্রভাবের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। তাদের সবার বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। নমুনাস্বরূপ শুধু তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করা হল ঃ

১. বিশিষ্ট স্কলার মশিয়েঁ রিফিল ইসলামের পর্দা বিধানের প্রশংসা করে তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখেন, "যদি আমরা ইসলামের পয়গাম্বরের যুগে ফিরে যাই

তবে দেখব, নারীর জন্য যে উপকারী বিধানসমূহ ইসলামের পয়গাম্বর জারি করেছেন তা আর কেউ করেননি নারীর প্রতি তাঁর অনেক অবদান আছে। কুরআনে নারীর অধিকারের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত রয়েছে। কোন কোন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছ যে, নারীকে কোন ধরনের ভোগ্য কাজে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কেনা কোন আয়াতে বলা হয়েছে, কী সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণভাবে তাদের সাথে আচরণ করা উচিত। (মাকালাতে শিবলী ১/১৫২-১৫৩)

২. মিস্টার হেয়ার কার্পেন্টস বলেন, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেভাবে নারীর অধিকার রক্ষা করেছেন, আর কেউ তা করেননি। তিনি তার আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার দরুন সে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ পেয়েছে এবং বোরকা পরিহিতা মুসলিম নারী জীবনের প্রত্যেক শাখায় এত অধিকার লাভ করেছে যে, আজ এই বিংশ শতাব্দীতে একজন উচ্চশিক্ষিত খৃষ্টান রমণীও তা থেকে বঞ্চিত।"

(ফারান, সীরাত সংখ্যা, জানুয়ারি)

৩. ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রতি যে বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে স্যার জন বেগট তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীজাতির প্রতি যেসব বিধি-বিধান আরোপ করেছেন তা নীতি-নৈতিকতামূলক, তাতে তুচ্ছতা, কঠোরতা বা নির্দয়তার কোন দিক নেই। এর বিপরীতে তিনি সর্বদা নারীদের সাথে উত্তম আচরণের আদেশ করেছেন এবং তাদের বিষয়গুলো মানুষের সামনে যথাযথ তুলে ধরার জন্য তাদের ওকালতি করেছেন।"

অপর এক স্থানে জনবেগট বলেন, "বাস্তব সত্য হল, তিনি নারীর প্রতি বিধি নিষেধ আরোপ করেছেন তাতে কঠোরতা নেই বরং তাতে নারী জাতির জন্য অনেক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।" –মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৩১-৩৩২-৪১৫ অনুবাদ The Life And Times Of Muhammad, খাওয়াতীন কি ইসলামী যিন্দেগী কে সাইনসী হাকায়েক, হাকীম মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ চুগতাঈ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন; মুসলিম নারীদেরকে তাদের মান-মর্যাদা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা নসীব করুন এবং পুরুষদেরকে তাদের হকসমূহের গুরুত্ব অনুধাবন করার এবং তা যথাযথভাবে আদায় করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইসলামে নারীর সম্মান ও মর্যাদা

ইসলাম পূর্ব জাহিলিয়্যাতের যুগে জাযীরাতুল আরবসহ গোটা বিশ্বে ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠানে, বিচার কার্যে, আইন-আদালতে, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী জাতির কোন কথা বা কাজের কোন মূল্য ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল না; বরং নারী সত্তাটাকেই তারা পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, বংশের জন্য কলঙ্ক, অপমান ও অভিশাপ মনে করত। তাই তারা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে, জীবন্ত কবরে পুঁতে, অথবা গভীর কুপে নিক্ষেপ করে কিংবা লোকালয়ের অদূরে পাথর দিয়ে মাথা থেতলিয়ে হত্যা করত। আবার কেউ কেউ শিশুকালেই কন্যা সন্তান বিক্রি করে দিত। আর যারা বেঁচে থাকত, তাদেরকে সমাজের মোড়লরা, সামর্থবানরা, জমিদাররা উপপত্নি, দাসী, গনিকা ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করত। অস্বীকার করলে চালানো হত তাদের উপর জুলূম, নির্যাতন ও নিপীড়নের ষ্টীম রোলার।

বিশ্বের বুকে ইসলামের নবী, নারী মুক্তির অগ্রদূত রূপে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবির্ভূত হওয়ার পর নারী জাতি পেল তার লুপ্ত সম্মান, মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা। ধর্ম-কর্ম সর্বক্ষেত্রে নারীর প্রতিটি কাজ-কর্ম ও কথাকে মূল্যায়ন করা হল। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিকির, ফিকির, তিলাওয়াত এমনকি জিহাদের ময়দানেও তাদেরকে পুরুষদের সমপরিমাণ ছাওয়াব দেয়া হল। শুধু কি তাই? বরং সাংসারিক কাজ-কর্ম, যেমন-রান্না-বান্না, ঘর গোছানো, ঘর সাজানো, সন্তান গর্ভে ধারণ, অতঃপর জন্ম দান ও স্তন্য দান, সন্তান লালন-পালন, সন্তানের জন্য রাত্রি জাগরণ, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বীয় সতীত্ব এবং স্বামীর ধন-সম্পদ সংরক্ষণ সহ প্রতিটি কাজের বিনিময়ে নারী জাতি পুরুষের তুলনায় অধিক ছাওয়াবের অধিকারী হল। নারী সমাজ যথাযথ মর্যাদা প্রাপ্ত হল।

ফলে যে নারীকে বলা হত কলঙ্কিনী, সে নারী হল অঢেল মর্যাদার অধিকারীণী। যে নারীকে বলা হত অনর্থের মূল, সে হল সৌভাগ্যের ফুল।

নারী জাতি যে আকর্ষণীয় নিয়ামত, তার বহু বর্ণনা পবিত্র হাদীস শরীফে পাওয়া যায়, যেমন-হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

حُبِّبَ اِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِى الصَّلَاةِ

"এই পৃথিবীর (সামগ্রী) থেকে আমার প্রিয় বানানো হয়েছে নারী ও সুগন্ধি এবং নামাযের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে।" (নাসায়ী শরীফ)

ইসলামে দ্বীনদার নারীর অপরিসীম ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিভীষিকাময় কিয়ামত দিবস নিঃসন্দেহে একটি মহা আতঙ্ক দিবস-যা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। সে দিনের ভয়াবহতা যদি সমগ্র বিশ্ববাসী সম্মিলিতভাবেও উপলব্ধি করতে চায়, তবু তারা অক্ষম থাকবে। সে ভয়াবহ দিনে সমস্ত আদম সন্তান হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। নির্দিষ্ট একটি ঘাঁটিতে আল্লাহর নির্দেশে কিছু মুখমন্ডলকে উজ্জ্বল ও শুভ্র করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমন্ডলকে গাঢ় কালো করে দেয়া হবে। অন্য এক ঘাঁটিতে এসে সকল মুমিন ও কাফিরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দেখা যাবে না। সেদিন পুণ্যবান পুরুষ এবং পূণ্যবতী নারীদের মাঝে বিপদ সঙ্কুল অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘাঁটিসমূহ পার হওয়ার জন্য নুর বন্টন করা হবে। একমাত্র পূণ্যবান পুরুষ ও পূণ্যবতী নারীরা এ নূর প্রাপ্ত হবে। যেমন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰى
لَكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

অর্থ ঃ "স্মরণীয় সেদিন, যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে, তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটাছুটি করবে। (তাদেরকে) বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য অনন্ত অসীম আনন্দময় জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরা হাদীদ ঃ ১২)

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহাপ্রলয় তথা মহাসঙ্কটের সময় শুধু পুরুষরাই নূরের অধিকারী হবে, তা নয়, বরং পূণ্যবতী নারীরাও সেই নূরের অধিকারী হবে। এটা যে নারী জাতির ফযীলতের প্রমাণ বহন করে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দ্বীনদার - ধার্মিকা নারীদের ফযীলত সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ

"এ বিশ্বভূমন্ডল পুরোটাই ভোগ সম্ভার ও আনন্দ উল্লাসের সামগ্রী। তন্মধ্যে সর্বোত্তম সামগ্রী হল নেক ও সৎকর্ম পরায়ণ নারী।" (মুসলিম)

অন্য একটি হাদীস হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ قَالَ نِسَاءُ الدُّنْيَا اَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ كَفَضْلِ الظِّهَارَةِ عَلَى الْبِطَانَةِ

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুনিয়ার (দ্বীনদার) নারীগণ কি আনতনয়না হুরদের চেয়ে উত্তম? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ার (দ্বীনদার) নারীগণ সুন্দরী হুরদের চেয়েও উত্তম, যেমন কাপড়ের উপরের পিঠ ভিতরের পিঠ থেকে উত্তম।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০ ঃ ২৭৭)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ-শাদীতে দ্বীনদার নারী নির্বাচিত করার তাকিদ দিয়েছেন এবং তাকে আল্লাহর অনুদান বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতে এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَاَةً صَالِحَةً فَقَدْ اَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِى الشَّطْرِ الْبَاقِىْ

"আল্লাহ যাকে নেককার দ্বীনদার স্ত্রী দান করেছেন, তাকে অর্ধেক দ্বীন দ্বারা সাহায্য করেছেন। এখন তার কর্তব্য হলো-সে "তাক্বওয়া" (খোদাভীরুতা) দ্বারা বাকী দ্বীন অর্জন করুক। (কানযুল উম্মাল ১৬ ঃ ২৭৩)

তাফসীরে বাগাভীতে নেককার স্ত্রীর ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ فِىْ تَفْسِيْرِ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وفِى الدُّنْيَا حَسَنَةً اِمْرَاَةً صَالِحَةً وَفِى الْاٰخِرَةِ الْجَنَّةَ والحور العين

হযরত আলী (রাঃ) পবিত্র কুরআনের আয়াত رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, الاخرة حسنة এর অর্থ- পৃথিবীতে নেক স্ত্রী এবং وفى الاخرة এর অর্থ- জান্নাত এবং তথায় অবস্থিত পবিত্র নারী অর্থাৎ আনত নয়না সুন্দরী হুরগণ। (তাফসীরে বাগাভী, ১ ঃ ১৭৭)

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হতে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

اَلزَّوْجَةُ الْمُوَاتِيَةُ عَوْنُ الرَّجُلِ عَلٰى دِيْنِهٖ

"নেককার ও ফরমাবরদার নারী প্রকৃতপক্ষে স্বামীর ধর্ম-কর্মে সাহায্যকারীণী।" (ফিরদাউস, ১ ঃ ৩০১)

দ্বীনদার নারীর ফযীলত সম্পর্কে আরও একটি হাদীস ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْءَةَ لِدِيْنِهَا وَجَمَالِهَا كَانَ فِيْهَا سَدًّا مِنْ غَوْرٍ

"যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তার দ্বীনদারী ও সৌন্দর্যের ভিত্তিতে বিবাহ করে, তাহলে সে নিজের ধ্বংসের পথে প্রতিবন্ধক-প্রাচীর নির্মাণ করল।" (ফিরদাউস ১ ঃ ২৯৪)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ خَيْرًا لَهٗ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ اِنْ اَمَرَهَا اَطَاعَتْهُ وَاِنْ نَظَرَ اِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَاِنْ اَقْسَمَ عَلَيْهَا اَبَرَّتْهُ وَاِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْ فِىْ نَفْسِهَا وَمَالِهٖ

"মুমিন বান্দা খোদাভীরুতা অর্জনের পর নিজের জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু যা সে নির্বাচন করে, তা হল-নেকবখত স্ত্রী। যার গুণ এমন যে, স্বামী যখন তাকে কোন কাজের আদেশ দেয়, তখন তা পূর্ণ করে। যখন স্বামী তার পানে তাকায়, তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়। আর যদি তার ব্যাপারে কোন শপথ করে, তা পূর্ণ করতে স্বামীকে সহযোগিতা করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদের হিফাজত করে।" (ইবনে মাজাহ)

বিশ্ব ভূমন্ডলে ইসলাম ধর্মে নারী জাতিকে যে ফযীলত ও মর্যাদা দান করা হয়েছে, তা অন্য কোন ধর্মে বা মতবাদে দান করা হয়নি। ইসলাম শুধু নারী সত্তাটাকেই মূল্যায়ন করেনি, বরং পুরুষদের মত নারীদের জন্য নামায, রোযা, দান, সদক্বাহ ইত্যাদির বিনিময়ে সুন্দর আনন্দময় জীবন এবং অনন্ত অসীম কাল অবস্থানের অনিন্দ্য বাগিচা বেহেশতের শুভ সংবাদ দান করেছে। এটাও নারী জাতির জন্য বড় সৌভাগ্য ও ফযীলতের বিষয়। মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"যে ব্যক্তি নেক আমল করবে, চাই পুরুষ হোক বা নারী হোক, যদি ঈমানদার হয়, তাকে আমি দুনিয়াতে প্রশান্তির যিন্দেগী দান করব এবং পরকালে তাদের আমলের উত্তম প্রতিদানে তাদেরকে পুরস্কৃত করব।" (সূরা নাহ্‌ল, ৯৭)

অনুরূপ বিষয়বস্তু সূরা নিসায়ও উল্লেখ আছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا

"যে কেউ পুরুষ কিংবা নারী কোন সৎকর্ম করে এবং (আল্লাহতে) বিশ্বাসী হয়, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রাপ্য তিল পরিমাণও নষ্ট করা হবে না।" (সূরা নিসা ঃ ১২৫)

পবিত্র কুরআনের "সূরাতুল ফাতহ" এ মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا

"যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরকাল থাকবে। এবং যাতে তিনি (আল্লাহ) তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে তাদের প্রাপ্য মহাসাফল্য।" (সূরা আল-ফাতহ, ৫)

উল্লেখিত আয়াত সমূহ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, নামায, রোযা তথা সৎকাজে, নেক কাজে একমাত্র পুরুষরা-ই ফযীলতপ্রাপ্ত সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হবে তা নয়, বরং প্রত্যেকটি নেক কাজে পুরুষদের মত নারীরাও ফযীলতের অধিকারী। তারাও হবে মহাসাফল্যের জান্নাতের গর্বিত মালিক।

দ্বীনদার, সৎকর্মশীলা ও নেককার নারীদের ফযীলত আরো বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হাদীস শরীফে আছে ঃ

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ رَجُلٍ غَيْرِ عَمَلٍ صَالِحٍ

হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নেক ও সৎকর্ম পরায়ণ একজন মহিলা এক হাজার বে-আমল পুরুষ হতে উত্তম।"

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

اَلَا دَمِيَّاتُ اَفْضَلُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ بِسَبْعِيْنَ اَلْفَ ضِعْفٍ

"নিশ্চয় পৃথিবীর নেকবখত নারীগণ জান্নাতের মধ্যে সত্তর হাজার আনত নয়না রূপসী হুরদের চেয়েও উত্তম হবে।" (আত তাযকিরা ঃ ৫৫৬)

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে এ বিষয়ভিত্তিক একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

اِنَّ اَسْرَعَ اُمَّتِىْ لُحُوْقًا فِى الْجَنَّةِ امْرَاَةٌ مِّنْ اَحْمَسَ

"জান্নাতে প্রবেশের সময় সবচেয়ে অগ্রগামী ঐ সমস্ত মহিলাগণ হবেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে অগ্রগামীনী।" (আহমদ, ২ ঃ ৬৬)

এই জাতীয় একটি হাদীস তাবরানী গ্রন্থে ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللهَ كَتَبَ الْغَيْرَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ فَمَنْ صَبَرَ مِنْهُنَّ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا كَانَ لَهَا مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা নারীদের উপর সতীত্ব সংরক্ষণবোধ ফরয করেছেন। যেমন, পুরুষদের উপর জেহাদ ফরয করেছেন। অতঃপর তাদের মধ্যে যে ঈমান ও ছাওয়াবের আশায় (সতীত্ব রক্ষা করতঃ) ধৈর্য্য ধারণ করবে, সে শহীদের ছাওয়াব পাবে।" (কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪০৭)

আদ-দুররুল মানসুর গ্রন্থে অপর একটি হাদীস হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

اَلْمَرْاَةُ الصَّالِحَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِثْلُ التَّاجِ الْمَخُوْصِ بِالذَّهَبِ عَلَى رَاْسِ الْمَلِكِ وَالْمَرْاَةُ السَّوْءُ عِنْدَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِثْلُ الْحِمْلِ الثَّقِيْلِ عَلَى الرَّجُلِ الْكَبِيْرِ

"নেককার মহিলা নেককার পুরুষের বিবাহ বন্ধনে এমন, যেমন বাদশাহর মাথায় মূল্যবান পাথর খচিত তাজমুকুট। আর নেককার লোকের বিবাহ বন্ধনে বদকার মহিলা এমন যেমন বৃদ্ধ লোকের মাথায় ভারী বোঝা।"

(দুররুল মানসুর ২ ঃ ১৫২)

দ্বীনদার নারীর ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে তাবরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ فِى النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُرَابِ الْاَعْصَمِ الَّذِىْ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ بَيْضَاءُ

"মহিলাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণ নেককার মহিলার উপমা সাদা পা বিশিষ্ট কাকের মত। (অর্থাৎ সাদা পা বিশিষ্ট কাকের সংখ্যা যেমন কম, তেমনিভাবে সৎকর্ম পরায়ণ নেককার মহিলাদের সংখ্যাও কম।)"(কানযুল উম্মাল, ১৬ঃ৪০৯)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

يَا مَعْشَرَ النِّسْوَانِ اِنَّ خَيْرَكُنَّ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ خِيَارِ الرِّجَالِ فَيُغْسَلْنَ وَيُطَيَّبْنَ فَيُدْفَعْنَ اِلٰى اَزْوَاجِهِنَّ عَلٰى بَرَاذِيْنَ الْحُمْرِ وَالصُّفْرِ مَعَهُنَّ الْوِلْدَانُ كَاَنَّهُنَّ اللُّؤْلُؤُ الْمَنْثُوْرُ

"হে নারী জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা নেককার, তারা নেককার পুরুষদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে গোসল দিয়ে খুশবু মাখিয়ে নিজ নিজ স্বামীর নিকট অর্পণ করা হবে। তখন তারা লাল ও হলুদ বর্ণের বাহনের উপর উপবিষ্ট থাকবে। তাদের সাথে ছড়িয়ে থাকা মুক্তার মত কচি কচি শিশুরা পরিবেষ্টিত থাকবে। (কানযুল উম্মাল, ১৬ ঃ ৪১২)

সচ্চরিত্রব নারী সম্পর্কিত একটি বাণী হযরত উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন ঃ

اَلنِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ اِمْرَاَةٌ عَفِيْفَةٌ مُسْلِمَةٌ هَيِّنَةٌ لَيِّنَةٌ وَدُوْدٌ وَلُوْدٌ تُعِيْنُ اَهْلَهَا وَقَلِيْلٌ مَا تَجِدُهَا وَامْرَاَةٌ وِعَاءٌ لَمْ تَزِدْ عَلٰى اَنْ تَلِدَ الْوَلَدَ وَثَلَاثَةٌ غِلٌّ وَقُمَّلٌ يَجْعَلُهَا اللهُ فِىْ عُنُقِ مَنْ يَشَاءُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ

"নারী জাতি তিন প্রকার ঃ (১) ঐ নারী, যে সচ্চরিত্রা, বাধ্যগত, প্রফুল্লমনা, কোমলহৃদয়, অধিক মুহাব্বতকারীণী, অধিক সন্তান প্রসবকারীণী, সর্বাবস্থায় স্বীয় স্বামী ও পরিবারের সকলের প্রতি দয়াময়ী। কিন্তু এমন মহিলা কম পাওয়া যায়।

(২) দ্বিতীয় ঐ নারী, যে পাত্রের মত (যাতে জিনিষ রাখা হয় এবং বের করা হয়) অর্থাৎ অধিক সন্তান জন্ম দেয়ার উপযুক্ত নয়। (৩) ঐ মহিলা, যে ধোকাবাজ, দাগাবাজ। আল্লাহ যাকে চান, তার উপর এমন দুরাচার মহিলা চাপিয়ে দেন। আর যাকে চান, তার উপর থেকে হটিয়ে দেন।" (কানযুল উম্মাল, ১৬ঃ ২৬৩)

এভাবে নারী জাতির অসংখ্য ফজীলত ও মর্যাদার বর্ণনা হাদীস শরীফে রয়েছে। বলা বাহুল্য, ইসলামই নারী জাতিকে উচ্চ মর্যাদার যথার্থ মূল্যায়নে অধিকার প্রাপ্তা ও সম্মানিতা করেছে।

আলকুরআনে নারী

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

"যে সৎকর্ম করে, পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়, তাহলে আমি তাকে এক উৎকৃষ্ট জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে দেব প্রাপ্য পুরস্কার, তাদের উত্তম কাজের কারণে, যা তারা করত।" –সূরা নাহ্‌ল ৯৭

আল্লামা উসমানী রহ. বলেন, 'উপরোক্ত আয়াতে সমস্ত সৎকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মূলনীতি বলা হয়েছে। যার সারকথা এই যে, যেকোন নরনারী সৎকার্যে অভ্যস্ত হবে এবং সেটা শুধু বাহ্যিক নয়, বাস্তবেও অর্থাৎ তার ভেতরে ঈমান ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের প্রাণও নিহিত থাকে, আমি অবশ্যই তাকে পবিত্র, উৎকৃষ্ট ও সুখের জীবন দান করব। দুনিয়ায় হালাল রুজি, পরিতুষ্টি, হৃদয়ের ঐশ্বর্য, স্বস্তি ও প্রশান্তি, আল্লাহর যিকিরের স্বাদ, তাঁর প্রেমের আনন্দ, বন্দেগীর দায়িত্ব-কর্তব্য আদায়ের সুখ, সার্থক ভবিষ্যতের আশা ইত্যাদি তার নসীব হবে। সেই সঙ্গে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের পরম মজা সে আস্বাদন করবে। সত্যই বটে اَهْلُ اللَّيْلِ فِىْ لَيْلِهِمْ اَلَذُّ مِنْ اَهْلِ اللَّهْوِ فِىْ لَهْوِهِمْ 'রাত জাগরণকারীদের কাছে রাত জাগরণ এত বেশি মজাদার যে, ক্রীড়ামোদীদের ক্রীড়ার আনন্দ এর কাছে তুচ্ছ।

এজন্যই এক বুযুর্গ বলেন, 'রাজা-বাদশাহ্‌রা যদি জানত, রাত জাগরণকারীরা রাত জাগরণে কী আনন্দ ও সম্পদ লাভ করে, তাতে তা কেড়ে নেওয়ার জন্য তারা রাজ্য-জয়ের মত সেনাভিযান চালাত। মোটকথা অনুগত মুমিনের পবিত্র ও সুখময় জীবন এখান থেকেই শুরু হয়ে যায়। কবরে যাওয়ার পর এর ঔজ্জ্বল্য আরো বেড়ে যায়। এ পবিত্র জীবনের চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে জান্নাত, যে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

حَيَاةٌ بِلَا مَوْتٍ وَغِنًى بِلَا فَقْرٍ وَصِحَّةٌ بِلَا سُقْمٍ وَمُلْكٌ بِلَا هَلَكٍ وَسَعَادَةٌ بِلَا شَقَاوَةٍ

"মৃত্যুহীন জীবন, অভাবমুক্ত ঐশ্বর্য, নীরোগ স্বাস্থ্য, পতনহীন রাজত্ব এবং এমন সৌভাগ্য, যার পর আর নেই দুঃখ-দুর্দশা।" আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরও তা দান করুন। (তাফসীরে উসমানী ২/৬১২, অনূদিত ই.ফা.বা.)

আখেরাতে পরম সাফল্য লাভের পাশাপাশি দুনিয়াতে 'হায়াতে তায়্যিবা' বা উৎকৃষ্ট জীবনের যে প্রতিশ্রুতি মহান রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন, তা নারী-পুরুষ সবার জন্যই অবারিত। যথাযথ দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকেই তা লাভ করতে পারে। প্রত্যেকেরই রয়েছে এই সুন্দর জীবন লাভ করার যোগ্যতা; প্রয়োজন শুধু সৎকর্ম সম্পাদনের।

আল্লামা উসমানী রহ. বলেন, "এ আয়াতে ঘোষিত হয়েছে যে, কুরআনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর পুণ্য ও সাফল্যের একই নিয়ম। অর্থাৎ নর-নারী নির্বিশেষে সবাই নিজ অবস্থা অনুযায়ী পুণ্যার্জন করে পবিত্র জীবনের অধিকারী হতে পারে।" (তাফসীরে উসমানী ২/৬১২)

আগের জাহেলী যুগসমূহে ও জাহেলী মতবাদসমূহে নারীর হীনতার যে ধারণা প্রচলিত ছিল তার খণ্ডন যেমন এ আয়াতে রয়েছে; অনুরূপ নব্য জাহেলিয়াত যদি কখনো পৃথিবীকে এই ধারণার দিকে নিয়ে যেতে চায় যে, নারী নয় পুরুষই প্রকৃতিগতভাবে হীন ও নিকৃষ্ট, তবে তার খণ্ডনের জন্যও এই আয়াত যথেষ্ট হবে। (তাফসীরে মাজেদী ২/৮৩০)

হাদীস শরীফে নারী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ ؟ قَالَ : أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : أُمُّكَ قَالَ : ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ : أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ أَبُوْكَ

"হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল আমার উত্তম আচরণের সর্বাধিক উপযুক্ত কে? নবীজী উত্তরে বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কে? নবীজী উত্তরে পুনরায় বললেন,

তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? নবীজী এবারও বললেন, তোমার মা। চতুর্থবারে প্রশ্নের পর নবীজী বললেন, তোমার পিতা।" –

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯৭১;সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৪৮)

পিতা-মাতা উভয়ের যত্নে একজন শিশু ধীরে ধীরে বড় হয়। তাই পবিত্র কুরআনে ও হাদীস শরীফে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার ও উত্তম আচরণের আদেশ করা হয়েছে। বিশেষ করে 'মা' হলেন সন্তানের সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার ও উপযুক্ত। কেননা সন্তানের ব্যাপারে তিনিই সর্বাধিক কষ্ট ভোগ করে থাকেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত সন্তানকে গর্ভেধারণ করা; এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যে অসহনীয় কষ্ট তিনি সহ্য করেন তা বর্ণনাতীত। এরপর মা শিশুকে দুধপান করান। এসব কষ্ট একমাত্র 'মা'-ই ভোগ করেন। তাই সন্তানের উত্তম আচরণের তিনিই সবচেয়ে বেশি হকদার।

ইসলম মায়ের এই স্বাভাবিক ও ন্যায্য অধিকারকে নিশ্চিত করেছে। উপরোক্ত হাদীসে ইসলামের সুবিচার ও ন্যায়-নিষ্ঠার অনুপম প্রকাশ ঘটেছে।

১৪তম অধ্যায়

মহিলাদের বিশেষ নছীহাত

মহিলাদের জান্নাতে যাওয়ার সহজ উপায়

আল্লাহ তা'আলা গঠন-বৈচিত্র্যের দিক থেকে মহিলাদেরকে পুরুষদের চেয়ে ভিন্ন করে সৃষ্টি করেছেন। তুলনামূলকভাবে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল। একজন সুস্থ ও সবল পুরুষের গায়ে যে পরিমাণ শক্তি ও সামর্থ থাকে, একজন মহিলার শরীরে সে পরিমাণ শক্তি বা সামর্থ্য থাকে না। একজন পুরুষের যে পরিমাণ সহ্য ও ধৈর্য্য ক্ষমতা আছে একজন মহিলার সে পরিমাণ নেই। একজন পুরুষ যে পরিমাণ দৃঢ়চিত্তের অধিকারী হয় একজন নারী সে পরিমাণ হয় না। একজন পুরুষের যে পরিমাণ সাহস থাকে, একজন নারীর সে পরিমাণ থাকে না। একজন পুরুষ যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ভারী কাজ করতে পারে, একজন মহিলা তা করতে পারে না। কারণ আল্লাহ পাক সৃষ্টির সময়ই পুরুষ ও মহিলাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ ও মহিলা যেহেতু শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্টের অধিকারী, তাই তাদের কর্মক্ষেত্রেও কাজের প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন। একজন পুরুষের উপর যেসব কাজ করার দায়িত্ব রয়েছে, একজন মহিলার উপর তা নেই। আবার একজন মহিলার উপর যেসব পার্থিব কাজ-কর্মের দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে; একজন পুরুষের উপর তা নেই।

আল্লাহ পাক স্রষ্টা হিসেবে প্রত্যেককেই তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতানুসারে কর্ম ও দায়িত্ব বণ্টন করে দিয়েছেন। তাই প্রত্যেকেরই উচিত নিজ নিজ সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে নিজ নিজ কর্ম সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করা এবং একের কর্মে অপরের হস্তক্ষেপ না করা। উল্লেখ্য যে, যদিও আল্লাহপাক নারী ও পুরুষকে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন তবুও মর্যাদার ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন তারতম্য নেই। সাধারণতঃ নারী-পুরুষ উভয়ই আল্লাহর নিকট সমান। সে ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত (সে পুরুষ হোক বা নারী) যে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সদা সচেষ্ট এবং ভয়ে ভীত। নারীরা যেহেতু তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে পুরুষের চেয়ে দুর্বল, তাই তাদের পার্থিব জীবনের দায়িত্ব এবং কর্তব্য কর্ম, ইবাদত-বন্দেগী ও কর্ম এবং তাদের বেহেশতে যাওয়ার রাস্তা সহজ। পক্ষান্তরে পুরুষরা যেমন শক্তি, সাহস, দৃঢ়তা,

সহ্য-ক্ষমতা ইত্যাদির বেশী অধিকারী, তেমনি তাদের উপর আল্লাহ প্রদত্ত দায়ীত্ব-কর্তব্যও বেশি। বিশেষ করে সংসার পরিচালনার জন্য জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পুরষকেই করতে হয়। ফলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ঝামেলায় তাদেরকে জড়াতে হয়। কিন্তু মহিলারা সাধারণত ঃ এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত এবং অনিচ্ছকৃতভাবেই এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন গুনাহ থেকে মুক্ত। মহিলারা যেহেতু পরিবার বহির্ভূত কোন কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত নয় এবং তা তাদের আবশ্যিক দায়িত্বও নয়। তাই বিশেষ কয়েকটি কাজ যদি তাঁরা খোদাভীতি ও দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পাদন করে, তাহলে আল্লাহর রহমতে তাঁরা সহজেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

মহিলাদের সহজে জান্নাতে যাওয়ার আমলগুলো নিম্নরূপ

নামায ঃ নাময পুরুষ-মহিলা সকলের উপর ফরজে আইন। পুরুষদের মত মহিলাদেরকেও পঁচ ওয়াক্ত নামায যথারীতি পড়তে হবে। নামায কারো জন্য ক্ষমা নেই। নারীরা পর্দার আঁড়ালে থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম মুতাবেক পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। নামাযই মুসলমানের প্রধান পরিচয়। নামায ত্যাগ করে মুসলমানিত্ব যেমন দাবী করা যায় না, তেমনি বেহেশতে যাওয়ার আশাও করা যায় না। নামায মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য সুচিত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন "যে নামায ত্যাগ করল, সে যেন কুফরী করল।" হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন- "নামায দ্বীনের স্তম্ভ এবং অন্যত্র বলেন, "নামায হল বেহেশতের চাবি।

মোট কথা, কোন অবস্থাতেই নামায ত্যাগ করা যাবে না। তবে আল্লাহ পাক মহিলাদের জন্য বিশেষ কিছু সময়ে নামায মাফ করে দিয়েছেন। যেমন-হায়েজ ও নেফাস চলাকালীন সময়। আর এটি হল নারীদের প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ।

রোযা ঃ নামাযের ন্যায় রোযাও একটি ফরজ ইবাদত। প্রত্যেক সুস্থ ও বালেগ নর-নারীকেই রমযানের একমাস রোযা রাখতে হবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "রোযা (আত্মরক্ষার) ঢাল স্বরূপ।" রোযা মানুষকে অন্যায়, অপরাধ ও অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আর এসব কাজ থেকে বাঁচার অর্থ হল জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "মেয়েরা যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে,

রমযানে রোযা রাখবে, নিজের গুপ্তস্থানকে হেফাজত করবে এবং স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে তখন সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে।" (তাবারানী)

নামায যেমন মহিলাদের হায়েজ ও নেফাসের সময় মাফ হয়ে যায়, রোযা তেমন মাফ হয় না। হায়েজ ও নেফাসকালীন সময়ের পরিবর্তে অন্য সময় রোযা রাখতে হবে এবং উক্ত রোযা ক্বাযা হিসেবে গণ্য হবে। অন্যথায় আল্লাহর আযাব থেকে সে রেহাই পাবে না।

হজ ঃ হজ পুরুষদের মত মহিলাদের উপরও ফরজ হয়। শারীরিকভাবে সুস্থ, আর্থিকভাবে সচ্ছল ও সামর্থ্যবান পুরুষের উপর যেমন হজ ফরজ, অনুরূপ আর্থিক ও শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান নারীর উপরও ফরজ। নারী হোক বা পুরুষ হোক কারো পক্ষে কোন ফরজ ইবাদত এড়ানো যাবে না। মহিলাদের হজ করতে হলে স্বামী, পুত্র, পিতা, অথবা কোন মাহরাম পুরষকে অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

যাকাত ঃ যাকাতও হজের মত আর্থিক সামর্থ্যের সাথে জড়িত। আর্থিক সামার্থ্যবান কোন বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন নারী বা পুরুষের উপর যাকাত ফরয হয়। এক চন্দ্র বছরান্তে নিসাবের মালিক পুরুষ বা মহিলাকে অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। যাকাতের নিসাব হল সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা তার কোনটির সমপরিমাণ মূল্যের ব্যবসায়িক মাল অথবা টাকা। যেসব মুসলিম নারী উল্লেখিত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য ব্যবহার করেন, তাদেরকে চন্দ্রের মাস হিসেবে পূর্ণ এক বছর পর বাজার মূল্য হিসাবে করে শতকরা ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে।

পর্দা ঃ উপরের আনুষ্ঠানিক ফরজ ইবাদতগুলোর সাথে সাথে পর্দা করাও নারীদের উপর ফরজ। পর্দালঙ্ঘন করে কারো পক্ষে বেহেশতে যাওয়া সম্ভব নয়। পর্দা হল লজ্জা-সম্ভ্রম শালীনতা ও সতীত্ব সংরক্ষণের উপায়। পর্দাহীন নারীর সতীত্বের কোন গ্যারান্টি নেই। তাই নারীর মূল সম্পদ সতীত্ব সংরক্ষণের জন্য পর্দা আবশ্যক। কারণ, কোন মহিলা যখন পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে তখন শয়তান তাকে পর পুরুষের মাধ্যমে তার সতীত্ব নষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে পর্দাহীনা নারী তাঁর সতীত্ব এবং মান-ইজ্জত হারিয়ে সমাজে ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। মহিলাদের পর্দা মান্য করার কারণে মহিলা-পুরুষ উভয়ই যিনা-ব্যভিচার ও অশ্লীল কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তোমরা যিনার নিকটেও যেও না। নিশ্চয়ই ইহা অশ্লীল কাজ।" (সুরা বনী ইসরাঈল) পর্দা লঙ্ঘনজনিত কারণে বহু নারীকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের রাত্রে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি অবস্থায় দেখে এসেছেন। পর্দার ব্যাপারে কিছু ইসলামে বিদ্বেষী লোক বিভিন্ন ধরনের অপব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বলেন; ইসলাম পর্দার কথা বলে মহিলাদেরকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রেখেছে। মূলত ঃ তাদের কথাটি ঠিক নয়। ইসলাম যদিও মহিলাদের জন্য ঘরকেই অধিকতর উপযুক্ত জায়গা বলে মনে করে, তবুও বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যেতে অনুমতিও প্রদান করে। মূলত ঃ পর্দার মূল কথা হল, মহিলারা তাদের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সম্বোধন করে গোটা মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লা পাক ইরশাদ করেন, "হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তাঁরা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে সহজে চেনা যাবে না ফলে তাদের কেউ উত্যক্ত হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

(সূরা আহযাব, আয়াত-৫৯)

দুঃখজনক ব্যাপার হল, আমাদের সমাজে অনেক ধর্মভীরু মহিলা রয়েছেন, যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রমযানের রোযাসহ বিভিন্ন ধরনের নফল ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন; কিন্তু পর্দার প্রতি গুরুত্ব দেন না। বিশেষ করে অনেকে ইসলামী পর্দাকে বিকৃত করত মনগড়া পর্দা বিধান পালন করে থাকে যেমন মুখ খুলে বা চোখ খুলে ফ্যাশন করে বোরকা পরিধান ইত্যাদি মূলত এসকল পর্দা নারীর সৌন্দর্য গোপনের উদ্দেশ্যে পালন করা হয় না বরং তা প্রদর্শণীর উদ্দেশ্যেই করা হয়ে থাকে। যা সম্পূর্ণ না জায়েয। তাদের কর্মতৎপরতায় মনে হয় পর্দা করা একটা ঐচ্ছিক ব্যাপার। কিন্তু মূলতঃ মহিলাদের প্রথম ও প্রধান কাজই হল পর্দা মেনে চলা।

স্বামীর খেদমত ঃ একজন স্বামীর প্রথম ও প্রধান সাথী হল তার স্ত্রী। স্ত্রীর উপর স্বামী বিরাট অংশে নির্ভরশীল। আবার স্বামীর অস্তিত্বের উপর স্ত্রীর অস্তিত্বও নির্ভরশীল। স্বামীর দায়িত্ব হল, রুজি-রোজগার করা এবং স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। স্বামী যেহেতু রুজি-রোজগারের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করেন তাই তার মনমেযাজ সব সময় ভাল নাও থাকতে পারে। স্ত্রীর উচিত স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়ি ফিরলে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে, আদরের সাথে হাঁসিমুখে তাঁকে বরণ করে নেয়া এবং তাঁর বৈধ আদেশ নিষেধ আনন্দ চিত্তে পালন করা। স্বামী যে স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ পাকও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। স্বামীর আনুগত্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যদি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করতে বলতাম, তাহলে স্ত্রীকে বলতাম তাঁর স্বামীকে সেজদা করতে।" মোটকথা, একজন নেককার স্ত্রী

সার্বক্ষণিকই তাঁর স্বামীকে সেজদা করত।" মোটকথা, একজন নেককার স্ত্রী সার্বক্ষণিকই তাঁর স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়।

সতীত্বের সংরক্ষণ ঃ নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল তাঁর সতীত্ব। যতদিন সতীত্ব আছে, ততদিন সমাজে ও আল্লাহর কাছে তাঁর মূল্য আছে। অসৎ মহিলা যেমন সমাজে ঘৃণার পাত্রী ও মূল্যহীন তেমনি আল্লাহর নিকটও তার জন্য জাহান্নাম সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী, নম্র, যারা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয় না। যারা যাকাত প্রদান করে এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে তারাই উত্তরাধিকারী। তাঁরা উত্তরাধিকারী লাভ করবে ফেরদাউসের (শীতল ছায়াময় উদ্যান) তাঁরা তাতে চিরকাল থাকবে।" (সূরা মুমিনুন' ২-১১)

পরিবারের সকলের সাথে ভাল ব্যবহার ঃ পরিবারের সকল সদস্যদের সাথে ভাল ব্যবহার, স্বামী সন্তানদেরকে সৎকাজের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করাও একজন নেককার পুণ্যবান মহিলার কাজ। একজন ধার্মিক মহিলা অবশ্যই পরিবারের সকল সদস্যসহ প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং গীবত-শেকায়েত ও চোগলখোরী থেকে নিজেকে হেফাজত করবে।

কিয়ামতের দিন যেসব কারণে বেশীর ভাগ নারী জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে সেগুলো নিম্নে প্রদত্ত হল।

ইমাম যাহাবী (রহ.) তাঁর "কিতাবুল কাবায়ের" নামক গ্রন্থে নারীদের জাহান্নামে যাওয়ার ছয়টি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লেখ করেন। একদা হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখতে পান। হযরত আলী (রাঃ) রাসূকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী ! আপনার কান্নার কারণ কি? উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- মি'রাজের রাত্রে আমি আমার উম্মতের নারীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের ভয়ংকর ও কঠিন আজাবে নিপতিত দেখেছি। সেটা স্মরণ করে আমি কাঁদছি। হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর বিবরণ জানতে চাইলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

১। আমি জাহান্নামে এক নারীকে তাঁর মাথার চুল দ্বারা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছি। তখন তাঁর মাথার মগজ ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ করছিল।

২। জাহান্নামে এক নারীকে তাঁর জিহ্বা দ্বারা ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি। অর্থাৎ জিহ্বা টেনে বের করে সমস্ত শরীরের ওজন জিহ্বার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

৩। এক নারীকে স্তনে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।

৪। এক নারীকে তাঁর পা যুগল বক্ষে এবং হস্তদ্বয় ললাটে আবদ্ধাবস্থায় জাহান্নামে শাস্তিরত দেখতে পেয়েছি।

৫। এক নারীকে মুখমণ্ডল শূকরের ন্যায় এবং শরীরের বাকী অংশ গাধার ন্যায় দেখতে পেয়েছি। সে অসংখ্য সর্প দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

৬। এক নারীকে জাহান্নামে কুকুরের আকৃতিতে দেখতে পেয়েছি। যার মুখ গহ্বর দিয়ে জাহান্নামের আগুন প্রবেশ করে মলদ্বার দিয়ে বের হচ্ছিল এবং জাহান্নামের ফেরেশতাগণ তাঁকে কঠোরভাবে প্রহার করছিল। হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত জিবরাইল (আঃ) কে উল্লিখিত মহিলাদের শাস্তির কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারেন, ১ম নারীর শাস্তির কারণ হল, বেপর্দাভাবে চলাফেরা করা। ২য় নারীরা শাস্তির কারণ হল, কথাবার্তায় অসংযত হওয়া। ৩য় নারীর শাস্তির কারণ হল, পর পুরুষের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা। ৪র্থ নারীর শাস্তির কারণ হল ইবাদতে অনীহা প্রকাশ করা। অর্থাৎ ঠিকমত পবিত্র হয়ে ইবাদত-বন্দেগী না করা। ৫ম নারীর শাস্তির কারণ হল, পর নিন্দা ও মিথ্যা কথা বলা এবং গীবত করা। ৬ষ্ঠ নারীর শাস্তির কারণ হল, হিংসা করা ও খোটা দেয়া।"

উক্ত ছয়টি অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থেকে উল্লিখিত কর্মগুলো ঠিকমত সম্পাদন করলে আল্লাহ পাক মহিলাদের ছোট-খাটো গুনাহসমূহ মাফ করে দিয়ে তাদের বেহেশতে যাওয়ার পথ সুগম করে দিবেন।

স্বামীর মন জয় করার পদ্ধতি

প্রাণপ্রিয় স্বামীকে একান্ত আপন বানানোর জন্য স্বামীর সাথে ভালবাসার পদ্ধতি শিক্ষা করা আদর্শ নববধুর কর্তব্য। স্বামী যতই রাগী, জেদী, একরোখা, বদমেজাজী, বে-ওকুফ ও আওয়ারা হোক না কেন, তাকে সৎ বানাবার চাবিকাঠি স্ত্রীর হাতেই। অসংখ্য দৃষ্টান্ত এমন রয়েছে যে, স্ত্রীর প্রচেষ্টায় স্বামীর সংশোধন হয়েছে। সংসার ত্যাগি বা সংসারবিমুখ স্বামীকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারীণী, ধৈর্য ধারণকারীণী স্ত্রীর সংখ্যা কম নয়। স্বামীর অন্তরকে করায়ত্ব করার জন্য স্ত্রী প্রয়োজনে তার দাসীর ভূমিকা পালন করবে। তার ভুল-ত্রুটি ও বক্রতা দূর করার নিমিত্তে সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাবে। তাকে দ্বীনী পরিবেশে জীবন গঠনের জন্য দাওয়াত ও তাবলীগে প্রেরণ করাব। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একত্রে বসে হাদীসের তা'লিমের ব্যবস্থা করবে। মাসআলা-মাসায়িলের কথা

স্বামীকে শোনাবে। যে কাজে স্বামী সন্তুষ্ট হয়, সে কাজ করবে। হৃদঁয়ের গভীরতা দিয়ে এবং নির্মলভাবে একনিষ্ঠ হয়ে স্বামীর সেবা-শুশ্রুষা করবে। তখন দেখবে, স্বামী একদিন না একদিন বধুর অধীনস্থ হয়ে যাবে। যে স্ত্রী আপন স্বামীকে মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে ভালবাসবে, সে স্বামীর ক্ষমতা হবে না স্ত্রীকে ফেলে অন্যের পিছনে হন্যে হয়ে ঘুরঘুর করার। স্বামীর মন জয় করার আরো উল্লেখযোগ্য কৌশল হচ্ছে স্ত্রীকে দাম্পত্যিক কর্তব্য পালন করতে হবে। অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে প্রেম-ভালবাসার আহ্বানের মাধ্যমে প্রাণপ্রিয় স্বামীর অন্তরকে স্ত্রীর জিতে নিতে হবে। স্ত্রী গৃহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকারী সামগ্রীসমূহকে যথাস্থানে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখবে। নিজ পূত-পবিত্র প্রেমমাখা মনোহণী দৃষ্টি একমাত্র স্বামীর উপরই নিবদ্ধ রাখবে। স্বামী গৃহে প্রবেশের সময় হাস্যোজ্জ্বল কপাল দ্বারা স্বামীকে অভ্যর্থনা জানাবে। তার সাথে ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্কের পরিবর্তে তার অধীনস্থতা ও আনুগত্যকে প্রাধ্যন্য দিবে। দাম্পত্য জীবনকে সফলকাম বানাতে এ সোনালী মূলনীতিসমূহের প্রতি নববধুর পূর্ণ ধ্যান ও মনোযোগ রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী পারস্পরিক মতবিরোধে লিপ্ত, যে গৃহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুহাব্বত নেই, প্রেম নেই, সহমর্মিতা নেই, সহানুভূতি নেই, যে ঘরে ভালবাসার আহবান উচ্চারিত হয় না, যেখানে মহিলা কর্কশভাষীণী হয় অথবা স্বামীকে বলে-"আমি আমার মুখ এদিকে ফিরিয়ে নাও," সেখানে সুখ-শান্তি ও আনন্দ-উল্লাসের সুমধুর সুর কিভাবে বাজতে পারে? এমতাবস্থায় পিয়ার মুহাব্বতের দাম্পত্য কামনা কিভাবে সজীবতা লাভ করতে পারে?

সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের বন্ধন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট হতে হবে। কারণ, নারী-পুরুষের দাম্পত্য বন্ধন তো আল্লাহ প্রদত্ত বন্ধন। এ বন্ধন তো ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বাঁধা হয়েছে। এ বন্ধনকে যেন এত দুর্বল মনে করা না হয় যে, সামান্য নাড়াচাড়া বা মামুলী টানা-হেঁচড়াতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। নারী যখন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে, তখন তারই বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করা চাই। এ বন্ধনকে দৃঢ়তর, মজবুত ও শক্তিশালী করার রজ্জু স্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। স্বামী মহারাজার অন্তরের সাথে স্বীয় অন্তরের বন্ধনকে দৃঢ় করার মাধ্যমে স্ত্রী তার হৃদয় রাজ্যের রাণী হতে পারে। এ নশ্বর পৃথিবীকে নারী ইচ্ছা করলে জান্নাত বানাতে পারে। তাই স্ত্রী স্বীয় স্বামীর পদতলে স্বীয় তন্ত, মন, ধন উৎসর্গিত করবে। তার সুখে সুখী এবং তার দুঃখে দুঃখী হবে। তবেই প্রম-মুহাব্বতের বন্ধন মজবুত হবে।

স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের বন্ধন হাট-বাজারের সওদা নয় যে, ফেরিওয়ালাদের থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রেম-ভালবাসার পথে বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্কের সাথে প্রত্যেককেই সব কিছু বিসর্জন দিতে হবে। এতেই তাদের ভালবাসা অটুট হবে।

স্বামীর পছন্দনীয় বিষয়াদি জেনে নিতে হবে

স্বামীর উপর বিজয় অর্জনের নিমিত্ত স্ত্রীর জন্য আবশ্যক এই যে, নিজের মধ্যে এমন গুণ সৃষ্টি করতে হবে যা-স্বামী পছন্দ করেন। স্বামীকে কোন পন্থায় সন্তুষ্ট করা যাবে? কেমন কাজকর্মে তিনি সন্তুষ্ট হবেন? কেমন কাজ তার পছন্দনীয়? সেগুলো সম্পর্কে অবগত হওয়া নববধুর কর্তব্য। স্বামী কেমন খাদ্য পছন্দ করেন, কেমন সাজ-গোছ ভালবাসেন, কেশ পরিচর্যার কোন ডিজাইন তার ভাল লাগে, কেমন ফ্যাশন তার প্রিয়, তার মনের চাহিদা কেমন এবং কেমন গুণ তাকে আকৃষ্ট করে, এসব কিছু নববধুর অন্তরে গেঁথে নিতে হবে। স্বামীকে অসন্তুষ্ট রেখে সুখী সংসার কল্পনা করা ভুল। "স্বামীর সুখেই স্ত্রীর সুখ" এ কথা নববধুকে বিস্মৃত হলে চলবে না। এসব নীতিমালাকে হৃদয়ে জমিয়ে সে অনুযায়ী স্ত্রী স্বামীর সহিত জীবন যাপন করবে। তাহলে মনে হবে-এই ভবে তার মত সুখী কেউ নেই।

স্বামী সুখী তখনই হবে-যখন স্ত্রী তার জীবন পথের পছন্দনীয় সফরসঙ্গীনী গণ্য হবে এবং সর্বদা মনেপ্রাণে তাকেই ভাববে, কামনা করবে। জ্ঞানে-গুণেই স্ত্রী স্বামীকে দেওয়ানা বানাতে পারবে। অনেক পুরুষকে তার সুন্দরী স্ত্রীকে ঘরে রেখে প্রতিবেশী মহিলাদের সাথে আড্ডা জমাতে দেখা গেছে। এর হেতু কি? স্বামীকে আকৃষ্ট করে দেওয়ানা বানানোর জন্য উচ্চ শিক্ষা, ধন-দৌলত, গাড়ী-বাড়ী আর নয়ন ঝলকানো রূপ-লাবণ্য ও সৌন্দর্যের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় গুণ আর জ্ঞানের। এর সাথে রূপ-লাবণ্য থাকলে তো সোনায় সোহাগা। অনেক পুরুষ লোক ঘরে সুন্দরী বউ থাকতে বন্ধুর স্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকে। তার চাল-চলন, আচার-আচারণ তার কাছে খুব ভাল লাগে। মূল্যবান পরিচ্ছদ আর দামী অলংকারে অলংকৃত সুন্দরী স্ত্রীও তার নিকট আকর্ষণীয় মনে হয় না। কী এর কারণ? এর কারণ হল, স্ত্রীর কর্তব্য পালনে অবহেলা এবং স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা। স্বামীকে কিভাবে করায়ত্ত করা যায়, তার হৃদয়কে কী দিয়ে জয় করা যায়, এর ত্বরীকা-পদ্ধতি ও দিক-নির্দেশনা সম্পর্কে অনেক মেয়েরা-বধুরা অনবগত। তাই স্বামীর হৃদয় জয় করার নিয়ম-পদ্ধতিসমূহ অবগত হওয়া প্রতিটি স্ত্রীর জন্য আবশ্যক।

মহিলাদের বোরকা পরিধান করে মার্কেটে যাওয়া

মহিলাদের স্বীয় দ্বীনদারী টিকিয়ে রাখার জন্য অর্থাৎ, দুনিয়া ও আখিরাতে সুউচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তাদের কর্তব্য হলো সর্বদা গৃহাভ্যন্তরে থাকা, বাইরে না যাওয়া। তবে একান্ত প্রয়োজনে মাহরামের সাথে, পর্দার সাথে বাইরে যাওয়ার অনুমতি আছে।

মহিলাদের শুধুমাত্র জিনিসপত্র পছন্দ করার জন্য স্বীয় স্বামীর সাথে মার্কেটে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। কেননা, প্রথমতঃ শরীয়াত মহিললাদেরকে যে প্রয়োজন বা ঠেকার ভিত্তিতে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে এটা সে প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। কারণ, যাওয়ার বা ঠেকার অর্থ এমন জরুরত হওয়া যে জরুরতে বাড়ীর বাইরে বের না হলে বিশেষ অসুবিধা বা অস্বাভাবিক ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। শুধু পর্দা করলেই বা বোরকা পরলেই মহিলাদের বাইরে যাওয়া জায়িয হয় না; বরং প্রথমে বিশেষ জরুরত সাব্যস্ত হতে হবে, তারপর পর্দা সহকারে বের হওয়া জায়িয হবে।

দ্বিতীয় ঃ স্ত্রীর নিজের পক্ষ থেকে জিনিস পছন্দ করাটা স্বামীর প্রতি পূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস না থাকার পরিচয় বহন করে। কারণ লেবাস-পোষাক দ্বারা একমাত্র স্বামীকে খুশী করাই স্ত্রীর কাম্য। সুতরাং, যাকে খুশী করা উদ্দেশ্য তিনি নিজের পছন্দমত কিনবেন এটাই তো যুক্তিযুক্ত। তাই স্ত্রীর এ ধরনের আচরণ থেকে দূরে থাকা একান্ত কর্তব্য। তাইতো কুরআনে কারীমে মহিলাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৩)

এমনিভাবে হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু এর ইন্তেকালের পরে হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত থাকতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করতেন। অন্য এক হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করো না, তবে তাদের জন্য তাদের ঘরে নামায পড়াটাই উত্তম। এ হাদীসদ্বয়ের সমন্বয়ে ফুকাহায়ে কিরাম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর তথা সাহাবায়ে কেরামের যামানাই ফিতনার আশঙ্কায় মহিলাদেরকে মসজিদে গমনে নিষেধ করে দেয়া হয়। বলা বাহুল্য, বর্তমান যামানার পরিস্থিতির সাথে আর সাহাবীগণের স্বর্ণযুগের পরিস্থিতির সাথে কোন তুলনা করা যায় না। অর্থৎ, এর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। আর যখন সেই সাহাবায়ে কিরামের যামানায়

সামান্যতম ফিতনার আশঙ্কায় মহিলাদেরকে মসজিদে এসে নামায পড়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। সেখানে বর্তমান ফিতনার যামানায় কি করে একজন মহিলার জন্য মার্কেটে যাওয়া বৈধ হতে পারে? চাই সে একা যাক বা স্বামীকে নিয়ে যাক। কেননা, শোনা যায় অনেক সময় স্বামী বা মাহরাম থাকা অবস্থায়ও অনেক মহিলার বিপদে পড়তে হয়েছে।

তাছাড়া মহিলা স্বামীর সাথে বোরকা পরিধান করে মার্কেটে গেলে যদিও তার সৌন্দর্য কোন বেগানা পুরুষ দেখতে পারবে না। কিন্তু সে তো একটি অযথা কাজ করতে গিয়ে নিজে কোন পুরুষকে দেখবে। আর এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁর পত্নিদ্বয় তথা উম্মে সালামা ও মাইমুনা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন। হঠাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে কামতুম (অন্ধ) সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট আগমন করলেন; তাই তিনি স্বীয় স্ত্রীদ্বয়কে তার থেকে পর্দা করতে বললেন। তখন স্ত্রীগণ বললেন, আগন্তুক তো অন্ধ, সে কিভাবে আমাদেরকে দেখবে? তাদের কথার প্রতিউত্তরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরাও কি অন্ধ? (তোমরা কি তাকে দেখবে না? সেটা কি তোমাদের জন্য বৈধ হবে?) অতএব সকল মহিলার জন্য এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। উল্লেখ্য, মহিলাদের মুখমণ্ডল ও হাত সতরের মধ্যে শামিল। সুতরাং, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও সমস্ত শরীর এবং চেহারা ঢেকে হাত মোজা ও পা মোজা পরিধান করে বের হওয়া কর্তব্য।

(সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩, আবু দাউদ শরীফ-১ঃ৮৪, মিশকাত শরীফ-২৬৯, ফাতওয়া রাহীমিয়া, ১ঃ ৩০, মা'আরিফুল কুরআন, ৭ ঃ ১৩৪, ২০৮, ২১৭)

১৫তম অধ্যায়

পর্দা ও মহিলাদের বিশেষ আলোচনা

পুরুষ এবং নারী কার কার সাথে দেখা দিতে পারবে

পুরুষ নিম্নবর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা করতে পারবে-

১। মা

২। দাদী, নানী ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমাণু মহিলাগণ।

৩। সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন।

৪। আপন মেয়েছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান ও ছেলেসন্তানদের স্ত্রী।

৫। যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে, তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান। স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী ও বৈপিত্রেয় বোন।

৮। ভাতিজী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

৯। ভাগ্নি, অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

১০। দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন যে কোন কন্যা সন্তান ও দুধ সম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

১১। দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু মহিলাগণ।

১২। দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

১৩। যৌনশক্তিহীন এমন বৃদ্ধা যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

১৪। অপ্রাপ্তবয়স্কা এমন মেয়ে যার প্রতি পুরুষের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না।

উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত কোন পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেও জায়িয নয়। বরং সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম।

মহিলাগণ নিম্নবর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষের সাথে দেখা করতে পারবেন -

১। বাপ, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু পুরুষগণ।

২। সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৩। শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু পুরুষগণ।

৪। আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানদের স্বামী।

৫। স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।

৬। ভাতিজা, ভাগিনা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই ও বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

৭। আপন চাচা অর্থাৎ, বাপের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৮। আপন মামা অর্থাৎ, মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

৯। দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

১০। দুধ সম্পর্কীয় বাপ, চাচা, মামা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন ক্রমানু পুরুষগণ।

১১। দুধ সম্পর্কীয় ভাই দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

১২। দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

১৩। যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। তার প্রতি মহিলাদেরও কোন আকর্ষণ নাই।

১৪। অপ্রাপ্তবয়স্ক এমন বালক যার মাঝে এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতীত কোন মহিলার জন্য অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেও জায়িয নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয ও হারাম।

(প্রমাণ ঃ সূরা নিসা, আয়াত, ২৩-সূরা নূর, আয়াত- ৩১, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন ২ঃ৩৫৬-৩৬১, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৬ঃ৪০১০৪০৫, তাফসীরে মাযহারী ২ঃ২৫৪-২৬১, তাফসীরে মাযহারী ৬ঃ৪৯৭-৫০২)

পুরুষদের জন্য মহিলাদের কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ

ক্যাসেটে উঠানো কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত শ্রবণ করা জায়িয আছে। তবে পুরুষদের তিলাওয়াত পরুষরা শুনবে, আর মহিলাদের তিলাওয়াত মহিলারা শুনবে। কিন্তু মহিলাদের তিলাওয়াত পুরুষের জন্য শ্রবণ করা জায়িয ন্যয়। কারণ মহিলাদের আওয়াজ বা কণ্ঠস্বর বেগানা পুরুষ থেকে বিনা

প্রয়োজনে গোপন থাকা বা রাখা জরুরী। এমনকি বিনা প্রয়োজনে তাদের সাথে কথাবার্তা বলাও নিষেধ। একান্ত প্রয়োজনেই কেবলমাত্র পর্দার আড়াল থেকে মেয়েরা কর্কশ স্বরে কথা বলতে পার। ক্যাসেটের মাধ্যমে মহিলাদের তিলাওয়াত শ্রবণ করার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। কুরআনে কারীমের তিলাওয়াত বা অন্য কোন দ্বীনী আলোচনা শোনার মহিলাদের কণ্ঠস্বর ব্যতীত আরো যথেষ্ট মাধ্যম রয়েছে। সুতরাং প্রয়োজন হলে, সেখান থেকেই শুনবে এবং নসীহত হাসেল করবে। তেমনিভাবে মহিলাদেরও উচিত যে, কোন পুরুষ কারী সাহেবের সুমধুর কণ্ঠে তিলাওয়াত না শোনা। কারণ-এতেও অনেক ক্ষতি রয়েছে। মেয়েরা কেবল মেয়েদের তিলাওয়াত শুনবে। তবে মেয়েরা পুরুষ বুযুর্গ উলামায়ে কিরামের ওয়াজ শুনতে ও নসীহত হাসিল করতে পারে।

(প্রমাণ ঃ তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন- ৬/৪০৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া- ৪/২১৯৭, নাফউল মুফতী ওয়াস সায়ি-৩২১)

মহিলাদের জন্য বাইয়াত হওয়া

মানবজাতি তথা নর-নারী নিজের দিলকে দিলের রোগসমূহ হিংসা, লোভ,অহংকার ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে উৎকৃষ্ট গুণসমূহ তথা আল্লাহর ভয়, ধৈর্য, অল্পেতুষ্টি ইত্যাদি গুণ হাসিল করতে ঃ আল্লাহ তাআলার অনুগত বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা ফরযে আইন। দিল থেকে রোগসমূহ দূর করা তথা আত্মশুদ্ধি করানোও আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। আর নবীর অবর্তমানে ওয়ারেসে নবী তথা খাঁটি আল্লাহওয়ালাগণ মানুষকে আত্মশুদ্ধি করানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিবেন।

অতএব নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য খাঁটি আল্লাহওয়ালাদের সাথে নিয়মিত সম্পর্ক করে নিজের অন্তরের রোগের হালাত জানিয়ে তাদের পরামর্শ মত আমল করা নর-নারী সকলের উপর ফরযে আইন। আর হাতে হাত দিয়ে প্রচলিত বাইয়াত হওয়া জরুরী বিষয় নয়। তবে মহিলাদের জন্য পর্দা ফরয হওয়ার কারণে কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সরাসরি দেখা-সাক্ষাৎ করে পরামর্শ নেওয়া, মাসআলা জিজ্ঞাসা করা জায়িয নাই। মহিলাগণ নিজের মাহ্‌রাম তথা স্বামী, পিতা, ছেলে ভাইয়ের মাধ্যমে আল্লাহওয়ালাদের কাছ থেকে পরামর্শ নিবে এবং আত্মার রোগসমূহের কথা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে পরামর্শ নিবে। এক্ষেত্রে ঐ চিঠির মধ্যে স্বামী বা মাহরামের দরস্তখত থাকাও জরুরী। ইচ্ছা করলে আল্লাহওয়ালাগণ মহিলাদেরকে মৌখিকভাবে বা দরখস্তের মধ্যে লিখিতভাবে বাইয়াতও করে নিতে পারেন এবং মুনাসেব মনে করলে পর্দার আড়াল থেকে কাপড় ধরেও বাইয়াত করা জায়িয।

উল্লেখ্য যে, পুরুষের উচিত তার অধীনস্ত মহিলাদের দ্বীনী তারাক্কীব ব্যাপারে ফিকির করা। এমনকি তার ঘরের কাজের লোকদের দ্বীনী ইলমের ব্যাপারে তাকে হাশরের ময়দানে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই লক্ষ্যে হক্কানী আলেম ও আল্লাহওয়ালাদের মাসআলা-মাসায়িল ও ওয়ায নসীহত কিতাবাদী তাদের পড়ানোর ও শোনানোর ব্যবস্থা করা এবং মাঝে মাঝে আলেম-উলামা তথা আল্লাহওয়ালাদেরকে নিজ বাসায় এনে পর্দার আড়াল হতে মহিলাদেরকে নসীহত শোনানোর ফিকির করা এবং কোন আল্লাহওয়ালাদের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করিয়ে দেয়া পুরুষদের দায়িত্ব।

এক্ষেত্রে যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে খাঁটি আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করার ব্যবস্থা না করে বা অনুমতি না দেয় তাহলে অন্য মাহরাম তথা বাপ-ভাই এর মাধ্যমে আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক করবে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী আজীবন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত করে যাবে।

(প্রমাণ ঃ সূরা জুমআ-৩, বুখারী শরীফ ১ ঃ২০, ২ঃ১০৭১, তিরমিযী শরীফ ১ঃ৩০০, ২ঃ৯৭, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৫ঃ৯৪, বযলুল মাজহুদ ১৭ঃ৪৯)

শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের চাকুরী

ইসলাম নারী ও পুরুষ প্রত্যেকের যিম্মাদারী ও দায়িত্ব পৃথকভাবে বণ্টন করে দিয়েছে। বাইরের সকল দায়িত্ব স্বামীর কাঁধে অর্পিত, আর ঘরের কাজ বা অভ্যন্তরীণ দায়িত্বগুলো স্ত্রীর কাঁধে অর্পিত। বস্তুতঃ মহিলাদের জন্য যথাসম্ভব ঘরে অবস্থান আবশ্যক, বেগানা পুরুষদের সঙ্গে সম্মিলন ঘটে এমন যে কোন পরিস্থিতি থেকে দূরে থাকা জরুরী।

শরীয়তের মূলনীতির আলোকে নারীর জন্য পর পুরুষের সাথে অফিস-আদালতে, কোর্ট-কাচারীতে চাকুরী করা একেবারেই গর্হিত এবং নাজায়িয কাজ। তাছাড়া এর দ্বারা পর্দা প্রথা, যা শি'আরে ইসলাম এবং একটি ফরয আমল তারও মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে। এছাড়াও আরো বিভিন্নভাবে শরঈ আহকাম উপেক্ষিত হয়। এসব কারণেই মেয়েদের জন্য পর পুরুষদের সঙ্গে কাজ করতে হয় এমন কোন চাকুরী করা নাজায়িয।

তবে রুজী-রোজগারের ব্যাপারে কোন মহিলাদের যদি কোন ব্যবস্থাই না থাকে যেমন উপার্জনক্ষম কোন পিতা, ভাই বা স্বামী না থাকে, তাহলে পর্দার সাথে অন্য কোন হালাল পেশা অবলম্বন করতে পারে, যেমন-সেলাই মেশিনের

কাজ বা হাঁস-মুরগী পালন বা মেয়েদের দ্বীনী তা'লীম বা কুরআনী শিক্ষা দানের কাজ বা মেয়েদের দুনিয়াবী বৈধ তা'লীমের কাজ করে বিনিময় নেয়া ইত্যাদি।

(সূরা নিসা ঃ ৩৪, মিশকাত শরীফ-২৬৯, ফিকহী মাকালাত, ১ঃ২৪৮,)

স্বামীর চাপের মুখে স্ত্রীর চাকুরী করা

হাদীস শরীফে আছে- "মহান আল্লাহর নাফরমানী করে কোন বান্দার হুকুম মান্য করা জায়েয নয়। তাছাড়া যেহেতু রিযিক- উপার্জনের জিম্মাদারী আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের উপর অর্পণ করেন নাই; বরং তাকে পর্দার ভিতরে থেকে স্বামীর খিদমত এবং স্বামীর সাংসারিক অভ্যন্তরীণ কাজ আনজাম দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, বিশেষ করে স্বামীকে দায়িত্ব দিয়েছেন স্ত্রীকে পর্দায় রাখার এবং স্ত্রীর উপর নিজেকে পর্দায় রাখা ফরয করে দিয়েছেন। তাই স্বামীর চাপের মুখে উক্ত স্ত্রীর জন্য চাকুরী করা জায়িয হবে না। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলাদের চাকুরী করতে গেলে, অফিস-আদালতে অন্য পুরুষের সাথে দেখা-শুনা, কথা-বার্তা, উঠা-বসা করতে হয়। পর্দা রক্ষা করে চলার কোন অবস্থা সেখানে থাকে না তাই এমতাবস্থায় স্বামীর অবৈধ হুকুম মান্য করা জায়িয হবে না। মনে রাখতে হবে, তার জন্য তাকেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। তার আমলনামা তাকেই দেয়া হবে সেখানে কেউ কারোর দায়িত্ব নিবে না। সুতরাং, স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে স্বামীকে বুঝানো। নিজে বুঝাতে না পারলে আলেম-উলামাগণের সহযোগিতা নিবে। আর সংসারে যদি বাস্তবিকই আর্থিক সংকট থাকে- যা দূর করার মত সামর্থ্য স্বামীর নেই, তাহলে স্ত্রী নিজেকে পর্দার ভিতরে রেখে হালাল রিযিকের কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে। (সূরা নিসা- ৩৪, মুসনাদে আহমদ, ১ঃ১৩১, তাফসীরে রুহুল মা'আনী, সূরা আহযাব-২৩-৫৯)

১২টি উত্তম গুণাবলী

সততা ও সত্যবাদিতা ঃ ইসলামে সততা ও সত্যবাদিতার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন মোআমালা-মোআশারা যাবতীয় ক্ষেত্রে সত্য কথা বলা ও সততার উপর টিকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ লোকদের সঙ্গ ও পক্ষ অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এবং এর বিপরীত মিথ্যাকে করা হয়েছে হারাম। মিথ্যাচারিতার পরিণাম হল ধ্বংস ও ব্যর্থতা।

আমানতদারী ঃ আমানতদারী হল সততা ও সত্যবাদিতার একটি বিশেষ অংশ। মানুষ অর্থ-সম্পদ গচ্ছিত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করা যেমন আমানতদারী, তেমনিভাবে কেউ কোন গোপনীয় কথা জানালে বা কোনভাবে কারও কোন গোপনীয় বিষয় জানতে পারলে তা গোপন রাখাও আমানতদারীর অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপক অর্থে আল্লাহ আমাদেরকে শরীয়তের যে বিধি-বিধান দিয়েছেন তা সমুদয় আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত, তার হক আদায় করাও আমাদের উপর ওয়াজিব। টাকা পয়সার আমানত, কথার আমানত, কাজের আমানত, দায়িত্বের আমানত ইত্যাদি যে কোন আমানতের খেয়ানত করা কবীরা গোনাহ।

সদ্ব্যবহার ঃ ইসলাম আপন-পর, ছোট-বড়, মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে সকলের সাথে, এমনকি অবলা প্রাণীর সাথেও সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে। কারও সাথে সদ্ব্যবহার করার অর্থ হল তার সাথে যা করণীয় তা করা তার হক বা অধিকার আদায় করা। তাই মাতা-পিতার অধিকার থেকে শুরু করে জীব-জন্তুর অধিকার পর্যন্ত সব কিছু রক্ষা ও আদায় করা এই সদ্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। মনকে সকলের অধিকার আদায়ের জন্য সচেতন করে তুললেই সদ্ব্যবহারের গুণ অর্জিত হবে।

আত্মীয়তা রক্ষা করা ঃ আনুগত্য, খেদমত, সদ্ব্যবহার এবং আদব তা'জীমের ক্ষেত্রে দাদা-দাদী এবং নানা-নানীর হক পিতা-মাতার তুল্য। চাচা ও ফুফুর হক পিতার তুল্য। ছোট ভাইয়ের কাছে বড় ভাই পিতৃতুল্য। হাদীসের বর্ণনা ও ইংঙ্গিত অনুসারে এরূপই প্রমাণিত হয়। এছাড়া ভাতিজা, ভাতিজী, ভাগিনা, ভাগ্নী প্রমুখ আত্মীয়-স্বজন, যাদের সাথে জন্মগতভাবেই আত্মীয়তা হয় তাদের সকলের হক বা অধিকার নিম্নরূপ ঃ

১. তাদের ভালবাসা।

২. তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

৩. তাদের মধ্যে কারও ভরণ-পোষণের কষ্ট থাকলে সঙ্গতি অনুসারে তাদের আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্য করা।

৪. মাঝে-মধ্যে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা।

৫. তাদের দ্বারা কোন কষ্ট পেলে তা সহ্য করা।

৬. তাদের সাথে আত্মীয়তা ও সম্পর্ক ছেদ না করা।

৭. সালাম, কালাম ও হাদিয়া আদান-প্রদান অব্যাহত রাখা। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিষয়গুলো আমল করাকে বলা হয় ছেলায়ে-রেহমী' অর্থ্যাৎ, আত্মীয়তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এই ছেলায়ে-রেহ্মী ওয়াজিব।

শ্বশুর-শাশুড়ী, শালা, ভগ্নীপতি, জামাই, পুত্রবধূ, স্ত্রীর আগের ঘরের সন্তান, স্বামীর অন্য পক্ষে সন্তান ইত্যাদি যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে আত্মীয়তা হয়, তাদের হকও সাধারণ মুসলমানের চেয়ে বেশী-সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমান ও এতীম-মিসকীনের চেয়ে তাদেরকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। অনেক আলেমের মতে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের ন্যায় বৈবাহিক সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথেও ছেলায়ে-রেহ্‌মী রক্ষা করা ওয়াজিব। এ ক্ষেত্রে উভয় শ্রেণীরই হুকুম এক পর্যায়ের।

অতিথিপরায়ণতা ঃ অতিথিপরায়ণতা মূলতঃ একটি মানের চরিত্র। মেহমানকে শুধু পর্যাপ্ত আপ্যায়ন করানোর নাম অতিথি পরায়ণতা নয়, বরং সাধ্য অনুযায়ী মেহমানকে আপ্যায়নতো রয়েছেই, সেই সাথে প্রফুল্যচিত্তে এবং বিকশিথ মনে মেহমানকে গ্রহণ করা ও তার সাথে সম্মানজনকভাবে আচরণ করাই হল সত্যিকার অতিথিপরায়ণতা।

মেহমান এলে আমার পানাহারে শরীক হবে, আর্থিক ক্ষতি হবে, ঝামেলা বাড়বে-এরূপ দুঃশ্চিন্তা মনকে বিকশিত হতে দেয়না, আর এটাই অতিথিপরায়ণতা গুণ সৃষ্টি হওয়ার অন্তরায়। পক্ষান্তরে যদি কেই চিন্তা করে যে, তাকদীরের বিশ্বাস অনুসারে মেহমান তারই হিস্যা ভোগ করবে-আমার নয়, তদুপরি আমি মেজবানের প্রতি মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে, তাহলে আতিথ্যের জন্য মন তার সংকোচিত হবে না বরং বিকশিত হবে এবং তখনই সৃষ্টি হবে অতিথিপরায়ণতা চরিত্র। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ অবশ্যই তোমার প্রতি তোমার মেহমানের হক বা অধিকার রয়েছে।

ভ্রাতৃত্ব স্নেহ-মমতা ঃ ভ্রাতৃত্ব ও স্নেহ-মমতা উত্তম চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। হৃদয়ের যে কামনীয় মাধুর্য, আবেগ, অনুরাগ এবং অনুগ্রহ; ক্ষেত্র বিশেষ সেটাকে স্নেহ-মমতা বলা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ সেটাকে প্রেম ভালবাসা বলে ব্যক্ত করা হয়, আবার গুরুজন ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির প্রতি সেটাকে নিবেদন করা হলে তা ভক্তি শ্রদ্ধা বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে।

ইসলামে স্নেহ-মমতা ও ভ্রাতত্বের গুরুত্ব এত বেশী যে, কারো মধ্যে এ গুণ উপস্থিত না থাকলে সে যেন মুসলমান বলেই আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য থাকে না। হাদীসে এরশাদ হয়েছে ঃ যারা ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেনা তারা আমাদের দলভুক্ত নয়। (তিরমিযী)

ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছেঃ সমস্ত মুসলমান একটা দেহের ন্যায়, একটা দেহের কোন অঙ্গ যদি ব্যধী গ্রস্থ হয় তাহলে অন্য অঙ্গ

যেমন তা উপলব্ধি করতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত মুসলমান মধ্যে একের প্রতি অন্যের এরূপ একাত্মতা ও সহমর্মিতা থাকতে হবে।

সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত, সকলেই এক আল্লাহর বান্দা, সকলেই এক আদমের সন্তান-মনের মধ্যে এই উপলব্ধি বদ্ধমূল ও উজ্জীবিত থাকলে পারিবারিক একাত্মতা ও সহমর্মিতা বোধ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সকলে এক আল্লাহর বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে জীবন যাপন কর। (বুখারী মুসলিম) হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছেঃ তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান। আর আদমকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথা বলে ভ্রাতৃত্ববোধকে উদ্বেলিত করা হয়েছে।

ত্যাগ ও বদান্যতা ঃ ত্যাগ হল কৃপণতার বিপরীত এবং দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়। আর বদান্যতা অর্থ দানশীলতা। দানশীলতার তিনটি স্তর রয়েছে। যথাঃ

(১) নিজের প্রয়োজন পূরণে যেন কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে এই পরিমাণ অন্যের জন্য খরচ করা।

(২) অন্যকে এই পরিমাণ দান করা যার সম পরিমান বা তার চেয়ে কিছুটা কম নিজের কাছে অবশিষ্ট থাকে।

(৩) নিজের প্রয়োজনে ব্যয় না করে নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেয়া। এই শেষোক্তো পর্যায়টিকে বলা হয় ত্যাগ।

ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টির জন্য আল্লাহর হক ও বান্দার হকের গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে ও কৃপণতা বা বখীলী চেতোনা থেকে মনকে নিয়ন্ত্রণ ও কৃপণতার বিপরীত প্রেরণা লাভ করতে হবে এবং সুন্দর চরিত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ সৃষ্টি করতে হবে।

উদারতা ঃ ব্যক্তি স্বার্থের সংকীর্ণ গন্ডি পেরিয়ে সার্বজনীন স্বার্থের চিন্তায় মনের বিকশিত হওয়াকে বলা হয় উদারতা। উদারতার বিপরীত চরিত্রকে বলা হয় সংকীর্ণতা। চিন্তার সংকীর্ণতা বহু ধরণের পংকীলতার উৎস হয়ে থাকে। সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে উন্নত চরিত্র সৃষ্টি হয় না। এরূপ মানসিকতা মানুষের জ্ঞানকে পক্ষপাত গ্রস্থ ও অনুভূতিহীন করে ফেলে। এই সংকীর্ণ মন-মানসিকতার গন্ডিতে আবদ্ধ মানুষ আমিত্বকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ফলে ব্যক্তি স্বার্থের বাইরে সে কিছু চিন্তা করতে পারে না। সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য কোন বিরাট অবদান রাখতে পারে না। ক্ষমা, দয়া, আত্মত্যাগ, প্রভৃতি বহুগুণ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয়ে যায় এই উদারতা না থাকার ফলে। এদিক থেকে চিন্তা করলে উদারতা এমন এক চরিত্র যা বহু চরিত্রের উৎসমূল। আমি শুধু আমার জন্য নই, আমার সবকিছু শুধু আমারই জন্য নয়-আমি পূণাঙ্গ সমাজদেহের একটি অংশ

মাত্র-এরূপ চিন্তা অর্থ্যাৎ চিন্তার পরিধিকে বিস্তৃত করা উদারতা সৃষ্টির সহায়ক হয়ে থাকে। তদুপরি-উদার মানুষের সাহচর্য এবং এমন মহামনীষীদের জীবনী পাঠও উদারতার মনোভাব জাগ্রত করে থাকে, যারা আত্বত্যাগ ও সার্বজনীন সেবায় নিজদেরকে উৎসর্গ করেছেন।

হায়া বা লজ্জাশীলতা ঃ নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কোন দোষনীয় কাজ করতে মানুষের মধ্যে যে জড়ত্ববোধ হয়ে থাকে সেটাকে বলে হায়া বা লজ্জা। এই লজ্জা মানুষকে ভাল কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। এ জন্যেই হাদীসে বলা হয়েছেঃ লজ্জা কেবল সুফল ও কল্যাণই বয়ে আনে। (বোখারী ও মুসলিম) এর বিপরীতে লজ্জা না থাকলে মানুষ সে যে কোন অন্যায় কাজই করতে পারে। তাই প্রবাদ আছে যখন তোমার লজ্জা থাকবে না, তখণ যা ইচ্ছা তাই কর।

এখানে উল্লেখ্য যে, কোন ভাল কাজ করতে যদি কখনও জড়তা বোধ হয় তাহলে সেটা লজ্জা বা প্রশংসনীয় গুণ বলে আখ্যায়িত হবে না। যেমন- পর্দা করতে বা দাড়ি রাখতে বা টুপি মাথায় দিতে জড়তা বোধ হল, এটা লজ্জা বা হায়া নয়, বরং এটা হল ধর্মীয় হীনমন্যতাবোধ।

যদি কেউ দৈহিক ও আত্মিক শক্তিকে যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ ও যথাস্থানে প্রয়োগ করে এবং পানাহারের চাহিদা ও আত্মিক কামনাসমূহ নিয়ন্ত্রণ যথাস্থানে প্রয়োগ করে, তাহলে তার মধ্যে লজ্জার যথার্থ বিকাশ ঘটবে। (আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ্দীন)

ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন ঃ বিপদ আপদে মানুষের প্রতি দয়া করা অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করাও উত্তম চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী যে মানুষের প্রতি দয়া করে না তার প্রতিও দয়া করা হবে না। যে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে না আল্লাহর তার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। এখানে ক্ষমা করার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যদিও যে পরিমান জুলুম কেউ করে ততটুকুর প্রতিশোধ তার থেকে নেয়া জায়েয, তবে উত্তম হল প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া। তবে উল্লেখ্য যে, এই ক্ষমা করার প্রশ্ন ব্যক্তিগত হক নষ্ট করার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কেউ দ্বীনের হক নষ্ট করলে যেমন মুরতাদ হয়ে ধর্মের অবমাননা করলে তা ক্ষমাযোগ্য নয়। এমনি ভাবে বিচারক আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার করবেন, অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারবেন না, কারণ সেটা তার ব্যক্তিগত হক নষ্ট হওয়ার সাথে জড়িত বিষয় নয়।

দয়া শুধু মুসলমানদের প্রতি নয় বা আপনজনদের প্রতি নয়। আপন-পর, শত্রু-বন্ধু, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের প্রতি এমনকি অবলা জীব-জন্তুর

প্রতিও দয়া প্রদর্শনের আদর্শ ইসলামের রয়েছে। এই দয়া যেমন পার্থিব কষ্ট ক্লেশ দূর করার জন্য হবে, তেমনি পরকালীন কষ্ট ক্লেশ দূর করার জন্যও হবে। ঈমানহীনের ঈমান এবং আমলহীনের আমল পয়দা করার জন্য মনের পেরেশানীও তাই বড় দয়া বলে গণ্য।

ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা ঃ যার যা হক ও প্রাপ্য তাকে তা যথাযথ ভাবে দেয়াকে বলা হয় ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা। আর তার চেয়ে কম করা হল জুলুম বা অবিচার। ইসলামে ইনসাফ ও ন্যায্য বিচারের গুরুত্ব এত বেশী যে, অমুসলিমদের সাথেও তা রক্ষা করার হুকুম দেয়া হয়েছে। জুলুম এবং অবিচারকে হারাম করা হয়েছে। ফয়সালার ক্ষেত্রে নিজের ও অন্যের মধ্যে ব্যবধান করার তথা পক্ষপাতিত্ব করার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। ইনসাফ করতে হবে, যদিও তা আপনজনের বিরুদ্ধে চলে যায়।

অঙ্গীকার রক্ষা করা ঃ অঙ্গীকার রক্ষা করা তথা ওয়াদা খেলাফ না করা সততারই অংশ বিশেষ। অঙ্গীকার রক্ষা করা ওয়াজিব। এমনকি বালক বা শিশুকে দেয়ার জন্য কোন কিছু প্রদানের অঙ্গীকার করলেও তা পূরুণ করা জরুরী। পূরণ করার নিয়ত না থাকলে অঙ্গীকার করবে না তবে কোন পাপ কাজের অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করা যাবে না। অঙ্গীকার পূর্ণ করার বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হযরত রাসূল (সাঃ) তাঁর ভাষণে প্রায়ই বলতেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গীকার বাস্তবায়নের বিষয়ে যত্নবান নয়, দ্বীন ইসলামের মধ্যে তার কোন অংশ নেই।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ঃ পাক-ছাফ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাকে আল্লাহ পছন্দ করেন। এজন্যেই ইসলাম শরীর, কাপড়-চোপড়, ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ইত্যাদিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। শরীরের অবাঞ্ছিত পশম নিয়মানুযায়ী কেটে বা উপড়ে ফেলা, খতনা করা, নখ কাটা, মোচ কাটা এসবই পরিস্কার পরিচ্ছতার আওতাভুক্ত। এসব হল জাহিরী অর্থ্যাৎ বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা। এর সাথে রয়েছে বাতিনী অর্থ্যাৎ আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার দিক, মনের রোগ থেকে নফস ও আত্মাকে এবঙ কুচরিত্র থেকে আখলাককে পবিত্র করার মাধ্যমেই এ দিকটি অর্জিত হবে।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসার বিরল দৃষ্টান্ত

আরবের মরুপ্রান্তরে বাস করত এক সহজ সরল অসহায় ব্যক্তি। ভাগ্যের লীলাখেলায় বিবাহ করেছিল সে এক সুন্দরী ও গুণবতী মহিলাকে। লোকটি তার স্ত্রীকে টাকা-পয়সা-ধন-দৌলত তেমন কিছুই দিতে না পারলেও তাকে সে

মনেপ্রাণে ভালবাসত। তাই তো মেয়েটিও তার স্বামীর ভালবাসা পেয়ে অভাব-অনটনের সব কষ্টই ভুলে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করছিল। কিন্তু স্ত্রী যদিও স্বামীকে ভালবাসায় তুষ্ট থেকে সব কষ্ট সহ্য করে নিয়েছিল, কিন্তু মেয়েটির পিতা তার মেয়ের এই বাহ্যিক কষ্ট দেখে তার স্বামী থেকে মেয়েকে নিয়ে এসে নিজের গৃহেই রেখে দিল। অসহায় স্বামী একদিকে সে দারিদ্রতার কারণে তার স্ত্রীর মন সন্তুষ্ট না করতে পারার বেদনায় ভুগছিল ঠিক সেই মুহূর্তে তার বিরহের যাতনা কোনভাবেই সইতে না পেরে তৎকালীন কাজী মারওয়ান এর কাছে গিয়ে বিচার দিল। মারওয়ান মেয়ে এবং মেয়ের পিতাকে ডেকে পাঠালো। কিন্তু সৌন্দর্যের তীর এমন এক তীর যা থেকে কোন বাহাদুরই মুক্তি পায় না। তাই মারওয়ান ঐ মেয়ের সৌন্দর্যে পাগল হয়ে ঐ আসহায় ব্যক্তি থেকে জোর করে তালাক নিয়ে নিজেই তাকে বিবাহ করে নিল। কিন্তু প্রিয়জনের অপহরণ এটা এমন কষ্ট তা একবার যে অনুভব না করেছে তাকে কোন দিন কোন ভাষা দিয়ে বোঝানো যাবে না। তাই অসহায় লোকটি নিরুপায় হয়ে আমীরের নিকট বিচারের দাবী করল। আমীর যদিও প্রথমে মারওয়ানকে ডেকে অনেক রাগ করলেন এবং তার থেকে ঐ মেয়েকে ছাড়িয়ে নিলেন। কিন্তু আমীর নিজেও যখন মেয়েটিকে দেখলেন তখন সে নিজেও তাকে বিবাহের প্রস্তাব করলেন। যেহেতু এখন মেয়ের প্রার্থী একজন নয় তিনজন বিধায় আমীর ঐ মেয়েকে সম্বোধন করে বললেন- তুমি যদি প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং অঢেল সম্পদের মালিক হতে চাও তাহলে তুমি স্বামী হিসাবে আমাকে গ্রহণ কর আর যদি তা না কর তাহলে মাওয়ান অথবা ঐ অসহায় ব্যক্তি এই তিনজনের মধ্য থেকে তুমি যাকে চাও তাকে গ্রহণ কর। আহ! স্বামীর ভালবাসার বিরল দৃষ্টান্ত! মেয়েটি বাদশাকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানিয়ে দিল হে বাদশাহ! আমি এমন কোন মেয়ে নই যে, অন্য কোন মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে সে তার স্বামীর ভালবাসাকে ভুলে যেতে পারে। হে বাদশাহ! আমি এমন কোন মেয়ে নই যে, অন্যের ধন-সম্পদ গাড়ি-বাড়ি দেখে সে তার স্বামীর অসহায়ত্বের কারণে তার ভালবাসাকে ভুলে যেতে পারে। হে বাদশাহ জেনে রাখুন প্রভাব প্রতিপত্তি ধন সম্পদ বাড়ি-গাড়ি এসব কিছুই অস্থায়ী আর ভালবাসা হয় মনের থেকে, তা হয় স্থায়ী সুতরাং আমি আপনাকেও চাইনা, মারওয়ানকেও চাইনা আমি চাই আমার পূর্বের সেই দরিদ্র স্বামীকে আমি শুধু তার ভালবাসায় ধন্য হতে চাই। যদি অনুগ্রহ করে আমাকে তার কাছে ফিরিয়ে দেন তাহলে চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

ফায়দা ঃ বাস্তবে প্রতিটি স্ত্রী যদি তার স্বামীর জন্য এমন হয় তাহলে সেই দাম্পত্য জীবনে তারা উপভোগ করতে পারে এক স্বর্গীয় শান্তি।

মা হিসেবে নারীর করণীয়

পরিবারের প্রধান পুরুষ বা বাবা হলেও তার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে নারী বা মা। এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নারী জাতির জন্য বিশেষ মর্যাদা। পারিবারিক জীবনে পিতা-মাতার দায়িত্ব দ্বৈত হলেও মায়ের ভূমিকা প্রত্যক্ষ ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মাতাকে এমন সব দায়িত্ব পালন করতে হয়-যা পিতা বা অন্য কারো পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। মাতাকে একাধারে গর্ভধারীণী, স্তন্যদায়িণী, সেবিকা-ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী এবং অভিভাবিকা প্রভৃতির ন্যায় বহুমুখী ভূমিকা পালন করতে হয়।

শিশুর দৈহিক গঠনের সাথে সাথে তার চারিত্রিক গঠনও নির্ভর করে একজন মাতার সঠিক কর্তব্য পালনের ভূমিকার উপর। মাতাকে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, যেন কোন অসতর্কতা বা শৈথিল্যের ছিদ্রপথে তার শিশু বা পরিবারের কোন সদস্য বিপথগামী হতে না পারে।

পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ইসলাম মাতার ভূমিকাকে যে একা বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মায়ের এই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি–

(ক) গর্ভধারণ অবস্থা (খ) শৈশব অবস্থা ও (গ) যৌবন অবস্থা।

গর্ভধারণ অবস্থা ঃ এ সময় গর্ভে সন্তান ধারণ করে দীর্ঘ নয়/দশ মাস পর্যন্ত একজন মাতাকে অপরিসীম ধৈর্য ও কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করতে হয়। একমাত্র সন্তানের কল্যাণ চিন্তা করে একজন মাতা তার শারীরিক ও মানসিক অসুবিধাকে তুচ্ছ মনে করে নিষ্ঠার সাথে গর্ভ লালন করেন। আসলে এজন্য সর্বক্ষণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

গর্ভাবস্থায় একজন মাতাকে সদাপ্রফুল্ল ও সৎচিন্তামগ্ন অবস্থায় সাংসারিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে হয়। তাকে খিয়াল রাখতে হয়-ঐ সময় যেন কুচিন্তা-বিমর্ষতা মনের উপর ছায়াপাত করতে না পারে। বরং সে সময় ওলী-আউলিয়াগণের জীবনী, চরিত্র গঠনমূলক ধর্মীয় বই-পুস্তক এবং কুরআন ও হাদীসগ্রন্থ বেশি পাঠ করা আবশ্যক। কেননা, গর্ভস্থ সন্তানের উপর গর্ভধারিণী মায়ের গুণ ও চরিত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তব জীবনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি। প্রাসংগিকভাবে আমরা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)-এর কথা বলতে পারি। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তাঁর মাতা নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াতসহ ইসলামী বিধি-বিধান ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে মশগুল থাকতেন।

একটি ভাল জাতের আমগাছ থেকে যেমন অগণিত ভাল আম পাওয়া যায়, তেমনি একটি সভ্য সুশিক্ষিতা, ধর্মবতী মায়ের থেকে একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ গড়ে উঠে। পক্ষান্তরে বিমর্ষ, কর্কশ, কুচিন্তামগ্ন, ভীত-শ্রদ্ধ মন মানসিকতাপূর্ণ দেহ হতে ঐ ছাঁচেরই অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিহীন, চরিত্রহীন, অবাধ্য, বখাটে, গোয়ার, স্বার্থপর ও পশুসুলভ চরিত্রের অধিকারী সন্তানই হয়।

এ কারণেই হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-"তোমরা যদি সন্তানকে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তুলতে চাও, তাহলে শিশু জন্মের আঠার বছর পূর্বে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কর।" অর্থাৎ তার মাকে শিক্ষিত কর। এখানে শিক্ষা বলতে সঠিক শিক্ষা, আদর্শ শিক্ষা, দ্বীনের জ্ঞান সম্পর্কে বলা হয়েছে।

গর্ভকালীন সময়ে মাকে কতগুলো ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন, হারাম-হালালের বাছ-বিচার করে হালাল ভক্ষণ করা, হারাম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা, কড়াকড়িভাবে পর্দা রক্ষা করে চলা, দেহ-মনকে সর্বদা পূত-পবিত্র রাখা প্রভৃতি। এছাড়াও এ সময় মায়েদের কুরআন শরীফের পাঁচটা সূরার তিলাওয়াত-আমল করলে, বড়ই ফজীলতের বিষয় হবে বলে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন-

(১) গর্ভাবস্থায় সূরা আলে ইমরান পড়লে বাচ্চা দ্বীনের দাঈ হয়।

(২) সূরা মুহাম্মাদ পড়লে বাচ্চা হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মত সবরওয়ালা হয়।

(৩) সূরা ইউসুফ পড়লে বাচ্চা সুন্দর হয়।

(৪) সূরা মরিয়ম পড়লে বাচ্চা নেককার হয় এবং

(৫) সূরা লুকমান পড়লে বাচ্চা হিকমত ওয়ালা হয়।

শুধু উক্ত পাঁচটি সূরা কেন, পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণটাই বরকতময়, কল্যাণময়। তাই এ সময় বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকা কর্তব্য এবং সম্পূর্ণ কুরআনের খতম তিলাওয়াত খুবই উত্তম হবে।

এ ছাড়াও গর্ভাবস্থায় হাদীসের বই-পুস্তক বেশি বেশি অধ্যয়ন করতে হবে। দ্বীনী ভাল বইপত্র পড়তে হবে এবং যথাসম্ভব পাক-পবিত্র থাকতে হবে।

আর নামায, জিকির, তাসবীহ ইত্যাদি তো আছেই। এসব পালন করার পাশাপাশি সকল মাসসূন দোয়ার আমল করতে হবে এবং সুন্নাত তরীকানুযায়ী জীবন যাপন করতে সচেষ্ট থাকতে হবে। মায়ের প্রভাব তার উপর যথেষ্ট থাকে। তাই মায়ের সেই নেক আমলের প্রভাবে সন্তান দ্বীনদাররূপে দুনিয়ায় আসবে আশা করি।

গর্ভাবস্থায় মায়ের চিন্তা-চেতনাও নিয়ন্ত্রণ হওয়া প্রয়োজন। খারাপ চিন্তা, দুশ্চিন্তা, টেনশন করা যাবে না বরং তখন দ্বীনী চিন্তা-ফিকির দ্বারা মনকে প্রফুল্ল ও হাসিখুশি রাখা কর্তব্য।

শৈশব অবস্থা ঃ আজকের সময়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণে মায়েরা সংসার, গৃহের ব্যবস্থপনা, পরিবারের দেখা-শোনাকে অগ্রাহ্য করছে। তারা নারী স্বাধীনতার নামে নারী-পুরুষের কর্মস্থল এক ও অভিন্ন করার ফিকিরে আছে এবং পরিবার পরিচালনা ও সংসার প্রথাকে অবজ্ঞা করছে। অথচ তার সাংসারিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জাগতিক কর্মস্থলে কাজের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জাগতিক কর্মস্থলের কাজ তো মেয়েরা না করলেও পুরুষদের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে যাবে, কিন্তু ঘরের ব্যবস্থাপনা ও সংসার পরিচালনা মায়েরা না করলে ঘরের শান্তি, শৃংখলা, নৈতিক অবস্থান সবই বিঘ্ন হতে বাধ্য। এর যথার্থ নিয়ন্ত্রণ রক্ষা মা ছাড়া কারো পক্ষেই তেমন সম্ভব নয়।

আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্য ষ্টাইলে আজ মায়েরা সংসার ফেলে বাইরে পুরুষের কাতারে কর্মস্থলে নিয়োজিত, আবার কখনও পার্টিতে আড্ডায় মগ্ন। ওদিকে সন্তান ডিশ এন্টেনা নিয়ে বিভোর, নয়তো বখাটে উচ্ছৃংখলদের সাথে বখাটেপনা কিংবা সন্ত্রাসী কাজে মগ্ন। মায়েরা ছোট শিশু সন্তানদের দায়িত্ব দিয়ে যায় অশিক্ষিত গৃহপরিচারিকা বা চাকর-বাকরদের হাতে। আবার ঘরের কাজ-কর্মও তাদের উপর ন্যস্ত হয়। এরকম সংসারে শান্তি আসবে কি করে? ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে পরিবার ও নতুন প্রজন্মের কর্ণধার। আমরা যদি কিশোর অপরাধ, স্বার্থপরতা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের কারণ খুঁজি তাহলে দেখতে পাই, যারা শৈশবে স্নেহ-মমতা ও সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং বিভিন্ন অশান্তির মাঝে বেড়ে ওঠে, তারাই এসব অপকর্মের হোতা।

তাই সন্তানের লালন-পালনের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকার গুরুত্ব উল্লেখ করতে যেয়ে শিশু মনোবিজ্ঞানী ডঃ আমলি মন্টিগো লিখেন- "একটি শিশুর বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার যথাযথ দেখাশোনা। শুধুমাত্র শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়াই তার বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট নয়। অনেক ডাক্তার এবং বিশেষজ্ঞ যারা তাদের জীবনের একটা বড় অংশ শিশু গবেষণার উপর কাটিয়ে দিয়েছেন, তাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই যে, নবজাতকের শারীরিক ক্ষুধার মধ্যে মায়ের স্নেহ-মমতাও রয়েছে। শিশুর গঠন, বুদ্ধি ও বিবেক-অনুভূতির উন্নয়ন তথা শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের জন্য মায়ের স্নেহ-মমতা এমন একটি প্রাথমিক শর্ত, যার কোন বিকল্প নেই।"

শিশুর লালন-পালনের ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা নারী বেশি পারদর্শী ও ধৈর্যশীলা। আর এজন্যই সন্তান লালন, আচার-আচরণ শিক্ষাদানের ব্যাপারে মায়ের ভূমিকাকে অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

সন্তান জন্মের সংকটময় সময় হতে সন্তানের স্তন্যপানকাল পর্যন্ত সময়টা একজন মাতার জন্য এক বিশেষ অধ্যায়। এ সময় একজন মাতাকে শিশুর খাওয়া-দাওয়া, সেবা-শুশ্রুষা, শিক্ষা স্বাস্থ্য, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদির প্রতি সাদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। এসময় একজন মাতাকে নিজের সুখ–শান্তি, আরাম-আয়েশ, আহার-নিদ্রা ইত্যাদির চাহিদাকে অবদমিত করেও সন্তানের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত হতে হয়। এমন কি সন্তানের অসুস্থ অবস্থাতে রাত্রির পর রাত্রি জেগে সন্তানের শিয়রে বসে সন্তানের সেবা ও তত্ত্বাবধানে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দেন মায়েরা।

সন্তানকে লালন-পালনের ফজীলত সম্পর্কে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে স্ত্রীলোক নিজের বাচ্চার অসুখের জন্য শুইতে পারে না, উপরন্তু বাচ্চাকে আরাম দেয়ার জন্য নিজের সুখ-আয়েশ ত্যাগ করে বাচ্চাকে সুখ-দানের চেষ্টা করে, আল্লাহপাক তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে ১২ বৎসরের কবুল ইবাদতের ছওয়াব দান করেন।"

ইদানীং কিছু সংখ্যক আধুনিক মা সন্তানকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করছে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন, "মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে।"

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, "যে স্ত্রী লোক বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায়, তাকে আল্লাহপাক একেক ফোঁটা দুধের বিনিময়ে একেকটি নেকী দেন।"

হাদীস শরীফে ঘোষণা করা হয়েছে, "যখন বাচ্চার দুধ খাওয়ার সময় পুরা হয়ে যায়, তখন আসমান থেকে একজন ফেরশতা এসে ঐ স্ত্রীলোককে খোশ খবর শুনায় যে, আল্লাহ পাক তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।" সুতরাং বাচ্চাকে বুকের দুধ থেকে বঞ্চিত করা মারাত্মক অন্যায়।

মায়ের বুকের দুধ শিশুর জন্মগত অধিকার। দুনিয়ার অন্য কোন দুধ বা কোন খাদ্যই মায়ের দুধের বিকল্প হতে পারে না। মায়ের দুধে শিশুর শারীরিক গঠন, মানসিক প্রবৃদ্ধি ও আত্মিক উন্নতি যা সাধিত হয়, তা অন্য কিছুতে হতে পারে না। অথচ আজকাল আধুনিক পরিবারে লক্ষ্য করা যায় যে, তারা শিশুকে জন্মের পর থেকেই বুকের দুধ না দিয়ে বোতলের দুধ পান করাতে অভ্যস্ত করে তোলে। আর এর কারণস্বরূপ মায়ের সুডৌল দেহের স্থায়িত্ব ও মজবুতির খোঁড়া যুক্তি খাড়া করে। এতে করে শিশুকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিত করা

হয় না বরং শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের উন্নতির পথকেও রুদ্ধ করা হয়। কেননা মায়ের দুধে আছে রোগ প্রতিরোধক এমন কিছু উপাদান-যা শিশুকে অসুখ-বিসুখ থেকে রক্ষা করে। এছাড়াও বুকের দুধ খাওয়ালে শিশু ও মায়ের মধ্যে একটা গভীর-আদর স্নেহের সঞ্চার হয় এবং মা ও শিশুর মধ্যে অকৃত্রিম ভালবাসার সেতু বন্ধন গড়ে উঠে।

মাতার স্তনে প্রকৃতিগতভাবে যে দুগ্ধ প্রস্তুত হয়, তা আল্লাহ পাকের এক মহাদান। এর দ্বারা শিশুর দৈহিক গঠনের সাথে সাথে মানসিক ও চারিত্রিক গঠনও সম্পূর্ণতা পায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মায়ের জন্য শিশুকে স্তন্যদানকালীন সময় খাদ্যের হালাল-হারামের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া বাঞ্ছনীয়। যেন শিশুর দৈহিক, মানসিক ও চারিত্রিক গঠনে হারাম খাদ্যের কোনরূপ প্রভাব পড়তে না পারে।

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব বাড়তে থাকে। সন্তানের বয়স দু'বছর পূর্ণ হলেই পরবর্তী যে কঠিন দায়িত্ব মাতার কাঁধে এসে পড়ে, তা সন্তানের শিক্ষার ভিত্তিমূল স্থাপনের দায়িত্ব। এটাই মায়ের স্নেহ পরশে সন্তানকে নির্মল চরিত্রে গড়ে তোলার ভিত্তি গড়ার মোক্ষম সময়। কেননা, এ সময় হতে শিক্ষাপূর্ব সময় সীমা পর্যন্ত একজন শিশু মাতার একান্ত সান্নিধ্যে থাকে। একজন দ্বীনদার মা মানেই একটি আদর্শ মাদ্রাসা। বাবাকে মাদ্রাসা বলা হয় না। কারণ, বাপতো বাইরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু মায়ের কাছে ছোট বেলা ছেলেমেয়েরা যখন ৫/৬ বছর থাকে, তখনকার সব নসীহত তাদের ব্রেনে সয়ে যায়। তখন একজন মা যদি আল্লাহওয়ালা হয়ে সন্তানদের দ্বীনী তাকাযা পুরা করে, তাতে গোটা খান্দানই আল্লাহওয়ালা হয়ে যাবে। ছোট বেলা মায়ের কথা দিলের মধ্যে এত রেখাপাত করে, যা কোন উস্তাদ বা শিক্ষকের কথায় করে না।

একজন মা যদি দ্বীনদার হয়, পুরো ফ্যামেলীর ভিতরে দ্বীন জারী হবে। অনেক ছেলের গার্জিয়ান এসে ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করায় এবং বলে-হুজুর! আমার ইচ্ছা ছিল না ছেলেকে মাদ্রাসায় ভর্তি করতে, কিন্তু ছেলের মা ভর্তি করাতে ইচ্ছুক। অবশেষে ইংরেজী লাইনে ছেলেকে ভর্তি করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ছেলের মায়ের কারণে ছেলেকে মাদ্রাসায় দিতে এসেছি।

মাতৃজাতিকে কত ক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। মায়ের কারণে সন্তান আল্লাহওয়ালা হবে, দ্বীনদার হবে, ইলমওয়ালা হবে। যখন ছোট শিশু মায়ের কাছে জামা চাবে, মা যদি দ্বীনদার হয়, তখন বলবে, দেখ আব্বু! জামা দেয়ার শক্তি তো আমার নেই, তুমি নামায পড়, আল্লাহর কাছে দোয়া কর। দোয়া মঞ্জুর হলে, আল্লাহ তোমার আব্বুর পকেটে টাকা দিয়ে দিবেন এবং তোমাকে জামা

বানিয়ে দেবেন। এভাবে যে কোন জিনিস সে চাবে, তাকে দোয়া করে চাইতে বলবে। এরপর শিশুটি যখন তা পাবে, তখন শিখাবে যে, উক্ত দোয়ার বদৌলতেই মহান আল্লাহ তাকে এটা দিয়েছেন। এভাবে একজন মা তার ছেলেকে আল্লাহ পাকের সাথে, নামাযের সাথে, দ্বীনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে, দ্বীনদার বানাতে পারে। আদান-প্রদান, মান-অভিমান এবং সকল কিছুতেই মায়ের অনুকরণ করতে শেখে।

বস্তুতঃ মানুষের সহজাত প্রবণতা হলো, মানুষ অনুকরণপ্রিয়। আর এক্ষেত্রে বড়দের চেয়ে শিশুরা অগ্রগামী, অর্থাৎ শিশুরা অতি সহজেই যে কোন কিছু অনুকরণ করতে অভ্যস্ত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শিশুরা এ সময় কিন্তু অপরের সংশ্রবে যেতে দ্বিধাবোধ করে। অথচ সে অকপটচিত্তে ও নিঃসংকোচে মায়ের সকল কিছুই অনুকরণ করার চেষ্টা করে। কাজেই এ সময় একজন মা যত সহজে তার শিশুকে দ্বীনী আকীদা, উত্তম আখলাক প্রভৃতি শিক্ষা দান করতে পারে, অন্য কেউ তা পারে না।

আদর্শ মায়ের স্নেহ-ভালবাসায় লালিত-পালিত শিশু তার কাছ থেকে দিনে দিনে আদব-কায়দা, শিষ্টাচার, দয়া-মায়া, শ্রদ্ধাবোধ, নিয়ম-শৃংখলা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি গুণের অনুশীলন করে থাকে, যা সামাজিক মূল্য বোধের মৌলিক উপাদান। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "কোন পিতা-মাতা সন্তানকে উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষাদান অপেক্ষা ভাল কোন জিনিস দিতে পারে না।" (তিরমিযী)

তিনি অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের সন্তানদেরকে কদর কর এবং তাদের ভাল স্বভাব-চরিত্র শিক্ষা দাও।

একজন আদর্শ মাতাই পারেন সন্তানকে উত্তম আখলাকে গুণান্বিত করে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তুলতে। বস্তুত ঃ আদর্শ পরিবারের শিশুরা মাতা-পিতার অকাজ, কুকাজ অনুসরণ করে হয় লম্পট, বদমাইশ, সন্ত্রাসী।

যৌবন অবস্থা ঃ এ সময়টা সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের উত্থান ও পতনের অধ্যায়। কেননা, এ সময় সে এমন এক মেরুতে অবস্থান করে, যেখান থকে পদস্খলন হলে নির্ঘাত তার অপমৃত্যু ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। কাজেই মাকে এ সময় খুব সজাগ দৃষ্টি রেখে সন্তানের শৈশবে দ্বীনী আকীদা-চরিত্র শিক্ষা দিতে হবে। দ্বীনী ধ্যান-ধারণা গড়ে তুলবে, এরপর উপযুক্ত বয়সে তার একাডেমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে পিতাকে। মায়ের কোলে শিশু আল্লাহ-রাসূলের নাম, কালিমা, দোয়া-কালাম শিখেছে, এখন পিতা তাকে পরিপূর্ণরূপে কুরআন-হাদীস ও দ্বীনের শিক্ষা দান করার জন্য মাদ্রাসায় ভর্তি করবে। মাদ্রাসায় পড়ে সন্তানরা দ্বীনী শিক্ষা পেয়ে সৎকর্মশীল ও চরিত্রবান হবে।

অন্ততঃ ফরজে আইন পরিমাণ দ্বীনী ইল্‌ম শিক্ষা মাদ্রাসায় দিতেই হবে। এরপর ইচ্ছা করলে দুনিয়াবী লাইনে যত ইচ্ছা পড়াতে পারেন। সন্তানকে তরুণ ও যুবক অবস্থায় কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে হয়। সন্তানের এ সময়টা আসলেই খুব ঝুঁকিপূর্ণ। এ সময় হঠাৎ করে তার দৈহিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানসিক ও জৈবিক আচরণেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তার দেহ হঠাৎ করে বেড়ে যায়। স্বর পরিবর্তন হয়। তার মধ্যে মুরুব্বীয়ানার স্বভাব সৃষ্টি হয়। তখন সে ছোট-বড়, বাছ-বিচার না করে সবখানেই নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়াস পায়। আর তাই না পারে তখন সে বড়দের সাথে খাপ খেয়ে চলতে, না পারে ছোটদের পরিবেশে মিশতে।

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির কারণে এ সময় একজনের জীবনে সবচেয়ে ক্ষতিকর যে দিকটার পূর্বাভাস সূচিত হয় তা হলো-এ সময় তার মনে জৈবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার একটা প্রবণতা জাগ্রত হয়। সংগত কারণে টাকশর-যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে চারিত্রিক সদগুণাবলীর অধঃপতন ঘটার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আর তাই এ সময় একজন আদর্শ মাতাকে সন্তান পরিচালনার হাল শক্তভাবে ধারণ করতে হয়। যেন কোনভাবেই তার পদস্খলন না হয়। এটাই হলো একজন আদর্শ মাতার চরম সফলতা।

বস্তুতঃ ইসলামী নৈতিকতা ও ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতেই একজন আদর্শ মাতা পারেন তার সন্তানকে নির্মল চরিত্রের অধিকারী করে গড়ে তুলতে। সন্তানদেরকে যে আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, তার বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে ইসলামী শরীয়তে-আমাদের তা মেনে চলতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ঔষধ ব্যবহারে মায়েদের করণীয়

গর্ভাবস্থায় মায়েদেরকে ঔষধ সেবন বা ব্যবহারে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ সময় এমন কিছু ঔষধ রয়েছে-যা মোটেও সেবন করা উচিত নয়। বিশেষ করে জীবন রক্ষাকারী এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ।

যেসব ঔষধ শরীরের রোগ জীবাণু ধ্বংস করে, এগুলোকে সাধারণতঃ এন্টিবায়োটিক বলা হয়। আজকাল সামান্য অসুখেই দামী ও শক্তিশালী এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুফাস্বল এলাকায় পল্লী ডাক্তারগণ সামান্য রোগে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে থাকেন। এটা মোটেও ঠিক নয়। এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের বিশেষ ক্ষেত্র ও মাত্রা রয়েছে, তার যথাযথ প্রতিপালন জরুরী।

গর্ভাবস্থায় যেসব এন্টিবায়োটিক সেবন বা ব্যবহার নিষেধ, এগুলোর কিছু আলোচনা করা গেল-

"ক্লোরামফেনিকল" গ্রুপের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে গর্ভবতীর রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে। ফলে গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। ম্যালোরিয়া জ্বরে ব্যবহৃত "ক্লোরোকুইন" গ্রুপের ঔষধ ব্যবহারে গর্ভস্থ শিশু বধির হয়ে জন্মাতে পারে।

"নাইট্রোফুরানটেনন" গ্রুপের ঔষধ ব্যবহারে গর্ভস্থ শিশুর রক্ত কণিকা ভেঙ্গে গিয়ে জন্ডিসে আক্রান্ত করতে পারে। তাছাড়া "সালফোনামাইডস" গ্রুপের ঔষধ ব্যবহারেও শিশুর জন্ডিস দেখা দেয়। "টেট্রাসাইক্লিন" জাতীয় ঔষধ ব্যবহারে গর্ভস্থ শিশুর হাড় ও দাঁতের ক্ষতি হতে পারে। টিবি বা যক্ষা রোগে ব্যবহৃত "স্ট্রেপটোমাইসিন" ব্যবহার নবজাত শিশুর বধিরতা ও গোশতপেশীল দুর্বলতা বাড়ায়।

গর্ভবতীকালীন সময়ে "কো-ট্রাইমক্সাজল", যা সচরাচর জ্বরে ব্যবহৃত "কট্রিম" নামে পরিচিত, আমাশায় অথবা পেটের পীড়ায় "মেট্রোনিডালজ" গ্রুপের ঔষধ, ম্যালেরিয়া রোগে ব্যবহৃত "কুইনাইন", কৃমিনাশক ঔষধ বিশেষ করে "লভামিজল" ব্যবহার গর্ভপাত ঘটাতে পারে।

এছাড়াও ব্যথানাশক বিভিন্ন ঔষধও এ সময় ক্ষতির কারণ হয়। গেটে বাত বা সাধারণ ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত "ইনডোমেথাসিন" গ্রুপের ঔষধ ব্যবহারে গর্ভস্থ শিশু যে কোন পঙ্গুত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারে। "এ্যাসপিরিন" গ্রুপের ঔষধ ব্যবহারে জন্ডিসের প্রবণতা দেখা দিতে পারে। বাতের ব্যথায় ব্যবহৃত "ফিনাইল বিউটাজল" গ্রুপের ঔষধও ক্ষতি করে থাকে। সবচেয়ে মারাত্মক "এ্যামাইডোপাইরিন" গ্রুপের ঔষধ। এটি ব্যবহারে রক্তের শ্বেত কণিকা তৈরীতে বাধা দেয়।

এ ছাড়া ব্যথানাশক হিসেবে ব্যবহৃত আরো কিছু ঔষধ যেমন- "ধাইবুপ্রুফেন" ডাইক্লোফেনাক সোডিয়াম", "কিটোপ্রফেন" ইত্যাদি গ্রুপের ঔষধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করাই ভাল। তাছাড়া এগুলো গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বাড়িয়ে দেয়। "কর্টিসোন" ও "প্রেডনিসোলন" গ্রুপের ঔষধ ব্যবহারে মৃত শিশু জন্ম নিতে পারে। গর্ভবতী মা "ইস্টোজেন"। "স্টিলবেস্টোরল" গ্রুপের ঔষধ ব্যবহার করলে, শিশু পূর্ণবয়স্ক প্রাপ্ত হওয়ার পর তার যোণী পথে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত গর্ভকালীণ সময়ে বেশী মাত্রায় "ভিটামিন-এ" গ্রহণ করলে শিশুর কিছু জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী মা জন্মনিরোধক ঔষধ

খেলে বা ব্যবহার করলে, গর্ভস্থ শিশুর দৈহিক গঠনে বিকৃতির সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বরে দীর্ঘদিন ভুগলে তার জন্ডিস দেখা দিতে পারে। এ সময় উপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাসপাতাল বা ক্লিনিকে ভর্তি রেখে সাবধানতার সাথে রেজিঃ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা নিতে হবে।

গর্ভাবস্থায় অনেক মায়েদের মুখ, হাত ও পায়ে পানি আসে বা ফুলে যায়। এ সময় অন্যান্য ঔষধের সাথে প্রধান ঔষধ "ফ্রসেমাইড' গ্রুপের ঔষধ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা মুখে খাওয়ার ৩০ মিনিটের মধ্যে মূত্রবর্ধক ক্রিয়া প্রকাশ পেয়ে থাকে। এটি কিডনীর কার্যকারিতায় শরীরের ইলেকট্রোলাইটের স্বল্পতা ও লিভার সিরোসিস রোগে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তবে গর্ভাবস্থায় প্রথশ তিন মাসে স্তন্যদানরত মায়েদের ক্ষেত্রে প্রস্ট্রট গ্রন্থির অতিরিক্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে "ফ্রুসেমাইড" গ্রুপের ঔষধ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা যায়।

"আইসোসরবাইড ডাইনিট্রেড" গ্রুপের ঔষধ গর্ভবতী অবস্থায় ব্যবহার না করাই উত্তম। তাছাড়া "ডিলটিয়াজেম" জাতীয় ঔষধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহার না করা উচিত।

"পাইরাজিনামাইড" গ্রুপের ঔষধ গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয়।

এক কথায়, গর্ভাবস্থায় যে কোন ঔষধ ব্যবহারেই সতর্ক থাকা উচিত। তবেই আমরা পেতে পারি-জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার সুস্থ, সবল ও সুন্দর শিশু। আর এজন্য গর্ভাবস্থায় যার তার নিকট থেকে যা ইচ্ছে তাই ঔষধ না খেয়ে অভিজ্ঞ রেজিঃ ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া কর্তব্য।

সাফল্যের কিছু উপায়

মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তার সুন্দর ব্যবহার আর উন্নত জীবন পদ্ধতির কারণে পদে পদে সাফল্য এসেছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবের মর্যাদা অলংকৃত করেছেন। নিম্নে তার চরিত্রের আলোকে কিছু পরামর্শ তুলে ধরা হল ঃ

সাফল্য কে না চায়, কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? কেউ কেউ বলেন, আমার কপাল খারাপ। এজন্যে আমার কোন কাজে সাফল্য আসে না। আসলে সাফল্য কোন মতে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হলেই তাতো আর ধরা দেবে না। আবার শুধু গাধার খাটুনি খাটলেই যে সাফল্য আসবে তারও কোন গ্যারান্টি নেই। এ জন্যে প্রয়োজন সঠিক কতকগুলো কলাকৌশল অবলম্বন করা।

১. প্রশংসা ঃ অন্যের কাজের প্রশংসা করুন। যার কাজে যতটুকু প্রশংসা প্রাপ্য তাই-তাকে দিন। অহেতুক চাটুবাজি করার কোন দরকার নেই। কাজের স্বীকৃতি প্রতিটি মানুষই চায়। তাই তাকে তার প্রাপ্য পাওনাটি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিন। ঐ মানুষটি পরবর্তীতে আপনার সাহায্যে বা উপকারে হাত বাড়াবে।

২. উপকার ঃ আমরা অন্ততঃ এই বাক্যটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে পারি, কারও উপকার না করতে পারলেও অপকার করবো না। আপনি যাদের উপকার করেছেন তাদের কথা স্মরণ করুন। তাদের কাছ থেকে সমান কোন উপকার প্রত্যাশা করবেন না। দেখবেন, কাজের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে তারা উপকারে আসবে।

৩. পরিশ্রম ঃ পরিশ্রমের কোন বিকল্প নেই। যথেষ্ট পরিমাণে পরিশ্রম করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। ঐ কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি পরিশ্রম করবো না। উদ্যোমী হোন, অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে সাধারণের চাইতে আপনাকে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

৪. আত্মবিশ্বাস ঃ নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন যে, এই কাজটি আপনি পারবেন। এই আত্মবিশ্বাস আপনাকে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। আমি করতে পারবো না, আমাকে দিয়ে এই কাজটি হবে না, আমি এ কাজ করার উপযুক্ত না ইত্যাদি বাজে কথা আজই পরিত্যগ করুন। আপনার ছোট ছোট সাফল্যগুলোকে একটি খাতার পাতায় লিখে ফেলুন। দেখবেন কত কাজ! আপনি নিজের উপর আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন।

৫. প্রতিভা ঃ একটি মানুষের মধ্যে অনেকগুলো প্রতিভা লুকিয়ে থাকতে পারে। একটি মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলের মধ্যেও অপূর্ব কোন প্রতিভা লুকানো থাকতে পারে। নিজের মধ্যেকার লুকানো প্রতিভাগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন।

৬. যোগাযোগ ঃ আমরা ব্যক্তিগতভাবে কতটা যোগাযোগ বিছিন্নভাবে বসবাস করি। নিজেকে কোনভাবেই সবার কাছ থেকে বিছিন্ন রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যাকে আপনার প্রয়োজন হবে, তার সাথে আজ থেকেই যোগাযোগ বজায় রাখুন। চমৎকার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

৭. ব্যবহার ঃ ব্যবহারে কি না হয়? ভদ্র, নম্র ও সংযত আচরণ করুন সবার সাথে। ভয়-ভীতি বা ধমক কিংবা অর্থ দিয়েও যা না হয়, কেবলমাত্র সুন্দর

ব্যবহার করলেই তার চাইতে বেশী কিছু আদায় করা যায়। সুতরাং ব্যক্তি নির্বিশেষে সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করুন।

৮. পড়ুন ঃ কেবলমাত্র পড়ার বই ছাড়া আর কিছু পড়বো না এ ধারণাটি সঠিক নয়। হাতের কাছে যাই পান-বইপত্র, ম্যগাজিন যাই হোক না কেনা পড়ুন। বাসে করে দূরে কোথাও যাচ্ছেন একটি বই সাথে রাখুন। ট্রেনে করে নানার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছেন সাথে একটি বই রাখুন, পড়ুন- যখনই সময় পান। পড়ার এই অভ্যাস একটি বিষয়কে বিশদভাবে চিন্তা করার সুযোগ করে দিবে আপনাকে।

৯. নিজের ঢোল নিজে পিঠাতে হয় না ঃ এ ধারণাটি আজকাল অচল। আপনার কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যকে একটি পরিষ্কার ধারণা দিন। আপনি কতটা মেধাবী, কতটা দক্ষ, কতটা পরশ্রমী, এ সম্পর্কে অন্য সবাই না জানতে পারলে তার কোন দামই নেই আজকের পৃথিবীতে। সুতরাং নিজের সম্পর্কে অন্যকে একটি স্বচ্ছ ধারণা দিন।

১০. আবেগ ঃ আবেগকে রশি দিয়ে টেনে রাখুন। আবেগতাড়িত হবেন না। অতিরিক্ত আবেগ কাজ কর্ম দক্ষতাকে কমিয়ে দেয়। আবেগকে দমন করুন, সঠিক সিদ্ধান্ত নিন।

১১. ধৈর্য ধরা ঃ চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌঁছানো পযর্ন্ত ধৈর্য ধরুন, ধীরস্থির থাকুন, চরম উত্তেজনায় আপনার সাফল্য হারিয়ে যেতে পারে। ধৈর্য আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

১২. ব্যর্থতা ঃ ব্যর্থতাকে স্বীকার করুন। মনে রাখুন, সাবইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। মানুষের কাজের একটা সীমারেখা আছে। সব কিছু ঠিক-ঠাক করার পরও আপনি ব্যর্থ হতে পারেন। এই ব্যর্থতাকে শান্ত মনে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলুন। ব্যর্থ হয়ে যাওয়া কাজটি আবার সম্পাদন করার জন্যে ভিন্ন দৃষ্টিতে এগিয়ে যান। নিশ্চিত আপনি এবার সফল হবেন।

বদমেযাজ নারীতে অগণিত ছওয়াব

হাদীসের ভাষ্য মতে কিছু নারী এমন রয়েছে "তারা হচ্ছে জাহাঁবাজ নারী যারা কর্কশভাষা ও বদমেযাজের দ্বারা স্বামীর রক্ত চোষণকারীণী। তারা স্বামীর গলার বেড়ি স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা এসব মহিলাকে তার ঘাড়ে আটকে দেন। আবার যাকে যখন ইচ্ছা মুক্ত করে দেন।"

এসব মহিলা বড়ই বদখাসলতের। এদের দুরাচারের কারণে স্বামী অতিষ্ঠ হয়ে জান বাঁচানোতেই ব্যস্ত থাকে। তাই এদের দ্বারা স্বামী দাম্পত্য সুখ-সোহাগের আশা করতে পারে না। এরা স্বামীর গলায় কাঁটা স্বরূপ আটকে থাকে। আবার স্বামী একে ছাড়তে চাইলেও কাবিননামার টাকা পরিশোধে অক্ষম হওয়ায় তা পারে না।

এ ধরনের মহিলা ঘাড়ে পড়া মূলতঃ পুরুষদের জন্য জ্বলন্ত পরীক্ষা স্বরূপ। অথবা এটা তাদের পাপের প্রতিফল। তাই তারা দুনিয়াতে এই সাজা ভোগ করতে থাকবে, আর ক্ষমা ও পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকবেন,

এই পরীক্ষার বেড়ি ভালো-মন্দ সবার কপালে লেগে যেতে পারে। তবে আল্লাহর খাস বান্দারা এটাকেও নিয়ামত মনে করেন এবং এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে মহান আল্লাহর দরবারে উচ্চ মকাম লাভের আশা পোষণ করেন।

এ ব্যাপারে হযরত মির্জা মাজহার জানেজানাঁ (রহঃ)-এর ঘটনা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। হযরত মির্জা মাজহার (রহ.) বড় বুযুর্গ ছিলেন, তবে তবীয়ত ছিল খুবই নাজুক। এরূপ নাজুক তবীয়তের লোক খুব কমই দেখা যায়। তাঁর নাজুক তবীয়ত সম্পর্কে বুঝার জন্য একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। গোলাম আলী (রহ.) ছিলেন মির্জা মাজহার (রহ.)-এর খাস খলীফা। অবশ্য তিনি পরবর্তীতে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

একদিন মির্জা মাজহার (রহ.)-কে গোলাম আলী (রহ.) হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। মির্জা মাজহার (রহঃ) বললেন, গোলাম আলী! হাতে জোর নেই বুঝি! এরপর গোলাম আলী (রহ.) একটু জোরে বাতাস দিতে লাগলেন। তখন তিনি বললেন, গোলাম আলী! বাতাস দিয়ে আমাকে উড়িয়ে দেবে নাকি! এতদুকারণে গোলাম আলী (রহ.) কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন- "হুজুর! না এদিকে যেতে পারি, না ওদিকে।"

ব্যস, এতেই মির্জা মাজহার (রহঃ)-এর মধ্যে জালালত এসে যায়। তিনি বলে ওঠেন- বের হয়ে যাও এখান থেকে, এখনই যাও। এখানে এদিকও যাওয়া যাবে না, ওদিকেও যাওয়া যাবে না।

এরপর সত্যি সত্যিই তিনি তখনই তাঁকে সেখান থকে বের করে দেন। অতঃপর সাতদিন পর্যন্ত এ অবস্থা চলে। পরিশেষে গোলাম আলী (রহঃ) অনবরত ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি করে ইসলাহ হওয়ার পর অবস্থা স্বাভাবিক হয়।

আরেক দিনের ঘটনা। একবার এক পুলিশ অফিসার মির্জা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। ঘরে পানির কলস দেখে তিনি সেই পানি পান করার

অনুমতি প্রার্থনা করলেন। পানি পান করার পর কিছুক্ষণ বসে থেকে তিনি মির্জা মাজহার (রহ.)-এর সাথে নানা রকম আলাপচারিতায় লিপ্ত হন। লোকটির বেঢঙ্গা কথা খুব কষ্টে মির্জা মাজহার (রহঃ) হজম করতে থাকেন।

চলে যাওয়ার সময় পুলিশ অফিসার বললেন, হুযুর! অনুমতি হলে, কোন মানুষ আপনার খিদমতে পাঠিয়ে দেই। মির্জা মাজহার (রহ.) উত্তরে বললেন "আগে নিজে মানুষ হোন, তারপর কাউকে এখানে পাঠাবেন। আপনি পাত্র থেকে পানি পান করার পর ঢাকনাটা বাঁকা করে রেখেছেন, এরপর থেকেই আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে।

মির্জা মাজহার (রহঃ)-এর তবীয়তের অবস্থা অবগত করানোর জন্য এখানে দু'টি ঘটনার উল্লেখ করলাম। তাঁর জীবনের এ রকম বহু ঘটনা রয়েছে। এরকম একজন নাজুক তবীয়তের বুযুর্গ ব্যক্তি স্ত্রীর ব্যাপারে কতটা সহনশীল, তা প্রমাণ করার জন্যই এই ঘটনাগুলোর অবতারণা করলাম। নিম্নে স্ত্রীর সহিত মির্জা মাজহার (রহ.)-এর আচরণ সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

আল্লাহর কী মর্জি, এমন একজন নাজুক তবীয়তের বুযুর্গের যিনি স্ত্রী ছিলেন, তার রূদ্রমূর্তি দেখে যে কোন লোক ভীমড়ি খেয়ে যেত যেন। মির্জা মাজহার সাহেবের অভ্যাস ছিল, প্রত্যেক দিন আসরের পর একজন খাদিম পাঠিয়ে স্ত্রীর কোন কিছুর হাজত আছে কি না তা জেনে নিতেন। খাদিম গিয়ে পর্দার আড়াল থেকে যেইমাত্র মির্জা সাহেবের কথা বলত, তৎক্ষণাৎ ঐ মহিলা গালী-গালাজ শুরু করে দিতেন। কিছুক্ষণ বকতেন ঐ খাদিমকে। এরপর মির্জা মাজহার সাহেব সম্পর্কে কিছুক্ষণ নানা রকম বদনাম ও কটুক্তি করতেন। এসব শেষ করে কোন হাজত থাকলে, সেটা উল্লেখ করতেন।

একদিন মির্জা মাজহার সাহেব নতুন একজন খাদিমকে সেই খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। এ খাদিমটি ছিল পাঠান। নিয়মমফিক খাদিম যখন পর্দার আড়াল থেকে হাজত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, তখন বেগম সাহেবা দস্তুর মুতাবিক বকাবকীর ফুলঝুড়ি ফুটাতে লাগলেন। পাঠান লোকটি এ অবস্থা দেখে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হলো। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, ঐ মহিলা কি দ্বীনচ্যুত হয়ে গিয়েছেন? তা না হলে আমাদের মহামান্য বুযুর্গ পীর সাহেবকে কেন এমন বিশ্রীভাবে গালমন্দ করবেন?

লোকটি বাহির থেকে এসব কথা বলে ফিরে আসল এবং মির্জা মাজহার সাহেবকে বলল, হযরত! আপনার স্ত্রী কী ভয়ংকর আপনাকে অকথ্য ভাষায় গালী-গালাজ করলেন।

হযরত মির্জা মাজহার জানেজানাঁ (রহঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নাজুক তবীয়ত দেখে এই বিবিকে আমার কপালে স্থির করেছেন এবং ইলহামের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমার সকল মর্যাদার ফয়সালা এই মহিলার মাধ্যমেই বর্তিত হবে। এর দেয়া কষ্ট সহ্য করতে পারলে, তুমি উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে।

বলা বাহুল্য, আল্লাহর ওলী-বুযুর্গগণ বদমেযাজী ও অবাধ্য স্ত্রীর বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখেন। আমাদের মত তাঁরা স্ত্রীর সাথে সারাদিন যুদ্ধ করেন না, ঝগড়া-ফাসাদ করেন না। তাঁরা অনুভব করেন, এই বদমেযাজী স্ত্রী গলার বেড়ি বটে-যা আল্লাহ তা'আলা-ই আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা আরো ভাবেন-এই বদমেযাজী স্ত্রীকে আল্লাহ তা'আলা আমার ভাগ্যে জুড়িয়ে দিয়েছেন। আমাকে পরীক্ষা করার জন্য, অথবা এই বেড়ি আমার গলায় লেগেছে আমার গুনাহের কারণে। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই আমাকে পাপমুক্ত করতে এই বিবি দান করেছেন। এই বিবির নির্যাতন সহ্য করার বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা আমার যিন্দেগীর গুনাহ মাফ করবেন। আবার ভাবেন-এই স্ত্রী আমার মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যম। তার অত্যাচারে সবর করার ওসীলায় আল্লাহ তা'আলা আমার মর্যাদা বুলন্দ করবেন।

সারকথা, বদমেযাজী স্ত্রী যদি কারো ভাগ্যে জুটে, তাহলে এটাকে মহান আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে সবর করতে হবে। সেই স্ত্রীর সহিত পাল্টা বদমেযাজের দ্বারা প্রতিশোধ নেয়া যাবে না বরং সময়-সুযোগমত তাকে বুঝিয়ে সুপথে আনার চেষ্টা করতে হবে এবং তার সংশোধনের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে রোনাজারী করে ক্ষমা চাইতে হবে এবং আমল-আখলাক দুরস্ত করে সর্বাবস্থায়ই শরীয়তের হুকুম পালন করে যেতে হবে।

বদমেযাজ স্ত্রীকে নিয়ে এভাবে ধৈর্য-সহ্যের সহিত জীবন কাটাতে পারলে, এই বদ স্ত্রীই তার পরকালীন জীবনের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হবে। স্ত্রীর বদমেযাজী, গালাগালী ও রুক্ষ ব্যবহারে সবর ও ধৈর্য ধরার বিনিময়ে সে মহান আল্লাহর নিকট অজস্র ছওয়াব, ফজীলত ও মহাপুরস্কারের অধিকারী হবে।

অনুরূপভাবে বদমেযাজ স্বামীর বেলায়ও একই কথা। কোন স্ত্রীর ভাগ্যে যদি বদমেযাজ ও হিংস্র স্বামী পড়ে, সে এটাকে মহান আল্লাহর পরীক্ষা মনে করে এক্ষেত্রে সবর-ধের্য ও দোয়ার বিনিময়ে মহান আল্লাহর নিকট বিশেষ রহমত, ছওয়াব, পুরস্কার ও ফজীলত লাভ করবে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির সেরা জীব। সেরা জীবের কাজও হবে উৎকৃষ্ট। এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এর ব্যতিক্রম হয় তাহলে মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় আর থাকে না। আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। প্রত্যেকটি জাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব। পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে পাঠিয়েছেন নবী-রাসূল সর্বশেষ নবী ও রাসূল আমাদের আদর্শিক নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর উম্মতগণ তাদের দাম্পত্য জীবন কেমনভাবে পরিচালনা করবে তার দিক নির্দেশনাও তিনি দিয়ে গেছেন।

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক বা দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেছেন "এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই- তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের সঙ্গিনীদিগকে সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা তাদের নিকট থেকে শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

(আল কুরআন-৩০ঃ২১)

তিনি আল্লাহ যিনি একটি মাত্র আত্মা থেকে তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন আর তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়"।

(আল-কুরআন ৭ঃ১৮৯)

পবিত্র কুরআনে স্বামী ও স্ত্রীকে পরস্পরের পোশাক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, পোশাক যেমন দেহের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং মানবদেহকে বাহিরের অনিষ্ট হতে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রীও তদ্রূপ পরস্পর মিলে মিশে থাকবে একে অন্যকে সংরক্ষণ করবে। পোশাক ও দেহের মধ্যে যেমন কোন আবরণ থাকে না। তদ্রূপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন আবরণ থাকবে না।

"তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক"

(আল-কুরআনঃ ২-২৮৭)

পারিবারিক জীবনে চলার ক্ষেত্রে সাংসারিক দায়িত্ব একজনের উপর অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। অন্যথায় পরিবারের সুষ্ঠু পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। তাই ইসলাম পুরুষের উপর কর্তৃত্বভার অর্পণ করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন "পুরুষ নারীর উপর কর্তা, কারণ আল্লাহ তায়ালা

তাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য পুরুষ (নারীদের জন্য) নিজেদের ধন ব্যয় করে। (আল-কুরআন-৪ঃ৩৪)

কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে– "নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে।" (আল-কুরআন-২ঃ২২৮)

স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তা, অভিভাবক ও দায়িত্বশীল-উল্লিখিত আয়াতদ্বয়-এর উজ্বল প্রমাণ। তবে এই কর্তৃত্ব অর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন না করলে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই পরিচালক ও দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেককেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং শাসনকর্তা তার অধীনস্তদের জন্য পরিচালক ও দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। পুরুষ তার স্ত্রী, পরিবার-পরিজনের জন্য পরিচালক ও দায়িত্বশীল। এ দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। ভৃত্য তার মনিবের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বশীল। এ জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খুব সতর্ক হও। তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই তোমাদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।

(বুখারী)

বুখারী শরীফের অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া তার উচিত নয়। আর আমি তোমাদিগকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ (পুরুষের) বুকের পাশের বক্র হাড় দ্বারা নারী সৃষ্টি হয়েছে এবং এর উপরের অংশই সর্বাধিক বাঁকা। তুমি যদি তাকে একেবারে সোজা করতে চেষ্টা কর তবে তা ভেঙ্গে যাবে। আর তাকে সোজা করতে চেষ্টা না করলে বাঁকাই থেকে যাবে। অতএব আমি তোমাদিগকে নারীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে উপদেশ দিচ্ছি।

স্বামী–স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে সুখ নেমে আসে তখন, যখন একজন স্বামীর জীবনসঙ্গিনী হয় সৎ চরিত্রবতী এবং স্ত্রীর জীবনসঙ্গী হয় সৎ চরিত্রবান। তখন সংসারে থাকে না কোন কলহ বিবাদ, দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ, তাদের সংসার হয় জান্নাত। সতী-সাধবী স্ত্রীর বৈশিষ্ট সম্পর্কে কুরআনে পাকে বলা হয়েছে– "নেককার নারীরা হয়ে থাকে স্বামীদের অনুগত এবং আল্লাহ তায়ালার তত্বাবধানে ও

হিফাযতে স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের গোপনীয় বিষয়ের সংরক্ষণ করে।

(আল- কুরআন ৪ঃ৩৪)

মুমিন পুরুষদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে 'হে রাসূল! ইমানদারগণকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং যৌন-অঙ্গের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য পবিত্র পন্থা। তারা যা কিছু করে আল্লাহ তায়ালা সে সম্পর্কে অবশ্যই অবগত আছেন। আর ঈমানদার নারীদিগকেও বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং যৌন অঙ্গের হিফাজত করে এবং যা স্বতই প্রকাশ হয়ে পড়ে তা ব্যতীত তারা যেন তাদের যীনাত অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা বা বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা অবৃত করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, সেই হল সর্বোত্তম স্ত্রী যাকে দেখলে তোমার মন খুশি হয় এবং তুমি তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে মেনে নেয়। আর তুমি যখন ঘরের বাইরে থাক তখন সে তোমার ধন সম্পদ ও নিজের হিফাযত করে। স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, স্বামীর আনুগত্য হতে আল্লাহর আনুগত্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্বামী যদি কোন স্ত্রীকে পাপ কাজের আদেশ দেয় আল্লাহর ফরজ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়, তা অমান্য করাই স্ত্রীর কর্তব্য। হাদীস শরীফে আছে, সৃষ্টিকর্তার নাফরমানী করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না। কিন্তু স্বামী যদি নফল নামাজ পড়তে বা নফল রোজা রাখতে স্ত্রীকে নিষেধ করে তবে তা মান্য করা আবশ্যক। এমতাবস্থায় নফল এবাদত কবুল হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্বামী উপস্থিত থাকলে তার অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর (নফল) রোজা রাখা উচিত নয়। (বুখারী)

তিনি আরও বলেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে তার বাসনা পূরণের জন্য আহবান করে তখন চুলায় রন্ধনে লিপ্ত থাকলেও সে তার ডাকে সাড়া দেয়। (তিরমিযী) স্ত্রীর সাথে স্বামীর ব্যবহার কেমন হবে এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "আর স্ত্রীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, তোমরা একে ঘৃণা করছ। স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণের সঙ্গে জীবন যাপনের নির্দেশ এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তব জীবনে চলার পথে স্ত্রীর কোন ত্রুটিবিচ্যুতি হতেই পারে। এ অবস্থায় তাকে বাদ দেওয়ার উদোগ গ্রহণ করা কোনক্রমেই ঠিক নয় বরং যথাসম্ভব ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বিষয়গুলো বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। হতে পারে স্ত্রী অসুন্দর, কিন্তু তার মধ্যে এমন গুণের সমাহার আছে যা দৈহিক সৌন্দর্য অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন চলার পথে

দেখা অনেক সুন্দরী স্ত্রী ঘরে থাকার পরও দাম্পত্য জীবন কলহপূর্ণ। কারণ স্ত্রী সুন্দর হলে কি হবে তার মধ্যে দ্বীনী দায়িত্ব নেই। এমন স্ত্রী অপেক্ষা অসুন্দর দ্বীনদার স্ত্রী অনেক শ্রেয়।

স্ত্রীকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিবাহ কর তালাক দিও না। কারণ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিভিন্ন নারীর স্বাদ গ্রহণকারী পুরষ এবং বিভিন্ন পুরুষের স্বাদ গ্রহণকারী নারীদিগকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অন্যত্র বলা হয়েছে, তালাক বৈধ হলেও আল্লাহর নিকট তা অপেক্ষা ঘৃণ্য অপর কোন বস্তু নেই।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব হলে এবং তা সংশোধন না হলে স্ত্রীর উপর কিছুটা কঠোরতা অবলম্বনের অধিকার ইসলাম স্বামীকে দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন, "স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশংকা কর তাদেরকে সদুপদেশ দাও। তারপর তাদের শয্যা বর্জন কর এবং তাদের প্রহার কর। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে (নির্যাতনের) কোন ছুতা অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ মহান শ্রেষ্ঠ। আর যদি উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা কর তবে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার হতে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিশ নিযুক্ত কর। যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূলে অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশেষ অবহিত।" (আল-কুরআন-৪ঃ৩৪-৩৫)

স্বামীর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে থাকাকে ইসলাম স্ত্রীর উপর অবশ্য কর্তব্য করে দিয়েছে। কারণ এছাড়া দাম্পত্য জীবন কোনদিন সুখের হবে না। স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিণী এবং স্বামীর সর্বাপেক্ষা কাছের মানুষ। এজন্য স্বামীর খেদমত করার জন্য স্ত্রীই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। রাসূল (সঃ)-এর স্ত্রীগণ হলেন জগতের স্ত্রীদের সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁরা সকলেই স্বামী সেবার উজ্বল ও উৎকৃষ্ট নজির রেখে গেছেন। তাদের আদর্শ অনুসরণে স্বামী সেবায় ব্রতী হওয়া সকল স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। কেননা স্ত্রীর আনুগত্য ও সেবা লাভের অধিকার স্বামীর রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- "সতী-সাধ্বী নারীরা একান্তভাবেই স্বামীদের অনুগত ও অনুরক্ত হয়ে থাকে।" (আল-কুরআন ৪ ঃ ৩৪)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে নারী পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমযান মাসের রোজা রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে এবং স্বামীর অনুগত থাকে বেহেশতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে।

(মুসনাদে আহমদ)

অন্য হাদীসে আছে, যে নারীর মৃত্যুকালে তার স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী)

যে ব্যক্তি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিলের বীজ বপন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, স্ত্রী যখন তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত্রি যাপন করে সে তার বিছানায় ফিরে না আসা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার উপর লা'নত করতে থাকে। (বুখারী)

স্বামীর উপর দায়িত্ব হচ্ছে তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণপোষন করবে। সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কৃপণতা করা নাযায়েজ। বিবাহের পর স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ সকল প্রকার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে স্ত্রী যদি স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেয় সেটা হবে স্বামীর প্রতি জুলুম।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, "বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ তায়ালা যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছে, এর চেয়ে গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ তায়ালা কষ্টের পর স্বস্তি দিবেন।" (আল-কুরআন ৬৫ঃ৭)

স্বামী বিত্তবান ও সচ্ছল হলে তার সচ্ছলতা অনুসারেই স্ত্রীর ভরণপোষণ করবে। আর অস্বচ্ছল হলে তদনুযায়ীই তার ভরণপোষণ করবে।"

(আল-কুরআন-২ঃ২৩৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসূল, স্বামীর উপর স্ত্রীর কি অধিকার আছে? জবাবে তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে, তখন তাকে আহার দিবে এবং তুমি যখন বস্ত্র পরিধান কর তখন তাকে বস্ত্র পরিধান করতে দিবে। তাকে চপেটাঘাত করবে না। তাকে গালাগালি করবে না এবং তাকে ঘরের ভিতর না রেখে তুমি বাইরে যাবে না। (অর্থাৎ স্বামী বাইরে গেলে যে স্ত্রী নিজেকে হেফাযত করে পর্দার বিধান পুরাপুরি মেনে চলে) স্বামীকে তার সাধ্যানুসারে স্ত্রীর খোরপোষ প্রদান সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্ত্রীকেও স্বামীর নিকট বশীভূত বিনীত ও কৃতজ্ঞ থাকতে বলা হয়েছে। অন্যথায় দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হবেই। অকৃতজ্ঞ স্ত্রীর পরকাল সুখের হয় না। স্বামী পরিশ্রম করে স্ত্রীর ভরণপোষণসহ সকল চাহিদা পূরণের জন্য সদা সচেষ্ট থাকে, কোন একদিন যদি কোন ত্রুটি হয় স্ত্রী অকৃতজ্ঞের মত বলে তোমার সংসারে এসে কোনদিন সুখ পেলাম না। এসব

স্ত্রীদের সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোজখে নারীদের সংখ্যায় বেশি দেখতে পেলেন। সাহাবাগণ তার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, তাদের অকৃতজ্ঞতার জন্য। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহ তায়ালার প্রতি অকৃতজ্ঞ? তিনি বলেন, তারা তাদের স্বামীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয় এবং স্বামীরা তাদের প্রতি যে সদাচরণ ও মঙ্গল কামনা করে তা তারা অস্বীকার করে। তুমি যদি জীবনব্যাপী তাদের কারো প্রতি সদাচরণ করে থাক। তারপরও তোমার থেকে এর বিপরীত সামান্য কিছু দেখতে পেলেই সে বলবে, তোমার কাছ থেকে কখনও কোন ভাল কিছু পেলাম না। (বুখারী)

হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে নারী তার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নয় আল্লাহ তায়ালা তার দিকে দৃষ্টিপাত করতেও পছন্দ করবেন না। (নাসাঈ)

মানুষকে ব্যভিচারের পথ হতে রক্ষার জন্য ইসলাম বিবাহ প্রথা জারী করে। দাম্পত্য জীবনে একে অপরের যৌন চাহিদা পূরণ করা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের পবিত্র দায়িত্ব। এ দাবী পূরণে কারো পক্ষ থেকে অবহেলা দেখা দিলে দাম্পত্য সম্পর্কে শৈথিল্য আসতে পারে। এরূপে একে অপরের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেও সুখী সুন্দর জীবন গড়ে তোলা মোটেও সম্ভব নয়।

স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে একটি হাদীসঃ ইমানদার স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর গৃহে এমন ব্যক্তিকে আসতে অনুমতি দেয়া বৈধ নয় যাকে সে (স্বামী) পছন্দ করে না (গাইরে মাহরাম সকল পুরুষ) স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে গহের বাইরে যাওয়া এবং এ ব্যাপারে কারও কথা মান্য করাও তার জন্য বৈধ নয়। স্বামীর শয্যা হতে দুরে থাকাও তার জন্য জায়েয নয়। স্বামী অবিচার করলে সাধ্যমত তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এই খেদমত স্বামী গ্রহণ করলে ভাল। আল্লাহ তায়ালা তার ওজর কবুল করে নেবেন, তার সত্যপন্থী হওয়াটা প্রকাশ করে দিবেন। আর স্বামী যদি তাতেও সন্তুষ্ট না হয় তবে আল্লাহপাকের দরবারে তার অক্ষমতার ওজর পৌঁছে যাবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, স্ত্রী যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে তারপরও সে (স্বামী) তার অহমিকার কারণে সন্তুষ্ট না হয় তার জন্য স্ত্রী দায়ী হবে না। স্বামীকে সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা স্ত্রীর কর্তব্য। হাদীস শরীফে আছে, তিন ব্যক্তির নামাজ কবুল হয় না এবং তাদের নেক কাজ আকাশে উত্থিত হয় না। তারা হলো, পলাতক ক্রীতদাস যতক্ষণ পর্যন্ত সে মনিবের নিকট ফিরে না আসে, নেশাখোর মাতাল যতক্ষণ পর্যন্ত সে

প্রকৃতস্থ না হয় এবং সেই স্ত্রী যার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট, যতক্ষণ স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট না হয়। (মুসলিম)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে "নেককার নারীগণ স্বামীদের প্রতি অনুগত ও বিনয়ী থাকে এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে তাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করে।" (আল কুরআন ৩৩৪)

দোষেগুণেই মানুষ এই সত্য স্বীকার করেই সংসার জীবন পাড়ি দিতে হয়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কিছু না কিছু দোষ থাকেই। এই দোষত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে একে অপরকে গ্রহণ করতে হবে। দাম্পত্য জীবনের কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন ঈমানদার পুরুষ যেন কোন ঈমানদার নারীকে ঘৃণা না করে। তার মধ্যে একটি বিষয় অপছন্দনীয় থাকলেও অপরাপর বিষয় পছন্দনীয় পাওয়া যাবে। (মুসলিম)

এমনিভাবে স্ত্রীরও উচিত স্বামীর ছোটখাট ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তার অন্যান্য গুণে আকৃষ্ট হয়ে তাকে হৃদয়ে বরণ করে নেয়া।

দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে তুলবার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের যদি কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ে তোলা যায় তাহলে সে জীবন হবে জান্নাতী। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী দাম্পত্য জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন।

গৃহ ব্যবস্থাপনায় নারীর প্রতি ৪০ টি নির্দেশনা

(১) রাত্রে দরজা বন্ধ করার আগে ভাল করে দেখে নিন, তাতে বিড়াল-কুকুর যেন ঘরে প্রবেশ করে লুকিয়ে না থাকে। কেননা, এদের রাত্রের বেলা জিনিষপত্র নষ্ট করার আশংকা আছে। আর কিছু না হোক, এগুলোর খসখস আওয়াজে ঘুমের ক্ষতি তো হবেই।

(২) মাঝে মাঝে রেখে দেয়া কাপড় চোপড়, বই-পুস্তক রৌদ্রে দিয়ে শুকিয়ে নিন।

(৩) বাড়ি-ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। প্রত্যেক বস্তু তার নির্দিষ্ট স্থানে সাজিয়ে রাখুন।

(৪) যদি সুস্বাস্থ্য চান হাত-পা বেঁধে শুধু বসে থাকবেন না; বরং নিজ হাতে মেহনতের কাজ করুন, শরীর ভাল থাকবে। বিশেষ করে যাতা ঘুরানো, মসলা পেশা ইত্যাদি ভারি কাজ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী।

(৫) কারো সাথে দেখা করতে গেলে দীর্ঘ সময় বসে গল্প-গুজব করবেন না। কেননা, তাতে তার বিরক্তিবোধ হবে বা তার কাজের ক্ষতি হবে।

(৬) প্রত্যেক বস্তু রাখার স্থান নির্ধারিত করে নিবেন, যেন ঘরের অন্য কারো কাজের সময় এখানে-সেখানে তালাশ করতে না হয়। আবার কাজ সমাধা করে প্রত্যেকেই যেন জিনিষটি পুনরায় ঐ স্থানেই রাখে। এমনিভাবে আপনার নিজের আসবাবপত্র রাখার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করে নিবেন, যেন কাজের সময় সব কিছু হাতের কাছে পাওয়া যায়, তালাশ করতে না হয়।

(৭) চৌকি-পিঁড়ি, বরতন, ইট, পাথর সিল ইত্যাদি চলাফেরার রাস্তায় ফেলে রাখবেন না। অনেক সময় দেখা যায়,-রাতের অন্ধকারে কেউ বেপরোয়াভাবে হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। এভাবে মারাত্মক ব্যথা পাওয়ার আশংকা আছে।

(৮) কেউ কোন কাজের কথা বললে মুখে হ্যাঁ-না একটা কিছু অবশ্যই বলবেন যেন সে নিশ্চিত হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, সে ভেবেছে আপনি শুনেছেন, অথচ আপনি শুনেননি। অথবা সে মনে কর বসে আছে আপনি এটা করবেন, অথচ করলেন না। খামাখা একটা লোক আপনার ভরসায় বসে থাকবে-এটা ঠিক নয়।

(৯) তরকারীতে লবণ বেশি হলে, এর প্রতিকার অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই এ ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

(১০) তরকারীতে মরিচ কেটে না দিয়ে পিষে দিন, যেন মরিচের টুকরায় কামড় লেগে মুখ না জ্বলে।

(১১) তামাশাচ্ছলে বাচ্চাদেরকে হাতে তুলে উপরের দিকে নিক্ষেপ করবেন না, জানালাতে দাঁড় করাবেন না। কেননা, এতে বাচ্চা যদি পড়ে যায়, তবে বিপদ হবে। পিছন থেকে তাদের হাসিচ্ছলে তাড়া করবেন না। তাতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে পারে।

(১২) রাতের বেলা পানি পান করার সময় গ্লাসের পানি বাতির আলোতে ভাল করে দেখে নিবেন।

(১৩) বাসন-পেয়ালা ব্যবহারের পর ভাল করে ধুয়ে উল্টিয়ে রাখবেন, দ্বিতীয় বার ব্যবহারের সময় অবশ্যই পুনরায় ধুয়ে নিবেন।

(১৪) মাটিতে রেখে বরতনে খানা দিলে বরতনটি দস্তরখানায় রাখার পূর্বে নীচটা দেখে নিবেন ময়লা থাকলে পরিষ্কার করে দস্তরখানে রাখবেন।

(১৫) কারো বাড়ী বেড়াতে গেলে কোন কিছু চাইবেন না। অনেক সময় সাধারণ জিনিষও হাতের কাছে পাওয়া যায় না, তাতে অনর্থক মেজবানকে লজ্জিত হতে হয়।

(১৬) মানুষের সামনে বসে থু-থু ফেলা, নাক পরিষ্কার করা, বায়ু ছাড়া ইত্যাদি ভাল নয়। প্রয়োজনে এক পাশে সরে গিয়ে এসব কাজ সেরে নেয়া উচিত।

(১৭) খাওয়ার সময় এমন বস্তুর নাম নিবেন না, যাতে শ্রবণকারীদের ঘৃণা সৃষ্টি হতে পারে। কেননা, এটা অনেকের নিকট অসহনীয় কষ্টের কারণ হয়ে যায়।

(১৮) অসুস্থ ব্যক্তি বা তার পরিবার-পরিজনের নিকট এমন কথা বলবেন না, যাতে করে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় বরং এদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করবেন। যেমন এটা তেমন কিছু নয়, ইনশাআল্লাহ শীঘ্রই ভাল হয়ে যাবেন।

(১৯) কথা বলার সময় বেশি হাত নাড়ানাড়ি করবেন না।

(২০) পরিধানের কাপড় বা এর আঁচল দিয়ে নাক পরিষ্কার করবেন না।

(২১) জুতা পরার সময় ঝেড়ে নিন। হতে পারে কোন বিষাক্ত প্রাণী বসে আছে। তেমনিভাবে শোয়ার পূর্বে বিছানাপত্র ভাল করে ঝেড়ে নিন।

(২২) পর্দার স্থানে কারো ফোঁড়া হলে, তাকে কোথায় হয়েছে জিজ্ঞাসা করবেন না। এতে সে লজ্জাবোধ করবে।

(২৩) মানুষের আসা-যাওয়ার রাস্তায় বসবেন না। তাতে আপনার ও চলাচলকারীর কষ্ট হবে।

(২৪) শরীর ও কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার রাখুন, যেন দুর্গন্ধ না হয়।

(২৫) লোকজন বসা অবস্থায় ঘর ঝাড়ু দিবেন না।

(২৬) তরি-তরকারির ছিলকা, বাকল, বিচি রাস্তায় বা কোন মানুষের উপর ফেলবেন না।

(২৭) চাকু, সুঁই ইত্যাদি ধারালো বস্তু দিয়ে খেলা করবেন না বা বাচ্চদেরকে খেলা করতে দিবেন না।

(২৮) দূর-দূরান্ত হতে কোন মেহমান আসলে, প্রথমে খবর নিন তার প্রস্রাব-পায়খানা সারার প্রয়োজন আছে কি না। থাকলে ব্যবস্থা করে হাত-মুখ ধোয়ার পানি দিন। খাবার-দাবারের ব্যাপারে বেশি আড়ম্বরতায় বিলম্ব না ঘটিয়ে

সময়মত যে খানা পাওয়া যায়, তা-ই পরিবেশন করা কর্তব্য। বিদায়ের দিন খুব ভোরে নাস্তা-পানির ব্যবস্থা করুন। লৌকিকতার চেয়ে বর; যাতে মেহমানের কোন কষ্ট না হয়, সেদিকে নজর রাখুন।

(২৯) টয়লেট বা গোসলখানা থেকে পায়জামার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে বের হবেন না; বরং ভিতরে এ কাজ সেরে বের হবেন।

(৩০) কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে, প্রথমে উত্তর দিয়ে পরে অন্য কাজে লিপ্ত হবেন।

(৩১) কোন কথা বললে বা কারো কথার উত্তর দিতে হলে, স্পষ্ট করে কথা বলুন, যাতে শ্রবণকারী পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।

(৩২) কাউকে কোন কিছু দিতে হলে দূর থেকে নিক্ষেপ করবেন না। কাছে এসে তার হাতে দিন।

(৩৩) কেউ কোন কাজে বা কথায় লিপ্ত থাকলে আপনি যেয়েই তার সঙ্গে কথা শুরু করবেন না। বরং সুযোগের অপেক্ষায় থাকুন। যখন সে আপনার দিকে তাকায়, তখন কথা বলুন।

(৩৪) কারো হাতে কোন কিছু দিলে, সে ভাল করে ধরার আগেই ছেড়ে দিবেন না। অন্যথায় অসতর্কতার কারণে জিনিষ পড়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।

(৩৫) কাউকে পাখা দিয়ে বাতাস দেয়ার খেয়াল হলে লক্ষ্য রাখবেন, তার শরীর বা কাপড়ে যেন পাখা না লাগে এবং এত জোরে বাতাস দিবেন না যে, তার কষ্ট হয়।

(৩৬) খাওয়ার সময় হাড়, কাঁটা ও ফলের ছিলকা এক জায়গায় জমা করুন। এদিক-সেদিক ছুঁড়ে ফেলবেন না। পরে সুযোগমত কোথাও ফেলে দিন।

(৩৭) বই-পুস্তক বন্ধ করার সময় আস্তে বন্ধ করুন। তাড়াহুড়া করলে অনেক সময় প্রথম ও শেষ পাতা ছিঁড়ে যায়।

(৩৮) স্বামীর সামনে পরপুরুষের প্রশংসা করতে নেই, অনেক স্বামী তা অপছন্দ করেন।

(৩৯) তেমনিভাবে পরমেয়ের প্রশংসাও স্বামীর সামনে করতে নেই। তাতে তার মন সেদিকে ধাবিত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে।

(৪০) উড়না-চাদর পরতে খেয়াল রাখুন, লটকে যেন মাটিতে পড়ে না থাকে।

এ সকল নিয়ম মেনে চললে, গৃহে শান্তি-শৃখংলা বিরাজ করবে, মননশীলতা ও রুচিবোধ পরিতৃপ্ত হবে এবং সকলের হক আদায় সহজ হবে।

সুখময় দাম্পত্য জীবন গঠনে নারীর করণীয়

মানব জাতির মাঝে নর ও নারীর মধ্যস্থিত সুশৃংখল ও নীতিসম্মত সংযোগের মাধ্যমে রচিত হয় 'দাম্পত্য জীবন'। এই জীবনের দুই অভিযাত্রীর একজন স্বামী, অপরজন স্ত্রী। আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছায় এ জোড়াটির সৃষ্টি, বিকাশ ও সংযোগ। আল্লাহ তায়ালা তার পাক কালামে এরশাদ করেন- 'আমি তোমাদের মধ্যে থেকেই অস্তিত্ব এনেছি তোমাদের সাথীকে। যাতে তোমরা তাদের নিকট স্বস্তি খুঁজে পাও। আর তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় প্রেমাবেগ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব।

বৈবাহিক জীবনের এই প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের দান তথা প্রত্যক্ষ ইচ্ছার বহিঃপ্রাকশ। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বা বন্ধনটিকে একান্ত অবাধ-মুক্ত আর দিন নির্দেশনাহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি। এর জন্য দেয়া হয়েছে উৎকৃষ্ট মানের নির্দেশনা, আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি নিষেধ। এসব নীতি-নিয়ম পালন করলে শুধু যে দাম্পত্য জীবন সুখময় হয়ে উঠবে তাই-নয়, বরং মানব সভ্যতার কেন্দ্র বিন্দুরূপ পরিবারে প্রশান্তি নেমে আসায় গোটা বিশ্বজগৎ হয়ে ওঠবে শান্তি-সুখের নীড়।

প্রতিটি নারী যেমন স্বামীর কাছে ভালোবাসা কামনা করে, তেমনি স্বামীও তা কামনা করে স্ত্রীর কাছে। দু'জনের সম্মিলিত ভালোবাসার ফলেই জীবন হয়ে ওঠে সুখ ও স্বপ্নময়। প্রতিটি নারীর মত পুরুষও এমন একজন জীবন সঙ্গিনী কামনা করে থাকে, প্রতিটি মুহূর্তেই যাকে একান্ত নির্ভরশীল মনে করতে পারে। নারীর কাছে পুরুষ আজীবন দুর্বল এবং নির্ভরশীল।

একজন পুরুষ তার অনেক কাজের দায়িত্ব স্ত্রীর ওপর ন্যস্ত করে কিছুটা স্বস্তি পেতে চান। স্ত্রীও তাঁর কাজের দায়িত্ব নিতে পেরে গর্ববোধ করে থাকে। এভাবেই একটি সুখের সংসার গড়ে ওঠে। জীবন চলার পথ হয় সহজ-সরল। একটি নারী হাতে মেহেদী মেখে লাল বেনারসী পরে নিজের বাবা-মাকে পর করে একজন অচেনা পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয়, তাঁকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আপন মনে করে চলে আসে তার ঘরে। স্বামীর ঘরকেই মনে করে নিজের আপন ভুবন। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সপে দেয় স্বামীর কাছে। তাঁকেই বানায় সকল চাওয়া-পাওয়ার কেন্দ্রবিন্দু। স্বামীর আদর-যত্নে-সোহাগ স্ত্রীর জীবন হয় ধন্য। যারা স্বামীর এ আদর সোহাগ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হন, তাদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। ব্যাহত হয় স্বাভাবিক জীবন যাপন। কিন্তু এ ভালোবাসা কেউ কারো কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নিতে পারে না। সেটা তাকে জয় করে নিতে হয়। আর তা জয় করা যায় ভালোবাসা দিয়েই। যে

যত ভালোবাসা দিতে পারে সে ততই ভালোবাসা পেতে পারে। স্বামীর ভালোবাসা পেতে হলে এবং সুখী দাম্পত্য জীবন গঠন করতে চাইলে একজন স্ত্রী হিসেবে নিজেকে নিম্নের বিষয়গুলো মেনে চলা উঁচিত।

১। স্ত্রীকে নিজের স্বামী এবং স্বামীর সংসারকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আপন ভাবা উচিত। স্বামীকে সব সময় নিজস্ব প্রেমিক বা একান্ত আপনজন মনে করে সুখে-দুঃখে তার পাশে দাঁড়ানো প্রতিটি নারীরই কর্তব্য। যাতে করে স্বামী তার স্ত্রীকে একান্ত নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারে।

২। পরের কাছে কখনো স্বামীর সমালোচনা, নিন্দ-ভৎসনা করা উচিত নয়। অধিকাংশ স্ত্রী লোক স্বামীর না শোকরী করার কারণে জাহান্নামী হবে। স্বামীকে ভাল করে না বুঝে অহেতুক সন্দেহ করা অনুচিত। তাতে স্বামীর ওপর থেকে স্ত্রীর বিশ্বাস হারিয়ে যেতে পারে। আর বিশ্বাস হল ভালবাসার মূলমন্ত্র বা ভিত্তি, যেখানে বিশ্বাস নেই সেখানে ভালোবাসার অস্তিত্ব কোথায়?

৩। যদি আসলেই স্বামীর স্বভাব খারাপ থাকে, তাহলে এ খেয়াল করতে হবে যে, তার ওপর রাগ-অভিমান করলে, তাকে তিরস্কার ভৎসনা করলে বা অন্য কোনভাবে চাপ সৃষ্টি করলে উল্টো নিজেরই ক্ষতি; বরং তার বদ-অভ্যাস দূর করতে চাইলে বা তাকে বাধ্য করতে হলে তার নিকট নত হতে হবে। বুদ্ধিমত্তার সাথে তার কু-অভ্যাস বদলানোর চেষ্টা করতে হবে নিরলসভাবে। তাকে নির্জনে ডেকে বুঝানোর পরেও বদ-অভ্যাস দূর না হলে, তাকে 'ভাল-ভাল' বলে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। লোকজনের সামনে তার দোষত্রুটি বর্ণনা করলে তার জিদ আরো শতগুণে বেড়ে যাবে এবং জিদের বশবর্তী হয়ে সে কাজ আরো বেশি করে করতে থাকবে। মনে রাঁখতে হবে, আল্লাহ তায়ালা পুরুষকে বাঘের স্বভাব দিয়ে তৈরী করেছেন। বাঘ রাগ করলে কিছুই মানে না, সব ছিড়ে ফেড়ে খায়। আর যদি কেউ নম্রতা স্বীকার করে, তাহলে তাকে কিছুই করে না। তদ্রূপ স্বামীকে বাধ্য করতে চাইলে তার নিকট খুব নত হয়ে চলতে হবে। গোনাহের কাজ ব্যতীত স্বামী যা কিছু করতে বলেন, তা শুনতে হবে। এ উপায় অবলম্বন করলে দেখা যাবে, অল্পদিনেই স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সুদৃঢ় হয়ে যাবে। (বেহেস্তী জেওর, ৪র্থ খণ্ড)

৪। কখনো কোনো বিষয়ে স্বামী অসন্তুষ্ট হলে, স্ত্রীর উচিত মাফ চেয়ে নেয়া। একদা জনৈক ভদ্র মহিলা হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রঃ)-এর বরাবর লিখে পাঠালেন, 'আমার স্বামী আমার উপর কখনো কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হলে, আমি বিভিন্ন কৌশলে তাকে রাজী ও সন্তুষ্ট করে নেই এবং তাতেই আমি

স্বস্তি পাই। কিন্তু কখনো আমার ভুল আমি অনুভব করতে পারি না, ফলে মাফ চাইতে মন চায় না। হযরত অনুগ্রহ করে জানাবেন, এ অবস্থায় আমি কি করব?

হাকীমুল উম্মতের ইরশাদ ঃ "ভুল অনুভব করতে পার কি না পার, স্বামীর নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, আমার কোন ভুল হয়েছে কিনা, যদি তিনি ভুল হয়েছে বলেন, তাহলে নির্দ্বিধায় মাফ চেয়ে নাও।" (দ্বিদার স্বামী ও দ্বীনদার স্ত্রী)

৫। অপচয়কারিনী স্ত্রীদের সাজ-সজ্জা আর আসবাবপত্র এবং সামাজিক উপহার-উপঢৌকন ও আচার-অনুষ্ঠানের সামান যোগাতে পুরুষরা আজ সুদ ঘুষে জর্জরিত। ধীরে ধীরে সবাই ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে। উপরন্তু তাদের সেসব অপচয়ের দায়ে দুনিয়ার সাথে তাদের দ্বীনও রববাদ হয়ে যাচ্ছে তা না হলে অধিকাংশ সংসারে সুখ-শান্তি বহাল আর পুরুষগুলোর পরহেজগারীও সুরক্ষিত থাকত। তাই প্রতিটি স্ত্রীর উচিত, ঈমানদীপ্ত আন্তরিক প্রভাবে প্রভাবিত করে স্বামীকে অসৎ উপার্জন হতে ফিরিয়ে রাখা এবং 'অল্পে তুষ্টির' গুনাবলী অর্জন করা। মনে রাখতে হবে, অসৎ পথে কখনো সুখ আসে না।

৬। স্বামীর অজান্তে কোন কিছু করা উচিত নয়। তার চেয়ে বেশি বুঝি, এরকম ভাব দেখাবেন না। স্বামীর সাথে চালবাজির চেষ্টা করা বোকামী। এতে স্বামী স্ত্রীর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলতে পারে। তাতে করে স্বাভাবিক জীবন চলার পথ ব্যাহত হতে পারে।

৭। স্বামীর সাথে সব সময় মুখে হাসি নিয়েই কথা বলার চেষ্টা করা উচিত। প্রিয়তমার মুখের হাসি স্বামীর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। তাছাড়া এতে আল্লাহপাক খুশী হয়ে সীমাহীন নেকী দান করেন। তাই, স্বামীর সাথে হাসিমুখে কথা বলাকে ইবাদত মনে করে, সদাসর্বদা মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যেন কখনো স্বামী মুখ ভার না দেখেন।

৮। স্বামী বাহির থেকে যতবার ঘরে আসবে, ততবার তার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা, আদর-ভালোবাসা মিশ্রিত সালাম (আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু) দিবেন এবং ঘর থেকে বাহিরে যাবার সময়ও অনুরূপ সালাম দিবেন। তাতে নিঃসন্দেহে প্রেম-ভালোবাসার ভীত আরো পোক্ত হবে।

৯। সহনশীলতা একজন নারীর জন্য খুবই বড় গুণ। স্বামীর সংসারের যে কোন অভাব-অনটন, বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টকে তকদিরের লিখন তথা নিজেরই কোন না কোন গোনাহের ফল হিসেবে মেনে নেয়া উচিত এবং এগুলোকে একান্ত নিজের সমস্যা মনে করে ধৈর্যের সাথে তা সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রেখে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। মানুষের জীবন সব সসয়

এক রকম থাকে না আপনার কর্মই আপনার হাতে সুখের চাবি এনে দিতে পারে ইনশাআল্লাহ।

১০। স্বামীর সাথে সবসময় মধুর ব্যবহার করা উচিত। তাকে কখনো কু-বাক্য বলা বা তার সাথে কখনো ঝগড়া করা উচিত নয়। তাতে করে স্বামী আপনার ওপর বিরক্ত হতে পারে এবং সংসারে দেখা দিতে পারে অশান্তির কালো মেঘ।

১১। স্বামীর নিজ ব্যবহার্য জিনিসগুলোর প্রতি নজর রাখা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। স্বামীর কখন কোন জিনিসের প্রয়োজন, স্ত্রীকে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ স্বামী সবসময় যে কোন ব্যাপারে স্ত্রীর উপরে খুবই নির্ভরশীল।

১২। স্বামী সারাদিন বাইরে থেকে শুধু অর্থ উপার্জন করে থাকেন; কিন্তু তা খরচ করা বা সংসার পরিচালনার দায়িত্ব স্ত্রীকেই নিতে হয়, সুষ্ঠ নিয়মমাফিক পরিচালনার দ্বারা সংসারে সুখ বজায় থাকতে পারে। সুতরাং খরচপত্রের সুক্ষ্ম হিসেব রাখা প্রতিটি স্ত্রীরই একান্ত কর্তব্য।

১৩। স্বামীর রুচিমত ঘরের দ্রব্যাদি সাজানোর চেষ্টা করবেন। যতটুকু সম্ভব সংসারের সব কাজ নিজের হাতে করাই উত্তম। মনে রাখতে হবে, জান্নাতী-রমণীকুলের সর্দার মা ফাতেমা (রাঃ) নিজ হাতে সকল কাজ করতেন। নিজের হাতে স্বামী ও পরিজনদের রান্না করে খাওয়ানোর আনন্দই আলাদা। একজন মেয়ের রান্না করতে না পারার মধ্যে কোন গর্ব নেই। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'যে মেয়ে লোক আপন স্বামীকে খুশি করার জন্য সাজে, সে দু'শ বৎসরের ইবাদতের সওয়াব পাবে।' (বায়হাকী)

অপর এক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ফরমান- 'যে নেকবখ্‌ত নারী নিজের কামাই করা টাকা হতে অভাবী গরীব স্বামীকে একটি দিরহাম (চারআনা) দিয়ে সাহায্য করবে, সে আল্লাহর রাস্তায় সাতটি স্বর্ণের পাহাড় সদকা করার ন্যায় সওয়াব অর্জন করবে। (ইমাম গাজালী)।

হজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- 'যে নারী গরীব স্বামীকে হেকারতের নজরে দেখবে এবং তার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, তার ভাগ্যে বেহেস্ত দূরের কথা, বেহেস্তের সুগন্ধও তার নসীব হবে না। বেহেস্তের সুগন্ধ পাঁচশ বৎসরের দূরের লোকও পাবে।- (তাবারানী)

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ভাল নারী কে? তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, যে নারীর দিকে স্বামী তাকালে তার মন খুশিতে ভরে যায়, যে নারীকে বৈধ আদেশ দিলে,

তৎক্ষণাৎ তা পালন করে, যে নারী তার জান এবং মাল দ্বারা স্বামীর অপছন্দনীয় কোন কাজ করে না সে-ই ভাল নারী।' (মিশকাত, নাসাঈ।)

স্বামীর মর্যাদা দিতে গিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– 'আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কাউকে যদি সেজদা করা জায়েয হত, তাহলে মেয়েদেরকে তার স্বামীকে সেজদা করার হুকুম দিতাম। (তিরমিজী) কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্বামীর মর্যাদা প্রসঙ্গে আরও যে সব বর্ণনা আছে সেগুলো অবলম্বনই সুখময় জিন্দেগী গঠনের সহায়ক, এতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নেই।

কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগের নারীরা ইসলামের এসব বিধানাবলী স্বীয় জীবনে বাস্তবায়নের সাধনা না করে, ইহুদী-খৃষ্টান নারীদের ন্যায় স্বামীকে অবহেলার পাত্র ভেবে, সারাক্ষণ স্বামীর গীবত-শেকায়েত, না শোকরীতে লিপ্ত থকছে। আর আল্লাহ ও তার রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্পষ্ট নির্দেশ তথা স্বামীর খেদমতের হুকুম লংঘনের তিক্ত ফলও আজ আমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করতে হচ্ছে। স্বামীর মর্যাদা দানের অবহেলার কারণেই আমাদের সমাজে ঘরে ঘরে দাম্পত্য কলহের আগুন জ্বলছে। সে আগুনে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে কত সোনার সংসার।

তাই এগিয়ে আসুন প্রিয় মুসলিম মা ও বোনেরা! আমরা সুখ-শান্তিময় যিন্দেগী গঠনে আমাদের মেয়ে জাতির যথার্থ ভূমিকাকে আঁকড়ে ধরে কাজে লাগাই। পরিশেষে আমি বলব, সুখ কখনো ইচ্ছে করে ধরা দেয় না, সেটাকে অর্জন করতে হয়।

আর কিভাবে অর্জন করা যাবে সে পথ আপনার নিজেরই খুঁজে নিতে হবে। এজন্য দরকার ঈমান দীপ্ত আন্তরিকতা ও পরিশ্রম, তবেই হয়ত হাতে পেয়ে যেতে পারেন সুখ নামের সোনার হরিণটি।

স্ত্রী প্রহারের ইসলামী নীতি

একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবনের জন্য চাই নর-নারীর পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি। এসবের অনুপস্থিতিতে কোন পরিবারকে আদর্শ কিংবা সুখী পরিবার বলা যায় না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার বদলে যদি সন্দেহ-সংশয় স্থান করে নেয় তাহলে বুঝতে হবে এখানে অশান্তি অবধারিত। বর্তমান প্রেক্ষিতে দাম্পত্য সমস্যা একটি প্রকট আকার ধারণ করেছে। এই সূত্র ধরে স্ত্রী হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, মারধর ও তালাক প্রদানের মত ঘৃণ্য ঘটনা ঘটছে অহরহ।

বিশেষতঃ স্ত্রী প্রহার একটি জাতীয় সমস্যার আকার ধারণ করায় সুশীল সমাজ চিন্তিত। তাই সময়ের দাবী হিসেবে স্ত্রী প্রহারের বৈধতা-অবৈধতা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

একথা অনস্বীকার্য যে, দাম্পত্য জীবন একটি দীর্ঘ জীবন। তাই এই দীর্ঘ জীবনে স্বামী-স্ত্রীর কোন না কোন ত্রটি-বিচ্যুতি হতেই পারে। অতএব এসব ক্রটি-বিচ্যুতিকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে হবে এবং এর জন্য অনাধিকার আচরণ কিংবা মারধরের মত ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হওয়া অনুসুচিত। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, নারীর মন সৃষ্টিগতভাবেই কিছুটা নাজুক এবং বক্রধরনের তাই স্বামীকেই বেশী সহনশীল হতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি এরশাদ করেন, "নারীকে বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে সে কখনোই তোমার জন্য কিছুতেই সোজা হবে না, যদি তার দ্বারা উপকৃত হতে চাও তাহলে ঐ বাঁকা অবস্থাতেই উপকার লাভ করো। কেননা তাকে সোজা করতে গেলে ভেঙ্গে ফেলবে। (বোখারী-মুসলিম)

অন্যত্র বর্ণিত আছে, কোন মুমিন যেন কোন মুমিনকে ঘৃণা না করে, কেননা কোন এক ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হলে অন্য ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে। এই হাদীসের আলোকে এ কথা বুঝা যায় যে, স্ত্রীর কোন কোন কাজে ভুলক্রটি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং ধৈর্য ও হেকমতের সাথে সময় নিয়ে সংশোধনের চেষ্টা চালাতে হবে। অনেকে সংশোধনকল্পে স্ত্রীকে প্রহার করে থাকে, মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা নিতান্ত গর্হিত কাজ। কেননা স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী এবং তাকে সৃষ্টিও করা হয়েছে স্বামীর হাড় থেকে। সুতরাং এক অঙ্গ যেমন অন্য অঙ্গের ব্যাপারে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়না ঠিক তদ্রূপ স্বামী কৃর্তক স্ত্রীকেও প্রহার করা ঠিক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তোমাদের কেউ যেন নিজের স্ত্রীকে গোলাম বাদীর ন্যায় আচরণ ও প্রহার না করে অতঃপর দিনের শেষে তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয় (তখন নিজের কাছে নিজেকে লজ্জিত মনে হবে)"।

একবার লাকিত ইবনে ছাবুরা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীর অশ্লীল ভাষার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করলে তিনি তাকে তালাক দেয়ার পরামর্শ দেন। তখন লাকিত (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার গর্ভে আমার সন্তান রয়েছে এবং আমি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। তাছাড়া তার সাথে আমার দীর্ঘদিনের দাম্পত্য সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তাকে তালাক দিতে আমার কষ্ট হবেই। তখন রাসূল বললেন, তাকে নছিহত কর যদি তার মধ্যে সামান্যতম সুবুদ্ধি থাকে তাহলে তোমার কথা কবুল করবে। খবরদার! তুমি তোমার

বিছানার সাথীকে দাসী-বাঁদীর ন্যায় প্রহার করো না। এই হাদীসে নছিহতকে সংশোধনের পন্থা সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং মারধরকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। তাই সংশোধনের জন্য এই পন্থাই অবলম্বন করা বাঞ্ছীনয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবাগণকে স্ত্রীদের মারধর করতে নিষেধ করলেন। কিছুদিন পর ওমর (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার নিষেধাজ্ঞার ফলে এখনতো স্ত্রীদের দৌরাত্ম বেড়ে গেছে। এতে তিনি হালকা মারধরের অনুমতি দিলে নারীরা আবার স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদেরকে এভাবে প্রহার করে তারা কিছুতেই ভাল লোক নয়। উপরোক্ত হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রী প্রহার একটি ঘৃণিত কাজ এবং এটা পরিহার করা উচিত।

তবে সার্বিকভাবে স্ত্রী প্রহার অপছন্দনীয় হলেও সংশোধনের নিশ্চিত ধারণা হলে হালকা-পাতলা প্রহার করতে দোষ নেই। তবে এর জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। সাধারণতঃ ৪ কারণে স্ত্রীকে প্রহার করা যায়।

১। শরিয়তসম্মত পোশাক পরিধানে অনীহা প্রকাশ করলে।

২। ওজর ব্যতীত সহবাস করতে অস্বীকৃতি জানালে।

৩। শররীয়তের বরখেলাফ চললে। এবং

৪। স্বামীর অনুমতি ব্যতিত ঘর হতে বের হলে। তবে এক্ষেত্রে শরীয়তের মূলনীতির প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। শরীয়তের মূলনীতি হলো, স্ত্রীর মধ্যে কোন অসঙ্গতি দেখা দিলে প্রথমে নছিহত করবে, এতে কাজ না হলে বিছানা পৃথক করে দিবে। এতেও কাজ না হলে তখন প্রহার করবে। আর মুখমণ্ডলে কিংবা অঙ্গহানী হয় এভাবে প্রহার করা যাবে না। শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে সামান্য মারধর করা হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, (শিক্ষাকল্পে) স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করলে এর জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

স্ত্রী প্রহারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ জায়গায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীকে সমর্থন করলেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতক জায়গায় পুরুষকে সমর্থন করেছেন। সাফওয়ান ইবনে মুআত্তালের স্ত্রী স্বামী কর্তৃক প্রহৃত হওয়ার অভিযোগ করলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফওয়ানকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাফওয়ান (রাঃ) জানালেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমার কথা অগ্রাহ্য করে প্রতি রাকাতে বড় দু'টি সূরা পাঠ করে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'একটি সূরাইতো সকল লোকের

নামাযের জন্য যথেষ্ট, কেন তুমি তোমার স্বামীর কথা অমান্য করছ? মোদ্দাকথা হলো, স্ত্রীকে প্রহার করা না করা উভয় ধরনের মত থাকলেও কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীকে প্রহার না করাই উত্তম।

এটা সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য বড় অন্তরায়। দাম্পত্য জীবনকে মারধরের মত অসহনীয় পর্যায়ে না নিয়ে বরং উভয়কে উভয়ের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত। দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য। স্ত্রীরা যেন স্বামীদের প্রতি অনুগত হয় সেজন্য তিনি বলেছেন, যদি কাউকে আমি সেজদা করার অনুমতি দিতাম তবে স্ত্রীদেরকে হুকুম করতাম যেন তারা স্বামীদেরকে সেজদা করে। আবার স্ত্রীদের প্রতি সহনশীল হতে স্বামীদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।'

সুতরাং দাম্পত্য সমস্যায় একতরফা কোন অভিযোগ না করে সমস্যার মূল কারণ উদঘাটন করা এবং উভয়কে উভয়ের প্রতি সহনশীল হওয়া দাম্পত্য জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দিন। আমীন।

স্বামীরা কেমন স্ত্রী পছন্দ করে

কেমন জিনিস স্বামীর পছন্দনীয় এবং কেমন গুণের দ্বারা স্বামীর অন্তর জয় করা যায়, তার সম্যক জবাব দেয়া বড় মুশকিল। কেননা, প্রত্যেকের চয়েজ পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন স্বামী সাজগোছ ও রূপচর্চাকে পছন্দ করে, কেউ সাদামাটা জীবন পছন্দ করে, কেউ ফ্যাশন পছন্দ করে, কেউ সরলতা ভালবাসে, কারো নিকট লজ্জাবতী শরমিলী মেয়ে বড় প্রিয়, কারো নিকট অধিক ভাষীণী কারো নিকট ভোলা-ভালা সাদাসিধে চেহারা ভাল লাগে, কারো নিকট টানাটানা পটলচরা চোখ আর বাঁশীর মত খাড়া খাড়া নাক ভাল লাগে, কেও নীরব ও ঠাণ্ডা মেয়ে পছন্দ করে, কেউ চালাক-চতুর ও চঞ্চল মেয়ে পছন্দ করে। মোটকথা, প্রত্যেক নারী-পুরুষের মন-মানসিকতা, চাহিদা, কামনা-বাসনা, পছন্দশক্তি ও নীতি আলাদা-আলাদা ভিন্ন ভিন্ন। তাই প্রতিটি স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মন-মিযাজ ও চাহিদা জেনে নিজের মধ্যে সে ধরনের গুণ ও সৌন্দর্য অর্জন করতে সচেষ্ট হবে। যাতে তার প্রতি স্বামী আকৃষ্ট ও দেওয়ানা হয়ে যায়।

উল্লেখিত বিশেষ গুণাবলী ছাড়াও কতিপয় গুণ এমন রয়েছে, সেগুলোর প্রতি প্রতিটি স্বামীর সাধারণতঃ আকর্ষণ থাকে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

(১) সর্বপ্রথম গুণ, যার প্রতি আকর্ষণ সকলের থাকে, তা হল-রূপ-লাবণ্য। তবে স্ত্রী খুব সুন্দরী হতে হবে, এটা আবশ্যক নয়। বরং স্ত্রীর সাজসজ্জা, রূপচর্চা ও বস্ত্র পরিধানের প্রদ্ধতি এমন পরিচ্ছন্ন ও চয়েজফুল হওয়া চাই-যা দ্বারা তার শরীর স্বামীর নিকট সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

(২) দ্বিতীয় গুণ, আন্তরের পবিত্রতা ও মনের নিষ্কলুষতা। কারণ, হিংসুক, মিথ্যুক ও সংকীর্ণমনা স্ত্রীর উপর প্রত্যেক স্বামী অসন্তুষ্ট থাকে। সুতরাং অন্তরের পবিত্রতা ও মনের পরিচ্ছন্নতাকে সহজাত স্বভাবে পরিণত করা স্ত্রীর আবশ্যক। এতে তার মধ্যে সৌন্দর্য ও হায়া-শরম দুটো গুণই সৃষ্টি হবে। অহংকারী, হিংসুক ও অপবিত্র মনের মহিলারা স্বামীর নিকট আস্থাভাজন হতে পারে না। এতটুকুই নয়; বরং অন্য লোকেরাও এমন মহিলাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না।

(৩) প্রত্যেক স্বামী এটাই কামনা করে যে, তার স্ত্রী যেন তার থেকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষায় কম থাকে। চালাকী ও চতুরতায় স্ত্রী তার স্বামীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করুক-এটা কোন বুদ্ধিমান ও আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন পুরুষ পছন্দ করে না। সামান্য শিক্ষিত একজন পুরুষ কখনো একজন ডিগ্রীধারী উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে বিবাহ করে সঠিক ও পরিপূর্ণভাবে সুখী হতে পারে না। কারণ, এতে স্বামী নিজের দুর্বলতা ও অপমান উপলব্ধি করে। তাই স্ত্রী যদি জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষা-দীক্ষায় স্বামীর তুলনায় বেশিও হয়, তবুও স্ত্রী কখনও স্বামীর সম্মুখে নিজের বড়ত্ব, চালাকী, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও শিক্ষা-দীক্ষার অহংকার প্রদর্শন করবে না। এতে স্বামীর মন ভেঙ্গে যাবে। স্ত্রী কখনো স্বামীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও শিক্ষাগত দুর্বলতার কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না। বরং এটাই নারীর কর্তব্য।

বস্তুতঃ নারীরা নিজের তুলনায় জ্ঞানী-গুণী, বিদ্বান ও বীর-বাহাদুর স্বামীকে পছন্দ করে। কিন্তু কোনক্রমে স্ত্রীর ভাগ্যে নিজের চেয়ে শিক্ষা-দীক্ষা ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে কম স্বামী জুটলে, তাকে অবজ্ঞা ও হেয় করবে না; বরং কথাবার্তা ও আচার-আচরণে তাকেই বড় করে রাখবে।

(৪) স্বামীকে নিজের দিকে আকৃষ্টকারী সবচেয়ে' কার্যকরী গুণ ও সৌন্দর্য হল, স্বামীর মূল্যবোধ অন্তরে স্থাপনপূর্বক স্বামীর সেবা ও আদেশের দাসত্ব করা, স্বামীর হুকুমের সম্মুখে মাথা নত করা। এটি নারীর একটি মহৎ গুণ। এর মাধ্যমে স্বামীর মুহাব্বত দ্বিগুণ হয়, আর স্ত্রী নিশ্চিন্তে স্বামীর সোহাগে ধন্য হয়ে কালাতিপাত করতে পারে।

মুখপোড়া, লজ্জাহীনা, জেদী ও নাফরমান নারীদের কোন পুরুষই পছন্দ করে না। ফরমাবরদার নারীরা সহজেই স্বামীর অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়।

(৫) স্বামী এমন স্ত্রীকে মনেপ্রাণে ভালবাসে, যে তার ভুল-ত্রুটিগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। স্বামীর দোষ থাকা সত্ত্বেও তাকে ভালবাসা স্ত্রীর কর্তব্য। প্রয়োজনে সময় মত হিকমতের সাথে স্বামীকে বুঝিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু দুর্ব্যবহার দ্বারা কিছুতেই স্বভাব পাল্টানো যাবে না। যার আচরণ, ব্যবহার ও প্রেম-ভালবাসায় অকৃত্রিমতা এবং কথাবার্তায় মাধুর্য ঝরে পড়ে, এমন নারীদের পুরুষরা আন্তরিকভাবে কামনা করে।

(৬) পুরুষরা এমন নারীদের পছন্দ করে যারা, মায়াবী, বিনয়ী, অন্যের দুঃখে দুঃখিনী, অপরের কষ্টে যার অন্তরে সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়, ইয়াতীম-অসহায় শিশুদের দেখলে কোলে তুলে নেয়। যার হৃদয় মানবতা, মনুষত্ব ও সমাজসেবার মানসিকতা দ্বারা পরিপূর্ণ এমন স্ত্রীকে স্বামী মনেপ্রাণে খুব পছন্দ করে। কিন্তু নেতৃত্বকামিনী, কর্কশভাষীণী, বদ জবান মহিলা, যার ভাষা কেচীর মত মানুষের অন্তর কেটে টুকরো টুকরো করে, এমনিভাবে যে মহিলা সবসময় উদাস ও নিরাশ হয়ে খামুশ চুপচাপ বসে থাকে, এমন মহিলাকে কোন পুরুষই পছন্দ করে না।

(৭) স্ত্রীর মনহরনী চাহনী আর মুচকী হাসির ঝলক স্বামীর জন্য আনন্দদায়ক। যে রমণী নিজে সদাসর্বদা হাসি-খুশী থাকে, সে অন্যকেও হাসি-খুশী রাখতে পারে। স্ত্রীর এ গুণটি স্বামীর চিন্তা-ফিকির, ক্লান্তি ও পেরেশানীকে দূর করে তাকে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, শক্তি-সাহস ও মনের সজীবতা দান করে। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত অবসন্ন স্বামীকে আনন্দপূর্ণ ও হাস্যময়ী চেহারা দ্বারা প্রশান্তি উপহার দেয়ার ব্যাপারে গুণবতী স্ত্রীকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে

স্বামী যে কথায় আনন্দ পায়, এমন কথাই বলো স্ত্রীর জন্য বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীর হাসীমাখা, আনন্দভরা মুখাবয়ব স্বামীর অসংখ্য দুঃখ-বেদনা দূর করতেৎ পারে। "তুমি হাসিলে জগত হাসে" স্বামীর মনের এ অমূল্য বাক্যটি নববধুকে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।

(৮) নারীর সবচেয়ে' গুরুত্বপূর্ণ গুণটি হল তার সতীত্বের সংরক্ষণ। সতীত্বের নূরে নারীর সৌন্দর্য নূরান্বিত হয়ে উঠে। যে নারীর মনের মধ্যে সতীত্বের মূল্যবোধ সদা জাগ্রত থাকে, সে তার প্রাণপ্রিয় স্বামীর অনুগত-বাধ্যগত থাকে এবং সে নারী সতীত্বের নূর ও সৌন্দর্য দেহের সৌন্দর্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। যে নারীর ভেতর এ মহৎগুণটি অনুপস্থিত, সে দেহ-যৌবনের দিক দিয়ে যতই সুন্দরী রূপসী হোক না কেন, স্বামী ও সমাজের নিকট তার মূল্য এক কানাকড়িও নেই।

সতীত্বের নূরে নারী স্বামীর মন জয় করতে পারে, দাম্পত্য জীবনে সুখ আনতে আরে। সতীত্বের নূর দ্বারা একজন সতী-সাধ্বী নারী স্বীয় গরীব গৃহকেও জান্নাতের নমূনারূপে উপস্থাপন করতে পারে, স্বামীর সাথে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে। নারীর সতীত্বের নিদর্শনের বড় অংশ হল তার পর্দা রক্ষা করা। শরয়ী পর্দা পূর্ণরূপে পালনের মাধ্যমে নারী বেগানা পুরুষদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে হিফাজত করে স্বামীর জন্য নিজেকে সর্বান্তকরণে নিবেদিত করবে। নামায, রোযা প্রভৃতি ইবাদত-বন্দেগী ও যাবতীয় গুনাহ থেকে পরহেজগারী অর্জনও নারীর সতীত্বের অমূল্য নিদর্শন।

স্বামীর খেদমত

স্বামীর খেদমত ও আনুগত্যকে যারা নিজেদের জন্য অসম্মানের ব্যাপার মনে করতেন না ইসলাম তাদেরকে অশান্তির উৎস থেকে রক্ষা করেছে।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) নবী কারীম স. এর সর্বাধিক প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তারপরও তিনি রাসূল স. এর খেদমতে কোনো ত্রুটি করতেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক করার আগে তা ধুয়ে নেওয়া পছন্দ করতেন এবং এই কাজটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) নিজেই করে দিতেন। –আবু দাউদ

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কম্বল গায়ে দিয়ে মসজিদে আসলেন। কম্বলের এক স্থানে একটু ময়লার দাগ ছিল। একজন সাহাবী সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা উম্মুল মুমিনীনের কাছে পাঠিয়ে দেন। উম্মুল মুমিনীন সেই জায়গাটি পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে কম্বলটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফেরত পাঠান। (আবু দাউদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইহরাম বাঁধতেন এবং ইহরাম খুলতেন তখন উম্মুল মুমিনীন তাঁর শরীরে খুশবু লাগিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ)

যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ শরীফে 'অদী' বা পশু পাঠাতেন তখন উম্মুল মুমিনীন (রাঃ) সে পশুর কিলাদা (গলাবন্ধ) পরিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ)

তবুক যুদ্ধে কোন কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ) এর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং এক পর্যায়ে সকল মুসলমানকে এবং তাদের স্ত্রীকেও তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন রাখার আদেশ দেন।

হিলাল ইবনে উমাইয়া (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আবেদন জানালেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি বৃদ্ধ মানুষ এবং তার কাজকর্ম করে দেওয়ার কেউ নেই। এমতাবস্থায় আপনি তা অপছন্দ করবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলেন। (বুখারী)

স্বামীর সম্পদের হেফাযত

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কে যে বিষয়টি খুব সুন্দর প্রভাব ফেলে তা হল, স্বামীর অর্থ-সম্পদের ব্যাপারে স্ত্রীর দায়িত্বশীলতা। সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীগণ এ ব্যাপারে এতই যত্নবান ছিলেন যে, স্বামীর অর্থ-সম্পদ তো বটেই, তারা স্বামীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়েই তারা স্বামীর বিনা অনুমতিতে হস্তক্ষেপ করাকে পছন্দ করতেন না।

হযরত আসমা (রাঃ) হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। একবার এক গরীব ব্যক্তি এসে আসমা (রাঃ)-কে বললেন, মা, আমাকে আপনার ঘরের ছায়ায় বসে কিছু মালপত্র বিক্রি করার অনুমতি দিন। আসমা (রাঃ) অনুমতি দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা ছাড়া অনুমতি দেওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তাই লোকটিকে বলে দিলেন, যখন যুবাইর (রাঃ) ঘরে থাকেন তখন তুমি আসবে। লোকটি পরে এসে আবার সেই আবেদন জানাল। ঘরে তখন হযরত যুবাইর (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। আসমা (রাঃ) বলতে লাগলেন, মদিনাতে বুঝি আর কোনো ঘর নেই? আমার ঘরের কাছে বসেই তোমার মালপত্র বিক্রি করার সাধ জেগেছে! হযরত যুবাইর (রাঃ) স্ত্রীকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, একজন গরীব মানুষ যদি এখানে সামান্য কিছু বেচাকেনা করে তাতে আর এমন কি অসুবিধা, তুমি এমন রাগ করছ কেন? আসমা (রাঃ) মনে মনে এটাই চাচ্ছিলেন। হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে এ কথা শোনার পর তিনি তাকে অনুমতি দিয়ে দিলেন।

এই বৈশিষ্ট্য যদিও সকল সাহাবিয়াদের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কুরাইশ বংশীয় নারীদের বিশেষত্বের কথা খোদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে উল্লেখ করেছেন, উদ্দেশ্য হল অন্যদেরও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। তিনি বলেছেন, কুরাইশের নারীগণ আরব নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। তারা সন্তানের প্রতি অধিক মমতাময়ী অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী। (মুসলিম)

গর্ভবতী মহিলার খাবার ও বিশ্রাম

১. গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরে খাবারের চাহিদা বেড়ে যায়।

২. পেটের শিশু মায়ের খাবারের উপরেই বেঁচে থাকে এবং বড় হয়।

৩. তাছাড়া শিশু জন্মাবার পর তাকে বুকের দুধ খাওয়াবার জন্যও মায়ের শরীরে কিছু শক্তি জমা রাখতে হয়।

৪. তাই গর্ভবতী মহিলাকে প্রতিদিন অন্তত অতিরিক্ত একবার এবং খাবার গ্রহণের সময় কিছুটা বেশি করে খেতে হবে।

৫. সম্ভব হলে প্রতিদিন মাছ, মাংস, ডিম, ডাল, শাক-সবজি খাবেন। আমলকী, আমড়া, পেয়ারা, লেবু, তেঁতুল, কামরাঙ্গা, জলপাই, কুল (বরই)ইত্যাদি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ টক-মিষ্টি ফল প্রতিদিন খাওয়ার পরে খেতে চেষ্টা করবেন।

৬. গর্ভের জ্জ মাস থেকেই নিয়মিতভাবে আয়রন বড়ি খাবেন।

৭. কেবলমাত্র আয়োডিনযুক্ত লবণ খাবেন। কারণ আয়োডিনের অভাবে পেটের শিশুর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না। ফলে পরবর্তিতে শিশু বুদ্ধিহীন, হাবাগোবা, বাবামন ও বিকলাঙ্গ হয়।

৮. আর মনে রাখবেন, গর্ভবর্তী মহিলাকে প্রতিদিন অবশ্যই দুপুরে পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে হবে।

৯. খাবার গ্রহণের কুসংস্কার পরিহার করে পরিবারের সকল সদস্যদের মতো আপনি ভাত, রুটি, শাক-সবজি, ফলমূল, মাছ-মাংস, ডিম, দুধ এবং অন্যান্য খাবার খাবেন।

বউ-শাশুড়ী সম্পর্ক

আমাদের সংসারের সুখ-দুঃখ আমাদের হাতেই। একটু তাল মিলিয়ে, মাথা খাটিয়ে চললেই অনেক কিছু সামাল দেয়া যায়। হাসি-আনন্দগুলো যদি স্বামী-শাশুড়ীর সাথে ভাগ করে নেয়া যায় তাহলে দুঃখের মুহূর্তেও তাঁরা পাশে দাঁড়াবেন। সুখে-দুঃখেই তো জীবন। আসুন স্বামী-শাশুড়ীর সাথে আমাদের কেমন সম্পর্ক হবে তা আলোচনা করা যাক।

কন্যা-জায়া-জননী, এই একজন নারীর জীবনচক্র। একজন মেয়ে জন্মের পর পিতা-মাতার আদরে বড় হতে থাকে। তার জীবনের দায়িত্ব থাকে অভিভাবকদের উপর ন্যস্ত। হেসে, খেলে, জবীনকে উপলব্ধি করে। তার কাছে যে জীবন ধরা পড়ে, তা তার স্বাধীন জীবন, যখন যা ইচ্ছা তা খেতে পারে। যা চায় তা পরতে পারে, ঘুমানো, বিশ্রাম সব কিছুই করতে পারে। ঘরের কি কাজ করতে হবে, তার খোঁজ নিতে খুব কষ্ট হয় না। যখন যতটুকু পারে, করে যায়। এ মহা সুখের ভিতর তৈরী করে এক স্বপ্ন ভুবন। তার প্রতিবেশী, আত্মীয়, বড়

বোনদের জীবন দেখে- যেখানে তারও স্বামী হবে, সংসার হবে, ঘর হবে, খাট-পালং না হলেও মাথা গুঁজার ঠাঁয় থাকবে, শ্বশুর-শাশুড়ী. স্বামীর সোহাগ, শাশুড়ীর স্নেহ, ননদের ভক্তি সব মিলিয়ে এক অনাবিল সুখের স্বর্গে হারিয়ে যাবে।

অনেক স্বপ্ন নিয়ে একজন মেয়ে স্বামীর সংসারে আসে। কিন্তু অনেকের স্বপ্নের সাথে বাস্তবের মিল দেয়া কঠিন হয়ে যায়। বাস্তব অনেক সময় খুব কঠিন। হাতের মেহেদী না যেতেই সব দায়িত্ব এসে পড়ে। স্বামীর সেবা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা ঘর সাজানো, গোছানো, রান্না করা, দেবর-ননদের সমস্যার সমাধান করা ছাড়াও আরো এমন সব কাজের ভারও আসে, যার সাথে তার পরিচয় নেই। তা সমাধান করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যায়। তার এ নতুন দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছাকৃত ভুল ধরা পড়ে। আমাদের সমাজের স্বামী পক্ষের ভাবনা হলো- 'বউয়ের সব কিছু করতে হবে।' অনেক বাড়ীতে চাকরের পরিবর্তে বউ আনা হয়। যদি কোন মেয়ে এসব দায়িত্ব পালন করতে না পারে তাহলে তার জন্য অপেক্ষা করে হাজারো বিপদ, লাঞ্ছনা। শ্বশুর-শাশুড়ী বলে, এ মেয়ে দিয়ে সংসার চলবে না। ননদ বলে, 'আহ্হা! মেম সাহেবা, আপনার বাবাকে বলুন দু'চারটা চাকর পাঠিয়ে দিতে।' স্বামীও দেখে অন্যভাবে। কখনও নির্যাতনও চলে।

অথচ এই নতুন মেয়েটিকে যদি সবাই গ্রহণ করে নেয়। শাশুড়ী যদি নিজের মেয়ের মত মনে করে, স্বামী যদি বন্ধুর মত মনে করে, তাহলে সাত খুন মাফ হয়ে যায়। মানুষমাত্রই ভুল করতে পারে। কোন মানুষই পূর্ণাঙ্গ নয়। সব কাজ মায়ের পেট থেকে শিখে আসে না। সবাই আস্তে আস্তে শিখে। বিপরীত পরিবেশেও মানিয়ে চলার উপযোগী হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। এর জন্য যতটুকু সময় অপেক্ষা করার তা অপেক্ষা করি না বলে আজ বউ-শাশুড়ী দ্বন্দ্ব, স্বামী-স্ত্রীতে অমিল দেখা দেয়।

যখন একজন নারী তার মা-বাবা ছেড়ে নতুন সংসারে আসে তখন সবাই থাকে অপরিচিত। সবার সাথে সে ঠিকভাবে মিশতে পারে না। আসলে হুট করে সবার জন্য মেশা সম্ভবও নয়। কিন্তু দেখা যায়, আমাদের সমাজের মেয়েরাই নতুন সে মেয়েটির জড়তা কাটাতে পারে না। তাই তাকে গাল শুনতে হয়। আনকালচারড; গোমড়ামুখী কিংবা সংসারের ব্যাপারে উদাসীন।

আমরা যদি সে মেয়েটির সাথে স্বাভাবিকভাবে মিশে যেতে পারি বা মেশার চেষ্টা করি তাহলে সে কিছুতেই দূরে সরে থাকতে পারে না। একটা নভেলের কাহিনীর কথা মনে পড়ছে। কাহিনীটা এমন ভাই-বোন-মা নিয়ে সুখী সংসারে

ভাইয়ের বউ আসে। বউ কিছুতেই মিশতে পারে না দেবর, ননদ, শাশুড়ীর সাথে। ঝগড়ায় আলাদা বাসা নিয়ে নেয়। সেখানে কিছুদিন কাটে। এরই মধ্যে বউ নিজের অপরাধ বুঝতে পারে। তার খারাপ ব্যবহারগুলোর জন্য অনুতপ্ত হয়। আবার ফিরে আসে পূর্বের সংসারে। শাশুড়ীকে বলে, 'মা! আপনি কেন আপন করে আমাকে ধরে রাখলেন না। আমি নতুন বলে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। আমাকে আপনার অন্য মেয়েদের মত মনে করে নিলে হয়ত আরো অনেক আগেই মিশে যেতে পারতাম আপনাদের সবার সাথে। শাশুড়ীও বুঝে দোষ শুধু একা বৌমার ছিল না। তারাও অন্য বাড়ীর মেয়ে হিসাবে অন্য চোখে কম দেখেনি।

প্রেম-ভালবাসার প্রকৃতি ও গণ্ডি

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পারস্পরিক যে প্রেম-প্রীতি হয়, তা সাধারণতঃ দু'প্রকারঃ বৈধ ও অবৈধ। ধর্ম, সমাজ ও আইনগতভাবে স্বীকৃত মহব্বত-ভালবাসাকে বৈধ ভালবাসা বলে। যেমন-স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা, পিতা-মাতা ও সন্তাদের মধ্যে প্রীতিবন্ধন ইত্যাদি।

এ প্রেম-ভালবাসা এত দরকারী ও প্রশান্তিদায়ক যে, এর অবর্তমানে অশান্তি ও কলহ-বিবাদে জড়িয়ে একটি সুন্দর পরিবার প্রজ্জ্বলিত অনলের মত জ্বলে উঠতে পারে। এমনকি একটি সমাজের সুখ-শান্তিও বিনাশ করে ফেলতে পারে।

আর এ বৈধ ভালবাসার আধিক্য যত বেশী হবে, ততই একটি পরিবার সুখী হবে। প্রীতি-পরিণয়ের গভীরতা যদি খুব বেশী হয়, জান্নাতী সুখের দুনিয়াবী আভা তারা ইহকালে-উপভোগ করতে পারবে।

এ প্রেম-পরিণয় যে দম্পতির মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তারা দরিদ্র হলেও সুখী। প্রবাদ আছে যে, অভাবের সংসারে প্রেম সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে, পিছন দিয়ে বের হয়ে যায়। এটা হালকা প্রেমের উদাহরণে খাটে। কিন্তু গভীর ভালবাসার বেলায় খাটে না। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসার মধ্যে কত ছাওয়াব আছে, তা লিখতে গেলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকেরই রূপ নিবে। এখানে আভাস স্বরূপ এতটুকু উল্লেখ করছি যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালবাসায় যা কিছু করে, তাতে সদকার ছাওয়াব তাদের আমলনামায় লিখা হয় বলে হাদীস শরীফে রয়েছে। এমনকি তাদের যৌন মিলনেও তারা ছাওয়াব লাভ করে বলে হাদীসে বলা হয়েছে। আবার স্বামী মহব্বত স্বরূপ স্ত্রীর মুখে খাবারের লোকমা তুলে দিলে, তাতেও সে ছাওয়াবের অধিকারী হয়। তেমনিভাবে সংসারের ভরণ-পোষণে স্বামী যা কিছু খরচ করে, তাতে সে সদকার ছাওয়াব পায়।

অনুরূপ ভাবে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর মহব্বত ও খিদমত দ্বারা অজস্র ছাওয়াব লাভ করে। সে স্বামীর সংসারের তদারকী-ব্যবস্থাপনা, রান্না করা, ঘর ঝাড়ু দেয়া, কাপড় ধোয়া প্রভৃতি সাংসারিক সকল কাজে ছাওয়াব লাভ করে।

মুমিনগণ একে অপরকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ও দ্বীনী ভ্রাতৃত্বে ভালবাসতে পারে। তাতে অনেক ছাওয়াবও আছে। তদ্রূপ একজন দ্বীনদার নারীও অন্য একজন দ্বীনদার নারীকে দ্বীনী মহব্বতে ভালবাসতে পারে। তাদের ভালবাসার রীতি-নীতি কেমন হতে হবে-তাও হাদীসে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, অর্থাৎ তাদের পরকালীন প্রতিদানের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শুধু কেবল আল্লাহর ওয়াস্তে এ ভালবাসা হতে হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনী মহব্বতে মুসলমানদের পারস্পরিক ভালবাসা স্থাপনের প্রতিদান সম্পর্কে একটি হাদীস উদ্ধৃত করছি। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান, "আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে বলবেন-আমার জন্য পরস্পরকে ভালবাসা দানকারীগণ আজ কোথায়? আজকের দিনে আমি তাদেরকে ছায়া দিব আমার ছায়ার নীচে, যেদিন আমার ছায়া ভিন্ন আর কোন ছায়া নেই।" (মুসলিম শরীফ)

আসলে মুসলমানদের সমস্ত কিছুই আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া কর্তব্য। সেই নীতিতে কাউকে ভালবাসতে হলেও আল্লাহর ওয়াস্তে এবং শরীয়তের নির্দেশিত পথেই ভালবাসতে হবে। মুসলামানদের গুণ হতে হবে-"হুব্বুন লিল্লাহ ওয়া বুগজুন লিল্লাহ" কাউকে ভালবাসা আল্লাহরই জন্যে, কাউকে ঘৃণা করাও আল্লাহরই জন্যে। অর্থাৎ আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যকে ভালবাসতে হবে। আল্লাহর এ বান্দাকে ভালবাসলে আল্লাহর ভালবাসা পাব, সেই জন্যই তাকে ভালাবাসা।

তদ্রূপই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যে কারো প্রতি দুশমনী রাখা বা ঘৃণা করা কর্তব্য। সে আল্লাহর বিধানের বিপরীত চলছে, প্রকাশ্যে তাকে বুঝিয়ে আল্লাহর নাফরমানী হতে বিরত রাখা যাচ্ছে না, বরং শয়তানী মিশন সে দৃঢ়তার সাথেই চালিয়ে যাচ্ছে, তার সহিত আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের উদ্দেশ্যেই বৈরিতা পোষণ করতে হবে। শক্তি থাকলে তাকে বল প্রয়োগে বিরত রাখতে হবে আল্লাহর নাফরমানী থেকে।

তবে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থের জন্যে কাউকে ভালবাসা বা ঘৃণা করা চলবে না। কারো প্রতি ভালবাসা ও ঘৃণা কেবল আল্লাহর ওয়াস্তেই হতে হবে। কিন্তু একজন পুরুষ ভিন্ন মহিলাকে কিংবা একজন মহিলা কোন বেগানা পুরুষকে কখনও ভালবাসতে কিংবা ভালবাসা নিবেদন বা বিনিময় করতে পারে না।

তথাপি একান্তই যদি কাউকে ভাল লেগে যায়, তাহলে ভালবাসার পূর্বে তাকে বিবাহ করে নিতে হবে। প্রথমে তাদের বিবাহ হতে হবে, এরপরই কেবল ভালবাসার বিনিময় বৈধ হবে, এর আগে নয়।

অবৈধ প্রেম-প্রীতি প্রসঙ্গ

যে প্রেম-পরিণয় অপর কোন না কোন মানুষের অধিকার হরণ করে, রীতি-নীতি বিরুদ্ধ, আইনসম্মত নয়, ধর্মবিরুদ্ধ, অর্বাচিন ও অবিবেচনামূলক একটি অন্ধ আবেগ তাড়িত, তা-ই অবৈধ প্রেম। যেমন-ধরা যাক, একজন বিবাহিতা স্ত্রীলোক স্বামী থাকাবস্থায় অন্য একটি পুরুষের সাথে প্রেমে আবদ্ধ হল এবং প্রেমের পূর্ণ পরিণতির কার্যক্রম শুরু করল। তাতে তার পতির অধিকার হরণ হল সুনিশ্চয়। আর পৃথিবীর কোন সভ্য আইনই একজনের অধিকার হননকে বৈধ বলে স্বীকার করে না। সুতরাং ইসলাম অবৈধ এ জাতীয় প্রেম-প্রীতিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে এবং এর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করেছে।

অবৈধ প্রেম-প্রীতি তিন প্রকারঃ (ক) অবিবাহিত নর-নারীর প্রেম (খ) পরকিয়া প্রেম ও (গ) সমকামিতা।

(ক) অবিবাহিত নর-নারীর প্রেম ঃ সাবালিকা হওয়ার পর তরুণ-তরুণী যুবক-যুবতীর মধ্যে যে ভাব-পরিণয় জমে উঠে, তা-ই অবিবাহিত নর-নারীর প্রেম।

ইসলামে এ প্রেম সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। পক্ষান্তরে খৃষ্ট সমাজ এ প্রেমকে বৈধতা দিয়েছে। অপর পক্ষে আঠারো বছর পূর্বে খৃষ্ট সমাজে বিয়ে নিষিদ্ধ। এ আঠারো বছর পর্যন্ত খৃষ্ট সমাজে যে কোন যুবক-যুবতী প্রেম ও দেহ মিলন করতে পারে, বাধা নেই। এমনকি গর্ভধারণ করতেও মানা নেই। তাই স্কুল ছাত্রীদের সত্তর পার্সেন্ট গর্ভপাত ঘটায় আর বাকী ত্রিশ পার্সেন্ট গর্ভধারণই করে নেয়।

এদের এ কর্মকান্ড "ষড়যন্ত্র" বলেই মনে হয়। কেননা, তাদের সমাজে আঠারো বছর পূর্বে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহের উদ্দেশ্য কি? বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্যই হল-সুন্দর সুস্থ সমাজ স্বীকৃতভাবে যৌন চাহিদা মেটানো। আঠারো বছর পূর্বে যদি ওপেন সেক্স দ্বারা যৌন চাহিদা পূরণ করা বৈধ হল অর্থাৎ বিয়ের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেল, আঠারো বছর নির্ধারণ করে বিয়ে নিষিদ্ধকরার হেতুটা কি? তাদের দাবী মতে, আঠারো বছর পূর্বে বিয়ে করলে যদি স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তাহলে প্রেম-সঙ্গমও নিষিদ্ধ করা উচিত ছিল, অথচ তা হয়নি। তাহলে উদ্দেশ্যটা কি হতে পারে?

সুতরাং এক্ষেত্রে গভীর ষড়যন্ত্রই প্রকাশ পাচ্ছে। ষড়যন্ত্রটা হল-আঠারো বছর পূর্বে বিয়ে নিষিদ্ধ, অথচ যৌবন আসে বার বছর বয়সে। আর এই ১৮-১২=৬ বছর যৌন চাহিদা নিবারণ নিষিদ্ধ নয়। সুতরাং ছয় বছর বয়সের মধ্যে যত নারী আছে, তারা কোন না কোন পুরুষের সঙ্গে যৌন লীলায় লিপ্ত হবেই বা হচ্ছেই। ফল দাঁড়াল-খৃষ্টান জাতির মধ্যে একটি রমণীও সতী নয়, সকলেই অসতী। ফলে তাদের সমাজে কোন স্বামীই কুমারী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে পারে না। ইতিপূর্বেই সব নারীকে পুরুষরা ভোগ করে নেয়। এভাবে নির্বিচারে নারী ভোগের লালসা চরিতার্থই তাদের সেই ষড়যন্ত্রের মতলব। পাশাপাশি তাদের এই কুৎসিত কালচার মুসলমানদের দেশে পুশইন করে তারা মুসলিম সমাজের পবিত্র জীবন ধারাকে কলুষিত ও পাপে জর্জরিত করতে চায়।

বস্তুতঃ বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায়-খৃষ্টানদের উক্ত আঠারো বছর আইন হল অমানবিক আইন। তাদের একটা স্কুলছাত্রী যদি আঠারোর পূর্বে গর্ভধারণ করতে পারে, অথবা গর্ভপাত ঘটানোর মত ঝুঁকি নিতে পারে, তাহলে আঠারোর পূর্বে তাকে বিবাহের বৈধ অধিকার দিতে দোষ কি?

তদুপরি তাদের কালচারের অশুভ পরিণাম হচ্ছে-পরিণতিতে একটি নর বা নারী আঠারো বছরের পূর্বেই বহুভোগের অভ্যাস গড়ে তোলে। আর এ অভ্যাসের কারণে বিবাহ জীবন তাদের কাছে হয়ে উঠে অসহণীয়। পরন্তু বিয়ের পরও তারা বহুভোগী থেকে যায়। যার ফলে সেসব সমাজে লাগামহীন যৌনাচার চলে আসছে এবং এ নিয়ন্ত্রণহীন যৌনাচারের ফলে 'এইড্স' নামক মরণব্যাধির জন্ম নিয়েছে তাদের সমাজে।

এই 'এইডস' বর্তমান মানব জাতির জন্যে একটি মহাআতঙ্ক, একটি বার যদি তা মহামারী আকার ধারণ করে, মানব জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পূর্ণ আশংকা রয়েছে।

ইসলামের বিধি-বিধানই এ ব্যাপারে সঠিক ও মানবিক। যৌন ক্ষুধা মানুষের মৌলিক চাহিদা এবং এর নীতিগত পূর্ণতা মৌলিক অধিকার। সুতরাং কোন বছর দ্বারা এ ক্ষুধাকে বন্দী করা সমীচীন নয়। যখন ইচ্ছা বিবাহের মাধ্যমে তা তারা যেন পূরণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। বার বছরে একটি মেয়ে প্রচন্ড প্রেমে পড়ে পাগল-মাতাল হয়ে উঠেছে। তাকে তার প্রিয়জনের সাথে বিয়ে দিয়ে তাদের জীবন রক্ষা করা যেতে পারে। তেমনিভাবে ছেলে-মেয়ের যৌন কামনা যাতে তাদেরকে বিপথগামী না করে, সেজন্য পরিণত বয়সে অবিলম্বে তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করা অভিভাবকের কর্তব্য। ইসলাম এ কথা-ই বলে। কিন্তু কোন ভাবেই যৌনাচার ইসলাম সহ্য করে না। তার পরিণতি যে মহা ভয়াল

'এইডস' তা তো আর বুঝাতে হবে না। তদ্রূপ বিবাহ ছাড়া প্রেম-ভালবাসাও হারাম। এমনকি প্রেম সংগঠিত হয় যে অস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ তা-ও হারাম।

মোটকথা, বিবহপূর্ব প্রেম-ভালবাসা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিবাহের পরই কেবল স্বামী-স্ত্রী হয়ে তারা প্রেম-ভালবাসা করতে পারে। এর আগে নয়। বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর এ প্রেম-ভালবাসা-ই পবিত্র। কিন্তু বিবাহের আগে কোন রকম প্রেম-ভালবাস করা, চিঠিপত্র আদান-প্রদান, দেখা-সাক্ষাত করা, প্রেমালাপ করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম।

দুঃখের বিষয়-বর্তমানে সমাজের বহু তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী ও নারী-পুরুষ এ রকম অবৈধ প্রেম-প্রীতিতে লিপ্ত। তাদের অবিলম্বে এ মহান ধ্বংসের পথ হতে সরে আসতে হবে এবং কৃত গুনাহের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে। আর সমাজ যাতে এহেন অপকর্মের দ্বারা কলুষিত না হয়, সজন্য সর্বস্তরে পর্দা প্রথা চালু করে সমাজকে ইসলামের আদর্শে গড়ে তুলতে বে।

(খ) পরকিয়া প্রেম ঃ অন্যের স্ত্রীর সাথে লুকিয়ে প্রেম করার নাম পরকিয়া প্রেম। পৃথিবীতে যতটি খুন হয়, ঝগড়া-ফ্যাসাদ হয়, তার শতকরা ৩০ ভাগই ঘটে থাকে পরকিয়া প্রেম হতে। এ পরকিয়া প্রেমের বহ্নিশিখায় ট্রয় নগরী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ট্রয়ের রাজ কুমার এথেন্সে গিয়েছিলেন ভ্রমণে। ঐশ্বর্যশালী এথেন্সের পরিবেশ যেমন তাকে তাক লাগিয়ে ছিল, তেমনি রাণীর সাথে দেখা হলে, তিনি একেবারে প্রেমেই পড়ে যান। রানী তা জানতে পারেন এবং সাড়া দেন। চলতে থাকে তাদের গোপন অভিসার।

একদিন ট্রয় রাজপুত্রের হাত ধরে এথেন্সের রাণী পালিয়ে আসেন ট্রয় রাজ্যে। শক্তিশালী এথেন্স রাজা সে অপমান সহ্য করতে পারেন না। সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি আক্রমণ করেন ট্রয় নগর এবং এক সময় এথেন্সের হাতে বাসিন্দা সহ ট্রয় নগর জ্বলে ভস্ম হয়ে যায়।

কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় দেখলাম-দু'নর-নারী প্রেম করে বিয়ে করেছিল। অতঃপর উপার্জনের উদ্দেশ্যে উভয়ে পরামর্শ করে পতি সৌদি আরব চলে যায়। সেখান থেকে টাকা পাঠালে স্ত্রী নতুন ঘর-বাড়ী তৈরী করে এবং সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী একটি ছেলের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে।

একদিন তার পতি দেশে ফিরে আসে এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করে যে, তার জায়গায় যেন ভিন্ন মনের একটি কামিনী। শুরু হয় কলহ-বিবাদ। আস্তে আস্তে অবগত হয়ে যায় পতি সবকিছু।

কিন্তু ইতিমধ্যে তার অর্ধাঙ্গিণীই বলতে থাকে-চুপচাপ না চললে, তোমাকে প্রয়োজনে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। বিষয়টি সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এবং একদিন রাতে স্ত্রীকে বল প্রয়োগে বেঁধে ফেলে এবং বটি দ্বারা ঠান্ডা মাথায় কুপাতে থাকে। খবর পেয়ে পুলিশ এলে সে দরজা খুলে দেয় সিগারেট টানতে টানতে।

স্ত্রীর পরকিয়া প্রেম দুনিয়ার কোন পুরুষ মেনে নিতে পারে না। এমন কি যৌন স্বাধীনতার প্রবক্তা যারা, তারাও নিজ জায়াদেরকে পরপুরুষের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ দেখলে সহ্য করতে পারবে না। অথচ খৃষ্টান ও নাস্তিকদের কাছে তাও বৈধ।

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পরকিয়ার কল্পনাও করা যায় না। কদাচিত তা ঘটে গেলে পাথরের আঘাতে আঘাতে তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধান। এর নাম রজম ব্যবস্থা।এ রজম ব্যবস্থা পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং বিপদগামীতা হতে স্বামী ও স্ত্রীকে হিফাজত করে। শুধু তাই নয়, বলতে গেলে রজম ব্যবস্থাই 'এইডস' প্রতিরোধের একমাত্র খোদায়ী ব্যবস্থা। সেসব দুরাচার 'এইডস' বহনকারী যিনাকারদের প্রতি রজমের দন্ড প্রয়োগ করে দুনিয়া পবিত্র করা হলে, 'এইডস' থেকে পৃথিবী মুক্ত হবে।

(গ) সমকামিতা প্রেম ঃ প্রাণী জগতের একটি বিকৃত রুচির নিকৃষ্টতম কর্ম হচ্ছে সমকামিতা। ইসলামে এটাকে 'লাওয়াতাত' বলা হয়। হযরত লুত (আঃ) এর যুগে ভ্রষ্ট কাওম এ কর্মে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর নবী লুত (আঃ) তাদেরকে অনেক বুঝালেন, কিন্তু তারা তার কথা গ্রাহ্য করেনি। পরিশেষে তাদের উপর আল্লাহর গজব নাযিল হয় এবং তারা ধ্বংস হয়ে যায়।

ইসলাম ধর্মে 'লাওয়াতাত' হারাম। কারণ, এটা পাশবিকের চেয়েও খারাপ।

এ ব্যাপারে ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। বিশ্বমানবতার যাবতীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও খাইর-মঙ্গল নিহিত রয়েছে ইসলামের বিধানে। ইসলামী হুকুমে মানব জাতির প্রেম-ভালবাসার যে নিয়ম-নীতি দেয়া হয়েছে, তা মেনে চলাই মানব জাতির জন্য কল্যাণের পথ। ইসলামের বিধান লংঘন করে কোন রকম প্রেম-প্রীতি দ্বারা কিছুতেই সুখ-শান্তির আশা করা যায় না-দুনিয়াতেও নয়, আখিরাতেও নয়।

স্বামীর সংসারে স্ত্রীর দায়িত্ব

দাম্পত্য জীবনে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রতিটি দম্পতির কাম্য। দাম্পত্য জীবনে সুখী সংসার গড়ে তুলতে স্বামী স্ত্রীকে কতকগুলো আচার-আচারণ মেনে

চলতে হয়, ঐগুলো ঠিকভাবে মেনে না চললে দাম্পত্য জীবন কখনও সুখময় হয় না।

স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বন্ধন শুধুমাত্র দু'চার দিনের জন্য নয়, বরং তাদের জীবনভর উভয়কে এই চিরবন্ধনে আবদ্ধ থাকতে হবে। এই বন্ধনে আবদ্ধ থেকে যদি পরস্পরের প্রতি একে অন্যকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা আকর্ষণ করতে পারে, তবে তার চাইতে সুখের বিষয় দুনিয়ায় আর কিছু নেই। কিন্তু (আল্লাহ্ না করুক), যদি কোন কারণে তাদের মধ্যে অমিল সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে এর চাইতে দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি স্থায়ী করবার দায়িত্ব যেমন স্বামীর, তেমন স্ত্রীরও। তবে দাম্পত্য সুখের নিশ্চয়তা অধিকাংশ সময় স্ত্রীর উপরই বর্তিয়ে থাকে। এ জন্য স্ত্রীকে কতকগুলো নিয়ম-নীতি পালন করে চলতে হয়। নিম্নে স্ত্রীর জন্য কিছু পালনীয় কর্তব্য সমূহ কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে বর্ণনা করা হলঃ

(১) স্বামীর স্বভাব-চরিত্র ও জীবনের চাল-চলনের সহিত নিজেকে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। তাকে কখনও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। তার মনে আঘাত লাগতে পারে-এরূপ আচরণ করবেন না।

(২) সর্বদা স্বীয় কাজ-কর্মে, আচার-ব্যবহারে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে যত্নবান হবেন। স্বামীর চোখের পলকের প্রতি দৃষ্টি রেখে চলা-ফিরা, উঠা-বসা করবেন। স্বামী যদি আপনাকে আদেশ করেন যে, তোমাকে এ স্থানে সারারাত্রি দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তবে আপনাকে তাই করতে হবে এবং এর ভিতরই মঙ্গল ও আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত।

(২) (৩) স্বামীর সাধ্যের বাইরে খরচ-পাতি চাবেন না, স্বামীর আর্থিক অবস্থার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন।

(৪) অল্পে তুষ্টির গুন অর্জন করতে হবে, অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক যা কিছু পাওয়া যায়, তা সন্তুষ্ট চিত্তে বরণ করে নিবেন। লোভ পরিহার করে চলবেন।

(৫) স্বামীর নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন বস্তুর আবদার করবেন না।

(৬) স্বামীর সংসারে খানা-পিনার একটু অসুবিধা হলে বা বাড়ী-ঘর, জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় মন মত না হলে, তাতে কখনও মন কালো বা চেহারা মলিন করবেন না। মুখে কখনও কিছু বলবেন না। বরং সর্বদা হাসিমুখে প্রফুল্লচিত্তে কালাতিপাত করবেন। সব কিছুই মহান আল্লাহর দেয়া ভাগ্যের ফয়সালা মনে করে সন্তুষ্ট থাকবেন।

(৭) স্বামীর সংসারে থেকে কোন সময় না শুকরিজনক কথাবার্তা তাকে বলবেন না, যেমনঃ আপনার ঘরে এসে শান্তি পেলাম না। সারাটা জীবন দুঃখে-কষ্টে গেল। আমার বাপের সংসারে কতইনা সুখ-শান্তি বিরাজ করতেছে। এরূপ আচরণ কোন সময় করবেন না। এরূপ না শুকরিতে আল্লাহ তা'আলা নারাজ হয়ে থাকেন। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "আমি দোযখের ভিতর অধিকাংশই স্ত্রী লোক দেখেছি।" তখন সাহাবীগণ আরজ করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কারণ কি? তৎশ্রবণে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন- "তারা অন্য লোকের উপর বেশী অভিসম্পাত বর্ষণ করে এবং নিজ স্বামীর নাশুকরী করে থাকে।"

(৮) স্বামী কর্তৃক প্রাপ্ত পোষাকাদিকে অপছন্দ করবেন না। খুশী মনে তা সাদরে গ্রহণ করবেন। নিজের পছন্দ না হলে তার জন্য স্বামীকে কোনরূপ তিরস্কার বা লজ্জা দিবেন না, অথবা এটাও বলবেন না যে, আপানর কোন ভাল পছন্দই নেই, পার্শ্বের বাড়ীর অমুক তার স্ত্রীর জন্য কত সুন্দর শাড়ী এনে থাকে। এ ধরণের কথাতে স্বামীর মন ছোট হয়ে যাবে এবং আগামীতে কোন জিনিস আনতে তার মন চাবে না। পক্ষান্তরে যদি আপনি খুশির ভাব দেখান, তবে তার মন সন্তুষ্ট হবে এবং ভবিষ্যতে আরো ভাল ভাল জিনিস আনার জন্য তার মনে আগ্রহ জাগবে।

(৯) স্বামী যদি কোন ব্যাপারে রাগ করেন, তবে খবরদার! আপনি এমন কথা বলবেন না-যাদ্বারা স্বামীর রাগ আরোও বেড়ে যায়। বরং সর্বদা স্বামীর মিযাজ বুঝে কথা বলবেন। যদি কোন ব্যাপারে স্বামী আপনার সাথে গোস্বা করে কথা না বলেন, তবে তখন আপনিও গাল ফুলিয়ে থাকবেন না। আপনার দোষ হোক চাই না হোক কিংবা স্বামীরই দোষ হোক, তবুও আপনি ঠমক ধরবেন না। বরং করজোড়ে মাফ চাওয়াকেই নিজের ইজ্জত মনে করবেন। মনে রাখবেন-স্ত্রী কোন ক্রমেই স্বামীর থেকে বড় নয়। কথায় আছে-"স্বামীর পদতলেই স্ত্রীর বেহেশত।"

(১০) স্বামী বাহির থেকে আসলে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করে খোশালাপ করবেন এবং গরম হলে পাখা দ্বারা বাতাস করবেন। সংসারের অভাব-অনটন বা শাশুড়ী-ননদের ঝগড়ার কথা বলবেন না। এতে স্বামীর মনে তাদের প্রতি ঈর্ষার ভাব সৃষ্টি হয়। ফলে সংসারে ঝগড়া-ঝাটি লেগেই থাকে।

(১১) স্বামীর যেমন অবস্থা, স্বামী শাক-ভাত মোটা কাপড় যখন যেমন যোগাতে পারেন, তাকেই হাসিমুখে সন্তুষ্ট চিত্তে খুশী হয়ে গ্রহণ করবেন। তাতে সুখী হবেন ইনশাআল্লাহ। কখনও বেশীর আকাংখা করবেন না বা মুখ বেজার

করে থাকবেন না। এটাকে আপনার ভাগ্য ও আল্লাহর ফয়সালা মনে করে খুশী থাকবেন। আল্লাহর দেয়া ভাগ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অংশ।

(১২) যদি স্বামীর পিতা-মাতা অর্থাৎ আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকেন, তাহলে তাদের সাথে নম্রতার সহিত উত্তম ব্যবহার করবেন, তাদেরকে খুশী রাখতে সচেষ্ট থাকবেন। স্বামী যদি তার কামাইকৃত টাকা-পয়সা বা অন্য কোন জিনিস আপনার শ্বশুর-শাশুড়ীর হাতে দেন, তাহলে আপনি কোন আপত্তি করবেন না এবং দিয়েছেন বলে গাল ফুলিয়ে মুখ ভার করে থাকবেন না। বরং আপনাকে যা দিবেন, তাও শ্বশুর-শাশুড়ীকে দিতে বলাই বিবেকের কথা। মনে রাখবেন-শ্বশুর-শাশুড়ীকে অবজ্ঞা করে স্বামীকে হাতের মুঠোয় রাখতে চেষ্টা করা শান্তির নিস্ফল প্রয়াস মাত্র।

(১৩) স্বামীর বড় ভাই-বোন থাকলে, তাদেরকে নিজের বড় ভাই-বোনের মত সেবা-যত্ন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করবেন, আর ছোট ভাই-বোন থাকলে, তাদেরকেও নিজের ছোট ভাই-বোনের মত স্নেহ ও আদর-যত্ন করবেন। তাদেরকে সময়মত গোসল করাবেন। তারা ছাত্র-ছাত্রী হলে, যথা সময় বিদ্যালয়ে পাঠাবেন এবং অবসর সময় তাদেরকে লেখা-পড়ায় সাহায্য করবেন।

(১৪) স্বামীর আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধব বেড়াতে এলে, কোন সময় বিরক্ত হবেন না বা মুখ ভার করে থাকবেন না। বরং তাদের সহিত মিষ্টি ব্যবহার করবেন এবং স্বামীর সামর্থ অনুযায়ী আদর-অভ্যর্থনা করবেন। এতে আত্মীয়-স্বজন খুশী ও সন্তুষ্ট হয়ে আপনার প্রশংসা এবং দোয়া করবে।

(১৫) শাশুড়ী-ননদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকবেন। স্বামীর মন লুটে নিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবার চিন্তা কখনও করবেন না। শাশুড়ী-ননদের কোন ব্যবহারে বা কথায় যদি মনে কিছু ব্যথা লাগে, তবে নীরবে তা সহ্য করবেন। খবরদার! সে সব কথা আবার রাত্রে শুয়ে স্বামীর কাছে বলবেন না। কারণ, এরূপ কুটনামীতে লাভ কিছুই হয় না, বরং শুধু ঝগড়াই সৃষ্টি হয় এবং সংসারে বাস করা বিষময় হয়ে উঠে। আর স্বামীরও উচিৎ, স্ত্রী যদি সংসারের অন্য কারো কুৎসা এসে বলে, তাতে যেন স্বামী কর্ণপাত না করেন। শিকায়াত অভ্যাসটাই ভাল নয়। শোকরে নেয়ামত বাড়ে; আর শেকায়তে অশান্তি বাড়ে।

(১৬) শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত ভাল ব্যবহার করবেন। কোন এক সময় এই শুশুর-শাশুড়ীই এ সংসারের ছেলে ও নববধু ছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তারা এখন বৃদ্ধ। কালের চরকা ঘুরে কোন এক সময় আপনারা স্বামী-স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর মত বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হবেন। তখন আপনারা শ্বশুর-শাশুড়ীর সহিত

যেমন আচরণ করেছেন, তাই প্রাপ্ত-হবেন। সুতরাং শ্বশুর-শাশুড়ী ও সংসারের অন্যান্যদের সহিত ভাল-সম্পর্ক গড়ে তুলতে যত্নবান হবেন।

(১৭) সংসারের কাজ-কর্মে চোরামী বা আলসেমী করবেন না। আপন কর্তব্য মনে করে সব কাজ সময় মত কারো বলার আগেই করে ফেলবেন। শাশুড়ী-ননদের জন্য কোন কাজ ফেলে রাখবেন না, সবগুলো নিজেই করতে চেষ্টা করবেন। এতে দেখবেন-তারা আপনার সহযোগিতা করবে এবং আপনার উপর খুশী হয়ে তারা আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে। তখন সংসারে ধন্য ধন্য রব পড়ে যাবে।

(১৮) কারো সহিত ঝগড়া বা উচ্চ, বাক্য করবেন না। বিশেষতঃ সংসারের মুরুব্বী অর্থাৎ আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী রাগ করে যদি কোন কথা বলেন, তবে খবরদার! সে কথায় আপনি প্রতি উত্তর দিবেন না। চুপ করে থাকবেন। মনে করবেন না যে, সামনা সামনি উত্তর না দিলে বুঝি আপনার হার হয়ে গেল। একথা ভুল। চুপ করে থাকলেই দেখবেন যে, পরিণামে আপনারই জিত হবে, সকলে আপনাকে ভাল বলবে।

(১৯) দু'জন লোক চুপে চুপে কথা বলতে থাকলে আপনি তাদের থেকে পৃথক থাকবেন। তারা পরস্পর কি বলছে, তাতে কান লাগানো নিরর্থক, পরন্তু শুধু শুধু এরূপ কুধারণা পোষণ করা যে, তারা হয়তঃ আপনার সম্পর্কে কিছু বলছে, এরূপ বদ খেয়ালীতেই মন ভাঙ্গা ভাঙ্গি এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়। কাজেই বদ খেয়াল হতে বেঁচে থাকবেন।

(২০) আপন পিতা বা ভাইদের ধন-দৌলতের গৌরবে স্বামীকে বা তার আত্মীয়-স্বজনকে হেয় বা তুচ্ছ ধারণা করবেন না। স্বামীর যা আছে, আল্লাহর দান মনে করে তাতেই খুশী থাকবেন। মনে রাখবেন ধন-সম্পদ কারো চিরদিন থাকে না।

(২১) আপন সন্তানকে কখনও খারাপ ভাষায় গালি-গালাজ করবেন না। যেমনঃ হারামজাদা, কুত্তার বাচ্চা, শুয়রের বাচ্চা ইত্যাদি। এতে সন্তান ঐ ধরণের গালি-গালাজ শুনে সেও ঐগুলো শিখে অন্যান্যদেরকে গালিগালাজ করা শুরু করবে। তখন পরিবেশ বা বাড়ীর দোষ দেয়া নিত্যন্তই বোকামীর কথা গণ্য হবে।

(২২) রাব্বুল আলামীনের ইচ্ছানুসারে তাকদীরে যার যেইরূপ স্বামী জুটেছে, চাই স্বামী শিক্ষিত হোক, কি অশিক্ষিত হোক, বিদ্যান হোক, কি মুর্খ হোক, ধনী হোক কি গরীব হোক, অন্ধ হোক বা কানা হোক, খোড়া হোক, কি লেংড়া হোক, সুন্দর হোক, কি অসুন্দর হোক, সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালা ইয়াকীন করে

খোলা মনে তার পদতলে নিজেকে বিলেয়ে দিয়ে মধুময় জীবন যাপন করতে থাকবেন। উভয়ে মিলে মিশে থেকে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে শান্তির নীড় রচনা করবেন। হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-"একজন বদকার স্ত্রী হাজার বদকার পুরুষ অপেক্ষা খারাপ। আর একজন নেককার স্ত্রীলোক সত্তর জন ওলীআল্লাহ হতে উত্তম।

মহিলাদের স্বতন্ত্র কিছু আদব

* 'রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় পুরুষদের থেকে পৃথক হয়ে চলাফেরা করবে'।

* 'রাস্তার মাঝ দিয়ে চলাফেরা করবে না; বরং একপার্শ্ব দিয়ে চলাফেরা করবে'।

* 'শব্দ হয় এ জাতীয় অলংকার পরিধান পরিহার করা।

(আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭১৪)

কেননা 'যে রমণী শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য স্বর্ণের অলংকার পরিধান করবে, সে আযাবে নিপতিত হবে'। (আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৮১)

* 'রূপার অলংকারের দ্বারা কার্য সমাধান করা উত্তম।'

(আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২,পৃষ্ঠা-৫৮১)

* 'মহিলারা নিজেদের হাতে নিয়মিত মেহেদী ব্যবহার করতে পারবে'।

(আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭৪)

* 'মহিলারা এমন সুগন্ধি ব্যবহার করবে যার ঘ্রাণ কড়া নয় তবে রং ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে'। (আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৭৫)

* 'এমন হালকা-পাতলা কাপড় পরিধান করবে না, যা পরিধান করলেও ভিতরে দৃষ্টিগোচর হয়'। (আবূ দাউদ শরীফঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬৭)

* 'যদি ওড়না পাতলা হয় তাহলে তার নীচে মোটা কাপড় লাগিয়ে নিবে'।

(আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬৭)

* 'কোনো (গায়রে মাহরাম) পুরুষ একাকীত্বে কখনই কোনো মহিলার সংস্পর্শে যাবে না। কোনো মহিলার একা সফরে বের হওয়ার অনুমতি নেই। তবে যদি তার সাথে কোনো মাহরাম পুরুষ থাকে তাহলে বের হতে পারবে'।

(বুখারী শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৮৭, মুসলিম শরীফ ঃ খণ্ড-২১৫)

* 'যে সকল মহিলা পুরুষের আকৃতি ধারণ করে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার লানত।'

(বুখারী শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৭৮৪, আবূ দাউদ শরীফ ঃ খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৬৬)

* আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। সুতরাং ঘরের বাইরে যে জায়গা খালি পড়ে থাকে তাকেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। মহিলারা নিজে ঘরের ভিতরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। আর ছোট ছেলে মেয়েদের দ্বারা বাইরের আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে নিবে।

পিতা-মাথার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব

ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেন আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে পিতা মাতার আদব সম্মান এবং তাদের সাথে সদ্ব্য ব্যবহার করার বিষয়টিকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্রিত করে ফরয করেছেন। যেমন সূরা লোকমানে নিজের শোকরের সাথে পিত মাতার শোকরকে এক করে অপরিহার্য করেছেন। বলা হয়েছে اَنِ اشْكُرْلِىْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ ঃ আমার শোকর কর এবং পিতা-মাতারও এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। ছহীহ বুখারীর একটি হাদীসেও প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে, কোন এক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে প্রশ্ন করল, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন (মুস্তাহাব) সময়ে নামায পড়া। সে পুনরায় প্রশ্ন করল, এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন পিতামাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা। (কুরতুবী)

মহিলাদের অযাচিত আবদার

জ্ঞানের আধার, রহমতের কান্ডার বিশ্বনবী হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী সমাজের একটি সহজাত স্বভাবের পর্যালোচন করেছেন। তা হল "কোন কোন নারী জ্ঞানী-গুণী বিবেকবান শিক্ষিত স্বামীকেও নির্বোধ-বোকা বানিয়ে ছাড়ে।"

এ ধরনের নারীরা জিদ করে, একই কথা বার বার বলে স্বামীর কান ভারী করে তোলে। যেমন, তারা স্বামীকে বলে-তোমার আয়-উপার্জন কম। এত অল্প আয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করা তোমার সম্ভব নয়। একটি সুন্দর বুদ্ধি আছে,

মা-বাপ থেকে পৃথক হয়ে যাও। তখন দেখবে-আমাদের সংসার কেমন সচ্ছলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। মাতা-পিতার অনুগত সোনার ছেলে প্রথম প্রথম কিছুদিন স্ত্রীর কথায় ভ্রুক্ষেপ করেনা বটে, কিন্তু স্ত্রী তাকে প্রতিরাত্রে বলতে বলতে, চৎছবক শিখাতে শিখাতে বাধ্য করে মাতা-পিতা থেকে পৃথক হতে। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে মাতা-পিতার সংসার থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর তাতে তার মা-বাবা মনে কষ্ট পায়।

অবশ্য মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রেখে এবং তাদের খিদমত ও ভরণ-পোষণ পূর্ণভাবে জারী রেখে পৃথক হয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

এছাড়াও অলংকার ও পোশাকাদির ব্যাপারে অতিরিক্ত আবদার করে অনেক স্ত্রী তার স্বামীকে বাধ্য করে নিজ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নেয়। মহল্লার কোন গৃহিণী নতুন ডিজাইনের কোন অলংকার যদি তৈরী করে, তাহলে আর স্বামী বেচারার রক্ষা নেই। এখনই বানিয়ে দিতে হবে, আজই অর্ডার দিতে হবে। যদি স্বামী বলে-এখন অলংকার বানানোর সুযোগ নেই, বাজার মন্দা, ব্যবসা বেশী একটা ভাল যাচ্ছেনা, বেতন অল্প, আগের থেকেই ঋণ রয়েছে মাথায়, ব্যাস! সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠে স্ত্রী। চোখ বড় বড় করে হুংকার দিয়ে বলে উঠে-তুমি আমার কোন কথা রেখেছ? আমার কোন দাবী তুমি পূর্ণ করেছ? তুমি সব সময় বাহানা তালাশ কর। কি প্রয়োজন ছিল একজন নিরীহ মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট করার? হালাল উপার্জনে পার না, তো হারাম কামাই কর!

তার কথায় প্রথম ধাক্কায় স্বামী বেচারা নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে চুপসে যায়। এরপর স্বামী অফিস থেকে যখন রাত্রে বাড়ী ফিরল, তখন পুনরায় ইনিয়ে বিনিয়ে মিনমিনিয়ে স্বামীর কর্ণযুগল ভাপিয়ে তুলে। স্বামী তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হয়ত ঘুমিয়ে পড়ল। শিশির ভেজা ভোর সকালে স্বামী যখন কর্মস্থলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন স্ত্রী ভাবল-গরমে ভয় পেলনা, শরমে নত হল না, এবার দেখি নরমে হৃদয় গলে কি-না। তাই সুযোগ বুঝে স্বামীর পা যুগল জড়িয়ে ধরে মায়াকান্না জুড়িয়ে দিয়ে বলে-তোমার পায়ে পড়ি। দয়া করে আজ যেখান থেকে সম্ভব আমার টাকা যোগাড় করে আনবেই। আজ অলংকারের টাকা আমার চাই।

স্বামী বেচারা স্ত্রীর বেহাল অবস্থা দেখে স্ত্রীর মায়ায় বিগলিত হয়ে বলে, আজকে আমি কোত্থেকে টাকা-আনবো? ডাকাতী করব, না হাইজ্যাক করব? উত্তর আসে-আমি ওসব কিছু জানিনা। ডাকাতী করবে, না অন্য পন্থা অবলম্বন করবে, তুমিই জান। অলংকারের টাকা আমি চাই। স্বামী বলে, আমার তো ঘুষ গ্রহণ করারও বদঅভ্যাস নেই। হারাম উপার্জনের কোন পন্থাও আমার জানা নেই। আর কারো থেকে ধার পাওয়ার কোন আশা নেই। তখন কেঁদে কেঁদে স্ত্রী

বলে, সারা দুনিয়ার সবাই ঘুষ খায়, আর তুমি মুত্তাকী-পরহেজগার সেজে বসে আছ? কোথাও বেড়াতে যেতে পারিনা। পাড়া-প্রতিবেশী দু'চারজন মহিলার সাথে মিশতেও পারিনা। না হাতে চুড়ি আছে, না গলায় লকেট।

স্বামী বেচারা কি আর করবে? স্ত্রীর কথাগুলো মনের গভীরে নিয়ে চিন্তা করে। স্ত্রী আমার ডাইনী হোক, পাষানী হোক, আর কুটনী হোক, অবশেষে স্ত্রী তো আমারই। সে আমার সংসারে এসে মোটা কাপড় মোটা ভাত ছাড়া আর কিছুই তো পায়নি। এ আবদারটা রক্ষা না করলে তার কচি মনটা ভেঙ্গে খানখান হয়ে যাবে। আর মন ভাঙ্গা ও মসজিদ ভাঙ্গা সমান কথা। তাই স্ত্রীর নিষ্পাপ হৃদয়টা ভাঙ্গার হাত থেকে রক্ষাকল্পে কোন একটা পন্থা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে।

পরিশেষে পন্থা অবলম্বন করেই একটা জয়ের মাল্য স্ত্রীর গলায় শোভা পায়। জিদ করে হোক আর পায়ে পড়ে হোক, স্বামীকে পাপে ডুবিয়ে বোকা ও বুদ্ধ বানিয়ে স্ত্রী অলংকার বানিয়েই ছাড়ে।

পোশাক তৈরীর ক্ষেত্রেও অনেক স্ত্রী একই পন্থা অবলম্বন করে। যদি কোন নতুন কাপড়, নতুন ডিজাইন বা নতুন ফ্যাশন বাজারে উঠে, ব্যাস, স্বামীর রক্ষা নেই। হুবহু ঐ ডিজাইনের পোশাক তৈরী করে দিতেই হবে। স্বামীর নিকট টাকা থাকুক বা না থাকুক, সময় সুযোগ আছে বা না আছে, ঐ পোশাকের জন্য জিদ শুরু করে দেয়। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে-কেটে বানিয়েই ছাড়বে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিবাহ-শাদীতে যে কাপড় একবার পরিধান করেছে, ঐ কাপড় পরিধান করে অন্য কোন অনুষ্ঠানে যাওয়া নাকি বড় দোষণীয়। তাই অনুষ্ঠানের জন্য প্রতিক্ষণ নতুন জোড়া চাই। ডিজাইনও নতুন, ফ্যাশন নতুন, ছিটও নতুন, ফিটও নতুন। দেখতে যেন মডার্ণ মনে হয়। এসব চিন্তা-ভাবনায় স্ত্রী সর্বদা ডুবে থাকে। আর তার এই অনৈসলামী খাহিশাত পূর্ণ করতে যেয়ে অসংখ্য গুনাহ তার দ্বারা প্রকাশ পায়, আর অসংখ্য গুনাহ স্বামীর দ্বারা প্রকাশ প্রায়। স্বামী তার স্ত্রীর খাহেশাত পূর্ণ করার টাকা জোগাড় করতে যেয়ে অক্ষমতার সম্মুখীণ হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে ঘুষ গ্রহণ করে অথবা অসদুপায়ের পথ ধরে।

ঘুষ গ্রহণ করা হারাম এবং একাজ মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে। আর যে কোন অসুদপায় অবলম্বনও তেমনি নাজায়িয ও হারাম।

মহিলাদের জন্য অলংকার পরিধান করা জায়েয তো অবশ্যই, কিন্তু ঐ জায়েয কাজের জন্য টানা-হেঁচড়া করা এবং স্বামীর জীবনের উপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেয়া কিংবা এজন্য তাকে ঘুষ ইত্যাদি হারাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা,

অতঃপর বেগানা পুরুষদের সম্মুখে এসব প্রদর্শন শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

তেমনিভাবে বিবাহ-শাদীর অনুষ্ঠানে অনেক নারী নানা রকম শরীয়ত পরিপন্থী প্রথার প্রচলন জারী রেখেছে। তারা চালু করেছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কু-রসম। ঐ কু-প্রথার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। পুরুষ যত বড় দ্বীনদার-পরহেজগার হোক না কেন, তাদের একটি কথারও মূল্যায়ন করা হয় না ঐ অনুষ্ঠানে। অবশেষে ওটাই হয়-যেটা নারীরা চায়।

অনুরূপভাবে জীবন মরণের ক্ষেত্রেও মহিলাদের বিভিন্ন প্রকার বিদ'আত ও শিরকযুক্ত বদরসম রয়েছে। ওগুলো পালন করা নামায-রোযার থেকেও বেশী আবশ্যক ও জরুরী মনে করে তারা। স্বামী যদি বুঝানোর চেষ্টা করে যে, এগুলো কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, এগুলো পরিত্যাগ কর, তাতেও তারা ঐ উপদেশ শ্রবণ করতে রাজী হয় না।

এসব উপমা ও দৃষ্টান্ত আমি হাদীস শরীফের মমার্থ সুস্পষ্ট করার জন্য লিপিবদ্ধ করলাম। ধর্ম-কর্মে ও বিবেক-বুদ্ধিতে দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও সেই সকল নারীরা বড় বড় শিক্ষিত বুদ্ধিমান পুরুষকে বুদ্ধ ও বোকা বানিয়ে মতলব হাসিল করে ছাড়ে।

তবে জায়িয পর্যায়ে যুক্তি সঙ্গত আবদারে দোষ নেই। কিন্তু যাতে তার অন্যায় আবদার পূরণের জন্য স্বামী কোনরূপ পাপ গুনাহ ও অন্যায় কর্মে জড়িত হয়ে ইহ-পরকাল বরবাদ না করে, সে ব্যাপারে তাকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। বরং ন্যূনতম প্রয়োজনেও স্বামীকে যাবতীয় অন্যায় কে বাঁচিয়ে রাখতে হবে এবং নিজে সৎ পথে চালাতে সহযোগিতা করতে হবে। তাহলে তারা দুনিয়ার জীবনের সুখ-শান্তি এবং পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করতে পারবে।

নেকী অর্জনের সহজ উপায়

আমাদেরকে একদিন না একদিন ইহকাল ছেড়ে পরকালে যেতে হবে। পরকালের জন্য প্রয়োজনীয় সম্বল আমাদের অর্জন করে নিতে হবে। পরকালের একমাত্র সম্বল হচ্ছে নেকী।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে ইচ্ছা করলে, সহজেই বেশ নেকী অর্জন করতে পারি। এ জন্য কঠোর পরিশ্রম কিংবা অধিক সময় ব্যয়ের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধুমাত্র অভ্যাসের। প্রত্যেক কাজের মাসনূন দোয়া কালাম পাঠ করার অভ্যাস করতে পারলে, অতি সহজেই অজস্র নেকী অর্জন করা সম্ভব।

আবার প্রতিটি কাজ সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী করলে,তাতে কাজও ভালভাবে সমাধা হয়, আবার যথেষ্ট নেকীও পাওয়া যায়। পাশাপাশি আমাদের রীতি-নীতির ভুল ত্রুটিগুলোও সুধরে চলতে হবে তাহলে আমল দ্বারা আমরা যথাযথ ছাওয়াব লাভে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

আরো কিছু ফর্মূলা শুনুন-'খোদা হাফেজে'র পরিবর্তে 'আল্লাহ হাফেজ' বলার অভ্যাস করতে হবে। খোদা হাফেজ ও আল্লাহ হাফেজ এই দু'টিতে কোন ভুল নেই। তবে অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে এই দু'টিতে অনেক তফাত আছে। 'আল্লাহ' আরবী ও পবিত্র কুরআনের শব্দ এবং 'খোদা হচ্ছে ফারসী শব্দ। তাই 'আল্লাহ' শব্দের ফজীলত অবশ্যই বেশী।

আমরা অনেকেই সহীহভাবে সালাম দিতে জানি না। সালাম শুধুমাত্র শুভেচ্ছা বা সৌজন্য বিনিময় নয়, সালাম একটি দোয়া ও ইবাদতও বটে। সালামের মাধ্যমে নেকী লাভের উপায় রয়েছে। আমরা সাধারণতঃ বলে থাকি-"সালামালেকুম"। এভাবে বলা শুদ্ধ নয়। বলতে হবে-"আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ" বললে ত্রিশটি নেকী পাওয়া যাবে।

আসসালামু আলাইকুম এর অর্থ-আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। সালামের উত্তরে বলতে হয়-'ওয়াআলাইকুমুস সালাম'। এর অর্থ আপনার উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। উত্তর দাতা এর সহিত 'ওয়া রাহমাতুল্লাহ' 'ওয়া বারাকাতুহ' বলতে পারেন। এটা বিশেষ ফজীলতপূর্ণ। আর কেউ সালাম দিলে তার জবাব অবশ্যই তাকে শুনিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে-সালাম দেয়া সুন্নাত, আর জবাব দেয়া ওয়াজিব।

কাজের শুরুতে "পরম করুণাময় মহান দয়ালুর নামে আরম্ভ করছি" না বলে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলতে হবে। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"-এটা পবিত্র কুরআনের আয়াত। এ আয়াতে ১৯ টি হরফ আছে। প্রতি হরফের অন্ততঃ ১০টি করে নেকি হিসেবে এতে (১৯×১০) = ১৯০টি নেকী পাওয়া যাবে।

নিয়মিত মাসনূন দোয়া পাঠে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে-ঘর হতে বের হওয়ার সময় "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লাহি লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ" বলা। হেঁটে চলার সময় "সুবহানাল্লাহ অথবা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করা। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠার সময় "আল্লাহু আকবার" এবং নীচে নামার সময় "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করা। ঘরে বা মসজিদে ঢুকার সময় ডান পা আগে বাড়িয়ে ঢোকা এবং দোয়া পড়া। ঘরে ঢুকে ঘরের লোকজনদেরকে সালাম দেয়া, খানা খাওয়ার পূর্বে "বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ' বলা খানা খাওয়ার পরে

"আলহামদুলিল্লাহিল্লাজী আত'আমানা ওয়া সাক্বানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন" পড়া। কাপড় পরিধান কালে "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী কাছানী হাযা ওয়ারাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়্যাহ" পাঠ করা। পায়খানয় ঢুকার সময় "আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবাইছ" পড়া, পায়খানা হতে বের হবার সময় "আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আফানী" পড়া। পিতা-মাতার জন্য "রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানী ছাগীরা" পড়ে দোয়া করা। জীব-জন্তু জবাই করার সময় "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা। রাগের সময় "আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম" বলা। যে কোন বিপদের সময় "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন" পাঠ করা এবং কষ্ট-দুঃখে এ দোয়া পড়া-"আল্লাহুম্মা আতাজিরুকা ফি মুসীবাতী ফাজুরণী ফীহা ওয়া আখলিফলী খাইরাম মিনহাযা"। এ ছাড়াও বালা-মুসীবতে দোয়ায়ে ইউনুস "লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জ্বালিমীন" পড়া, দুশ্চিন্তা হতে মুক্তির জন্য "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়া আমাদের কর্তব্য। এ সকল মাসনূন দোয়া ভাল আলেম থেকে সহীহ-শুদ্ধভাবে মুখস্থ করে নিতে হবে। তেমনিভাবে কোন কাজের ইচ্ছা প্রকাশে ইনশাআল্লাহ বলা, কাজের প্রশংসায় 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা, হাঁচির পরে 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং অন্যের হাঁচির দোয়ার জবাবে 'ইয়ার হামূকাল্লাহ' বলা, গুনাহর কথা শুনলে, 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলা, কারো অবদানের মূল্যায়নে মাশাআল্লাহ বলা, ধন্যবাদ জ্ঞাপনে জাযাকাল্লহ বলা উত্তম আমল।

আর সময় পেলেই দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করতে হবে। বিশেষ করে মুনাজাতের শুরুতে ও শেষে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পড়া একান্ত কর্তব্য।

এ সকল দোয়া ছাড়াও সকাল-সন্ধ্যা ও ওজীফামূলক অনেক ফজীলতপূর্ণ দোয়া রয়েছে। সেগুলো নিয়মিত পড়ে আমরা অসংখ্য নেকী অর্জন করতে পারি।

আবার জুমু'আর দিন নেকী অর্জনের অনেক সুযোগ রয়েছে। জুমু'আর দিন যে সর্বপ্রথম মসজিদে যাবে, সে একটি উট, পরবর্তীজন একটি গরু, তৎপরবর্তীজন ১টি বকরী, এভাবে একটি মুরগী, ১টি ডিম সদকা করার ছাওয়াব পাবে। জুম'আর জন্য যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে, খুশবু ব্যবহার করে, পায়ে হেঁটে মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের কাছাকাছি বসে এবং অহেতুক কথা বা বাজে কাজ না করে মনোযোগের সাথে খুৎবা শুনে, তার প্রতি কদমে ছাওয়াব লেখা হয় এবং গুনাহ মাফ করা হয়। আবার জুম'আর দিন সূরা কাহাফ

তিলাওয়াত করলে অজস্র নেকী লাভ হয় বলে হাদীসে রয়েছে।

অনুরূপভাবে ফজরের নামাযের পর তিন বার "আউজুবিল্লাহিস সামীইল আলীমি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম" পাঠ করে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করলে, সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাতের দোয়া করবেন। অনুরূপ মাগরিবের নামাযের পর পাঠ করলে, সকাল পর্যন্ত এই মর্তবা লাভ হবে। সূরা ইখলাস সূরা ফালাক ও সূরা নাস সকাল ও সন্ধ্যায় তিন-তিন বার বাঠ করলে, সকল প্রকার আপদ-বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাছাড়া এগুলো পাঠে প্রতি হরফে ১০ টি করে নেকীতো আছেই।

আজানের জওয়াব দেয়া কর্তব্য। আজানের জওয়াব দেয়ার অভ্যাস করতে হবে। আর আজানের আমলী জবাবে মসজিদে জামা'আতে শরীক হওয়া পুরুষদের জন্য ওয়াজিব। একা নামাযের চেয়ে জামা'আতে নামাযে সাতাশগুণ ছাওয়াব বেশী পাওয়া যায়। আর জামে মসজিদে নামায পড়ার দ্বারা ৫০০ গুণ ছাওয়াব বেশী লাভ হয়। তবে মহিলাগণ বাড়ীর অভ্যন্তরে গহীন নির্জনে নামায পড়লে পুরুষদের মসজিদের নামায পড়ার সমতুল্য নেকী পাবে। আর মাহে রমজানের রোযা এবং সামর্থবানদের জন্য হজ্জ করা, মালদারের জন্য মালের যাকাত দেয়া ফরজ কর্তব্য। তেমনিভাবে হালাল কামাই করা; হালাল খানা খাওয়া, হকভাবে চলা ফরজ কর্তব্য।

এ সকল ইবাদতের পাশাপাশি আখলাক-চরিত্রের দ্বারাও নেকী অর্জিত হয়। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নিতে হবে। এসকল কাজেও ছাওয়াব ও নেকী রয়েছে। মাতা-পিতার খিদমত করতে হবে। এতে ওঅশেষ নেকী হয়। মনে রাখতে হবে, সন্তানের বেহেশত মায়ের পদতলে। আলেমগণের সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তাদের সংস্পর্শে থাকাও এক প্রকার ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ। কবর জিয়ারত করতে হবে। এতে নেকী অর্জন হয় এবং পরকালের কথা স্মরণ হয়।

আরেকটি সহজ নেকীর পথ হল-কোন উত্তম মানের কাজ ডান হাত, ডান পা দিয়ে করা এবং নিম্নমানের কাজ বাম হাত, বাম পায়ে করা সুন্নাত ও ফজীলতময়। যেমন-সকল কাজে ডান-বামের সুন্নাত বজায় রাখলে, কাজও হয়, আবার বিশেষ নেকীও লাভ হয়।

এভাবে নিয়মিত আমল করে সুন্নতী যিন্দেগী গঠন করলে, সহজেই অজস্র নেকী লাভ করা আমাদের সম্ভব হবে।

প্রেম-ভালবাসার করুণ পরিণতি

এ প্রেম-ভালবাসাই আমার মূল্যবান জীবন ধ্বংস করেছে। কথাটি বলল অধুনা মুসলিম বিশ্বের সাংস্কৃতিক রাজধানী কায়রোর এক ভার্সিটি পড়ুয়া হতভাগা রূপসী তরুণী। আল্লাহ পাকের সুনিপূণ বিধান পর্দাকে অমান্য করে যৌবনের অপ্রতিহত গতিসীমা লংঘনের দায়ে তার জীবন যে ধ্বংসের আগ্নেয়গিরিতে নিপতিত হয়েছে, অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তরুণ-তরুণীদের সহশিক্ষা, অবাধ মেলামেশা, বল্গাহীন স্বাধীনতা ও অশ্লীল বিনোদনের কালগ্রাস মানবের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে টর্নেডোর ধ্বংসলীলা বয়ে আনে, এ মেয়েটির জীবনই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রেম নামের চক্রান্তের শিকার অবলা-সরলা মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের একজন মেধাবী ছাত্রী। চার বোনের মধ্যে সেই সবার বড়। ছোটরা মাধ্যমিক স্কুলে পড়া লেখা করে। বৃদ্ধ পিতা মহল্লার মুদী দোকানদার। উর্বশী তরুণীটি দেখতে সুন্দরী। মনযোগী-পরিশ্রমী। সৎগুণাবলী ও আখলাক-চরিত্রে বেশ প্রসিদ্ধ। জ্ঞান-গরিমায় তুলনাহীন। বান্ধবী মহলের সবারই ভীষণ প্রিয়। মোটকথা, রূপে-গুণে অনন্য নজীর। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার হিংস্র ছোবল তাকে মান-মর্যাদার শান্তিময় জীবন ছেড়ে পশুত্বের নিকৃষ্টতম জীবনে নিয়ে এল। তার বিপর্যস্ত জীবন কাহিনীতে রয়েছে আধুনিক তরুণ-তরুণীদের জন্য বিরাট শিক্ষণীয় অধ্যায়। তাই সে বিশ্বের সকল তরুণীদের প্রতি দরদী হয়ে নিজের জীবন কাহিনী নিজেই বলে গেল। যেন সকলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

তার ভাষায় ঃ "প্রতিদিনের মত আজও ক্লাস শেষ হল। ক্যাম্পাস থেকে গেটের দিকে বেরিয়ে এলাম। হঠাৎ এক যুবক এসে সামনে দাঁড়াল। চেহারায় দুষ্টামীর মুচকি হাসি। পোশাকে আভিজাত্যের কৃত্রিম রং। তার বাঁকা চোখের চাহনি দেখে মনে হল-আমি যেন তার পরিচিত কেউ। আমি তাকে কোন গুরুত্ব না দিয়েই পথ ধরলাম। কিন্তু সেও আমার পিছু ধরল। ভদ্রতার নম্র কণ্ঠে আস্তে আস্তে কথা বলছে, আর পিছে পিছে হাঁটছে। দুষ্ট লোকের মিষ্টি ভাষায় বলতে লাগল, ওহে রূপসী! অনেক দিন ধরে আমি তোমাকে দেখে আসছি। জেনেছি তোমার অনেক কিছুই। তোমার হরিণ চঞ্চল রূপসী চেহারা এবং নির্মল আখলাক-চরিত্রে আমি মুগ্ধ। তাই আমি তোমাকে বিয়ে করে মনের রাণী বানাতে চাই।' এমন পরিস্থিতি এই প্রথম। দুষ্টের মিষ্টি কথায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে কপোলে ঘাম বেরিয়ে এল। লজ্জায় চেহারা যেন লাল হয়ে গেল। কোন কিছু না বলেই জলদি ছুট দিলাম। পা দু'টি যেন হোঁচট খেতে খেতে কোন মতে বাসায় গিয়ে

উঠলাম। শুরু হল দুশ্চিন্তার অনিদ্র রাত। ভয়-ভীতির কালো মেঘ বারবার গর্জে উঠল মনের অস্থিরাকাশে।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। যখনই ক্যাম্পাস ছেড়ে গেটে আমি তাকে অপেক্ষমান দেখতে পাই, আমাকে দেখা মাত্রই হাসি মুখে কথা বলতে এগিয়ে আসে সে। আমি যতই তাকে এড়িয়ে চলি, সে যেন ততই বিরক্ত করতে লাগল। প্রত্যহ আমার পিছে বাসা পর্যন্ত ছুটে আসে।

এবার ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। একদিন বাসার গেটে এক টুকরো কাগজ ছুড়ে মারল সে। কাগজটি উঠাব কি না দোটানায় পড়ে গেলাম। কম্পিত হয়ে উঠিয়ে পড়তে লাগলাম। প্রেম-প্রীতির রসালো কথাবার্তায় ভরপুর সেটি। আমার উদাসীনতার অভিযোগে ও মনের দুঃখ প্রকাশে ফেলে দিলাম। কিছুক্ষণ না যেতেই ফোনের রিং বেজে উঠল। রিসিভার ধরতেই দুষ্টের মিষ্টি আওয়াজ ভেসে এল। চিঠি পড়েছি কিনা আবেগাপ্লুত কণ্ঠে জানতে চাইল সে। আমি গম্ভীর গলায় তাকে সতর্কতার সংকেত দিলাম, জ্বালাতন বন্ধ না করলে পরিবারকে বলে দিব সব। একটু পর আবারও ফোন করল সে। এবার বিনয়ের সিক্ত কণ্ঠে কাকুতি-মিনতি শুরু করল। কান্নার আওয়াজে বলতে লাগল, আমি একজন ধনাঢ্য যুবক। ধন-সম্পদের কোন অভাব নেই। নিতান্ত অভাব শুধু আপনজনের। নশ্বর পৃথিবীতে আপনজন বলতে কেউ বেঁচে নেই। আপনহারা জীবনে কোন শান্তি নেই। জীবনটি যেন হতাশা-দুরাশার মরুপ্রান্তর। তোমাকে বিয়ে করে প্রশান্তির দ্বার খুলতে চাই। তোমার জন্য তৈরী করব শান্তির সুরম্য প্রাসাদ। তোমার সকল চাহিদা পূরণে আমি প্রস্তুত। তুমি আমার হৃদয়রাণী জীবন সঙ্গীনী হবে। মোটকথা, এই বিয়ের পরিণাম হবে সুখ-শান্তি ও মর্যাদার সংসার। ভরা যৌবনে চাটুকারের এ সকল আকর্ষণীয় কোমল কথায় আমিও মনে মনে বেশ দুর্বলতা অনুভব করলাম। অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না করে অভিভাবককে না জানিয়ে ইসলামের বিধান লংঘন করে কল্পনার আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। শুরু হল মন দেয়া-নেয়া।

ক্রমশ দীর্ঘায়িত হতে লাগল প্রেমালাপের রঙ্গিন মঞ্চ। ক'দিনেই রমরমা হয়ে জমে উঠল প্রেমের গরম বাজার। ডুবে গেলাম ভালবাসার অথৈ সাগরে। প্রতিটা মুহূর্ত তার ফোনের অপেক্ষায় বসে রইলাম। ক্লাস শেষেও তাকেই খুঁজে বেড়াতাম। আস্তে আস্তে সে যেন আমার হৃদয়-মন, চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাংখাকে কেড়ে নিল। সে-ই হল জীবনের প্রধান পাঠ্যসূচী। এভাবে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল বেশ কিছুদিন।

হঠাৎ জীবনাকাশে নেমে এল অমাবস্যা তিমির, সে অন্ধকার ধ্বংস করে দিল আমার সতীত্ব, চরিত্র ও মূল্যবান জীবনকে। ধ্বসে পড়ল ভবিষ্যতের সুরমা

প্রাসাদ। কলংকের ঘৃণ্য মালা গলায় জড়িয়ে বেঁচে থাকতে হল সমাজের মাঝে। প্রতিদিনের মত আজও বের হলাম বন্ধুটির সাথে। আজ নিয়ে গেল জনশূণ্য এক নির্জন বাসায়। ভিতরে ঢুকেই পাশাপাশি বসলাম। ভেসে গেলাম ভালবাসা ও যৌবনের বন্যায়। ভুলে গেলাম রাসূলের সে অমূল্য নসীহত, "কোন (বেগানা) নারী-পুরুষ যখন নিভৃতে একত্রিত হয়, তখন তাদের (হৃদয়ে কুমন্ত্রনা সৃষ্টিতে) তৃতীয় জন ইবলিস-শয়তান ভূমিকা রাখে।" (হাদীস) সত্যই শয়তান প্রভাব বিস্তার করে বসল।

সে জোর পূর্বক আমার সতীত্ব কেড়ে নিল। আমাকে ডুবিয়ে দিল জাহান্নামের অগ্নিকুন্ডে। হারিয়ে ফেললাম চরিত্র ও সতীত্বের মহাসম্পদ। জ্ঞানশূন্যভাবে অভিশাপ শুরু করলাম, 'হে নরপশু! আমাকে কি পাপ করালি তুই'? দুষ্টামির হাসি হেসে সে বলল, 'ভয় নেই সুন্দরী! তুমিতো আমারই স্ত্রী।' আমি বললাম-'কবে তোর স্ত্রী হলাম?' সে বলল, 'অতি শীঘ্রই তোমাকে বিয়ে করছি।' বিবেকের দংশনে উন্মাদিনী হয়ে বাসায় ফিরলাম। পদযুগল যেন আমার পাপী দেহকে বহনের শক্তি হারিয়ে ফেলল। দেহের প্রতিটা কোণায় অনূশোচনার অগ্নি দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। কি হতে কি হয়ে গেল কিছুই ভাবতে পারলাম না। লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে খোদার কাছে ক্ষমা চাইলাম। দিশেহারা হয়ে কাঁদতে লাগলাম। অন্ধকার যেন চারিদিক থেকে আমাকে ঢেকে নিল। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও লেখাপড়ার যবনিকা টানলাম। কারণ, লেখাপড়ার মূল লক্ষ্য চরিত্রের উন্নতি। আমার তো আর চরিত্র নেই। লেখাপড়া দিয়ে আর কি হবে? এরূপে আমার অবস্থা দিনদিন বিপর্যয়ের চরমে গিয়ে পৌছল। পরিবারের সবাই বিচলিত, মূল রহস্য কেউ জানল না। হৃদয়ে একটি মাত্র আশা নিয়ে বসে রইলাম, সে আমাকে বিয়ে করবে। বেশ কিছুদিন তার কোন খোঁজ নেই। ব্যাপারটি আমার মাথায় পর্বতসম কঠিন হতে লাগল। এরপর কি হবে, কিছুই যেন ভেবে পাই না। ক্ষণিকের একটি ভুল জীবনকে এমনিভাবে বিধ্বস্ত করে দিবে, ভাবতেই দু'চোখ ভিজে গেল।

একদিন আবারও ফোন বেজে উঠল। সে বলল, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তোমার সাথে দেখা করতে চাই। ভাবলাম-বিয়ের ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলবে হয়তো। আনন্দে হৃদয় ভরে গেল। জলদি বেরিয়ে পড়লাম দেখা করতে। কিন্তু কি আশ্চর্য। তার চেহারায় যেন পাষণ্ডতার কালো মেঘ। কিছু বলার আগেই মুখ ভেংচিয়ে রুক্ষভাবে বলে উঠল, বিয়ের ব্যাপারে কখনই ভাববে না কিন্তু। আমি চাই-আমরা বিয়ের শৃংখলে না জড়িয়ে এমনি আমোদ-ফুর্তিতেই জীবন কাটাব। মনের অজান্তেই হাত দুটো উঁচু হয়ে গেল। তার গাল বেয়ে কষে চপেটাঘাত

করলাম, যেন তার পাপী চোখ থেকে কুদৃষ্টি বিদায় নেয়। আমি বললাম, ভেবেছিলাম-আজ বুঝি অতীত ভুলের সংশোধন করবে। কিন্তু একি কথা? তুই একটি মানবতা-মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বহীন দুশ্চরিত্র নর পিচাশ! অভিমানের ভেজা চোখে দ্রুত গাড়ী থেকে নেমে এলাম। এবার সে বলল, ধন্যবাদ তোমার অনুগ্রহের জন্য। তার কথা শুনে পিছনে ঘুরে তাকালাম। এবার তার হাতে একটি ভিডিও ক্যাসেট দেখতে পেলাম। সে ক্যাসেটটির দিকে ইশারা করে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, এ ক্যাসেটই তোমার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে। বিস্মিত নয়নে জানতে চাইলাম-এর ভিতর কি আছে? সে বলল, একদিন বুঝবে, কি আছে। পরে বলেই ফেলল-সেদিনের সেই অপকর্মগুলো সম্পূর্ণ রেকর্ড করা আছে এতে। গোপন ক্যামেরার মাধ্যমে সেদিনের প্রতিটা নাড়াচাড়া পর্যন্ত ভিডিও বন্দী। সেটা দ্বারা সে আমাকে ব্ল্যাক মেইল করবে বলে হুংকার দিল। আমি বললাম-কি করেছিস ইতর কাপুরুষ? সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, এ ক্যাসেটই তোকে কাবু রাখার একমাত্র উপায়। তবে হ্যাঁ! তুই যদি আমার প্রতিটা হুকুম মেনে চলিস এবং আমার আঙ্গুলের ইশারায় উঠা-বসা করিস, তবেই কেবল বাঁচতে পারবি। এবার আমার কান্নায় বুক ফেটে যেতে লাগল। উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগলাম। ব্যাপারটি সকল বংশের জন্য বিরাট কলংক। সেও আমাকে কর্কশভাবে সতর্ক করল। অস্থির হয়ে আমি প্রাণ বাঁচিয়ে কোনমতে সেখান থেকে চলে এলাম।

চিন্তা-অস্তিরতা ও পেরেশানীর অতল গহ্বরে নিপতিত হলাম। জীবন আমার বিষময় হয়ে উঠল। সেই নরপিচাশ সেই ক্যাসেট দিয়ে ব্যবসা শুরু করল। ক্যাসেটটি বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। আমার ভাগ্যাকাশ দুর্দশায় ঘনীভূত হতে লাগল। একদিন আমার নিজ চাচাত ভাইয়ের হাতে ধরা পড়ল ক্যাসেটটি। এবার ঘটনা ফাঁস হয়ে গেল। বাবা-মাসহ পরিবারের সবাই জেনে গেল। ক'দিনেই এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। লজ্জা ও লাঞ্ছনায় গোটা বংশের মাথা নীচু হয়ে গেল। উপায় না দেখে লোকালয়ের দৃষ্টি থেকে গা ঢাকা দিয়ে জীবন বাঁচালাম।

ক'দিন পর খবর পেলাম-অপমানের গ্লানি সইতে না পেরে আমার বৃদ্ধ পিতা ছোট বোনদের নিয়ে শহর ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের অখণ্ডনীয় হস্তক্ষেপ তাদের পিছু ছাড়ল না। ক'দিন পর সেখানেও পৌঁছে গেল সর্বনাশা ঘটনাটি। অন্য এক যুবকের মাধ্যমে সেখানেও ছড়িয়ে পড়ল ক্যাসেটটি। ঐ এলাকার লোকজন আমার পরিবারের বিরুদ্ধে সালিশ বসাল। এর পরের ঘটনা আরও মারাত্মক।

এভাবে পাপের প্রায়শ্চিত্তে ডুবে মানবেতর জীবন নিয়ে কোন মতে বেঁচে থাকলাম। সামান্য একটি ভুলের কারণে সোনার জীবনের সর্বনাশ করলাম। আল্লাহ পাকের সুন্দর বিধানকে অমান্য করার দরুণই আমার এই দশা হল। সত্যই খোদার অনুপম বিধান মানবের জন্য কতইনা সুন্দর ও কল্যাণকর আমি যদি পর্দা রক্ষা করে পর পুরুষের সাথে না মিশতাম, তবে তো আর এই সর্বনাশের শিকার হতাম না। ওহে মুসলিম বোনেরা আমার। তোমাদের পাপী বোনের কথা হৃদয়াঙ্গম কর। ইসলামই আমাদের নারীদের মানমর্যাদা ও জীবনের গ্যারান্টি দেয়। আধুনিক সভ্যতা নারীদের জীবনকে পশুত্বের দিকে নিয়ে যায় শুধু। এখনই সময় বুঝার, চিন্তা করার। মিথ্যের জমকাল প্রলেপ মাখা আধুনিক সভ্যতা ছেড়ে দাও। পর্দার বিধানকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধর। ইসলামই তোমাদের উত্তম পাথেয়।

জানতে পারলাম- এই দুশ্চরিত্র যুবকটির যাদুর ফাঁদে জড়িয়ে আমার মত আরও অনেকগুলো অবলা-সরলা কোমলমতি তরুণীর সোনালী ভবিষ্যত ধ্বংস হয়েছে। ধ্বসে পড়েছে তাদের পরিবারের ঐতিহ্য বন্ধন। আমার হৃদয় প্রতিশোধের নেশায় মেতে উঠল। সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণতে লাগলাম। কোন একদিন পাপীটি মদের অতিরিক্ত নেশায় ঢুলতে ঢুলতে আমার কাছে এল। সূবর্ণ সুযোগ বুঝে জলদি তার পাপী দেহে ছুরি চালিয়ে দিলাম। মানবরূপী ইবলিস শয়তানকে হত্যা করে খোদার পবিত্র ভূমিকে শয়তান মুক্ত করলাম। হাজারো মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পিচাশের মৃত্যুর খবর শুনে।

প্রিয় তরুণী বোনেরা আমার! আমি আজ আমার অতীত কুকর্ম এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জীবনের উপর ভীষণ লজ্জিত। যখনই সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে, আমার সমস্ত দেহ-মন শিউরে উঠে। মনে হয়- প্রতিটা জায়গাতেই যেন নরপশু আমাকে ধাওয়া করছে। আমি আমার জীবনের চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনাটি বিশ্বের সকল তরুণী বোনদের সামনে তুলে ধরলাম, যাতে তারা আমার মত চক্রান্তের শিকার হয়ে মূল্যবান জীবনকে ধ্বসিয়ে না দেয়। যেসব তরণী বোনেরা আজ যৌবনের জোয়ারে দিশেহারা হয়ে যুবকদের চাকচিক্যময় কথাবার্তা, বাকচাতুর্যপূর্ণ গোলাপী প্রেমপত্র এবং তাদের টানা-হেঁচরায় অস্থির, তাদের জন্য যেন আমার জীবন কাহিনী উত্তম সবক হয়।

ওহে বিশ্বের যুবতী বোনেরা আমার! তোমরা যুগের ভ্রমর সদৃশ নরপিচাশ যুবকদের মিষ্টি মধুর কথাবার্তা, রসালো আলাপ, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, টেলিফোন, প্রেম নিবেদন ও অবাধ মেলামেশা থেকে বেঁচে থাক। আধুনিক সভ্যতায় গা ভাসিয়ে আমার মত লাঞ্ছনার ঘৃণ্য মাল্য গলায় জড়িও না। প্রেম-ভালবাসা নামের

পাপের পথে যেওনা। ইসলামের অনুপম আদর্শ পর্দার সংরক্ষিত গন্ডির মধ্যেই তোমাদের ভবিষ্যত কল্যাণ রয়েছে, পর্দাকে কখনও ছাড়বেনা। অভিভাবকের অগোচরে কখনও পা বাড়াবে না। তোমাদের মূল্যবান জীবনের প্রতি দরদি হয়েই আমার কলংকময় জীবন চিত্র তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। সেই ভয়ংকর চিত্র আমি ও আমার গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার উপর আক্ষেপ করেই আমার বৃদ্ধ পিতার অকাল মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে একটি কথাই বারবার বলেছেন, হে দুর্ভাগা মেয়ে! তোর প্রতি খোদার গজব পড়ুক। কিয়ামত পর্যন্ত আমি তোর উপর অসন্তুষ্ট থাকব।

আমি আমার জীবনে পিতার বদ দোয়া বইয়ে নিয়ে চলছি। বর্তমানে আমি তাওবা করেছি। আল্লাহ পাক যেন ক্ষমা করেন, তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই।

শেষ কথা ঃ এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ১৪০৮ হিজরীতে। এ জাতীয় ঘটনা আজ আর নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর অধুনা পরিবারগুলোতে এমন ঘটনা অহরহ ঘটে যাচ্ছে। বল্গাহীন যুগের হাজারো অবলা-সরলা নারী অবাধ মেলামেশায় এ জাতীয় চক্রান্তের শিকার হয়ে পাগলা গারদে মানবেতর জীবন যাপন করছে। আবার কলংকের কালো দাগ মুছতে অনেকে আত্মহত্যা করে মূল্যবান জীবনকেই বিসর্জন দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক ইয়াহুদী চক্রের দ্বারা মুসলিম আরব দেশগুলোতে সাধারণতঃ এমন ঘটনা পরিকল্পিত ভাবে বেশী সংঘটিত হচ্ছে। ইয়াহুদীরা মুসলিম তরুণ-তরুণীদের আখলাক-চরিত্র ও মূল্যবান জীবন ধ্বসিয়ে দিতে ফ্লিমি কায়দায় এমন অস্ত্র ব্যবহার করে-যার ক্ষতি আনবিক, পারমানবিক বোমার ক্ষতির চেয়েও ভয়াবহ। ইয়াহুদীদের মারণাস্ত্রগুলোর অন্যতম হল-অশ্লীল সিনেমা, নাটক ও পত্র-পত্রিকা। আজ মুসলিম বিশ্বের প্রতিটা দেশ এসব অশ্লীল বিনোদনের সয়লাবে ভরপুর। ভেসে যাচ্ছে যুবক-যুবতীদের নৈতিক চরিত্র। স্যাটেলাইট ডিশের মাধ্যমে যেসব নগ্নতা-অশ্লীলতা দেখানো হয়, তাতে শয়তানেরও লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যাবার কথা। তাই মুসলিম দেশের সরকারগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় কর্তব্য-নিজ দেশ থেকে অপসংস্কৃতি দূর করে মুসলিম যুবকদের নৈতিক-চারিত্রিক মহামারী থেকে দূরে রাখা। অন্যথায় নিকট ভবিষ্যতে এর চূড়ান্ত মাশুল দিতে হবে সকলকেই। তবে সরকারের এই কর্মসূচী তখনই সম্ভব, যদি পরিবারের মা-বাবগণও নিজ নিজ সন্তানের সোনালী ভবিষ্যতে আন্তরিক হয়। তাই মুসলিম জাহানের প্রতিটা মা-বাবা ও সরকারের প্রতি আহবান, সময় থাকতেই আপনারা এগিয়ে আসুন। রক্ষা করুন মুসলিম তরুণ-তরুণীদের পবিত্র জীবনগুলোকে।

বউয়ের সাথে শাশুড়ীর দ্বন্দ্বের কারণ ও প্রতিকার

স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক গভীরতর করা যেমনিভাবে বধুর কর্তব্য, তেমনিভাবে স্বামীর স্নেহময়ী মা-জননীর অর্থাৎ শাশুড়ীর সাথেও সুসম্পর্ক গভীর করা তার কর্তব্য। তবে এক তরফাভাবে কস্মিনকালেও সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হবে না-যতক্ষণ না শাশুড়ীও বউয়ের সাথে সম্পর্ক গভীরতর করতে যত্নবান হবেন।

বউ-শাশুড়ীর ঝগড়া বাঁধার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত কারণ হলো-ঘরে দ্বীনদারী না থাকা। যখন ঘরে দ্বীনদারী আসবে, ঘরে আল্লাহ তা'আলার আহকাম যিন্দা হবে, তখন বউ-শাশুড়ীর দ্বন্দ্ব ফাসাদ-খতম হবে।

এছাড়াও বউয়ের সহিত শাশুড়ীর দ্বন্দ্ব-ফাসাদের যে সব কারণ রয়েছে, সেগুলো হলো-

১ম কারণ ঃ শাশুড়ীর অন্তরে এমন কুধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ছেলেকে আমি এ যাবত এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শরীরের রক্ত পানি করে খাওয়ায়ে-দাওয়ায়ে মানুষ করলাম, আজ নতুন একটা মেয়ে উড়ে এসে জুড়ে বসে রাজত্ব করবে এবং আমার কলিজার টুকরা হাত ছাড়া হয়ে যাবে, এট কেমনে মেনে নেয়া যায়?

এ ধারণা মনে আসলে শাশুড়ীর চিন্তা করা উচিত যে, এটা আল্লাহ পাকের বিধান ও জগতের নিয়ম যে, মাতা-পিতা সন্তানদের বড় করে গড়ে তুলে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে অপরের হাতে তুলে দেয়। সেই শাশুড়ী নিজেও তো নববধু রূপে যখন এ বাড়ীতে আসেন, তখন তিনিও তো তার স্বামীকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একান্ত করে নিয়েছিলেন।

এছাড়াও এক্ষেত্রে নিজের মেয়ের কথা চিন্তা করুন যে, তাকেও তো বড় করে অপরের হাতে তুলে দিয়েছেন বা দিবেন এবং সেই জামাইও তো কোন না কোন মায়ের সন্তান। আমার সেই মেয়েও তো তার কোলে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এবং আপনিও চান যে, আপনার মেয়ে সেই সংসারে রাণী হয়ে থাকুক। তাই আপনার ছেলের ঘরের বউও তো সে রকম অধিকার পাওয়ার হকদার।

২য় কারণ ঃ শাশুড়ী স্বীয় গৃহের মহারাণী হয়ে থাকেন। গোটা বাড়ীতে তার রাজত্ব পরিচালিত হয়। এখন বউ বাড়ীতে আবির্ভূত হওয়ার পর তার মনে এ দুর্বলতা দেখা দেয় যে, আমার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে এবং বউ রাজত্ব পরিচালিত করতে আরম্ভ করবে।

এব্যাপারে শাশুড়ীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনিও একদিন বধু ছিলেন এবং সংসারের কর্তৃত্ব করেছিলেন। তাছাড়া তিনি তো এখন ক্রমশঃই বার্ধক্যে

পতিত হবেন, তখন সংসারের দায়িত্বের বোঝা বধুর উপর পড়লে, তাতে তো তারই কাজে আসান হল।

৩য় কারণ ঃ শাশুড়ী শুধু আপন স্বামীর ধন-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা ও সোনা-গহনাকে নিজ মালিকানাধীন মনে করেন যে তা-ই নয়, বরং পুত্রের উপার্জিত সম্পত্তির উপরও নিজের দখরলদারিত্ব চান। যখন এ বধু আপন স্বামীর ঐ সম্পত্তি হতে প্রয়োজনে হাত খরচ ইত্যাদি বাবদ কোন অংশ চায় তখন শাশুড়ীর তা বরদাস্ত হয় না। বরং সেই চাওয়াকে স্বীয় দখলদারিত্বে হস্তক্ষেপ মনে করে ঝগড়া বাঁধান।

শাশুড়ীর এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে-পুত্রের উপার্জিত সম্পদ পুত্রের একান্তই নিজস্ব, আর সেই সম্পদে তার স্ত্রীর সুনির্দিষ্ট হক রয়েছে। সেই হক পাওয়ার সে একান্তই হকদার।

৪র্থ কারণ ঃ যে কোন শাশুড়ীর অন্তরে মাঝে মাঝে এ সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মনে হয়-বউ আমাদের বাড়ীর জিনিসপত্র অগোচরে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেয়।

এমন শাশুড়ীদের স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধু সন্দেহের বশে কারো উপর অপবাদ আরোপ করা ঠিক নয়। এরূপ কুধারণা করা গুনাহর কাজ।

তাছাড়া বউ যদি সম্পূর্ণ নিজের মালিকানার কিছু মা-বাবা বা ভাই-বোনকে হাদিয়া দেয়, তাতে শাশুড়ীর তো বলার কিছুই নেই।

৫ম কারণ ঃ বউ যখন নিজের জন্য পোশক-পরিচ্ছদ বা প্রসাধনী ক্রয় করে তখন শাশুড়ীর মনে এ ধারণা হয় যে, বউ আমার ছেলের পকেট খালী করে দিচ্ছে। এছাড়াও বউ যদি স্বামী থেকে টাকা নিয়েও কোন কিছু কিনে এসব ভেবে শাশুড়ীর মুখটা মলিন হয়ে যায়।

এক্ষেত্রে শাশুড়ীর মনে রাখতে হবে-তিনি যখন বধু ছিলেন, তখন তিনিও এমন প্রসাধনী ব্যবহার করেছেন। আর স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে-স্ত্রীর প্রয়োজনীয় জিনিস সামর্থ অনুযায়ী যোগান দেয়া। এটা স্ত্রীর হক।

৬ষ্ঠ কারণ ঃ অনেক সময় কোন ব্যাপারে সামান্য সন্দেহ হলে, তখন শাশুড়ীর পুত্রবধুর উপর কুধারণা শুরু হয়ে যায় এবং নিত্যনতুন ঝগড়া জন্ম নেয়।

আগেই বলেছি যে, প্রমাণ ছাড়া শুধু সন্দেহের বশে বউয়ের উপর কোন অপবাদ দেয়া ঠিক নয়। তা অন্যায় ও গুনাহর কাঝ। হ্যাঁ, যদি সত্যিই তার কোন ভুল-ত্রুটি হয়, তাহলে নিজের মেয়ে হলে যেমন তাকে ফেলে দিতে পারতেন না, সংশোধন করতে চেষ্টা করতেন, তেমনি পুত্রবধুকেও শান্তিপূর্ণ উপায়ে শুধরানোর চেষ্টা করতে হবে।

এ পর্যন্ত শাশুড়ীর কারণে বউ-শাশুড়ীর ঝগড়া বাধার বিভিন্ন কারণ ও প্রতিকার তুলে ধরা হল। অনেক সময় বউয়ের বদ আখলাকী, বদ মেযাজ ও অহংকারের কারণেও বউ-শাশুড়ীর মাঝে ঝগড়া বাঁধে। অনেক স্ত্রী এমন আছে যে, তার স্বামী, শাশুড়ী, ননদ বা অন্য কারো অনুগত থাকুক-এটা সে কখনই পছন্দ করে না। কোন কোন বধু মনে করে যে, শাশুড়ী তার প্রতিটি কাজের তদারকী করে এবং তার ভুল-ত্রুটি অন্বেষণ করতে থাকে। সে এ কথাও ভাবে যে, আমি অধিকারের দিক দিয়ে শাশুড়ী ও ননদদের তুলনায় কোন অংশে কম নই। এ গৃহে আমি দাসী বা মাসী হতে আসিনি। শাশুড়ী ননদরা যদি আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ উত্থাপন করে, আমি তাদের বিরুদ্ধে দশটি অভিযোগ উত্থাপন করব। এভাবে ভুল মনোবৃত্তির পিছনে অনেক সময় বৌয়েরা ধাবিত হয়।

নববধুর অন্তরে এসব চিন্তা-ভাবনা আসলে পূর্বপ্রসূত। তার এমন হিংস্র পরিকল্পনা কারো শিখিয়ে দেয়া। শ্বশুরালয়ে আসার আগের তার স্বজন ও বান্ধবীরা শিখিয়ে দিয়েছে যে, খবরদার! সে বাড়ীতে একবার যদি নত স্বীকার করিস, তাহলে আজীবন তোকে নত স্বীকার করতে হবে, আর অসহনীয় জ্বালা সয়ে সয়ে দিনাতিপাত করতে হবে। অপরিণামদর্শী স্বজন-বান্ধবীদের এহেন হাঙ্গামামাখা সবক ও দিক-নির্দেশনার কুপ্রভাব তার অন্তরে ও মন-মানসিকতায় শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ীর সম্মুখে নত হওয়ার কল্পনাই আসতে দেয় না। বউয়ের পক্ষ থেকে ঝগড়া-ফাসাদের মূল উদ্ভব সাধারণতঃ এ বদআচরণ বাড়তেই থাকে এবং জেদাজেদী ও অহংকারের অগ্নি দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনবরত তুষের আগুনের ন্যায় জ্বলতে থাকে।

বউকে এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে এবং নিজের সুখের ঘর নিজ গুণের দ্বারা রচনা করতে হবে। কারো কুপ্ররোচনায় কান দেয়া যাবে না। নিজের সংসার ভাঙ্গলে কুটনী প্ররোচিকারা কিন্তু জুড়ে দিবে না।

বউয়ের আত্মম্ভরিতা, মন-মতলবী, অহমিকা ও বদচলন অনেক সময় ঝগড়ার কারণ হয় এবং বউ-শাশুড়ীর দ্বন্দ্ব ঘটায়।

কিন্তু বউ যদি সামান্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সহিত চলে এবং সেসব বদস্বভাব পরিহার করে বড়ত্ব, অহংকার ও নাদানী পরিত্যাগ করে আপন মর্যাদার স্তর চিনে সহনশীলতার যিন্দেগী গঠন করতে পারে, তাহলেই ঘর ও সংসারে শান্তি নেমে আসবে এবং পরিবার হবে সুখ-শান্তির উদ্যান।

শাশুড়ীর সহিত বিবাদ নয়

নববধু স্বামীর সংসার তরীতে আরোহণের পর সর্বপ্রথম যে প্রবীন কান্ডারীর সাক্ষাত লাভ করে, তিনি হলেন সম্মানিতা শাশুড়ী। মাতৃস্নেহ ও পিতৃআদর বিসর্জন দিয়ে ভিন্ন এক সংসার জগতে পদার্পণ করে বিশেষতঃ শাশুড়ীর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় সকল নববধুকে।

সমাজে খুব কম সংখ্যক গৃহবধু শাশুড়ীর সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে সংসার কাননে শান্তির ফুল ফুটাতে সক্ষম হয়েছে। সিংহভাগ ঘরণী শাশুড়ীর হৃদয় কোণে বিষাক্ত তীর মেরে বদদোয়া হাসিল করে সংসারে বিবাদের বীজ বপন করে।

শাশুড়ীর সাথে বউয়ের বিবাদের বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে হচ্ছে-

১। মা সম্বোধনে অস্বীকৃতি ঃ বিশেষতঃ ভাতিজী, ভাগ্নী, ননদের মেয়ে অথবা এরূপ নিকটাত্মীয়ের কোন মেয়ে কিংবা সাধারণ পরিবারে ধনীর মেয়ে অথবা কু-শিক্ষিত মেয়ে পুত্রবধু হিসেবে আসলে লজ্জা বশতঃ বা আত্মঅভিমানের কারণে শাশুড়ীকে মা অথবা আম্মা বলে ডাকতে দ্বিধাবোধ করে। অথচ প্রত্যেক শাশুড়ীর কাম্য যে, বধু তাকে মা বলে ডাকবে, আর শাশুড়ী মেয়ে বলে আদর করবে। এর বিপরীত হলেই বাড়তে থাকে বউ-শাশুড়ীর মাঝে সম্পর্কের দূরত্ব। সূত্রপাত হয় বিবাদের।

২। দায়িত্বে অবহেলা ঃ গৃহবধুর সাক্ষাত পেয়ে আনন্দে আত্মহারা শাশুড়ী সু-দীর্ঘ যুগের তিলে তিলে গড়া সোনার সংসারের চাবি বধুর হাতে অর্পণ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। তাই বিচক্ষণ শাশুড়ী বধুকে নিজ কাজের সহযোগী হিসেবে নিয়ে সংসার পরিচালনায় উপযুক্ত গৃহিণী রূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করে।

কিন্তু অনেক বদনসীব বউ শাশুড়ীর কথায় কর্ণপাত না করে বরং শাশুড়ীকে জীবনের ভোগ-বিলাসের পথের বাধা ও দুশমন ভাবতে থাকে। তাই সংসার জীবনের সকল পর্যায়ে অবহেলা প্রদর্শন করে উড়ে এসে জুড়ে বসার ক্ষমতা বলে নিজে বনে যায় রাজরাণী, আর শাশুড়ীকে ভাবতে থাকে চাকরাণী। ফলে বধূ-শাশুড়ীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে।

৩। খিদমতে অনীহা ঃ শাশুড়ীরা স্বীয় বউ হতে খিদমত কামনা করেন। মায়ের খিদমত করার দায়িত্ব সন্তানের স্বামীর বিভিন্ন প্রয়োজনে বাহিরে অবস্থান কালে তার মায়ের সেবার দায়িত্বটুকু স্বাভাবিকভাবেই তার স্ত্রীর উপরই বর্তায়। অধিকন্তু শাশুড়ী বয়োবৃদ্ধ হয়ে অকর্ম বা দীর্ঘ অসুস্থতায় ভুগলে সার্বক্ষণিক

একজন সহযোগীর সেবা পেতে চান। কিন্তু আজকাল প্রায় বধুরা শাশুড়ীকে সেবা করার মানসিকতা তো রাখেই না, বরং অনেকে মাজুর শাশুড়ীকে রীতিমত ঘৃণা করে। অথচ এ সকল বউদের চিন্তা করার প্রয়োজন যে, তারাও একদিন শাশুড়ী হবে এবং তারাও তাদের বউদের থেকে এভাবেই খিদমত পেতে মুখাপেক্ষী হবে।

৪। কর্কশ ব্যবহার ঃ সক্ষম মানুষ কখনও অপরের সেবা চায় না। কিন্তু সবাই সর্বাবস্থায় অপরের মুখের সুন্দর ব্যবহার কামনা করে। এক্ষেত্রেও শাশুড়ী চান যে, বউ সর্বদা সদ্যালাপ করবে, কথার মর্যাদা দেবে। কিন্তু দুঃখজনক যে, অনেক বধু সুযোগ বুঝে শাশুড়ীর মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করে। কথায় বলে-"মারের ঘা শুকালেও কথার ঘা শুকায় না।" এমন পরিস্থিতিতে অসহায় নির্বাক শাশুড়ী মন অগ্নি নির্বাপন করে নয়ন অশ্রু দ্বারা। বউদের জন্য এটা কখনও উচিত নয়।

৫। স্বামী ছিনতাইয়ের অপচেষ্টা ঃ শ্বশুর-শাশুড়ীর মাধ্যমে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর গৃহে পদার্পন করলেও অবস্থা এক সময় এমন হয় যে, শ্বশুর-শাশুড়ী হয়ে যান অপরিচিত মানুষ। পরিবার থেকে আলাদা হয়ে একাকী বসবাসের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে স্বামীকে মাতা-পিতার কোল হতে ছিনিয়ে নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় অনেক বউরা। স্বামী তখন স্ত্রীর ছলনাময়ী কথায় আত্মভোলা হয়ে জননীকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়। শ্বশুর-শাশুড়ীকে অসহায়ত্বের সাগরে নিক্ষেপ করে স্বামী ছিনতাইয়ের এরূপ স্বার্থপরতা কখনও বউদের থেকে কাম্য নয়।

অনেক সময় বদনসীব স্বামীরা আবার বউদের কথায় স্বীয় পিতা-মাতার সাথে এমন জঘণ্য আচরণ করে ফেলে, যার দরুণ তাদের অপুরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আর হাদীস শরীফে রয়েছে-মা-বাবাকে কষ্ট দেয়ার শাস্তি পরকালে তো রয়েছেই, ইহজীবনেও আল্লাহ তা'আলা তার পরিণতি ভোগ করান। তার বাস্তব উদাহরণ প্রচুর।

প্রতিনিয়ত এ রকম হাজারো নজীর আমাদের সম্মুখেই অহরহ ঘটছে-যেখানে শাশুড়ীর মনে দুঃখ দেয়াতে বউ ও ছেলের অমঙ্গল হচ্ছে।

৬। শাশুড়ীর মর্যাদাহানির চেষ্টা ঃ আমার এক সহকর্মীর স্ত্রী, পুত্র ও মা কথা রেকর্ড করে ক্যাসেট পাঠালো প্রবাসে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্যাসেটটি শুনতে গিয়ে কানে এল শাশুড়ীকে খাটো করতে স্ত্রীর কসরত।

এছাড়া বহু বউ তার নিজস্ব কুটুম সমাজে সর্বদা শাশুড়ীর কুৎসা রটনা ও মিথ্যা কাহিনী শুনিয়ে আত্মীয়দের নিকট শাশুড়ীর বদনাম রটানো ও মানহানি ঘটানোর কাজ অব্যাহত রাখে-যা সমাজ দর্পনে প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয়। এটা কখনও সমীচীন নয়।

উপসংহার ঃ নিজের অবুঝ সন্তান যেমনি সার্বক্ষণিক মান-অভিমানে অথবা আবদারে বিরক্ত করে তোলে, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ীও তদ্রুপ। মানুষ বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছলে অবুঝ শিশুসুলভ আচরণ করা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজের পিতা-মাতার আসনে গণ্য করলে কোন সমস্যাই থাকে না।

তাই শ্বশুর-শাশুড়ীকে নিজ পিতা-মাতার ন্যায় যথাসাধ্য ধৈর্য ও সম্মানের সাথে খিদমত করে নিজ জীবনকে ধন্য করার সাথে সাথে দু'জাহানের কামিয়াবী হাসিল করা প্রত্যেক বউয়ের উচিত। মনে রাখতে হবে-আজকের বধু আগামী দিনের শাশুড়ী। আন্তরিকতার সাথে শাশুড়ীর খিদমত করতে পারলে, যেমন কর্ম তেমন ফল হিসেবে আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন ধারায় নিজেও এক দিন বউয়ের সেবা পাবেন নিঃসন্দেহে।

দাম্পত্য জীবনে যাবতীয় ঝগড়া বিবাদ থেকে আত্ম রক্ষার উপায়

আমরা দাম্পত্য জীবনে সাধারনত যে সমস্ত সমস্যাগুলি দেখতে পাই তা হল ঃ

১। কনের মাতা চান যে, তার কন্যা স্বামীর বাড়িতে সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করুক এবং কোন ধরনের কাজই যেন না করুক। পক্ষান্তরে ছেলের মাতা চান যে, এখন ছেলে বিবাহ দিয়েছি বাড়িতে বউ এনেছি সুতরাং আমি আর কোন কাজ করবোনা এসব মিলে একটি ঝঞ্ছাটের সৃষ্টি হয়।

২। অনেক পরিবারে দেখা যায় যে, স্বামী শুধু স্ত্রীর কথার উপর নির্ভর করে নিজের মাতা পিতা ভাই বোনদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। আবার অনেকে শুধু মাতা পিতা ভাই বোনদের কথা শুনে স্ত্রীর উপর অবিচার করে থাকে এ উভয় ধরনের সমস্যা বর্তমান সমাজে দেখা দেয়।

৩। বিবাহের পর সব থেকে বড় সমস্যা যে ষিয়টি দেখা দেয় সে সম্পর্কে জনৈক জ্ঞানী যথার্থই বলেছেন যে বিবাহের পরে স্বামীর উপর স্ত্রীর সাথে সাথে সকলের দাবি দাওয়া সমান পর্যায়ে পৌছে যায় এবং স্বামীর যে কোন অপরাধই তখন অনেক বড় করে দেখা হয়। যেমন বিবাহের পর স্বামী যদি স্ত্রীকে একটি কাপড় দেয় পক্ষান্তরে নিজের ভাই বোনদেরকে না দেয় সে ক্ষেত্রে সকলেই ক্ষিপ্ত হয়। মা বলে ঐ মেয়ে আমার ছেলেকে নষ্ট করে ফেলেছে। ভাই বোনদের ও একই অভিযোগ। এমনকি অনেক পরিবারে দেখা যায় যে, তারা মায়ের ব্যাপারেও ভাগাভাগি করতে চায় এবং বিবাদে মেতে ওঠে। এ সমস্যা যেমনি

ভাবে স্বামীর পরিবারের লোকদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। স্ত্রীর পরিারের লোকদের পক্ষ থেকেও হয়ে থাকে যেমন স্বামী যদি স্ত্রীর নিকট একটু সময় বেশী দেয় এ ক্ষেত্রে সকলে প্রশ্ন তোলে রফিক এখন স্ত্রীকে পেয়ে সব কিছু ভুলে গেছে তদ্রুপ মুনতাহা যদি তার স্বামীর নিকটে একটু সময় বেশী দেয় এক্ষেত্রে তার ভাই বোনদের পক্ষ থেকে আপত্তি করে বলে যে মুনতাহা আপু তো স্বামীকে পেয়ে সব কিছু ভুলে গেছে। এধরনের কথা বার্তায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরে যায় মহা সংকটে। অনুরুপ ভাবে আরো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমরা দেখতে পাই।

প্রথম সমস্যার সমাধান ঃ এ সমস্যাটি প্রায় সকল পরিারেই পরিলক্ষিত হয়। আর এর পিছনে মুল কারণ হল একে অন্যের প্রতি আন্তরিকতার অভাব। অর্থাৎ স্ত্রী তার শাশুড়ীকে আপন মনে করে না শাশুড়ী তার বৌকে আপন মনে করে না। মোদ্দাকথা এধরনের সমস্যা নিরসনের জন্য সকলে যদি একে অন্যের প্রতি আন্তরিক হয় শাশুড়ী তার বৌকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসে এবং স্ত্রী যদি শাশুড়ীকে নিজের মায়ের মত মনে করে তাহলে আর কোন সমস্যা হয় না। অনুরুপ ভাবে শাশুড়ী যদি নিজের মেয়ে স্বামীর বাড়িতে গিয়ে যেমনটি ব্যবহার পাওয়ার আশা করে অনুরুপ ছেলের বৌকে ও নিজের মেয়ে মনে করে তার সাথে তদ্রুপ আচরণ করে। অনুরুপ ভাবে স্ত্রী যদি তার আপন বৃদ্ধা মাতা তার সামনে কেমন থাকবে এ ষিয়টি তার শাশুড়ীর ক্ষেত্রে চিন্তা করে তাহলে কোন পরিবারে কোন কলহ দেখা দিতে পারে না। তদ্রুপ স্বামীর ভাইবোনেরা তাদের ভাবীকে আপন মনে করলে এবং ভাবীও তার দেবর নোনদদেরকে আপন ভাই বোনদের মনে করবে।

২য় সমস্যার সমাধান ঃ বিবাহের পরে এই সমস্যা দেখা দেয় একথাটি সব স্বামীকে প্রতিটি মূহুর্তে মাথায় রাখতে হবে। সুতরাং যাচাই বাছাই না করে শুধু এক পক্ষের কথার উপর ভিত্তি করে কখনো সিদ্ধান্ত নিবেন না এবং পূর্ণ যৌবনা ষোড়শী সুন্দরী তরুণী কে কাছে পেয়ে বৃদ্ধা মাতাকে ভুলে গেলে চলবে না। বরং শৈশবে সন্তানের জন্য মায়ের ত্যাগকে অবশ্য প্রতিটি সন্তানের জন্য স্মরণ রাখা দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩য় সমস্যার সমধান ঃ

এ সমস্যাটির মূল কারণ হল নির্বুদ্ধিতা। কেননা একটি ছেলে ৩০ বছর এবং একটি মেয়ে ১৫ বছর অপেক্ষার পরে যখন তাদের মাঝে একটি নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন ছেলে যেমনি ভাবে মেয়েকে একান্ত ভাবে কাছে পেতে চায় তদ্রুপ মেয়েও তাই কামনা করে সুতরাং অন্যান্যদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় এটাই হবে যে তখন তাদেরকে একান্তভাবে থাকতে দেওয়া। কেননা জীবনের প্রথম

সময়টাই হল স্বামী স্ত্রীর মনের মাঝে ভালবাসার স্থায়ী হওয়ার সময়। আর সেই সময়টা যদি তাদেরকে একান্ত ভাবে থাকতে না দেওয়া হয় সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মনে ভালবাসার সঞ্চার হয় না। যার ফলে দেখা যায় যে, কিছুদিন পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব শুরু হয় মূলত এই দ্বন্দের জন্য মূল দ্বায়ী হল যারা স্বামী স্ত্রীকে জীবনের প্রথম সময় গুলিতে একান্ত ভাবে থাকতে বাধা গ্রস্থ করেছে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ ১০টি সুন্নত

১। মেসওয়াকের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হওয়া। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযর পুর্বে ওজুর সময় মিসওয়াক করা।

২। সকাল সন্ধার দুয়াসমুহ আদায় করা।

৩। কোন বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ দোয়া পড়বে।

৪। সন্তানদেরকে পেশাব পায়খানা করানোর সময় কেবলার দিকে মুখ পিঠ দিয়ে বসাবেনা।

৫। যে কোন সময় কোন বিপদ আসলে সঙ্গে সঙ্গে নামাজে দাড়িয়ে যাবে, এবং নামাযান্তে কিছু ছদকা করবে।

৬। মেয়েরা পরস্পরে দেখা সাক্ষাতের সময় একে অপরকে সালাম দিবে।

৭। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে প্রথমে স্বামীকে বলবে না বরং ওযু করে দুরাকাত নামাজ পড়বে আল্লাহ পাকের নিকট চাইবে। এর পর বিষয়টি স্বামীকে অবগত করব।

৮। পর্দার ব্যাপারে খুবই যত্নশীল হবে। যে সকল পুরুষের সামনে যাওয়া জায়েয নেই তাদের থেকে নিজেকে এবং নিজের অন্যান্য সব ধরনের আসবাব পত্র বিশেষ করে কাপড় ইত্যাদি গোপন করে রাখবে। এবং পুরুষগণ যাতে মহিলাদের কণ্ঠও শুনতে না পায় সে ব্যাপারে ও যত্নশীল হবে।

৯। সব ধরনের অপচয় থেকে বেচে থাকবে। মেয়েদের মধ্য এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি যে তারা যেমনি ভাবে টাকা পয়সার অপচয় করে ঠিক তেমনি ভাবে তারা জীবনের সব থেকে বড় সম্পদ সময়ের ও অপচয় করে। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা অনর্থক কথা বলে কাটিয়ে দেয়।

১০। যখনই আযান হবে, আযানের উত্তর দিবে এবং প্রথম ওয়াক্তেই নামাজ আদায় করবে।

পরিবারে অশান্তি হওয়ার কারণ ও তার প্রতিকার

পরিবারে বিভিন্ন কারণে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এসব কারণগুলো শুরু থেকেই যদি এড়িয়ে চলা যায়, তাহলে একটা সুখী ও আনন্দময় পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেই সুখ এবং আনন্দকে ধরে রাখা সম্ভব। সাধারণতঃ যে সব কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিয়ে থাকে নিম্নে সেগুলোর প্রতিকার-ব্যবস্থাসহ উল্লেখ করা হল।

১) শ্বশুর-শাশুড়ী ও পুত্র-বধুর মাঝে সুসম্পর্ক না থাকা ঃ সাধারণতঃ শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রের উপর অধিকার থাকার সুবাদে পুত্র-বধুর উপরও কর্তৃত্ব করতে চায়। তারা পুত্র যে রকম আনাগত এবং খেদমত পাওয়ার, পুত্র-বধু থেকেও সেরকম পেতে চায়। এর ফলে পুত্র-বধুর সাথে কর্তৃত্ব সুলভ আচরণ ও ক্ষেত্র বিশেষে বাদী সুলভ ব্যবহারও করে থাকে। অনেক সময় পুত্র-বধু প্রফুল্ল চিত্তে না চাইলেও জবরদস্তী তার সাথে শ্বশুর-শাশুড়ী কাজ ও খেদমত নিয়ে থাকেন এবং জবরদস্তী পুত্র-বধুকে একান্তভুক্ত রাখা হয়। এসব কারণে পুত্র-বধুর স্বাধীন চেতনা আঘাতগ্রস্ত হয়, কখনও কখনও এ আত্মমর্যদায় আঘাতবোধ করে এবং সংসারকে সে আপন বলে মেনে নিতে পারে না, ফলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে শুরু হয় তার সম্পর্কের টানা পোড়েন এবং তখনই পুত্র-বধু তাদের থেকে বিছিন্ন হয়ে যেতে চায়। পুত্র-বধুর আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের আতিথেয়তা ও আপ্যায়নে গুরুত্ব না দেয়ার কারণেও অনেক সময় শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি পুত্র-বধু ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর প্রতিকারের জন্য মনে রাখা দরকার যে, শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা মৌলিকভাবে পুত্র-বধুর দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। বরং এ খেদমতের দায়িত্ব যদি আঞ্জাম দেয় তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। শ্বশুর-শাশুড়ী যদি পুত্র-বধুর খেদমতকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করেন, তাহলে পুত্র-বধুর প্রতি তারা প্রীত হবেন এবং তার প্রতি তাদের বাদী সুলভ মনোভাব সুষ্টি হবে না।

২) যৌথ পরিবার থাকা ঃ অনেক সময় একান্তভুক্ত পরিবার থাকার কারণেও সংসারের শান্তি বিনষ্ট হয়। বিশেষভাবে যদি স্ত্রীর জন্য থাকার ঘরও পৃথক করে দেয়া হয়। স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যেক নারীই এ কামানা করে যে, স্বামীকে নিয়ে সে স্বাধীনভাবে নিজেরমত করে একটা সংসার গড়ে তুলবে, তার থাকার জন্য একটা ভিন্ন ঘর থাকবে, যেখানে সে তার মাল-সামান সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করতে পারবে, যেখানে সে স্বাধীনভাবে স্বামীর সাথে বিনোদন করতে পারবে। যৌথ পরিবার ও একান্তভুক্ত সংসার অনেক ক্ষেত্রেই এ কামনায় বাঁধা সৃষ্টি করে। ফলে শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ, দেবর প্রমুখদের সাথে পুত্র-বধুর বনিবনা হয়ে ওঠে না।

অনেক পিতা-মাতাই মনে করে থাকেন তাদের পুত্রের ভিন্ন সংসার গড়ে উঠলে তারা অবহেলিত হবেন, তারা বঞ্চিত হবেন।

কিন্তু পুত্রকে যদি তারা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে পুত্রের সংসার ভিন্ন হলেও পুত্র তাদের অধিকার এবং খেদমতে ত্রুটি করবে না– এটাও বাস্তব সত্য। তদুপরি জোর জবরদস্তী কিছুদিন একান্তভাবে রাখা হলেও চরম অবনিবনা সুষ্টি হওয়ার পর এক সময়তো পৃথক হওয়াটা আগে ভাগে করে ফেললেইতো ভাল।

হযরত থানবী (রহঃ) বলতেন, চুলার আগুন থেকেই সংসারের শান্তিতে আগুন লাগে, অতএব এই যুগে শুরু থেকেই চুলা পৃথক করে দেয়া সমীচীন।

তবে স্ত্রীর মনে রাখা দরকার- বিনা প্রয়োজনে স্বামীকে তার মাতা-পিতা ও ভাই বোন থেকে পৃথক করে নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়।

৩) আয়-ব্যয়ের মাঝে ভারসম্যতা না থাকা ঃ প্রত্যেক মানুষেরই উচিত তার আয় অনুযায়ী ব্যয় করা। অনেকে সংসার জীবনের প্রথম দিকে আবেগের বশবর্তী হয়ে সাধ্যের বাইরে অনেক বেশী ব্যয় করে থাকে। সব ক্ষেত্রেই সে তার ষ্ট্যান্ডার্ড ছাড়িয়ে চলে যায়। এভাবে তার স্ত্রী ও সন্তানাদির ষ্ট্যান্ডার্ড বেড়ে যায় এবং এভাবে চলতে চলতে এক সময় সে ঋণী হয়ে পড়ে কিংবা এভাবে চলা তার পক্ষে আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন পূর্বের ষ্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য তাকে অবৈধ আয়ের পথে পা বাড়াতে হয় কিংবা স্ত্রী পুত্র পরিজনের কাছে হেয় হতে হয়, তাদের মন রক্ষা করা সম্ভব হয় না, ফলে মানসিক শান্তি বিনষ্ট হয়। কুরআনে এক দিকে যেমন কার্পন্য করতে নিষেধ করা হয়েছে, অপর দিকে এত বেশি হাত খোলা হতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে পরবর্তীতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে যেতে হয় এবং হেয় হতে হয়।সুতরাং আয় ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যতা রক্ষা করা উচিত। বিশৃংখল ব্যয় করা নিষিদ্ধ।

(৪) স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে না দেয়া ঃ কোন গাড়ীর আরোহীগণ যদি গাড়ীর চালককে সহযোগীতা না করে, তাহলে চালক সে গাড়ি নির্বিঘ্নে চালাতে সক্ষম হয় না। তদ্রুপ সংসার জীবনে পুরুষ হল গাড়ী চালকের ন্যায় আর স্ত্রী হল সে গাড়ীর আরোহী এবং কিছুটা সে চালকও বটে। তাই স্ত্রীকে সংসার চালানো শিখিয়ে দেয়া উচিত, যাতে পুরুষ আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সংসার পরিচালনায় সে সহযোগিতা করতে পারে এবং যাতে স্বামীর আয়ের সাথে।

সঙ্গতিহীন ভাবে সংসার চালিয়ে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় না ফেলে। স্ত্রীর মধ্যে ষ্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধি করার এবং আরও ঝাঁকজমকের সাথে চলার মনোবৃত্তি যেন

সৃষ্টি হতে না পারে সে জন্য নিজের চেয়ে ধনবান পরিবারের বাড়িতে স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার বা পাঠানোর এবং তাদের সাথে উঠা-বসার ব্যাপারে সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে। শুধু স্ত্রী নয় বরং সংসারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫) স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সন্দেহ ঃ স্বামী স্ত্রী একে অপরের চরিত্রের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লে এ থেকে সংসারে চরম অশান্তি দেখা দিতে পারে। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য পথমতঃ উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, দলীল প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কুধারণা করা অন্যায় এবং পাপ। অতএব দলীল প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহ হয়ে থাকলে মন থেকে সে সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি মন থেকে সন্দেহ না যায় তাহলে, যে কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে কারণ উল্লেখ করে তাকে স্পষ্ট বলতে হবে যে, এ কারণে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে তুমি এ থেকে বিরত হও আর বিরত হতে আমার জন্য দোয়া কর যেন আমার মন থেকে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং নিজেও মন থেকে কু-ধারণা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করতে থাকবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যথায় মনে মনে সন্দেহ, ক্ষোভ চাপা রাখলে সেটা খারাপ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। আর বাস্তবিকই যদি দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, তাহলে যে কারণে সেটা ঘটছে সেটা প্রতিহত করবে। এর জন্য সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রীকে শরীয়তসম্মত পর্দার মধ্যে রাখা। পর্দা ব্যবস্থাই হল চরিত্র এবং সতীত্ব সংরক্ষণের সবচেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা। আর যদি স্বামীর চরিত্র নষ্ট হতে থাকে, তাহলে স্ত্রী যেহেতু জোরপূর্বক স্বামীকে কোন কিছু মানাতে বাধ্য করতে পারবে না এবং এজন্য বকাঝকা করলে স্বামীর জিদ বেড়ে গিয়ে আরও হীতে বিপরীত হতে পারে, তাই স্ত্রীর তখন করণীয় হল ঃ (এক) স্বামীর মতি ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবে। (দুই) যখন স্বামী নির্জনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকবে এবং ঠান্ডা মাথায় থাকবে তখন খুব নরম ভাষায় তাকে বুঝাতে থাকবে এবং (তিন) স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আগের চেয়ে বেশি নিজেকে বিনোদিত করবে। এভাবে হয়ত স্বামীর সংশোধন হয়ে যেতে পারে। এ না করে স্ত্রী যদি এরূপ মুহূর্তে স্বমীকে জব্ধ করতে চায় প্রকাশ্যে হেয় করতে চায় এবং স্বামীর মনোরঞ্জনে পূর্বের চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী।

৬) একাধিক বিবাহ ঃ ইসলাম বিভিন্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতে একাধিক বিবাহ (এক সঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন) পুরুষের জন্য জায়েয রেখেছে। তবে শর্ত হল পুরুষ তার সকল স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ ও সমতা বজায় রাখবে। স্বামী স্ত্রী ঘরে

আনুক, আর একটা বিবাহ করুক সাধারনভাবে স্ত্রী তা মেনেনিতে চায় না এবং এ জন্য মনোমালিন্য ও সংসারে অশান্তি লেগে যায়। এ অশান্তির প্রতিকারের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের কিছু করণীয় রয়েছে। স্বামীর করণীয় হল যদি একান্তই তাকে আবার বিবাহ করতে হয় তাহলে যে কারণে আগের স্ত্রী পরবর্তী বিবাহকে মেনে নিতে পারছে না অর্থাৎ সে আশংকা করছে যে, অন্য স্ত্রীকেই বেশি আদর সোহাগ করা হবে এবং তার আদর সোহাগের আচরণ করবে, তাহলে আস্তে আস্তে পূর্বের স্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আর স্ত্রীর কর্তব্য হল প্রথমতঃ সে বুঝাবে যে, পুরুষের জন্য একাধিক বিবাহ করা যেহেতু জায়েয, তখন আমার সেটা মেনে নিতে বাঁধা কোথায়। দ্বিতীয়তঃ সে জিদ ধরে স্বামীর খেদমত ও মনোরঞ্জনে ত্রুটি করবে না, তাহলে এই অবসরে পরবর্তী স্ত্রীর দিকে স্বামী বেশী ঝুঁকে পড়বে বরং তার জন্য উচিত হলো স্বামীকে আরও বেশি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা, যাতে স্বামীকে ভারসাম্যতার পর্যায়ে রাখা যায়। তৃতীয়তঃ সতীনকে প্রকাশে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। যদি সতীনের সাথে প্রকাশে শত্রুতার আচরণ করা হয়, তাহলে সেও তাকে শত্রু ভাববে। এভাবে শুরু থেকেই অমিল লেগে গেলে ভবিষ্যতে তাকে আপন করে নেয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে-নতুন সতীনকে আপন করে নিতে না পারলে সংসারে অশান্তি আসবে, সে অশান্তি শুধু নতুন সতীনই ভোগ করবে না, তাকেও ভোগ করতে হবে। তাই জিদ ধরা নয় বরং বুদ্ধিমত্তা হল শুরু থেকেই সতীনকে আপন করে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করা। আর নতুন স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে যে, তার স্বামীর পুরাতন স্ত্রীর অধিকার রয়েছে, যেমন তার অধিকার রয়েছে। অতএব পুরাতন স্ত্রী থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টা অত্যন্ত অন্যায়। নতুন স্ত্রী যদি স্বামীকে সব স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে এক দিকে স্বামী অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে অপর দিকে আগের স্ত্রীও নতুনের প্রতি মুগ্ধ হবে এবং সর্বোপরি সংসারের শান্তি রক্ষা হবে।

৭) তালাক সম্পর্কিত কুসংস্কার ঃ তালাক দেয়া বা না দেয়া উভয় ক্ষেত্রেই সমাজে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা রয়েছে। কিছু লোক কথায় কথায় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, নিতান্ত ঠেকা ছাড়াই সামান্য কারণে রাগের মাথায় তালাক দিয়ে দেয় এবং তিন তালাক দিয়ে বসে, যাতে করে হুঁশ ফিরে এলেও আর স্ত্রীকে রাখা তার জন্য জায়েয থাকে না, তখন সে নানা ভাবে পারিবারিক অশান্তিতে পড়ে যায়। মনে রাখতে হবে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া বা নিতান্ত ঠেকা ব্যতীত তালাক দেয়া স্ত্রীর প্রতি জুলুম এবং অন্যায়। আর কখনও কখনও তালাক দিতে হলেও এক তালাক দেয়া সমীচীন, যাতে পরে হুঁশ ফিরে এলে প্রয়োজন বোধে আবার

স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া যায়। সারকথা- রাগের মাথায় তালাক দেয়া পরিবারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে। আবার কতক লোক সমাজের নিন্দা সমালোচনার ভয়ে, পরিবারের তথাকথিত ঐতিহ্য বজায় রাখার জন্য নিতান্ত ঠেকায় পড়েও স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে না। স্ত্রীর সাথে কোনভাবেই তার বনিবনা হচ্ছে না, কোনভাবেই তারা মিলে মিশে থাকতে পারছে না, দাম্পত্য জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠাছে, তবুও তালাক দিতে পারছে না, ফলে সারাটাজীবন তার অশান্তিতে কাটছে।

এটাও এক ধরণের কুসংস্কার। তালাক দেয়াটা অত্যন্ত গর্হিত বটে, কিন্তু তা সময়ে এবং সব পরিস্থিতিতে নয় বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তালাক দেয়াটা মোস্তাহাব বা উত্তম হয়ে দাড়ায়। এমন কি কোন কোন পরিস্থিতিতে তালাক দেয়া ওয়াজিব ও জরুরী হয়ে পড়ে। ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন ঃ স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দেয় বা নির্যাতিন করে, কিংবা মোটেই নামাজ না পড়ে, বা বুঝানো স্বত্বেও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে উক্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়াটাই মোস্ত াহাব ও উত্তম। আর স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার ব্যাপারটা যদি এমন দাঁড়ায় যে, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় করতে পারে না, তাহলে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ওয়াজিব হয়ে পড়ে। (অবশ্য যদি স্ত্রীর তার অধিকার ছেড়ে দেয় তাহলে ভিন্ন কথা) অতএব কোন ক্রমেই যে স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না নিন্দা সমালোচনার ভয়ে কিংবা বংশে কেউ তালাক দেয়নি কাজেই তালাক দেয়া যাবে না-এই ঐতিহ্য রক্ষা করতে গিয়ে উক্ত স্ত্রীকে রেখে জীবনকে দুর্বিষহ করার কোন অর্থ নেই। যখন পারস্পারিক অনৈক্যের কোনই সমাধান করা সম্ভব হয় না, তখন তালাক দেয়াই সমীচীন।

৮) অত্যাধিক মহর ধার্য করা ঃ অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি না থাকা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে না শুধু এই কারণে যে, তার ঘাড়ে চেপে আছে বিরাট অংকের মহর, যেটা পরিশোধ করা তার সাধ্য নেই। আবার এই মহরের অংক বড় থাকার সুবাদে অনেক স্ত্রী স্বামীর অবাদ্য হওয়ার বা স্বামীকে যথাযথভাবে তোয়াক্কা না করার দুঃসাহস পায় এই ভাবে যে, সে যতই করুক স্বামী তাকে ছাড়ার সাহস পাবে না মহর পরিশোধ করার ভয়ে। সাধ্যের বাইরে তখন হয়ে দাড়ায় জীবনের জন্য কাল, অশান্তি দূর করার পথে অন্তরায়। ইসলামের দৃষ্টিতে মহর পরিশোধ যোগ্য একটি ঋণ, অন্যান্য ঋণের ন্যায় এ ঋণও পরিশোধ করা ওয়াজিব-এই চিন্তা থাকলে কোন স্বামীই শুধু নাম শোহরতের জন্য সাধ্যের বাইরে মহর ধার্য করত না। কিংবা করে থাকলেও ক্রমান্নয়ে তা পরিশোধ করে দিলে পরবর্তীতে তার জন্য সেটা কোন সমস্যা হয়ে

দাঁড়াতে পারত না। মূলতঃ সমাজ মহরকে শুধু ধার্য করার বিষয় মনে করে, এটা যে পরিশোধ করা জরুরী তা মনে করে না, যার ফলেই সাধ্যের বাইরে মোটা অংকের মহর বাঁধা হয় এবং এটা কোন এক সময় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৯) যৌতুক প্রথা ঃ আমাদের বর্তমান সমাজে যৌতুক একটি বিরাট পারিবারিক অশান্তির কারণ। এই যৌতুকের অভিশাপে বহু নারীকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়, বহু নারীকে জীবন দিতে হয় এবং বহু পরিবারের শান্তি বিনষ্ট হয়। যৌতুক একটি সামাজিক অভিশাপ এবং এটা সমাজের এক রকম মানসিক সংক্রামক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে সমাজকে মুক্ত করা অপরিহার্য। যৌতুক চাওয়া যে অবৈধ, এটা একটা ঘৃণিত পন্থা, এটা অনধিকার চর্চা, এর কারণে যে স্ত্রীর কাছে হীন ও নীচ বলে প্রতিপন্ন হতে হয়- এসব কথাগুলো ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া আবশ্যক, তাহলে হয়ত ধীরে ধীরে এ ব্যধী সমাজের মন-মানসিকতা থেকে দূর করা সম্ভব হতে পারে।

১০) সন্তানাদির দ্বীনদার না হওয়া ঃ সন্তানাদি যদি মাতা-পিতার অবাধ্য হয়, খারাপ পথে চলে, এক কথায় সন্তানাদি যদি দ্বীনদার ও ভাল না হয়, তাহলে সংসারে সেটা বিরাট অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রতিকার হল সন্ত ানাদিকে দ্বীনদার বানানো।

১১) পারস্পরিক অধিকার আদায় না করা ঃ পরিবারের মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে একের প্রতি অপরের যে অধিকার তা আদায় না করলে যা করণীয় তা না করলে পরস্পরে অমিল থেকে অশান্তির সূত্রপাত ঘটতে পারে। উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও আরও বিভিন্ন কারণে পরিবারে অশান্তি দেখা দিতে পারে, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম থেকে তার ইসলামী সমাধান জেনে নেয়া যেতে পারে।

স্ত্রী অবাধ্য হলে করনীয়

স্ত্রী যদি স্বামীর অবাধ্য হয়ে যায় বা এমন আশংকা দেখা দেয় কিংবা স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করে, তাহলে সে স্ত্রীকে সংশোধনের জন্য স্বামীদেরকে যথাক্রমে পাঁচটি উপায় বলে দেয়া হয়েছে ঃ

১। প্রথম পর্যায়ে ধৈর্য ধারণ করবে।

২। তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে, উপদেশ দিয়ে সংশোধনের চেষ্টা করবে।

৩। তাতেও কাজ না হলে তৃতীয় পর্যায়ে স্ত্রীকে সর্তক করার জন্য স্ত্রী থেকে ভিন্ন বিছানায় শয়ন করবে বা এক বিছানায় থেকেও ভিন্ন দিকে পাশ ফিরিয়ে

শুয়ে থাকবে। এই ভদ্র জনোচিত শাস্তির পরও যদি সে তার দুষ্কর্ম থেকে এবং অবাধ্যতা থেকে ফিরে না আসে তাহলে চতুর্থ পর্যায়ে

৪। তাকে সাধারণভাবে হালকা মারধর করার অনুমতি রয়েছে অর্থাৎ এমন মারধর, যাতে তার শরীরে মারধরের প্রতিক্রিয়া বা জখম না হয়।

৫। উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো গ্রহন করার পরও যদি স্ত্রী কথা মানতে আরম্ভ না করে এবং মনোমালিন্য ও বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়ে যায়-চাই তা স্ত্রীর স্বভাবের জটিলতা বা অবাধ্যতার কারণে হোক বা পুরুষের অহেতুক কড়াকড়ির কারণে হোক-তাহলে পঞ্চম পর্যায়ে সরকার ও উভয় পক্ষের মুরব্বী, অভিবাবক কিংবা মুসলমানদের কোন শক্তিশালী সংস্থা তাদের (স্বামী-স্ত্রীর) মধ্যে আপোষ করে দেয়ার জন্য দু'জন শালিস নির্ধারণ করে দিবেন-একজন পুরুষের পরিবার থেকে আর একজন স্ত্রীর পরিবার থেকে। তারা যদি আন্তরিকতার সাথে সৎ নিয়তে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি ও সমস্যার সমাধান করতে আগ্রহী হয়ে কাজ করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের কাজে সহায়তা দান করবেন এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টি করে দিবেন।

স্ত্রীকে শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

১। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নারীগণ বক্র স্বভাবের হয়ে থাকে। তাদেরকে একেবারে ছেড়ে দিলে বক্রই থেকে যাবে,আবার অতিরিক্ত শাসন পূর্বক সম্পূর্ণ সোজা করতে চাইলে ভেঙ্গে যাবে। তাই নারীদের শাসনও করতে হবে এবং শাসনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদেরকে সংশোধনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, তবে পূর্ণ সংশোধন হবে এমন আশা রাখা যায় না।

২। স্ত্রী অবাধ্য হলে বা যথাযথ আনুগত্য না করলে তাকে সংশোধনের জন্য প্রথমে বুঝিয়ে শুনিয়ে এবং উপদেশ দিয়ে সংশোধন করতে হবে। এ উদ্যোগ ব্যর্থ হলে বিছানায় তাকে ত্যাগ করতে হবে। এপন্থায় সংশোধন না হলে তারপর তাকে কিছুটা হালকা মারধর করেও সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। অনেক মুফাসসিরদের মতে এ তিনটি পন্থার মধ্যে ধারাবাহিতকা রক্ষা করা ওয়াজিব। অর্থ্যাৎ বুঝানো এবং উপদেশ প্রদানের পূর্বেই বিছানায় ত্যাগ করা জায়েয নয় বা বুঝানো ও বিছানায় ত্যাগ করার পন্থাদ্বয় গ্রহণ না করে প্রথমেই মারধর করে সংশোধন করতে যাওয়া বৈধ নয়।

৩। স্ত্রীকে মারধর করার ব্যাপারে যে অনুমতি দেয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে- এ মারধর অর্থ নির্যাতন করা নয়, তাকে কষ্ট দেয়া নয় কিংবা

তাকে লাঞ্ছিত করা নয় বরং তার আত্মমর্যাদায় আঘাত দিয়ে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা। এ জন্যই ফোকাহায়ে কেরাম শর্ত করেছেন, শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এমনভাবে মারা যাবে না, চেহারায় মারা যাবে না, কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, মারবে রুমাল বা কাপড় পেঁচিয়ে তা দ্বারা বা মেসওয়াক দ্বারা। তদুপরি এই যতটুকু মারধর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তাও সবক্ষেত্রে নয় বরং ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন ঃ সাধারণভাবে চার কারণে মারা যেতে পারে। (এক) স্বামী যৌন চাহিদা পূরণ করার আহবান করার পরও স্ত্রী যদি অমান্য করে. (দুই) শরীয়সম্মত ওযর ছাড়া স্বামীর বিনা অনুমতিতে বাড়ি থেকে বের হলে। (তিন) স্বামীর বলা সত্বেও যদি স্ত্রী সাজসজ্জা ও রূপচর্চা না করে (চার) শরীয়তের ফরয কর্ম পরিত্যাগ করলে; যেমন নামাজ না পড়লে, ফরয গোসল না করলে ইত্যাদি।

৪। সর্বোপরি কথা হল- মারধর অনুমতি রয়েছে বটে কিন্তু সেটা পছন্দনীয় পন্থা নয়। হযরত রাসূল (সঃ) এ পর্যায়ের শাস্তি দানকে পছন্দ করেননি বরং তিনি বলেছেন, ভাল লোক এমন করে না।

৫। স্ত্রীকে শাসন এবং সংশোধন করার জন্য বকাঝকা করা, গালমন্দ করা বা মারধর করার ক্ষেত্রে অনেকেই রাগের বশে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। যার ফলে একদিকে শাসনের ফায়দা নষ্ট হয়ে যায়, আবার পরে নিজের বাড়াবাড়ির জন্য নিজেকেই লজ্জিত হতে হয়। এর থেকে বাঁচার উপায় হল (এক) ঠিক রাগের মুহূর্তে কিছুই বলবে না বা কিছুই করবে না। (দুই) কি কি শব্দ বলে তাকে গালমন্দ করতে হবে কিংবা কিভাবে কোন স্থানে কতটুকু প্রহার করবে তা আগে চিন্তা করে স্থির করে নিবে। (তিন) গালমন্দ বা প্রহার করার পূর্বে চিন্তা করে নিবে যে, পরে আবার তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে কত কিছু করা হবে, তখন যেন শরম পেতে না হয়। এ তিনটি পন্থা গ্রহণ করলে শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

৬। স্ত্রীকে শাসনের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে স্বামী শাসক আর স্ত্রী শাসিত নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শাসক শাসিতের সম্পর্ক নয় বরং তাদের মধ্যে সম্পর্কটা হল ভালবাসার, সর্ম্পক, প্রেমিক প্রেমিকার সর্ম্পক। অতএব কোন শাসনই যেন ভালবাসার চেতনা বাদ দিয়ে শুধু রাগ ও ক্ষোভ চরিতার্থ করার জন্য না হয়।

স্ত্রী প্রতি স্বামী রাগান্বিত হলে স্ত্রীর করণীয়

কোন কারণে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হয়ে যায় তখন স্বামীর রাগকে প্রশমিত করার জন্য এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য স্ত্রীর চারটা কাজ করণীয়। যথাঃ

১) স্ত্রীকে মনে করতে হবে যে, সে স্বামীর অধীনস্ত ও স্বামীর কর্তৃত্বাধীন এবং এই অধীনস্ত ও কর্তৃত্বাধীন থাকার মধ্যেই সাংসারিক ও পারিবারিক কল্যাণ এবং শৃংখলা নিহিত, প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী ও এরকমই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব স্বামীর রাগ সাময়িকভাবে তাকে সহ্য করে নিতে হবে তার পক্ষেও উল্টা রাগ হওয়াটা সমীচীন হবে না।

২) স্বামী যদি রাগান্বিত হয় আর প্রকৃত পক্ষে স্ত্রীর কোন অন্যায় নাও থাকে, তবুও সেই মূহুর্তে স্ত্রীর চুপ থাকা বাঞ্ছনীয়-স্বামীর সাথে তর্ক জুড়ে দেয়া ঠিক হবে না। তর্ক শুরু করলে স্বামীর রাগ আরও বেড়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত কোন অঘটন ঘটে যেতে পারে, যেমন মারধরের দিকে যেতে পারে বা খোদা নাখাস্তা তালাকের দিকেও যেতে পারে। রাগের মুহূর্তেই এসব ঘটে থাকে। অতএব রাগ বৃদ্ধি না করে তা প্রশমিত করা উচিত। স্ত্রীর যদি কোন অন্যায় না থাকে আর সে স্বামীর অন্যায় রাগের মুহূর্তেও চুপ থাকে-কথা কাটাকাটি না করে, তাহলে পরে যখন রাগ ঠান্ডা হবে তখণ সে নিজের অন্যায় রাগের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং স্ত্রীর প্রতি মুগ্ধ হবে, তার অনুগত হয়ে পড়বে আর ভবিষ্যতে রাগ করতে গেলেও ভেবে চিন্তে রাগ করবে।

৩) স্বামীর রাগের পেছনে স্ত্রীর অন্যায় থাকুক বা না থাকুক স্ত্রীর উচিত খোশামোদ তোষামোদ করে হলেও স্বামীর রাগ ভাঙ্গানো। স্ত্রীর যদি অন্যায় থাকে তাহলে তো তার জিদ ধরা চরম অন্যায় হবে বরং সে মুহূর্তে তার ক্ষমা চেয়ে নেয়া উচিত। যদি তার অন্যায় নাও থাকে, তবুও সে জিদ ধরলে হয়তবা স্বামীকে নত করা সম্ভব হবে না। তাহলে তার সামান্য জিদের কারণে পরিণতি খারাপ হয়ে পড়তে পারে।

৪) চুপ থেকে, তর্ক না করে খোশামোদ-তোষামোদ করেও যদি স্বামীর রাগ ভাংগানো না যায় তাহলে নির্জনে ঘনিষ্ট মুহূর্তে তার কাছে সত্যিকার অবস্থা তুলে ধরবে এবং নিজের অন্যায় থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিবে। ইনশাআল্লাহ স্বামীর রাগ প্রশমিত হবে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রাগ এলে স্বামীর করণীয়

কোন দোষ-দ্রুটির কারণে স্ত্রীর প্রতি রাগ এসে গেলে তখণ স্বামীর করণীয় হলঃ

১) স্বামীর চিন্তা করা উচিত যে, প্রাকৃতিক নিয়মে এবং আইনগত ভাবে স্ত্রী তার কর্তৃত্বাধীন ও অধীনস্থ হলেও সে তার স্ত্রীর ভালবাসা ও খেদমতের ঋণে তার কাছে দায়বদ্ধ। এ হিসেবে সে স্ত্রীর অনুগ্রহের অধীন। স্ত্রীর প্রতি তার

অনুগ্রহ থাকলে তার প্রতিও স্ত্রীর অনুগ্রহ রয়েছে। স্ত্রীর যেমন স্বামীকে প্রয়োজন, স্বামীরও স্ত্রীকে প্রয়োজন, উভয়ই উভয়ের কাছে ঠেকা। অতএব এক তরফা ভাবে কর্তৃত্ব সুলভ মনোভাব নিয়ে কথায় কথায় স্ত্রীর প্রতি রাগ করা তার পক্ষে ঠিক নয়।

২) স্বামীর সব সময়ই স্ত্রীর অসহায়ত্ব এবং তার জন্য স্ত্রীর আপনজন ছেড়ে চলে আসার কথা স্মরণ করা দরকার, তাহলে স্ত্রীর প্রতি রাগ করা নয় বরং সহানুভূতি জাগ্রত হবে এবং রাগের মুহূর্তে এটা স্মরণ করলে রাগ প্রশমিত হবে।

৩) কোন একটা দোষের কারণে রাগ এসে গেলে তার অন্য অনেক গুণ রয়েছে সেগুলো স্মরণ করে তার প্রতি প্রীত হওয়ার চেতনা জাগ্রত করবে।

৪) উপরোক্ত পন্থায় রাগ প্রশমিত না হলে রাগ দমনকরার স্বাভাবিক যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে তার উপর আমল করবে।

স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার

দোষ-গুণে মানুষ। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ থাকে, আবার তার অনেক গুণও থাকে। স্ত্রীর মধ্যেও এমন কিছু পরিলক্ষিত হতে পারে যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগবে। যদি স্ত্রীর মধ্যে এমন কিছু পরিলক্ষিত হয় যা স্বামীর কাছে অপছন্দ লাগে এবং তার কারণে স্ত্রীর সাথে দুর্ব্যবহার করতে মনে চায় বা তাকে ছেড়ে দিতে মনে চায় তার প্রতি ভালবাসা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয়, সে মুহূর্তে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চিন্তায় আনতে হবে-

১) তার অন্যান্য গুনাবলীর কথা চিন্তা করা এবং এভাবে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করা।

২) এই চিন্তা করা যে, এ সব দেখেও যদি সবর করা হয়, তাহলে ছওয়াব হবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

৩) নিজের কিছু দোষ ত্রুটির কথা চিন্তা করে ভাবতে হবে যে, আমার এসব দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তো স্ত্রী আমাকে ভালবেসে যাচ্ছে, সে সবর করে যাচ্ছে, তাহলে আমি কেন তার দোষ-ত্রুটি দেখে সবর করতে পারব না, আমি কেন এসব সত্ত্বেও তাকে ভালবাসতে পারবনা ?

৪) একান্ত তাকে ছেড়ে দিতে মনে চাইলে এই চিন্তা করবে যে, আমি তাকে ছেড়ে দিলে সে অন্য কোন মুসলমান ভাইয়ের ঘরে যাবে এবং তার কষ্টের কারণ হবে। অতএব তাকে রেখে দিলে অন্য ভাইকে কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা

করার ছওয়াব পাওয়া যাবে। অন্যথায় অন্য আর এক ভাইকে কষ্ট দেয়ার জন্য আমিও দায়ী হয়ে যাই কি না?

৫) স্ত্রীর এমন কোন কিছুর কারণে যদি তাকে অপছন্দ লাগে, যা তার এখতিয়ার বহির্ভুত; যেমন স্বামী ছেলে কামনা করে অথচ স্ত্রীর গর্ভে শুধূ ব্যাধি লেগে থাকে ইত্যাদি, আর এ কারণে যদি স্ত্রীকে স্বামীর অপছন্দ লাগে, তাহলে স্বামীর ভেবে দেখতে হবে যে, এ অপছন্দ লাগার জন্য স্ত্রী দায়ী নয়, এতে স্ত্রীর কোন দোষ নেই। এ ক্ষেত্রে রাগ করা হলে এ রাগ মূলতঃ তাকদীরের উপর এবং আল্লাহর ফায়সালার উপর গিয়ে পড়ে, যা মারাত্মক অন্যায়। তাকদীরের উপর সন্তুটি এবং তাকদীরের উপর যথার্থ বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমেই এ রকম অপছন্দ লাগাকে দূর করা সম্ভব।

৬) এই চিন্তা করবে যে, আমরা আল্লাহর কত নাফরমানী করি, আল্লাহর অপছন্দ লাগার কত কাজ করি, তারপরও আল্লাহ আমাদের সাথে করুণার আচরণ করেন। আল্লাহর এ চরিত্রে চরিত্রবান হয়ে আমারও উচিৎ করুণার আচরণ করা।

স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকার

স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার প্রতিকারের জন্য স্বামীকে যে সব বিষয় চিন্তা করে দেখতে হবে-যা পূর্বের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে, অদ্রূপ স্বামীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে মন থেকে সে অপছন্দ লাগাকে দূর করার জন্য স্ত্রীকেও সে বিষয়গুলো চিন্তা করতে হবে।

স্বামীকে বশীভূত করার পদ্ধতি ও মাসায়েল

স্বামীকে বশীভূত করার অর্থ যদি এই হয় যে, স্বামী স্ত্রীর বাধ্যগত হয়ে থাকবে, তার কথায় স্বামী উঠা বসা করবে এবং স্ত্রী স্বামীর নাকে রশি লাগিয়ে ঘুরাতে পারবে, এরকম বশীভূত করতে চাওয়া ঠিক নয়। এরকম বশীভূত করার জন্য কোন তাবীয তুমার করাও হারাম। কেননা, এটা শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। শরিয়ত চায় স্বামী স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব করবে এবং স্ত্রী স্বামীর অনুগত বা বাধ্যগত থাকবে। তবে হাঁ স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, তাকে যথাযথ ভাল না বাসে, তার হক আদায়ে ত্রুটি করে তাহলে তাকে বশীভূত করতে চাওয়া এই অর্থে যে, সে স্ত্রীর প্রতি যেন সন্তুষ্ট হয়ে যায়, স্ত্রীকে যেন যথার্থ ভালবাসে, তার হক সমূহ যেন আদায় করে, এরূপ বশীভূত করতে চাওয়া অন্যায় নয়। স্বামীকে

এরূপ বশীভূত করার সবচেয়ে উত্তম পন্থা হল স্ত্রী স্বামীর সাথে খোশামোদ তোষামোদ করে চলবে, স্বামীর কল্যাণ ও স্বামীর খেদমতের জন্য নিজেকে সম্পূর্ন নিবেদিত করে দিবে। একথা মনে রাখা দরকার যে, জোরপূর্বক স্বামীকে বশীভূত করা যায় না। কোন স্ত্রী জোর জবরদস্তী করে রাগারাগি করে, জিদ ধরে তকাতর্কি করে, ঝগড়া ফ্যাসাদ করে স্বামীকে স্থায়ীভাবে বশীভূত করতে পারে না। এক মাত্র খোশামোদ তোষামোদ করেই স্বামীকে অনুগত করা যায়। তবে হাঁ, এভাবেও যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে না পারে, এভাবেও যদি স্বামী থেকে ভালবাসা ও তার অধিকার আদায় করতে না পারে, তখন কুরআন হাদীসের যে কোন ঝাড়-ফুঁক বা তাবীজ ব্যবহার করলে করতে পারে। ইনশাআল্লাহ স্বামী স্ত্রীর প্রতি মেহেরবান হয়ে যাবে।

শ্বশুর বাড়িতে বসবাস ও সকলের সাথে মিলে থাকার নিয়ম

শ্বশুর বাড়িতে বসবাসের কতিপয় আদব ও নীতি রয়েছে, যা মেনে চললে শ্বশুর বাড়িতে সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা যায় এবং সকলের কাছে প্রিয় হওয়া যায়। এ নীতি গুলো অমান্য করলে বিবাদ ও ঝগড়া কলহের সূত্রপাত ঘটে এবং অশান্তি সৃষ্টি হয়। নীতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. স্বামীর হক যথাযথভাবে আদায় করা।

২. যত দিন শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকবেন তাদের খেদমত ও আনুগত্যকে ফরয বলে জানবে এবং সে মতে তাদের খেদমত ও আনুগত্য করবে। তাদের সাথে কথা-বার্তা ও উঠা বসায় আদব-সম্মানের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখবে। শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা আইনতঃ ফরয না হলেও নৈতিক ফরয।

৩. শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ প্রমুখদের থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভিন্ন সংসার গড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে না। যদিও স্ত্রীর অধিকার রয়েছে ভিন্ন হতে চাওয়ার, কিন্তু সে এরূপ দাবি করলে, এর জন্য পিড়াপিড়ি করলে শ্বশুর-শাশুড়ী যখন জানবে তখন তারা এই ভেবে ক্ষিপ্ত হবে যে, পুত্র-বধু আমাদের পুত্রকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। এখান থেকেই ফ্যাসাদের সূত্রপাত ঘটবে।

৪. শ্বশুর বাড়ির কোন দোষ ত্রুটি মা বাপের কাছে বলবে না বা শ্বশুরালয়ের কারও সম্পর্কে কোন গীবত শেকায়েত বাপের বাড়িতে করবে না। এ থেকেই ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষের মন খারাপ হয়ে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

৫. শ্বশুর-শাশুড়ী জীবিত থাকা অবস্থায় যদি একান্তভুক্ত সংসার হয় তাহলে স্বামী সংসার চালানোর টাকা-পয়সা স্ত্রীর হাতে দিতে চাইলে সে স্বামীকে বলবে

শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে দেয়ার জন্য; যাতে শ্বশুর-শাশুড়ীর মন পরিস্কার থাকে এবং তারা এই ভাবতে না পারে যে, পুত্র-বধু আমাদের পুত্রকে কুক্ষিগত করে ফেলেছে।

৬. শ্বশুর বাড়ির সকল বড়দেরকে-আদব এবং ছোটদেরকে স্নেহ করবে।

৭. শ্বাশুড়ী, ননদ প্রমুখরা যে কাজ করবে তা করতে লজ্জাবোধ করবে না। তাদের কাজে সহযোগিতা করবে বরং তারা করার পূর্বেই সম্ভব হলে তাদের কাজ করে দিবে, তাহলে তাদের ভালবাসা লাভ করা যাবে।

৮. নিজের কাজ কারো জন্য ফেলে রাখবে না এই ভেবে যে, অমুক করে দিবে। নিজের সব কিছুকে নিজেই সাজিয়ে গুছিয়ে ও পরিপাটি করে রাখবে।

৯. দুই চারজনে কোন গোপন কথা বলতে থাকলে সেখান থেকে সরে যাবে, তারা কি বলছিল সেটা জানার জন্য খোঁজ লাগাবেনা। অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, তারা হয়ত আমার কোন দোষ বলাবলি করছিল।

১০. শ্বশুর বাড়িতে প্রথম প্রথমে মন না বসলেও মনকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, কান্না জুড়ে দিবে না। এসে পারলে না- এর মধ্যে আবার যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ী শুরু করবে না। এভাবে কিছু দিন পর মন ঠিক হয়ে যাবে।

পুত্র-বধূর প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর করণীয়

১. পুত্র-বধু এলেই শাশুড়ী মনে করবে না যে, এখন থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম, ঘরের কোন কাজ আর আমাকে করতে হবে না, এখন কাজের মানুষ এসে গেছে। পুত্র-বধু ঘরের বাঁদী বা চাকরানী নয় বরং পুত্র-বধূ ঘরের শোভা, পুত্র-বধুকে চাকরানী মনে করবে না এবং চাকরানী সুলভ আচরণ তার সাথে করবে না।

২. শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা পুত্র-বধুর আইনতঃ দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। অতএব শ্বশুর-শাশুড়ীর যতটুকু খেদমত সেবা করবে তার জন্য শ্বশুর-শাশুড়ী প্রীত হবেন এবং এটাকে তারা অনুগ্রহ মনে করবেন। আর যতটুকু সে করবে তার জন্য তাকে জবরদস্তী করতে পারবেন না। কিংবা তার করণে তার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবেন না।

৩. পুত্র-বধুর অধিকার রয়েছে শ্বশুর-শাশুড়ীর সাথে একান্তভুক্ত না থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার, অতএব পুত্র-বধু যদি পৃথক হতে চায় তাহলে তাকে বাধা দিতে পারবে না। বরং হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ) বলেছেন ঃ এই জামানায় একান্তভূক্ত থাকার কারণেই পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে। কাজেই

শুরুতেই ফ্যাসাদ লাগার আগেই পুত্র ও বধূকে পৃথক করে দেয়া সমীচিন। তাতে মহব্বত ভাল থাকে। অন্যথায় যখন ফ্যাসাদ লাগবে তখন পৃথকও করে দিতে হবে আবার মহব্বত ও সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে।

৪. পুত্রের সাথে পুত্র-বধুর অত্যাধিক ভালবাসা হতে দেখলে ঈর্ষাবোধ করবে না এবং অহেতুক এই সন্দেহ করবে না যে, বধূ আমাদের পুত্রের মাথা খেয়ে ফেলবে কিংবা আমাদের থেকে বুঝি তাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা হয়ে যাওয়াইতো শরীয়তের কাম্য। তাদের মধ্যে মহব্বত দেখলে ঈর্ষাবোধ করবে না।

৫. পুত্র-বধুকে স্নেহ করবে, আদর সোহাগ করবে এবং তার আরাম ও সুবিধার প্রতি খেয়াল রাখবে, যেন পুত্র-বধু শ্বশুর-শাশুড়ীকে স্নেহময়ী পিতা-মাতার মত পেয়ে তাদেরকে আপন মনে করে নিতে পারে এবং তাদের জন্য সব রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করাকে নিজের গৌরব মনে করে নিতে পারে।

৬. পুত্র-বধুর কাছে নিজেদেরকে তার কল্যাণকামী হিসেবে প্রমাণিত করতে হবে, যাতে তাদের প্রতি পুত্র-বধুর ভক্তি ও আজমত বৃদ্ধি পায়।

৭. যৌতুকের জন্য পুত্র-বধুকে কোন রকম চাপতো দূরের কথা ইশারা ইঙ্গিতেও কিছু বলবে না। এমনকি পুত্র-বধু তার বাপের বাড়ি থেকে কি কি মাল সামান এনেছে, কি কি আনেনি বা কেন আনেনি-এ প্রসঙ্গে কোন আলোচনাই তুলবে না। মনে রাখতে হবে যৌতুক চাওয়া হারাম এবং এই যৌতুকের কারণে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়ে থাকে, এখন কোন মাতা-পিতা যৌতুকের কথা তুলে পুত্রের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইবে কিনা, সেটা পিতা-মাতার উচিত হবে কি না, তা তাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। অনেক সময় পুত্র স্ত্রীকে এসব কথা কিছুই বলে না, পিতা-মাতাই নিজেদের থেকে এ সব আলোচনা তুলে থাকে, কিন্তু পুত্র-বধু মনে করে স্বামীর ইশারাতেই এগুলো বলা হচ্ছে। এভাবে পিতা মাতার এসব আলোচনা দ্বারা পুত্র ও পুত্রবধুর মধ্যে মন কষাকষি ও ভুল বুঝাবুঝি শুরু হয়ে যেতে পারে।

৮. পুত্র-বধুকে সংসার চালানো শিখিয়ে দিবে।

৯. পুত্র-বধুকে এই নতুন সংসারে এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করবে।

১০. পুত্র-বধু এক হিসেবে শ্বশুর-শাশুড়ীর অধীনস্ত, অতএব পুত্র-বধুর দ্বীনদারী, ইবাদত বন্দেগী ও তার ইজ্জত আব্রুর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর হকসমূহ

১। স্ত্রীর উপর স্বামীর হকসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম হক হল ভালবাসা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ। মূলত প্রতিটি স্ত্রীর এমন হওয়া উচিত যে, সে পৃথিবীতে তার সব থেকে আপন এবং মনের মানুষ তার স্বামীকে এমনি মনে করবে। স্বামীর আনন্দে আনন্দিত হবে আর স্বামীর দুঃখে দুঃখিত হবে। স্বামী যদি তার নিকট কোন কিছুর আবেদন করে সঙ্গে নিঃসংকোচে বলে দিবে। হে আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী আমার নিকট আমার নিজের জীবনের থেকে কোন প্রিয় জিনিসও যদি আপনার জানা থাকে তাহলে বলুন তা আমি আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিতে কোনই দ্বিধা করব না। এমন সৌহার্দপূর্ণ আচরণের পরে পৃথিবীর কোন স্বামীও তার স্ত্রীর জন্য জীবন উৎসর্গে দ্বিধা করবে না। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরস্পরের সম্পর্ক যখন এমন হয়ে যাবে তখন দাম্পত্য জীবনে ফিরে আসবে এক অনাবিল শান্তি।

মোদ্দাকথা স্ত্রী যেন হয় স্বামীর সমস্ত দুঃখ-পেরেশানী দূর করার একটি মাত্র স্থান।

২। প্রতি বৈধ কাজে স্বামীর কথা মান্য করা স্ত্রীর উপর আবশ্যক, স্বামী যদি স্ত্রীকে শরীআত পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ দেয় তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর নিকট অপারগতা প্রকাশ করে দিবে।

৩। স্ত্রী, স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে ভরণ পোষণের দাবী করবে না। এক্ষেত্রে অনেক স্ত্রী লোকেরাই ভুল করে থাকেন। দেখা যায় স্বামীর উপার্জন ৫ হাজার টাকা যা দিয়ে সে মোটামুটিভাবে সংসার চালাতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীর অফুরন্ত দাবীর সামনে স্বামী অসহায় হয়ে পড়ে। স্ত্রী স্বামীর প্রতি সপ্তাহে একবার উন্নত মানের চাইনিজের দোকানে, একবার উন্নত মার্কেটে, যেয়ে দামী দামী পোশাক এবং কসমেটিক সামগ্রীর দাবী করে বসে, এক্ষেত্রে স্বামীর দুঃখের আর অন্ত থাকে না। দুনিয়ার প্রতিটা স্বামীই চায় তার স্ত্রীকে সে রানীর মত করে রাখবে, কিন্তু একদিকে সামর্থ না থাকার কারণে তা করতে না পারায় মানসিকভাবে সকলেই এক ধরনের কষ্টে থাকে, আর এ অবস্থায় স্ত্রী যদি স্বামীকে এ ধরনের বিষয়ে চাপাচাপি করে তাহলে স্বামীর কষ্টটা এক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে পড়ে এ জন্য বিবেকবান স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামী স্ত্রীকে যাই দিবে তার উপর তুষ্ট থাকবে এবং মন খুলে আনন্দ প্রকাশ করবে।

অনেক স্ত্রীগণ যদিও মুখে কিছু বলেনা কিন্তু তাদের অঙ্গভঙ্গি এবং অভিমানও স্বামীর জন্য কষ্টকর হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে স্বামীর কর্তব্য হল, স্ত্রীকে যদি তার চাহিদা অনুপাতে সব কিছু করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয় কিন্তু আর্থিক

দুর্বলতা বা অন্যকোন কারণে তার দাবী পূরণে ব্যর্থ হয় তাহলে এটাকে নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। যদি কোনভাবেই বোঝানো না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করবে। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে কোনভাবেই দুর্ব্যবহার করবে না কেননা স্ত্রীর প্রাপ্য না পাওয়ায় একদিকে তার মনে কষ্ট থাকে, অন্যদিকে আবার স্বামীর সহানুভূতির বিপরীত তার থেকে দুর্ব্যবহার পায়। তাহলে স্ত্রী স্বাভাভিকভাবেই ভেঙ্গে পড়ে। বিষয়টি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের লক্ষ রাখার প্রয়োজন।

৪। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে যাবে না। এক্ষেত্রে অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় হল স্বামীর অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে যাওয়া তো দূরের কথা নিজের ঘর থেকে বেরই হবে না।

৫। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ অন্যকে দিবে না। অর্থাৎ স্বামীর সম্পদের পরিপূর্ণ রক্ষণা বেক্ষণ করবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর জেনে রাখার দরকার দুনিয়ার প্রতিটি স্বামীর সব থেকে মূল্যবান সম্পদ হল তার পরমপ্রিয়া-স্ত্রী-সুতরাং স্বামীর টাকা পয়সার রক্ষণাবেক্ষণ যেমনিভাবে জরুরী তার থেকে স্ত্রীর সতিত্ব রক্ষা করা তার থেকে অনেক বেশি জরুরী।

অনেক মেয়ে তার স্বামী বাসায় না থাকলে অন্য পুরুষদের সাথে ফোনে বা বাসায় ডেকে বা তার কাছে গিয়ে কথা বলে হাসি-তামাশা করে। আর বিষয়টা স্বামী যখন জানতে পারে তখন তার জন্য অসহনীয় হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে স্ত্রীকে অবশ্য অবশ্য সংযত হতে হবে।

৬। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল নামায নফল রোযা রাখাও ঠিক নয়।

৭। স্বামী যদি স্ত্রীকে সহবাসের জন্য আহবান করে তবে শরঈ কোন ওজর যেমন হায়েজ ইত্যাদি ছাড়া স্ত্রী কখনো স্বামীর-আহবান অস্বীকার করবে না বরং সাথে সাথেই নিজকে সম্পূর্নভাবে স্বামীর সামনে পেশ করে দিবে। স্বামীকে পরিপূর্ণ আনন্দ দিতে স্ত্রীকে অবশ্যই সচেষ্ট থাকতে হবে। কেননা স্বামীর যৌন ক্ষুধা নিবারণের একটিমাত্র স্থান হল নিজের স্ত্রী আর এ বিষয়ে সে স্ত্রী যদি কোন ধরনের অভিমান করে স্বামীকে আনন্দ দিতে চেষ্টা না করে তবে স্বাভাভিকভাবে স্বামীর তখন হারামে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অথচ আল্লাহ পাক পুরুষদের হারাম থেকে বাচার জন্যই বৈধ পন্থায় স্ত্রীর ব্যবস্থা করছেন। এবিষয়টি স্ত্রীকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর করণীয় হল যদি শরঈ কোন ওজর থাকে তবে মূল মেলামেশা ছাড়া অন্য যেসব জায়েয পন্থা আছে তা অবলম্বন করে স্বামীকে তুষ্ট করার চেষ্টা করবে।

৮। স্বামীকে আর্থিক দুর্বলতা বা চেহারা সুন্দর না হওয়ার দরুন ঘৃণা করবে না।

৯। স্বামীকে কোন গোনাহের কাজে দেখলে আদবের সাথে তাকে সৎপথে আনার চেষ্টা করবে।

১০। স্বামীর নাম ধরে ডাকবে না। এটা বেয়াদবীর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য রসিকতা করে যদি কখনো কখনো এমন করে এটা ভিন্ন কথা।

১১। অন্য কারো নিকট স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না।

১২। স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহার বা ঝগড়া অবশ্যই পরিহার করবে।

১৩। স্বামীর মাতা-পিতার খেদমতে সচেষ্ট থাকবে। তাদের সাথে কখনো ঝগড়া করবে না এবং তাদের কোন ভাবেই কষ্ট দিবে না।

স্বামীর উপর স্ত্রীর হক সমূহ

১। স্ত্রীর সাথে সর্বক্ষেত্রে ভাল ব্যবহার করা। নিজে যখন খাবে স্ত্রীকেও খাওয়াবে, নিজে যেমন পরিধান করবে স্ত্রীকেও তেমন পরিধান করাবে।

বি ঃ দ্র ঃ এক্ষেত্রে অনেক মহিলা স্বীয় স্বামীকে তার সাধ্যের বাইরে চাপ দিয়ে থাকেন ১০, ২০, হাজার টাকা দামের শাড়ী, থ্রীপিস না হলে তারা পরতেই চান না; বরং মুখে কিছু না বললেও অভিমানের শেষ থাকে না, এটা নিতান্তই অন্যায়।

২। স্ত্রী যদি না জানে তাহলে তাকে নামায, রোযা, পবিত্রতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জ্ঞান শিক্ষার ব্যস্থা করা।

বিঃদ্রঃ এক্ষেত্রে অনেক মূর্খ স্বামী তার স্ত্রীকে দ্বীনী মাসআলা শিক্ষার জন্য কুরআন শরীফ শিক্ষার জন্য পুরুষ শিক্ষকের সামনে বেপর্দায় পাঠিয়ে থাকেন, এটা অজ্ঞতা, মূর্খতা, বিবেকহীনতা এবং দ্বীনের নামে বদদ্বীন ছাড়া অন্য কিছু নয়। বরং এক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় স্ত্রীকে কোন মহিলা শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা আর যদি নিতান্তই মহিলা শিক্ষক না পাওয়া যায় তবে পরিপূর্ণ পর্দার সাথে এবং যথেষ্ট পরিমাণ দূরত্বের সাথে, পর্দার সাথে আড়াল থেকে কোন ধার্মিক পুরুষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা।

অথবা হক্কানী আলেমদের লিখিত কোন দ্বীনী বই-পুস্তকের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষার ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব।

৩। স্ত্রীকে ইসলামী কৃষ্টি-কালচারে অভ্যস্ত করা এবং পাশ্চাত্যের কালচার পরিত্যাগে বাধ্য করা স্বামীর নৈতিক দায়িত্ব।

বিঃদ্রঃ বর্তমান সমাজে এক শ্রেণীর নোংরা রুচীসম্পন্ন কাপুরুষ স্বামী রয়েছে যারা পুরুষদের সাথে লেনদেনের যাবতয়ি কার্যাদি স্ত্রীর উপর অর্পণ করে থাকে। যেমন-মার্কেট করা ইত্যাদি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং পরিতাপের বিষয়।

অনেক স্বামী এমন আছে যে, তারা নিজের টেলিফোন পর্যন্ত রিসিভ করেনা রবং যেকোন ফোনই স্ত্রী রিসিভ করে থাকে। এটাও অত্যন্ত কুরুচী এবং ইসলাম পরিপন্থি কাজ। কেননা, মেয়েলোকদের তো একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন ফোন রিসিভ করাই অনুচিত।

৪। একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মাঝে সমতা বজায় রাখাও স্বামীর নৈতিক দায়িত্ব।

বিঃদ্রঃ এক্ষেত্রে অনেক স্বামীকে দেখা যায় যে তারা দ্বিতীয় বিবাহ করে প্রথম স্ত্রীকে একেবারেই ভুলে যায়, অনেকে আবার প্রথম স্ত্রীকে অত্যাচার করে। এটা সম্পর্ণ শরীয়ত গর্হিত কাজ। এমন লোকদের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ জায়েয নেই।

৫। মহিলার কোন গোপন কথাকে কখনো প্রকাশ করবে না এবং তাদের কোন দোষত্রুটিও প্রকাশ না করা, বরং তা লুকিয়ে রাখবে। বস্তুত ঐ পুরুষ স্বামী হওয়ারই উপযুক্ত না, যে তার স্ত্রীর গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেয়। কেননা, পৃথিবীতে প্রত্যেকেই এমন একজন মনের মানুষের কামনা করে যার কাছে সে তার সমস্ত মনের কথা খুলে বলবে আর এই সম্পর্ক সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মাঝেই হয়ে থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একে অন্যের গোপন রহস্য ফাস করা অত্যান্ত গর্হিত কাজ।

৬। স্ত্রীর কোন কথায় বা কাজে যদি কখনো স্বামী কষ্ট পায় তাহলে এক্ষেত্রে স্বামীকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং অত্যন্ত নরমভাবে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

৭। সাধারণ বিষয়ে স্ত্রীর উপর রাগ করা অনুচিত। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর লক্ষণীয় বিষয় হল, তার স্বামীর মনের প্রতি লক্ষ্য রাখা। কেননা অনেক স্বামী এমন আছে যে তার স্ত্রীকে ছাড়া কিছুই বুঝেনা, স্ত্রীকে সীমাহীন ভালবেসে থাকে তাই তারা তার সেই প্রাণপ্রিয় স্ত্রী থেকে মনের বিপরীত কাজ না করাকে স্ত্রী থেকে মনেপ্রাণে কামনা করে। কিন্তু অনেক স্ত্রী বিষয়টি বুঝতে ভুল করে এটা আদর্শ বিবেকবান কোন স্ত্রী থেকে কাম্য নয়।

৮। স্বামীকে অবশ্যই গাইরাত (আত্মমর্যাদাবান) সম্পন্ন। হবে তবে এ ক্ষেত্রে স্বামীকে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। কেননা অনেক স্বামী সীমাতিরিক্ত গাইরাত প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের প্রতি খারাপ ধারণা করে

থাকে, পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক মানুষের মাঝে গাইরাত নামের কোন কিছুই দেখা যায় না। বস্তুত এর কোনটিই প্রশংসিত নয়।

৯। স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচের মধ্যে কার্পণ্য করবে না, পক্ষান্তরে তাকে অপচয়েরও সুযোগ করে দিবে না।

১০। স্ত্রীর চাহিদা অনুপাতে তার সাথে সঙ্গম করতে হবে।

১১। একান্ত নিরুপায় হওয়া ছাড়া স্ত্রীকে কখনো তালাক দিবে না।

১২। প্রয়োজন অনুপাতে স্ত্রীকে বাসস্থান নির্মান করে দিতে হবে।

১৩। মাঝে মাঝে স্ত্রীর নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

১৪। নিরুপায় হয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যদি স্ত্রীকে মারপিটের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও স্ত্রীকে প্রহারের যে বিধিমালা শরীআত প্রদান করেছে তা লংঘিত না হতে হবে।

১৫। স্ত্রীর সাথে হাসি-রসিকতা করাও তার একটি হক। অনেক স্বামীকে দেখা যায় যে, তার স্ত্রীর সামনেও মুখ ভার করে রাখে, এটা নিতান্ত বোকামী বৈ কিছু নয়।

১৬। স্ত্রীর অভিমান সহ্য করাও স্বামীর দায়িত্ব। হযরত আয়েশা (রাঃ) কে যখন অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশাকে বলেছিলেন, আয়েশা তোমাকে এতটা বিচলিত ও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি তুমি নিরপরাধ হও তাহলে অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমার সততার কথা জানিয়ে দিবেন। আর যদি তোমার অসতর্কতায় কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে আল্লাহপাক ক্ষমা করে দিবেন। দুটি দিকের সম্ভাবনাময় সান্ত্বনায় হযরত আয়েশার জন্য অসহ্য সীমাহীন যাতনার বিষয় ছিল। ফলে তিনি আর বেদনার ভার সইতে না পেরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। ঠিক তখনই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হযরত আয়েশার পবিত্রতা সম্বলিত আয়াত নাযিল হল। তখন হযরত আবুবকর এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার নিকট গিয়ে শুভ সংবাদ শোনালেন। হযরত আবু বকর বললেন ওঠ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সালাম কর। কিন্তু হযরত আয়েশা বিছানায় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে শুয়ে শুয়েই বললেনঃ এটা তো আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণা। তিনি অনুগ্রহ করে আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন তাই আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর শুকরিয়া জ্ঞাপন করব না। বালাবাহুল্য এখানে হযরত আয়েশা রাসূলের সামনে

এসে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই অভিমান সহ্য করেছেন। মূলত মান-অভিমান তো প্রেমময় দাম্পত্য জীবনের স্পন্দন ও প্রত্যাশা। নবীজীবনের এই দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, দাম্পত্য জীবন কোন শাসক-শাসিতের জীবন নয়; বরং বন্ধুত্ব ও ভালবাসার স্পন্দন ও তার অবিভাজ্য অংগ। আর সেই বন্ধুত্বের দাবী এটাই যে, স্বামী স্ত্রীর মান-অভিমান সহ্য করে নিবে। মান-অভিমানের উত্তরে শাসকীয় কায়দায় চটে যাওয়া অমানবতা বৈ কিছুই নয়।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে আদর্শ স্বামী

শরীয়াতের দৃষ্টিতে পাত্র দ্বীনদার হতে হবে। দ্বীনদারী ব্যতীত বৈবাহিক হুকুম আদায় করা সম্ভব হয় না। পাত্র দ্বীনদার না হলে, আর যত গুণই থাকুক না কেন অথবা যত ডিগ্রিধারী হোক না কেন এবং যত সুন্দর হোক না কেন, তার নিকট কোন দ্বীনদার মেয়ে কখনো সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন-"তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি বিবাহের পয়গাম দেয়, যার দ্বীনদারী এবং চরিত্র সুন্দর হওয়া সম্পর্কে তোমরা নিশ্চিত, তার নিকট তোমাদের মেয়েদের বিবাহ দাও। এমতাবস্থায় যদি তোমরা বিবাহ না দাও, তবে দুনিয়াতে বড় ফিতনা-ফাসাদ নেমে আসবে (তিরমিযী শরীফ)। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, পাত্র দ্বীনদার হওয়া জরুরী। নতুবা কোন মেয়ের জন্য তাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করা বা তার নিকট মেয়ে বিবাহ দেয়া বিপদজনক। দ্বীনদারী বলতে শুধু নামায-রোযাই শেষ নয়। বরং দ্বীনের মৌলিক পাঁচটি বিষয়ের প্রত্যেকটি তার মধ্যে পুরাপুরি থাকতে হবে।

যেমন (১) সহীহ আকীদাসম্পন্ন হতে হবে। (২) ইবাদত তথা নামায, রোযা ইত্যাদির মাসআলা জেনে সেগুলোর পাবন্দ আমলদার হতে হবে। (৩) মু'আমালাত অর্থাৎ রিযিকের ব্যাপারে হালাল-হারামের বিবেচনা জ্ঞানসম্পন্ন ও পরহেযগার হতে হবে। (৪) মু'আশারাত অর্থাৎ কাউকে অনর্থক কষ্ট না দেয়া বরং সকলের হক আদায় করার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। (৫) আখলাক-চরিত্র সুন্দর হতে হবে, আত্মার রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

এ বর্ণিত পাঁচটি গুণের প্রত্যেকটি পাত্রের মধ্যে থাকতে হবে। যদি তার মধ্যে কোন একটা পাওয়া না যায়, তাহলে তার দ্বীনদারী পরিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে না।

যেমন ঃ সুদর্শন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার নাক, কান, চোখ, সবই সুন্দর ও যথানুরূপ। আর যদি সবই ঠিক থাকে, কিন্তু শুধু চোখ অন্ধ হয় বা নাক কাটা হয়, তাহলে তাকে সুদর্শন বলা হয় না। এমনিভাবে দ্বীনদার তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে বর্ণিত সমস্ত গুণাবলি মওজুদ থাকবে। এ সমস্ত গুণের সমষ্টি তার ভিতর না থাকলে, প্রকৃত মু'মিন-মুসলমান হওয়া যায় না।

(প্রমাণ ঃ ইসলামী শাদী-৯৭, তিরমিযী-১/২০৭)

নারীদের সৌন্দর্য চর্চার হুকুম

পবিত্র কুরআনে মুমিন নারীদের জন্য 'তাবাররুজ' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাবারুরুজ শব্দের অর্থ-মুখমণ্ডল, শরীর, রূপ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ানো। ইসলামী পরিভাষায় মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্যকে প্রকাশ্যে পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন করাকে তাবাররুজ বলে। (তাশরীহুল বুখারী)

বর্তমান যুগে কিছুসংখ্যক নারী ইউরোপীয় স্টাইলে অর্থাৎ বিধর্মীদের অনুকরণ করে, যেমন-বেপর্দা চলাফেরা, শরীরে কারুকার্য করা, পাতলা কাপড় পরিধান, মাথার চুল খাট করা, শার্ট-প্যান্ট ও সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রকাশ্যে পরপুরুষের সামনে চলাফেরা করছে। আজ নারীদের এই খোলামেলা চলাফেরা করার কারণে তারা হচ্ছে কামলিপ্সু অর্থাৎ খারাপ চরিত্রের অধিকারী পুরুষের হাতে লাঞ্ছিতা, হচ্ছে তারা ধর্ষণ খুন, জোরপূর্বক বিয়ে এবং এসিড নিক্ষেপের শিকার।

পরপুরুষের সামনে মহিলাদের প্রকাশ্য সৌন্দর্য প্রদর্শন হারাম। কারণ, খাদ্য দেখে কিংবা তার ঘ্রাণ পেলেই একজন লোকের যেমন ক্ষুধার তীব্রতা বেড়ে যায়, তেমনিভাবে নারীরা যখন সেজেগুজে কারুকার্য করা পাতলা কাপড় পরিধান করে চলাফেরা করে, তখন তাদের দ্বারা পরিবেশ কলুষিত হয়। ফ্যাশনের নামে কেউ ওড়না কাঁধ থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুলিয়ে দেয়। আবার কেউ এক চিলতে কাপড় পরিধান করে-যা সামান্য বাতাসে উড়ে গিয়ে চুলগুলোকে এলোমেলো করে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। কেউ সামনের চুল ছোট করে কপালের উপর ঝুলিয়ে দেয়। আবার কেউ মাথার মুকুট পরে নামকেওয়াস্তে ওড়না দিয়ে তা ঢেকে রাখে। এরকম যে কোনভাবেই পর্দার বিধান লংঘন করা কাবীরা গুনাহ ও হারাম।

দুঃখের বিষয়, যে ওড়না দিয়ে সৌন্দর্য ঢাকার কথা, সেই ওড়ানা আজ নারীরা সৌন্দর্য প্রকাশের জন্যই ব্যবহার করছে। আবার কাউকে দেখা যায়,

বোরকা পরে সত্য, কিন্তু মুখ ঢাকে না। বরং সেজেগুজে মেকআপ করে ঘর থেকে বের হয়। আর তখনি শয়তান এদের সৌন্দর্যকে পরপুরুষের নিকট আরো আকর্ষণীয় করে তুলে। ফলে ঘটে যায় নানা অঘটন। ইসলামে এ ধরনের চলাফেরা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- "হে নবী! আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে (যিনা-ব্যাভিচার হতে) আর মহিলাগণ তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। তবে একান্ত অনিচ্ছায় যতটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে (যেমন বোরকার বহিরাংশ, তাতে দোষ নেই)। আর তারা যেন লম্বা চাদর (হিজাব, বোরকা) দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, মহিলা, নিজ মালিকাধীন বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-যারা মহিলাদের গোপন বিষয়ে বুঝেনা, তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, তাহলেই তোমরা সফল হবে। যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। (সূরা নূর, আয়াত-৩১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-"তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। অন্যথায় যার অন্তরে ব্যধি রয়েছে যে, সে লালসা পোষণ করে মতলব হাসিলের চেষ্টায় থাকবে।"

(সূরা আহযাব, আয়াত-৩২)

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল- পরপুরুষের সামনে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন নাজায়িয। সুতরাং সাজ-গোজ করে বেপর্দাভাবে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া কোনক্রমেই জায়িয নয় এবং বাসা-বাড়ীতে থাকা অবস্থায়ও কোন গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে যাওয়া জায়িয নয়।

বস্তুত ঃ নারীদের যাবতীয় রূপ ও সৌন্দর্য কেবলমাত্র স্বামীর জন্য। স্বামীর চোখ, মন ও হৃদয়কে জুড়িয়ে দেয়ার জন্য নারীরা কেবল স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে মেয়েদের সুরেলা সুপ্রিয় মধুর আওয়াজ ও মিষ্টি ভাষা শুধু স্বামীর অন্তর জয়ের জন্য এবং প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করবে শুধু স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে। শুধু এক্ষেত্রেই নারী পারবে শরীয়তের সীমানার মধ্যে সৌন্দর্য চর্চা করতে।

কিন্তু সুগন্ধি প্রসাধনী ব্যবহার করে নারীরা বোরকা পরেও ঘর থেকে বের হতে পারবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যে মহিলা ঘ্রাণযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করে বাইরে বের হয়, সে

ব্যভিচারিণী গণ্য হয়।" বলাবাহুল্য-তার ব্যবহৃত সুগন্ধি পুরুষদেরকে ফিতনায় ফেলে তার দিকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে। তাই নারীদের উচিত-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা। নচেৎ আল্লাহ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ তাদের উপর পতিত হবে।

তেমনিভাবে এমন সৌন্দর্য চর্চা জায়িয নয়-যার দ্বারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা আকৃতি বিকৃত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- "আল্লাহর গজব ও অভিশাপ ঐসব নারীদের উপর পতিত হয়, যারা শরীরে চিত্র বা নাম খোদাই কিংবা অংকিত করার মাধ্যমে সমাজকে প্রলুব্ধ করে অথবা নিজ শরীরে তা গ্রহণ করে এবং যারা কপালের উর্দ্ধাংশে মাথার চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে অথবা ভ্রুর লোম উপড়িয়ে তাকে সরু করে এবং যারা রেত ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত ঘর্ষণ করে দাঁতকে সরু করে এবং দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। এ শ্রেণীর নারীরা রূপসজ্জার প্রবণতায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব ও গঠনের প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত আকৃতি পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলে রূপসজ্জার এ অবাঞ্ছিত চাকচিক্যের সাহায্যে এ নারীরা নিশ্চয় পরপুরুষের সামনে ফুটে উঠতে চায়। সুতরাং তারা লা'নত ও অভিশাপের যোগ্য।"

(সহীহ বুখারী)

সুতরাং মহিলাদের অনৈসলামী রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর কুফল থেকে নিজের বেঁচে থাকা এবং সমাজকে হিফাজত করা, পর্দা পালন দ্বারা মহিলাদের ইজ্জত-সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা জরুরী। তেমনিভাবে বেপর্দার ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচা এবং মনের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মহিলাদের পরপুরুষের সামনে অঙ্গসজ্জা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

স্বামীর উদ্দেশ্যে নারীর সাজসজ্জা

স্ত্রীর জন্য স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা গ্রহণ করা প্রশংসনীয় ও ছওয়াবের কাজ। একমাত্র স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা করার জন্য স্ত্রীর প্রতি শরীয়তের নির্দেশ রয়েছে।

অথচ বর্তমানে নারীদের অবস্থা হলো,স্বামীর সামনে তারা নোংরা-অপরিচ্ছন্ন ও ময়লা কাপড়-চোপড় পরে থাকে। আর বাইরে যাওয়ার সময় আপাদমস্তক সুসজ্জিত করে যায়। আবার কেউ স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা গ্রহণ করলে, সমালোচনা শুরু হয়ে যায় যে, মেয়েটার লাজ-লজ্জা কিছু নেই। স্বামীর সামনে কেমন রূপচর্চা করছে। এসবই সমাজের উল্টোপথে চলার দুঃখজনক চিত্র।

প্রতিটি জিনিসের একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। আমার প্রশ্ন, ভালো কাপড়-চোপড় পরিধানের ও সাজসজ্জা করে মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার উদ্দেশ্য কি? নিশ্চয়ই মানুষকে দেখানো। অথচ এটা হারাম। নারীর সৌন্দর্য একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য কারো সামনে প্রকাশ করা জায়িয নয। অথচ কি অদ্ভুত কাণ্ড! যাকে দেখানোর জন্য এ কাপড়-চোপড় ও সাজ-পোশাক তৈরী হয়েছে, যার টাকায়, এগুলো তৈরী হয়েছে, তার সামনে তা পরিধান না করে অন্যদের সামনে পরিধান করা হয়!

হায় আফসোস, আজকালের অনেক স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সাথে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কথ বলে না, তার সামনে ভাল কাপড়-চোপড় পরিধান করে তার মন-হৃদয় আকৃষ্ট করে না, অথচ অন্যের বাড়ীতে গেলে সুমিষ্টভাষী বনে যায় এবং সুন্দর থেকে সুন্দরতম সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের আকৃষ্ট করে। এ কেমন কথা? অথচ ইসলামের হুকুম হল, নারীর এ রূপ-সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্যই নিবেদিত হতে হবে এবং স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রী সাজসজ্জা গ্রহণ করবে। স্ত্রী নিজের রূপ-সৌন্দর্য দ্বারা সর্বদা স্বামীর হৃদয়-মন আকৃষ্ট করে জয় করে রাখবে।

এ সম্পর্কে উপলব্ধির জন্য একজন মহিয়সী নারীর ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করছি-

আমাতুল্লাহ নাম্নী মহিয়সী বুযুর্গ নারী প্রতিরাতে ইশার নামাযের পর খুব রূপসজ্জা গ্রহণ করতেন। সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোষাক পরিধান করে হাতে, গলায় ও কানে অলংকার পরে এবং চোখে সুরমা লাগিয়ে সাজসজ্জা করে স্বামীর নিকট শুইতেন। এরপর সারারাত স্বমীর মনোরঞ্জন করে ভোর রাতে স্বামীকে জিজ্ঞেস করতেন-আমাকে আপনার আরো প্রয়োজন আছে কি? যদি স্বামী বলতেন-হ্যাঁ, আছে, তাহলে সাথে সাথে আবার তার কাছে শুয়ে যেতেন। আর যদি বলতেন-না, আমার তোমাকে আর প্রয়োজন নেই, তখন তিনি বলতেন-তাহলে আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখন গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদতে মশগুল হই। স্বামী অনুমতি দিলে তিনি পরিধেয় পোষাক ও অলংকার খুলে ফেলে পাক-পবিত্র হয়ে সাদা কাপড় পরে অবশিষ্ট রাত নির্জনে মহান আল্লাহর ইবাদতে কটিয়ে দিতেন।

চিন্তা করুন, উক্ত আল্লাহওয়ালী নারী রাতের এক অংশে কেমন সাজসজ্জা গ্রহণ করতেন শুধুই স্বামীর জন্য, আবার অন্য অংশে কেমন মোটা ও সাদামাটা কাপড় পরিধান করতেন কেবল মহান আল্লাহর ইবাদতের জন্য। সুসজ্জিত অবস্থায় তাকে কেউ দেখলে অবশ্যই বলবে-এ আবার কেমন আল্লাহওয়ালী-যার কাছে সাজসজ্জার এত গুরুত্ব? কিন্তু এটা তো আর কারো জানা নেই যে, কেন

তিনি এ সাজসজ্জা গ্রহণ করেছে? বস্তুতঃ তার এ সাজসজ্জা গ্রহণ নফসের চাহিদা পূরণ করার জন্য ছিল না; রবং স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা গ্রহণ যেহেতু শরীয়তের নির্দেশনা, তাই তিনি তা করতেন। আর এ উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা গ্রহণ দূষণীয় তো নয়ই; বরং তা বিশেষ ছাওয়াবের কাজ। তাই যেখানে সাজসজ্জা গ্রহণ করা শরীয়তের হুকুম, সেখানে তা তিনি যথাযথভাবে গ্রহণ করতেন। কারণ, স্বামী স্ত্রীকে সুসজ্জিত অবস্থায় দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে, তার জন্য অসুন্দর ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকা জায়িয নয়।

অপরদিকে স্বামীর কোন চাহিদা যখন তার প্রতি থাকতো না, তখন আর তার কাছে সাজসজ্জার কোন গুরুত্ব থাকতো না। কেননা, স্বামীর চাহিদা ছাড়া সাজসজ্জা গ্রহণ নিঃনিসন্দেহে প্রবৃত্তির অনুসরণ।

বস্তুত ঃ আল্লাহওয়ালাগণ যে কোন কাজ করা ও না করার ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশকেই প্রধান্য দিয়ে থাকেন। তারা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে কোন কিছু করেন না।

আমাদের এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত এবং মহান আল্লাহর নির্দেশমত জীবনের যাবতীয় কিছু করা কর্তব্য।

লজ্জা নারীর অবিচ্ছেদ্য ভূষণ

আজ পৃথিবীতে চোখ বুলালে দেখা যায় যে, নারী জাতি অবহেলিতা, লাঞ্ছিতা এবং উচ্ছৃংখলা পুরুষের ভোগের শিকার। এর মূলে কি জানেন? লজ্জার অভাব। লজ্জা যদি নারী-পুরুষের থাকতো, তাহলে এভাবে অবাধে মেলামেশা করতে পারতো না তারা। বর্তমান পৃথিবীতে বিশৃংখলা-বেহায়াপনা, অবাধ যৌনাচার-এ সবকিছুর মূলই হচ্ছে লজ্জার অভাব। হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেনঃ "যার লজ্জা নেই, তার দিল মুর্দা; আর যার দিল মুর্দা, তার ঈমান নেই; আর যার ঈমান নেই, সে জাহান্নামী।" (তালিবুল মাওলা)

সাইয়েদুত ত্বায়েফা হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) বলেনঃ "লজ্জা হচ্ছে মানব চরিত্র সংশোধনের চাবিকাঠি।" (আসরারুল আউলিয়া) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন- "যার লজ্জা নেই, তার চরিত্র ঠিক নেই। আর যার চরিত্র ঠিক নেই, পশুর মধ্যে আর তার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই।" (ফাতাওয়া বাযযাযিয়া)

আব্বাসীয় খলীফা হযরত হারুনুর রশীদ (রহঃ) এর সহধর্মিনী যুবাইদা খাতুন ছিলেন একজন ধার্মিকা রমণী। একদা তিনি ঘরের ছাদে বসে চুল শুকাচ্ছিলেন, অন্য ঘরের বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে কতিপয় গোলাম তা দেখেছিলো। হঠাৎ যুবাইদার নজর পড়লো সেদিকে। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করলেন আপন

কক্ষে। দরজা-জানালা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কাঁদলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করলেন মাবুদের শাহী দরবারে। কেঁদে কেঁদে আরাধনা করলেন-"ওহে পুরস্কার ও তিরস্কারের মালিক! আমি ভুল করেছি, আমার অসতর্কতার দরুন কতিপয় বেগানা পুরুষ (গাইরে মাহরাম) আমার চুল দেখে ফেলেছে। আমি তাওবা করছি, তুমি আমায় ক্ষমা কর।" এত কিছু করার পরও ফিরে এলোনা তাঁর মনের তৃপ্তি। অতঃপর ক্ষোভে-দুঃখে তিনি মাথার সমস্ত চুল কেটে ফেললেন। খলীফাতুল মুসলিমীন মহলে এসে চুল কাটার কারণ জিজ্ঞেস করলে, যুবাইদা তাঁর আদ্যপান্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন স্বামীর কাছে। বাদশাহ তাকে নানা রকমের শাস্তির ভয় দেখালেন, কিন্তু নির্ভিক যুবাইদা বললেনঃ ওগো প্রাণপতি! আপনার শাস্তির চেয়ে মাওলার শাস্তি অনেক বড়। যেহেতু তিনি অসীম আর আপনি সসীম। আপনার শাস্তির সীমারেখা আছে, কিন্তু আমার মাবুদের শাস্তির সীমা নেই। যে চুল বেগানা পুরুষে দেখেছে, সে চুল কেন থাকবে আমার মাথায়? হয়ত রোজ হাশরে আগুনের সাপ বেঁধে দেয়া হবে আমার চুলের সাথে। সেই সাপের ছোবল হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই করেছি এ কাজ। আপনার কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী আমি। ভবিষ্যতে আমি আর ছাদের উপর চুল শুকাবোনা। বাদশাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং খুব পেয়ার করলেন।

বর্তমান জগতে দেখা যায়-পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অধঃপতনের চরম পর্যায়ে নেমে গেছে মানুষ। অধিকাংশ নারী লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে পেট-পিঠ ও মাথা খোলা রেখে বিচরণ করছে সর্বত্র-যা বিলকুল শরীয়ত পরিপন্থী। বোরকা তো দূরের কথা, এমনকি বড় ওড়নাও পড়তে নারাজ তারা। গায়ের ব্লাউজ ছোট করতে করতে ষোল ইঞ্চি থেকে, ছয় ইঞ্চিতে টিকিয়েছে। আর মাথা ঢাকার তো কোন প্রশ্নই আসে না। কোন কোন অঞ্চলের মেয়েরা বিবাহের পূর্বে মাথায় কাপড় দেয়াটাকে খুব গর্হিত কাজ বলে মনে করে। কোন দ্বীনদার পরিবারের মেয়েরা যদিও বা মাথায় কাপড় দেয়, তাতে বেহায়া মেয়েরা টিপ্পনী কাটে, আর বলেঃ ওহে! তোমার বিবাহ হয়েছে কোথায়? লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠে তাদের মুখ। মাথা নেড়ে না সুচক জবাব দেন তারা। আবার টিপ্পনী কেটে বলেঃ বিবাহ হয়নি, তাহলে মাথায় কাপড় দিয়েছো কেন? ঘোমটা টানার যুগ শেষ হয়ে গেছে। মাথার ঘুমটা ফেলে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। আর পুরুষকে দেখিয়ে দিতে হবে যে, আমরা কোন অংশেই কম নই তোমাদের থেকে। ছিঃ শত সহস্র ধিক এদের জীবনের প্রতি। ইসলাম থেকে সরে গেছে এরা বহু দুরে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগকেও হার মানিয়েছে আজকের নারীরা কোন কোন ক্ষেত্রে।

সন্তান সম্ভবা নারীকে নিয়ে যাওয়া হয় মাতৃ সদনে। লজ্জা-শরমের বালাই নেই সেখানে। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে-সন্তান হলে তার ডান কানে আযান, আর বাম কানে ইকামত দাও। বলা আবশ্যক, নার্সিং হোম আর মাতৃ সদনে অধিকাংশই তো অমুসলিমদের আনাগোনা। ঔষধের অনুপ্রাণ হিসেবেও সেখানে পাওয়া যাবে না আযান-ইকামত। জন্মলগ্নে আযান-ইকামত ছাড়া বেড়ে উঠে যে সন্তান, তার লজ্জা থাকে কি করে? কেননা, শয়তান তো শুরু থেকেই বাসা বাঁধে তার অন্তরে।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) বলেনঃ লজ্জাহীনা নারী-পুরষ শয়তানেরই ভাইবোন। (তাসখীসুল মাকায়েল)

মানব জাতির মহান পথ প্রদর্শক জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম ইরশাদ করেছেনঃ "লজ্জা, শ্লীলতা ও ঈমান একত্রে মিশ্রিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়। ফলে একটির অবর্তমানে অপরটির আশা করা অবান্তর।" তিনি আরো বলেনঃ "যদি তুমি লজ্জা না কর, তবে তুমি যা ইচ্ছা-তাই করতে পারো।" (বুখারী)

বর্তমান প্রগতির যুগে দেখা যায়-অধিকাংশ ঘরে টিভি, ভিসিআর, ডিশ এ্যান্টিনার ছড়াছড়ি। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ী, ছেলের বৌ, মেয়ের জামাই, মোট কথা সকলে লজ্জার মাথা খেয়ে এক সাথে দেখে উলঙ্গ অশ্লীল ছবি। হাদীস শরীফে আছে-যে সমস্ত নারী-পুরুষ সতর খোলা রাখে এবং যারা কারো সতর খোলা অবস্থায় দেখে, তাদের প্রতি বর্ষিত হয় আল্লাহর লা'নত।

অনেকে বলে থাকে-সুস্বাস্থ্যই সুখের মূল। অথচ দেখা যায়-সুস্বাস্থ্যের সাথে সৎ চরিত্র না থাকলে, অনেক সময় সেই স্বাস্থ্য দুঃখ-যাতনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। যেমন-মনে করুন, এক সঙ্গে দুই ব্যক্তি চুরি করে ধরা পড়েছে। একজনের স্বাস্থ্য ভাল, আর অন্য জনের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ, হাড্ডি ছাড়া শরীরে আর কিছুই নেই। এমতাবস্থায় লোকেরা কাকে বেশী মারপিট করবে-বলতে পারেন কি? যার স্বাস্থ্য ভাল, তাকেই দেয়া হবে কঠিন ধোলাই। সুতরাং কেবল সুস্বাস্থ্যই সুখের মূল নয়। তার সাথে সৎ চরিত্রও থাকা চাই। সুস্বাস্থ্যের সাথে সৎ চরিত্রই হচ্ছে সুখের চাবিকাঠি। সৎ চরিত্রবান নারী-পুরুষ কখনও লজ্জাহীন হতে পারে না।

সুলতানুল হিন্দ ইমামুল আউলিয়া হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহঃ) এর মায়ের নাম ছিল রুবাইয়া বিনতে খুযামা। খাজা সাহেব মাতৃগর্ভে থাকাকালীন রুবাইয়া মাহরাম আত্মীয়ের সম্মুখেও পর্দা করতেন। কেউ তাঁর কারণ সুধালে তিনি বলতেনঃ "ফাতাওয়ার উপর আমল করা জায়েয, আর তাকওয়ার উপর

আমল করা উত্তম। সুতরাং আমি উত্তমের উপর আমল করছি।" হযরত খাজা সাহেব যখন ভূমিষ্ট হন, তখন রুবাইয়ার মা সুমাইয়া খাতুন দাঈ ডাকার জন্য লোক পাঠাতে চাইলে হযরত রুবাইয়া জোর আপত্তি তুলে বললেনঃ "আমার জন্য কোন দাঈ ডাকতে হবে না। আমি দাঈর সামনে বে-আব্রু হতে পারব না। অগত্যা আমি আমার কাজ নিজেই সমাধা করব ইনশাআল্লাহ। ফলে তাই হলো, তিনি নিজেই করলেন সবকিছু, কোন কষ্ট হল না সন্তান ভূমিষ্টের সময়।

খাইরুত তাবিয়ীন ইমামুল আউলিয়া হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এর মাতা ছিলেন নবীপত্নী হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) এর দাসী। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের দু'বৎসর পূর্বে হাসান বসরীর জন্ম হয়। তিনি মায়ের সাথে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) এর ঘরেই বসবাস করতেন। হযরত আদি ইবনে নাওফিল (রাঃ) বলেনঃ "হাসানকে শিশুকালে কোন দিন উলঙ্গ দেখা যায়নি।"

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর শাসনামলে হাসান বসরীকে তাঁর মা গোসল করাচ্ছিলেন। হাসানের শুকনা পরিধেয় বস্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। হাসানের মা বললেনঃ কিছুক্ষণ উলঙ্গ অবস্থায় ঘরের মধ্যে বসে থাকো। বস্ত্র শুকালে পরিধান করবে। শিশু হাসান কোনক্রমে রাজী হচ্ছিলেন না। তিনি উচ্চ স্বরে কাঁদছিলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন গমনপথে তার কান্নার আওয়াজ শুনে শিশু হাসানের মাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আদ্যপান্ত সবকিছু শুনে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) বললেনঃ ওতো ঠিকই করেছে। যেহেতু লজ্জা ঈমানের অর্ধেক। এখন থেকেই ভাল অভ্যাস থাকা দরকার।

হযরত হাসান বসরীর জীবনী তালাশ করলে দেখা যায়-তিনি একশত ত্রিশ জন সাহাবীর সুহবত লাভ করেছিলেন। চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) এর সুহবতে দশ বৎসর কাটিয়েছেন। ইতিহাসের পাতায় তিনি অমর হয়ে আছেন আজও। আউলিয়াদের মধ্যে তিনি হয়েছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

পৃথিবীর বুকে চোখ বুলালে দেখা যায়- অধিকাংশ নারী-পুরুষ লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে পোশাক বদল করছে। নারী ধরছে পুরুষের বেশ, আর পুরুষ ধরছে নারীর বেশ। আইয়্যামে জাহিলিয়্যাতের যুগে পারস্যের নিয়ম ছিলো-পুরুষ যত বড় সক্ষম হোক না কেন, সে কোনদিন মার্কেটে যেত না। নারীরাই মার্কেট করতো। ইসলামের সোনালী যুগ খতম হয়ে যাওয়ার পর ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করলো যখন পাশ্চাত্যের কৃষ্টি-কালচার, তখনই শুরু হলো আবার সেই জাহিলী বেহায়াপনা। হাট-বাজারে দেখা যায়-পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশী কেনা-কাটা করছে।

স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পার্ক ও রেস্তোরায় দেখা যায়-বেগানা নারী-পুরুষদের লজ্জাহীনভাবে অবাধ বিচরণ। যা বিলকুল শরীয়ত পরিপন্থী।

বর্তমান প্রগতির যুগে লজ্জা শব্দটির প্রয়োগ প্রায় নিভু নিভু। যে মেশিনের মধ্যে টাকা উৎপাদন হয়, সে মেশিন যদি খুল্লমখোলা রাস্তা-ঘাটে রাখা হয়, তাহলে নকল টাকা উৎপাদন হবে নয় কি? ঠিক তদ্রূপ নারীদের পেট হচ্ছে ভাল মানুষ তৈরীর মেশিন। উক্ত নারী জাতি অর্থ উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়ালে, তাদের পেটে জন্ম নিবে নকল ও খারাপ মানুষ। ডঃ উইলিয়াম তার সুনিপুন কলমের মাধ্যমের লিখেছেনঃ নিম গাছের হাওয়া শরীরে লাগালে কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়। বাঁশ গাছের হাওয়া লাগলে পান্ডব নামক রোগ হয়। তেঁতুল গাছের হাওয়া সর্বদা লাগলে মস্তিকের বিকৃতি ঘটে। আর পেঁপে গাছের হাওয়া লাগলে কুষ্ঠ ব্যাধি হয়। প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মহা বৈজ্ঞানিক জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "বেগানা নারী-পুরুষ লজ্জাহীনভাবে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়ালে, তারা হবে নানান রকমের ব্যাধির শিকার।" আজ হচ্ছেও তাই। যত্রতত্র অবাধ বিচরণকারীদের গনোরিয়া, সিপিলিস, যৌনরোগ ইত্যাদি অহরহ হচ্ছে। আরো হচ্ছে এইডস্ নামের মরণ ব্যাধি-যার কোন ঔষধ নেই; মৃত্যুই যার পরিণাম।

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস সংগ্রহের সময় বহু সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য তিনি দুই/তিন মাসের পথ অতিক্রম করেছিলেন। একদিনকার ঘটনা। মদীনা থেকে গাজা এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য। গিয়ে জানতে পারলেন-এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ) এর ছাত্রের ছাত্র। তার বাড়ীতে ইমাম বুখারী পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখতে পেলেন-তাঁর হাবিলীর বাইরে তিনি ইস্তিঞ্জা করতে বসেছেন। অতঃপর বাম হাতে কুলুখ ধরে আগন্তুকের দিকে মুসাফাহার উদ্দেশ্যে ডান হাত এগিয়ে দিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এসব দেখে হতবাক। তিনি মেজবানকে কিছু না বলেই দ্রুত প্রস্থান করলেন সেখান থেকে। কেউ কারণ সুধালে তাকে বললেনঃ "যার লজ্জা নেই, তার দিল মুর্দা। যার দিল মুর্দা, সে মিথ্যা কথাও বলতে পারে। অতএব, তার হাদীস সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।"

আসুন, দৃষ্টি বুলিয়ে দেখি-মহামানব সাইয়িদ্যুল মুরাসালীন রাসূলে মাদানী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দিকে। উম্মাহাতুল মুমিনগণ বলেনঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিক দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, দৌহিত্রদ্বয়কে ইস্তিঞ্জা করতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং রাস্তা পরিবর্তন

করলেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ) বললেনঃ আব্বাজান! ওরা তো আপনারই দৌহিত্র এবং নাবালিগ। উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেনঃ না মা! লজ্জা ঈমানের অংশ। এখন থেকেই ওদেরকে লজ্জার তা'লীম দেয়া দরকার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করলেনঃ গুপ্তস্থান ও যৌন অঙ্গের দিকে তাকালে দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়। প্রাকৃতিক জরুরত সেরে দু'ভাই যখন হাসতে হাসতে নানার কাছে এলেন, তখন দু'ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে মুচকি হাসতে হাসতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেনঃ ওহে জান্নাতীদ্বয়। পায়খানা-পেশাবখানায় বসে কথা বলতে নেই। তাতে জবান আড়ষ্ঠ হয়; দাঁতে বিমার হয়, মস্তিকের ক্ষয় হয়, লজ্জা শক্তি লোপ পায় এবং আল্লাহ পাকও নারাজ হন। মাসুম ইমামদ্বয় বললেনঃ ঠিক আছে-নানাজান! আমরা তাওবা করছি, আর কোন দিন ইস্তিঞ্জায় বসে কথা বলব না।

(তাতহীরুল ইনসান)

লজ্জা হচ্ছে ঈমানের অংশ। যার লজ্জা নেই, তার ঈমানের অর্ধেক নেই। লজ্জাহীনতা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। লজ্জাহীন মানব-মানবী শয়তানের সহচর। আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) এর স্ত্রী মায়িশা (রাঃ) হাতে ব্যবহার করতেন স্বর্ণের চুড়ি। উক্ত চুড়ির ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ ওহে মায়িশা! নবী পরিবারের অবমাননা করছো। আমি বার্ধক্যের কারণে অন্ধ হয়ে গেছি, চলতে ফিরতে পারি না, নইলে তোমায় বেত্রাঘাত করে স্বর্ণের গহনা ব্যবহার করার সাধ মিটিয়ে দিতাম। আযমীদের মত লজ্জাহীনভাবে কুরাইশগণ স্বর্ণের গহনা ব্যবহার করবে-তা হতে পারে না। মায়িশা বললেনঃ কেন দাদাজান? আমি তো পর্দার ভিতরেই আছি। উত্তরে আব্দুল্লাহ বললেনঃ ওহে নির্বোধ! তুমি পর্দার ভিতরে আছো, তোমার চুরির আওয়াজ যে বাইরে যাচ্ছে! (শামসুল ঈমান)

বিখ্যাত ইউনানী চিকিৎসক আল-জাগল স্পেনী উমাইয়া বলেনঃ মেয়েদের গহনার আওয়াজ বেগানা পুরুষ শুনলে উক্ত পুরুষ 'যক্ষা' নামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে। (মুজারাবাতে আকবরী)

আজ আমরা প্রতিটি মুসলিম নারী-পুরুষ যদি 'লজ্জা' নামক মহোপদেয় গ্রহণ করি, তাহলে ফিরে আসবে সৎ চরিত্র। আরো ফিরে আসবে ইসলামের সোনালী যুগ। ঘুচে যাবে অন্তর থেকে রুহানী রোগ, ফিরে আসবে আত্মার অনাবিল শান্তি। সংসারে নাযিল হবে আল্লাহ পাকের অগণিত রহমত, বরকত এবং করুণাধারা। প্রতিটি পরিবারে নেমে আসবে শান্তির ঢল।

১৬তম অধ্যায়

মহিলাদের ফযীলত ও মর্যাদা

সম্পর্কে ১০০ হাদীস

১। হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মহিলা গর্ভবস্থায় বা বাচ্চা প্রসবকালে মারা যায়, সে শহীদের মর্যাদা পাবে।

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড-৪, পৃঃ ৪২১)

২। হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে জনৈকা মহিলা উপস্থিত হল আর তখন তার কোলে একটি শিশু সন্তান ছিল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মহিলারা প্রথমে পেটে বাচ্চা ধারণ করে পরে সন্তান প্রসব করে অতঃপর তার (নবজাতকের) সাথে কতইনা উত্তম আচরণ তথা মায়া-মহব্বত আদর-সোহাগ করে থাকে। সুতরাং স্বামীর সাথে তার আচরণ যদি খারাপ না হয় আর নামাযও রীতিমত আদায় করে তবে সে বেহেশতে যাবে।

এসব হাদীস নয় ২/১৪১

(দুররে মানসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫৪)

৩। হযরত হাসান বিন সুফয়ান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন (হে মহিলারা) তোমরা যদি সম্মত থাক যে, তোমাদের কেউ তার স্বামী থেকে গর্ভবতী হবে। আর স্বামীও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাহলে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজাদার ও রাত জাগরণ করে ইবাদতকারীর মত সওয়াব পাবে। প্রসববেদনার সময় তাকে এমন এক নেয়ামত দেয়া হবে যার খবর আসমান ও জমিনবাসী কেউ জানেনা। উহা তার চক্ষু শীতল করার জন্য গোপন রাখা হবে। প্রসবের পর বাচ্চার প্রতি চুমুক দুধ চোসার বিনিময়ে একটি নেকী পাবে। বাচ্চার কারণে রাত জাগরণ করতে হলে আল্লাহর রাস্তায় ৭০ টি গোলাম আজাদ করার সওয়াব পাবে। তোমরা কি অবগত আছো, এসব মহিলা কারা? তারা হলেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনকারিণী নেককার মহিলা। যারা কখনও স্বামীর সাথে নাফরমানী করেন না।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৫)

৪। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মহিলা তার গর্ভাবস্থা

থেকে সন্তান প্রসব ও দুধ ছাড়ান পর্যন্ত এমন, যেমন আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) সীমান্ত রক্ষাকারী। আর গর্ভাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের সমান সওয়াব পাবে। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪১১)

৫। হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গর্ভকালে মহিলারা এমন উত্তম বিনিময় পায় যেমন পায় দিনভর রোজাদার ব্যক্তি, সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়কারী ব্যক্তি, অনুনয়-বিনয়কারী ব্যক্তি, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তি। প্রসববেদনার বিনিময় সমস্ত সৃষ্টিজগৎ থেকে গোপন রাখা হয়েছে। প্রসবের পর বাচ্চাকে দুধপানের সময় প্রতি চুমুকের বিনিময়ে প্রাণীকে জীবন দান করার পরিমাণ সওয়াব পাবে। দুধ ছাড়াবার সময় একজন ফেরেশতাও এসে মুবারকবাদ জানায় মহিলার কাঁধের উপর হাত রাখে এবং বলে, এসব কষ্টের বিনিময়ে তোমার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে গেছে। আজ থেকে নতুনরূপে আমল কর। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬,পৃঃ ৪১২)

৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় মহিলাদের জন্য গর্ভ থেকে প্রসব পর্যন্ত এবং দুধ ছাড়ান পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় অবিরত বিচরণকারীর সমান ফজিলত বা প্রতিদান রয়েছে। আর যদি গর্ভাবস্থায় মারা যায় তাহলে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে। (মুসনাদে ফিরদাউস, খণ্ড-১, পৃঃ ২০৮)

৭। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, মৃত্যুকালে যে মহিলার স্বামী তার উপর সন্তুষ্ট থাকবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (জামে সগীর, খণ্ড-১ পৃঃ ২৯৫)

৮। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস যার ভাগে পড়বে সে দুনিয়া ও আখেরাতের দৌলত পাবে (১) কৃতজ্ঞতা পোষণকারী দিল (২) যিকিরকারী জবান (৩) কষ্ট-যাতনায় ধৈর্যশীল শরীর এবং (৪) সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদ রক্ষাকারী স্ত্রী। (মেশকাত, পৃঃ ২৮৩)

৯। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে মহিলা (১) পাঁচ ওয়াক্ত নামায (নিয়মিত) আদায় করবে (২) রমজান মাসের রোজা (ঠিকমত) রাখবে (৩) লজ্জাস্থান হেফাযত করবে এবং (৪) স্বামীকে মান্য করবে তাকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, যে দরজা দিয়ে মন চায় সে দরজা দিয়ে তুমি বেহেশতে প্রবেশ কর। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৬)

১০। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ মহিলা সর্বশ্রেষ্ঠ যে পূত-পবিত্র থাকে এবং মহব্বত রাখে। অর্থাৎ সতীত্ব বজায় রাখে এবং স্বামীর প্রতি আশেক থাকে। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৯)

১১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ মহিলা যার দিকে তাকালে তোমাকে খুশী করে দেয় আর যখন কোন হুকুম দেয়া হয় আনুগত্য (মান্য) করে, কখনও দূরে অবস্থান করলে তার নফস ও তোমার ধন-দৌলত রক্ষা করে। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ থেকে فَنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ পর্যন্ত তেলাওয়াত করেন।

(দুররে মানসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫১)

১২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, (একদা) হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মহিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? প্রতি উত্তরে হুযুর ইরশাদ করেন (ঐ মহিলা) যার দিকে তাকালে সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করে আর কোন কাজ করতে বললে (তাকে) মান্য করে স্বামীর অপছন্দনীয় কাজে তার লজ্জাস্থান ব্যবহার করে না এবং তাঁর অর্থ-সম্পদ অপচয় বা অপব্যবহার করে না। (মিশকাত, পৃঃ ২৮৩)

১৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন মহিলার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় যে রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ (নামায) পড়ে এবং নিজের স্বামীকেও তাহাজ্জুদের জন্য উঠায়ে দেয়। আর স্বামী যদি অসম্মতি প্রকাশ করে তবে তার মুখমণ্ডলের উপর পানি ছিটায়ে দেয়। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৯)

১৪। মহিলা ছাহাবী হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ আনসারী (রাঃ) একবার হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান (উৎসর্গ) হোক আমি মুসলমান মহিলাদের পক্ষ থেকে দূত হিসেবে আপনার দরবারে এসেছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক আপনাকে নারী-পুরুষ উভয় জাতির নিকট নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। তাই আমরা (মহিলাদের একটি জামাআত) আপনার উপর ও আল্লাহ পাকের উপর ঈমান এনেছি। কিন্তু আমরা মহিলারা তো নিজ নিজ ঘরে থাকি, পর্দার মধ্যে আবদ্ধ থাকি, পুরুষদের গৃহে আটক থাকি। তারা আমাদের থেকে খাহেশ পুরা করে। তাদের বাচ্চাকেও আমরা পেটে ধারণ করি। এত কিছু (ত্যাগ-তীতিক্ষা) সত্ত্বেও বহু ছওয়াবের কাজে তারা আমাদের থেকে

অগ্রগণ্য। যেমন পুরুষরা জুমার নামাযে শরিক হয়। জামাআতে নামায আদায় করে, রোগীদের সেবাযত্ন করে, জানাযায় শরিক হয়। হজ্জ, উমরা বা জিহাদে গেলে আমরা (মহিলারা) তাদের সম্পদ হেফাজত করি। কাপড় সেলাই করি, সন্তানের প্রতিপালন করি। অতএব আমরা কি ছওয়াবের দিক দিয়ে তাদের সমান হতে পারবো?

হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এমন চমৎকার) প্রশ্ন শ্রবণ করে ছাহাবাগণের দিকে মুখ ফিরায়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দ্বীনের ব্যাপারে এর চেয়ে উত্তম প্রশ্ন আর কারো থেকে তোমরা শ্রবণ করেছ কি? তারা উত্তর দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কল্পনাও করিনি যে, মহিলারা এত সুন্দর প্রশ্ন করতে পারেন। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমা (রাঃ) এর দিকে তাকিয়ে বললেন, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর এবং বুঝে নাও। যেসব মহিলা তোমাকে প্রেরণ করেছে তাদেরকে তুমি জানায়ে দিবে যদি মহিলারা নিজের স্বামীর সাথে ভাল আচার-ব্যবহার করে, তার সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং উহার উপর আমল করে তবে তা উক্ত সকল আমল ও কাজকর্মের ছাওয়াবের বরাবর হবে। একথা শুনে সন্তুষ্টচিত্তে আসমা (রাঃ) ফিরে যান।

(দুররে মুনসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫২)

১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যে বিধবা ও খান্দানী মহিলা পৃথক (স্বয়ংসম্পূর্ণ) হওয়া বা ইন্তেকাল করা পর্যন্ত স্বীয় বাচ্চাদের সেবাযত্ন ও প্রতিপালন করবে এমন কি গায়ের রংও ময়লা করবে সে বেহেশতে দুই আঙ্গুলের মত কাছাকাছি আমার নিকটবর্তী হবে।

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৫০)

১৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন ওজাহী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ছাহাবী (রাঃ) জনাব নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, যখন আমি ঘরে আসি তখন আমার স্ত্রী বলে, মারহাবা, আমার সরদার এসেছেন। অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত দেখলে বলে, দুনিয়ার দুঃখ বা আফছোছের কি আছে? পরকালই তো আমাদের আসল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তার স্ত্রীকে বলে দাও, সে-ও আল্লাহর কর্মীদের (জিহাদকারীদের) মধ্য থেকে একজন। জিহাদের অর্ধেক বিনিময় সে পাবে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪১০)

১৭। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার আমার নিকট এক বেদুঈন মহিলা এসেছিল। তার সঙ্গে ছিল দুইটি কন্যা সন্তান। আমি

খাওয়ার জন্য তাকে তিনটি খেজুর দেই। সে দুই মেয়েকে দুটি দেয় এবং নিজে একটি নেয়। তার খেজুরটি যখন সে খাওয়ার জন্য মুখের কাছে নিয়ে যায় তখন মেয়ে দুইটি ঐ খেজুরটিকেও চায়। ফলে সে তার খেজুরটি দুইভাগ করে দুই মেয়েকে দিয়ে দেয়। আম্মাজান বলেন যে, পরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে আসলে আমি তাকে ঘটনা শুনাই। তখন তিনি ইরশাদ করেন, নিঃসন্দেহ আল্লাহ পাক তার উপর বেহেশত ওয়াজিব করেছেন এবং দোযখ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৫৫)

১৮। হযরত হাব্বান বিন হাবলা (রাঃ) থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে যে, দুনিয়ার নেককার মহিলারা যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে তখন দুনিয়ার নেক আমলের বিনিময়ে তারা বেহেশতী হুর দের চেয়ে অধিক মর্যাদাশীলা হবে। (তাযকেরা, পৃঃ ৫৫৬)

১৯। হযরত আলী (রাঃ) থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক ঐ মহিলাকে ভালবাসেন যে তার স্বামীর সাথে মিষ্টি আলাপ করে অর্থাৎ তার দিকে নিজের মন নিবিষ্ট রাখে এবং পরপুরুষ থেকে নিজেকে পূতঃপবিত্র রাখে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-২, পৃঃ ৪০৬)

২০। হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একজন নেককার মহিলা এক হাজার বদকার পুরুষ অপেক্ষা উত্তম।

(আনিসুল ওয়ায়েজীন)

২১। হযরত আবদুল্লাহ বিন. উমর (রাঃ) রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যে, দুনিয়া ও এর সব কিছু ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক উপভোগের বস্তু। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ উপভোগের বস্তু হল– নেককার মহিলা। (মিশকাত, পৃঃ ২৬৭)

২২। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ মহিলা যে সৌন্দর্যের দিক দিয়ে সুন্দরী-রূপসী, কিন্তু দেনমোহর অনেক কম।

(জামে সগীর, পৃঃ ৪০৪)

২৩। জনাব রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐ মহিলা, যে স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং অনুগত কিন্তু শর্ত হল আল্লাহর উপর তার পুরোপুরি ইয়াকীন রাখতে হবে। আর সর্বনিকৃষ্ট ঐ মহিলা যে নিজের সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য পরপুরুষকে দেখায়, তাদের প্রতি খাহেশ রাখে এবং তাদের সাথে নির্জনবাস করতে চায় বা ঐ মহিলা

যে ধোঁকা দেয়। এমন মহিলাদের দিলের মধ্যে নেফাক থাকে। তাই তারা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু যেসব মহিলা সাদা পা বিশিষ্ট কাকের মত হবে অর্থাৎ এমতাবস্থায়ও যার আমল একটু ভাল হবে (আমলের কারণে) সে সাদা পা বিশিষ্ট কাকের মত অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম (বিখ্যাত) হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। (জামে সগীর, পৃঃ ৪০৪)

(২৪) জনৈক ছাহাবী (রাঃ) হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল, আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার জন্য কে সবচেয়ে বেশি হকদার? বললেন, তোমার মা। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কে? বললেন তোমার মা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর কে? বললেন, তোমার মা। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? বললেন, তোমার আব্বা। (রুহুল মাআনী, খণ্ড-৫, পৃঃ ৫৮)

২৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন যে, আমি কোন এক জিহাদাঙ্গনে এক নিহত মহিলাকে দেখেছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদের ময়দানে মহিলা ও বাচ্চাদের কতল (হত্যা) করতে নিষেধ করেছিলেন। (সুনানুল কুবরা, খণ্ড-৯, পৃঃ ৭৭)

২৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলাদেরকে পুরুষদের উপর লজ্জতের দিক দিয়ে নিরানব্বই গুণ বেশি ফযীলত দিয়েছেন কিন্তু তাদের মধ্যে লজ্জা-শরমের পর্দা দাখিল করে দিয়েছেন। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-৬ পৃঃ৩৪৫)

২৭। হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দাহ (রাঃ) থেকে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে যে, বাচ্চা প্রসবকারী কাল মহিলা সুন্দরী নিঃসন্তান মহিলা থেকে উত্তম। আমি আল্লাহর দরবারে (আমার) উম্মতের সংখ্যাধিক্যের উপর গর্ববোধ করব। এমনকি অকাল গর্ভপাত বাচ্চা বেহেশতের দরজায় গোস্বাবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তখন তার উপর হুকুম হবে বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও। সে আরজ করবে, হে আমাদের প্রতিপালক, আমার মাতাপিতার কি অবস্থা? ইরশাদ হবে তুমি মাতাপিতাকে সঙ্গে নিয়ে বেহেশতে দাখিল হয়ে যাও। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-২, পৃঃ ২৭৪)

২৮। হযরত হাব্বান বিন আবু হাবলাহ থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় দুনিয়ার নেককার মহিলারা বেহেশতের মধ্যে বেহেশতী হুরের চেয়ে ৭০ হাজার গুণ বেশি সুন্দরী হবে। (তাযকেরাহ, পৃঃ ৫৫৬)

২৯। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে স্বীয় মায়ের কপালে চুমু দিবে সে চুমু তার জন্য দোযখের পর্দা হবে।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ৬৪২)

৩০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার উম্মতভুক্ত নয় যে স্ত্রীকে তার স্বামী থেকে এবং গোলামকে তার মনিব থেকে ধোঁকা দিয়ে দূরে রাখে।

(আবু দাউদ)

৩১। হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াককাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে, নিজের পুত্রের দিকে মুখ তুলে তাকানো তোমার জন্য একটি নেয়ামত। তদ্রূপ নিজের কন্যার দিকে তাকানও তোমার জন্য সওয়াবের কাজ। কেননা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নরম দিল দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

(ফিরদাউস, খণ্ড-৪, পৃঃ ২৯০)

৩২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবার-পরিজনের মেয়েদের নিকট উত্তম।

(জামে সগীর, পৃঃ ৪০৬)

৩৩। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে যে, যখন কোন মহিলা তার স্বামীকে বলবে 'জাযাকাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আপনাকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করেন) তখন উভয়ের গোনাহ মাফ হয়। আর স্ত্রী যদি বিনা কারণে স্বামীর উপর (যতই কম হোক না কেন) রাগ করে তবে স্ত্রীর আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং স্বামীকে তার গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।

(ফিরদাউস, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৩২)

৩৪। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ইমানদার মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার আখলাক-চরিত্র উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট ভাল। (রিয়াজুল ছালেহীন, পৃঃ ১২৫)

৩৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি কি

তোমাদিগকে বেহেশতী ব্যক্তিত্বদের কথা বলব না? ছাহাবীগণ বললেন, বলুন। এর উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হযরত আম্বিয়াগণ বেহেশতী, আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বেহেশতী, শহীদগণ বেহেশতী, তদ্রূপ শহরের পার্শ্বে অবস্থিত কোন মুসলমানের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য সাক্ষাৎকারী বেহেশতী, অধিক সন্তান প্রসবকারী মহিলা বেহেশতী, এমনকি যদি স্বামী বা নিজের গোস্বার অবস্থায় স্বামীর হাত ধরে বলে যে, যতক্ষণ তুমি রাজী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষণিকের জন্যও কিছু খাবো না অবশেষে তাকে রাজী করে ফেলে সেও বেহেশতী। (হাবিউল আরওয়াহ, পৃঃ ১১৪)

৩৬। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণিত আছে যে, যখন স্বামী স্ত্রী উভয়ে একে অপরের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখে তখন আল্লাহ তাআলাও উভয়কে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন। আর একে অপরের হাত ধরে মোসাফাহা করলে আঙ্গুলের মধ্যখান থেকে গোনাহ ঝরতে থাকে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬ পৃঃ ২৭৬)

৩৭। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নেককার ও দ্বীনদার স্ত্রী পেয়েছে আল্লাহ তাকে অর্ধ দ্বীন দ্বারা মদদ করেছেন। এখন তার উচিত বাকী অর্ধ দ্বীন (আল্লাহর তাকওয়া দ্বারা) আয়ত্ত করে। (কন্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ২৭৩)

৩৮। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বাস্তবিক নেককার, অনুগত স্ত্রী পুরুষের জন্য দ্বীনের মদদগার। (মুসনাদে ফিরদাউস, পৃঃ ৩০১ খণ্ড-১)

৩৯। হযরত আবু উমামাহ (রাঃ) রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন যে, ঈমানদার ব্যক্তি খোদাভীতি অর্জনের পর সর্বোত্তম জিনিস যা নিজের জন্য মনোনীত করে তাহলো সতী-সাধ্বী স্ত্রী। তার গুণ হলো স্বামী কোন আদেশ করলে তা পালন করে, তার দিকে তাকালে তাকে সন্তুষ্ট করে, কোন ব্যাপারে কসম দিলে পুরা করে। আবার স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের জান (নফস) ও ধনসম্পদ হেফাজত করে। (মিশকাত, পৃঃ ২৬৮)

৪০। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ইরশাদ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক মহিলাদের প্রতি ঈর্ষার বিনিময়ে নেকী দিবেন। আর পুরুষদের জন্য জিহাদের। সুতরাং যে মহিলা ঈমান ও নেকী প্রাপ্তির পথে ঈর্ষার কথায় ধৈর্য ধরে (যেমন স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করল) তবে সে শহীদের বরাবর সওয়াব পাবে।

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড- ১৬, পৃঃ ৪০৭)

৪১। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমানদার পুরুষকে ঈমানদার মহিলার (স্ত্রী) সাথে হিংসা-বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়। কারণ তাদের মধ্যে কোন কিছু খারাপ লাগলেও অন্য ভাল গুণও তো আছে যাতে সে খুশি হতে পারে।

(মিশকাত, পৃঃ ৪৩১)

৪২। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা কারবারে সাহায্য করলে সদকার ছাওয়াব পাবে।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৮)

৪৩। হযরত মুয়াজ (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণনা করেছেন, যে মুসলমান মাতাপিতার তিনটি নাবালেগ বাচ্চা মারা যাবে (অথচ ছওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করবে) আল্লাহ পাক তাদেরকে (মাতাপিতা) বাচ্চাদের অসিলায় বেহেশতে দাখিল করবেন। হযরত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যদি দুটি বাচ্চা মারা যায়? বললেন, দুই বাচ্চাও সুপারিশ করে তাদেরকে বেহেশতে নিয়ে যাবে। আবার জিজ্ঞাসা করেন, যদি একটি বাচ্চা মারা যায়? বললেন, একটি বাচ্চাও সুপারিশ করে বেহেশতে নিয়ে যাবে। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড -৩ পৃঃ ২৯০)

৪৪। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মূল্যবান ও আপাদমস্তক গোপনীয় বস্তু। সে যখন বাহিরে বের হয় তখন শয়তান তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। (মিশকাত, পৃঃ ৪২১)

৪৫। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, কয়েকজন মহিলা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল জিহাদের মাধ্যমে পুরুষরা মহিলাদের থেকে ছওয়াবের দিক দিয়ে অনেক অগ্রসর হয়ে গেছে সুতরাং আমাদের জন্য এমন কোন আমল আছে কি? যা আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদদের আমলের বরাবর হতে পারে। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মহিলাদের নিজের ঘরে দৈনন্দিন কাজকর্ম করলে তা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমান সওয়াব হবে।

এসব হাদীস নয় ২/১৩৫ পৃ:

(দুররে মানসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫৩)

৪৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত আছে যে, একজন বদকার মহিলার অপকর্ম হাজার পুরুষের অপকর্মের সমান। তদ্রূপ একজন নেককার মহিলার মর্তবা সত্তর জন ছিদ্দীকের সমান। (জামে সগীর, খণ্ড-২, পৃঃ ১১৯)

৪৭। হযরত আবদুল্লাহ বিন যামআহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, নিজের স্ত্রীকে গোলামের মত নির্দয়ভাবে প্রহার করিও না। যার সাথে দিনের শেষে (রাতে) সহবাসে মিলিত হও। (মিশকাত, পৃঃ ২৮০)

৪৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের অধিকারের ব্যাপারে সদাচরণ করার জন্য আমার উপদেশ গ্রহণ কর। কারণ তাদেরকে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় থেকে পয়দা করা হয়েছে। (মিশকাত পৃঃ ২৮০)

৪৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় মহিলারা পাঁজরের হাড়ের মত (বাঁকা) যখন তাকে সোজা করতে যাবে তখন ভেঙ্গে ফেলবে। সুতরাং যদি ছেড়ে দাও তবে উপকার পাবে। (মুসলিম, পৃঃ ৪৭৫)

(৫০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, নবী মুহাম্মাদুর রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বিধবা ও মিসকীন মহিলার মঙ্গলের জন্য যে চেষ্টা করে সে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারীর ন্যায় বা রোজাদারের ন্যায় বা তাহাজ্জুদ আদায়কারীর ন্যায় সওয়াব পাবে।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-৩ পৃঃ ১৭৩)

৫১। رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً

এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, দুনিয়াতে হাছানাহ বলার উদ্দেশ্য হলো নেককার স্ত্রী আর পরকালে হাসানাহ বলার অর্থ হলো বেহেশত ও বেহেশতের হুর। (তাফসীরে বাগাভী, খণ্ড-১, পৃঃ ১৭৭)

৫২। হযরত আলী (রাঃ) হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয় অকালে গর্ভ থেকে পতিত বাচ্চা তার মাতাপিতাকে দোযখে দাখিল করানোর কারণে পরওয়ারদিগারের সাথে ঝগড়া করবে। তখন হুকুম হবে হে রবের প্রতি নারাজ বাচ্চা, তোমার মাতাপিতাকে বেহেশতে প্রবেশ করব। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ২৭৪)

৫৩। হাকেম বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- ফেরেশতারা এই বলে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে যে,

আমরা ঐ খোদার প্রশংসা করছি যিনি পুরুষদেরকে দাড়ি দ্বারা এবং মেয়েদেরকে চুলের বেণি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন। (কুনুযুল হাকায়েক)

৫৪। হযরত আনাস (রাঃ) ইরশাদ করেছেন, স্বামী তার স্ত্রীর পাহারাদার ও জিম্মাদার। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে। তদ্রূপ স্ত্রীও স্বামীর পাহাদার ও যিম্মাদার। এ ব্যাপারে তাকেও জিজ্ঞাসা করা হবে। (ফিরদাউস, খণ্ড-২,পৃঃ ৩০১)

৫৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই যিম্মাদার এবং তোমাদের প্রত্যেকের যিম্মাদারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমাদের আমীর (গভর্নর) ও যিম্মাদার। অনুরূপ পুরুষ ঘরের সদস্যদের যিম্মাদার। আর মহিলা স্বামীর ঘর ও বাচ্চাদের যিম্মাদার। (রিয়াজুছ ছালেহীন, পৃঃ ১৬৩)

৫৬। হযরত মুয়াবিয়া বিন হায়দাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহর রাসূল, স্বামীর উপর তার স্ত্রীর জন্য কি কি হক আছে? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি যখন খাও তখন তাকেও খাওয়াও। তুমি কাপড় পরলে তাকেও পরাও, তার চেহারার উপর প্রহার করবে না, অশ্লীল গালিগালাজ করবে না এবং তাকে ঘরের চার দেওয়ালের ভিতরে পর্দার মধ্যে রাখ।

(রিয়াজুছ ছালেহীন, পৃঃ ১৬৩)

৫৭। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে মহিলারা তোমরা যদি তোমাদের উপর অর্পিত তোমাদের স্বামীর হক সম্পর্কে অবগত থাকতে তবে প্রত্যেক মহিলা তার স্বামীর চেহারার উপর পতিত ধুলাবালি নিয়ে নিজের চেহারার উপর মালিশ করার চেষ্টা করতে। (দুররে মানসুর, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৮)

৫৮। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলারা পুরুষদেরই অংশবিশেষ।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-৪, পৃঃ ৪০৮)

৫৯। হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য মায়েদের প্রতি নাফরমানী করাকে হারাম করেছেন, খরচে কৃপণতা করতে নিষেধ করেছেন। বেহুদা কথাবার্তা বলা ও অধিক প্রশ্ন করাকে অপছন্দ করেছেন এবং সম্পদ নষ্ট ও অপচয় করাকে নাজায়েয করেছেন। (মিশকাত, পৃঃ ৪১৯)

৬০। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন পুরুষ যখন সুন্দরী রূপসী ও ধার্মিক মহিলাকে বিবাহ করে নেয় তখন সে নিজের নিকৃষ্টতা ও হীনতা থেকে নিজেকে রক্ষা করার দেওয়াল তৈরী করে নেয়।

(ফিরদাউস, খণ্ড-১, পৃঃ ২৯৪)

৬১। হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন মহিলাদের মধ্যে নেককার মহিলার দৃষ্টান্ত সাদা পা বিশিষ্ট কাকের ন্যায়। অর্থাৎ সাদা পায়ের বিশেষ আলামতের কারণে কাকের মধ্যে সবাই উহাকে চিনতে পারে তেমনি নেককার মহিলাকে সবাই সহজে চিনে নিবে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৯)

৬২। হযরত আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলারা মনে রেখ, তোমাদের মধ্যে যে নেককার হবে সে নেককার পুরুষদের (স্বামীর) পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। পরে তাদেরকে গোসল দিয়ে খুশবু লাগায়ে নিজ নিজ স্বামীদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। তখন তারা লাল ও হলুদ রংয়ের বাহনের উপর উপবিষ্ট থাকবে। সেখানে স্বামীদের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত মুতির মত বেঁচে থাকবে।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪১২)

৬৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ আমার পূর্বে কোন মানুষকে বেহেশতে প্রবেশ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু দেখবো যে, হঠাৎ আমার ডানদিক থেকে এক মহিলা বেহেশতের দরজার দিকে এগিয়ে চলে গেছে। তখন আমি তার আগে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ মহিলা রূপে-গুণে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় ছিল (বিধবাও ছিল) তার এতিম বাচ্চাও ছিল, তাই তাদের কারণে সে ধৈর্য ধরেছিল (অর্থাৎ আর বিবাহ বসেনি)। শেষ পর্যন্ত তার বাচ্চারা বালেগ হয়ে যায় এবং আল্লাহর শোকর আদায় করে। সুতরাং এমন সীমাহীন কুরবানীর জন্য এ মহিলা আগে যাওয়ার মর্যাদা পেয়েছে।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৬০)

৬৪। হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মিথ্যা বলা সরাসরি হারাম, কিন্তু প্রয়োজনবশতঃ তিন স্থানে জায়েয আছে। (১) স্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য (২) যুদ্ধের ময়দানে শত্রুদের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য (৩) দুই মুসলমানের মধ্যে মীমাংসার জন্য। (মিশকাত, পৃঃ ৪২৮)

৬৫। হযরত আবদুর রহমান বিন ছালিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমরা কুমারী মেয়েকে বিয়ে কর। কারণ সে খুব মিষ্টভাষী, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী এবং অল্পে তুষ্ট থাকে। (মিশকাত, পৃঃ ২৬৮)

৬৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের এ নশ্বর দুনিয়ায় মহিলা ব্যতীত আমার নিকট আর কোন অধিক প্রিয়বস্তু মিলেনি।

(হাশিয়ায়ে নাসায়ী, খণ্ড-২,পৃঃ ৯৩)

৬৭। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ দুনিয়ার দুইটি বস্তু আমার নিকট অতি প্রিয়-মহিলা এবং খুশবু, আর নামাযের মধ্যে আমার চক্ষুকে শীতল করার বিষয় রয়েছে। (নাসায়ী, পৃঃ ৯৩)

৬৮। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, (এক সফরে) আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল, আমি সম্প্রতি বিয়ে করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কুমারী বিয়ে করেছ নাকি বয়স্কা বা বিবাহিতাকে বিয়ে করেছ? আমি বললাম, বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করেছি। বললেন, হে জাবির কতই না উত্তম হতো তুমি যদি কুমারী মেয়ে বিয়ে করতে। তাহলে সে তোমার সাথে খেলা করতো আর তুমিও তার সাথে খেলতে। মদীনায় এসে আমরা যখন বাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, দেরী করে রাতে এশার সময় যাও। তাহলে এর মধ্যে তোমাদের স্ত্রীরা চিরুণী ব্যবহার করে প্রস্তুত হবে এবং নাভীর নীচের পশম পরিষ্কার করে নিবে, অতঃপর (পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতির পর) তোমরা ঘরে দাখিল হও। (মুসলিম, পৃঃ ৪৭৭)

৭৯। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার ঘরে কন্যা জন্মেছে অথচ তাকে দুঃখ-কষ্ট দেয়নি তার উপর পুত্রকে প্রাধান্য দেয়নি তবে কন্যার কারণে আল্লাহ পাক তাকে বেহেশতের মধ্যে দাখিল করবেন।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৫৪)

৭০। হযরত নবীত বিন শুরাইত (রাঃ)-বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন ঘরে কন্যা সন্তান ভুমিষ্ঠ হয় তখন আল্লাহ পাক তার (কন্যাকে) মোবারকবাদ জ্ঞাপন করার জন্য এক জামায়াত ফেরেশতা প্রেরণ করে। সুতরাং তারা এসে পরিবারের উপর শান্তি বর্ষণ করে এবং নিজেদের ডানার মধ্যে তাদেরকে ঢেকে নিয়ে মাথার উপর হাত বুলায় যে, এক দুর্বল প্রাণী (আত্মা) অপর দুর্বল প্রাণী (আত্মা) থেকে বের হয়ে এসেছে। অতঃপর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের সহযোগিতার জন্য একজন সহায়ক নিয়োগ করা হয়। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৪৯)

৭১। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোন মহিলা কন্যা প্রসব করে তখন আল্লাহ পাক তার নিকট একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। বরক নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ফেরেশতা এসে শব্দ করে বলে, এক দুর্বল প্রাণী থেকে অপর দুর্বল প্রাণী পয়দা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ পাক তার জন্য একজন মদদগার (ফেরেশতা) নির্ধারিত করে দেন। পুত্র হলে আল্লাহ পাক আসমান থেকে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। সে এসে পুত্রকে চুম্বন করে বলে, আল্লাহ পাক তোমার উপর সালাম পেশ করেছেন। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৫০)

৭২। হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তানের মধ্যে কন্যারা উত্তম। কারণ তাদের মধ্যে অনেক কল্যাণ ও গুণ রয়েছে। কোমল সুরে নম্রতার সাথে কথা বলে মাতাপিতার খেদমত করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে, মায়ামমতা ও নম্র ভদ্র থাকে। মোটকথা জন্মগতভাবে তারা অনেক গুণের অধিকারী হয়। (ফিরদাউস, খণ্ড-৪, পৃঃ ২৫৫)

৭৩। হযরত নবীত বিন শুরাইত (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইরশাদ বর্ণনা করেছেন, তোমরা মেয়েদেরকে অপছন্দ করিও না। কারণ আমিও মেয়েদের পিতা। নিশ্চয় তারা অনেক গুণের অধিকারী হয়; যেমন বিনয়ী হয়, মায়াশীল হয়, আদর-সোহাগকারিণী হয়। মাতাপিতার খেদমতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। অত্যন্ত কল্যাণকামী ও গুণবতী হয় (ফিরদাউস, খণ্ড-৫, পৃঃ ৩৭)

৭৪। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিল। ইতিমধ্যে সেখানে তার এক ছেলে উপস্থিত হয়। সে তাকে ধরে চুম্বন দেয়, অতঃপর রানের উপর বসায়। কিছুক্ষণ পর সেখানে তার আরেকটি মেয়ে আসে। তখন সে তাকে (মেয়ে) নিজের সামনে বসায়ে দেয়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি উভয়ের মধ্যে সমান আচরণ করলে না কেন? অর্থাৎ মেয়েকে চুম্বনও দাওনি রানের উপরও বসাওনি।

(হায়াতুছ ছাহাবা, খণ্ড-২, পৃঃ ৬৬১)

৭৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক ঐ ব্যক্তিকে মহব্বত করেন যার নিকট অনেক কন্যা থাকে আর পুণ্যের প্রত্যাশায় সে ধৈর্যধারণ করে থাকে। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৫০)

৭৬। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মেয়েরা অধিক মায়াময়ী খেদমতকারিণী ও

বরকতপূর্ণ হয়। যে গৃহে একটি কন্যাও হবে কিয়ামতের দিন সে তার পিতার জন্য দোযখ থেকে পর্দাস্বরূপ হবে। মেয়ে দুইজন হলেও তাদের বরকতে পিতা বেহেশতে প্রবেশ করবে। তদ্রূপ তিন মেয়ে বা বোন হলেও পিতার থেকে জিহাদ ও সদকা বন্ধ করে দেয়া হবে। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৫৪)

৭৭। হযরত উকবা বিন আমির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যার অভিভাবকত্বে (যিম্মাদারীতে) তিনটি মেয়ে থাকবে লালন-পালনের যাবতীয় কষ্ট সহ্য করবে এবং সাধ্যমত খাদ্য-পানির ব্যবস্থা করবে কিয়ামতের ময়দানে এ মেয়েরা তার জন্য পর্দা (প্রতিবন্ধক) হবে। (ইবনে মাজা, পৃঃ ২৬৯)

৭৮। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ যাকে কন্যা দ্বারা পরীক্ষায় লিপ্ত করেছেন আর সেও যথাযথরূপে ধৈর্যধারণ করেছে কিয়ামতের দিন ঐ কন্যাই উক্ত ব্যক্তির দোযখ থেকে মুক্তির কারণ হবে।

(কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৪৭)

৭৯। হযরত নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দুই মেয়ে বা দুই বোন বা দুই খালা বা দুই ফুফু বা দুই দাদীকে দেখাশুনা করবে সে বেহেশতে আমার সঙ্গে থাকবে। যদি তারা সংখ্যায় তিনজন হয় তবে সংকীর্ণতা ও মহাবিপদ থেকে মুক্তি পাবে। তবে যদি ৪বা ৫ জনও হয় তবুও। হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা জান ও মাল দ্বারা তাদের উপর সাহায্য কর। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৫১)

৮০। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার প্রতিপালনে তিন কন্যা বা তিন বোন বা দুই কন্যা বা দুই বোন থাকবে এবং তাদেরকে উত্তমরূপে আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে তাদের বদৌলতে সে বেহেশত পেয়ে যাবে। (তিরমিযী, খণ্ড-২, পৃঃ ১৩)

৮১। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলাদের সৌভাগ্যের দলীল হল, তার প্রথম কন্যা সন্তান হওয়া। কারণ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন আবার যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। সুতরাং তিনি কন্যাকে পুত্রের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

(দুররে মানসুর, খণ্ড-৫ পৃঃ ১২)

৮২। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ মহিলা স্বামীর জন্য বেশি বরকতপূর্ণ যার দেনমোহর অতি কম এবং প্রথম সন্তান কন্যা।

(হাশিয়ায়ে ফিরদাউস, খণ্ড-১, পৃঃ ২১৫)

৮৩। হযরত সুরাকা বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, অবশ্যই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে সুরাকা আমি তোমাকে সর্বোত্তম ছদকার কথা কি বলে দেব না? তা হল তোমার ঐ মেয়ের খরচ বহন করা যে শরীয়তসম্মত কারণে (তালাক বা স্বামীর ইন্তেকালে) তোমার ঘরে ফিরে এসেছে। অথচ তুমি ছাড়া তার আর কোন জীবিকা উপার্জনকারী নেই। (ইবনে মাজা, পৃঃ ২৬৯)

৮৪। হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যে মহিলা বিধবা অবস্থায় বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য ঘরে আবদ্ধ থাকবে সে বেহেশতে আমার সাথে থাকবে।

(কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪০৮)

৮৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) নবী করিম সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে মহিলাকে তার স্বামী দুঃখ-কষ্ট দেয় (কিন্তু সে বিরক্তি বা অসহ্যবোধ করে না) বরং সে বলে যে, লাব্বাইক অর্থাৎ আমি তোমার খেদমতে প্রস্তুত। তাহলে ঐ লাব্বাইক বলার কারণে আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা পয়দা করবেন। সে আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করবে। ফলে তার যাবতীয় পুণ্য ঐ মহিলার আমলনামায় লিখে দেওয়া হবে।

(ফিরদাউস, খণ্ড-১, পৃঃ ৩৫১)

৮৬। হযরত সালমান বিন ইয়াজীদ তার পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, হুজুরে আকরাম সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাস্তায় যারা বের হয় না তাদের উচিত আল্লাহর রাস্তায় গমনকারী ব্যক্তিদের (মুজাহিদগণের) স্ত্রীদিগকে নিজের মায়ের মত করে শ্রদ্ধা করা।

(খোঁজ খবর নেওয়া)। মুসলিম, খণ্ড-২, পৃঃ ১৩৮)

৮৭। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, সর্বোৎকৃষ্ট মহিলা হল আনসার মহিলারা। কারণ তারা দ্বীনী শিক্ষা তথা শরীয়তের বিধিবিধান শিখবার ব্যাপারে লজ্জা-শরমের প্রতিবন্ধকতা পয়দা হতে দেননা। (মুসলিম, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫০)

৮৮। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল-

াম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম বেহেশতে গমনকারী ঐ সব মহিলা হবে যারা দ্বীনের ব্যাপারে সাহসী (অগ্রণী)।

(মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড-২, পৃঃ ৬৬)

৮৯। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মহিলাদিগকে দুর্বল এবং তাদের আপাদমস্তক (সমস্ত) গোপনীয় (ছতর)করে সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং তোমরা ঘরের চার দেওয়ালের সাহায্যে তাদের গোপনীয়তা (ছতর) সংরক্ষণ কর। (ফিরদাউস, খণ্ড-৪, ৩১৫)

৯০। হযরত আবদুর রহমান বিন আবজা বলেন যে, রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নেককার মহিলা ও নেককার পুরুষের বিবাহ বন্ধনের দৃষ্টান্ত এমন যেমন সোনার পাথরে প্রস্তুত উজ্জ্বল (সুসজ্জিত) টুপি বাদশাহর মাথার উপর। পক্ষান্তরে নেককার পুরুষ ও বদকার মহিলার মধ্যে বিবাহের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন বৃদ্ধলোকের উপর ভারী বোঝা।

(দুররে মানসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫২)

৯১। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহিলা তিন প্রকারের হয়।

(১) প্রথম প্রকার প্লেটের ন্যায় যার মধ্যে জিনিসপত্র (সহজে) রাখা যায় বেরও করা যায় অর্থাৎ বাচ্চা প্রসব করতে সক্ষম নহে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার বেকার উষ্ট্রীর মত এবং

(৩) তৃতীয় প্রকার হল ঐ সব মহিলা যারা স্বীয় স্বামীকে খুব মহব্বত করে, অধিক সন্তান প্রসব করে এবং দ্বীন ও ঈমানের লাইনে স্বামীকে মদদ (সাহায্য) করে। এমন মহিলা স্বামীর জন্য সোনার খনি থেকেও উত্তম।

(দুররে মানসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫৩)

৯২। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহিলা তিন প্রকার–

(১) ঐসব মহিলা যারা পাক-পবিত্র হয়। (তাছাড়া) অনুগত, কোমল স্বভাব, নরম দিল, মহব্বতকারী ও অধিক সন্তান প্রসবকারিণী হয়। সর্ববাস্থায় স্বামী ও পরিবারের লোকদের প্রতি মেহেরবান থাকে। তবে এমন মহিলা খুব কমই পাওয়া যায়।

(২) ঐ মহিলা যে বরতনের মত অর্থাৎ বেশি বাচ্চা প্রসব করে।

(৩) ঐ সব মহিলা যারা ধোঁকাবাজ (প্রতারক) হয়। আল্লাহ যাকে চান তাকে এমন স্ত্রী দেন আবার যখন হটাতে চান তখন হটিয়ে দেন।

(দুররে মানসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫৩)

৯৩। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে বেহেশত প্রত্যাশীরা বেহেশত তো (তোমার) মায়ের পদতলে। (কান্‌যুল উম্মাল, খণ্ড-১৬, পৃঃ ৪৬১)

৯৪। হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুরে পাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন, ঈমানদার মহিলার জন্য এটা জায়েয নেই যে, স্বামী অপছন্দ করে এমন ব্যক্তিকে ঘরে নিয়ে আসে। তদ্রূপ স্বামীর সন্তুষ্টি ও অনুমতি ছাড়া ঘর থেকে বাহিরে যাবে না। স্বামীর ব্যাপারে কারো আনুগত্য বা তাবেদারী করবে না। কথায় কথায় তার সাথে রাগ করবে না। নিজের বিছানা পৃথক করবে না বা তাকে প্রহার করবে না। আর স্বামী যদি অত্যাচার করে তবে তার নিকটে এসে তাকে রাজি করাবে। যদি রাজী হয়ে যায় তবে তো আল্লাহ পাকও ঐ মহিলার ওযর-আপত্তিকে কবুল করবেন। আর যদি রাজী না হয় তবুও আল্লাহর নিকট ওজর পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তার উপর রাজী হবেন। (দুররে মানসুর, খণ্ড-২, পৃঃ ১৫২)

৯৫। হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস (সঙ্গম) করাও একটি ছদকা। (ছাহাবাগণ) আরজ করলেন হে আল্লাহর রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রী থেকে মানুষ খাহেশ (নফসের চাহিদা) পূর্ণ করে তবুও কি উহার মধ্যে বিনিময় পাবে? প্রতি উত্তরে হুজুরে পাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জাননা যে, এ খাহেশকেই হারাম তরিকায় পূর্ণ করলে গোনাহ হতো? ছাহাবাগণ (রাঃ) বললেন, অবশ্যই গোনাহ হতো। তখন হুজুর পাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, তদ্রূপ হালাল পন্থায় করলেও বিনিময় পাবে। (মুসলিম, খণ্ড-১, পৃঃ ৩২৫)

৯৬। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলে পাক সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজের মধ্যে উপদেশ দিয়ে বলেন, হে মহিলারা তোমরা অলংকার দিয়ে হলেও দান-ছদকা কর। সুতরাং এ নছীহত শ্রবণ করে আমি আমার স্বামী আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কে বললাম, হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদিগকে দান–ছদকা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। আর আপনি তো অভাবী ও নিঃস্ব মানুষ। আমি দানের জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছি। সুতরাং আপনি নবী

কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের দরবারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি যদি (নফল) ছদকা আপনাকে দিয়ে দেই তবে জায়েয হবে কিনা? যদি জায়েয হয় তবে তো খুবই উত্তম। অগত্যা যদি জায়েয না-ই হয় তবে আমি অন্য কাউকে দিয়ে দিব।

প্রতিউত্তরে আমার স্বামী আমাকে বললেন, তুমি উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞসা করে নাও। তিনি বলেন যে, তখন আমি হুজুর সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম সেখানে অপর এক আনসারী মহিলা দণ্ডায়মান আছে। ঘটনাক্রমে তার ও আমার উদ্দেশ্য (নিয়ত) এক রকম ছিল। বলেন যে, তখন হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ভিড় ছিল। এরই মধ্যে হযরত বেলাল (রাঃ) আমাদের দিকে বের হয়ে আসলেন। তখন আমরা বললাম, আপনি হুজুরের খেদমতে উপস্থিত হয় বলেন যে, দুইজন মহিলা আপনার নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে এসেছে। মাসআলা হল, আমাদের ছদকা আমাদের স্বামী ও আমাদের ঘরের এতিম বাচ্চাদের দিলে জায়েয হবে কিনা? আর আমরা কারা তা বলবেন না।

হযরত বেলাল (রাঃ) উপস্থিত হয়ে মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করলে হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম জিজ্ঞাসা করলেন, এসব মহিলা কারা? তিনি বললেন, একজন আনসারী মহিলা, অপরজন যয়নব। বললেন, কোন্ যয়নব? তিনি উত্তর দিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের স্ত্রী। তখন হুজুরে আকরাম সাল-ালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাকে বলে দাও যে, তার জন্য (এ দানে) দ্বিগুণ সওয়াব। প্রথমত ছদকার (সওয়াব) দ্বিতীয়ত আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপনের। (মিশকাত, পৃঃ ১৭০)

৯৭। হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন মহিলা তার স্বামীর অর্থ-সম্পদ থেকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে যদি দান ছদকা করে তবে সে পাবে দানের বিনিময়। স্বামী পাবে আয়ের এবং ক্যাশিয়ার পাবে হেফাজতের। তবে কারো থেকে কারো বিনিময় কম হবে না। (আবু দাউদ,পৃঃ ১৪৪)

৯৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি জিহাদে যাওয়ার প্রাক্কালে নিজের স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল, তুমি ঘরের উপরের তলা থেকে নিচের তলায় নামবে না। নীচের তলায় স্ত্রীর পিতা থাকত। হঠাৎ তার পিতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন মহিলা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে এবং পিতার সেবা-যত্ন করার জন্য অনুমতি চায় কিন্তু হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেন এবং বলেন, হে

মহিলা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমার স্বামীর কথা মান্য কর। ঘটনার কয়েকদিন পর পিতার ইন্তেকাল হয়। তখন ঐ মহিলা পুনরায় হুজুরের নিকট পিতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করার জন্য নিচতলায় যাওয়ার অনুমতি চায়। এবারও হুযুর নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি নিজেই সেখানে উপস্থিত হন এবং দাফনের পর ঐ মহিলাকে শুভ সংবাদ দেন যে, তোমার স্বামীকে (তুমি) মান্য করার কারণে তোমার আব্বাকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(আবু দাউদ, পৃঃ ২৪৪)

৯৯। হযরত আমর বিন আল আহওয়াছ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের সাথে বিদায় হজ্জে শরিক ছিলেন। হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা সমাপ্ত করে খোতবা আরম্ভ করেন। খোতবার মধ্যে মূল্যবান উপদেশ দান করেন। তন্মধ্যে এ উপদেশও ছিল যে, মনে রেখ, আমি তোমাদিগকে মহিলাদের ব্যাপারে সদুপদেশ দিচ্ছি যে, তারা তোমাদের সাহায্যকারী। তোমাদের মানবীয় চাহিদা পূরণ করা ব্যতীত তোমরা তাদের কোন অংশের মালিক নও। (অতএব তাদেরকে কোন রকম কষ্ট-যাতনা দিবে না।) তবে হাঁ, যদি ব্যভিচারীতে লিপ্ত হয় বা এমন পরিকল্পনা প্রকাশ পায় তবে (তার সাজা শাস্তি এটুকু যে,) তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। এরপরও সংশোধন না হলে প্রয়োজনবশতঃ মৃদুভাবে প্রহার কর। ফলে যদি সংশোধন হয়ে যায় তবে আর কোন বিপরীত পদক্ষেপ গ্রহণ করিও না। জেনে রেখ যে, তোমাদের জন্য নারীদের উপর হক আছে তদ্রূপ নারীদেরও তোমাদের উপর হক আছে। সুতরাং তাদের উপর তোমাদের হক হল, তোমরা পছন্দ করোনা এমন ব্যক্তিকে তোমাদের ঘরে তারা (মহিলারা) আসতে দিবে না। তদ্রূপ তোমরা যাকে অসৎ (খারাপ) মনে কর তাকে তারা তোমাদের ঘরে প্রবেশ করতে দিবে না। পক্ষান্তরে তোমাদের উপর মহিলাদের হক হল তাদের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। অর্থাৎ যখন তোমরা খাও, পান কর ও পরিধান কর তখন তাদেরকে, পান করাও পরিধান করাও।

(দুররে মানসুর, খণ্ড-২ পৃঃ ১৫৬)

মুমিন নারীর উত্তম গুণাবলী

হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন-"পুরুষও তিন প্রকার এবং নারীও তিন প্রকার। নারীদের প্রথম প্রকার হল-(সার্থক নারী-যারা) সতী-সাধবী, ধার্মিকা মুসলমান, বিনম্র, স্বামী ও

সন্তানদের প্রতি সোহাগিণী, অধিক সন্তান প্রসবকারীনী, বিপদাপদ ও দুঃসময়ে স্বামীকে সাহায্যকারীণী। তোমরা এমন নারীর সংখ্যা খুব কম পাবে। দ্বিতীয় প্রকার নারী হল-(তেজী নারী-) যাদের দাবী, অবদার ও চাহিদা খুব বেশী। এমন নারী স্বামীর জন্য সন্তান জন্ম দেয়া ছাড়া অন্য কোন উপকারে আসেনা। তৃতীয় প্রকার নারী হল- (বেহুদা নারী-) যারা স্বামীর জন্য ভারী বোঝা- যা উঁকুনের মত জাপটে থাকে। এমন নারীকে আল্লাহ যাকে চান তার গলা থেকে সরিয়ে দেন। তেমনিভাবে পুরুষও তিন প্রকার। প্রথম প্রকার পুরুষ হল- (সফল পুরুষ -যারা) সচ্চরিত্রবান, বিনয়ী, অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী, সুস্থবিবেকবান। যখন কোন সমস্যায় পতিত হয়, তখন স্বীয় বিবেক দ্বারা চিন্তা করে এবং সমস্ত বিষয় চিন্ত-ভাবনা করে সমাধা করে। দ্বিতীয় প্রকার পুরুষ হল- (কর্মী পুরুষ-) যাদের কোন ব্যক্তিগত মতামত নেই। তবে যখন তাদের সম্মুখে কোন সমস্যা উপস্থিত হয়, তখন তারা কোন বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট গমন করে এবং তার পরামর্শে কাজ করে। তৃতীয় প্রকার পুরুষ হল- (অকর্মা পুরুষ-যারা) সদা চিন্তিত ও পেরেশান থাকে। তারা নিজেরাও বুদ্ধি রাখেনা এবং অন্য কোন জ্ঞানী পরামর্শদাতার পরামর্শও গ্রহণ করে না।" উল্লেখিত হাদীস শরীফে নারী ও পুরুষদের তিন প্রকারে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় তুলে ধরে লভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তাদের মান-মূল্যায়ন পূর্বক সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দেয়া হয়েছে।

হাদীসটির স্বরূপবিশ্লেষণে প্রথমতঃ নারীদের তিন প্রকার থেকে প্রথম প্রকার তথা সার্থক নারীদের গুণাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আশা করছি।

সফল নারীর গুণাবলী

উল্লেখিত হাদীসে প্রথম প্রকার বা সার্থক নারী তাদেরকে বলা হয়েছে- যাদের মধ্যে ৬টি গুণের সমাহার ঘটেছেঃ (১) তারা সতী-সাধবী, সচ্চরিত্রবতী। (২) ধার্মিকা মুসলমান। (৩) বিনম্র ও কোমল স্বভাবী। (৪) স্বামীর সোহাগীণী। (৫) অধিক সন্তান প্রসবকারীণী। (৬) বিপদাপদে স্বীয় স্বামীকে সাহায্যকারীণী। এসব গুণাবলীর বিশ্লেষণ নিম্নরূপ-

১ম গুণ-সতীত্ব রক্ষা

সতীত্ব রক্ষা করা, চরিত্র রক্ষা করা বা সতী-সাধবী হওয়া নারীর সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ গুণ, যার উল্লেখ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রয়েছে। সূরাহ নিসার ৩৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

فَالصَّالِحَاتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ

"নেককার স্ত্রীগণ অনুগতা হয়। তারা আল্লাহ তা'আলা যা হিফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন, লোকচক্ষুর অন্তরালে তা হিফাযত করে।"

সুতরাং নেককার ও সতী নারী তারা-যারা ফরমাবরদার স্বীয় প্রতিপালকেরও এবং স্বীয় প্রাণপ্রিয় স্বামীরও তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতেও খিয়ানত করেনা। বরং স্বীয় ইজ্জত, লজ্জাস্থান, অবয়ব ও স্বামীর ধন-সম্পত্তি, মাল-দৌলত, আসবাবপত্র যথাসাধ্য সংরক্ষণ করে।

বস্তুতঃ এটাই নারীর সাংসারিক দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اَلْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهٖ

"নারী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানদের সংরক্ষণকারীণী।"

২য় গুণ-ধার্মিকা মুসলমান হওয়া

ধার্মিকা মুসলমান হওয়ার অর্থ হল- আল্লাহর হুকুমের প্রতি আত্মসমর্পন করা, মাথা পেতে মেনে নেয়া। যে নারী আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করে দেয়, তা আনন্দ বদনে পালন করে এবং শরয়ী আহকাম পালন করতে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেনা। সেই নারী ফরমাবরদার ও ধার্মিকা অনুগত মুসলমান বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে যে নারী আল্লাহর হুকুম-আহকাম। আদেশ-নিষেধ শুধু শ্রবণ করে, কিন্তু পালন করার আগ্রহ অন্তরে বিন্দুমাত্র সৃষ্টি হয়না, বরং তার নফস-প্রবৃত্তি, তাকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করে, তাকে প্রকৃত মুসলামান নারী বলা যায় না। এ ধরনের নারীরাই নারীস্বাধীনতা, নারীমুক্তি ও নারী অধিকারের নামে ফ্রী সেক্স, ফ্রী মাইন্ড, অশ্লীলতা, বে-হায়াপনা ও বেলেল্লাপনার পথে পরিচালিত হয়। বেপর্দা উদোম শরীরে বখতী উটের মত হেলে-দুলে পথ চলে সেজে-গুজে স্বীয় রূপ-লাবণ্য পর-পুরুষদের প্রদর্শন করে বেড়ায়। এদের পরিণাম খুবই ভয়াবহ হবে।

৩য় গুণ-নম্র হওয়া

নেককার নারীর তৃতীয় গুণ হল-নরম স্বভাবের ও নরম মেযাজের হওয়া। উল্লেখিত হাদীস শরীফে لَيِّن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সেই নারীর মেযাজ ও স্বভাব নরম হবে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ

"আল্লাহ তা'আলা দয়ার্দ্র। তিনি দয়া ও নম্রতাকে পছন্দ করেন।" তিনি আরো ইরশাদ করেন-

وَيُؤْتِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُؤْتِىْ عَلَى الْعُنْفِ

"আল্লাহ তা'আলা নম্রতার কারণে যা দান করেন, কঠোরতার কারণে তা দান করেন না।"

ভাষা কখন নরম ও কর্কশ হয়?

অভিজ্ঞতার আলোকে জনৈক বুযুর্গ বলেন, নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, জীবনের শুরুতে পুরুষের ভাষা কর্কশ হয় এবং নারীর ভাষা নরম হয়। অতঃপর বয়স যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন পুরুষের ভাষা নরম হতে থাকে আর নারীর ভাষা কর্কশ হতে থাকে।

তবে যারা দ্বীনদার-বুঝমান নারী, তারা বয়স বাড়লেও কর্কশ হয় না, নিজেদেরকে কন্ট্রোল করে রাখে। সফল নারীর গুণ এটাই।

নম্রতা, ভদ্রতা, কোমলতা, সহমর্মিতা ও নরম স্বভাবের মহৎগুণ নারী জাতির অমূল্য রত্ন। এগুলো নারীকে স্বামীর হৃদয়ে রক্ষিত সিংহাসনের একচ্ছত্র রাণী বানিয়ে দেয়। অথচ অনেক নির্বোধ নারী এটা বোঝেনা। এজন্য তাদের সংসার থাকে অশান্তির জাহান্নামে নিমজ্জিত।

৪র্থ গুণ-সোহাগিণী হওয়া

নেক নারীর চতুর্থ গুণ হচ্ছে-স্বামী ও সন্তানদের প্রতি সোহাগীণী হওয়া। প্রেম-ভালবাসা ও মায়া-মমতা নারীর সহজাতগুণ। এ গুণের বৈধ ক্ষেত্র হচ্ছে-তার স্বামী ও সন্তানাদি। যে নারী স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও সন্তানদের প্রতি মমতাময়ী হয়, হাদীস শরীফে তাকে উত্তম নারী বলা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র ভালবাসার বন্ধন আল্লাহ তা'আলা নিয়ামতরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাই দাম্পত্য জীবন মুহাব্বত ও প্রেম-ভালবাসার আকর।

তাই স্বামী-স্ত্রীকে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। ঘরকে প্রেমের মালঞ্চ বানিয়ে রাখা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই কর্তব্য।

সার্থক নারীর বিশেষ গুণ হল-প্রেমময়ী হওয়া, স্বামী সোহাগীণী হওয়া। যে নারী স্বামী সোহাগীণী হয়, স্বামীকে উপচেপড়া ভালবাসা দ্বারা আপন বানিয়ে নেয়, সে নারীর ইহকাল ও পরকালের জীবন ধন্য ও সাফল্যমন্ডিত হয়।

স্বামী-স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রগাঢ় ভালবাসা সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- لَمْ تَرَ مُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

"তুমি বিবাহের বন্ধনের মত পারস্পরিক ভালবাসা কোথাও পাবে না।" পক্ষান্তরে বেগানা নারী-পুরুষের প্রেম-ভালবাসা হারাম। অনেক নির্বোধ ও মুর্খ বলে থাকে-জনৈক মেয়ের সাথে তার প্রেম হয়েছে এবং তাদের প্রেম ফুলের মত

পবিত্র। নাউযুবিল্লাহ। কেউ যদি বলে, মানুষের মল-মূত্র দু'প্রকার ঃ (১) পবিত্র ও (২) অপবিত্র। তাহলে তার মত নির্বোধ পৃথিবীতে নেই। তেমনিভাবে গাইরে মাহরাম যুবক-যুবতীর প্রেম-ভালবাসা মল-মূত্রের ন্যায় নাপাক। তাকে পবিত্র বলে ভিন্নভাবে ভাগ করার কোন অবকাশ নেই। তা সর্বাবস্থায়ই হারাম।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ বংশের নারীদের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন-

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ

"সর্বোত্তম আরব নারী হল কুরাইশ বংশীয় সচ্চরিত্রবতী নারী।"

কুরাইশী নারীদের প্রশংসার কারণ হচ্ছে-বিশ্বের অন্যান্য নারীদের তুলনায় কুরাইশ বংশীয় নারীরা স্বীয় স্বামীদের প্রতি অধিক হৃদ্যতাশীলা। তারা স্বামীদের খুব ভালবাসে। যে কোন অবস্থায় স্বামীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তারা পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ় অনড়।

তাদের গুণাবলী বর্ণনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

وَأَحْنَاهُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَحْفَظُهُ لِبَيْتِ زَوْجِهَا

"কুরাইশ নারীগণ স্বীয় সন্তানদের খুব স্নেহময়ী, মেহেরবান এবং স্বামীর গৃহের সংরক্ষণে খুবই যত্নবান।"

৫ম গুণ-অধিক সন্তান জন্মদান

নেক নারীর পঞ্চম গুণ হল-অধিক সন্তান জন্ম দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে, অধিক সন্তান জন্ম দেয়া প্রশংসার বিষয়। কারণ, একে তো এর মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বেড়ে তা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গর্ববোধের বিষয় হবে। এ প্রসঙ্গে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-"তোমরা সোহাগীণী ও অধিক সন্তানদায়ীণী মেয়েকে বিবাহ কর। কারণ, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতদের উপর গর্ববোধ করব।" (মিশকাত)

দ্বিতীয়তঃ সন্তানাদি বেশী হলে এবং তারা সকলে দ্বীনদার মুত্তাকী হলে, সেই ব্যক্তির পরিবারে আল্লাহ পাকের ইবাদত-বন্দেগী ও জিকির-তাসবীহ বেশী হওয়ার পথ সুগম হবে।

তা ছাড়া নেক সন্তান দ্বারা পিতা-মাতা দুনিয়া ও আখিরাতে যে লাভবান হন, সেক্ষেত্রে সন্তান বেশী হলে, তা তাদের অধিক ফজীলত ও মর্যাদা লাভের কারণ হবে।

আর এক্ষেত্রে বেশি সন্তান হলে, তাদের ভরণ-পোষণ কিভাবে হবে বা তারা খেতে পারবে না ইত্যাদি প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, পৃথিবীতে মহান আল্লাহ যত জীব সৃষ্টি করেন, তাদের খানা-পিনা ও রিযিকের যিম্মাদারী মহান আল্লাহর উপর বলে তিনি ঘোষণা করেছেন।

"ছেলে হোক-মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট। আরো বেশী হলে, ওরা কম পাবে।" বলে যে প্রচারণা রয়েছে, এটা ইসলাম বিরোধী ও কুফরী কথা। এ ধরনের কথা দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

৬ষ্ঠ গুণ-বিপদাপদে স্বামীকে সাহায্য করা

নেক নারীর ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে-সে স্বীয় স্বামীর বিপদাপদ, বালা-মুসীবত ও সংকটময় মুহূর্তে নিজেকে স্বামীর সম্মুখে সাহায্যকারীণীরূপে উপস্থাপন করবে। যে কোন দুঃসময়ে স্বামীর পাশে ছায়ার মত হাজির থাকবে। স্বামীর বিপক্ষে কখনও অন্য কাউকে প্ররোচিত করবেনা।

যদি স্বামী দরিদ্র হয়, তাহলে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করে অল্পে তুষ্ট থাকবে, আলহামদু লিল্লাহ বলবে এবং স্বামীকে সান্ত্বনা দিবে এ কথা বলে যে, আপনি চিন্তিত হবেন না। আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যা রিযিক রেখেছেন-তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

স্বামীর ঋণের ব্যাপারেও সান্ত্বনা দিবে, সাহায্য করবে। তাকে কখনও হারাম উপার্জনে উদ্বুদ্ধ করবে না, হারাম খেতে দিবেনা। চুরি-ডাকাতী, ছিনতাই সহ শরীয়ত বিরোধী ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে স্বামীকে বিরত রাখবে।

যদি কারো স্বামী অবৈধ টাকার প্রাচুর্য গড়ে তোলে, তাহলে তাকে বুঝিয়ে সৎপথে নিয়ে আসবে। বলবে-হালাল রুযীতে আল্লাহপাক যা দেন, আমি তাতেই খুশী আছি। হারাম কামাই দ্বারা অতিসুখের বাড়ী-গাড়ী, স্বর্ণ-গয়না, আরাম-আয়েশ, ঐশ্বর্য চাই না। বলতে কি, অনেক স্বামী শুধু স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অবৈধ পথে পা বাড়ায়। এক্ষেত্রে স্ত্রী সংযমশীলতা গ্রহণ করে স্বামীকে বুঝিয়ে এবং অন্যায় আবদার না করে স্বামীকে কুপথ থেকে বাঁচাতে পারে।

অথচ দুঃখের বিষয়, আজকাল আমাদের সমাজে উল্টো দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নারীরা নিত্য নতুন কাপড় বানানো এবং নতুন নতুন সোফা সেট ক্রয় করা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে। তাদের চাই শুধু টাকা আর টাকা। হারাম হোক-হালাল হোক, টাকা চাই। তখন স্বামী বাধ্য হয়ে হারাম উপার্জন করছে, আর স্ত্রী আরামছে হারাম ব্যয় করছে। এ অভ্যাস পরিত্যাগ করে তাওবা না করলে, হারাম কামাই ও হারাম ভক্ষণের দরুণ কিয়ামতের দিন তাদের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

অতএব, স্ত্রীর কর্তব্য এই যে, তার গৃহে যদি হারাম উপার্জন, হারাম টাকা, হারাম মাল, হারাম মাছ-তরকারী আসতে থাকে, তাহলে স্পষ্ট ভাষায় উপার্জনকারীকে জানিয়ে দিবে যে আমাদের এমন হারাম উপার্জনের প্রয়োজন নেই। কষ্টে-তুষ্টে কাল কাটাবো, তবুও হারাম উপার্জন চাইনা। স্ত্রীর সৎপরামর্শে আশা করি স্বামী সংশোধন হয়ে যাবে। তাতে পরিবারের সবাই হারাম থেকে বেঁচে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পাবে।

সফল মুমিন নারীর এ সকল গুণাবলী দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য কল্যাণ ও সাফল্যের অবলম্বন হবে। তাতে তার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতই সার্থক ও শান্তিময় হবে। জান্নাত হবে তার অনাবিল সুখের ঠিকানা।

৭ম গুণ ঃ ধৈর্য ধারণ

মুমিন নারীর একটি মহৎ গুণ হচ্ছে- ধৈর্য ধারণ করা, অল্পে তুষ্ট থাকা। আল্লাহ তা'আলা যতটুকু সম্পদ দান করেছেন এবং স্বামীর দ্বারা সাধ্যমত খাওয়া-পরার যতটুকু বন্দোবস্ত হয়, তার উপর সন্তুষ্ট থেকে আলহামদু লিল্লাহ বলা নারীর কর্তব্য।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা বাস্তব সত্য যে, এ গুণ আজকাল নারীদের মধ্যে পাওয়া কঠিন। দিন দিন এ গুণটি নারীদের থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

হযরত মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলভী (রহঃ) একজন বড় মাপের ওয়ায়েজ ছিলেন এবং দিল্লীর ভাষা বলতেন। তার ওয়াজ বড় ব্যতিক্রমধর্মী, বড় আশ্চর্য ধরণের হত। তিনি ওয়াজে বলতেন, আপনি গৃহকে যত মাল-সামান, আসবাবপত্র দিয়ে পূর্ণ করে দিন না কেন, তবুও নারীরা বলবে কয়েকটা ছেড়া কাঁথা আর বালিশ ছাড়া আর কি-ই-বা আছে তোমার ঘরে?

এর মূল হেতু হচ্ছে এই যে, নারীরা নিজ ধ্যান-ধারণায়, চিন্তা-চেতনায়, মন-মানসিকতায় সামাজিকভাবে তার কতটুকু মর্যাদা, তার একটা মাপকাঠি তৈরী করে। অতঃপর প্রতিবেশী ধনী পরিবারের মত সেও তার মাপকাঠি অনুযায়ী নিজ গৃহকে সাজাতে চায়-স্বামীর সামর্থ থাকুক বা না থাকুক।

এজন্যই জনৈক বুযুর্গ বলতেন-স্ত্রী ও কন্যাদেরকে প্রতিবেশীর গৃহে যাওয়া-আসা করতে দিওনা। কেননা, ওখানে যেয়ে তারা ঘরের সমগ্র আসবাবপত্রের নিরীক্ষণ করবে, জরিপ চালাবে। অতঃপর নিজ গৃহের আসবাবপত্রের সাথে তুলনা করবে যে, তাদের গৃহে ঐ জিনিসটা আছে, আমাদের গৃহে নেই। তাদের কাপড়, পোশাক পরিচ্ছদ আমাদের থেকে একটু উন্নত অথবা তাদের অলংকার একটু দামী কিংবা তাদের সোফা সেটের ডিজাইনটা সুন্দর.... ইত্যাদি। তখন স্বামীর নিকট জোর দাবী শুরু হয়ে যাবে- যেখান থেকে হোক, এনে দিতেই

হবে। অন্যথায় অনশন, ধর্মঘট ও অশান্তি সৃষ্টির ধমকী দেয়া হবে। এসব নির্বোধ মহিলারা দেখেনা যে, অল্প আয়ের স্বামী বেচারা কোত্থেকে তার দাবী পূরণ করবে? অথবা ঐ জিনিষটা ক্রয় ঠিক হবে কি-না?

স্ত্রীদের জন্য এটা উচিত নয়। স্বামীর অবস্থা বুঝে তাদের চলা কর্তব্য।

৮ম গুণ ঃ কল্যাণকামী হওয়া

কল্যাণ আদান-প্রদান মুমিন নারীর একটি সুন্দর গুণ এই যে, সে যেখানে যাবে, সেখান থেকে হয় কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা সেখানে কল্যাণ রেখে আসবে।

কল্যাণ রেখে আসা বা কল্যাণ বয়ে নিয়ে যাওয়ার অর্থ এই যে, সে যেখানে যাবে, সেখানে স্বীয় দ্বীনদারী, আমানতদারী, ইবাদতগুজারী প্রভৃতি গুণের ছোঁয়া ও তার নিদর্শন রেখে আসা। প্রতিবেশী মহিলারা যেন বলতে বাধ্য হয়, অমুক মহিলা, অমুক প্রতিবেশীর গৃহকর্ত্রী এসেছিলেন, মা-শা-আল্লাহ! কত নেককার পরহেযগাঁর মহিলা, কত ভাল মহিলা!

তাকে দেখে যেন ঐ প্রতিবেশী মহিলাদের তার অনুকরণ-অনুসরণের আগ্রহ-উৎসাহ সৃষ্টি হয় এবং তার গুণ ও দ্বীনদারীর সাথে নিজেদের দ্বীনদারীর তুলনা করে অন্তরে অন্তরে লজ্জিত হয় অধিকন্তু আত্মশুদ্ধির আগ্রহও যেন তাদের অন্তরে সৃষ্টি হয়।

পরন্তু বাজে গল্প-গুজবের পরিবর্তে প্রতিবেশী মহিলাদেরকে দ্বীনের কথা শুনাবে, আমলের তারগীব দিবে, নামাযের দাওয়াত দিবে প্রভৃতি। উক্ত মুমিন নারী কোথাও গেলে যেমন এ দ্বীনী সুবাস দান করবে, তেমনি কেউ তার নিকট এলেও তাকে এ রকম দ্বীনী সুবাস দিবে।

পক্ষান্তরে কিছু কিছু নারীর স্বভাব এমন যে, তারা অন্যদের বাড়ীতে গিয়ে অযথা গল্প-গুজব জুড়ে দেয়, সময় নষ্ট করে। আবার তাদের দেখে শুধুমাত্র মন্দ গুণ বা দোষণীয় দিকগুলো অন্তরে গেঁথে নেয়, অতঃপর গীবত করে সকলের কাছে তা প্রকাশ করতে থাকে।

অথবা তারা সেখান থেকে দুনিয়াদারীর মুহাব্বত নিয়ে আসে। আর এ দু'টোই ক্ষতিকর। এ জন্য মহিলাদের প্রতিবেশীর বাড়ীতে বেশী আসা-যাওয়া করা অনুচিত। কেননা, তাদের উপর মন্দের প্রভাবটাই বেশি পড়ে।

কোন কোন সময় প্রতিবেশীর গৃহে যাওয়ানর প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে। তখন মুমিন নারীর জন্য আমাদের দেয়া পরামর্শ মেনে চলা কর্তব্য যে, সেখানে সে যেন দ্বীনের সুবাস ছড়িয়ে আসতে পারে।

এসব হাদীস নয় ২/১৩৫-১৪১ পৃ:

হাদীসের আলোকে নারীর ফযিলত ও মর্যাদা

১। একজন নেককার মহিলা ৭০ জন আউলিয়ার চেয়ে উত্তম।

২। একজন বদকার মহিলা এক হাজার বদকার পুরুষের চেয়ে নিকৃষ্ট

৩। একজন গর্ভবতী মহিলার দু'রাকাত নামায গর্ভহীন মহিলার ৮০ রাকাত নামাযের চেয়ে উত্তম।

৪। গর্ভবতী মহিলার প্রত্যেক রাত এবাদত ও দিনগুলো রোযা হিসাবে গণ্য করা হয়।

৫। একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ৭০ বৎসরের নামায-রোযার নেকী তার আমলনামায় লিখা হয়।

৬। প্রসবের সময় যে কষ্ট হয়, ব্যথা হয় প্রতিবারের ব্যথার কারণে হজ্বের ছওয়াব দান করা হয়।

৭। সন্তান প্রসবের ৪০ দিনের মধ্যে মারা গেলে তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করা হয়।

৮। যে মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করান তিনি প্রতি ফোঁটা দুধের বিনিময়ে একটি নেকী লাভ করেন।

৯। যদি বাচ্চা কাঁদে আর 'মা' কোন প্রকার বদ দোয়া না দিয়ে তাকে দুধ পান করান, আল্লাহ তাকে এক বৎসরের নামায ও এক বৎসরের নেকী দান করেন।

১০। যখন বাচ্চার দুধ পান করানো হয়ে যায়, তখন আসমান থেকে একজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে সে মাকে সুসংবাদ দান করে যে, আল্লাহ পাক তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

১১। যে মহিলা বাচ্চার কান্নার জন্যে ঘুমাতে পারেন না, তিনি ২০ জন গোলাম আযাদ করার নেকী পান।

১২। যে মহিলা তার অসুখের কারণে কষ্ট ভোগ করেন এবং তারপরও সন্তানের সেবা করেন আল্লাহ পাক ঐ মহিলার পিছনের সব গুনাহ মাফ করে দেন এবং ১২ বৎসরের ইবাদতের ছাওয়াব দান করেন।

১৩। স্বামী পেরেশান হয়ে ঘরে আসলে যে স্ত্রী স্বামীকে খোশ-আমদেদ বলে এবং সান্ত্বনা দেয় তিনি জেহাদের অর্ধেক নেকী লাভ করেন।

১৪। যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান, তখন আল্লাহ পাকও তাদের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান।

১৫। যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠান ও নিজেকে হেফাযত করেন এবং ঘরে থাকেন তিনি পুরুষের ৫০০ বৎসর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন এবং ৭০ হাজার ফেরেশতা তাকে স্বাগত জানাবে এবং তিনি হুরদের নেত্রী হবেন। তাকে বেহেশতে গোসল দেয়া হবে। সে ইয়াকুতের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবে।

১৬। যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, তার নামায ও অন্যান্য এবাদত আসমানের উপরে উঠে না।

১৭। যে স্ত্রী স্বামীর অনুরোধ ছাড়াই তাঁর পা দাবিয়ে দেন আল্লাহ পাক তাঁকে ৭ তোলা স্বর্ণ দান করার সওয়াব দান করেন। আর যদি স্বামীর অনুরোধের পর পা দাবিয়ে দেন, তাহলে ৭ তোলা রৌপ্য দান করার সওয়াব দান করেন।

১৮। স্বামী যখন মাঠ থেকে ঘরে ফিরে আসেন, তখন যদি স্ত্রী তাকে খানা খাওয়ান ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন খেয়ানত না করেন, তবে আল্লাহ পাক সে স্ত্রীকে ১২ বৎসরের নামাযের সওয়াব দান করেন।

১৯। স্বামী স্ত্রীকে একটি মাসআলা শিক্ষা দিলে ৮০ বৎসরের এবাদতের সমান সওয়াব পাবেন।

২০। যে পবিত্র মহিলা নামায-রোযার পাবন্দী করেন ও স্বামীর খেদমত করেন তার জন্য বেহেশতের ৮টি দরজা খুলে দেয়া হয়।

২১। যে মহিলা যিকিরের সাথে ঘর ঝাড়ু দেয় আল্লাহ পাক তাকে 'কাবাঘর' ঝাড়ু দেয়ার সওয়াব দান করেন।

২২। যে মহিলা নিজের জানোয়ারের দুধ দোহন করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলেন ঐ জানোয়ার তার জন্য দোয়া করে।

২৩। যে মহিলা বিসমিল্লাহ বলে খাবার প্রস্তুত করেন আল্লাহ তাআলা তার রুজির মধ্যে বরকত দান করেন।

২৪। যে স্ত্রী তার স্বামীর সন্তুষ্টি অবস্থায় মারা যায় তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব।

২৫। যে মহিলা পর্দা করে না, অন্য পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ঐ সমস্ত মহিলা বেহেশতে যাবে না, এমনকি বেহেশতের সুঘ্রাণও পাবে না।

২৬। যে মহিলা বেগানা পুরুষকে উঁকি মেরে দেখে আল্লাহ তাআলা ঐ মহিলার প্রতি অভিসম্পাত করেন। ভিন্ন পুরুষের জন্য বেগানা মহিলাকে দেখা যেমন হারাম তেমনি মহিলার জন্যও পুরুষকে দেখা হরাম।

২৭। দু'ব্যক্তির নামায মাথার উপর উঠে না (কবূল হয় না) (১) যে গোলাম তার মনিব থেকে পলায়ন করে এবং (২) ঐ মহিলা যে তার স্বামীর সাথে নাফরমানী করে।

২৮। যে পুরুষের স্ত্রী নেই তিনি হলেন ফকীর, আর যে মহিলার স্বামী নেই তিনি হলেন মিসকীন।

২৯। দুনিয়াতে প্রত্যেক কষ্ট সহ্যকারী মহিলা ফিরাউনের নেককার স্ত্রী আসিয়া-এর মত সাওয়াব পাবেন।

৩০। সকল জান্নাতীগণ আল্লাহপাকের সাক্ষাতের জন্য যাবেন, কিন্তু যে মহিলা দুনিয়াতে পর্দা করে চলবেন, আল্লাহ পাক স্বয়ং তার সাক্ষাতের জন্য আসবেন।

৩১। একজন দোযখী মহিলা ৪ জন বেহেশতী পুরুষকে নিয়ে দোযখে যাবেন-(১) পিতা (২) ভাই (৩) স্বামী (৪) নিজের ছেলে। এ মহিলা বলবে তারা আমাকে দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দেয়নি।

৩২। মহিলাগণ ঘরের খেদমত আনজাম দিলে গাজীদের সমান সওয়াব পাবেন।

৩৩। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে সেজদা করা জায়েয হতো তাহলে স্ত্রীদেরকে বলা হতো তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করতে।

১৭তম অধ্যায়

সন্তান লালন-পালন

সন্তানের চারিত্রিক প্রতিপালনে করণীয়

যেসব গুণাবলী আখলাক বা চরিত্রকে সুন্দর করে, সেগুলোকে উত্তম গুণাবলী বলে, আর যেসব চরিত্রকে কলুষিত করে, সেগুলোকে মন্দ গুণাবলী বলে।সন্তানদেরকে সেসকল গুণাবলীতে গুণান্বিত করা এবং মন্দ বিষয় থেকে দূরে রাখা পিতা-মাতার কর্তব্য।

ইসলামে সুন্দর চরিত্র ও উত্তম আখলাকের পরিধি অনেক বিস্তৃত।কারণ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইসলাম মহৎ জীবনের জন্যে সুন্দর ও কল্যাণকর রীতি-নীতির তা'লীম দিয়েছে। ইসলামের সেই সুন্দর ও উত্তম গুণাবলীর মধ্য থেকে মৌলিক কিছু গুণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে। সন্তানদেরকে এ গুণাবলীতে গুণান্বিত করতে পারলে, তাদের ভিতর উন্নত ও সুন্দর আখলাকের একটি মজবুত ভিত গড়া সম্ভব হবে বলে দৃঢ় আশা রাখি। সেই উত্তম গুণগুলো হচ্ছে-

১। সততা ও সত্যবাদিতা।

২। আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা।

৩। ধৈর্য ও সহনশীলতা।

৪। হায়া বা লজ্জাশীলতা।

৫। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতা।

৬। আত্মার প্রাচুর্য।

৭। ক্রোধ দমন।

৮। ইস্তিকামাত বা অবিচলতা।

৯। তাওয়াক্কুল বা আল্লাহরনির্ভরতা।

১০। দানশীলতা।

১১। ওয়াদা রক্ষা করা।

১২। হাসি মুখে কথা বলা।

১৩। মেহমানের মর্যাদা ও সম্মান করা।

১৪। বড়কে সম্মান ও ছোটকে স্নেহ করা।

১৫। ক্ষীণ স্বরে কথা বলা।

১৬। বিনয়ী হওয়া।

১৭। প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণ করা।

১৮। অহেতুক কথাবার্তা বর্জন করা।

১৯। গঠনমূলক বই-পুস্তক পড়া।

এছাড়াও সুন্দর চরিত্র গঠনমূলক আরো অনেক উত্তম গুণাবলী রয়েছে। তবে বর্ণিত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে, বাকীগুলো অর্জন করা সহজ হবে।

নিম্নে উপরোক্ত গুণগুলোর মধ্যথেকে কয়েকটিরর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা আলোচনা করা হল-

একঃ সততা ও সত্যবাদিতা

সততা ও সত্যবাদিতা তথা সত্য কথা বলা ও সত্যপরায়ণ হওয়া উত্তম চরিত্রের অন্যতম একটি গুণ। যে ব্যক্তির সত্য কথা বলার সুঅভ্যাস গড়ে উঠে, আল্লাহর দরবারে সে সত্যবাদী হিসেবে চিহ্নিত হয়। পার্থিব জীবনেও সে মানুষের আস্থা ও ভালবাসা লাভে সক্ষম হয়। সত্য কথা তাকে নেক ও সৎকর্ম করতে সহায়ক এবং জান্নাতে পৌঁছানোর মাধ্যম হয়।

তাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর রিওয়ায়াতের হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا

"নিশ্চয় সত্যবাদিতা বা সত্য কথা বলা মানুষকে সৎকর্মের পথে নিয়ে যায়। আর সৎকর্ম মানুষকে জান্নাতের পথে নিয়ে যায় এবং সত্য কথা বলতে বলতে মানুষ শেষ পর্যন্ত সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী)-এর মর্যাদা বা উপাধি লাভ করে।"

(বুখারী শরীফ)

বর্ণিত আছে, জনৈক গ্রাম্য সাহাবীর কিছু খারাপ অভ্যাস ছিল। যেমন-চুরি করা, যিনা করা ইত্যাদি। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এক শর্তে করতে পারি, আর তা হচ্ছে-তোমাকে মিথ্যা কথা বর্জন করতে হবে। তিনি এতে রাজী হন এবং তাঁর কাছে বাই'আত নিয়ে চলে যান। অতঃপর যখনই তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী কোন খারাপ কাজ করার ইচ্ছা হত, তখনই তাঁর মনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কৃত ওয়াদার কথা মনে পড়ত এবং মনে মনে বলতেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আমাকে এ ব্যাপারে কখনো জিজ্ঞেস করেন, তখন আমি কি বলব? যদি সত্য কথা বলি, তাহলে তিনি ইসলামী আইন অনুযায়ী আমার কৃত অপরাধ (যিনা, চুরি)-এর শাস্তি দিবেন। আর যদি মিথ্যা বলি, তাহলে তো রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যে ওয়াদা করেছিলাম, তা ভঙ্গ হবে। আর তার পরিণামও মারাত্মক। এসব চিন্তা করে তিনি সেসব কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করলেন। মুলতঃ এই সত্যবাদিতাই তাঁকে সকল অপকর্ম ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে নেক ও সৎকর্ম করার দিকে নিয়ে গেল।

সুতরাং সন্তানদেরকে প্রকৃত চরিত্রবান ও মুমিন-মুত্তাকী হিসেবে গড়তে হলে, তাদেরকে তাদের জীবনের প্রতিটি কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ও চাল-চলনে সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত করা একান্ত জরুরী।

দুইঃ আমানতকারী বা বিশ্বস্ততা

উত্তম আখলাক বা সুন্দর চরিত্রের আরেকটি গুণ হচ্ছে আমানতদারী বা বিশ্বস্ততা। আমানতদারীর গুরুত্ব ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিসীম। আমানতের সঠিক চর্চা ব্যতিরেকে সমাজ জীবনে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

ইসলাম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমানতের গুরুত্ব বর্ণনা করার সাথে সাথে একে পূর্ণ ঈমানের অন্যতম আলামত হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-لَادِيْنَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার মধ্যে (পূর্ণ) দ্বীন নেই।" (বাযযার)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ

"যার মধ্যে আমানতদারী নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই।" (বাযযার)

অপর এক হাদীসে মুনাফিকের লক্ষণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- اِذَاؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের একটি আলামত হচ্ছে– যখন তার কাছে কোন আমানত রাখা হয়, তখন সে তাতে খিয়ানত করে।"

উল্লেখ্য যে, আমানত শব্দটি ক্ষুদ্র হলেও এর পরিধি অনেক ব্যাপক। শুধুমাত্র কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাকেই আমানত বলা হয় না-যা আমরা সাধারণতঃ মনে করে থাকি, বরং এর সাথেও আমানতের

আরো অনেক প্রকারভেদ রয়েছে, যেমন-আল্লাহর দ্বীন উলামাগণের যিম্মায় আমানত, ডাক্তারগণের যিম্মায় রোগী আমানত, বিচারকের সামনে সত্য ও সঠিক ঘটনা উপস্থাপন করা সাক্ষী ও প্রত্যক্ষদর্শীগণের যিম্মায় আমানত, শিক্ষকের যিম্মায় ছাত্রের লেখাপড়া আমানত, সন্তানরা পিতা-মাতার যিম্মায় আমানত, কর্মচারীদের নিকট অফিসের কাজ আমানত এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট রাষ্ট্রের প্রতিটি জিনিস আমানত।

মোটকথা, যে যেই দায়িত্বে নিয়োজিত, তার উচিত সেই দায়িত্ব আমানত। তা সঠিকভাবে পালন করা তার একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

"যদি নিকট আমানত রাখা হয়েছে, তার উটিচত সেই আমানত আদায় করা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করা।" (সূরা বাক্বআরা, ২৮৩)

অপর আয়াতে আল্লাহপাক বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানত তার হকদারদের নিকট পৌঁছাতে নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা নিসা,৫৮)

তাই সন্তানের চরিত্রকে সুন্দর করতে হলে, তাকে আমানতদারীর গুণে গুণান্বিত করতে হবে। তার সামনে এর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে এবং তা সঠিকভাবে পালনে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তিনঃ ধৈর্য ও সহনশীলতা

উত্তম বা সুন্দর চরিত্রের আরেকটি গুণ ধৈর্যের গুণে গুণান্বিত হতে পারা, তাতে কখনো বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট বিচলিত করতে পারে না। কারণ, সে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হলে, এটাকে সে আল্লাহর মর্জি বলে মেনে নিবে এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশা করবে। মুখেও এ মনোভাবই ব্যক্ত করে বলবে- اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

("নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং আমরা সবাই তাঁরই নিকট ফিরে যাব")। (সূরা বাক্বারা, ১৫৬)

পবিত্র কুরআনে ধৈর্যশীলদের পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত প্রতিদান প্রদান করা হবে।"

(সূরা যুমার, ১০)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।" (সূরা বাক্বারা, ১৫৩)

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যকে সকল সৎগুণের মূল এবং সর্বোত্তম নিয়ামত বলে ঘোষণা করে ইরশাদ করেন–

اِنَّ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَلَنْ تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

"যে ব্যক্তি যাচনা (ভিক্ষা) থেকে বাঁচতে চায়, আল্লাহ তাকে যাচনা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। যে ধৈর্য অবলম্বন করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। এবং যে ব্যক্তি (মানুষ থেকে) অমুখাপেক্ষী থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করেন। আর ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তোমরা কিছুতেই প্রাপ্ত হওনি।" (বুখারী শরীফ)

অপর হাদীসে ধৈর্যকে ঈমানের অর্ধাংশ আখ্যায়িত করে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

"ধৈর্য ঈমানে অর্ধেক।"

হযরত উমর (রাঃ) বলেন-"আমরা সুখের জীবন ধৈর্যের মাঝেই পেয়েছি।" (বুখারী শরীফ) তেমনি আকাবিরগণের মাঝে একটি কথার প্রচলন আছে–

اَلنَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ

"আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যের সঙ্গে এবং ধৈর্য হচ্ছে সুখ-শান্তির চাবিকাঠি।"

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ধৈর্যকে তিন ভাবে ভাগ করা যায়ঃ

(এক) আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে ধৈর্য ধারণ করা।

(দুই) হারাম ও নাজায়িয তথা আল্লাহর নাফরমানী বর্জনে ধৈর্য ধারণ করা।

(তিন) যে কোন বিপদাপদ ও সংকটে (কষ্ট বা আঘাতের প্রথম মুহূর্ত থেকেই) ধৈর্য ধারণ করা।

উল্লেখ্য যে, এই সকল প্রকার ধৈর্যেরই অনেক ফজীলত রয়েছে। ধৈর্য যে শুধু পরকালীন কল্যাণই বয়ে আনে, তা নয়। ধৈর্যের সুফল পার্থিব জীবনেও পাওয়া যায়। যেমন, ধৈর্য মানুষের জীবনে স্বস্তি ও সফলতা বয়ে আনে, মানব জীবনের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখে এবং জীবনকে মর্যাদামন্ডিত করে তুলে। ধৈর্যশীল ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

অতএব, সন্তানদের চরিত্রকে সুন্দর ও মহিমান্বিত করতে হলে, তাদেরকে ধৈর্যের অনুশীলন ও তা'লীম দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

শিশুদের কান্নার কারণ ও প্রতিকার

ফুলের মত কচি প্রিয় মুখের দুধের শিশুরা কোন না কোন কারণে যখন কাঁদে তখন অন্যান্যদের মত কোন কোন মাও বিরক্তির আতিশর্যে ক্রন্দনরত শিশুর প্রতি মন্তব্য করে যে, "কাঁদা ছাড়া যেন ওর কোন কাজ নেই।" ক্ষিধে লাগুক বা কোলে চড়তে ইচ্ছে করুক, অথবা নিজের ইচ্ছার পরিপন্থী কোন কথা বা কাজ হোক, কিংবা কোন জিনিষ নিতে মনস্থ করুক-শিশু কাঁদতে শুরু করে দেয় এবং অধিকার ও মনের দাবীপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কাঁদতে থাকে। বিশেষ করে ক্ষিধে পেলে তো কাঁদেই। সম্ভবতঃ কুদরতীভাবে শিশুদের জানা হয়ে যায় যে, না কাঁদলে মা জননীও দুধ দিবে না। না চাইলে দুধ বিক্রেতার দুধ দেয় না। ক্রেতাকে প্রশ্ন করে, কতটুকু দুধ দেব? তারপর সে দুধ মেপে দেয়।

কচি কলিজার টুকরা অবুঝ শিশুদের সম্পর্কে কান্নার কারণে অলীক ও অসাড় মন্তব্য করা উচিত নয়। শিশুরা নিষ্পাপ, মা'সুম, অবুঝ। বড়দের মত চালাক, চতুর, বুদ্ধিমান হয় না যে, স্বার্থ হাসিলের জন্য অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কাঁদবে। শিশুরা বিনা কারণে বা অপ্রয়োজনে কাঁদে না-এ কথা প্রতিটি মায়ের স্মরণ রাখতে হবে। কি কি কারণে শিশুরা কাঁদে তার কিছু তথ্য তুলে ধরা হল ঃ

* জন্মের পর শুধু প্রাথমিক দিনগুলোতে অধিকাংশ শিশুর কাঁদা তাদের জন্মগত, মজ্জাগত স্বভাব। যেমন, দু'সপ্তাপ বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশু প্রতিদিন গড়ে দু'ঘন্টা করে ক্রন্দন করে। এক থেকে তিন মাসের শিশুরা সন্ধ্যা বা রাত্রের শুরুলগ্নে কিছুক্ষণ অবশ্যই ক্রন্দন করে আত্মপ্রশান্তি লাভ করে থাকে। এর চেয়ে সামান্য বড় অর্থাৎ পাঁচ/ছয় মাস বা তার অধিক বয়সের শিশুরা হাত-পা নেড়ে, দাপা-দাপি করে খেলাধুলা করতে চায়। তাদেরকে বিছানায় কিংবা দোলনায় শুইয়ে দিলে কাঁদতে আরম্ভ করে।

দরজার আংটা বা শিকলের ঝংকার শিশুদের মনোরঞ্জনের খোরাক জোগায়। খেলনা বা ঝুনঝুনির মিষ্টিমধুর আওয়াজে শিশুরা কান্না ভুলে গিয়ে ফোকলা দাঁতে হাসতে শুরু করে। কিন্তু যদি অনবরত কাঁদতেই থাকে, আর চুপ করার নামও না নেয়, তখন কিন্তু বুঝতে হবে যে, এটা নিছক কান্না নয়, বরং কোন রহস্য আছে। পেটে অথবা শরীরে নিশ্চয় কোন ত্রুটি বা অসুবিধা দেখা দিয়েছে। তখন অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ করুন।

* ক্ষুধার কারণেও শিশুরা কাঁদে, খ্যান খ্যান করে। অধিকাংশ শিশুর দু'তিন ঘন্টা পর পরই ক্ষুধা পায়। দুধ পান করালেই চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে।

* পিপাসার কারণেও শিশু কাঁদে। গরম কালে এবং জর চলাকালে শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে ঘাম নির্গত হয়। তাই শিশুদের বার বার পানির পিপাসা পায়। পিপাসার সময় পানি না পেলে কাঁদতে থাকে। যদি সামান্য পানি পান করানো হয়, তাহলে তৎক্ষনাত চুপ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা খেলতে থাকে। অনেক মা-ই পিপাসার কারণে শিশুর কান্নার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারেন না। বরং ক্রন্দনরত শিশুর উপর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে থাকেন-কাঁদুক, যত মনে চায় কাঁদুক।" কোন বিবেকবান আদর্শ মায়ের জন্য এ আচরণ সমীচীন নয়। এটা সরাসরি ঐ অবুঝ শিশুর উপর জুলুমের শামিল।

* পেশাবে ভিজে যাওয়ার কারণেও শিশু কাঁদে। কাঁথা, লেপ বা প্যাক করা প্যান্ট পেশাবের পানিতে ভিজে গেলে, শিশু ঝভ্রাটাবস্থা অনুভব করে, তাই কাঁদতে থাকে। ভিজে কাঁথা অথবা পেশাব প্লাবিত জামা পরিবর্তন করে দিলে চুপ হয়ে যায়। কোন কোন মা নিজ সুবিধার্থে শিশুকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত PAM PAR অথবা প্যাকিং করা প্যান্ট পরিয়ে রাখে, যাতে করে বার বার প্যান্ট বা কাঁথা পরিবর্তন করার ঝামেলা পোহাতে না হয়। এটা করা উচিত নয়। এটা অবুঝ শিশুর প্রতি মায়ের পক্ষ থেকে জুলুমের নামান্তও। এতে শিশুর শারীরিক বর্ধন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়।

* পাতলা পায়খানা হওয়ার কারণেও শিশুরা কাঁদে। যদি বাচ্চার পাতলা পায়খানা বা আমাশয় দেখা দেয়, তখন বার বার পায়খানা জনিত কষ্ট অথবা পেট ব্যথার কারণে শিশু কাঁদতে থাকে।এক্ষেত্রে স্যালাইন খাওয়ানো ও ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।

* চুলকানীর কারণেও শিশু কাঁদে। শিশুরা শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে দুই উরুতে অথবা লজ্জাস্থানে চুলকানী, দাউদ, একজিমা জনিত কষ্টে কাঁদতে থাকে। এর চিকিৎসা হল-জ্বলা নিরামক কোন ঠান্ডা ক্রীম ব্যবহার করা। ক্রীম ব্যবহার অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শক্রমে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* পেট ব্যথা ও পেটের গ্যাস হওয়ার কারণেও শিশু কাঁদে। গ্যাসজনিত কারণে পেট মোচড়ানো, পেট কামড়ানো দুধের শিশুর কাঁদার হেতু। যদি দুধপান করানো পর শিশুকে বুকের সাথে লাগিয়ে ঢেকুরের মাধ্যমে পেটের গ্যাস গলা দিয়ে নিঃসারণ করিয়ে দেয়া যায়, তাহলে হয়ত শিশু পেটের ব্যথায় কাঁদবে না। কিন্তু ঢেকুরের মাধ্যমে গ্যাস বের করার পরও যদি শিশু একাধারে কাঁদতে থাকে, তাহলে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্বরণাপন্ন হোন।

* একাকীত্বেও কারণেও শিশুরা কাঁদে। শিশু যদি কামরায় একাকী ঘুমায় এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আশে-পাশে কাউকে দেখতে না পায়, তখন বেজার

হয়ে কাঁদতে থাকে। শিশুরা নির্জনতা ও একাকিত্বকে খুব ভয় পায়। এমতাবস্থায় কোলে নিয়ে মন ভোলানোর চেষ্টা করলে, চুপ হয়ে যায়।

* দাঁত ওঠার সময়ও শিশুরা কাঁদে। যখন শিশুর প্রথম দাঁত উঠতে শুরু করে, তখন দাঁত উঠার ব্যথায় কাঁদতে থাকে।

ঔ শিশুদের নিদ্রা যদি পূর্ণ না হয,তাহলেও শিশুরা কাঁদতে থাকে। তাছাড়া নিদ্রার বেগ হলে, যদি মা ঘুম পাড়াতে বিলম্ব করে অথবা ঘুমাবার উপযোগী জায়গা না পায়, কিংবা ঘুম পড়ার বিছানা মন মত না হয়, তাহলেও শিশুরা কাঁদতে থাকে।

* জ্বর, সর্দি ও কাশির কারণেও শিশুরা কাঁদে। শিশুর যদি জ্বর, সর্দি, কাশি হয় তখনও বিতৃষ্ণার কারণে সে কাঁদে। জ্বর বা সর্দিও প্রচন্ডতায় শিশুর মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়া, নিদ্রা-জাগরণ কিছুই ভাল লাগে না। ভাল লাগে শুধু কান্না আর কান্না। শিশুর এ নাজুক পরিস্থিতি মাকে খুবই ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে সামাল দিতে হবে।

* অনেক সময় শিশু কানের ব্যথায়ও কাঁদে। কথা দিয়ে বুঝাতে পারে না বলে বার বার কানে হাত দেয়। এতে মায়ের বুঝে নিতে হবে যে, নিশ্চয় কানে কিছু হয়েছে।

* মাথা ধরার কারণেও শিশু কাঁদে। জ্বর বা সর্দির প্রচন্ডতায় অবুঝ শিশুর মাথা ধরতে পারে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে পারে। তখন শিশুর মাথা ও কপাল প্রচন্ড গরম হয়ে যায়। মাথা ব্যথার কারণে শিশু কাঁদতে থাকে।

অনেক মায়েরা কান্নার প্রকৃত কারণ উদঘাটন না করেই শিশুকে ধমকাতে থাকে।

অনেক মায়েরা কান্না থামানোর জন্য মুখ চেপে ধরে। কেউ কেউ গালে চড় কষে দেয়। এটা শিশুর প্রতি সরাসরি জুলুম। এতে শিশু মারাত্মক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন তাকে যে-ই কোলে নিতে চায়, আশ্রয় মনে করে তার কোলে চলে যায়।

যদি শিশু দুধ পান করা ছেড়ে দেয়, চেহারায় রোগের ছাপ লেগে থাকে, জ্বরে আক্রান্ত হয়ে, ডায়রিয়া দেখা দেয়, অস্থিরতায় ভোগে, সারাক্ষণ কাঁদতেই থাকে, তাহলে কিছুমাত্র বিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন শিশু বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হোন। আর সদাসর্বদা শিশুর স্বাস্থ্য, সুস্থ্যতা ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করতে থাকুন।

কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলত

ইসলামপূর্ব যুগে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে নারীর করুণ চিত্র, দুঃখ-দুর্দশা, লাঞ্ছনা-গঞ্ছনা সম্পর্কে পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। সেই সাথে এও জানেন যে, চরম অবমাননার শিকার এই নারী জতিকে ইসলাম কী পরিমাণ মর্যাদা প্রদান করেছে। জ্ঞাত এই বিষয়টির চর্বিত চর্বণ না করে ভিন্ন আঙ্গিকে কিছুটা আলোচনা সে সব লোকের জন্য পরম সুসংবাদ, যাঁরা সন্তুষ্ট চিত্তে কন্যা-ভগ্নির লালন-পালন করেন, তাদের এলেম শিক্ষা দেন এবং সুপাত্রস্থ করতে সজাগ থাকেন।

অবলা, পুরুষনির্ভর এই নারী জাতির প্রতি সহমর্মিতা, সদাচার এবং তাদেরকে লালন-পালন করার তাগিদ দিতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির তিনজন কন্যা সন্তান কিংবা তিনজন ভগ্নি থাকে অথবা দুইজন বা একজন কন্যা অনুরূপ সংখ্যাক ভগ্নি থাকে; অতঃপর সে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, তাদের হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত। (তিরমিযী ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩)

হাদীসে উত্তম আচরণ বলতে উদ্দেশ্য হলো তাদের জন্য যেসব ওয়াজিব হক রয়েছে তা আদায় করার সাথে সাথে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেন, হাদীসে বর্ণিত এই সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা কন্যা, ভগ্নিকে বিবাহ দেয় কিংবা মৃত্যু পর্যন্ত সুনজরে দেখবে। উল্লেখ্য যে, হাদীসটি আম তথা ব্যাপক। তিনকন্যার প্রতিপালনকারীর জন্য যেমন হাদীসে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, এক কিংবা দুই কন্যার অধিকারীর জন্যও অনুরূপ সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যাদের ঘাড়ে বোনের লালন-পালনের দায়িত্ব বর্তায় তারা একাজকে বোঝা মনে না করে পরম সৌভাগ্য হিসেবে বরণ করতে পারেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যার উপর এসব কন্যা কিংবা বোনের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয় এবং এতে সে বিরক্ত না হয়ে ধৈর্য ধারণ করে, তার এবং জাহান্নামের মধ্যে এই দায়িত্ব পালন প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে। (প্রগুক্ত, প্রঃ ১৩)

লক্ষণীয় যে, হাদীসে 'উবতুলিয়া' শব্দ এসেছে। যার অর্থ বিপদে ফেলা। স্বাভাবিকভাবেই মানুষ কন্যা সন্তানকে নিজের জন্য বিপদের কারণ মনে করে বিধায় হাদীসে এরূপ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু হাদীসের মূল অর্থ হলো পরীক্ষা করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কন্যা সন্তান দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন-কে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় আর কে ব্যর্থ হয় তা দেখার জন্য। কত বড়

সুসংবাদ যে, অন্য কোন গুনাহের কারণে যদি শাস্তির যোগ্যও হয় তথাপি আল্লাহ তা'আলা এই মহান গুরু দায়িত্ব পালনের খাতিরে তাকে ক্ষমা করবেন।

একজন সত্যিকার মুমিন, আশেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে ভীত ব্যক্তি এই হাদীস নিজের জীবনে পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। ইসলামের সফলতা ঠিক এখানেই যে, একজন মানুষ তার ঔরসজাত কন্যা কিংবা বোনকে প্রতিপালন করেও জান্নাতের অধিকারী হচ্ছে। এদের ব্যাপারে সুসংবাদের বাণী এখানেই শেষ নয়। আরো বহু হাদীসে কন্যা ও ভগ্নি লালন-পালন, তাদের দ্বীনি শিক্ষা প্রদান এবং শেষ পর্যায়ে সুপাত্রস্থ করার ফযীলতের কথা বলা হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, একবার জনৈক মহিলা দু'টি কন্যা সন্তান নিয়ে আমার কাছে আগমন করে কিছু খাবার চাইল। কিন্তু সে সময় আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া অন্য কিছুই না। ঐ খেজুরটিই আমি তাকে দান করলাম। কিন্তু সে নিজে খেজুরটি না খেয়ে কন্যা দুইজনের মধ্যে ভাগ করে দিল। অতঃপর সে আমার কাছে থেকে বিদায় নেয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। আমি তাঁকে ঘটনাটি শোনালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যাকে এসব কন্যা-বোনের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং দোযখের মধ্যে এই কন্যা-ভগ্নি প্রতিবন্ধকতার দেয়াল হিসেবে খাড়া হয়ে যাবে।

(তিরমিযী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩ বোখারী ১ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ, মুসলিম. ইবনে মাজাহ)

আরো বড় সুসংবাদ হল! কন্যা সন্তানকে যথার্থ মূল্যায়নকারীর মর্যাদা কত উঁচুতে তা নিম্নের হাদীস দ্বারা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুইজন কন্যা সন্তানের বোঝা বহন করবে তথা উত্তমভাবে লালন-পালন করবে। আমি এবং সে এই দুই আঙ্গুলের মত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করব। এই বলে তিনি শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন।

(তিরমিযী, মুসলিম)

দুই আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন যে. এই দায়িত্ব পালনের কারণে তার মর্যাদা এত পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে যে, আমার কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে। অন্য দু'একটি আমলের ক্ষেত্রেও এরূপ বলা হয়েছে যে, এই আমল করতে পারলে সে আমার কাছে জান্নাতে থাকতে পারবে। কিন্তু এখানে বলার গুরুত্ব. তাৎপর্য আরো বেশি। আরো জোরালো।

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা কন্যা সন্তান কিংবা বোন লালন-পালনের ফযীলতের কথা জানা গেল। আর এর চেয়ে বড় ফযীলতের কথা আর কী হতে পারে যে, এরূপ ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে জান্নাতে মিলিত হওয়ার সুযোগ লাভ করবে! একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, লালন-পালন,. শিক্ষাদান এবং সুপাত্রস্থ করার যে সব ফযীলতের কথা বলা হলো তাহলো কন্যার ক্ষেত্রে, পুত্র সন্তানের কথা বলা হয়নি। অতএব যারা পুত্র সন্তান জন্মলাভের আনন্দে মণ মণ মিষ্টি বিতরণ করেন, অথচ কন্যা সন্তানের সংবাদে চেহারা ছাই বর্ণের হয়ে যায়, তারা এ থেকে যথার্থ শিক্ষা নিতে পারেন। পারেন সকল রকম সংকীর্ণতা, হীনন্মন্য, বৈষম্যতা ভুলে এক আলোর ভুবন গড়তে। যে ভুবনে কন্যার আগমন বিষাদের কালিমা ছড়াবে না, মুখে ছাই মাখিয়ে দিবে না বরং তার আগমন হবে সবার জন্য আনন্দের বার্তা, অফুরন্ত ফযীলত লাভের অনুপম সুযোগ। কন্যা সন্তানের গর্বিত পিতা হয়ে কিংবা বোনের গর্বিত ভাই হয়ে রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে যেন আমরা উপস্থিত হতে পারি। আমীন।

মায়ের দুধ ঃ শিশুর হক

বুকের দুধের উপকারিতা

এক কথায় বলা যায়, বুকের দুধের উপকারিতা ও গুণাবলী অপরিসীম। নিম্নে শিশুর জন্য মায়ের বুকের দুধের উপকারিতা সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধৃত হল।

❖ মায়ের বুকের দুধ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শিশুর উপযোগী করে তৈরী থাকে, এতে সহজ পাচ্য আমিষ থাকে, তাই পুষ্টিহীনতার সম্ভাবনা থাকে না। অনুরূপভাবে বুকের দুধে সঠিক ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ চর্বি থাকে বলে এ দুধ গ্রহণে শিশুর অতিরিক্ত মোটা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

❖ বুকের দুধে সব ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে এবং তাতে যথেষ্ট পরিমাণ পানি থাকে। সতরাং জন্মের পর থেকে ছয় মাস পর্যন্ত শিশুকে পৃথক কোন খাবার বা পানি দেয়ার প্রয়োজন হয় না; বরং উল্লিখিত সময় পর্যন্ত একমাত্র বুকের দুধই শিশুর পরিপূর্ণ পুষ্টি যোগায় এবং শিশুকে স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে উঠতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

❖ বুকের দুধ চুষে খেতে হয় বলে তা শিশুর চোয়াল ও দাঁতের সঠিক গঠনে সহায়তা করে।

❖ বুকের দুধ শিশুর পক্ষে সহজে হজম করা সম্ভব হয়।

❖ শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায় এই মাতৃদুগ্ধ।

❖ অনুরূপভাবে শিশুর বুদ্ধি ও মেধা বিকাশে মায়ের দুধের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূণ।

❖ মায়ের দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ডাইরিয়া, নিউমোনিয়া, কান পাকা, শ্বাসনালীর সংক্রমণ ইত্যাদি রোগের প্রকোপ ও তীব্রতা ব্যাপকভাবে হ্রাস করে।

❖ মায়ের দুধে জীবাণুনাশক ল্যাকটোফেরিন থাকায় তা বাইরে রেখে দিলেও দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জীবাণুমুক্ত থাকে। কৃত্রিম কোন খাবারে এ গুণ নেই। এজন্য কর্মজীবী মায়েরা কর্মস্থলে যাবার আগে পরিষ্কার পানিতে ফুটানো ঢাকনা বিশিষ্ট পাত্রে বুকের দুধ চেপে বের করে রেখে যেতে পারে এবং ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত এই দুধ নির্বিঘ্নে খাওয়ানো যেতে পারে।

সর্বোপরি শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ফলে মা ও শিশুর মধ্যকার চমৎকার বন্ধনটি অধিকতর দৃঢ় হয়, যা পরিবারের অন্যান্যের মাঝেও প্রতিফলিত হয়।

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোতে মায়ের শারীরিক উপকারিতা

মায়ের দুধে যে কেবল শিশুরই উপকার সাধিত হয় তা নয়; বরং শিশুকে যথানিয়মে মায়ের দুধ খায়ানোর ফলে প্রসূতি মায়েরও বহুবিধ উপকার ও কল্যাণ সাধিত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গবেষণার আলোকে বর্তমানে এটা সুপ্রমাণিত এবং সুবিদিতও। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ফলে প্রসূতি মায়ের যে উপকারগুলো সাধিত হয়, তা নিম্নে প্রদত্ত হল।

❖ জন্মের সাথে সাথে বাচ্চাকে মায়ের বুকের দুধ চুষতে দিলে মায়ের জরায়ুতে এক ধরনের সংকোচন হয়, যার ফলে গর্ভফুল তাড়াতাড়ি পড়তে সহায়তা হয় এবং প্রসবের পররক্ত ক্ষরণ কমে যায়। কাজেই মায়ের রক্তস্বল্পতা কম হয়।

❖ শিশুকে নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ালে স্তনে দুধ জমতে পারে না,কাজেই দুধ জমে স্তনে ব্যাথা হয় না। বা প্রদাহ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

❖ গবেষণার আলোকে দেখা গেছে। যে সকল মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ায়, তাদের স্তনে ও জরায়ুতে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

❖ জন্মের পর থেকেই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে মায়ের গর্ভবর্তী হওয়ার আশঙ্ক কম থাকে।

❖ তাছাড়া শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর ফলে মায়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং শারীরিক সৌন্দর্যও ঠিক থাকে।

সফল মাতৃদুগ্ধ নিশ্চিতকরণে আমাদের করণীয়

মায়ের দুধের সুবিধাগুলো শিশুর পুরোপুরিভাবে পেতে হলে সফল মাতৃদুগ্ধ দান নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে পরিবারস্থ লোকদের সতর্ক দৃষ্টি ও প্রসূতি মাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান একান্ত জরুরী। সফল মাতৃদুগ্ধ দান নিশ্চিতকরণে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন-

❖ গর্ভাবস্থা থেকেই শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য গর্ভবতী মহিলার মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

❖ সেজন্য গর্ভাবস্থায় মায়ের খাদ্য ও পুষ্টির দিকে বিশেষ ভাবে নজর দিতে হবে এবং স্তনের যত্ন নিতে হবে।

❖ সন্তান প্রসবের পর পরই শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। এ ব্যাপারে প্রসূতিকে অন্যদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

❖ এ কথা ভালভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিশুর প্রথম খাবার হচ্ছে মায়ের দুধ; সুতরাং কোন অবস্থাতেই তাকে মধু, চিনি বা মিছরির পানি ইত্যাদি খাওয়ানো যাবে না। কারণ, এর ফলে শিশুরা বুকের দুধ খেতে চায় না। উপরন্তু এগুলো শিশুদের হজমের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

❖ মায়ের স্তনে পর্যাপ্ত দুধ আসার জন্য তাকে যথেষ্ট পরিমাণ সুষম খাবার খাওয়াতে হবে।

❖ শক্ত খাবারের সাথে সাথে দৈনিক তরল পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে; যেমন- দুধ, ডাবের পানি, মাছের ঝুল ইত্যাদি।

❖ প্রসূতি মাকে প্রয়োজনিয় বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। সেই সাথে তাকে অধিক প্ররিশ্রমের কাজ থেকে রেহাই দিতে হবে।

❖ ঘা শুকানোর জন্য প্রসূতিকে শুকনা খাবার দিতে হয়-এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এর ফলে দুধ কম তৈরী হয়।

❖ শিশুর যখন ক্ষুধা পাবে এবং যতবার সে দুধ খেতে আগ্রহী হবে ততবারই তাকে বুকের দুধ খাওয়াতে হবে। শিশু মায়ের স্তন যত খালি করে রাখবে তত বেশি দুধ উৎপন্ন হবে।

❖ শিশুর বয়স পাঁচ মাস পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র তাকে বুকের দুধই খাওয়াতে হবে।

❖ শিশুকে বোতলে দুধ খাওয়ানো বর্জন করতে হবে। এমন কি কনো চুষনীও তাকে দেয়া যাবে না।

শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোর সময়সীমা

জন্মের পর থেকে আরম্ভ করে সাধারণত দু'বৎসর পর্যন্ত তাকে বুকের দুধ খওয়াতে হবে। সুতরাং জন্মের পর পরই শিশুর শরীর পরিষ্কার করে তাকে বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত। শিশুর কোমল শরীরের মৃদু স্পর্শ মায়ের দেহ ও মনে এক অনাবিল্ প্রশান্তি এনে দেয়। কাজেই মোটা কাপড় দিয়ে শিশুর শরীর না পেঁচিয়ে খালি শরীরেই তাকে মায়ের নিকট নেয়া উচিত (তবে ঠাণ্ডা লেগে যাওয়ার ভয় থাকলে শিশুর গায়ের উপর দিয়ে তোয়ালে বা কাঁথা দিয়ে রাখা যেতে পারে) এর ফলে বাচ্চা গুরুতর অসুস্থ না হলে সে মায়ের স্তনের বোঁটা ধরতে চেষ্টা করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তা চিনে নেয়ার পর বোঁটা চুষতে আরম্ভ করে। ফলে স্তনে দুধ আসা নিশ্চিত হয়। এ সময় বাচ্চার মুখে কেবল স্তনের বোটা না দিয়ে, স্তনের চারপার্শ্বের কালো চমড়াও ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ, প্রকৃতপক্ষে দুধ থাকে চামড়ার নিচে।

জন্মের পর পরই শিশু মায়ের স্তন থেকে হলদেটে বর্ণের যে দুধ খেয়ে থাকে এটাকে বলা হয় শাল দুধ, অনেকের ধারণা, শাল দুধ দূষিত। সুতরাং তারা শিশূকে এ দুধ খাওয়োনো থেকে বিরত রাখে। অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে- এই শাল দুধ খুবই পুষ্টিকর।

এ সময় শিশুকে অন্য কোন খাবার এমনকি পানি পর্যন্ত খেতে দেয়া যাবে না। কারণ, এতে শিশুর পেটের পীড়া দেখা দেওয়ার এবং পেট ফেঁপে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ শিশুকে ছয় মাস পর্যন্ত কেবল বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। সুতরাং শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে তার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে তাকে মাতৃদুগ্ধ দান নিশ্চিত করা সকলের অপরিহার্য কর্তব্য।

সন্তানকে শাসন করার পদ্ধতি

নিঃসন্দেহে সমস্ত মা-ই নিজ নিজ সন্তানকে ভালবাসেন, আদর সোহাগ করে থাকেন, স্নেহ-মমতা দিয়ে তাদের ঢেকে রাখেন। কোন কোন মা তো খুব বেশী-ই আদর-সোহাগ করেন। এই আদর-সোহাগ-স্নেহ-মায়া কোন কোন শিশুর জীবনের পাথেয় হয়ে ভবিষ্যতে তাকে "মহান ব্যক্তিত্ব" রূপে সমাজে প্রতিষ্টিত করে এবং কোন কোন শিশুকে অজ্ঞ, অমানুষ, অশিক্ষিত, অভদ্র, অবাঞ্ছিত রূপে সমাজে ধিকৃত করে তোলে।

এর কারণ হল-আদর-সোহাগ, মায়া-মমতা করার স্থান, কাল, পাত্র বুঝতে পারা, চিনতে পারা অথবা চিনতে ভুল করা। যেমন, সে সময়টায় করণীয় ছিল মায়ের পক্ষ থেকে শিশুকে সান্ত্বনা দেয়ার, স্নেহ করার, সে সময়ে তাকে শাসন করা, ধমকী দেয়া, ভয় দেখানো বিরূপ ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর যে সময়টায় করণীয় ছিল তাকে সতর্ক করার, শাসন করার, সে সময়ে তাকে আদর-সোহাগ করা, ধন্যবাদ দেয়া তাকে বেপরোয়া করে তোলে। এটা শিশুর জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর।

উপমা স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন-শিশু আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে বা বেড়াতে যেয়ে "আল্লাদপনা" শুরু করেছে এবং দস্ত রখান থেকে বা প্লেট থেকে কিংবা ট্রে থেকে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় কিছু খাচ্ছে, কিছু ছড়াচ্ছে, ফেলাচ্ছে। দৌড়া-দৌড়ি, হৈ হুল্লোড় করছে। তখন তার এ দৃশ্য দেখে মা জননী আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বগর্বে উপস্থিত মেহমানদের সম্বোধন করে বলছেন, দেখ, দেখ, আমার বাচ্চাটা কেমন নির্ভীক, সাহসী! এখানে কত সুন্দর মনটা ভরে তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। অথচ আমার ঘরেখেতেই চায় না। থাক, মনটা ভরে খাক। যেভাবেই খেতে চায় খাক। কেউ বাধা দিও না। এটা অনুচিত। বরং বাড়ীতে ফেরার পর সন্তানকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে কঠোর ভাবে বুঝানো উচিত যে, "প্রিয় বৎস! খাদ্র দ্রব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাওয়া বা ফেলে দেয়া খুবই খারাপ অভ্যাস। এমন নোংড়া স্বভাব তো ঐ সমস্ত শিশুদের থাকে- যারা কোন দিন এমন খাদ্য চোখে দেখে না বা এমন খাদ্য খাওয়া যাদের ভাগ্যে জোটে না। আল্লাহ তা'আলার কত বড় অনুগ্রহ আমাদের প্রতি যে, তিনি আমাদেরকে পানাহারের জন্য কত নেয়ামত দান করেছেন। যদি তুমি এমনটি কর, তাহলে তা হবে আল্লাহর নাশুকরী, অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে যা কিছু আমাদেরকে দান করেছেন, তা ছিনিয়ে নিবেন। আর তখন আমরা গরীব হয়ে যাবো। সুতরাং আগামীতে এমনটি কখনও করবে না।" এমন নসীহত আর কঠোর শাসন না করে যদি শিশুকে উৎসাহিত করা হয়, সাবাস দেয়া হয়, ধন্যবাদ দেয়া হয়, তাহলে তা হবে শিশুর সাথে খিয়ানত ও প্রবঞ্চনা।

যদি কারো শিশু সন্তানের মধ্যে এমন ঘৃণ্য অভ্যাস থাকে, তাহলে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে কিছু পানাহার করিয়ে নেয়া উচিত। কারণ, শিশুদের পেট শান্ত থাকলে মনটাও শান্ত থাকে। এটা অনেক মায়ের পরীক্ষিত। তাই এটা অনেক মায়ের জন্য লক্ষণীয়।

এমনিভাবে লক্ষণীয় এই যে, কোন কোন শিশুর জন্য এমনও হয় যে, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, তবুও ঘুমাচ্ছে না বা কোন বস্তুর জন্য জেদ ধরে কাঁদছে। তখন অনেক মা আদর সোহাগ করে শান্ত করার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ গরম মেজাজে শাসিয়ে দেয়, অথবা এমন বলে যে, আরে অলক্ষুণে ঝঞ্ঝাট! ঘুমাচ্ছিস না কেন? সারা দিন জ্বালিয়েছিস, এখন রাতেও বিরক্ত করছিস? একটু শান্তিতে ঘুমাতে দে। জানি না, তুই আমার ঘরে জন্ম নিলি কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে থাকে। অথচ তখন মায়ের করণীয় ছিল এই যে, যদি সে কোন কেচ্ছা-কাহিনী শ্রবণ করার জন্য জেদ করে, তাহলে তাকে কোন সাহাবীর ঈমানদীপ্ত সাহসিকতার ঘটনা শুনিয়ে দেয়া। আর যদি ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদতে থাকে, তাহলে তাকে কিছু আহারের ব্যবস্থা করা। আর মাথায় স্নেহ মাখা হাত বুলিয়ে তার জন্য দোয়া করা। সুতরাং শিশুদের আখলাক-চরিত্রও স্বভাব বিগড়ে যাওয়ার এটাই কারণ যে, যে সময়টা ছিল আদর-সোহাগ ও সান্ত্বনা দেয়ার, সে সময় তাকে শাসানো ও ধমকানো হল। এটা তার জন্য বড়ই ক্ষতিকর।

শিশুদের বদ স্বভাব প্রতিরোধে মায়ের করণীয়

শিশুদের বদস্বভাব, অসদাচরণ ও অপছন্দনীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় এটা-যা দূর করার এবং তার মূল উৎপাটন করার জন্য প্রতিটি মা-ই সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকে, কিন্তু শিশু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কেন যেন আরো বেশী সে কাজে আকৃষ্ট হয়। মা হয়ত চাচ্ছেন, সন্তান পুনরায় যেন দুষ্টামী না করে, কিন্তু সে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি ভুলে যেয়ে সে কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তার এ স্বভাব কি কোন দিন পরিবর্তিত হবে না? অবশ্যই হবে। তবে মায়ের জন্য প্রয়োজন-কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য-সহ্য ও বিনম্রতার। এক্ষেত্রে ক্রোধ ও উত্তেজনা পরিহার অপরিহার্য।

আদর্শ মায়ের জন্য এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, শিশুর আচরণগুলো শিশুসূলভ হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। শিশুর প্রতিটি কাজ-কর্ম, কথাবার্তাকেই যদি দোষণীয় বিবেচনা করা হয় এবং ডাইরেক্ট এ্যাকশন হিসেবে তৎক্ষণাৎ কিছু উত্তম মাধ্যম দেয়া হয়, তাহলে তা হবে শিশুর জন্য খুবই ক্ষতিকারক। এতে শিশুর মন ভেঙ্গে যাবে এবং সংশোধনের পরিবর্তে আরো বেশী বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, একবার এক ভদ্র মহিলা-তার শিশু কন্যাটিকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সে বাড়ীতে কচি মুখ ও অল্প বয়সের বাচ্চা-কাচ্চা না থাকার কারণে নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হল এবং কচি মুখের আধো ভাঙ্গা মিষ্টি মিষ্টি মায়া জড়ানো কথা শ্রবণ করার নিমিত্ত সকলেই তার সাথে অন্তরঙ্গ ও ফ্রি হওয়ার জন্য

প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। কেউ কেউ বিস্কুট, পানীয় ইত্যাদি পেশ করতে লাগল। কিন্তু এই ভদ্র মহিলাটি তার শিশু কন্যাটির প্রতি খুব দৃষ্টি রাখতে থাকলেন। যখনই সে কোন কথা বলত, তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে বলতেন, "বদ তমীজ বে-আদব কোথাকার! পাকনী বুড়ীর মত মুখ চালিয়ে যাচ্ছিস।" অতঃপর মেজবানদের বললেন, "কি বলব বোন! এই বাচালের কারণে আমি কোথাও আসা-যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। যেখানেই যাই, অভদ্রের মত কথা বলতে থাকে। এর কারণে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।" আর যখন কেউ কিছু দিচ্ছিল,আর মেয়েটি তা নিতে ইচ্ছা করছিল,তখন মা বললেন, বদবখ কোথাকার! দুরহ এখান থেকে। মনে হয়-জীবনে কোন জিনিস চোখে দেখিসনি। তুইতো আমাকে সকল স্থানে অপমান করেই ক্ষান্ত হোস ইত্যাদি। এখন পাঠক নিজে বলুন, এই ভদ্র মহিলা কোন দৃষ্টিকোন থেকে স্বীয় নিষ্পাপ নির্দোষ শিশু কন্যার সকল আচরণকে অবলোকন করছিলেন? মেয়েটির সকল আচরণ কথা-বার্তা কি অপছন্দনীয়, দোষণীয় ছিল? শিশুকাল এমন একটা সময়-যখন শিশুর শিরা-উপশিরায়, প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়, ধমনীর প্রতিটি কণায় কণায় প্রকৃতিগত-মজ্জাগত ভাবে চঞ্চলতা, চুরতা, ফুর্তি প্রবণতা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই হেতু শিশু নিজেই নিজের কাছে এমন অক্ষম, অপারগ থাকে যে, সে সব সময় তুর তুর করতে থাকে, কিছু না কিছু একটা করতেই থাকে। এখন তার এ চঞ্চলতাকে যদি জঘন্যতম অপরাধ ধরে নেয়া হয় এবং তাৎক্ষনিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এটা হবে শিশুর প্রতি নির্ঘাত জুলুম। তাবে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কুঅভ্যাসে শিশু অভ্যস্থ হতে থাকলে, অবশ্যই তাকে শাসন করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।

শিশুদেরকে শাস্তি দানের পরিমাণ

শিশু যতদিন ছোট থাকে, ততদিন পিতা-মাতার আদর সোহাগে, মায়া-মমতায়, স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকে। আর যখন শিক্ষা-দীক্ষা ও শাসনের বয়সে পৌছে যায়, তখন পিতা-মাতা ও লালন পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গেও কর্তব্য এই যে, শিশুদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সংশোধনের সর্ব প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া তার বক্রতা শুদ্ধিকরণ এবং তার আবেগ, তার কামনা বাসনা, তার স্বভাব-চরিত্রের সংশোধন ও আমূল পরিবর্তনের সমস্ত পথ অবলম্বন করবেন। এর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা অভিভাবকের কর্তব্য। যাতে করে-সে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মন-মানসিকতা, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও উচ্চাঙ্গ সামাজিকতার শিষ্টাচারে অলংকৃত হতে পারে।

শিশুদের লালন-পালন ও চারিত্রিক সংশোধনের জন্য ইসলামের এক বিশেষ পদ্ধতি ও স্বতন্ত্র পন্থা রয়েছে। সুতরাং ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, যদি শিশুদের জন্য আদর-সোহাগ দ্বারা বোঝানো উপকারী হয়; তাহলে অভিভাবকদের জন্য তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাকে উপেক্ষা করা, রাগ দেখানো দুরস্ত নয়। আর যদি রাগ দেখানো বা ধমক দেয়া, শাসন করা তার সংশোধনের জন্য উপকারী হয়, তাহলে প্রহার করা, দৈহিক শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। আর যদি আদর-সোহাগ, ওয়াজ-নসীহত, ধমক, শাসন, সম্পর্ক ছিন্ন করণ এবং কড়াকড়ির সকল পন্থাই অকার্যকরী সাব্যস্ত হয়, এমতাবস্থায় এতটুকু প্রহার করার অনুমতি রয়েছে, যা শরীয়তের সীমার মধ্যে গণ্য এবং যা অমানসিক-অমানবিক না হয। তবেই হয়ত শিশুর সংশোধনের পথ সুগম হবে এবং তার চাল-চলন, আখলাক-চরিত্র, স্বভাব-অভ্যাস দুরস্ত হবে।

শিশুদের লালন-পালন ও সংশোধনের সমস্ত স্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর জীবন বিধান অনুযায়ী হবে। শিশুদের লালন-পালন, সংশোধন এবং আদর-সোহাগ ও নম্রতার সাথে বুঝানো সম্পর্কিত একটি ঘটনা ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত উমর ইবনে আবী সালামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত এক কিশোর ছিলাম। আহারের সময় আমার হস্ত খাবার প্লেটের এদিক ওদিক ঘুরা-ফেরা করত। এ দৃশ্য অবলোকন করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেনঃ "হে বৎস! আল্লাহর নামে আহার শুরু কর, ডান হাতে আহার কর এবং নিজের নিকটবর্তী পার্শ্ব থেকে আহার কর।"

শিশুদের শাসন এবং প্রহার করা সম্পর্কিত একটি হাদীস আবু দাউদ শরীফে হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "যখন তোমদের সন্তাদের বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তাদের নামায পড়ার আদেশ দাও। আর যখন দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তাদের নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও।"

শিশুদের সাথে নম্র ব্যবহার বা কর্কশ ব্যবহার যা-ই করা হোক না কেন, তা হতে হবে তার ইললৌকিক ও পারলৌকিক উপকারার্থে এবং চারিত্রিক সংশোধেনের উদ্দেশ্যে। যদি উদ্দেশ্য হয় তাকে লোক সমাজে অপমানিত করা, লজ্জিত করা, তাহলে তা হবে হিতে বিপরীত। কারণ, যেমনিভাবে আমরা আত্মমর্যাদাবোধ- সম্মানবোধ অন্তরে গচ্ছিত রাখি এবং অন্যের সম্মুখে, লোক সমাজে অপমানিত হওয়া, লজ্জিত হওয়া পছন্দ করি না, তেমনিভাবে শিশুরাও আত্মমর্যাদাবোধ হৃদয়ে সংরক্ষিত রাখে এবং লোক সমাজে অপমানিত হওয়া

পছন্দ করে না। তাই যখন সে কোন অপরাধ করে, তখন মাতা-পিতা তাকে যে শাস্তি দেয়, এ শাস্তিকে সে কেমন যেন মানহানী এবং তার ইজ্জত ও সম্মানবোধ আঘাত মনে করে। যখন সে লক্ষ্য করে যে, কাজটা বড় অপরাধের অমার্জনীয় এবং তাতে অন্যদের সম্মুখে অপমানিত হতে হবে, তখন সে ঐ কাজ থেকে তাওবা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোন মা যদি একই অপরাধের কারণে বার বার শিশুর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানতে থাকেন, তখন সে মনে মনে এ কথার উপলব্ধি করতে থাকে যে, লোক সমাজে তার কোন মান-সম্মান ও মূল্য নেই। আর তখনই সে একগুঁয়ে ও বেশরম, নির্লজ্জ হয়ে যায়। এরপর তাকে কেউ আর অপরাধ জগতে থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। এমন হয় অধিকাংশ সময় মায়ের ভুলের কারণে।

সুস্থ বিবেকহীন অনেক মায়ের মুখের ভাষা অলংকৃত হয় অবাঞ্ছিত ধমকী ও ভীতিপ্রদ বাক্য দ্বারা। যেমন-"থাপ্পর দেব এখনই," "জুতা মেরে মুখ ভেঙ্গে দিব", "দাঁত ভেঙ্গে দিব লাথি মেরে" ইত্যাদি। এভাবে বে-সাহারা, অসহায়-অবুঝ শিশুকে স্নেহহীন মায়ের পক্ষ থেকে হয়রানী ও ভীতি প্রদর্শন করা কিভাবে দুরস্ত হবে? এতে শিশুর উপর কতটুকু কুপ্রভাব পড়বে, সেদিকে সামান্যতমও ভ্রূক্ষেপ কি করা হয়?

অনেক শিশু এমন রয়েছে-যারা মায়ের ঐ অনবরত ধমকীস্বরূপ কথাগুলোকে 'নিছক মুখের জোর' মনে করে নেয় এবং এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মায়ের কথায় কিছুই যায় আসে না। এমন কথা তিনি সর্বদা বকতে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে কাজে পরিণত করেন খুব কমই। এখানে লক্ষণীয় এই যে, উক্ত বাক্যগুলো স্বীয় প্রভাব হারাতে বসেছে। পক্ষান্তরে শিশুর শাস্তিকে উপেক্ষা করতে শুরু করেছে। শাস্তিকে সে এখন পরওয়া করে না। কিন্তু যে শিশুরা ঐ ধমকীমূলক বাক্যগুলোকে সত্য এবং বাস্তবিক মনে করে, তাদের পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়।

এটা চিন্তা করা মারাত্মক ভুল যে, শিশু যেন এমন একটাও অপরাধ বা ভুল না করে যার কারণে শাস্তি দিতে হয়। শিশুতো ভুল্ল করবেই। অবশ্য এটা হতে পারে যে, মা তার শাস্তির বিধানকে শিথিল করতে পারেন, অথবা শাস্তি রহিত করতে পারেন।

একথা প্রতিদানযোগ্য যে, শিশু কিন্তু প্রত্যেকটা দুষ্টামী জেনে শুনে, সেচ্ছায় স্বজনে করে না। কিছু দুর্ঘটনা তো এমন হয় যে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার ক্ষতিকর দিকটা তার জানাও থাকে না। তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে গেলে, সে নিজে নিজেই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয় এমতাবস্থায় তাকে বিবেক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা বাঞ্ছনীয়।

১৮তম অধ্যায়

ফযীলতপূর্ণ দিবস ও রজনী

ফযীলতপূর্ণ সময়সমূহ বান্দার জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত। সামান্য সময় সুন্নত অনুযায়ী নেক আমল করে অসামান্য সওয়াব লাভ কর যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, ফযীলতপূর্ণ সময়ের মূল্যায়ন ও মর্যাদা রক্ষা করা সেসব সহজ নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত যাতে কষ্ট কম, কিন্তু সওয়াব বেশি।

যেসব সহজ ও ছোট আমলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে অথবা সহীহ হাদীসে অধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে এবং যেসবের প্রচুর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সেসব আমল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মারাত্মক পর্যায়ের কিছু বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ির প্রবণতা রয়েছে; যেগুলোর সংশোধন অত্যন্ত জরুরি। যেমন–

(ক) কেউ কেউ সেসব আমলকে সহজ ও তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং সেগুলোর প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে। এভাবে তারা প্রতিদান ও সওয়াবের অনেক বড় অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয় তারা এভাবে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মূল্য না দিয়ে অকৃজ্ঞতার বোঝা নিজেদের মাথায় চাপায় অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

'সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। এরপর কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অনুপরিমান অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' (সূরা যিলযাল ৬-৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لَاتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْاَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'কোন সৎকাজকে কস্মিনকালেও হেয় জ্ঞান করো না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা। (সহীহ মুসলিম ২/৩২৯)

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন-

عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللّٰهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ اَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ الْمُسْتَقِىْ، وَتَكَلَّمَ اَخَاكَ وَوَجْهُكَ اِلَيْكَ مُنْبَسِطٌ

আল্লাহকে ভয় কর এবং কস্মিনকালেও কোন সৎকাজকে হেয় জ্ঞান করো না, যদিও তা হয় তোমার বালতি থেকে কিছু পানি অন্যের পাত্রে ঢেলে দেওয়া এবং তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথোপকথন করা।'

(মুসনাদে আহমদ ৫/৬৩)

এক হাদীসে একথাও ইরশাদ করেছেন–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

'একটি খেজুরের অর্ধাংশ দ্বারা হলেও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ কর। যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে একটি উত্তম কথা দ্বারা।'

(সহীহ বুখারী ২/৯৬৮)

সুতরাং কোনভাবেই শয়তানের এই ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা যখন ইসলামের বড় বড় কাজ করছি না তখন এই ছোট ছোট নেক আমল আমাদের কী উপকারে আসতে পারে? বরং যখন যে নেক কাজের তাওফীক হয় মহাপ্রাপ্তি মনে করে তা করে ফেলা উচিত। দ্বীনের বড় বড় কাজ করা থেকে বঞ্চিত থাকা নিঃশন্দেহে অনেক বড় ক্ষতি। আমাদের সেসব কাজের প্রতি অত্যধিক মনোযাগী হতে হবে এবং সে জন্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা সেগুলো আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু এটা কেমন কথা যে, বড় কাজগুলো যখন হয় না তখন সহজ নেক আমলগুলোও করব না। বস্তুত এটা শয়তানের একটি প্রতারণা, যাতে ক্ষতিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানো ছাড়া আর কিছুই নয়। ছোট ছোট নেক আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার একটি বড় উপকার হল এর মাধ্যমে বড় বড় নেক আমলের আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আমলনামায় নেক কাজের পরিমাণ বেশি হওয়ার যথাযথ মর্যাদা ও মূল্য আজ আমাদের জানা নেই; কিন্তু যেদিন এই চক্ষু বন্ধ হবে; আল্লাহর সামনে উপস্থিতি হবে এবং হিসাব-কিতাবের ক্ষেত্র সামনে আসবে সেদিন বুঝে আসবে একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র নেককাজের কী মূল্য ! সেখানকার মুদ্রা, টাকা-পয়সা নয়; সেখানকার মুদ্রা হল এসব নেক কাজ। সেখানে প্রশ্ন-ই হবে যে, নিজের আঁচলে কী পরিমাণ নেক আমল নিয়ে এসেছ? তখন আঁচল যদি শূন্য হয় তাহলে অসহ্যকর আক্ষেপ হবে যে, দুনিয়ায় অবস্থানকালে আহ্‌রে! আমাদের আমলসমূহ কেন নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করলাম না? কিন্তু সেদিন আর আমলের সময় থাকবে না। তাই সেই আক্ষেপের কোন ফল হবে না।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম যাঁদের সেসব নেক আমলের মর্যাদা ও মূল্য জানা ছিল, তাঁরা সেসব নেক আমলের লোভী ছিলেন। কোন আমল সম্পর্কে যদি অবহিত হতেন যে, তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন তৎক্ষণাৎ এর উপর আমল শুরু করে দিতেন। আর যেসব আমলের সওয়াব তাঁরা বিলম্বে অবহিত হতেন সেসব সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করতেন যে, বিষয়টি আমাদের আগে থেকে জানা ছিল না। অন্যথায় আগে থেকেই এই নেক আমলকে অভ্যাসে পরিণত করতাম।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে হাদীস শোনান যে, 'যে ব্যক্তি কোন জানাযার নামায পড়ে তার এক কীরাত সওয়াব হয়। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত জানাযার পেছনে থাকে সে দুই কীরাত সওয়াব লাভ করে। আর প্রতিটি কীরাত পাহাড় সমতুল্য। এ কথা শুনে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমি তো অনেক কীরাত অকারণে নষ্ট করে ফেলেছি।' (জামে তিরমিযী ১/২০১)

মোটকথা যেসব নেক কাজ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হয় তা অত্যন্ত মূল্যবান। দুনিয়াতে অবস্থান কালেই এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। আর বিশেষভাবে যেসব নেক কাজে কোন কষ্ট হয় না, সেগুলোকে শুধু অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার কারণে বর্জন করা তো এতই লোকসানের ব্যাপার যে, আখেরাতে এর আক্ষেপ অসহ্যকর হবে।'

(খ) পক্ষান্তরে কিছু লোক এমন আছে যারা ফযীলতপূর্ণ সময়সমূহে নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বটে এবং সেসব সহজ নেক আমলের প্রতিও কম-বেশি মনোযাগী হয়; কিন্তু তাদের একটি মারাত্মক রোগ হল তারা ফরয ও ওয়াজিবকে গুরুত্ব দেয় না। তাদের ধারণা, ফযীলতপূর্ণ সময়গুলোতে আমলের প্রতি মনোযাগী হওয়া এবং সহজ নেক কাজসমূহকে আঁকড়ে ধরাই আমাদের যাবতীয় দুর্বলতা ও গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। সেসব সময়ের আমলে যত সওয়াব হয়েছে তা কি কম? কেউ কেউ তো পরিষ্কার এ কথাও বলে থাকে যে, এখন যা ইচ্ছে কর, অমুক পবিত্র রাতে ইবাদত করে সবকিছু ধুয়ে ফেলব।

স্মরণ রাখবেন এ ধরনের মন-মানসিকতা এক নম্বরে উল্লিখিত ভুল মন-মানসিকতা থেকে নিকৃষ্টতম এবং অধিক ভয়াবহ। ভাল করে মনে রাখবেন শরীয়তের ঘোষণা এবং বিশেষ সময়ের ফযীলতের ঘোষণা এবং বিশেষ আমলের উপর প্রতিদান ও সওয়াবের উৎসাহ প্রদানের হেকমত এই যে, আমরা যেন সেসব সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন করি এবং সে সকল আমলকে গুরুত্ব

দেই। এর উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই নয় যে, এই দানকে আমরা অন্যান্য সময়ের ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শনের অসিলা বানাব এবং না এই যে, জেনে-শুনে অন্যান্য আমল বিশেষত তদপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহে ত্রুটি করব। যদি এমন করি তাহলে মূলত আমরা শরীয়তকে বিকৃত করলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী ভুল। বুঝার একটি খুব মন্দ দৃষ্টন্ত পেশ করলাম এবং প্রবল আশংকা রয়েছে বরং এ কথা নিশ্চিত যে, এই বিকৃতি ও ইচ্ছাকৃত ভুল বুঝার পরিণামে সেসব সময়ের মর্যাদা রক্ষা এবং সেসব বরকত থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। নাউযুবিল্লাহ।

অধিক প্রতিদান ও সওয়াববিশিষ্ট কোন আমলের তাওফিক হলে শয়তান এই ধোঁকা দেয় যে, আমলনামায় তো শুধু এই এক আমল দ্বারাই অত্যাধিক সওয়াব জমা হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মেহনত করার কী দরকার ? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনেই শয়তানের এই ধোঁকার জাল ছিন্ন করে দিয়েছেন। তিনি অজু ও নামাযের সওয়াব (যা অনেক বেশি) বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন, 'ওয়ালা তাগতাররু' তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। অর্থাৎ শুধু এই দুই আমলে এত অধিক সওয়াবের কথা শুনে একথা মনে করো না যে, আর অন্য আমলের প্রয়োজন নেই। অথবা এখন কোন গুনাহ-ই ক্ষতিকর নয়। কারণ সওয়াব তো ওই আমলের হয় যা আল্লাহ তাআলার দরবারে গৃহীত হয়। এখন কারো কাছে কী দলীল আছে, তারা আমল অবশ্যই কবুল হওয়া স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কবুল হওয়া যখন নিশ্চিত নয় তখন কীভাবে শুধু দু একটি নেক কাজকে যথেষ্ট মনে করা যায় এবং কীভাবে এর ভিত্তিতে গুনাহের কাজে রত হয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

তাছাড়া কিছু গুনাহ এমনও রয়েছে যার কারণে সমস্ত নেক আমলের সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। তাহলে কিভাবে বলা যায় (আল্লাহ না করুন) কখন কি গুনাহের কারণে অজান্তেই সমস্ত সওয়াব ধ্বংস হয়ে যায়নি বা ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে না।

তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্যে ফরয, সবর্দা আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত-সান্ত্রস্ত ও প্রকাম্পিত থাকা। আল্লাহ তাআলার রহমতের আশাও থাকবে এবং আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির ভয়ও থাকবে।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে

إِيَّاكُمْ وَمُحَقِّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَالرَّجُلُ

يَنْطَلِقُ فَيَجِيْءُ بِالْعُوْدِ، اَلرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالْعُوْدِ حَتّٰى جَمَعُوْا سَوَادَ فَاَجَّجُوْا نَارًا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا

'সেসব গুনাহের ব্যাপারে সাবধান থেকো যেগুলোকে সাধারণ মনে করা হয়। কারণ তা একত্র হয়ে ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন কোন কাফেলা কোন মরুভূমিতে অবতরণ করল আর তাদের খাবারের সময় ঘনিয়ে এল। তারা বিভিন্ন দিক থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করতে লাগল। প্রত্যেকে ছোট ছোট লাকড়ির টুকরো জমা করতে লাগল। ফলে লাকড়িতে বড় একটি স্তূপ জমা হয়ে গেল এবং তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করল।'

(মুসনাদে আহমাদ ১/৪০৩, হাদীস ৩৮০৮)

এই উপমা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন যে, সেই লাকড়ির স্তূপের মত ছোট ছোট গুনাহের কাজ একত্র হয়ে মানুষকে জাহান্নামী বানিয়ে ফেলে। তাই কোন গুনাহকেই সাধারণ মনে করা যাবে না।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

اِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ

'সেসব গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক থেকো যেগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। কারণ আল্লাহ তাআলার দরবারে এসব গুনাহ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে।

(সহীহ ইবনে হিব্বান ১২/৩৭৯, হাদীস ৫৫৬৮)

সুতরাং সহজ থেকে সহজতর নেক আমলের মত ছোট থেকে ছোট গুনাহের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত এবং তা বর্জন করা উচিত। নেক আমলকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার মত গুনাহকে ভয় করার ক্ষেত্রেও সাহাবায়ে কেরামকে আমাদের আদর্শ বানানো উচিত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন-

إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالًا هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ

'তোমরা অবশ্যই এমন অনেক আমল করো যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও হালকা অথচ রাসূলুল্লাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমরা তাকে ধ্বংসাত্মক গুনাহসমূহের মধ্যে গণনা করতাম।'

(সহীহ বুখারী ২/৯৬১, হাদীস ৬৪৯২)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক মুমিনের সামনে থাকা উচিত। তিনি বলেন-

এর কারণ হল-আদর-সোহাগ, মায়া-মমতা করার স্থান, কাল, পাত্র বুঝতে পারা, চিনতে পারা অথবা চিনতে ভুল করা। যেমন, সে সময়টায় করণীয় ছিল মায়ের পক্ষ থেকে শিশুকে সান্ত্বনা দেয়ার, স্নেহ করার, সে সময়ে তাকে শাসন করা, ধমকী দেয়া, ভয় দেখানো বিরূপ ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর যে সময়টায় করণীয় ছিল তাকে সতর্ক করার, শাসন করার, সে সময়ে তাকে আদর-সোহাগ করা, ধন্যবাদ দেয়া তাকে বেপরোয়া করে তোলে। এটা শিশুর জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর।

উপমা স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন-শিশু আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারো বাড়িতে দাওয়াত খেতে বা বেড়াতে যেয়ে "আল্লাদপনা" শুরু করেছে এবং দস্ত রখান থেকে বা প্লেট থেকে কিংবা ট্রে থেকে খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় কিছু খাচ্ছে, কিছু ছড়াচ্ছে, ফেলাচ্ছে। দৌড়া-দৌড়ি, হৈ হুল্লোড় করছে। তখন তার এ দৃশ্য দেখে মা জননী আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বগর্বে উপস্থিত মেহমানদের সম্বোধন করে বলছেন, দেখ, দেখ, আমার বাচ্চাটা কেমন নির্ভীক, সাহসী! এখানে কত সুন্দর মনটা ভরে তৃপ্তি সহকারে খাচ্ছে। অথচ আমার ঘরেখেতেই চায় না। থাক, মনটা ভরে খাক। যেভাবেই খেতে চায় খাক। কেউ বাধা দিও না। এটা অনুচিত। বরং বাড়ীতে ফেরার পর সন্তানকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে কঠোর ভাবে বুঝানো উচিত যে, "প্রিয় বৎস! খাদ্র দ্রব্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাওয়া বা ফেলে দেয়া খুবই খারাপ অভ্যাস। এমন নোংড়া স্বভাব তো ঐ সমস্ত শিশুদের থাকে- যারা কোন দিন এমন খাদ্য চোখে দেখে না বা এমন খাদ্য খাওয়া যাদের ভাগ্যে জোটে না। আল্লাহ তা'আলার কত বড় অনুগ্রহ আমাদের প্রতি যে, তিনি আমাদেরকে পানাহারের জন্য কত নেয়ামত দান করেছেন। যদি তুমি এমনটি কর, তাহলে তা হবে আল্লাহর নাশুকরী, অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলা যদি আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে যা কিছু আমাদেরকে দান করেছেন, তা ছিনিয়ে নিবেন। আর তখন আমরা গরীব হয়ে যাবো। সুতরাং আগামীতে এমনটি কখনও করবে না।" এমন নসীহত আর কঠোর শাসন না করে যদি শিশুকে উৎসাহিত করা হয়, সাবাস দেয়া হয়, ধন্যবাদ দেয়া হয়, তাহলে তা হবে শিশুর সাথে খিয়ানত ও প্রবঞ্চনা।

যদি কারো শিশু সন্তানের মধ্যে এমন ঘৃণ্য অভ্যাস থাকে, তাহলে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে কিছু পানাহার করিয়ে নেয়া উচিত। কারণ, শিশুদের পেট শান্ত থাকলে মনটাও শান্ত থাকে। এটা অনেক মায়ের পরীক্ষিত। তাই এটা অনেক মায়ের জন্য লক্ষণীয়।

এমনিভাবে লক্ষণীয় এই যে, কোন কোন শিশুর জন্য এমনও হয় যে, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, তবুও ঘুমাচ্ছে না বা কোন বস্তুর জন্য জেদ ধরে কাঁদছে। তখন অনেক মা আদর সোহাগ করে শান্ত করার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ গরম মেজাজে শাসিয়ে দেয়, অথবা এমন বলে যে, আরে অলক্ষুণে ঝঞ্ঝাট! ঘুমাচ্ছিস না কেন? সারা দিন জ্বালিয়েছিস, এখন রাতেও বিরক্ত করছিস? একটু শান্তিতে ঘুমাতে দে। জানি না, তুই আমার ঘরে জন্ম নিলি কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে থাকে। অথচ তখন মায়ের করণীয় ছিল এই যে, যদি সে কোন কেচ্ছা-কাহিনী শ্রবণ করার জন্য জেদ করে, তাহলে তাকে কোন সাহাবীর ঈমানদীপ্ত সাহসিকতার ঘটনা শুনিয়ে দেয়া। আর যদি ক্ষুধার তাড়নায় কাঁদতে থাকে, তাহলে তাকে কিছু আহারের ব্যবস্থা করা। আর মাথায় স্নেহ মাখা হাত বুলিয়ে তার জন্য দোয়া করা। সুতরাং শিশুদের আখলাক-চরিত্রও স্বভাব বিগড়ে যাওয়ার এটাই কারণ যে, যে সময়টা ছিল আদর-সোহাগ ও সান্ত্বনা দেয়ার, সে সময় তাকে শাসানো ও ধমকানো হল। এটা তার জন্য বড়ই ক্ষতিকর।

শিশুদের বদ স্বভাব প্রতিরোধে মায়ের করণীয়

শিশুদের বদস্বভাব, অসদাচরণ ও অপছন্দনীয় কর্মকান্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় এটা-যা দূর করার এবং তার মূল উৎপাটন করার জন্য প্রতিটি মা-ই সর্বক্ষণ সক্রিয় থাকে, কিন্তু শিশু নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কেন যেন আরো বেশী সে কাজে আকৃষ্ট হয়। মা হয়ত চাচ্ছেন, সন্তান পুনরায় যেন দুষ্টামী না করে, কিন্তু সে কঠোর থেকে কঠোরতর শাস্তি ভুলে যেয়ে সে কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। তার এ স্বভাব কি কোন দিন পরিবর্তিত হবে না? অবশ্যই হবে। তবে মায়ের জন্য প্রয়োজন-কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য-সহ্য ও বিনম্রতার। এক্ষেত্রে ক্রোধ ও উত্তেজনা পরিহার অপরিহার্য।

আদর্শ মায়ের জন্য এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, শিশুর আচরণগুলো শিশুসূলভ হিসেবে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। শিশুর প্রতিটি কাজ-কর্ম, কথাবার্তাকেই যদি দোষণীয় বিবেচনা করা হয় এবং ডাইরেক্ট এ্যাকশন হিসেবে তৎক্ষণাৎ কিছু উত্তম মাধ্যম দেয়া হয়, তাহলে তা হবে শিশুর জন্য খুবই ক্ষতিকারক। এতে শিশুর মন ভেঙ্গে যাবে এবং সংশোধনের পরিবর্তে আরো বেশী বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন, একবার এক ভদ্র মহিলা-তার শিশু কন্যাটিকে নিয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে সে বাড়ীতে কচি মুখ ও অল্প বয়সের বাচ্চা-কাচ্চা না থাকার কারণে নিষ্পাপ ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে সকলেই খুব আনন্দিত হল এবং কচি মুখের আধো ভাঙ্গা মিষ্টি মিষ্টি মায়া জড়ানো কথা শ্রবণ করার নিমিত্ত সকলেই তার সাথে অন্তরঙ্গ ও ফ্রি হওয়ার জন্য

প্রচেষ্টা চালাতে লাগল। কেউ কেউ বিস্কুট, পানীয় ইত্যাদি পেশ করতে লাগল। কিন্তু এই ভদ্র মহিলাটি তার শিশু কন্যাটির প্রতি খুব দৃষ্টি রাখতে থাকলেন। যখনই সে কোন কথা বলত, তৎক্ষণাৎ ধমক দিয়ে বলতেন, "বদ তমীজ বে-আদব কোথাকার! পাকনী বুড়ীর মত মুখ চালিয়ে যাচ্ছিস।" অতঃপর মেজবানদের বললেন, "কি বলব বোন! এই বাচালের কারণে আমি কোথাও আসা-যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। যেখানেই যাই, অভদ্রের মত কথা বলতে থাকে। এর কারণে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।" আর যখন কেউ কিছু দিচ্ছিল,আর মেয়েটি তা নিতে ইচ্ছা করছিল,তখন মা বললেন, বদবখ কোথাকার! দুরহ এখান থেকে। মনে হয়-জীবনে কোন জিনিস চোখে দেখিসনি। তুইতো আমাকে সকল স্থানে অপমান করেই ক্ষান্ত হোস ইত্যাদি। এখন পাঠক নিজে বলুন, এই ভদ্র মহিলা কোন দৃষ্টিকোন থেকে স্বীয় নিষ্পাপ নির্দোষ শিশু কন্যার সকল আচরণকে অবলোকন করছিলেন? মেয়েটির সকল আচরণ কথা-বার্তা কি অপছন্দনীয়, দোষণীয় ছিল? শিশুকাল এমন একটা সময়-যখন শিশুর শিরা-উপশিরায়, প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়, ধমনীর প্রতিটি কণায় কণায় প্রকৃতিগত-মজ্জাগত ভাবে চঞ্চলতা, চুরতা, ফুর্তি প্রবণতা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেই হেতু শিশু নিজেই নিজের কাছে এমন অক্ষম, অপারগ থাকে যে, সে সব সময় তুর তুর করতে থাকে, কিছু না কিছু একটা করতেই থাকে। এখন তার এ চঞ্চলতাকে যদি জঘন্যতম অপরাধ ধরে নেয়া হয় এবং তাৎক্ষনিক শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এটা হবে শিশুর প্রতি নির্ঘাত জুলুম। তাবে শরীয়ত পরিপন্থী কোন কুঅভ্যাসে শিশু অভ্যস্থ হতে থাকলে, অবশ্যই তাকে শাসন করতে হবে, শাস্তি দিতে হবে।

শিশুদেরকে শাস্তি দানের পরিমাণ

শিশু যতদিন ছোট থাকে, ততদিন পিতা-মাতার আদর সোহাগে, মায়া-মমতায়, স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকে। আর যখন শিক্ষা-দীক্ষা ও শাসনের বয়সে পৌছে যায়, তখন পিতা-মাতা ও লালন পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গেও কর্তব্য এই যে, শিশুদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সংশোধনের সর্ব প্রকার মাধ্যম ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া তার বক্রতা শুদ্ধিকরণ এবং তার আবেগ, তার কামনা বাসনা, তার স্বভাব-চরিত্রের সংশোধন ও আমূল পরিবর্তনের সমস্ত পথ অবলম্বন করবেন। এর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা অভিভাবকের কর্তব্য। যাতে করে-সে পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী মন-মানসিকতা, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও উচ্চাঙ্গ সামাজিকতার শিষ্টাচারে অলংকৃত হতে পারে।

শিশুদের লালন-পালন ও চারিত্রিক সংশোধনের জন্য ইসলামের এক বিশেষ পদ্ধতি ও স্বতন্ত্র পন্থা রয়েছে। সুতরাং ইসলাম এই শিক্ষা দেয় যে, যদি শিশুদের জন্য আদর-সোহাগ দ্বারা বোঝানো উপকারী হয়; তাহলে অভিভাবকদের জন্য তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা বা তাকে উপেক্ষা করা, রাগ দেখানো দুরস্ত নয়। আর যদি রাগ দেখানো বা ধমক দেয়া, শাসন করা তার সংশোধনের জন্য উপকারী হয়, তাহলে প্রহার করা, দৈহিক শাস্তি দেয়া ঠিক নয়। আর যদি আদর-সোহাগ, ওয়াজ-নসীহত, ধমক, শাসন, সম্পর্ক ছিন্ন করণ এবং কড়াকড়ির সকল পন্থাই অকার্যকরী সাব্যস্ত হয়, এমতাবস্থায় এতটুকু প্রহার করার অনুমতি রয়েছে, যা শরীয়তের সীমার মধ্যে গণ্য এবং যা অমানসিক-অমানবিক না হয। তবেই হয়ত শিশুর সংশোধনের পথ সুগম হবে এবং তার চাল-চলন, আখলাক-চরিত্র, স্বভাব-অভ্যাস দুরস্ত হবে।

শিশুদের লালন-পালন ও সংশোধনের সমস্ত স্তর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর জীবন বিধান অনুযায়ী হবে। শিশুদের লালন-পালন, সংশোধন এবং আদর-সোহাগ ও নম্রতার সাথে বুঝানো সম্পর্কিত একটি ঘটনা ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত উমর ইবনে আবী সালামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত এক কিশোর ছিলাম। আহারের সময় আমার হস্ত খাবার প্লেটের এদিক ওদিক ঘুরা-ফেরা করত। এ দৃশ্য অবলোকন করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেনঃ "হে বৎস! আল্লাহর নামে আহার শুরু কর, ডান হাতে আহার কর এবং নিজের নিকটবর্তী পার্শ্ব থেকে আহার কর।"

শিশুদের শাসন এবং প্রহার করা সম্পর্কিত একটি হাদীস আবু দাউদ শরীফে হযরত আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "যখন তোমদের সন্তাদের বয়স সাত বৎসর পূর্ণ হয়, তখন তাদের নামায পড়ার আদেশ দাও। আর যখন দশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করে, তখন তাদের নামাযের জন্য প্রহার কর এবং তাদের শোয়ার বিছানা পৃথক করে দাও।"

শিশুদের সাথে নম্র ব্যবহার বা কর্কশ ব্যবহার যা-ই করা হোক না কেন, তা হতে হবে তার ইললৌকিক ও পারলৌকিক উপকারার্থে এবং চারিত্রিক সংশোধেনের উদ্দেশ্যে। যদি উদ্দেশ্য হয় তাকে লোক সমাজে অপমানিত করা, লজ্জিত করা, তাহলে তা হবে হিতে বিপরীত। কারণ, যেমনিভাবে আমরা আত্মমর্যাদাবোধ- সম্মানবোধ অন্তরে গচ্ছিত রাখি এবং অন্যের সম্মুখে, লোক সমাজে অপমানিত হওয়া, লজ্জিত হওয়া পছন্দ করি না, তেমনিভাবে শিশুরাও আত্মমর্যাদাবোধ হৃদয়ে সংরক্ষিত রাখে এবং লোক সমাজে অপমানিত হওয়া

পছন্দ করে না। তাই যখন সে কোন অপরাধ করে, তখন মাতা-পিতা তাকে যে শাস্তি দেয়, এ শাস্তিকে সে কেমন যেন মানহানী এবং তার ইজ্জত ও সম্মানবোধ আঘাত মনে করে। যখন সে লক্ষ্য করে যে, কাজটা বড় অপরাধের অমার্জনীয় এবং তাতে অন্যদের সম্মুখে অপমানিত হতে হবে, তখন সে ঐ কাজ থেকে তাওবা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কোন মা যদি একই অপরাধের কারণে বার বার শিশুর আত্মমর্যাদায় আঘাত হানতে থাকেন, তখন সে মনে মনে এ কথার উপলব্ধি করতে থাকে যে, লোক সমাজে তার কোন মান-সম্মান ও মূল্য নেই। আর তখনই সে একগুঁয়ে ও বেশরম, নির্লজ্জ হয়ে যায়। এরপর তাকে কেউ আর অপরাধ জগতে থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। এমন হয় অধিকাংশ সময় মায়ের ভুলের কারণে।

সুস্থ বিবেকহীন অনেক মায়ের মুখের ভাষা অলংকৃত হয় অবাঞ্ছিত ধমকী ও ভীতিপ্রদ বাক্য দ্বারা। যেমন-"থাপ্পর দেব এখনই," "জুতা মেরে মুখ ভেঙ্গে দিব", "দাঁত ভেঙ্গে দিব লাথি মেরে" ইত্যাদি। এভাবে বে-সাহারা, অসহায়-অবুঝ শিশুকে স্নেহহীন মায়ের পক্ষ থেকে হয়রানী ও ভীতি প্রদর্শন করা কিভাবে দুরস্ত হবে? এতে শিশুর উপর কতটুকু কুপ্রভাব পড়বে, সেদিকে সামান্যতমও ভ্রক্ষেপ কি করা হয়?

অনেক শিশু এমন রয়েছে-যারা মায়ের ঐ অনবরত ধমকীস্বরূপ কথাগুলোকে 'নিছক মুখের জোর' মনে করে নেয় এবং এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, মায়ের কথায় কিছুই যায় আসে না। এমন কথা তিনি সর্বদা বকতে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে কাজে পরিণত করেন খুব কমই। এখানে লক্ষণীয় এই যে, উক্ত বাক্যগুলো স্বীয় প্রভাব হারাতে বসেছে। পক্ষান্তরে শিশুর শাস্তিকে উপেক্ষা করতে শুরু করেছে। শাস্তিকে সে এখন পরওয়া করে না। কিন্তু যে শিশুরা ঐ ধমকীমূলক বাক্যগুলোকে সত্য এবং বাস্তবিক মনে করে, তাদের পরিস্থিতি ভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়।

এটা চিন্তা করা মারাত্মক ভুল যে, শিশু যেন এমন একটাও অপরাধ বা ভুল না করে যার কারণে শাস্তি দিতে হয়। শিশুতো ভুল্ল করবেই। অবশ্য এটা হতে পারে যে, মা তার শাস্তির বিধানকে শিথিল করতে পারেন, অথবা শাস্তি রহিত করতে পারেন।

একথা প্রতিদানযোগ্য যে, শিশু কিন্তু প্রত্যেকটা দুষ্টামী জেনে শুনে, সেচ্ছায় স্বজনে করে না। কিছু দুর্ঘটনা তো এমন হয় যে, তা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তার ক্ষতিকর দিকটা তার জানাও থাকে না। তা হঠাৎ সংঘটিত হয়ে গেলে, সে নিজে নিজেই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয় এমতাবস্থায় তাকে বিবেক দিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা বাঞ্ছনীয়।

১৮তম অধ্যায়

ফযীলতপূর্ণ দিবস ও রজনী

ফযীলতপূর্ণ সময়সমূহ বান্দার জন্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনেক বড় নেয়ামত। সামান্য সময় সুন্নত অনুযায়ী নেক আমল করে অসামান্য সওয়াব লাভ কর যায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, ফযীলতপূর্ণ সময়ের মূল্যায়ন ও মর্যাদা রক্ষা করা সেসব সহজ নেক কাজের অন্তর্ভুক্ত যাতে কষ্ট কম, কিন্তু সওয়াব বেশি।

যেসব সহজ ও ছোট আমলে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনে অথবা সহীহ হাদীসে অধিক প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার রয়েছে এবং যেসবের প্রচুর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে সেসব আমল সম্পর্কে মানুষের মধ্যে মারাত্মক পর্যায়ের কিছু বাড়াবাড়ি ও ছড়াছড়ির প্রবণতা রয়েছে; যেগুলোর সংশোধন অত্যন্ত জরুরি। যেমন–

(ক) কেউ কেউ সেসব আমলকে সহজ ও তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং সেগুলোর প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করে। এভাবে তারা প্রতিদান ও সওয়াবের অনেক বড় অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়। শুধু তা-ই নয় তারা এভাবে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের মূল্য না দিয়ে অকৃজ্ঞতার বোঝা নিজেদের মাথায় চাপায় অথচ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

'সে দিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো যায়। এরপর কেউ অণুপরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অনুপরিমান অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।' (সূরা যিলযাল ৬-৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন

لَاتَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْاَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'কোন সৎকাজকে কস্মিনকালেও হেয় জ্ঞান করো না, যদিও তা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় সাক্ষাৎ করা। (সহীহ মুসলিম ২/৩২৯)

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন-

عَلَيْكَ بِاتِّقَاءِ اللّٰهِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ اَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ الْمُسْتَقِىْ، وَتَكَلَّمَ اَخَاكَ وَوَجْهُكَ اِلَيْكَ مُنْبَسِطٌ

আল্লাহকে ভয় কর এবং কস্মিনকালেও কোন সৎকাজকে হেয় জ্ঞান করো না, যদিও তা হয় তোমার বালতি থেকে কিছু পানি অন্যের পাত্রে ঢেলে দেওয়া এবং তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথোপকথন করা।'

(মুসনাদে আহমদ ৫/৬৩)

এক হাদীসে একথাও ইরশাদ করেছেন–

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

'একটি খেজুরের অর্ধাংশ দ্বারা হলেও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লাভ কর। যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে একটি উত্তম কথা দ্বারা।'

(সহীহ বুখারী ২/৯৬৮)

সুতরাং কোনভাবেই শয়তানের এই ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয় যে, আমরা যখন ইসলামের বড় বড় কাজ করছি না তখন এই ছোট ছোট নেক আমল আমাদের কী উপকারে আসতে পারে? বরং যখন যে নেক কাজের তাওফীক হয় মহাপ্রাপ্তি মনে করে তা করে ফেলা উচিত। দ্বীনের বড় বড় কাজ করা থেকে বঞ্চিত থাকা নিঃশন্দেহে অনেক বড় ক্ষতি। আমাদের সেসব কাজের প্রতি অত্যধিক মনোযাগী হতে হবে এবং সে জন্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। কেননা সেগুলো আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু এটা কেমন কথা যে, বড় কাজগুলো যখন হয় না তখন সহজ নেক আমলগুলোও করব না। বস্তুত এটা শয়তানের একটি প্রতারণা, যাতে ক্ষতিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছানো ছাড়া আর কিছুই নয়। ছোট ছোট নেক আমলের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার একটি বড় উপকার হল এর মাধ্যমে বড় বড় নেক আমলের আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আমলনামায় নেক কাজের পরিমাণ বেশি হওয়ার যথাযথ মর্যাদা ও মূল্য আজ আমাদের জানা নেই; কিন্তু যেদিন এই চক্ষু বন্ধ হবে; আল্লাহর সামনে উপস্থিতি হবে এবং হিসাব-কিতাবের ক্ষেত্র সামনে আসবে সেদিন বুঝে আসবে একটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র নেককাজের কী মূল্য ! সেখানকার মুদ্রা, টাকা-পয়সা নয়; সেখানকার মুদ্রা হল এসব নেক কাজ। সেখানে প্রশ্ন-ই হবে যে, নিজের আঁচলে কী পরিমাণ নেক আমল নিয়ে এসেছ? তখন আঁচল যদি শূন্য হয় তাহলে অসহ্যকর আক্ষেপ হবে যে, দুনিয়ায় অবস্থানকালে আহ্‌রে! আমাদের আমলসমূহ কেন নেক আমল দ্বারা পূর্ণ করলাম না? কিন্তু সেদিন আর আমলের সময় থাকবে না। তাই সেই আক্ষেপের কোন ফল হবে না।

সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম যাঁদের সেসব নেক আমলের মর্যাদা ও মূল্য জানা ছিল, তাঁরা সেসব নেক আমলের লোভী ছিলেন। কোন আমল সম্পর্কে যদি অবহিত হতেন যে, তা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন তৎক্ষণাৎ এর উপর আমল শুরু করে দিতেন। আর যেসব আমলের সওয়াব তাঁরা বিলম্বে অবহিত হতেন সেসব সম্পর্কে আক্ষেপ প্রকাশ করতেন যে, বিষয়টি আমাদের আগে থেকে জানা ছিল না। অন্যথায় আগে থেকেই এই নেক আমলকে অভ্যাসে পরিণত করতাম।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে হাদীস শোনান যে, 'যে ব্যক্তি কোন জানাযার নামায পড়ে তার এক কীরাত সওয়াব হয়। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত জানাযার পেছনে থাকে সে দুই কীরাত সওয়াব লাভ করে। আর প্রতিটি কীরাত পাহাড় সমতুল্য। এ কথা শুনে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, আমি তো অনেক কীরাত অকারণে নষ্ট করে ফেলেছি।' (জামে তিরমিযী ১/২০১)

মোটকথা যেসব নেক কাজ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণ হয় তা অত্যন্ত মূল্যবান। দুনিয়াতে অবস্থান কালেই এর দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। আর বিশেষভাবে যেসব নেক কাজে কোন কষ্ট হয় না, সেগুলোকে শুধু অমনোযোগিতা ও উদাসীনতার কারণে বর্জন করা তো এতই লোকসানের ব্যাপার যে, আখেরাতে এর আক্ষেপ অসহ্যকর হবে।'

(খ) পক্ষান্তরে কিছু লোক এমন আছে যারা ফযীলতপূর্ণ সময়সমূহে নেক আমল ও ইবাদতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বটে এবং সেসব সহজ নেক আমলের প্রতিও কম-বেশি মনোযাগী হয়; কিন্তু তাদের একটি মারাত্মক রোগ হল তারা ফরয ও ওয়াজিবকে গুরুত্ব দেয় না। তাদের ধারণা, ফযীলতপূর্ণ সময়গুলোতে আমলের প্রতি মনোযাগী হওয়া এবং সহজ নেক কাজসমূহকে আঁকড়ে ধরাই আমাদের যাবতীয় দুর্বলতা ও গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে। সেসব সময়ের আমলে যত সওয়াব হয়েছে তা কি কম? কেউ কেউ তো পরিষ্কার এ কথাও বলে থাকে যে, এখন যা ইচ্ছে কর, অমুক পবিত্র রাতে ইবাদত করে সবকিছু ধুয়ে ফেলব।

স্মরণ রাখবেন এ ধরনের মন-মানসিকতা এক নম্বরে উল্লিখিত ভুল মন-মানসিকতা থেকে নিকৃষ্টতম এবং অধিক ভয়াবহ। ভাল করে মনে রাখবেন শরীয়তের ঘোষণা এবং বিশেষ সময়ের ফযীলতের ঘোষণা এবং বিশেষ আমলের উপর প্রতিদান ও সওয়াবের উৎসাহ প্রদানের হেকমত এই যে, আমরা যেন সেসব সময়কে যথাযথ মূল্যায়ন করি এবং সে সকল আমলকে গুরুত্ব

দেই। এর উদ্দেশ্য কস্মিনকালেও এই নয় যে, এই দানকে আমরা অন্যান্য সময়ের ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শনের অসিলা বানাব এবং না এই যে, জেনে-শুনে অন্যান্য আমল বিশেষত তদপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ আমলসমূহে ত্রুটি করব। যদি এমন করি তাহলে মূলত আমরা শরীয়তকে বিকৃত করলাম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বাণী ভুল। বুঝার একটি খুব মন্দ দৃষ্টন্ত পেশ করলাম এবং প্রবল আশংকা রয়েছে বরং এ কথা নিশ্চিত যে, এই বিকৃতি ও ইচ্ছাকৃত ভুল বুঝার পরিণামে সেসব সময়ের মর্যাদা রক্ষা এবং সেসব বরকত থেকেও বঞ্চিত হতে হবে। নাউযুবিল্লাহ।

অধিক প্রতিদান ও সওয়াববিশিষ্ট কোন আমলের তাওফিক হলে শয়তান এই ধোঁকা দেয় যে, আমলনামায় তো শুধু এই এক আমল দ্বারাই অত্যাধিক সওয়াব জমা হয়ে গেছে। সুতরাং এখন মেহনত করার কী দরকার ? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনেই শয়তানের এই ধোঁকার জাল ছিন্ন করে দিয়েছেন। তিনি অজু ও নামাযের সওয়াব (যা অনেক বেশি) বর্ণনা করে ইরশাদ করেছেন, 'ওয়ালা তাগতাররু' তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। অর্থাৎ শুধু এই দুই আমলে এত অধিক সওয়াবের কথা শুনে একথা মনে করো না যে, আর অন্য আমলের প্রয়োজন নেই। অথবা এখন কোন গুনাহ-ই ক্ষতিকর নয়। কারণ সওয়াব তো ওই আমলের হয় যা আল্লাহ তাআলার দরবারে গৃহীত হয়। এখন কারো কাছে কী দলীল আছে, তারা আমল অবশ্যই কবুল হওয়া স্তর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। কবুল হওয়া যখন নিশ্চিত নয় তখন কীভাবে শুধু দু একটি নেক কাজকে যথেষ্ট মনে করা যায় এবং কীভাবে এর ভিত্তিতে গুনাহের কাজে রত হয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

তাছাড়া কিছু গুনাহ এমনও রয়েছে যার কারণে সমস্ত নেক আমলের সওয়াব বাতিল হয়ে যায়। তাহলে কিভাবে বলা যায় (আল্লাহ না করুন) কখন কি গুনাহের কারণে অজান্তেই সমস্ত সওয়াব ধ্বংস হয়ে যায়নি বা ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে না।

তাই প্রত্যেক মুমিনের জন্যে ফরয, সবর্দা আল্লাহ তাআলার ভয়ে ভীত-সান্ত্রস্ত ও প্রকাম্পিত থাকা। আল্লাহ তাআলার রহমতের আশাও থাকবে এবং আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তির ভয়ও থাকবে।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে

إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ، كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا أَرْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، الرَّجُلُ

يَنْطَلِقُ فَيَجِيْءُ بِالْعُوْدِ، اَلرَّجُلُ يَجِيْءُ بِالْعُوْدِ حَتّٰى جَمَعُوْا سَوَادً فَاَجَّجُوْا نَارًا مَا قَذَفُوْا فِيْهَا

'সেসব গুনাহের ব্যাপারে সাবধান থেকো যেগুলোকে সাধারণ মনে করা হয়। কারণ তা একত্র হয়ে ব্যক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। যেমন কোন কাফেলা কোন মরুভূমিতে অবতরণ করল আর তাদের খাবারের সময় ঘনিয়ে এল। তারা বিভিন্ন দিক থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করতে লাগল। প্রত্যেকে ছোট ছোট লাকড়ির টুকরো জমা করতে লাগল। ফলে লাকড়িতে বড় একটি স্তূপ জমা হয়ে গেল এবং তা দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করল।'

(মুসনাদে আহমাদ ১/৪০৩, হাদীস ৩৮০৮)

এই উপমা থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝিয়েছেন যে, সেই লাকড়ির স্তূপের মত ছোট ছোট গুনাহের কাজ একত্র হয়ে মানুষকে জাহান্নামী বানিয়ে ফেলে। তাই কোন গুনাহকেই সাধারণ মনে করা যাবে না।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

اِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ ، فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ

'সেসব গুনাহের ব্যাপারে সতর্ক থেকো যেগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করা হয়। কারণ আল্লাহ তাআলার দরবারে এসব গুনাহ সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে।

(সহীহ ইবনে হিব্বান ১২/৩৭৯, হাদীস ৫৫৬৮)

সুতরাং সহজ থেকে সহজতর নেক আমলের মত ছোট থেকে ছোট গুনাহের ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত এবং তা বর্জন করা উচিত। নেক আমলকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার মত গুনাহকে ভয় করার ক্ষেত্রেও সাহাবায়ে কেরামকে আমাদের আদর্শ বানানো উচিত। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন-

اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالًا هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ، اِنْ كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ

'তোমরা অবশ্যই এমন অনেক আমল করো যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও হালকা অথচ রাসূলুল্লাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে আমরা তাকে ধ্বংসাত্মক গুনাহসমূহের মধ্যে গণনা করতাম।'

(সহীহ বুখারী ২/৯৬১, হাদীস ৬৪৯২)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ)-এর নিম্নোক্ত উক্তি প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেক মুমিনের সামনে থাকা উচিত। তিনি বলেন-

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الْحَسَنَةَ فَيَثِقُ بِهَا وَيَنْسَى الْمُحَقَّرَاتِ فَيَلْقَى اللّٰهَ وَقَدْ اَحَاطَتْ بِهِ، وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِّئَةَ فَلَا يَزَالُ مِنْهَا مُشْفِقًا حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ اٰمِنًا

'মানুষ নেক কাজ করে এর উপর আস্থাশীল হয়ে যায় এবং (তার থেকে প্রকাশিত) সেসব গুনাহকে ভুলে যায় যেগুলোকে তুচ্ছ ও সাধারণ মনে করা হয়। এরপর আল্লাহ তাআলার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সেসকল গুনাহ তাকে বেষ্টন করে ফেলে। পক্ষান্তরে কেউ মন্দ কাজ করে কিন্তু এর ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত্র থাকে এরপর আল্লাহ তাআলার সাথেনিরাপদ অবস্থায় সাক্ষাৎ করে।'

(ফাতহুল বারী ১১/৩৩৭)

যদি উপরোক্ত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ নেক আমলসমূহের যথাযথ মূল্যায়ন যদিও তা সহজ থেকে সহজতর হয় এবং গুনাহের ভয় যদিও তা ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়, একজন মুমিনের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং প্রতি মূহূর্তে স্মরণ থাকে তাহলে সে উভয় ধরনের প্রান্তিকতা অর্থাৎ বাড়াবাড়ি ও শিথিলতা থেকে নিরাপদে থাকবে এবং সর্বদা আশা ও ভয়ের মধ্যে থাকবে। আল্লাহ তাআলার রহমত ও সন্তুষ্টি লাভের আশাও তার অন্তরে থাকবে এবং তাঁর শাস্তি ও ক্রোধের ভয়ও থাকবে। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে তার আকীদা-বিশ্বাস তা-ই থাকবে যা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন-

نَبِّئْ عِبَادِيْ اَنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ

'আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু আমার শাস্তিই হুল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা হিজর ৪৯-৫০)

(গ) কারো কারো মধ্যে এ রোগও দেখা যায় যে, তারা যখন সহজ নেক আমল সম্পর্কে অনেক বেশি প্রতিদান ও সওয়াবের কথা শুনে তখন একে অস্বীকার করে বসে এবং বলে যে, এ পরিমাণ আমলের এত অধিক সওয়াব! অথচ যদি পবিত্র কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা কোন সওয়াব প্রমাণিত হয় তাহলে একে মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া এবং উক্ত নেক আমলকে আল্লাহ তাআলার বড় নেয়ামত জ্ঞান করে মূল্যায়ন করাই একজন মুমিনের কর্তব্য। একটু চিন্তা করা উচিত, বিশ্বাস ও সমর্পণ এবং কৃতজ্ঞতা ও যথাযথ মূল্যায়নের পরিবর্তে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা কত বড় গুনাহ এবং কত বড় অকৃতজ্ঞতা! হ্যাঁ, যদি কোন মূর্খ ওয়ায়েজ কোন বাতিল বা জাল হাদীসের উদ্ধৃতিতে কোন আমলের

সওয়াব বর্ণনা করে তাহলে আলেমদের এর প্রতিবাদ করা এবং উক্ত রেওয়ায়াত বাতিল হওয়ার কথা প্রকাশ করা জরুরি।

২. ফযীলতপূর্ণ সময়সমূহের ফযীলতের সম্পর্কে বিশেষভাবে এবং ফযীলতের এমন কিছু হাদীসের ব্যাপারে সাধারণভাবে, যেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে, অনেক ওয়ায়েজ ও বক্তাদের মধ্যে দু ধরনের শিথিলতা লক্ষ করা যায়। একটি হল তারা যে হাদীসই যেখানেই পড়েন বা যার কাছেই শুনেন, বর্ণনা করা শুরু করেন অথচ অনেক সময় এমন হয় যে, বর্ণনাটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, আদৌ হাদীস নয় অথবা সনদ ও সূত্রের দিক থেকে এতই দুর্বল যে, উক্ত বর্ণনা বিদ্যমান থাকা না-থাকা সমান পর্যায়ের। সুতরাং কোন হাদীসকে জনসাধারেণের সামনে পেশ করার আগে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে নিশ্চয়তা অনুসন্ধান করে নেওয়া একজন আলেমের দ্বীনী দায়িত্ব।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

كَفَا بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

'কারো গুনাহগার হওয়ার জন্যের এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে তা-ই বর্ণনা করবে।' (সুনানে আবু দাউদ ২/৬৮১; সহীহ মুসলিম ১/৮)

অন্য এক হাদীসে আরো ইরশাদ হয়েছে-

اِتَّقُوا التَّحْدِيْثَ عَنِّيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ

'আমার দিকে সম্পর্কিত করে হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সতর্কতা অবলম্বন কর। শুধু এমন হাদীসই বর্ণনা করবে যার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে।' (জামে তিরমিযী ২/১২৩)

সুতরাং প্রত্যেক দাঈ ও মুবাল্লিগ, উস্তাদ ও পীর, ওয়ায়েজ ও বক্তার উপর হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ফরয। বর্ণনাযোগ্য কি না তা যাচাই ব্যতিরেকে শুধু কোন কিতাব বা পুস্তকে দেখে অথবা কারো কাছে শুনে কস্মিনকালেও হাদীস বর্ণনা করা যাবে না। অন্যথায় নিজের অজান্তেই বহু মুনকার, বাতিল, জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনাকে হাদীসে নববী হিসেবে বর্ণনা করতে থাকবে; যেগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসেবে প্রমাণিত নয়।

দ্বিতীয় শিথিলতা হল ফযীলতের হাদীস এত অধিক পরিমাণে বর্ণনা করেন যে, ফরয ও ওয়াজিব নিয়ে আলোচনা করার সুযোগই তারা পান না। মসনূন তরীকা হল ফাযায়েলের আগে ফরয নিয়ে আলোচনা করা এবং উৎসাহ বৃদ্ধিকারী রহমতের হাদীসসমূহের সাথে সাথে ভীতিপ্রদর্শনকারী শাস্তির হাদীসসমূহেরও

বর্ণনা করা। শুধুই ফযীলত ও আগ্রহ প্রদানের হাদীস বর্ণনায় ব্যস্ত থাকা দাওয়াতের নববী-পন্থার পরিপন্থী।

তেমনি ফযীলতের যে সকল হাদীসের এমন বিশেষ মর্ম থাকে যে, শুধু শাব্দিক অর্থ দ্বারা সাধারণ মাসুষ সে মর্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, সেসকল হাদীসকে ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ ছাড়া বর্ণনা করতে থাকা অত্যন্ত ভুল পদ্ধতি; যার ব্যাপারে হাদীস শরীফে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কারণ এর দ্বারা মানুষের মধ্যে করণীয় আমলসমূহের ব্যাপারে শিথিলতা এবং গুনাহের ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি হয়। দাঈ ও ওয়ায়েজদের এই দু ধরনের শিথিলতার সংশোধনের লক্ষ্যে ইমাম ইবনুল জাওযী র. তাঁর 'তুহফাতুল ওয়ায়েজীন' কিতাবে লেখেন, 'অনেক ওয়ায়েজ ভিত্তিহীন হাদীস দ্বারা নিজেদের মাহফিল উত্তপ্ত করে। উদারণস্বরূপ, রজব মাসের প্রথম জুমারাতে এবং শবে বরাতের বিশেষ নামায অথচ ফরয ও ওয়াজিবসংক্রান্ত হাদীসসমূহের বর্ণনা করে না।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা ভীতিপ্রদর্শনকারী জাল হাদীস এত অধিক পরিমাণে বর্ণনা করে যে, মানুষ আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। (অথচ নিয়ম হল ভীতি প্রদর্শনের নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পাশাপাশি রহমত ও আগ্রহ প্রদানের হাদীসসমূহও বর্ণনা করা) পক্ষান্তরে কিছু মানুষের অভ্যাস হল তারা আগ্রহ প্রদানকারী জাল হাদীস বর্ণনা করে অথবা এমন সহীহ হাদীস বর্ণনা করে যার বিশেষ মর্ম থাকে। (তুহফতুল ওয়ায়েজীন)

আশুরার তাৎপর্য ফজিলত ও করণীয়

আশুরার তাৎপর্য

ইসলাম ধর্মে মুহাররম মাসটি একটি গুরুত্ব ও মর্যাদাশীল মাস। যার গুরুত্ব প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পাকের সূরা তওবার ৩৬ নং আয়াতে বলেন- "আল্লাহ তায়ালার কিতাবানুযায়ী আল্লাহর নিকট মাসসমূহের সংখ্যা হচ্ছে বিশেষরূপে সম্মানিত।" ঐ চারটি মাস হল-১। জিলক্বদ ২। জিলহজ্জ ৩। মুহাররম ও ৪। রজব। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রক্তপাত হারাম ছিল। উক্ত কারণে এই কয়েক মাসে সমগ্র আরব দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকত। এর ফলে মানুষ নিরাপদে হজ ও উমরাহ পালন করতে পারত।

উপরে উল্লিখিত আয়াতটি প্রমাণ করে যে, মুহাররম ও অন্যান্য মাসের মার্যাদা ও গুরুত্ব শুধুমাত্র ইসলামের জামানা হতেই নয়, বরং যেদিন থেকে আসমান-জমিন সৃষ্টি করা হয়েছে, ঐ দিন হতেই এ মাসগুলোর গুরুত্ব রয়েছে।

এ কারণে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি, যেমন ইয়াহুদী, খৃষ্টান, কাফির ও মুশরিক প্রভৃতি অমুসলিম জাতিরও এ মাসসমূহে মারামারি, হানাহানি হতে বিরত থাকার চেষ্টা করত এবং এ মাসে খুন-খারাবী ইত্যাদিকে অবৈধ মনে করত। কারণ, আরবের কাফিররা ইবরাহীমী ধর্মের দাবীদার ছিল। কাজেই তারা হারাম মাসগুলোকে মেনে চলত। কখনও যুদ্ধ করা আবশ্যক হলে কিংবা যুদ্ধ করতে করতে কোন হারাম মাস এসে পড়লে তারা মনগড়া বলত- এ বৎসর এ মাসটি হারাম বলে গণ্য হবে না, বরং এর বদলে পরের মাস হারাম বলে গণ্য হবে। যেহেতু এ পরিবর্তনটি তারা মনগড়া করত, তাই এর প্রতিবাদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-("মাসগুলোর) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও বৃদ্ধি মাত্র। যা দ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। (এরূপে যে,) তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে। আল্লাহপাক যে মাসগুলোকে হারাম করেছেন যেন তারা তার সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে।

অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলোকে হালাল করে নেয় এবং তাদের দুষ্কর্মগুলো তাদের নিকট ভাল মনে হয়। আল্লাহ এরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত দান করেন না।" (তাওবা-৩৭)

তবে যদি কাফিররা হারাম মাসগুলোর মধ্যে মুসলমানদের সাথে লড়াই বেঁধে দেয়, তখন মুসলমানদের কি কর্তব্য হবে, সে প্রসঙ্গে অপর একটি আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন,-"সম্মানিত মাস সম্মানিত মাসের বিনিময়ে আর এই সমস্ত সম্মানতো পারস্পরিক বিনিময়ের বস্তু। সুতরাং যে ব্যক্তি তোমাদের উপর (হারাম মাসগুলোতে) উৎপীড়ন করে, তোমরাও তার উপর উৎপীড়ন করবে, যেরূপ তোমাদের উপর উৎপীড়ন করা হয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং বিশ্বাস রাখবে- আল্লাহ খোদাভীরুদে সঙ্গে থাকেন।"

(বাক্বারা ঃ ১৯৯)

এছাড়া একবার ঘটনাক্রমে সাহাবাদের সাথে কাফিরদের এক সংঘর্ষ হয় এবং আমর হাযরামী নামক কাফির নিহত হয়। এটা ছিল জমাদিউস সানী মাসের শেষ তারিখ। হারাম মাস হওয়ার কারণে রজব মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল; কাজেই বিধর্মীরা বলতে লাগল- "মুসলমানগণ সম্মানিত মাসের প্রতিও গুরুত্ব দেয়নি।" তদুত্তরে নিম্নের আয়াতটি নাযিল হয়।

"যখন মানুষ আপনাকে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তদুত্তরে আপনি বলে দিন যে তাতে (ইচ্ছাকৃতভাবে) যুদ্ধ-বিগ্রহ করা গুরুতর অপরাধ। আর আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে, মসজিদে হারামের সাথে কুফুরী করা, মসজিদে হারাম অধিবাসীদেরকে তথা হতে বহিষ্কার

করা আল্লাহর নিকট তার চেয়ে আরো বেশি গুরুতর অপরাধ। (বাক্বারা-২১৭) অর্থাৎ যদিও মুসলমানরা হারাম মাসের মর্যাদা লংঘন করে অপরাধ করেছে বটে; কিন্তু তোমরা তো এর চেয়েও জঘন্যতর অপরাধে লিপ্ত আছ। যা আয়াতে উল্লেখ্ করা হয়েছে। সুতরাং নিজ অপরাধগুলোর প্রতি না দেখে অন্যের অপরাধ নিয়ে সমালোচনা করা তোমাদের উচিত নয়।

আশুরার ফজিলত

মুহাররম মাস অতি সম্মানীত এবং ফজিলতের মাস। যার নামের মধ্যে সম্মান এবং মর্যদার অর্থ নিহিত রয়েছে। কেননা, মুহাররম শব্দের অর্থ হচ্ছে সম্মানিত। বিশেষভাবে মুহাররমের ১০ তারিখ অত্যাধিক ফজিলতপূর্ণ। এদিনটিকে 'আশুরা' বলা হয়।

অনেকে মনে করে থাকে, হযরত হুসাইন (রাঃ) মুহাররমে শাহাদতবরণ করার কারণেই মুহাররম মাস ফজিলত ও সম্মানের মাস হয়েছে। এটা নিছক ভুল কথা; বরং এ মাসের ফজিলত দুনিয়ার প্রথম হতেই সাব্যস্ত হয়েছে। তাই বলা যায়, এ মাসে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে তাঁর শাহাদতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। **(মাসিক আল কাউসার....)**

মুহাররম মাস ফজিলতের মাস হওয়ার কারণ হচ্ছে- ইতিহাসে যে সমস্ত বড় বড় ঘটনা ঘটেছে যথা-ফিরাউনের নির্যাতন হতে হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের নাজাত এ দিনেই হয়েছে। এ কারণে তাদেরকে ঐ নিয়ামতের শোকর আদায় করার জন্য এ দিনে রোযা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। (আহসানুল ফাতওয়া) **এসব হাদীস নয় ২/১২০ পৃ:**

এছাড়া ইবনে নাবাতা স্বীয় ২য় খুৎবায় লিখেছেন, হযরত আদম (আঃ)-এর তাওবা এ দিনে কবুল হয়েছে। হযরত ইদরীস (আঃ)-কে এ দিনেই জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এ দিনেই হযরত নূহ (আঃ) এবং তাঁর সাথে নৌকায় অবস্থিত ঈমানদারগণকে প্লাবন হতে নাজাত দেয়া হয়েছে এবং এ দিনেই আল্লাহপাক ইবরাহীম (আঃ)-কে কুখ্যাত নমরূদের আগুন হতে মুক্তিদান করেছেন। উক্ত দিনেই আল্লাহপাক হযরত মূসা (আঃ)-এর সহিত প্রথম কালাম (কথা) বলেছেন এবং তাঁর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। এ আশুরার দিনেই আল্লাহ তায়ালা হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে রোগ হতে মুক্তি দিয়েছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট ফিরিয়ে দিয়েছেন। হযরত ইউনুস (আঃ)-কে মাছের পেট হতে উদ্ধার করেছেন। এ ১০ মুহাররমের দিনই বনী ইসরাঈলের জন্য আল্লাহপাক নীল নদীতে ১২টি কুদরতী রাস্তা তৈরী করেছেন। আশুরার দিনেই দাউদ (আঃ)-এর

গুনাহ আল্লাহ মাফ করেছেন এবং সুলাইমান (আঃ)-এর বাদশাহী ছিনিয়ে নেয়ার পর পুনঃফিরিয়ে দিয়েছেন। এই দিনেই হযরত ঈসা (আঃ) কে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। উক্ত দিনেই হযরত জিব্রাইল (আঃ) রহমত নিয়ে দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন এবং এ দিনেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ মাফের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১০ মুহাররম এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন যেদিনে আল্লাহ পাক দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। এ দিনেই আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আসমান হতে বৃষ্টি ও রহমত বর্ষণ করেছেন। এছাড়া আরও অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এ আশুরার দিনে সংঘটিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীসহ তাবিয়ীগণের মর্মান্তিক শাহাদতের ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, হযরত হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদতের কারণে এই মাসটি গুরুত্বপূর্ণ হয়নি; বরং এটা বলা চলে যে, ন্যায় ও সত্যের জন্য তাঁর শাহাদত এ মাসে হওয়ার কারণে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের ফজিলত বৃদ্ধি পেয়েছে।

আশুরায় আমাদের করণীয় কাজসমূহ

এ দিনে রোজা রাখা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মুহররমের ১০ তারিখে আল্লাহর খুশীর জন্য রোযা রাখবে, তার পূর্বের এক বছর গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। মুহাদ্দিসীনে কিরামের অভিমত অনুসারে, এটা দ্বারা সগীরাহ গুনাহ উদ্দেশ্য। কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা করা জরুরী। খাঁটি আন্তরিকভাবে তওবা করে নিলে অতীতের ১ বছরের সমস্ত গুনাহ মাফ পাওয়ার আশা করা যায়। কোন একজন সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই দিনতো ইয়াহুদীরাও রোযা রাখে। তার উত্তরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন "আমি যদি আগামী বছর জিন্দা থাকি, তাহলে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য বা মিল হতে পৃথক হওয়ার জন্য ১০ তারিখের রোযার সাথে আরো ১টি দিন মিলিয়ে রোযা রাখব"। এ কারণে আমাদের উচিত, আমরা যেন শুধুমাত্র ১০ তারিখে রোযা না রাখি, বরং ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ তারিখে দুই দিন রোযা রেখে এই সুন্নাতটি পালন করি। এছাড়া ইবনে নাবাতা স্বীয় ২য় খুতবায় যঈফ হাদীসের আলোকে লিখেছেন যে, এ দিনে যে ব্যক্তি কোন উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় পরাবে, আল্লাহপাক তাকে কিয়ামতের দিন শক্ত আযাব হতে মুক্তি দিবেন। এ দিনে যে ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার ভাল বিনিময় দান করবেন। এ দিনে যে ব্যক্তি কোন ইয়াতীমের মাথা মুছে দিবে, অথবা কোন ভুখাকে খাওয়াবে অথবা কোন পিপাসিত ব্যক্তিকে পান করাবে, আল্লাহপাক ঐ ব্যক্তিকে রোগ,

দুর্বলতা ও অলসতা হতে মুক্ত রাখবেন। এদিনে যে ব্যক্তি চোখে সুরমা লাগাবে, তার চোখে কোন অসুখ হবে না এবং এ দিনে যে ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনকে সাধ্য অনুযায়ী ভালভাবে খাওয়াবে, আল্লাহ তায়ালা পুরো বৎসর তার উপর রিজিক প্রশস্ত করবেন।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীনের নিকট বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা উল্লিখিত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়নি, বরং যঈফ হাদীস দ্বারা কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই ইবাদতের নিয়তে নয়; বরং ফায়দা অর্জনের নিয়তে এদিন উপরোক্ত আমলগুলো আদায় করা যায়।

সফর মাস ঃ প্রচলিত কুসংস্কার ও সময়ের শুভ-অশুভ

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা কতক মাস, দিন ও রাতকে অন্যান্য মাস, দিন ও রাতের চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ বানিয়েছেন এবং তাতে ভাল কাজের অধিক বরকত রেখেছেন। কিন্তু কোন মাস, দিন ও রাত বা কোন সময়কে অকল্যাণকর বা অশুভ বানাননি। সময় মাত্রই আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও করুণা। উত্তম ও সঠিক কাজের মাধ্যমে মানুষ যে কোন সময়কেই ফলপ্রসূ ও রবকতময় করতে সক্ষম।

কোন মাস, দিন বা রাতকে অশুভ মনে করা বা বিশেষ কোন সময়কে বিশেষ কাজের জন্য অশুভ ও অলক্ষণে মনে করা জাহেলিয়াতের কুসংস্কার। যেমন ইসলামপূর্ব যুগের কোন কোন লোকের এই ধারণা ছিল যে, শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদির অনুষ্ঠান অশুভ ও অকল্যাণকর। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা,. এই বিত্তিহীন ধারণাকে এই বলে খণ্ডন করেছেন যে-

تَزَوَّجَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شَوَّالٍ وَبَنٰى بِىْ فِىْ شَوَّالٍ فَاَىُّ نِسَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اَحْظٰى عِنْدَهٗ مِنِّىْ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শাওয়াল মাসেই বিবাহ করেছেন এবং শাওয়াল মাসেই বিবাহ রজনী উদযাপন করেছেন। অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে"?

(সহীহ মুসলিম হাদীস, ১৪২৩)

বর্তমানে কিছু লোক মহররম মাসের ব্যাপারে এ জতীয় ধারণা পোষণ করে। তারা এ মাসটিকে বিবাহ-শাদির জন্য অশুভ মনে করে। সম্ভবত তাদের

এই ভ্রান্ত ধারণার পেছনে এ মাসে হযরত হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদাত বরণের ব্যাপারটি কার্যকর। অথচ সময় কখনো অশুভ হয় না বিশেষ করে মহররম মাস তো 'আশহুরে হুরুম' তথা মর্যাদাপূর্ণ মাস-চারটির অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। রমযান মাসের পর এ মাসের গুরুত্ব ও ফযীলতই সবচেয়ে বেশি। হযরত হোসাইন (রাঃ) এর শাহাদত বরণের মাধ্যমে এ মাস কীভাবে অশুভ হতে পারে? অশুভ ও অকল্যাণ তো ওই সব লোকের বদআমলের মধ্যে নিহিত, যারা তাঁকে অন্যায়ভাবে শহীদ করেছে। বছরের কোন্ মাসটি এমন আছে, যাতে কোন মহান ব্যক্তির শাহাদতের ঘটনা ঘটেনি? তবে কি বছরের সকল মাসই অশুভ ও অকল্যাণকর হয়ে যাবে?

সফর মাসের ব্যাপারেও জাহেলি যুগে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, এ মাসটি অশুভ। নাউযুবিল্লাহ! এ জাতীয় শুভাশুভের ধারণা একটি কুসংস্কার, যাকে ইসলাম বাতিল সাব্যস্ত করেছে এবং এভাবে বান্দাদেরকে এক বিরাট মুসীবত থেকে দিয়ে আরাম ও স্বস্থির জীবন-যাপনের পথ সুগম করেছে।

কুসংস্কার অর্থ হল, কোন ধরনের দলীল-প্রমাণ ছাড়া শুধু ধারণার ভিত্তিতে কোন বিশ্বাস পোষণ করা এবং কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব গ্রহণ করা। এ এমন এক মারাত্মক ব্যাধি, যা মানুষের মন ও মগজকে নানা ধরনের কাল্পনিক বিষয়াদির আখড়া বানিয়ে ছাড়ে; মানুষকে হতাশায় নিমজ্জিত করে এবং নানা ধরনের অর্থহীন রীতি ও রেওয়াজের দুর্বহ বোঝা তার কাঁধে চাপিয়ে দেয়, আর অকারণ দুঃশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতির অসংখ্য ছিদ্রপথ উন্মুক্ত করে; বরং সামান্য চিন্তা করলেই স্পষ্ট হবে যে, এই ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার অনুসরণ শিরকের মত মহা অপরাধেরও মূল; এছাড়া কত অসংখ্য শিরকী বিশ্বাস ও কর্ম এবং বিদআতী কার্যকলাপ যে এ থেকে জন্ম নেয়, তা আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

এই কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন ধ্যান-ধারণার একটি নিকৃষ্টতম প্রকার, যা মানুষের জীবন-যাত্রায় বিরূপ প্রভাব ফেলে তাহল এই শুভাশুভের বিশ্বাস ও কুলক্ষণ গ্রহণ করার মানষিকতা। যেহেতু এর ভিত্তিই হল মানুষের মগজপ্রসূত ধ্যান-ধারণা ও নানা অলীক কল্পনা, তাই স্থান ও কালভেদে এর যে কত রূপ ও ধরন হতে পারে তা কল্পনারও অতীত।

কোথাও অমাবস্যার রাতকে বা রাতের বিশেষ অংশকে অলক্ষুণে মনে করা হয়, কোথাও বিজোড় রাতকে, কোথাও বা বিশেষ দিনকে, আবার কোথাও বিশেষ স্থানকে অলক্ষুণে মনে করা হয়। কেউ একটি বিষয়কে অশুভ লক্ষণ মনে করে, অপরজন অন্য একটি বিষয়কে। আবার অনেকে বিশেষ কার্যাদির জন্য বিশেষ দিন বা রাতকে অশুভ মনে করে। এসবই মূলত আরব পৌত্তলিক ও

ভারতীয় মূর্তি পূজারীদের অন্ধ অনুসরণ। কেননা তারা গ্রহ-নক্ষত্রের কাল্পনিক প্রভাব বা নানা ধরনের অলীক ধারণার ভিত্তিতে এ জাতীয় অর্থহীন বিষয়াদি উদ্ভাবন করেছিল।

এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত মারাত্মক একটি কুসংস্কার এই যে, আজও অনেক মানুষ সেই ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের মত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করাকে একটি কুলক্ষণ মনে করে। অন্তত প্রথম সন্তান কন্যা হওয়া যে অশুভ এতো অনেকেরই বিশ্বাস। দুঃখের ব্যাপার হল অনেক 'মা'ও এই কন্যা সন্তানকে অপয়া মনে করেন। নাউযুবিল্লাহ!

ইসলামের একটি বড় অবদান এই যে, ইসলাম দলীল-প্রমাণহীন কোন ধারণা পোষণকে সমূলে উৎপাটিত করেছে এবং এমনই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার তাওহীদের বিশ্বাস দান করেছে, যাতে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কোনই স্থান নেই। বিশেষ করে এই কুলক্ষণ গ্রহণ করার মানসিকতা অত্যন্ত কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে ইসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন لَاعَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَاصَفَرَ "রোগ লেগে যাওয়া' 'কুলক্ষণ' 'পেঁচা' ও 'সফর' এসবই অলীক কল্পনা। এসবের কোন বাস্তবতা নেই।" (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৭৪৩)

এই হাদীসে কয়েকটি কুসংস্কারের অপনোদন করা হয়েছে ঃ

ক. রোগ-ব্যাধি একজন থেকে অপর জনের সাথে লেগে যাওয়ার ধারণা। অথার্ৎ রোগব্যাধি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে এক জনের শরীর থেকে উড়ে এসে অপরজনের শরীরে লেগে যেতে পারে, এ ধারণাই শিরক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ যার অর্থ হল, 'তবে প্রথম রোগীর শরীরে কোথা থেকে রোগ এল?–এই বাক্যে এ ভ্রান্তবিশ্বাসের শিকড় কেটে দিয়েছেন। হ্যাঁ, যেসব রোগব্যাধির ব্যাপারে দলীল দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশার ফলে তা সংক্রমিত হয়, সেক্ষেত্রে তাওহীদের বিশ্বাসের পাশাপাশি উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করাতে কোন দোষ নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে শরীয়ত এর আদেশও কারেছে। শরীয়ত যে বিষয়টিকে বাতিল ও ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেছে তা হল, কোন ব্যধিকে এমন মনে করা যে, তা নিজে নিজেই সংক্রমিত হতে পারে। অথচ উপকার ও অপকারের একমাত্র মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা। হায়াত-মওত, সুস্থতা-অসুস্থতা সব কিছুই তাঁর হুকুমে হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে এই হাদীসে ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল, কুলক্ষণ গ্রহণ করা। হাদীসে এর জন্য طِيَرَة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির

মূল হল طير অর্থাৎ পাখি। আরব দেশে শুভাশুভ নির্ণয়ের এই পন্থা অধিক প্রচলিত ছিল যে, তারা কোন কাজের সংকল্প করলে পাখি উড়িয়ে দিত। পাখি ডান দিকে উড়ে গেলে তা শুভ লক্ষণ, আর বাম দিকে গেলে তা অশুভ লক্ষণ মনে করত এবং উদ্দিষ্ট কর্ম থেকে বিরত থাকত। এরপর যে কোন কুলক্ষণ গ্রহণই طيرة নামে অখ্যায়িত হয়েছে। তার পদ্ধতি যাই হোক না কেন।

ইসলাম এসব কাল্পনিক বিষয়কে ভিত্তিহীন ঘোষণা করেছে এবং স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে, কুলক্ষণ গ্রহণ করা শিরকেরই একটি প্রকার।

(মুসনাদে আহমাদ ১/৩৮৯; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৬১৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১০, ৩৯০৭; সহীহ ইবনে হিব্বানম হাদীস ৬১২২)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! জাহেলি যুগে আমরা পাখি উড়িয়ে শুভাশুভ নির্ণয় করতাম। তিনি ইরশাদ করলেন,"এ হল নফসের ওয়াসওয়াসা ওঅলীক কল্পনা)। অতএব এ কারণে উদ্দিষ্ট কর্ম থেকে বিরত হয়ো না।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৭৬৭)

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "অন্তরে এই দোয়া পড়ে কাজ আরম্ভ করবে–

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّاأَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّاأَنْتَ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّابِاللّٰهِ

"হে আল্লাহ! একমাত্র তুমি কল্যাণ দাও এবং তুমিই অকল্যাণ থেকে রক্ষা কর। আর কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিও তুমিই দিয়ে থাক।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৯১৯)

অপর এক হাদীসে এসেছে যে-

مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ قَالُوْا ؛ وَمَا كَفَّارَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ ؛ أَنْ يَّقُوْلَ ؛ اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّاخَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

"যে ব্যক্তিকে কোন অশুভ লক্ষণ উদ্দিষ্ট কর্ম থেকে বিরত রাখে সে যেন শিরক করল। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এর কাফফারা কি? ইরশাদ হল একথা বলে (ও কাজ শুরু করা)

اَللّٰهُمَّ لَاخَيْرَ اِلَّاخَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ اِلَّاطَيْرُكَ، وَلَااِلٰهَ غَيْرُكَ

"হে আল্লাহ কল্যাণ তোমার পক্ষ থেকেই আসে এবং অকল্যাণও তোমার আদেশেই হয়। তুমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই।"

(মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭০৪৫)

বস্তুত ইসলামে তাওহীদের বিশ্বাস এমনই সমুন্নত বিশ্বাস যে, যার অন্তরে তা স্থান গ্রহণ করেছে, তার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া আর কারো ভয় থাকবে না এবং তার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হবেন একমাত্র সেই সুমহান সত্তা। এটিই তাওহীদের প্রাণী। যেখানে এই প্রাণ নেই, সেখানে শিরকের ওই সমস্ত শাখা-প্রশাখা বের হতে থাকবে, যা আমরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি।

তৃতীয় যে বিষয়টি এই হাদীসে বাতিল সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল, পেঁচার ব্যাপারে জাহেলি কুসংস্কার। যেমন তাদের ধারণা ছিল যে, কোন বাড়ির ছাদে বা গাছে পেঁচা বসলে সেখানে কোন মানুষের মৃত্যু হবে বা কোন বিপদ ঘটবে। অথচ হায়াত-মওত, বিপদ-আপদ সব কিছুই নির্ধারিত এবং সব কিছুই ঘটবে আল্লাহ তাআলার আদেশে নির্ধারিত সময়ে। পেঁচা দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে এর কী সম্পর্ক? সব কিছুর খালেক, মালেক যাঁার আদেশেই সব কিছু ঘটে, তিনি কি পেঁচাকে বিপদ-আপদের নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন? এই ধারণাকে আকীদা হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে কোন দলীল আছে কি?

হ্যাঁ, বিপদ-আপদ সাধারণত গুনাহের কারণে ঘটে থাকে। এজন্য তওবা ও ইস্তেগফারের দরজা খোলা রয়েছে। অনুরূপ ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য দোয়া ও আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনার দরজাও তো সর্বদাই খোলা। এসব জিনিসের প্রতিই গুরুত্ব সহকারে যত্নবান হওয়া উচিত।

চতুর্থ যে বিষয়টি হাদীস শরীফে উল্লিখিত হয়েছে তা হল 'সফর'। এর ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তার একটি হল, জাহেলি যুগে সফর মাসকে অশুভ মনে করা হত। ইসলাম এই ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করেছে এবং একে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন কুসংস্কার সাব্যস্ত করেছে। ইসলাম জানিয়ে দিয়েছে যে, অলক্ষুণে বা অপয়া হওয়ার কোন ধারণার স্থান ইসলামে নেই। এসবই মানুষের কুসংস্কার এবং মনের অলীক কল্পনা। সবচেয়ে বড় অলক্ষুণে বা অশুভ বিষয় হল মানুষের বদআমল ও পাপাচার, যা আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও লানতকে টেনে আনে। অতএব তা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং নেক আমল ও ভাল কাজের মাধ্যমে তাকে ফলপ্রসূ বানানো উচিত। এটাই কল্যাণ ও বরকত লাভের পথ। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দিন এবং সব ধরনের ওয়াসওয়াসা, কল্পনা ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থেকে নিরাপদ রাখুন। আমিন।

যিলহজ্ব মাস ঃ ফযীলত ও করণীয়

এই দিন এই সময় যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই একে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করেছেন। বছর, মাস, সপ্তাহ, দিন, রাত ইত্যাদি তিনিই সাজিয়েছেন। আর তিনিই তাঁর অপার মহিমা ও প্রজ্ঞায় এবং একক হেকমত ও কুদরতের বলে বছরের কিছু মাস, মাসের কিছু দিন এবং দিনের কিছু অংশকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। যিলহজ্ব মাস সেগুলোর অন্যতম।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি-আসমানসূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তার মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এতে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না।" (সূরা তওবা ৩৬)

আয়াতে উল্লেখিত সম্মানিত চারটি মাস কী কী তা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে বলে দিয়েছেন। সেগুলোর তিনটি হচ্ছে ধারাবাহিক-তা হচ্ছে যিলকদ, যিলহজ্ব ও মহররম এবং বছরের মাঝেরটি হচ্ছে রজব। (সহীহ বুখারী ২/৬৭২; তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৩৮৯)

ইসলাম পূর্ব আরবরাও এ মাসগুলোকে সম্মানিত মনে করত এবং এগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকত। মুফাসসিরীনে কেরামের তাফসীরের আলোকে বোঝা যায়, যিলহজ্ব মাসের পবিত্রতাই মূলত এখানে মুখ্য।

এ মাসটি হজের মাস। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ এ মাসের সাথে জড়িত। এ মাসে যেন সকল মানুষ নির্বিঘ্নে এসে হজ আদায় করতে পারে, সে জন্য এর আগের মাস যিলকদকে আরবের মুশরিকরাও সম্মানিত মনে করত। এ মাসে সবধরনের হানাহানি, কাটাকাটি নিষিদ্ধ মনে করত। আবার যেন মানুষ হজ আদায় করে আপন জায়গায় নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারে সে জন্য এর পরের মাস মহররমকেও তারা সম্মানিত মনে করত এবং তারা এ মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়াকে অপরাধ মনে করত।

ইসলামে হানাহানি, কাটাকাটি এমনিতেই নিষেধ, আর এ সম্মানিত মাসসমূহে সেসব আরো মারাত্মক অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়। মূলত যিলহজ্ব মাসের পবিত্রতা রক্ষা এবং সে ফযীলতপূর্ণ দিনগুলো যথাযথভাবে পালন করার লক্ষ্যেই আগে পরের মাস দুটিকেও সম্মানিত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ২/৩৯১)

যিলহজ্ব মাসের বিশেষ কিছু অংশের আরো কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। সূরা ফজরের শুরুতে আল্লাহ তাআলা শপথ করে বলেন– وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 'শপথ ফজরের, শপথ দশ রাতের।'

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইবনে যুবায়ের (রাঃ) ও মুজাহিদ রহ. প্রমুখ মুফাসসির সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে 'দশ রাত' বলতে যিলহজ্ব মাসের প্রথম যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ রাতকেই বোঝানো হয়েছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৩৫)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার কাছে এ দশকের এমন মর্যাদাই রয়েছে। তাই তিনি এগুলোর শপথ করে ইরশাদ করেছেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস থেকে এ দশকের ফযীলত আরো স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত. নবীজী ইরশাদ করেন-

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ فِيهِنَّ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ يَعْنِيْ عَشَرَذِيْ الْحِجَّةِ قَالُوْا ؛ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ قَالَ ؛ وَلَا الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، إِلَّارَجُلًا خَرَجَ بِنَفْسِهٖ وَمَا لِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذٰلِكَ بِشَيْءٍ

"আল্লাহ তাআলার নিকট কোন দিনের নেক আমলই এদিনগুলোর (যিলহজ্বের ১ম দশকের) নেক আমলের চেয়ে অধিক প্রিয় নয়। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়? উত্তরে বলেন, না আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; তবে হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয় আর তার কোন কিছুই নিয়ে সে ফিরে না আসে।"

(সহীহ বুখারী ১/১৩২; তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৫৩৫)

এছাড়াও আরো ফযীলত হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। শুধু হজ্ব ও কুরবানীই নয় এ মাসের ফযীলতে আমাদের যেসব করণীয় ও বর্জনীয় কাজ রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে অবহেলার কোন সুযোগ নেই।

করণীয় আমলসমূহ

১. আল্লাহ তাআলা যাদেরকে হজ্ব পালন করার মত সামর্থ্য দিয়েছেন তাদের এ গুরুদায়িত্বটি আদায় করা, কোন ধরনের অহেতুক ওজর–আপত্তি দেখিয়ে অবহেলা না করা, দুনিয়ার অন্যান্য প্রয়োজন পিছনে রেখে হজ্ব আদায়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। আমাদের কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ তাআলার দরবারে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং এখনই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করা দরকার যে, পরবর্তী মৌসুমে যেন কোন ভাবেই হজ্ব অনাদায় থেকে না যায়।

২. যাদের তেমন আর্থিক সচ্ছলতা নেই তাদের সব সময় আল্লাহর দরবারে দোয়া করা উচিত। তাওফীকদাতা একমাত্র তিনিই। নিঃস্ব ব্যক্তিকে সামর্থ্যবান করা তাঁরই কাজ। তাই একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবারই হজ্ব আদায়ের আগ্রহ থাকা দরকার।

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের এমন বহু ঘটনা পাওয়া যায়, যাদের শুধু কাবা যিয়ারতের অদম্য আগ্রহই ছিল; বাহ্যিক সামর্থ্য বলতে কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের সে আগ্রহ ও তামান্না পূর্ণ করেছেন। ঘরে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা না থাকলেও কাবা যিয়ারত তাঁদের নবীস হয়ে গেছে।

৩. কুরবানী দেওয়ার মত আর্থিক সচ্ছলতা যাদের রয়েছে তাদের কুরবানী দেওয়া উচিত। যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তাদেরও সাধ্যমত তা আদায়ের চেষ্ট করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরবানীর দিন আল্লাহর নামে পশু জবাই করার চেয়ে উত্তম আর কোন আমল নেই। তাই এ ফযীলতপূর্ণ আমলে আমাদের সবারই শরীক হওয়া দরকার।

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, জবাইকৃত পশুর গায়ের পশম পরিমাণ সওয়াব আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করবে। এমন একটি পুণ্যময় কাজে আমাদের অবহেলা দুঃখজনক। তবে মনে রাখতে হবে, এ কুরবানী যেন কখনো লোক দেখানোর জন্য বা নিজের বাহাদুরি প্রকাশের জন্য না হয় এবং দুনিয়াবি প্রতিযোগিতায় জেতার জন্য না হয়।

৪. যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশক অর্থাৎ ঈদের দিন ব্যতীত বাকি নয় দিন রোযা রাখার বিশেষ ফযীলতও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাফসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, "নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশুরার রোযা, যিলহজ্বের প্রথম দশকের রোযা এবং প্রত্যেক মাসের তিন রোযা কখনো ছাড়তেন না।" (মুসনাদে আহমদ ৭/৪০৮; হাদীস ২৫৯২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্বের রোযা রাখতেন না এ ধরনের একটি বর্ণনাও রয়েছে, তবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম রোযা রাখার বর্ণনাটিকেই বিভিন্নভাবে প্রাধান্য দিয়েছেন এ ছাড়া অন্যান্য হাদীসেও এ দিনগুলোতে রোযা রাখার বিভিন্ন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আর পূর্বোল্লিখিত সহীহ বুখারীর হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট সাব্যস্ত হয়েছে যে, এদিনগুলোর ইবাদত আল্লাহ তাআলার দরবারে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। তাই রোযা, নামায, তাসবীহ, তেলাওয়াত সবকিছু যতবেশি সম্ভব করা দরকার।

৫. বিভিন্ন হাদীসে 'ইয়াওমে আরাফা' অর্থাৎ যিলহজ্বের নয় তারিখের বিশেষ

ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ এই দিনে এত অধিক পরিমাণে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন যা আর কোন দিন দেন না। আরাফার ময়দানে উপস্থিত হাজ্বীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের সামনে ফখর করেন; তাদের জীর্ণশীর্ণ অবস্থার উপর আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হয়ে যান। তাই যেকোন দোয়া কবুলের উত্তম সময় হল আরাফার দিন। তাই এ দিনটিকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

এই আরাফার দিনে আমাদের বিশেষ করণীয় হচ্ছে-

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِىْ قَبْلَهُ وَالَّتِىْ بَعْدَهُ

"আরাফার দিনের (৯যিলহজ্বের) রোযার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি এর এক বছর আগে ও এক বছর পরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।" (মুসলিম ১/৩৬৩)

খ। নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সব ধরনের নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

يَوْمُ عَرَفَةَ هٰذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيْهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَلَهُ

"আরাফার দিন এমন একটি দিন যেদিন কোন ব্যক্তি তার কান, চোখ ও জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ-লাতায়েফুল মাআরিফ ৩০৮)

গ। এ দিনে ইখলাস ও বিশ্বাসের সাথে অধিক পরিমাণে কালেমা তাওহীদ পাঠ করা উচিত। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফার দিন এ কালেমাটি খুব বেশি পড়তেন।

لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

জামে তিরমিযীর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সবচেয়ে উত্তম দোয়া হচ্ছে আরাফার দিনের দোয়া। আর আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে-

لَاإِلٰهَ إِلَّااللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَعَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

এমনিভাবে আরো হাদীসে অধিক পরিমাণে ইস্তেগফার করার ফযীলতের কথা এসেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ আমলগুলো যথাযথভাবে করার তাওফীক দান করুন।

বর্জনীয় আমলসমূহ

যিলহজ্ব মাস যেহেতু একটি পবিত্র মাস, সম্মানিত মাস, তাই এর পবিত্রতাও সেভাবেই রক্ষা করতে হবে। এ মাসের পবিত্র দিনগুলোতে নেক কাজের যেমন বিশাল সওয়াব রয়েছে, তেমনি এ দিনগুলোতে গুনাহেরও ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। তাই এ দিনগুলোতে নেক কাজের যেমন বিশাল সওয়াব রয়েছে, তেমনি এদিনগুলোতে গুনাহেরও ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে, তাই এদিনগুলোকে অপবিত্র করার মত কোন আচরণ যেন আমাদের থেকে প্রকাশ না পায়। উদাহরণস্বরূপ দুয়েকটি তুলে ধরছি।

১. ঈদ উপলক্ষে গুনাহের সরঞ্জাম জোগাড় করা। এমন অনেক পরিবার রয়েছে যেগুলোকে দ্বীনদার বা নামাযী পরিবার বলে মানুষ জ্ঞান করে থাকে, সেখানেও ঈদ উপলক্ষে এ পবিত্র মাসে টিভি, ভিসিআর ও ডিশের সংযোগ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। যা করতে বলা হয়েছে তা না করে গুনাহের পহাড় তৈরির প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়, এটা বড়ই দুঃখজনক।

২. ইসলামের একটি পবিত্র খুশির দিনকে বিজাতীয় কালচারে ওদের মেলার মত করে সাজানো এবং শরীয়তের বিধিবিধান জলাঞ্জলি দিয়ে বিধর্মীদের আচার-আচরণের মাধ্যমে ঈদ উদযাপন করা। এ বিষয়টি আমাদের সমাজকে আজ বহুলাংশ গ্রাস করে ফেলেছে। ফলে এ সময়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে মিনতি করার পরিবর্তে ঢাকঢোল পেটানো, বেহায়াপনা গ্রহণ করতে বেশি দেখা যায়। এসব ব্যাপারে সতর্ক হওয়া জরুরী।

৩. বর্তমানে কুরবানী ও পবিত্র হজের মাসটি এমন সময় হচ্ছে যখন ঈসায়ী সনের শেষ ও শুরু। এ সনের শেষ ও শুরুকে বরণ করতে গিয়ে সমাজে এমন অশালীন আচার-আচারণের বহিপ্রকাশ ঘটে যা এ মাসের পবিত্রতাকে সম্পূর্ণ নিরর্থক করে দেয়। থার্টিফার্স্ট নাইট তথা বর্ষবরণের সময় মুসলমানদের আজকাল মনেই থাকে না যে, তারা একটি পবিত্র মাসের পবিত্র সময় অতিবাহিত করছে। এ সময় তাদের কী করা উচিত ছিল অথচ কী করছে!

৪. এ মাসটি ইবাদতের। যেকোন ইবাদতই এ মাসে করা যেতে পারে। তবে নির্দিষ্ট পদ্ধতির কোন নামায বা অন্য কোন আমল এ মাসের জন্য বিশেষভাবে নেই। কোন কোন বাজারি বইয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সূরা দিয়ে বিভিন্ন নামাযের ফযীলতও বর্ণিত আছে-এগুলো ভিত্তিহীন; কোন নির্ভরযোগ্য

হাদীসের কিতাবে এগুলো নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই।

এমনিভাবে যিলহজ্বের প্রথম তারিখের জন্য নির্দিষ্ট দোয়া, দ্বিতীয় তারিখের জন্য নির্দিষ্ট দোয়া, এভাবে প্রত্যেক তারিখের জন্য ভিন্নভিন্ন দোয়ার কথাও কোন কোন বইয়ে উল্লেখ আছে। এগুলোরও কোন ভিত্তি নেই। যেকোন সময়েই যে কোন দোয়া করা যায়।

এ পবিত্র দিনগুলোর কিছু ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও আছে একথা সত্য; কিন্তু কোন কোন অনির্ভরযোগ্য বইতে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন এমনিভাবে অন্যান্য দিনের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এদিনগুলোর ফযীলত যথাযথভাবে উপলব্ধি করার এবং সে মোতাবেক আমল করার তাওফীক দান করুন আমীন।

ঈদুল ফিতর ও আমাদের করণীয়

দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর পবিত্র ঈদের আনন্দ ধ্বনি। শহর ও গ্রামগঞ্জে সর্বত্রই সাজসাজ রব। ধনী-গরীব শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলেই এই ঈদ উদযাপনে আনন্দিত। সকলেই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটায় ব্যস্ত। যারা রোযা রাখে না, নামায পড়ে না, যাকাত-ফিতরাও আদায় করে না। তারাও ঈদের আনন্দ থেকে পিছিয়ে নেই। মহিলারা রাতের আরামকে হারাম করে ঈদের রাতে রান্না-বান্না ও ঘর সাজানোতেই কাটিয়ে দেয় সময়। ঈদুল ফিতর মুসলিম জাহানের সর্বজনীন আনন্দ উৎসব।

সমাজে মানুষ মাত্রেরই থাকতে পারে হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ ও মনোমালিন্য। আর ঈদ আসে অন্তরাত্মার সমস্ত কলুষতাকে ধুয়েমুছে পাক-সাফ করে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার দাবি নিয়ে। শিক্ষা দেয় পরস্পরের প্রতি প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রেরণা যোগায় উদার ও বিদ্বেষমুক্ত জীবন গড়ার।

পৃথিবীর সমস্ত জাতি গোষ্ঠীরই কোন কিছুকে কেন্দ্র করে বছরের নির্দিষ্ট আনন্দ-উৎসব করার প্রথা আছে। ঐ দিন তাদের ধর্মীয় স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন প্রকার আমোদ-প্রমোদ করে থাকে। ইসলামে রয়েছে গোটা মুসলিম উম্মার জন্য বৃহৎ দুটি আনন্দ উৎসবের দিন। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। যা অমুসলিম জাতির উৎসব থেকে স্বতন্ত্র।

মুসলিম জাতির উৎসব হবে ঈদ প্রবর্তক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর তরীকা অনুযায়ী। রাসূল সা,-ঈদের দিনে প্রথমে গোসল করে পবিত্র হতেন। শরিয়তসম্মতভাবে সাজগোজ করতেন। ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেতেন। (না খেলেও ক্ষতি নেই তবে সারাদিন অনাহারে থাকা নিষিদ্ধ) হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি খোরমা না খেয়ে বের হতেন না এবং বিজোড় সংখ্যায় খেতেন (বুখারী)

ঈদের দিনে নির্দোষ খেলাধুলা ও আনন্দ-উৎসব করা জায়েয। কিন্তু আমাদের মুসলিম সমাজে পবিত্র ঈদ ও পবিত্র বিয়ে-শাদীর অনুষ্ঠানে যে বাড়াবাড়ি চলছে তা অমুসলিমদেরকেও হার মানায়। যেন ভোজন আর সাজনের মধ্যেই ঈদের আনন্দ সীমাবদ্ধ। ফ্যাশনের নামে চলছে দেহ প্রদর্শনী। চিত্ত বিনোদনের নামে দেখছে অডিও, ভিডিও, নাটক ও সিনেমা। যা অশ্লীলতায় ভরপুর। গান-বাজনাসহ বিজাতীয় কুসংস্কার দ্বারা মাটি করে দেয়া হচ্ছে খোদা প্রদত্ত ঈদের পবিত্রতা।

এভাবে মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকছে বিধর্মীয় কুসংস্কার। যাতে ধ্বংস হচ্চে ইসলাম ও মুসলিম জাতির মূল্যবান ঈমান-আকীদা। প্রশ্ন হল আমরা মুসলমানরা অপসংস্কৃতির ঘাড়ে চেপে কি শান্তির ঠিকানা খুঁজে পাব? কখনই নয়। এতে বয়ে নিয়ে এসেছে অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেহায়াপনা ও স্বার্থপরতা। এর দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে সুশীল সমাজ, ছিন্ন হচ্ছে মায়া-মমতার বন্ধন। সর্বোপরি এটা ইসলামী আদর্শকে গলা টিপে হত্যা করার শামিল।

আমাদের বোধোদয় হওয়া উচিত, মাহে রমাযানের পর শাওয়াল মাসটিও অত্যন্ত ফফিলত ও বরকতপূর্ণ মাস। যার প্রথমেই রয়েছে ঈদের আনন্দঘন মুহূর্ত। যা বছরে একবারই আসে খুশির ডালী বহন করে। এ মাসে ইবাদতের প্রতিও জোর দেয়া হয়েছে। এক মাস সিয়াম সাধনার পরে মানুষ যেন লাগামহীনভাবে স্বেচ্ছাচারিতা না করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে নিজেকে পাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, আল্লাহ পাক তাকে অঢেল নেক দিবেন। এ মাসে পাপকাজ বেশি হওয়ার আশংকা থাকে। শয়তান বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকে বিপথগামী করতে নানা রকম ফন্দি আঁটতে থাকে। যেন এক মাসের অর্জন সবটুকু মাটি হয়ে যায়। তাই যে ব্যক্তি নিজেকে পাপমুক্ত রাখার জন্য নিজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে আল্লাহপাকও তার প্রতি বেহেশতের মধ্যে দৃষ্টি রাখবেন।

এ মাসের কিছু ইবাদত

ঈদের দিন রাতে ও দিনে যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ইবাদত করে আল্লাহ পাক রোজ হাশরের সংকটময় মুহূর্তে তাকে দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি দিবেন। এ

রাতটি শবে কদরের মত মর্যাদা রাখে। এ মাসের ছয়টি রোযা অত্যন্ত ফজিলতপূণ। হুজুর পাক স. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে খুব জাঁকজমকের শহর প্রদান করাবেন। যার মধ্যে থাকবে লাল ইয়াকুত পাথরের বাড়ী এবং আরও থাকবে প্রত্যেক বাড়ির সম্মুখে দুধ ও মধুর পানি প্রবাহিত নদী। ফেরেশতারা ঐ ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমাকে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সত্য বলতে কি, রমাযানের রোযার শেষে কিসের নামায, কিসের কুরআন তেলাওয়াত, দান-সদকা ও ইবাদত বন্দেগী! সবই যেন আনন্দ জোয়ারে ভেসে যায়। অনেকে যায় ইবলিসের বানানো অপসংস্কৃতির জালে। এ জাল ছিন্ন করা দুর্বল ঈমানদারে পক্ষে অসম্ভব।

বিশ্ব মুসলিম ভাই ভাই। এক সূত্রে গাঁথা রয়েছে লাল রক্ত কণিকায়। আসুন আমরা হাতে হাত রেখে ইসলাম বিবর্জিত অপসংস্কৃতির প্রাচিরকে ঈমানী বজ্রাঘাতে মিতীর্ণ করে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন ও সমাজ গড়ার শপথ করি।

ঈদের দিনের কুপ্রথা

আজ আমাদের দেশের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোও আগ্রাসন থেকে মুক্ত নয়। তথাকথিত কিছু কলামিস্ট আর লেখকরা আমাদের পবিত্র দিবসসমূহকেও অন্য সভ্যতার রঙ্গে রাঙ্গিয়িত করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। শবে কদর ফ্যাশন লেখা এখনো চোখে না পড়লেও তারা ঈদ ফ্যাশনের নামে আমাদের দেশের উঠতি বয়সী তরুণ-তরুণীদের কোন পথে ঠেলে দিচ্ছেন তা ভাবলেও গা শিউরে উঠে। বিশেষবভাবে টিভি চ্যানেলগুলো এক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করছে বেশি। তাদের কাছে ঈদ মানেই বেহায়াপনা, অশ্লীলতা আর শর্টকাট জামা পরে রাস্তাঘাটে উলঙ্গ নৃত্য প্রদর্শনের মহড়া। ঈদের দিন আসলে মনেই হয় না আমরা গতকালও রোযা রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাকওয়া অর্জনের চেষ্ট করেছি। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চলে। বিশেষত আজকের সময়ে ঈদের দিনে পুরুষের জন্য নারীর পোশাক আর নারীর জন্য পুরুষের পোষাক পরা যেন আবশ্যকীয় স্টাইল হয়ে গিয়েছে। ঈদের দিন দেখা যায় পুরুষরা একপ্রকার ওড়না সহ মেয়েলি ডিজাইনের পাঞ্জাবী পরছে, অপরদিকে মেয়েরা জিন্সের টাইটফিট প্যান্টসহ কোমর দোলানো হাফ ডিজাইনের শার্ট পরছে। ওড়নার তো বালাই নেই। ওরা ওড়না তথাকথিত ফ্যাশনবাদী ছেলেদের দিয়ে দিয়েছে।

আজকের তরুণ সমাজের কাছে ঈদের দিন মানে গানের আসর বসানোর সময়, রাস্তায় রাস্তায় ব্যাপক উন্মুক্ত আওয়াজে ক্যাসেট বাজানোর উৎসব, হাইস্পিডের মিউজিক সম্বলিত গান আর তালে তালে নাচ সাথে মদ-জুয়ার আসর। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার উলঙ্গপনার উত্তরাধিকার হতে পারলেও তাদের মধ্যে যে বৈষয়িক নৈতিকতা, দেশপ্রেম, জতিপ্রেম, সময়ানুবর্তিতা, গবেষণা আর আবিষ্কারের নেশা আছে আমরা তা গ্রহণ করতে বা শিখতে পারি না।

আসুন! আর কারো অনুসরণ নয়, নিজের আদর্শ, শিক্ষা দিয়ে আমার ব্যক্তি জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর করি। রমযানের শিক্ষাকে অন্তত ঈদের দিনে স্মরণ রেখে রমযানকে সম্মান করি। অন্য কোন সভ্যতায় নয় একমাত্র ইসলামী আদর্শের মধ্যে শান্তি ও সুখ নিহিত। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফিক দিন।

পবিত্র ঈদুল ফিতর যেভাবে উদযাপন করবেন

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনা ও তারাবী'র মাধ্যমে রাত্রি জাগরণের পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন নির্ধারণ করেছেন। এদিনে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলমান বান্দার জিয়াফত। তাই এদিনে রোযা দাররা খুশির সাথে আল্লাহর জিয়াফতের সাড়া দিবে। এ দিনে ঈদের মাঠ থেকে প্রত্যাবর্তনের আগেই সকল রোযাদারের জন্য ক্ষমা ও দোযখ হতে মুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়। এদিনে তাইতো মুমিন বান্দাদের খুশির কোন অন্ত নেই।

ইসলামে ঈদের প্রবর্তন

হিজরী দ্বিতীয় সনে রমযান মাস শেষ হওয়ার দুইদিন পূর্বে ঈদুল ফিতর ও সাদকায়ে ফিতর সংক্রান্ত এ আয়াতটি নাযিল হয়।

নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয় এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে। (সূরা আল-আ'লা ঃ ১৪-১৫)

হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সফল হয়েছে, যে সাদকায়ে ফিতর দান করেছে এবং ঈদের নামায পড়েছে। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস ঃ ৩/৪৩৩)

ঈদের দিনের রসম-রেওয়াজ

* কবর যিয়ারতকে এদিন বিশেষ আমল মনে করা হয়। ফলে ঈদগাহ থেকে সরাসরি দলবদ্ধভাবে গোরস্থানের দিকে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া হয়।

অথচ কবর যিয়ারত এদিনের নির্ধারিত কোন আমল নয়। এদিনে কবর যিয়ারতের বিশেষত্ব কোন নির্ভরযোগ্য শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(দেখুন ঃ আল মাদখাল, লিবনিল হাজ্ব ঃ ১/২৮৬)

* ঈদের নামাযের পর পর মুসল্লীদের পরস্পর মু'আনাকা করাকে ঈদের অংশ মনে করা হয়। অথচ শরীয়তের কোন দলীল দ্বারা এটি প্রমাণিত নয়। শরয়ী দলীল-প্রমাণ ছাড়া শরীয়তের বহির্ভূত কোন বিষয়কে দ্বীনের অংশ মনে করে করলে তা বিদআতে পরিণত হয়ে যায়। তাই হক্কানী আলেম ও মুফতীগণ ঈদের নামাযের পর প্রচলিত এ নিয়মকে বিদআত আখ্যা দিয়েছেন।

(ইমদাদুল আহমদ ঃ ১/১৮৮, ১৩৫৪)

পবিত্র ঈদে নারীদের করণীয়-বর্জনীয়

ঈদ মানে খুশি, ঈদ মানেই আনন্দ। ঈদ নামটা শুনলেই সবারই মনটা পুলকিত হয়ে ওঠে। সময়ের আবর্তনে প্রতি বছর ঘুরে ফিরে দু'টি ঈদ আসে। একটি হল ঈদুল ফিতর বা রোযার ঈদ, অপরটি হল ঈদুল আযহা বা কোরবানীর ঈদ। প্রতিবছর রমযানের রোযার শেষে আসে রোযার ঈদ। বয়ে যায় ঘরে ঘরে আনন্দের হিল্লোল। তবে মূলতঃ এই আনন্দটা তাদের জন্যই যারা সারা মাস রোযা রেখেছে ও আল্লাহতা'আলার ইবাদত করেছে। সুতরাং, তাদের জন্য শালীনভাবে ঈদ উদযাপন করে ঈদের মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা অপরিহার্য কর্তব্য। পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদেরও এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নিম্নে মেয়েদের কিছু ঈদের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

করণীয়

*নারীরাই হচ্ছে পরিবারের ভিতরগত দিক দিয়ে দায়িত্বশীল। তাদের উচিত হচ্ছে ঈদের দিন সকাল সকাল ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া।

* স্বামী-সন্তানকে ভাল করে গোসলের ব্যবস্থা করে সুন্দর কাপড় পরিধান করিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে ঈদগাহে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা।

* অতঃপর তাদের ঈদগাহে যাওয়ার আগে কিছু মিষ্টি খাবারের ব্যবস্থা করা।

* মিসওয়াক করা।

*নিজে গোসল করে পরিপাটি হওয়া।

* এবং সব সময় হাসি-খুশি প্রাণচঞ্চল থাকা।

বর্জনীয়

কেনাকাটা ঃ মেয়েরা হচ্ছে ঘরের রাণী। ঘরেই তাকে শোভা পায়। কিন্তু বর্তমানে মনে হচ্ছে মেয়েরা এতে সন্তুষ্ট নয়। সমাধিকারে দাবী করে মেয়েরা

এখন সর্বত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে কেনাকাটা করছে। বিশেষ করে ঈদের মার্কেটে মহিলাদের উপচে পড়া ভীড়ের কারণে পা ফেলানোও দায় হয়ে যায়। কার থেকে কার শাড়ী বা কসমেটিকসটা সুন্দর এই নিয়েই শুরু হয় প্রতিযোগিতা। এর কারণ কয়েকটি–

* সমঅধিকারের দাবী।

* গৃহকর্তার কেনা জিনিস পছন্দসই না হওয়া।

বিশেষ করে রমযানের শেষ ক'টা দিন যেন মার্কেটে রাত হয় না। সর্বদা চলতে থাকে অবিরাম মেয়েদের পথচলা, মার্কেটিং, শপিং ইত্যাদি। যেখানে রমযানের শেষ ১০ দিন আল্লাহ পাক জাহান্নামের আগুন থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষকে মুক্তি দেন। সেখানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি না চেয়ে তারা রাতদিন তাদের শপিং ও কেনাকাটা নিয়েই ব্যস্ত। আবার কিছু সংখ্যক বোরকাধারী মহিলাও এমন আছেন যারা শপিং এ অভ্যস্ত। তাদের বাজার আরও গরম। তাদেরকে কিছু বলার বললেই জবাব দিয়ে দেয় বোরকাতো পরেছি, সুতরাং যেথা ইচ্ছে সেথায় যাওয়া যাবে। আসলে কোন অবস্থাতেই মেয়েদের বিশেষ করে রমযানে তো মার্কেটে যাওয়াই উচিত নয়। মুসলিম রমণীদের শান তো এমন হওয়াই উচিত যে, গৃহকর্তা যা এনে দেবে তাই খুশি হয়ে পরিধান করবে। ইসলামে কিন্তু সবকিছু নিষিদ্ধ নয়, মেয়েরা পূর্ণ হেজাব অবলম্বন করে মাহরামের সাথে মার্কেটে যেতে পারবে। তবে তা আবশ্যকীয় করে নেয়া উচিত নয়। বর্তমান মা-বোনদেরকে হতে হবে হযরত ফাতেমা-আয়েশা রাযি;এর উত্তরসূরী। তারা জীবিত থাকতেতো পর্দা অবলম্বন করতেনই এমনকি মৃত্যুর পরেও পর্দার অসিয়ত করে যেতেন। হযরত ফতেমা রাযি; মৃত্যুর পূর্বে ওসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, আমার মৃত্যুর পর আমাকে রাতের আঁধারে মানুষের জানার আগেই কবরে সমাধিস্থ করে দিবেন। যেন কেউ আমার আকার-আকৃতি বুঝতে না পারে। সুতরাং আমাদেরকেও তাদের মত হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

চাহিদার বাড়াবাড়ি ঃ বর্তমান নারীদের আরেকটি স্বভাব হচ্ছে চাহিদার বাড়াবাড়ি। এটা এলার্জির মত একটা সংক্রমিত রোগ। কারো কাছে একটা ভাল জিনিস দেখলেই হল তারও এটি চাই। গৃহকর্তার সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক। গৃহকর্তা যদি ওজর-আপত্তি-পেশ করে তাহলেতো কোন কথাই নেই। বাড়ীতে এক রান্নার হরতাল হয়ে যায়। সারাক্ষণ গাল ফুলিয়ে বসে থাকে, কিছু চোখের পানি ঝরায়, অতঃপর কিছু ভাংচুর করার চেষ্টা করে। এসব দেখে গৃহকর্তা বাধ্য হয়ে হারাম পথে পা বাড়ায়। ঘুষ, সুদ, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি যেভাবে হোক তাদের কাঙ্খিত জিনিস এনে দেয়। তারপরেই তাদের মুখ খুশিতে প্রসন্ন হয়ে

উঠে এবং এই বলে তা উপভোগ করে যেভাবেই এনে দিক না কোন আমাদের জন্য তা হলাল। এই হল বর্তমান নারীদের অবস্থা। এই ধরনের মন-মানসিকতা সবাইকে বর্জন করতে হবে। সবসময় গৃহকর্তা যা এনে দিবে তাই খুশিমনে পরিধান করবে। এই যে, এটাই তার সমর্থ্যে ছিল এর চেয়ে বেশি নেই, যদি থাকত অবশ্যই আনত। কেননা প্রত্যেকেই চায় তার ঘরে রমণীরা সুন্দর থাকুক। এই ধরনের বাড়তি চাহিদা ইসলামের শানের পরিপন্থী।

সাজ-সজ্জা ঃ ঈদের দিন খুশি-আনন্দের দিন। এই দিন সবারই ঘরে ঘরে পড়ে যায় খুশির ধুম। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে দেখা যায় খুশির আমেজ। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পড়ে যায় সাজ-সজ্জার ধুম। এই সাজ-সজ্জাকে ইসলাম নিষেধ করে না; বরং আরও অনুমোদন করে। তবে হ্যাঁ অবশ্যই তা শরীয়তের গণ্ডির ভিতর থাকা চাই। শালীনতার ভিতরে থেকে কোন কিছু করাকেই ইসলাম নিষেধ করে না। তবে বর্তমানে কিছু উগ্র সাজ রয়েছে। এগুলো ইসলাম অনুমোদন করে না এবং এগুলো ছেড়ে দেয়া প্রত্যেকের অপরিহার্য।

নেলপালিশ ঃ আধুনিক মডার্ন মেয়েরা প্রাচ্য-পাশ্চত্যের উগ্র নারীদের থেকে একটি ফ্যাশন রপ্ত করেছে যে, নেলপালিশ ব্যবহার করা। যে কোন অনুষ্ঠানে বা প্রাগ্রামে তাদের রঙ-বেরঙের নেললপালিশ ব্যবহার করা চাই-ই। এটা ব্যবহার করা আদৌ ঠিক নয়। কেননা নেলপালিশে শূকরের চর্বি ও অন্যান্য উপাদান থাকায় ভিতরে পানি প্রবেশ করে না ফলে ওজু-গোসল হয় না। ইবাদত-আমল সব বরবাদ। এর বিপরীতে ইসলামেও সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে-তা হচ্ছে মেহেদি। এটা সুন্নতে নববী দ্বারা সাবেত। তাছাড়া এতে অনেক উপকার রয়েছে এবং সৌন্দর্যও কম নয় এবং নেলপালিশের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদী।

লিপিষ্টিক ঃ এটিও একটি আধুনিক ফ্যাশন। যেখানেই যাওয়া হয় দেখা যায় কিশোরী, তরুণী, যুবতী প্রত্যেকের ঠোটে নানা কালারের বাহার। এটাও সর্বক্ষণ ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা এতেও শুকরের চর্বি ও অন্যান্য উপাদান থাকায় ভিতরে পানি প্রবেশ করে না। তাই এটা সর্বক্ষণিক ফ্যাশন বানানো উচিত নয়। হ্যাঁ কদাচিৎ ব্যবহার করা যেতে পারে।

সুগন্ধি ঃ আধুনিক মেয়েদের আরেকটা ফ্যশন সুগন্ধি ব্যবহার করা। এট কস্মিনকালেও ঠিক নয়। বর্তমানে কোন অনুষ্ঠানে গেলেই পারফিমের ঘ্রাণে পরিবেশ মৌ মৌ করতে থাকে। মেয়েদের জন্য আতর, সেন্ট, পারফিউম সব দরনের সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ ইসলাম মেয়েদের জন্য তা অনুমোধন করে না। কেননা এতে করে পুরুষরা মেয়েদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে ফেতনা অবশ্যম্ভবী।

অবাধে চলাফেরা ঃ বর্তমান যুগের আধুনিকা মেয়েরা ছেলেদের সাথে অবাধে চলাফেরা করে অভ্যস্ত। বিশেষ করে ঈদের সামনে যুবতীরা কিশোরীরা, তরুণীরা, যুবক, কিশোর, তরুণদের সাথে হাতে হাত দিয়ে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়ায়। আনন্দ-উল্লাস, হই-হুল্লোড় করে নিজেদেরকে মাতিয়ে রাখে। রমনাপার্ক, জিয়া উদ্যান, বোটানিক্যাল গার্ডেন ইত্যাদি দর্শনীয় স্থানগুলোতে জোড়ায় জোড়ায় বসে আড্ডা দেয়। নাইটক্লাবগুলোতে হইহুল্লোড় করে মাতালবস্থায় বুদ হয়ে পড়ে থাকে। এসবগুলি শরীয়ত পরিপন্থী কাজা ও ঘৃণ্য রুচিবিরোধী আচরণ। এগুলি পরিহার করে অবশ্যই সবাইকে শালীন হতে হবে। পর্দা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং চারদিকের পরিবেশকে গড়েগ তুলতে হবে শরীয়ত সম্মতভাবে।

মেহমানদারী ঃ বর্তমানে ঘরোয়া পরিবেশে মেহমানদারী মানেই ঘরের বুধয়া সুন্দর করে সেজে গুজে খাবার পরিবেশন করবে। তাদের ছাড়া মনে হয় খাবারের পরিবেশটা ঠিকমত জমে ওঠে না। এটা একদম অনুচিত। কেননা মেহমানদারী হচ্ছে নবীগণের সুন্নত। একে এমন শরীয়ত বিরোধী ফ্যশন দ্বারা কলুষিত করা মোটেই উচিত নয়। এতে করে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যায়। আখেরাততো বরবাদ হয পর্দা ইত্যাদি না করার কারণে। আর দুনিয়া বরবাদ হয় এভাবে যে, হয়ত ঐ বধুর সৌন্দর্য অভিভূত হয়ে কোন আগত মেহমান তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে বা বধূই কোন মেহমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে ফলে যা হবার তাই হবে।

শিশু-কিশোরদের আনন্দ ঃ আধুনিক শিশু-কিশোরদের আনন্দ মানেই হচ্ছে নায়ক-নায়িকাদের অনুকরণে নানা রঙের বাহারী পোশাক পরে টিভি, ডিসএন্টিনা ও সিডি, ভিসিডির সামনে হা হয়ে বসে থাকা। তাছাড়া আজকাল ঈদের পরে খুশি প্রকাশ করে এওক সপ্তাহব্যপী নানা অনুষ্ঠানের প্রোগ্রামে রাত-দিন টিভি সেটটাকে গরম করে রাখে টিভির সুকৌশলী প্রোগ্রামররা। এতে করে মনের মাঝে নানা ধরণের উগ্রতা নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে তাদের অশান্ত মন। কি আনন্দ তাদের খুশি, কি অদ্ভুত তাদের আনন্দ। টিভি দেখা মারত্মক কবীরা গুণাহ।

মা-বাবার উচিত এই টিভি থেকে নিজেরা বেঁচে থাকা এবং সন্তাদেরকেও তা থেকে বিরত রাখা এবং সন্তানদেরকেও তা থেকে বিরত রাখা এবং ধর্মীয় হামদ-নাত ও কুরআন তিলাওয়াতের ক্যসেটের দিকে তাদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেয়া। তা না করে আজকাল যেন প্রতিটি ঘরে স্বপরিবারে টিভি সেটের সামনে রীতিমত সমাবেশ হয়ে যায়। টিভির মত চরিত্র-বিধ্বংসী কোন জিনিস এই পৃথিবীতে

নেই। মানুষের এটি বুঝা উচিত। এক বুযুর্গ আলেম বলেন, টিভি হচ্ছে বিষধর সাপের বাকের ন্যায়। একটি একটি প্রোগ্রাম মানে হচ্ছে একটি বিষধর সাপের বিষধর ছোবল। যেমনভাবে সবাই বিষাক্ত সাপের বিষ থেকে বেঁচে থাকে তেমনি টিভি থেকেও সবাইকে বেঁচে থাকা উচিত।

শাবান মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত

যে সকল সময়ের মধ্যে আল্লাহ পাক বিশেষ বরকত রেখেছেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় হলো শাবান মাস। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি (নফল) রোযা এ মাসেই রাখেতেন।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে রমযান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি এবং শাবান মাসের মত এত বেশি (নফল)রোযা অন্য কোন মাসে রাখতে দেখিনি।-বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী অন্য এক হাদীসে আছে, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি একদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে শাবান মাস ব্যতীত অন্য কোন মাসে এত অধিক পরিমাণে (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, এটা ঐ মাস যে মাস সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই গাফেল থাকে। এটা রজব ও রমযান মাসের মধ্যবর্তী মাস। এটা এমন মাস যে মাসে মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হয়। (এদিকে লক্ষ্য করেই) আমার আকঙ্ক্ষা যে, আমার আমল (আল্লাহ পাকের দরবারে) এ অবস্থায় পেশ হোক যে, আমি রোযাদার।

(নাসায়ী, শু'আবুল ঈমান)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান মাসে পুরা রোযা রাখতেন এবং এ কথা বলতেন যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী ও নেক আমলের মেহনতে তোমাদের শক্তি-সামর্থ খরচ কর, কেননা আল্লাহ তা'আলা ক্লান্ত হন না; ক্লান্ত তোমরা হয়ে যাও।

(বুখারী, মুসলিম ঃ মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ)

হযরত ইম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন আমি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে কেবল শাবান ও রমযানেই দেখেছি। (তিরমিযী)

এ সম্পর্কিত আরো হাদীস হাদীসের সহীহ কিতাব সমূহে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল হাদীস দ্বারা শাবান মাসের অত্যন্ত গুরুত্ব ও ফযীলত বুঝে আসে।

শবে বরাত ঃ শবে বরাতও এ শাবান মাসেই যা অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও ফযীলতের রাত্রি। শাবানের পনের তারিখের রাত, যা চৌদ্দ তারিখ দিনের সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শুরু হয়ে পনের তারিখ সুবহে সাদিক অর্থাৎ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে শেষ হয়।

শবে বরাতের নামকরণ ঃ হাদীস শরীফে এ রাতের বিশেষ কোন নাম বর্ণিত হয়নি। বরং 'লাইলাতুল নিছফি মিন শাবান' অর্থাৎ শাবানের পনেরতম রজনী শব্দে উল্লেখিত হয়ে এরাতের ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। শবে বরাত এটা ফারসী শব্দ, যা 'শব' এবং 'বারাআত' দুটি শব্দ মিলে গঠিত হয়েছে। শব শব্দের অর্থ হলো রাত এবং বারাআত শব্দের অর্থ হলো, নাজাত, মুক্তি, রক্ষা, রেহাই ইত্যাদি। এ রাতে যেহেতু অসংখ্য গোনাহগারের গোনাহ মাফ হয় এবং অসংখ্য অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করা হয়, সেহেতু এ রাত মুসলমানদের মাঝে 'শবে বরাত' বলে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

শবে বরাতের ফযীলত

হাদীস শরীফে এ রাতের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সে সকল ফযীলত থেকে কিছু অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্তকারে এখনে পেশ করা হলো।

হাদীস শরীফে আছে ঃ হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, পনের শাবান রাতে আল্লাহ পাক তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি বিশেষভাবে মুতাওয়াজজেহ হন এবং সমস্ত মাখলুককে ক্ষমা করে দেন কিন্তু মুশরিক এবং বিদ্বেষীদেরকে মাফ করেন না।

(সহীহ ইবনে হিব্বান, কিতাবুস সুন্নাহ মাওয়ারেদুযযিমান, শু'আবুল ঈমানা, মা'জামুল কাবীর, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ ইত্যাদি)

অন্য এক হাদীসে আছে ঃ হযরত আবু ছা'লাবাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সা, ইরশাদ করেন, শঅবানের পনের তারিখের রাতে আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের দিকে মুতাওয়াজজেহ হয়ে মুমিনদেরকে মাফ করে দেন এবং বিদ্বেষীদেরকে স্বীয় বিদ্বেষের মধ্যে ছেড়ে দিন। অর্থাৎ তাদেরকে মাফ করেন না; যতক্ষণ না তারা স্বীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করে দোয়া করে।

(কিতাবুস সুন্নাহ, বাইহাকী, শু'আবুল ঈমান, দুররুল মানছুর)

শবে বরাতের আমল (করণয়ি) ঃ হাদীস শরীফে আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কে আমার নিকটে না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। জান্নাতুল বাকীতে আমি রাসূলকে পেলাম। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি এ আশংকা করছো যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলে তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করবেন ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার এ ধারণা হয়েছিলো যে আপনি হয়তো অন্য কোন স্ত্রীর কাছে গমন করেছেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- পনের শাবানের রাতে আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করেন এবং বনু কাল্‌ব গোত্রের লোকদের ছাগল পালের পশমের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী ইবনে মাজাহ্, জামেউল উসূল)

আরবদের মধ্যে বকরী পালনের খুব প্রচলন ছিলে। প্রত্যেক গোত্রেরই বিপুল সংখ্যক বকরী থাকতো, তবে 'বনু কাল্‌ব' গোত্রের বকরী সবচেয়ে বেশি ছিলো। ঐ সকল বকরীর শরীরে যে পরিমান পশম ছিলো, তার চেয়ে অনেকব বেশি সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ পাক (শবে বরাতে) মাফ করে থাকেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, একটি বরকীর গায়ে কত লক্ষ লক্ষ পশম থাকে। যা গণনা করা সম্ভব প্রায়। তারপরে যদি বকরীর সংখ্যাও অনেক বেশি, তাহলে তা কত বেশি? ধারণা করাও অসম্ভব বলে মনে হয়। আল্লাহ্ পাক এর চেয়েও অধিক সংখ্যায় স্বীয় গেনাহ্গার বান্দাকে মাফ করে থাকেন। আল্লাহ্ পাক যেমন মহান তাঁর ক্ষমাও তেমন মহান।

এ রাতে কবরস্থানে যাওয়া ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে এ কথাও জানা গেল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে মদীনার কবরস্থান 'জান্নাতুল বাকীতে গমন করেছিলেন। কাজেই কেউ যদি এ রাতে কবরস্থানে যায় এবং মৃত আত্মীয়-স্বজনের জন্য ইসালে সওয়াব ও দোয়া করে, তাহলে এটা মুস্তাহাব। তবে বিশ্বাস এবং আমল কোনো দিক দিয়েই এটাকে জরুরী মনে করা যাবে না। সাথে সাথে সব ধরনের বিদ'আত (যেমন এ রাতে কবরস্থানে যাওয়াকে একান্ত জরুরী মনে করা, সফর করে দূরের কবরস্থানে বা মাজারে যাওয়া, অনেক লোক একত্রিত হয়ে যাওয়া, মেলা বসানো, কবর বা মাজারে আলোকসজ্জা করা ইত্যাদি) থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

এ সম্পর্কে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. অত্যন্ত জরুরী কথা বলেছেন, আর তা হলো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জীবনে একবার মাত্র শবে বরাতে কবরস্থানে গিয়েছেন, কাজেই জীবনে একবার গেলে এ মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে। প্রতি শবে বরাতে কবরস্থানে যাওয়াকে জরুরী মনে করলে এটা সীমাবহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হবে।

এ রাতে বেশী বেশী দোয়া করা ঃ হাদীস শরীফে আছে; হযরত উছমান ইবনে আবি 'আস (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, শাবানের পনের তারিখের রাতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন, আছে কি কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী, যাকে আমি ক্ষমা করে দিবো? আছে কি কোন প্রার্থনাকারী, যাকে মনোবাসনা আমি পূর্ণ করে দিবো? (সুতরাং এ রাতে) সকল প্রার্থনাকারীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা হয়, কিন্তু ব্যভিচারী এবং মুশরিকের দোয়া কবুল করা হয় না।

(দুররুল মানছুর, শু'আআবুল ঈমান, লাতায়েফ)

যেহেতু সারা রাতে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ক্ষমা করার এবং প্রত্যেকের মানোবাসনা পূর্ণ করার ঘোষণা হয়ে থাকে। কাজেই সমগ্র রাত জাগ্রত থেকে আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাটি করে নিজের গোনাহসমূহ মাফ করিয়ে নেওয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা লাভের জন্য খুব বেশি দোয়া করা প্রয়োজন।

এ রাতে দোয়া কবুল হয় ঃ ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন আমাদের নিকট নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস পৌছেছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন। পঁচটি রতে দোয়া (অধিক) কবুল হয়।

১. জুমু'আর রাত, অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত। ২. কুরবানী ঈদের (পূর্ব) রাত, ৩. ঈদুল ফিতরের (পূর্ব) রাত, ৪. রজবের প্রথম রাত, ৫. পনের শাবানের রাত অর্থাৎ শবে বরাত।

অতঃপর হযরত ইমাম শাফেয়ী রহ. উল্লেখিত রাতসমূহ সম্পর্কে বলেন, আমি যা কিছু বর্ণনা করেছি এটাকে আমি মুস্তাহাব মনে করি, ফরয মনে করি না।

(কিতাবুলউম, সুনানে কুবরা, মা'রেফাতুস সুনানে ওয়াল আছার, ফায়জুল কাদীর)

এ রাতে দীর্ঘ নফল নামায পড়া ঃ হযরত আলা ইবনুল হারেছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাহাজ্জুদ) নামায আরম্ভ করলেন এবং এত দীর্ঘ (সময় ধরে) সিজদা করলেন যে, আমার আশংকা হলো, হয়তো বা তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছে। যখন আমি তাঁর এ অবস্থা দেখলাম, তখন উঠে (গিয়ে) তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীকে নাড়া দিলাম, তখন তা নড়তে আরম্ভ করলো। এতে আমরার সান্ত্বনা লাভ হলো যে, তিনি জীবিত আছেন। (এ কাজ করে) আমি আমার জায়গায় ফিরে আসলাম। যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা উঠালেন এবং নামায

শেষ করলেন, তখন বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি কি এ ধারণা করেছো যে, নবী তোমার প্রতি অত্যাচার করেছে ? আমি বললাম, জ্বি না! ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু আপনার দীর্ঘ সিজদার কারণে আমার ধারণা হয়েছিলো হয়তো বা আপনার রূহ কবজ করা হয়েছে। (এর পরিপ্রেক্ষিতে) তিনি এরশাদ করলেন ঃতুমি কি জানো, এটা কোন রাত? আমি আরজ করলাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালা জানেন। (তখন) তিনি বললেন, এটা শাবানের পনেরতম রাত, যে রাতে আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দার প্রতি বিশেষ দয়ার দৃষ্টি করেন এবং ক্ষমাপ্রার্থীদেরকে ক্ষমা করেন, রহমতপ্রার্থীদের প্রতি রহম করেন, আর বিদ্বেষীদেরকে তাদের বিদেশের মধ্যে ছেড়ে দেন।

(আততারগীব ওয়াততারহীব, শু'আবুল ঈমান জমউল জাওয়ামে ইত্যাদি)

পনের শাবানের রোযা ঃ

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যখন পনের শাবানের রাত আসে তখন নামাযে দাঁড়াও এবং পরের দিনে রোঁযা রাখো, কেননা সে রাতে (শবে বরাতে) সূর্যাস্তের পর আল্লাল্লাহ পাক দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং বলেন, আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী, যাকে আমি মাফ করে দিবো? আছে কি কোন রিযিকপ্রার্থী, যাকে আমি রিযিক দিবো? আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত, যাকে মুক্তি দিবো! এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত বলতে থাকেন যে, আছে কি কেউ অমুক জিনিস প্রার্থী, (থাকলে আমি তার প্রার্থনা কবুল করবে।)

(ইবনে মাজাহ শু'আবুল ঈমান, তারগীব ও তারহীব)

এ হাদীস দ্বারা দুটি জিনিস প্রমাণিত হলো, এ রাতে (নফল) নামায আদায় করা এবং পরবর্তী দিনে রোযা রাখা।

শবে বরাতের আমল মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের অভিমত

শাফেয়ী মাযহাব ঃ ইমামে শাফেয়ী র. তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'কিতাবুল উম'-এ লিখেছেন ঃ নিশ্চয়ই পাঁচটি রাতে দোয়া অধিক কবূল হয়ে থাকে। জুমআর (পূর্ব) রাত্রে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার (পূর্ব) রাত্রে, রজবের প্রথমরাত, পনেরো শাবানের রাত্র। (এ সকল রাত সম্পর্কে) আমি যা কিছু বললা, এগুলোকে আমি মমুস্তাহাব মনে করি; ফযর নয়। (কিতাবুল উম ১ ঃ ২৩১)

হানাফী মাযহাব ঃ আল্লামা হাসকাফী র. বলেন, দুই ঈদ ও শবে বরাতে জাগ্রত থেকে (নফল) ইবাদত করা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার ২ ঃ ২৪-২৫) আল্লামা ইবনে নুজায়ম র. লিখেছেন– রমযানের শেষ দশ রাতে, দুই ঈদের

(পূর্ব) রাত্রে, জিলহজ্বের ১ম দশ রাত্রে, শবে বরাতে জাগ্রত থেকে নফল ইবাদত করা মুস্তাহাব। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে।

(বাহরুর রায়েক ২ ঃ ৫২, ফাতহুল মুয়ীন ১ ঃ ২০৪ দুরারুল হিকাম ১ঃ১৭১)

শবে বরাতের রোযা সম্পর্কে অভিমত

মালেকী মাযহাব ঃ শাইখ দারদীর মালেকী র. লিখেছেন ঃ শাবানের পনের তারিখের রোযা মুস্তাহাব। (শরহে ছগীর ১ ঃ ৬৯২)

হানাফী মাযহাব ঃ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী র. বলেন, শাবানের পনের তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব। –যাওয়ালুস সিনাহ ১০ পৃঃ

পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী র. ও পনের শাবানের রোযাকে মাসনূন আমলের মধ্যে গণ্য করেছেন। (শবে রবারত ৮ পৃঃ)

শবে বরাতের ফযীলত ও বরকত হতে বঞ্চিত শ্রেণী। হাসীদ শরীফে এ রাতের যেমন ফযীলত ও বরকতের কথা বর্ণিত হয়েছে তদ্রুপ এমন কিছু গোনাহের কথাও এসেছে যার মধ্যে লিপ্ত ব্যক্তি এ বরকত ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

এখন হাদীস শরীফের আলোকে ঐ সকল গোনাহের আলোচনা করা হচ্ছে, যাতে তা থেকে বিরত থাকা সহজ হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক শাবানের পনেরতম রাতে স্বীয় বান্দাদের প্রতি বিশেষ (রহমতের) দৃষ্টি করেন এবং তাদেরকে মাফ করেন। তবে কিছু সংখ্যক লোককে তিনি মাফ করেন না। একজন (ঐ ব্যক্তি) যে হিংসা-বিদ্বেষ রাখে। অপরজন (ঐ ব্যক্তি) যে, অন্যায়ভাবে কাউকে খুন করে থাকে। (জআততারগীব ২ ঃ ২৪২)

হযরত আতা ইবনে এসার র. থেকে বর্ণিত আছে যে, শবে ক্বদর ব্যতীত কোন রাতই শবে বরাতের চেয়ে উত্তম নয়। এ রাতে আল্লাহ পাক দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন এবং মুশরিক, হিংসুক-বিদ্বেষী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যতীত স্বীয় ক্ষমাপ্রার্থী সকল বান্দাকেই ক্ষমা করে দেন। (আল লাতাফেয় ১৬২ পৃঃ, মা ছাবাতা বিসসুন্নাহে ৩৫৫) একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন– আমার নিকট জিব্রাইল আ. এসে বললেন আজ শবে বরাত, যে রাতে আল্লাহ পাক বনু কালব গোত্রের বকরীসমূহের পশম পরিমাণ লোককে আগুন অর্থাৎ দোযখের শাস্তি) থেকে মুক্তি দান করে থাকেন। কিন্তু

মুশরিক, হিংসুক, আত্মীয়তা ছিন্নকারী, অসৎ আচরণকারী, মা-বাপের অবাধ্য সন্তান এবং সর্বদা মদ্যপানরত ব্যক্তির প্রতি দয়ার দৃষ্টি করেন না।

(শু'আবুল ঈমান ৩ঃ৩৮৩, আদ দুররুল মানছুর ৬ ঃ ২৭)

শবে বরাতের বিদআত ও কু-প্রথা

কোন পবিত্র জয়গা ও সময় এমন নেই যেখানে শয়তান মানুষকে বরকত ও ফয়ীলত থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়নি। এ সকল স্থান ও সময়ে শয়তান কনো না কোন বিদআতের প্রচলন অবশ্যই করে রেখেছে। সাথে সাথে এ সকল শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপে এমন আকর্ষণীয় রং লাগায় যে, নির্বোধ গাফেল ও মূর্খ লোকেরা সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে সে সকল গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে বরকত ও ফযীলত লাভের পরিবর্তে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শবে বরাতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এ পবিত্র রাতের জন্য এমন কিছু অহেতুক প্রথার প্রচলন ঘটানো হয়েছে, যোগুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ফরয ওয়াজিবের মত গুরুত্বারোপ করে আদায় করা হয়ে থাকে। এ সকল বিদ'আত ও নিষিদ্ধ কর্ম থেকে কয়েকটির আলোচনা সংক্ষেপে করা হচ্ছে, যাতে এগুলো থেকে সহজে বিরত থাকা যায়।

আতশবজী ঃ আতশবাজী, তারাবাতি, পটকা ইত্যাদি পোড়ানো ও ফুটানো। এগুলো যে শুধু অহেতুক গোনাহ তা নয়, বরং এর পার্থি ক্ষতিও সর্বদা দৃষ্টিগোচর হয়। নিম্নে কয়েকটি ক্ষতি প্রদত্ত হলো ঃ

◆ স্বীয় সম্পদের অপব্যয় যা দুনিয়ার দৃষ্টিতেও খারাপ। এ ধরনের লোককে পবিত্র কুরআনে 'শয়তানের ভাই' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

◆ অনেক সময় নিজ জীবন, পরিবার-পরিজন ও প্রতিবেশীর জীবনের জন্য এটা মারাত্মক বিপদের কারণ হয় অগ্নিকান্ড ও আহত হওয়ার ঘটনা অহরহ ঘটে থাকে।

◆ ছোট ছেলেমেয়েকে এ সকল জিনিস কেনার জন্য টাকা দিয়ে শৈশব থেকেই তাদেরকে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা ও অহেতুক প্রথার আগ্রহী ও উৎসাহিত করে তোলা হয়।

◆ শবে বরাতে যখন আল্লাহ পাকের রহমত প্রতিটি লোককে তাওবা ও গোনাহ মাফ করানোর প্রতি আহবান করে, তখন এ সকল বেহুদা কাজে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অবহেলা করা। তাছাড় এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, যেমন বরকতময় স্থান ও সময়ের কারণে সওয়াব বেড়ে যায়, তোমনই সে সকল স্থান ও সময়ে গোনাহের কারণে আযাবও বেড়ে যায়।

হালুয়া রুটি ঃ হালুয়া-রুটির প্রথাকে এমনভাবে জরুরী করে নেওয়া হয়েছে যে, যদি হালুয়া-রুটি পাকানো ও বন্টন করা না হয়, তাহলে মনে করা হয় এ বছর শবে বরাতই হয়নি। ফরয ওয়াজিব ছুটে গেলেও এ পরিমাণ আফসোস করা হয় না। হালুয়া-রুটি ছুটে গেলে যে পরিমাণ আফসোস করা হয়। যে ব্যক্তি এ কুপ্রথা থেকে নিজ পরিবারকে মুক্ত রাখে, তাকে কৃপণ বখীল ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করা হয় এবং বিভিন্নভাবে লজ্জা দেওয়া হয়। শরীয়তে এর কোন প্রমাণ নেই, বরং অপব্যয় হওয়ার কারণে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

বিভিন্ন কনফেকশনারী ও বেকারীতে বিভিন্ন প্রানীর আকৃতিতে রুটি তৈরি করা হয়। মুর্তিপূজার সাথে মিল থাকার কারণে এটা মারাত্মক ধরনের গোনাহ যা একেবারেই পত্যিজ্য।

শিরনি বা তাবারুক ঃ শহর এলাকার অনেক মসজিদেই মসজিদ কমিটি বা মহল্লার যুবক ছেলেরা দলব্ধভাবে চাঁদা উঠিয়ে (যা অনেকের নিকট থেকে জোরপূর্বক আদায় করা) গরু বা খাসি জবাই করে বিরিয়ানি পাকিয়ে মুসল্লীদের মধ্যে শিরনি বা তাবারুক নামে বিতরণ করে। এ ধরনের কাজেরও কোন প্রমাণ শরীয়তে নেই। পক্ষান্তরে এতে অনেক অনিষ্টতা আছে। যেমন

◆ অনেকের নিক থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করাহয়, অনেক লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও লজ্জায় পড়ে চাঁদা দিয়ে থাকে। অথচ হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, কোন মুসলমানের সম্পদ (অন্যের জন্য) তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হালাল নয়। এর আয়োজকগণ সারা রাত এ কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন ইবাদত করার সুযোগ পান না। আর শোরগোলের কারণে অন্যদের ইবাদতে মন বসে না।

◆ এমতাবস্থায় মসজিদে বসে খাওয়া-দাওয়া নিষিদ্ধ; অথচ এ শিরনি মসজিদেই খাওয়া হয়।

◆ শিরনি বন্টনকালে এমন শোরগোল হয় যে, ইবাদতের পরিবেশ মারত্মকভাবে নষ্ট হয়।

◆ যাদের রোযা রাখার ইচ্ছা ছিলো, তাদের কারও কারও এমন হতে পারে যে তারা রোযা রাখতে পারেন না। কারণ বিরিয়ানী ফজরের নামাজের পর দেওয়া হয়।

◆ অনেক অবাঞ্ছিত অপবিত্রলোকও শিরনির লোভে মসজিদে প্রবেশ করে; এমনকি বিধর্মী পর্যন্ত।

আলোকসজ্জা ঃ এ রাতে মসজিদ ও অন্যান্য ইমারতে আলোকসজ্জা করা হয়, যা একান্তভাবে কাফেরদের সাথে মিলে যায়। হিন্দু সম্প্রদায়ের দেউয়ালী

পূজার নকল। যা একেবারেই নিষিদ্ধ-হারাম। কুরআন পাকে কাফেরদের সাথে যারা মিল রাখে, তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত বলা হয়েছে। শাইখ আলী ইবনে ইবরাহীম র. বলেন, এ কুপ্রথা 'বরামুকাহ' নামক একজন নওমুসলিমের মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে। এ ব্যক্তি অগ্নিপূজক ছিলো, যখন মুসলামন ছিলো, তখন সে এ প্রথা ইসলামের দাখিল করলো, যাতে করে মুসলমানদের সাথে নামায আদায়কালে অগ্নিকেও সিজদা করতে পারে। অবশ্য অষ্টম শতাব্দীর ইমামগণ এর প্রতিরোধ কঠোরভাবে করেছেন। মিসর ও সিরিয়ার অঞ্চল থেকে একেবারে মিটিয়ে দিয়েছেন। (মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ ২৬৩)

আপসোস! আমাদের দেশে এখনো এ কুপ্রথা যথেষ্ট পরিমানে বিদ্যমান রয়েছে।

মসজিদে একত্রি হওয়া ঃ রাতে জাগ্রত থাকার নিয়তে যদি ঘটনাক্রমে দু'বার ব্যক্তি মসজিদে জমা হয়ে ভিন্নভাবে স্বীয় নামায, যিকির ও তেলাওয়াতে মগ্ন থাকে, তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আজকাল যেভাবে লোকদেরকে ডেকে ডেকে মসজিদে জমা করে হট্রগোল করা হয় এবং অনেক অহেতুক কাজে লিপ্ত হয়ে এ বরকেতময় সময় অতিবাহিত করা হয়, এটা নব আবিস্কৃত বিদ'আত ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই এটাকে প্রতিরোধ করাও একান্ত জরুরী।

শবে বরাতের বিশেষ নামায

কোন কোন বাংলা 'নামায শিক্ষা' ইত্যাদি বইতে শবে বরাতের বিশেষ নামাযের কথা লেখা আছে যে, দুই রাকাত নামাযের প্রথম রাকাতে অমুক সূরা এতবার; দ্বিতীয় রাকাতে অমুক সূরা এত বার এবং শেষে অমুক দোয়া পড়তে হবে। এর কোন ভিত্তি নেই। শরীয়তে বিশেষ কোন সূরা বা দোয়ার কথা বর্ণিত হয়নি, বরং অন্যান্য নফল নামাযের মত যে কোন সূরা দিয়ে এদিনের নফল নামায আদায় করবে।

মাইকে কুরআন তিলাওয়াত ও নাত পরিবেশন ঃ অনেক বাড়ি ও দোকানে লোকদেরকে এনে মাইকে খতমে কুরআনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমত ঃ এটা টাকার বিনিময়ে হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত ঃ এরা এত দ্রুত কুরআন পড়ে যে, কোন কিছুর উচ্চারণই সহীহ হয় না, যার ফলে হাদীসের ভাষায় কুরআন পড়েও এরা কুরআনের অভিশাপ কুড়ায়। এছাড়া বিনা প্রয়োজনে মাইকে তেলাওয়াত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ এতে রোগীদের কষ্ট, ইবাদতকারীদের ইবাদতে বিঘ্নতা ছাড়াও প্রদর্শনীর (রিয়ার) মতো মারাত্মক গোনাহের কারণ হয়।

কবরস্থানে ভিড় করা ও মেলা বসানো ঃ এ রাতের কুপ্রথাসমূহের মধ্যে একটি হলো, লোকেরা বিভিন্ন কবরস্থান ও মাজারে ভিড় করে ও মেলা বসায়।

এ সকল জায়গায় খুব আলোকসজ্জাও করা হয়। অনেক দূর দুর থেকে সফর করে এসে এদিক ওদিকে ঘোরাফেরা করে ও তামাশা দেকে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। এ সকল কাজ নাজায়েয এবং মারত্মক গোনাহ। কাজেই মুসলমানদের এ সকল বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরী। মোটকথা, এ রাতের করনীয় কাজ ঐ গুলোই যার আলোচনা একটু পূর্বে করা হয়েছে। এছাড়া যা লোকেরা বানিয়েছে সবই বর্জনীয় বিদ'আত ও হারাম। এ সকল বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটানো অনেক ভাল।

আমাদের প্রত্যেকের উচিত, এ মুবারক সময়কে গনীমত মনে করে খুব বেশি উপকার লাভ করা। যদি কোন ব্যক্তির ইবাদত করার তাওফীক ও হয়, তবুও নিজ পরিবার-পরিজনকে এ রাতের ঐ সকল বিদ'আত থেকে বিরত রাখা, যা সওয়াব মনে করে করা হয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমিন।

মাহে রজব ঃ করণীয় ও বর্জনীয়

মাহে রজবের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা মেহেরবানী করে কোন কোন দিন, রাত ও মাসে বিশেষ বরকত ওফযীলত রেখেছেন এবং সে সকল সময়ে ইবাদতে অসংখ্য ও অগণিত সওয়াব প্রদানের ঘোষণা দান করেছেন।

সেসব তাৎপার্যপূর্ণ সময়ের কোন কোনটিতে শরীয়তের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট ইবাদতও রয়েছে। আবার কোন কোনটিতে সুনির্দিষ্ট ইবাদতের প্রতিউৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাই প্রত্যেকের উচিত এসংক্রান্ত সকল বিধানের সঠিক জ্ঞানার্জন করা এবং সে অনুযায়ী আমলের মাধ্যমে বর্ণিত ফযীলত ও বরকত লাভে সচেষ্ট হওয়া।

কিন্তু আফসোস! আমরা তা না করে অনেকেই উল্টো পথ ধরেছি। আমরা এসব ক্ষেত্রে নিজ থেকে বিভিন্ন আচার–অনুষ্ঠান, রসম-রেওয়াজ এবং বিশেষ পদ্ধতির বিশেষ ফযীলত সম্পন্ন ইবাদত আবিষ্কার করেছি। কোথাও বা নির্দিষ্ট পদ্ধতিটির বিভিন্ন ইবাদত চালু করেছি, কোথাও বা নিজ থেকেই নির্দিষ্ট সময়ের বিশেষ ফযীলত ঘোষণা করেছি।

মোটকথা, উভয় ধরণের দিন, রাত ও মাস (যেগুলোর বিশেষ ফযীলত কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আর যেগুলোর বিশেষ ফযীলত প্রমাণিত নয়) বিভিন্ন রসম-রেওয়অজ ও কুসংস্কারের শিকার। পবিত্র মাহে রজবের ব্যাপারটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

পবিত্র মাহে রজব সম্পর্কে যা কিছু প্রমাণিত তা এই যে, কুরআন মাজীদে যে চারটি মাসকে সম্মানিত বলে আক্যয়িত করা হয়েছে, মাহে রজব তার অন্ত র্ভূক্ত। ইরশাদ হয়েছে।

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

"নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টির দিন থেকে। এর মেধ্য চারটি মাস সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং তোমরা এই মাসসমূহে নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না"

(সূরা তওবা ৩৪)

হাদীস শরীফে আছে, "হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "বার মাসে বছর। তার মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। তিনটি ধারাবাহিক যথা- যিলকদ, যিলহজ্ব, মহররম আর চতুর্থটি হল রবজ, যা জুমাদাল উখরাও শাবান মাসের মধ্যবর্তী মাস।"

(সহীহ বুখারী ২/৬৭২, হাদীস ৪৬৬২)

মাহে রজবের ফযীলতের জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট যে, তা 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত মাসসমূহের অরন্তর্ভূক্ত। আশহুরে হুরুমের মর্যদা ও শ্রেষ্ঠত্ব হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত ইসমাঈল আ. এর যুগ থেকেই চলে আসছে। জাহেলি যুগে সেসব মাসের মর্যাদার নামে বহু রসম-ওেয়াজ ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ইসলাম সেসব মাসের মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে সকল রসম-রেওয়াজ ও সংস্কার এনেছে। মোটকথা, ইসলামে আশহুরে হুরুমের ফযীলত একটি স্বীকৃত বিষয়।

আশহুরে হুরুমের অন্তর্গত কোন কোন মাসের জন্যে বিশেষ বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়ে থাকলেও যে কথাটি আশহুরে হুরুমের সকল মাসের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য তা এই যে, উক্ত মাস চারটি সম্মানিত। এসব মাসে যেকোন নেক আমলের সওয়াব অন্যান্য মাসের সওয়াবের তুলনায় বেশি। এমনিভাবে এসব মাসে গুনাহের ক্ষতি ও ভয়াবহতাও অধিক। তাই এসব মাসে ইবাদতের প্রতি অধিক য়ত্নবান হওয়া এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার প্রয়োজনও অধ্যধিক।

(আহকামুল কুরআন, জাসসাস ৩/১১১; কুরতুবী ৮/৮৬-৮৭; ইবনে কাসীর ২/৩৯১; রুহুল মাআনী ১০/৯০-৯১; মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৬৯-৩৭৩)

তাছাড়া উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আশহুরে হুরুমের এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, এসব মাসে ইবাদতের প্রতি যত্নবান হলে বাকি মাসগুলোতেও ইবাদতের তাওফীক হয়। আর আশহুরে হুরুমে কষ্ট করে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে পারলে অন্যান্য মাসেও গুনাহ পহিার করা সহজ হয়।

(আহকামুল কুরআন, জাসসাস ৩/১১১; মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৭২)

তাই আশহুরে হুরুমে আন্তর্গত মাহে রজবের মর্যদা রক্ষা করার প্রতি সচেষ্ট হওয়া উচিত। কেননা, এ মাসের ইবাদত-বন্দেগী অধিক সওয়াবের দাবি রাখে; তেমনি গুনাহের অপরাধ ও ভয়াবহতাও অধিক। সুতরাং, ফরয ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবদতের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করা এবং সব ধরনের পাপাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, শরিয়তের পক্ষ থেকেই এই বরকতপূর্ণ মাসের কোন বিশেষ নামায ও বিশেষ রোযা প্রমাণিত নেই। বরং অন্যান্য মাসে পালনীয় নফল ইবাদতগুলো যথাযথ পালনের মাধ্যমেই মাহে রজবের ফযীলত লাভ করতে হবে, নিজ থেকে মনগড়া কোন নফল নামায বা নফল রোযা আবিষ্কার করা যাবে না।

মাহে রজবের তাৎপর্য

ফযীলত ও তাৎপর্যের কারণে মাহে রজবকে কেন্দ্র করে সমাজে আজ অনেক কিছুই প্রচলিত আছে। এসব রসম-রেওয়াজ ও ঘটনা প্রবাহের প্রতি লক্ষ করে আমরা মাহে রজবকে দুভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-ইসলাম পূর্ব মাহে রজব এবং ইসলামপরবর্তী মাহে রজব।

ইসলাম পূর্ব মাহে রজব

ইসলামপূর্ব যুগে মাহে রজব পালিত হতো বিভিন্ন রসম-রেওয়াজ ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হত বিভিন্নভাবে। মাহে রজবের মর্যদাদ রক্ষার্থে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ (যা তাদের সাধারণ অভ্যাস ছিল) পর্যন্তও বন্ধ রাখত। কেউ কেউ এ মাসে রোযাও রাখত। এ ছাড়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ মাসের মর্যাদা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা চলত গোত্রে গোত্রে।

তাছাড়া জাহেলি যুগে মাহে রবজ উদযাপনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল পশু জবাই করা। এ মাসে তারা নিজেদের প্রেমিকার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশুজবাই করে উৎসব পালন করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম এসব রসম-রেওয়াজে পরিবর্তন আনেন ও সংস্কার সাধন করেন। তাঁর অবদানের ইসলামপরবর্তী মাহে রজবের সূচনা হয়।

ইসলামপরবর্তী মাহে রজব মাহে রজবের দোয়া

বর্ণিত আছে যে, যখন মাহে রজব শুরু হত তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্যে রজব ও শাবান মাসে রবকত দাও এবং আমাদেরকে রমযান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও।

(মুসনাদে আহমাদ, যাওয়ায়েদ ২/২৫৯; মুসনাদে বাযযার-মাজমাউয যাওয়ায়েদ ২/১৬৫)

অর্থাৎ আমাদের হায়াত বৃদ্ধি করে দাও, যাতে আমরা রমযান পেতে পারি; যেন বহু আগে থেকেই রমযানের শুভাগমননের অধীক আগ্রহে থাকতেন। এই দোয়া ব্যতীত আরো যেসব বিষয় মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে, শরীয়তে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই।

মাহে রজবে পশু জবাই

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ؛ لَافَرْعَ وَلَا عَتِيْرَةَ

"ইসলামে 'ফারা' (উটবা বকরির প্রথম বাচ্চা প্রতিমার উদ্দেশ্যে) জবাই করার কোন প্রথা নেই এবং 'আতীরা' ও নেই। অর্থাৎ রজব মাসে প্রতিমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু জবাই করার প্রথাও নেই!"

(সহীহ বুখারী ২/৮২২, হাদীস ৫৪৭৪)

আজকাল রজব মাসে খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী রহ. এর মাযারে যে 'উরস' হয় সেখানে এমন অনেক পশুই জবাই করা হয় যা মুর্খ লোকেরা হযরত খাজা রহ. বা তাঁর মাযারের নামে মান্নত করার। জাহেলি যুগের 'ফাৎরা' 'আতীরা' আর বর্তমানের এসব জবাইকৃত পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো কাছে সাধারণ উপায়-উপকরণের উর্ধ্বের বিষয়াদি যথা-হায়াত-মওত, রিযিক-দৌলত, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি প্রার্থনা করা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে মান্নত করা, তা কোন মুর্তির নামেই হোক বা কোন পীর-বুযুর্গের নামেই হোক সবই শিরক্ এতে সেসব বুযুর্গের কোন অপরাধ নেই; অপরাধ তাদের যারা এসব গর্হিত কাজ করে। বুযুর্গানে দ্বীন তো মানুষকে তাওহীদ ও সুন্নতের শিক্ষা দিয়েছেন, শিরক-বেদআত বা পাপাচারের শিক্ষা দেননি।

রজব মাসে খাজা (রহ.) এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গোটা উপমহাদেশে শিরক-বেদআত ও অবৈধ কর্মের এমন সব রসম-রেওয়াজ জাহেল লোকেরা আবিষ্কার করেছে এবং অতিগুরুত্বের সাথে প্রতি বছর সেসব পালন করে যে, আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অপকর্মও এসবের সামনে ম্লান হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে ঢোল-তবলা ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহ নাচ-গানের আসর করা হয, কোন কোন স্থানে তো নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং নানা ধরণের ধরনের গর্হিত কাজকর্ম ও হয়ে থাকে। এসব কাজকর্ম নিঃসন্দেহে হারাম। আর এসব হারাম কাজের অর্থ যোগানের জন্য লাল কাপড়ে মোড়ানো বিরাট বিরাট 'আজমীরী ডেগ' বিভিন্ন স্থানে বসানো হয় এবং নযর-নিয়ায, মান্নত ইত্যাদির নামে টাকা ওঠানো হয়। এসব ডেগে টাকা দেওয়াও হারাম এবং এসব টাকায় যেসব খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করা হয় তা খাওয়াও হারাম। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই মুসলমানদের রক্ষাকারী! হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ঈমান ও তাওহীদ এবং সত্য ও সুন্নতের পথে অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দিন।

অন্যান্য কুসংস্কার

রজবে আতীরার প্রথা ছাড়া অন্যান্য রসম-রেওয়াজকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমলীভাবে তথা কাজে-কর্মে সংশোধন করেছেন।

তিনি মাহে রজবে জাহেলী যুগের আচার-অনুষ্ঠান ও রসম-রেওয়াজ বন্ধ করে গেলেন, কিন্তু আফসোস! আজ তাঁর উম্মত মাহে রজবে দ্বীনের নামে বহু কিছু চালু করে রেখেছে। যথা-মাহে রজবের বিশেষ নামায ও বিশেষ রোযা, শবে মেরাজের বিশেষ নামায ও বিশেষ রোযা, শবে মেরাজের বিশেষ নামায বিশেষ রোযা এবং এই দিনে পালিত নানান রকম-রেওয়াজ ইত্যাদি। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

মাহে রজবের বিশেষ ইবাদত

এ সম্পর্কে আলোচনার আগে ফযীলতপূর্ণ দিন বা রাতের ইবাদতসমূহের ব্যাপারে একটি মৌলিক বিধান জেনে নেওয়া দরকার। বিধানটি হল কোন দিন বা রাতের বিশষ ফযীলত প্রমাণিত হওয়ায় এটা জরুরী নয় যে, সে সময়ের কোন বিশেষ ইবাদতও থাকবে। বরং কোন বিশেষ ইবাদতকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলতে হলে স্বতন্ত্র দলীল থাকা জরুরি; শুধু ফযীলত প্রমাণিত থাকা যথেষ্ট নয়। কে না জানে জুমার রাতের কত ফযীলত! কিন্তু যেহেতু এতে ভিন্ন কোন ইবাদত নেই, তাই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- "তোমরা (সাপ্তাহের) অন্যান্য রাত ব্যতীত শুধু জুমআর রাতকে নামাযের জন্যে নির্দিষ্ট করো না এবং অন্যান্য দিন

ব্যতীত শুধু জুমার দিনে রোযা রেখো না। তবে হ্যাঁ, যদি তা অভ্যাসের তারিখ হয়ে থাকে।" (সহীহ মুসলিম ১/৩৬১, হাদীস ১১৪৪)

বোঝা গেল শুধু ফযীলত প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা বিশেষ ইবাদত প্রমাণিত হয় না নতুবা জুমার রাতের ইবাদত এবং জুমার দিনের রোযার বিশেষত্বকে হাদীস ফরীফে অস্বীকার করা হত না

(হুজ্জতুল্লাহিল বালেগা ২/৫৩; ফতহুল মুলহিম ৩/১৫৬)

তেমনিভাবে কোন সময়ের ব্যাপারে ব্যাপক কোন নামায প্রমাণিত হওয়ার দ্বারা সে নামাযের কোন বিশেষ পদ্ধতিকে নিজ থেকে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলা যাবে না। তার জন্যে দরকার স্বতন্ত্র দলীলের। কারণ ইবাদতের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ 'তাওকীফী' তথা একমাত্র ওহী দ্বারা প্রমাণযোগ্য, কিয়াস বা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা কোন ইবাদত ও তার ধরণ নির্ধারণ করার অবকাশ শরীয়তে নেই।

(আল-ইতিসাম ১/৪৪-৫১৪; ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম ১০৯-১২৭)

এই মৌলিক কথাটির পর এখন আসা যাক মাহে রজবের প্রসঙ্গ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাসটি আশহুরে হুরুমের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এর ফযীলত অবশ্যই প্রমাণিত। কিন্তু এতে কোন বিশেষ ইাবাদত-নামায বা রোযা প্রমাণিত নয়।

তাই সব মাসেই পালনীয় যেসব নফল নামায রয়েছে, যেমন তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত ইত্যাদি এবং নফল রোযা, তেলাওয়াতে, তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ ও ইস্তেগফার ইত্যাদি ইবাদতসমূহ যথাযথা পালনের মাধ্যমে রজব মাসের ফযীলত অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে। যেহেতু শরীয়তে এ মাসের বিশেষ কোন ইবাদত প্রমাণিত নেই তাই নিজ থেকে মনগড়া কোন বিশেষ ইবাদত বা তার বিশেষ কোন ইবাতদ প্রমাণিক নেই তাই নিজ থেকে মনগড়া কোন বিশেষ ইবাদত বা তার বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করা, সেটাকে সুন্নত বা মুস্তাহবে মনে করা বেদআত বা তার বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করা,ম সেটাকে সুন্নত বা মুস্ত াহাব মনে করা বেদআত তথা শরীয়ত প্রবর্তনে দখল দেওয়ার শামিল।

মাহেব রজবের বিশেষ নামায

বাজারে বিভিন্ন ভাষার বেশ কিছু অনির্ভরযোগ্য বইপুস্তকে মাহে রজবের বিশেষ নামাযের যেসব কথা পাওয়া যায় তার সবগুলোই ভিত্তিহীন ও বাতিল। উপমাস্বরূপ একটি নামাযের কথা তুলে ধরছি। কোন কোন বইপুস্তকে আছেঃ

(মওযূ) "হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ফরমায়েছেন, হে সালমান! এমন কোন মুমিন নর-নারী নেই, যে এই মাসের পহেলা তারিখে

মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে চল্লিশ রাকাআত (মতান্তরে বিশ রাকাআত) নফল নামায নিম্নোক্ত নিয়মে আদায় করবে, তার যাবতীয় গুনাহ মাফ হবে না এবং গুনাহগারদের দফতর থেকে তার নাম কাটা যাবে না। এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতে শহীদের দলের সাথে উঠাবেন। একাধারে হাজার বছর ইবাদতকারী আবেদগণের নামের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং বেহেশতে এক হাজার মরতাবা দান করবেন। এই নামায দুই দুই রাকাআতের নিয়তে দশ সালামে আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহার সাথে তিনবার সূরা ইখলাস ও তিনবার সূরা কাফেরুন পাঠ করবে।

এ ধরনের বাতিল ও ভিত্তিহীন আরো বহু কথাই বাজারি বই-পুস্তকগুলোতে পাওয়া যায়, যেগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় না।

মাহে রজবের বিশেষ রোযা

মাহে রজবের ইবাদত শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ মাসের বিশষ ফযীলতের বিশেষ কোন রোযা শরীয়তে প্রমাণিত নেই। তবে রজব মাসে মাঝে মধ্যে সাধারণ নফল রোযা রাখা বাঞ্ছনিয়।

মুসলিম শরীফে আছে, উসমান ইবনে হাকীম র. প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. কে রজবের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেন, "আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোযা রাখা শুরু করতেন তখন এত বেশি রোযা রাখতেন যে, আমরা ভাবতাম তিনি আর রোযা ছাড়বেন না। আর যখন রোযা ছাড়া শুরু করতেন তখন পুনরায় রোযা রাখবেন বলে মনে হত না।" (সহীহ মুসলিম ১/৩৬৫)

হাদীস বিশারদগন বলেন যে, সাঈদ ইবনে জুবাইর র.-এর উদ্দেশ্য হল রজব মাসের নফল রোযার ব্যাপারে স্বতন্ত্র কোন বিধান নেই। বরং যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মাসেই নফল রোযা রেখে থাকতেন, তাই রজব মাসেও নফল রোযা রাখতেন। সুতরাং আমাদের জন্যেও তাই বাঞ্ছনীয়।

(শরহু সহীহে মুসলিম, ইমাম নববী রহ. ১/৩৬৫; ফাতহুল মুলহিম ৩/১৭৫; বাযলুল মাজহূদ ৩/৩৮৩)

তাছাড়া রজব মাস আশহুরে হুরুম (সম্মানিত চার মাস)-এর অন্তর্ভূক্ত। আর এ মাসগুলোতে মাঝে মধ্যে নফল রোযা রাখার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে।

(সুনানে আবূ দাউদ ৩৩০, হাদীস ২৪২৮; সুনানে ইবনে মাজা ১২৫১৭৪১, হাদীস ১৭৪১)

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশেষভাবে রজব মাস বা এ মাসের কোন নির্দিষ্ট তারিখে রোযা রাখার ফযীলতসম্ভলিত যত রেওয়ায়াত বই-পুস্তকে পাওয়া যায় তার সবগুলোই জাল ও ভিত্তিহীন বা বর্ণনাসূত্রের দিক থেকে এত অধিক দুর্বল যে, তা দ্বারা না কোন বিধান প্রমাণিত হয়, না কোন আমল প্রমাণিত হয়।

এখানে নমুনাস্বরূপ এ ধরনের কয়েকটি রেওয়ায়াত উল্লেখ করছি, যা কোন কোন পুস্তক থেকে নিয়ে লিফলেট ও হ্যন্ডবিল আকারে বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করা হয়েছেঃ

ক. (মওযূ) "যে ব্যক্তি রজব মাসের প্রথম দিন রোযা রাখে, সে যেন সারা বছরই রোযা রাখল। যে ব্যক্তি এ মাসে সাতটি রোযা রাখে তার জন্যে দোযখের সতটি দরজাই বন্ধ হয়ে যায়। আট রোযাকরীর জন্যে যাবতীয় পাপ পূর্নে পরিবর্তীত হয়। আঠারো রোযাকারীকে আসমান থেকে কেউ বলে আল্লাহ তোমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন, এখন থেকে আবার নতুনভাবে সৎকাজ শুরু কর।"

খ. (মওযূ) "রজবের প্রথম দিনের রোযাকারীর ষাট বছরের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। পনের রোযাকারীর হাশরের হিসাব-নিকাশ সহজতর হয়। ত্রিশ রোযাকারীর জন্যে আল্লাহ বলেন, আমি এই বান্দার উপর সন্তুষ্ট, তাকে শাস্তি প্রদান করব না।"

গ. (মওযূ) "রজবের সাতাশ তারিখে রোযাকারী ষাট মাস রোযা রাখার পুণ্য পেয়ে থাকে। এই দিনই হযরত জিবরাঈল আ. নবুওয়তসহ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিটক আগমন করেন।"

ঘ. (মওযূ) "রজব মাসে এমন একটি দিন ও তিনটি রাত আছে, সেদিনগুলোতে যদি কেউ রোযা রাখে এবং রাতে ইবাদত করে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে শত শত বছরের রোযার এবং শত বছরের রাত জাগ্রত থাকার পুণ্য দান করে থাকে। এ রাত হল রজব মাসের শেষ তিন রাত এবং যেদিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছেন সেই দিন।"

উপরোক্ত রেওয়ায়াতসমূহ এবং এ ধরনের অন্যান্য রেওয়ায়াত সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ সুস্পষ্ট বলেছেন যে, এগুলো বাতিল ও ভিত্তিহীন বা সনদের দিক থেকে এত দুর্বল যে, এসবের কোন ধর্তব্য নেই। যেমন মোল্লা আলী কারী র. কতক মুহাদ্দিসের বরাতে বলেন-انـها مـوضـوعـة 'এ রেওয়ায়াতগুলো জাল। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/২৮৬)

ইমাম যাইনুদ্দীন ইবনে রজব র. বলেন "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বিশেষভাবে রজব মাসের রোযার ফযীলত সম্পর্কে কোন কিছু প্রমাণিত নেই।" (লাতায়েফুল মাআরেফ ১৩১) ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী র. ও 'তাবয়ীনুল আজব' গ্রন্থে অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন। (ফাতহুল মুলহীম ৩/১৭৫)

মুহাম্মাদ ইবনে মানসূর আসসামআনী র. বলেন, "বিশেষভাবে রজবের রোযা মুস্তাহাবের ব্যাপারে কোন হাদীস প্রমাণিত নয়। এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয, তার সবগুলো একেবারেই দুর্বল। কোন আলেম সেসব রেওয়ায়াত শুনে সন্তুষ্ট হতে পারে না। (কারণ যে সমস্ত রেওয়ায়াত বর্ণনার দিক থেকে একেবারেই দুর্বলব, সেগুলো ভিত্তিহীন ও জাল রেওয়ায়াতেরই হুকুম রাখে)।"

(ফাতহুল মুলহিম ৩/১৭৫)

সুতরাং আশহুরে হুরুম (সম্মানিত চারমাস) বা অন্যান্য মাসের মত রজব মাসেও সাধারণভাবে নফল রোযা রাখা যেতে পারে এবং তা বাঞ্ছনীয়ও বটে। তবে শুধু রজব মাসের রোযা বা রজব মাসের কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযার ব্যাপারে বিশেষ কোন ফযীলতের আকীদা রাখা বা সেটাকে রজব মাসের বিশেষ আমল মনে করা এবং তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা শরীয়তে বেদআত তথা কুসংস্কারের শামিল।

তাই হযরত উমর (রাঃ) কিছু লোককে রজব মাসের রোযার ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করতে দেখে জোরপূর্বক তাদেরকে খাবার খেতে বাধ্য করেন।

(মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ২/৫১৩)

রজবের ব্যাপারে দুটি কথা

২৭ রজবের ব্যাপারে সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ যে, এটি শবে মেরাজ। অনেকেই মনে করে যে, এ রাতটিও সেভাবে কাটাতে হবে যেভাবে সবে কদরের রাত কাটানো হয়।

অনেকে আবার বিশেষ নিয়মের নামায এবং পরদিন রোযা রাখাকেও এ সময়ের একটি বিশেষ ইবাদত মনে করে। অথচ বাস্তব কথা হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মহিমান্বিত মেরাজ যে রজব মাসেই হয়েছিল তা ইতিহাসে প্রমাণিত নয়। কোন কোন বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, মেরাজ হয়েছিল রবিউল আউয়াল মাসে। কোন কোন রেওয়ায়াতে রজব মাসের কথা এসেছে, আবার কোন কোন রেওয়ায়াতের অন্য মাসের কথাও রয়েছে। তাই দৃঢ়তার সাথে বলা যাচ্ছে না যেমন, মেরাজ রজনী কোনটি। আর সুনির্দিষ্টভাবে ২৭ রজব সম্পর্কে তো ইমাম ইবরাহীম হারবী র. ইমাম ইবনে

রজব র. স্পষ্ট বলেছেন যে,এরাতে মেরাজ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

(লাতায়েফুল মাআরেফ ১৩৪)

তাছাড়া এ রাতে বিশেষ কোন ইবাদত থাকলে এবং তার পরদিন বিশেষ রোযার বিধান থাকলে অবশ্যই তা হাদীস শরীফে উল্লেখ থাকত এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তা পালন করতেন। কিন্তু এমন কোন কিছুর প্রমাণ নেই।

এখানে লক্ষণীয় যে, মেরাজের ঘটনা হিজরতের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল এবং তারপরও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তত এগারো বছর জীবিত ছিলেন কিন্তু হাদীস শরীফের কোথাও এমন প্রমাণ নেই যে, তিনি কখোনো এ রাত উদযাপন করেছে বা উদযাপন করতে বলেছেন। এজন্য এ রাত বা এর পরদিনকে ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করার এই বাড়তি কাজটি করে গুনাহ্গার হওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ ?

রজব মাস যেহেতু পুরোটাই বরকতময় তাই এর সবকটি দিন ও সবকটি রাতেই ইবাদত-বন্দেগীর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সময়ের মূল্য বোঝার, সময়কে কাজে লাগাবার এবং বিশেষভাবে ফযীলতপূর্ণ মাস, দিন ও রাতগুলোকে যথাযথ মূল্যয়ন করার তাওফীক দান করুন। বেদআত ও রসম-রেওয়াজের পেছনে পড়ে মুবারক সময়গুলোকে নষ্ট করা থেকে মাহফুয রাখুন। আমীন।

লাইলাতুল কদর (শবে কদর)

বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহিমান্বিত রাত লাইলাতুল কদর। পবিত্র কুরআনে তিনবার এবং বিভিন্ন হদীসেবহুবার এ রাতকে এ নামেই এল্লেখ করা হয়েছে। তবে আমাদের সমাজে এ রতটি শবে কদর নামেই প্রসিদ্ধ। আরবী 'লাইলাতুল' আর ফার্সি 'শব' উভয়ের অর্থই রাত রজনী। আর 'কদর' শব্দটি আরবী। এর অর্থ-পরিমাপ, পরিমাণ, সম্মান, মর্যাদা, মহিমা, ভাগ্য ইত্যাদি। অনেকের মতে, এখানে কদর অর্থ-মর্যাদা, মহিমা। সুতরাং লাইলাতুল করদ অর্থ দাঁড়ায়-মহিমান্বিত রজনী মর্যাদার রাত। এ রাতটি একটি অন্যান্য মহিমায় মহিমান্বিত বলেই একে লাইলাতুল কদর-মহিমান্বিত রজনী, মর্যাদার রাত। এ রাতটি একটি অনন্য মহিমায় মহিমান্বিত বলেই একে লাইলাতুল কদর-মহিমান্বিত মর্যাদাবান রাত বলা হয়েছে। আবু বকর ওয়াররাক র. এর মতে আমলের ত্রুটি ও স্বল্পতার কারণে মর্যাদাহীন আমলহীন লোকও এ রাতের ইবাদতের মাধ্যমে মর্যদাবান হতে সক্ষম হয় বলে একে লাইলাতুল কদর-মহিমান্বিত রজনী বলা হয়েছে। আবার অনেকের মতে, এখনে কদর অর্থ ভাগ্য যেহেতু এ রাতে পরবর্তী এক বছরের ভাগ্য নির্ধারণ করা হয়, সেহেতু এ রাতের এই নামকরণ করা হয়েছে।

শবে কদর কবে?

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে শবে কদরের অসীম ফযীলত ও অসাধারণ মাহাত্ম্যের বর্ণনা এসেছে। কিন্তু শবে কদর-এ বিষয়টি বেশ বিতর্কিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নির্ধারিত একটি তারিখের কথা বলেননি; বরং তিনি বলেছেন শবে কদর রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর কোন একটিতো নিহীত। আর তাই তিনি এই বেজোড় পাঁচ রাতে শবে কদরকে অনুসন্ধান করতে বলেছেন। এ থেকে বুঝে আসে,শবে কদর প্রতি বছর নির্ধারিত একটি তারিখে নাও হতে পারে। বিভিন্ন বছর রমাযানের বিভিন্ন রাতেও হতে পারে। তবে শেষ দশকের বেজোড় রাতসমুহের কোন একটিতেই হওয়ার সমুজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা রমাযানের শেষ দশকে শবে কদর অনুসন্ধান কর।

(বুখারী শরীফ ঃ খ-১,পৃঃ ২৭০)

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে শবে কদর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শবে কদর রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোর কোন একটি একুশ, তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ বা উনত্রিশতম রাত।

উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে সাতাশ রমাযানে শবে কদর হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এটা সুনিশ্চিত নয়, প্রবল ধারণা বটে। আর এ জন্যেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের পূর্ণ শেষ দশকেই ইতিকাফ করতেন। ইবাদত-বন্দেগীরর মধ্যদিয়ে শবে করদ অতিবাহিত হয়। অজান্তে অবহেলায় যেন শবে কদরের অপরিসীম ফযীলত থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশকে এত অধিক ইবাদত ও কঠোর পরিশ্রম করতেন, যা অন্য কোন সময়ই করতেন না।

(মুসলিম শরীফ ঃ খ-১,পৃঃ ৩৭০/ তিরমিযী শরীফ, খ-১পৃঃ ১৬৪)

অন্য এক হাদীসে রয়েছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রমাযারেন শেষ দশক এসে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লুঙ্গি খুব শক্ত করে পরতেন। (অধিক ইবাদত ও কঠোর পরিশ্রমের প্রতয়দীপ্ত হেয় পস্তুতি নিতেন) নিজেও রাত জেগে ইবাদত করতেন। পরিবার-পরিজনকেও জাগাতেন।

(বুখারী, খ-১ পৃঃ ২৭১/ মুসলিম)

এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইশা ও ফযরের নামায জামাতে আদায়

করল সে যেন পূর্ণ রাতই জেগে থেকে ইবাদত করল। তাই অন্তত রমাযানের শেষ দশকের প্রতিদিন ইশা ও ফযরের নামায জামাতে আদায় করলেও শবে কদরের ফযীলত লাভের আশা করা যায়।

শবে কদরের নিদর্শনাবলী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের কোন নির্ধারিত তারিখ না বললেও এমন কিছু আলামত বলেছেন যা প্রসঙ্গে এক হাদীসে তিনি ইরশাদ করেন এ রাতের কতিপয় আলামত হচ্ছে, রাতটি সুস্পষ্ট আলোকোজ্জ্বল ও নাতিশীতোষ্ণ হবে। সারা রাত কোন তারকা দ্বারা শয়তানকে নিক্ষেপ করা হবে না। আরেকটি আলামত হচ্ছে, পরদিন ভোরের সূর্য কিরণহীন উদিত হবে। (বায়হাকী) উল্লিখিত আলামতগুলোর শেষোক্তটির বর্ণনা বহু হাদীসে এসেছে এবং সর্বদাই এটি প্রত্যক্ষ করা গেছে।

শবে কদরের ফযীলত, মর্যাদা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন অবতীর্ণ করেছি লাইলাতুল কদরে। লাইলাতুল কদর হল হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতারা স্বীয় পালনকর্তার নির্দেশ অবতীর্ণ হন। শান্তি ই শান্তি, যা ফযরোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।" (সূরা কদর)

লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম-এ কথার অর্থ হচ্ছে, একাধারে বিরামহীনভাবে এক হাজার মাস ইবাদত করলে যে সওয়াব হবে, শুধু এক শবে কদরের ইবাদতের বিনিময়ে এর চেয়েও অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে। এটা এ রাতের অন্যন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য, অতুলনীয় মহিমা অনুপম মর্যাদা। অন্য এক আয়াতে এ রাতকে লাইলাতুম মুবারাকাহ বরকতময়, কল্যাণপূর্ণ রজনী বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি ইহা (কুরআন) এক বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে সকল গুরুত্বপুর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। আমার আদেশক্রমে... (দুখান ঃ ৩-৫) লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর অঝোর ধারায় অপরিসীম কল্যাণ ও নানবিধ বরকত অবতীর্ণ করেন বলেই এ আয়াতে এ রাতকে 'লাইলাতুল মুবারাকাহ' বরকতময় রজনী আখ্যা দেয়া হয়েছে এ রাতের ফযীলত, গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। লাইলাতুল কদ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, রমাযানের আগমনের পূর্বেই শাবানের শেষ দিনের প্রদত্ত এক ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতের ফযীলত বর্ণনা করে এর জন্য পস্তুত হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অবহেলায় যেন এ রতের ফযীলত তেকে কেউ বঞ্চিত না হয় সেজন্য সতর্ক করে দিয়েছেন। হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবানের শেষদিনে আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে

বললেন, হে লোক সকল! তোমাদের সামনে এক মহান ও বরকতময় মাস উপস্থিত হয়েছে। এটি এমনি একমাস যার একটি রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। (বাইহাকী/ সহীহ ইবনে মুযাইমা)

পূর্ববর্তী উম্মতরা দীর্ঘ সয়স পেত। হাজার বছরও মানুষ বাঁচত। এই দীর্ঘ জীবনে, প্রলম্বিত আয়ুতে সৎ, নিষ্ঠাবান, নেক বান্দারা অনেক ইবাদতের সুযোগ লাভ করত। কিন্তু উম্মতে মুহাম্মদী স্বল্পজীবি। ৭০/৮০ বছরের অধিক বয়স এ উম্মতের খুব কম মানুষই পায়। বরং হয়ত হিসাব করলে দেখা যবে এ উম্মতের গড় আয়ু ৬০/৬৫ বছরের অধিক নয়। তাহা এ অতি অল্প জীবনে, সংক্ষিপ্ত আয়ুতে অল্প ইবাদতের সুযোগই মিলে। এসব ভেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব চিন্তিত হলেন। দুশ্চিন্তার কালোমেঘ জমল তার হৃদয়াকাশে। শবে কদরের মত অভুতপূর্ব নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় রাসূলের চিন্তার তিমিরে আলোর সূর্য উদিত করলেন। অবতীর্ণ হল সূরা কদর। সুসংবাদ দেয়া হল, এ উম্মত প্রতি বছরই এমন একটি রাত পাবে, যে রাতে ইবাদত হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষা অধিক উত্তম। এটা একমাত্র উম্মতে মুহাম্মাদীরই বৈশিষ্ট্য। ইতোপূর্বে এই নিয়ামত, শবে কদর অন্য কোন উম্মতকে দান করা হয়ানি। হাজার মাসে ৮৩ বছর চার মাসের কিচু অধিক কাল হয়। সে হিসেবে বারটি শবে কদর এক হাজর বছরের সমতুল্য। কোন সৌভাগ্যবান, সৎ মানুষ যদি জীবনে অন্তত রারটি শবে কদর পেতে সক্ষম হন এবং যথাযথভাবে ইবাদত করতে পারেন, তাহলে তিনি পূর্বেকার উম্মতের এক হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন ইবাদতের সমতুল্য সওয়াব পাবেন।

এখনে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও একাধিক হাদীসে একথাই বলেছেন। কিন্তু হাজার মাস থেকেও কত বেশি শ্রেষ্ঠ সেটা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। ফলে একটিমাত্র শবে কদরের ইবাদতের সওয়াবের প্রকৃত হিসাব কিন্তু আমাদের অজানাই রয়ে গেল। আমরা শুধু এতটুকু নিশ্চিত হতে পারলাম, একটি শবে কদরের ইবাদতের সওয়াব হাজার মাসের (৮৩ বছর ৪ মাস) ইবাদতের সওয়াব অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। বরং বেশি। কিন্তু কত বেশি তার সঠিক হিসাব একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলাই জানেন। 'আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বাড়িয়ে দেন। (বাকারা ঃ ২৬১)

শবে কদরের ফযীলত প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ঈমানসহ সওয়াবের আশায় সবে কদরে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, তার অতীতের সকল পাপ মার্জনা করা হবে (বুখারী শরীফ খ-১.পৃঃ ২৭০)

শবে কদরের আমল

শবে কদরের ভিন্ন বিশেষ কোন আমল নেই। অন্য রাতে করতে হয় না বা করা যায় না এমন কোন বিশেষ ইবাদতই এ রাতে বিধিবদ্ধ নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ রাতে জেগে ইবাদত করতেন। বিভিন্ন হাদীসে উম্মতকে তিনি এরাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন ও হদীসে শবে ক দরে বিশেষ কোন ইবাদতের আলোচনা পাওয়া যায় না। আর তাই মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ বলেন, এ রাতে নামায, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, তাসবীহ, তাহলীল, ইস্তাগফার, দোয়া ইত্যাদি সকল ইবাদত করা উত্তম।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন শবে কদরে জিবরাঈল আ. ফিরিশতাদের একটি দল নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং তাঁরা কি দাঁড়িয়ে কি বসে, যে যেভাবেই আল্লাহর স্মরণ(ইবাদত) করে তাদের জন্য রহমতের দোয়া করেন।

এ হাদীসেও আল্লাহর স্বরণ তথা ইবাদতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষ নিয়মে বিশেষ কোন ইবাদতের উল্লখ করা হয়নি। এ ধরনের সকল হাদীসে শবে কদরের ইবাদতের বিষয়টি স্বাভাবিক নিয়মে ও ব্যপাক রাকা হয়েছে। এ রাতে নফল নামাযও অন্য যে কোন নফল নামাযের মত স্বাভাবিক নিয়মেই পড়তে হবে। বিশেষ কোন সূরা বিশেষ সংখ্যায় পড়ার আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

শবে কদরের একটি বিশেষ দোয়ায়া

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে কদরের একটি বিশেষ দোয়া শিখিয়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি শবে কদর পাই, তাহলে কী দোয়া করব- আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফাকু আন্নী। 'হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা করতে পছন্দ করেন, সুতরাং আমাকে ক্ষামা করুন।' (দোয়াটির আরবী উচ্চারণ যারা জানেন না তাদেরকে আলেমদের কাছ থেকে শিখে নেয়ার অনুরোধ করছি)

এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সারগভ দোয়াা। শবেকদরে এই দোয়াটি অধিকহারে করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা যদি এ দোয়ার কারণেদয়া পরিবেশ হয়ে ক্ষমা করে দেন, তাহলেই তো জীবন স্বার্থক।

১৯তম অধ্যায়

লেবাস-পোশাক

লেবাস-পোশাকে ইসলামী নির্দেশনা

পোশাক মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহের অন্যতম। লজ্জাস্থান আবৃত রাখা এবং সুন্দর ও পরিপাটি থাকার চাহিদা মানুষের স্বভাবজাত। শীতের প্রকোপ, রোদের তাপ আর ধুলোবালি থেকে শরীর রক্ষার জন্যও পোশাকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তাই পোশাক মহান রাব্বুল আলামীনের একটি নেয়ামত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَابَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

"হে আদম সন্তান, আমি তোমাদের জন্য পোশাকের ব্যবস্থা করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে এবং ব্যবস্থা করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক। এটা সর্বোত্তম। এ সবই নিদর্শন আল্লাহর কুদরতের, যাতে তোমরা চিন্তা কর।"(সূরা আরাফ ২৬)

শরীরের বিশেষ অঙ্গসমূহ আবৃত করার প্রেরণা মানুষের স্বভাবের অংশ। স্বভাব ও রুচির বিকৃতি না ঘটলে এই প্রেণার বিপরীত হয় না। শরীয়ত কিন্তু 'সতর' আবৃত করাকে কেবল নৈতিক প্রেরণার উপর ভিত্তিলীল না রেখে একে দ্বীন ও ধর্মের অপরিহার্য অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষের স্বাভাবিক রুচি ও শালীনতাবোধকে সংরক্ষণ করার জন্যও যে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশনার প্রয়োজন, আমাদের আজকের সমাজ এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। বিষয়টিকে মানুষের চলতি রুচিরোধের উপর ছেড়ে দেওয়া হলে কত অসংখ্য পথে যে এর বিকৃতি ঘটতে পারে তার ইয়ত্তা নেই। অর্থ ও খ্যাতির লালসা, প্রদর্শন-প্রিয়তা আর বিজাতির অন্ধ অনুকরণ অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে প্রকৃত অর্থে শালীন ও রুচিশীল থাকতে দেয় না।

এছাড়া মানুষের আত্মিক পবিত্রতার জন্যও লেবাস-পোশাক এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। কোন লেবাস মানুষের মনে অংবোধ জন্ম দেয় আবার কোন লেবাস বিনয়-নম্রতা আনে। কোনটা মানুষকে করে শান্ত। আত্মার পবিত্রতা ও তার বাহ্যিক প্রকাশে তাই এর প্রভাব অনস্বীকার্য।

ইসলামী শরীয়ত লেবাস-পোশাকের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছে, যা মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করে, বিভিন্ন আত্মিক ও নৈতিক ব্যাধি থেকে মানুষকে রক্ষা করে এবং রুচি ও শালীনতাবোধের বিকাশ ঘটায়। লেবাস-পোশাক সংক্রান্ত এ ধরনের কিছু মৌলনীতি নিম্নে আলোচিত হলঃ

১. সতর আবৃত করা

পোশাক অবশ্যই মানুষের সতর আবৃতকারী হতে হবে, পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতটি يوارى سوءاتكم 'যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে' বাক্যাংশে এই মৌলনীতিই বিধৃত রয়েছে এবং এতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়েছে যে, পোশাকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল সতর আবৃত করা। ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামায সঠিক হওয়ার জন্য সতর আবৃত করা ফরয। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত আর নারীর মুখমণ্ডল, পায়ের পাতা ও হাতের কব্জি পর্যন্ত অংশ ছাড়া বাকি শরীর নামাযে আবৃত রাখা ফরয। অনুরূপ গাইরে মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডলসহ গোটা শরীর আবৃত রাখাও জরুরী। অতএব পোশাক-পরিচ্ছদ যাতে এই প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য।

এত সংক্ষিপ্ত পোশাক পরিধান করা যাতে সতর বা সতরের কিছু অংশ অনাবৃত থাকে বা এত পাতলা কাপড় ব্যবহার করা যাতে আবৃত সতরও দৃষ্টিগোচর হয়, পুরুষ-মহিলা সবার জন্যই হারাম ও নিষিদ্ধ। অনুরূপ যে পোশাকে শরীরের আবরণীয় অঙ্গসমূহ ফুটে উঠে তাও শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্জনীয়। সে হিসেবে পুরুষের জন্য জিন্সের প্যান্ট বা সাধারণ আঁট-সাঁট-টাই কখনো এদেশীয় পোশাক ছিল না। এটা ইউরোপ থেকে আমদানী হয়েছে। পাশাপাশি শরীয়তের নীতিমালা বিচারেও তা উত্তীর্ণ নয়। সুতরাং একজন আত্মমর্যাদাবান মুসলিম হিসেবে এই বেশ পরিহার করা উচিত।

পাশ্চাত্যের অনুসরণে আমাদের দেশেও মহিলাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে লেবাসের প্রচলন ঘটছে তা দেখলে মনে প্রশ্ন জাগে পোশাকের দর্শনটা আসলে তাদের কাছে কি? শরীর আবৃত রাখা, না কিছু অংশ আবৃত করে বাকিটাকে পরিস্ফুট করে তোলা। পোশাকের হাত, আঁচল ইত্যাদি দিন দিন সংক্ষিপ্ততর হচ্ছে। আর কাঁধ, গলা হচ্ছে প্রশস্ততর। অর্থাৎ যত দিন যাচ্ছে পোশাকও শরীরের উপর থেকে তার অধিকার হারাচ্ছে। তাহলে আমরা কোন্ দিকে ফিরে যাচ্ছি? সেই আদিম যুগে নয় তো?

২. সৃষ্টি-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া

পুরুষের পোশাক পুরুষোচিত আর নারীর পোশাক নারীর স্বভাব-প্রকৃতি ও দৈহিক গঠন ইত্যাদির উপযোগী হওয়া কাম্য। শরীয়তের দৃষ্টিতে পুরুষের পোশাক এমন হওয়া চাই যা তার ব্যক্তিত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষকে শক্তি ও দৃঢ়তা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বাইরের ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে নিধারিত কর্তব্যে ব্রতী হওয়াতেই রয়েছে পুরুষের যথার্থতা। তাই কোমল ও বর্ণিল সাজসজ্জা পুরুষের প্রকৃতি ও দায়িত্বের সাথে মিল খায় না। অপর দিকে নারীজাতিকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন স্বভাবজাত কোমলতা ও কমনীয়তা দিয়ে। মাতৃত্বের মমতা আর নারীত্বের লাজ নম্রতাই হচ্ছে নারীর স্বভাব-সৌন্দর্য। পোশাকের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনাসমূহ নর-নরীর এই সৃষ্টি-প্রকৃতির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্য পূর্ণ। ইসলামে রেশমের পোশাক পরিধান করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু নারীর জন্য তা অনুমোদিত। স্বর্ণের ব্যবহার নারীর জন্য জায়েয কিন্তু পুরুষের জন্য হারাম। যেকোন রংয়ের কাপড় নারীরা পরিধান করতে পারে, কিন্তু পুরুষর জন্য কিছু কিছু রং অপছন্দনীয়। নিম্নোক্ত হাদীসসমূহ লক্ষ করুন ঃ

১ "তোমরা রেশমের কাপড় পরিধান করো না। কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করবে সে আখেরাতে তা থেকে বঞ্চিত হবে।" সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০৬৯/১১

২ "আমার উম্মতের পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং তা হালাল করা হয়েছে মহিলাদের জন্য"। –সুনানে তিরমিযী, হাদীস ১৭২০

৩ "তোমরা সাদা পরিধান কর। কেননা তা তোমাদের সর্বোত্তম কাপড়ের অন্যতম এবং তাতেই তোমাদের মৃতদের কাফন দাও।" –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৫৫

৩. পোশাকে নারী-পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণের নিষিদ্ধতা

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে অত্যন্ত কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর বেশ ধারণকারী পুরুষের এবং পুরুষের বেশ ধারণকারিণী নারীর প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৮৮৫)

বেশ ধারণ করার অন্যতম মাধ্যম হল পোশাক। অতএব নারীর জন্য পুরুষের পোশাক পরিধান করা এবং পুরুষের জন্য নারীর পোশাক পরিধান করা

হারাম ও কাবীরাগুনাহ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীর পোশাক পরিধানকারী পুরুষকে এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারিনী নারীকে অভিসম্পাত করেছেন।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৯২)

আজকাল অনেক নারীকে প্যান্ট-শার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি পরতে এমনকি এসব পরে বাইরে বের হতেও দেখা যায়। এসব যে কেবল পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণের কারণেই বিষিদ্ধ তাই নয়, নির্লজ্জতা, পর্দাহীনতা আর বিজাতির সামঞ্জস্য গ্রহণ ইত্যাদি বহু কারণেই তা হারাম। অনেক সময় পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন মুসলিম দেশের নারীদের ছবি আসে যারা মাথায় ওড়না পেঁচিয়ে মুসলমানিত্ব প্রকাশ করছে। কিন্তু শরীরের বাকি অংশে শোভা পাচ্ছে ইউরোপীয় সাজ প্যান্ট-শার্ট বা প্যান্ট-গেঞ্জি।

বলাবাহুল্য, মুসলমানিত্বের এই প্রেরণা কেবল মাথায় সীমাদ্ধ না থেকে গোটা শরীরে প্রসারিত হলেই ভাল হত এবং তাই হত সঠিক মুসলমানিত্বের বহিঃপ্রকাশ।

একটি দৈনিক পত্রিকায় জিন্স ও গেঞ্জি পরিহিতা এবং মাথায় ওড়না পৌঁচানো এক ফিলিস্তীনী তরুণীর ছবি এসেছিল, যার দিকে এক ইসরাঈলী সৈন্য অস্ত্র তাক করে আছে। ছবিটি আমার কাছে নিদারুণ বেদনাদায়ক কিন্তু অতি তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল। আজ আমরা আমাদের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করেছি বলেই কি ইহুদী-খৃস্টানদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছি না?

৪. পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে অপচয় না করা।

'ইসরাফ' বা অপচয় সর্বক্ষেত্রেই নিন্দনীয় ও হারাম। পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারেও তা প্রযোজ্য। বিলাসিতা বা ফুটানির জন্য বা শুধু শখের বসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাক তৈরি করা বা সীমাতিরিক্ত উচ্চমূল্যের পোশাক ক্রয় করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। বিশেষ বিশেষ সময়ে পরিধানের জন্য কিছুটা মূল্যবান পোশাক থাকা দোষনীয় নয়, তবে তা কখনো ইসরাফের আওতাভুক্ত না হওয়া চাই।

অনুরূপ এ ব্যাপারে কৃপণতাও কাম্য নয়। আবুল আহ্ওয়াস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তখন আমার পরনে ছিল অতি নিম্নমানের পোশাক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সম্পদ আছে? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন কি সম্পদ আছে? আমি উত্তরে বললাম, সবধরনের সম্পদই

আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন- উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া, গোলাম ইত্যাদি। তখন তিনি ইরশাদ করেন- فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ

'যখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে সম্পদ দিয়েছেন তখন তোমার উপর তাঁর নেয়ামত ও অনুগ্রহের চিহ্ন থাকা চাই।'

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৫৭; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ৫২৯৪)

অতএব বিলাসিতা বা কৃপণতা কনোটাই নয়, প্রয়োজন ও সঙ্গতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে লেবাস-পোশাক ব্যবহার করাই ইসলামের নির্দেশনা।

৫. অহংকার ও প্রদর্শনের মানসিকতা পরিহার করা

অহংকার ও লোক দেখানোর মানসিকতা সর্বাবস্থায় ও সকল কাজেই পরিত্যাজ্য। লেবাস-পোশাকের মধ্য দিয়েও যাতে এই আত্মিক ব্যাধি মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়েও হাদীস শরীফে সতর্ক করা হয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

"যে ব্যক্তি অহংকারবশত মাটিতে কাপড় হেঁচড়ে চলে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। (ক্রুদ্ধ থাকবেন)।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১৮৫/৪৪)

জাহেলি যুগে এভাবে মাটিতে কাপড় হেঁচড়ে চলার প্রবণতা ছিল সেটা ছিল একটা অহংকারসুলভ রীতি। আমাদের সমাজেও অনেককে ইচ্ছাকৃতভাবে লুঙ্গি, প্যন্ট ইত্যাদি মাটিতে হেঁচড়ে চলতে দেখা যায়। এ ধরনের কাজ অহংকার বশত হয়ে থাকলে তা মারাত্মক কবীরা গুনাহ আর যদি অহংকারবশত না হযে শুধু অভ্যাস ও রেওয়াজ ইত্যাদির কারণে হয় তবুও তা নাজায়েয। অতএব সর্বাবস্থায়ই তা পরিত্যাজ্য। অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ

"লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে তা (অর্থাৎ টাখনুর নিচের সেই স্থান) জাহান্নামে যাবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৮৭)

অনুরূপ মানুষকে দেখানোর জন্য বা মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খুব জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক বা ব্যতিক্রমি পোশাক পরিধান করাও শরীয়তে নিষেধ। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে লেবাস পরিধান করবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরাবেন।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০২৩; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৬০৩/৩৬০৭)

৬. পারিপাট্যের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করা।

সুন্দর, শালীন ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা এবং চুল, দাড়ি, নখ ইত্যাদি পরিপাটি রাখা মাহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও নির্দেশনা। হাদীস শরীফে এসেছে-

"নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসা ছিলেন, ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। যার চুল ও দাড়ি ছিল এলোমেলো। নবীজী তাকে হাতের ইশারায় চলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন; যেন তিনি তার চুল-দাড়ি পরিপাটি করে আসার নির্দেশ দিচ্ছেন। লোকটি তার চুল-দাড়ি পরিপটি করে ফিরে এল নবীজী তখন; ইরাশদ করেন-

أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ

'এ বেশটি কি এথেকে উত্তম নয় যে, তোমাদের কেউ মাথার চুল আউলিয়ে মূর্তিমান শয়তানের মত এসে উপস্থিত হবে'। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক ২/২৬২)

ইসলামের সৌন্দর্যপ্রিয়তা সম্পর্কে লিখতে গেলেও বেশ কলেবরের একটি বই হবে এবং সে বইয়ের একটি অধ্যায় হতে পারে সৌন্দর্য ও পারিপাট্যের ব্যাপারে ইসলামের ভারসাম্য। ইসলাম সকল বিষয়ের মত এ ব্যাপারেও ভারসাম্য রক্ষার নির্দেশ দেয়, কিন্তু এ ব্যাপারে নিমজ্জিত হয়ে পড়া কখনো সমর্থন করে না। প্রয়োজন ও ভদ্রতার পরিধিতেই তা সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এই সীমা অতিক্রম করে যদি তা মানুষের সার্বক্ষণিক ধ্যান-জ্ঞানের উপলক্ষ হয়ে ওঠে তবে এই লেবাস-পোশাকই অপচয়, অংকার লোক দেখানো ইত্যাদি নিষিদ্ধ দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য। আজকের সমাজে ফ্যাশনের নামে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় তা দিয়ে সমাজের অনেক কল্যাণকার্যই সম্পাদন করা যায়। 'শিল্প' শব্দটি এমনই মোহনীয় যে, যেখানেই তা যোগ হয় তা-ই যেন সকল বিবেচনার উর্ধ্বে উঠে যায়। সুতরাং ফ্যাশন যখন শিল্প হয়েছে তখন আর তাতে দোষের কী থাকতে পারে?! কিন্তু কোন বেরসিক যদি সত্যি সত্যিই সন্দিহান হয়ে ওঠে যে, এসব মোহনীয় শব্দ ব্যবহারের পেছনে কি বিবেকের দংশন-জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন গোপন প্রেরণা কার্যকর? অথবা এসবই কি মানুষের সহজাত বুদ্ধি-বিবেচনাকে আচ্ছন্ন করে সমাজকে একটি গড্ডালিকা প্রবাহে বইয়ে

দেওয়ার মোক্ষম অস্ত্র? অথবা ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মুনাফা লোটার একটি কৌশল মাত্র? তবে তা অবশ্যই অযৌক্তিক হবে না। ইসলাম মানুষকে শব্দের কারিশমায় প্রতারিত না হয়ে বাস্তবতার অনুগামী হওয়ার নির্দেশনা দেয় এবং প্রত্যেক বস্তু ও বিষয়ের যথাযথ মূল্যায়নের আদেশ করে।

৭. বিজাতির অন্ধ অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকা

জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রেই স্বকীয়তা বজায় রাখা উচিত। কোন ধরনের বাছ-বিচার ছাড়াই অন্যের রীতি-নীতির অনুগামী হওয়া আত্মমর্যাদার অধিকারী কোন জাতির কাছেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। আল্লামা ইবনে নুজাইম র. বলেন-

"আহলে কিতাবের সাথে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য নিন্দনীয় নয়। কেননা আমরাও খাই-দাই, পান করি যেমন ওরাও খায়-দায়,পান করে। হারাম তো তা-ই যা নিন্দিত বিষয়ে হয় এবং যাতে সামঞ্জস্যই উদ্দেশ্য থাকে।"

(আলবাহরুর রায়েক)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, তাঁরা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাদি সংক্রান্ত বেশ কিছু বিষয় বিজাতিদের থেকে গ্রহণ করেছেন। যথা গযওয়ায়ে আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধে নবীজীর পরিখা খননের কৌশল গ্রহণ করা, যুদ্ধে মিনজানিক, যা এক ধরণের পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র-এর ব্যবহার, এসবই অন্য জাতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যেহেতু এগুলো ব্যবস্থপনা ও কৌশলগত ব্যাপার, যাতে শরীয়ত মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করেছে; অতএব তা কখনো সেই নিন্দিত সামঞ্জস্যের আওতাভুক্ত নয়। কিন্তু যেসব বিষয়ে সামঞ্জস্য অবলম্বন শরীয়তের কোন বিধান বা মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক তা অবশ্যাই পরিত্যজ্য।

আজকাল পাশ্চাত্যের যে বেশভূষা আমাদের মুসলিম সমাজে দুঃখজনকভাবে প্রসার লাভ করছে তাকে তো পোশাক বলাই মুশকিল। শুধু ইসলামী মূলনীতিই, নয় সাধারণ শালীনতাবোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও এজাতীয় লেবাস-পোশাক অবলম্বন করা একটি মুসীবতের ব্যাপারই বটে। সামান্য চিন্তা করলেই দেখা যাবে, এমন বেশভূষা ইসলামের এক বা একাধিক নীতির সাথে বিরোধপূর্ণ।

৮. অগোছালো ভঙ্গিতে পোশাক পরিধান না করা

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اِشْتِمَال صَمَّاء (ইশতেমালে সাম্মা) থেকে নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮১৯)

'ইশতেমালে সাম্‌মা' বলা হয় চাদর জাতীয় কোন পোশাক পুরো শরীরে এমনভাবে পেঁচিয়ে নেওয়া যে, সহজভাবে চলাফেরা করা যায় না; প্রয়োজনের সময় তাড়াতাড়ি হাত বের করা যায় না। যেমন গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় শীতকালে মায়েরা শিশুদের গায়ে চাদর জড়িয়ে ঘাড়ের কাছে গিঁট মেরে দেন। এভাবে কাপড় পরা অনুচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চাদরে احتباء 'ইতহিবা' করতেও নিষেধ করেছেন।

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৮১৯/৫৮২২)

এখানে 'ইহতিবা'র অর্থ হল, মাটিতে দুই হাঁটু খাড়া করে বসে এক চাদরে পুরো শরীর ও পা দুটি আবৃত করা। এতে উপর দিয়ে সতর দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশংকা থাকে।

অনুরূপ লুঙ্গি পরে বিছানায় বা মাটিতে শুয়ে হাঁটুর উপর পা তুলে দিতেও নিষেধ করেছেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

(জামউল ওয়াসায়েল শরহু শামায়িলিত তিরমিযী ১/১৭৯)

কেননা এতেও সতর অনাবৃত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

মোটকথা এমন অগোছালো ভঙ্গিতে বা বেঢংগাভাবে পোশাক পরিধান করা অনুচিত যা আরামদায়ক নয় অথবা যাতো সতর অনাবৃত হওয়ার আশংকা থাকে।

আমাদের সমাজের মজদুর শ্রেণীর অনেককে 'মালকোচা' মারতে দেখা যায়; এটা যে শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয, তা তো বলাই বাহুল্য।

৯. পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখা

এটিও নবীজির নির্দেশ। জাবের (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন তার মাথার চুল এলোমেলো। তখন তিনি ইরশাদ করেন-

مَاكَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ؟

"এই লোকের কি এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে তার মাথা পরিপাটি করবে?" অপর এক ব্যক্তিকে ময়লা কাপড় পরিহিত দেখে ইরশাদ করেন– এর কাছে কি এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে তার কাপড় ধৌত করবে।"

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪০৫৬)

হযরত সাহল ইবনে হানজালা (রাঃ) থেকে ফেরার পথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে লক্ষ করে ইরশাদ করেন- "তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে আগমন করেছ। সুতরাং তোমাদের হাওদাগুলো ঠিক

করে নাও এবং তোমাদের পোশাক পরিপাটি করে নাও, যাতে তোমরা (সাক্ষাৎ করতে আসা) মানুষের ভিড়ে তিলকের মত (অর্থাৎ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন) প্রতিভাত হও। (জেনে রেখো!) আল্লাহ্ তাআলা স্বভাবগত নোংরামী বা ইচ্ছকৃতভাবে নোংরা বনা কোনটাই পছন্দ করেন না।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭০৮৩)

অপর হাদীসে চুল, দাড়ি, আউলিয়া শয়তানের মূর্তি ধারণ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মানাযির আহসান গীলানি রহ. এর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেন, "(ইসলামের) প্রশংসিত পূর্বপুরুষদেরকে যে কতক লোক বদনাম করতে বসেচে তাদেরকে সাহস করে একথাটা কে জানিয়ে দিবে যে, এলোমেলো দাড়ি, বিক্ষিপ্ত কেশ আর বেঢংগা লেবাস-পোশাককে যে তারা ধর্মীয় সূরত সাব্যস্ত করছেন, ধর্মের সবচেয়ে বড় শিক্ষক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টিতে তা-ই ছিল বেদ্বীনীর আলামত।

(ইসলামী মাআশিয়াত ২৩)

১০: পোশাক পরিধান করে দোয়া পড়া

পোষাক-পরিচ্ছদ যেহেতু আল্লাহ তাআলার নেয়ামত তাই তা পরিধান করে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আবু সাঈদ খুদরী রা, বলেন "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন বলতেন।

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِىْ هٰذَا نَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَاصُنِعَ لَهُ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَاصُنِعَ لَهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ

"ইয়া আল্লাহ, তোমারই প্রশংসা। তুমিই আমাকে এই পোশাক পরিয়েছ। আমরা তোমার নিকট এই কাপড়ের কল্যাণ (যথা, টেকসই হওয়া, প্রয়োজনে কাজে আসে) এবং উপকারিতা কামনা করি এবং এর অকল্যাণ ও অপকারিতা থেকে পানাহ চাই।" (সুনানে তিরমিযী; হাদীস ১৭৬৭, সুনানে আবু দাউদ)

পোশাকের উপকারিতা হল, এর মাধ্যমে দৈহিক প্রয়োজন পূরণ হওয়া, আত্মিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত এবং আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যে সাহায্য লাভ হওয়া আর এর অপকারিতা হল, এর মাধ্যমে পোশাকের উদ্দেশ্য অর্জিত না হওয়া, আত্মিক ও মানসিক অবনতি ঘটা এবং আল্লাহর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভিন্ন পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে সহায়ক হওয়া।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিষয়াদি অর্জন একমাত্র আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের মাধ্যমেই হতে পারে। লেবাস-পোশাকের ব্যাপারে ইসলামী দর্শন ও নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুধাবন করার পর যে কোন মুমিনই নবীজীর এই দোয়ার গভীরতা উপলব্ধি করে চমৎকৃত হবেনা।

তাই পোশাক শুধু মানুষের বাহ্যিক খোলসমাত্র নয়; এটি মানুষের রুচি, প্রকৃতি ও মন-মানসিকতার পরিচায়ক। মানুষের আত্মিক উন্নতি বা অবনতির মাধ্যম। তাই এ ব্যাপারে অবহেলা নয়, নয় গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানো। সচেতনা ভাবে সেই লেবাসই অবলম্বন করা উচিত যা মানুষকে মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু হতে সাহায্য করে। নিঃসেন্দেহে সেটিই সর্বোত্তম লেবাস।

পোষাক-পরিচ্ছদে আধুনিক বিচ্যুতি

আজকাল নারীরা দর্জির নিকট গিয়ে শরীরের মাপ দেয়। এমনকি বক্ষ, কোমর, পেট ইত্যাদির মাপও দেয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা হয়ত এমন নির্লজ্জ কাজ করার দুঃসাহস পায়না। কিন্তু তথাকথিত কোন কোন পরিবারের মডার্ণ নারীরা স্বামী বা পিতা-মাতার অজান্তে দর্জির নিকটে যেয়ে শরীরের মাপ দিচ্ছে। তারা বলে যে, মা-বোন সকলেরই আছে। এতে কি-ই বা পাপ হয়?

হায় আফসোস! পুরুষ দর্জি বেগানা নারীর দেহের মাপ নেবে, তাতেও তাদের বিবেকে বাঁধে না? কোন পোষাক তৈরীর জন্য কোন পুরুষ দর্জিকে শরীরের মাপ দেয়া নারীর জন্য সম্পূর্ন হারাম। তেমনিভাবে পুরুষদের জন্য নারীর শরীর পরিমাপন নাজায়িয।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- কোন না-মাহরামকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা এমন, যেন কোন ব্যক্তির হাত শুয়োরের রক্তে ডুবিয়ে রাখা। অর্থাৎ বেগানা নারীকে স্পর্শ করা আর শুয়োরের রক্তে হাত ডুবিয়ে রাখা সমান কথা। তেমনিভাবে কোন মহিলা তার শরীরকে কোন পুরুষকে স্পর্শ করতে দেয়ারও সেই হুকুম। পোষাকের মাপের জন্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মাপ দেয়াও তার চেয়ে কম নয়।

ফিকহের কিতাবে আছে-যদি প্রয়োজন দেখা দেয় কোন মহিলাকে যানবাহনে আরোহণ করানোর, তাহলে করণীয় হল-এক নারী অন্য নারীকে হাতে ধরে বাহনে আরোহণ করাবে। একান্ত যদি কোন মহিলা না থাকে, তাহলে মাহরাম পুরুষ তার মাহরাম মহিলাকে কোন মোটা কাপড়ের আবরণে ত্বড়িত এমনভাবে আরোহণ করাবে, যাতে পুরুষের হাতের উষ্ণতা নারীর শরীরে অথবা

নারীর হাতের উষ্ণতা পুরুষের শরীরে অনুভূত না হয়। আর অন্তর পবিত্র রাখবে।

এখন চিন্তার বিষয় এই যে, পিতা, কন্যা, জননী এবং পুত্র সম্পর্কে শরীয়তের আদেশ এই। অথচ এরা একে অপরের জন্য মাহরাম। সুতরাং যারা গাইরে মাহরাম, তাদের জন্য কি হুকুম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাই বেপর্দায় নারী-পুরুষের একাকার হয়ে যাওয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না।

পোষাকের মাধ্যমে মহিলাদের যাতে মাহরামদের থেকে প্রয়োজনীয় পর্দা এবং পরপুরুষ থেকে প্রয়োজনীয় পর্দা করা যায়-সে রকম ফুলগলা, ফুলহাতা, ঢিলেঢালা সুন্নাতী লেবাস পরিধান করা কর্তব্য। বেপর্দার বিভিন্ন ফ্যাশনের পোষাক তৈরী করা কিছুতেই জায়িয হবে না। মুসলমান নারী-পুরুষদের এ জাতীয় কার্যকালাপ থেকে বাঁচতে হবে।

খৃষ্টানী পোষাক পরিহার করতে হবে

পোশাক সেলাই করার ব্যাপারে ঐ জিনিসের প্রতি একবারেই লক্ষ্য রাখা হয় না যে, এটা জায়িয, নাকি নাজায়িয? মুসলমানের সন্তানেরা শার্ট, জামায় কলার ও টাই ব্যবহার করে। যদি কেউ বাধা দেয়, তাহলে বলে-এত কঠোরতা করা উচিত নয়। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব বিটানিকার প্রথম সংস্কার যখন প্রকাশিত হয়, তাতে টাই-এর উপর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। যা আমি একটি পত্রিকায় পড়েছি। লেখা ছিল যে, ইংরেজরা খৃষ্টীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। কলারদ্বয় হল সলীব, আর টাই হল-যার উপর যীশু ঝুলে রয়েছেন। এটা ইংরেজরা তাদের ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী আবিস্কার করেছে, আর আমরা চোখ বন্ধ করে আপন বানিয়ে নিয়েছি! ইসলামী সংস্কৃতি ধ্বংসে ইংরেজরা কত সুক্ষ্মভাবে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে আর মুসলমানরা না বুঝে তা পালন করে চলেছে।

চমকানো ফ্যাশন পরা নাজায়িয

ফিকাহর কিতাবে আছে, যে পোশাকে শরীর ঝকমক করে, তা পরিধান করা নাজায়িয। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে নারী-পুরুষ সকলেই দেহ প্রদর্শনীতে ব্যস্ত। পোশাক পরিহিত রয়েছে, অথচ শরীরের অঙ্গ দৃষ্ট হয়। তাতে দেহের অনেক কিছুই প্রদর্শিত হচ্ছে। তেমনিভাবে শর্ট কামিজ বা সংক্ষিপ্ত কাপড় পরে মেয়েরা অর্ধোলঙ্গ হয়ে সর্বত্র অশ্লীলতার বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। এভাবে বর্তমান নারীদের পোশাক শালীনতাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের পোশাক হতে হবে ঢিলাঢালা, মার্জিত ও পর্দাসমৃদ্ধ। খোদা প্রদত্ত সৌন্দর্য হিসেবেই পোষাক বেছে

নিতে হবে পোশাক মানুষের সৌন্দর্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৌন্দর্যের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছেন। সূরা আরাফের ২৬নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

يَا بَنِىْ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِىْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

"হে আদম সন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র। আর পরহেযগারীর পোশাকই সর্বোত্তম।"

মহামহিম আল্লাহ তা'আলা লজ্জাস্থান আবৃত করার নিমিত্ত এবং সৌন্দর্যের জন্য পোশাক দান করেছেন। মানুষ ঐ পোশাককে কাট-ছাট করে নিত্য নতুন ডিজাইন ও ফ্যাশন উদ্ভাবনে এত অতিরঞ্জিত করছে যে, হালাল-হারামের প্রতি সামান্য মাত্রায়ও ভ্রুক্ষেপ করে না। এটা অনুচিত।

পোষাক সম্পর্কে নির্দেশনা পোষাক ইসলাম সম্মত হওয়ার পাশাপাশি পোষাক হালাল উপার্জনের হতে হবে। হারাম টাকার পোষাক ব্যবহারে কোন পবিত্রতা ও মনন সৌন্দর্যশীলতা নেই। পাশাপাশি অহংকার থেকেও বাঁচতে হবে এবং মানুষদের দেখানোর নিয়্যত ত্যাগ করতে হবে। বরং আল্লাহকে রাজী-খুশী ও সন্তুষ্ট করার নিয়্যতেই মুসলমানদের পোষাক পরিধান করা কর্তব্য। সে মর্মে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নতুন পোষাক পরিধান করতেন, তখন নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

(অর্থঃ ঐ মহান আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা-যিনি আমাকে পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং যিনি আমাকে এ রিযিক দান করেছেন আমার শক্তি-সামর্থ ব্যতীত।)

তৎসঙ্গে মুস্তাহাব এই যে, নতুন পোষাকের শুকরিয়া স্বরূপ যে পোষাক পুরাতন হয়ে যায়, তা সদকা করে দেয়া।

প্রয়োজন মুতাবিক পোষাক বানানোর অনুমতি আছে। দু'সেট পোষাকের প্রয়োজন, তিন সেট পোষাকের প্রয়োজন, কিন্তু সেটের উপর সেট, জোড়ার উপর জোড়া পোষাক একত্রিত করতে থাকা আর এই কারণেই পড়ে থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দণীয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-"একটি বিছানা নিজের জন্য, একটি বিছানা স্ত্রীর জন্য, একটি বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থটি শয়তানের জন্য।" (মিশকাত শরীফ)

অর্থাৎ বিছানা একটির অতিরিক্ত বানানোর অনুমতি রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজন অনুপাতে। হাকীমুল উম্মত হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী (রাঃ) বলেন-"মানুষ আমদানী বৃদ্ধি করার ধান্ধায় ব্যস্ত, যা মানুষের আয়ত্বাধীণ নয়। আর ব্যয় কমানোর চেষ্টাই করেনা। অথচ তা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীণ।"

তাই পোষাকের ক্ষেত্রেও যাতে অপচয় না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বস্তুতঃ এসব কিছুর জন্যই মহান আল্লাহর দরবারে আমাদের জবাবদিহী করতে হবে।

বেপর্দা ও অবাধ্য স্ত্রীর প্রতি স্বামীর করণীয়

পর্দা আল্লাহপাক ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত বিধান। তাই এ বিধান পালন করা প্রতিটি নারীর উপর ফরয। আখিরাতের কল্যাণ অর্জনের সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর মায়া-মুহাব্বতের স্থায়ীত্বের লক্ষ্যে এবং দাম্পত্য জীবন সুখ ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্যই পর্দার এ বিধান। কিন্তু এমনও অনেক লোক আছে, যারা আত্মঅহমিকা, নির্বুদ্ধিতা ও বেওকুফীর কারণে নিজেদের এত বড় উপকারী জিনিসের বিরোধিতা করে থাকে। কাজেই কোন মহিলা যদি পর্দা না করে এবং স্বামীর বলাতেও তার কথা না শুনে, তাহলে সে একাধারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং স্বামীর অবাধ্যচারিনী সাব্যস্ত হবে। এমতাবস্থায় স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে বুঝাবে। প্রয়োজন হলে একই ঘরে বিছানা আলাদা করে দিবে। এতেও যদি কোন ফল না হয়, তাহলে হালকা শাস্তি প্রয়োগ করবে। এতেও যদি সু-পথে না আসে তাহলে দু'পক্ষের দু'জন মুরুব্বীর দ্বারা ফয়সালা করাবে। এতেও ফায়দা না হলে স্ত্রীর পবিত্র অবস্থায় শরীয়াত মুতাবিক তালাক দিয়ে কোন দ্বীনদার পর্দান শিন মহিলাকে বিবাহ করে নিবে। আর এ রকম করাই উচিত। কারণ, একজন দ্বীনদার লোকের জন্য দ্বীনদার পর্দানশীন স্ত্রী হওয়া উচিত। বেপর্দা স্ত্রীকে নিয়ে ঘর-সংসার করায় মান-মম্মান নিয়ে জীবন-যাপন করা এবং তার থেকে নেক সন্তানের আশা করা অসম্ভব।

(প্রমাণ ঃ ফাতওয়া দারুল উলূম, ৯ঃ৩৬)

বেপর্দা মেয়ের প্রতি পিতার করণীয়

ছেলেমেয়েকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য বাল্যকালেই তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়া মা-বাপের উপর ফরয করা হয়েছে। সেই প্রথম ফরয তরক করার কারণে আজ বদদ্বীন পরিবেশে থেকে এবং দ্বীনী শিক্ষার বদলে নাস্তিক্যবাদী কু-শিক্ষা পেয়ে তারা বিপথগামী হচ্ছে। তাদেরকে বাল্যকালেই দ্বীন ও ইসলামের বিধি-বিধান শিক্ষা না দিলে অভিভাবকগণ পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

মেয়ের ব্যাপারে পিতার কর্তব্য হচ্ছে, শিশুকাল থেকেই দ্বীনী পরিবেশে রেখে দ্বীনদারী শিক্ষা দিয়ে আদর্শ চরিত্রের অধিকারীনীরূপে তাকে গড়ে তুলবে। অতঃপর বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ার সঙ্গে দ্বীনদার, পরহেযগার পাত্র দেখে তাকে অবিলম্বে বিবাহ দিয়ে দিবে। সাবালিকা হওয়ার পরও যদি অভিভাবক তার বিবাহের বন্দোবস্ত না করে এবং এমতাবস্থায় যদি সে পাপ কাজে লিপ্ত হয়, তবে অভিভাবকও সেই গুনাহের অংশীদার হবে। (মিশকাত শরীফ, ২ঃ২৭১)

আজ অধিকাংশ পিতামাতা ছেলেমেয়েকে কুরআন শিখায় না, দ্বীনী ইলম শিখায় না। বালেগ হওয়ার পর তাদের হেফাজতে রেখে তাড়াতাড়ি তাদের বিবাহ-শাদীর ফিকির করে না। যদ্দরুন পরে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। শরীয়াতের বর্ণিত নির্দেশের উপর ধারাবাহিকভাবে আমল করলে এ ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি এক প্রকার থাকে না বললে চলে। কিন্তু মানুষেরা শরীয়াতের বরখেলাফ করে যখন পেরেশানীতে পড়ে, তখন শরীয়াতকে দোশারোপ করে নিজের ঈমান নষ্ট করে ফেলে। শরীয়াতের দৃষ্টিতে ছেলেমেয়ে কাউকে অন্যায়ের কারণে ত্যাজ্য করার বিধান নেই। বরং, বুঝিয়ে সৎপথে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর দুনিয়াবী আইনে ত্যাজ্য করলেও তারা শরীয়াতের বিধান মোতাবেক পিতা-মাতার সম্পদ থেকে মাহরূম হয় না। তবে তার সম্পূর্ণ সম্পদ যদি অন্য আওলাদকে মালিক বানিয়ে হিবা করে দেয়, সেক্ষেত্রে অবশ্য ত্যাজ্য সন্তানরা অংশ পায় না। সন্তান নাফরমানীতে ডুবে থাকলে তার ব্যাপারে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়াই উত্তম।

আপনি তাকে সৎপথে আনার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। সম্পদ থেকে মাহরূমীর ভয় দেখিয়ে বা অন্য কোনরূপ শাসনে কন্ট্রোলে আনার চেষ্টা করুন। আর তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে মহিলাদের কোন দ্বীনী পরিবেশ ও দ্বীনী তা'লীমের মধ্যে আনা-নেয়ার ব্যবস্থা করুন। তৎসঙ্গে দ্বীনদার পাত্র দেখে তাকে যথাশীঘ্র বিবাহ দেয়ার ব্যবস্থা করুন। পাশাপাশি তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে

অনবরত দোয়া-রোনাযারী করতে থাকুন এবং তাকে দ্বীন শিক্ষা না দেয়ার কারণে নিজের ভুলের প্রতি অনুতপ্ত হয়ে তওবা করুন।

(প্রমাণ ঃ ফাতওয়া মাহমুদিয়া, ১৪ ঃ ৪৩৯, ফাতাওয়া রাহীমিয়া, ৬ ঃ ৪৭০/১৫০, ফাতাওয়া আব্দুল হাই, ৩ ঃ ৯, ইমদাদুল মুফতীন, ১০৫১)

পিতা-মাতার আদেশে পর্দা ভঙ্গ করা

বালেগা মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরয। পিতা-মাতা বা কোন মানুষের কথার কারণে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা জায়িয নয়। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে যে, "আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কোন বান্দাকে খুশী করা জায়িয নয়"।

তাই এ অবস্থায় পর্দা ভঙ্গ করে হাইস্কুলে যাওয়া জায়িয হবে না। তবে যে কোন হিক্‌মতের মাধ্যমে পিতা-মাতাকে স্বীয় মতের উপর রাজী করাবে। যদি অগত্যা পিতা-মাতা রাজি নাই হন তাহলে তাদের নির্দেশ এ ব্যাপারে না মানলে গুনাহগার হতে হবে না।

(প্রমাণ ঃ মিশকাত শরীফ, ৩১৯, তাফসীরে কুরতুবী, ৯ঃ২৬৬, আবু দাউদ, ২ঃ৫৫৯)

২০তম অধ্যায়

নারীদের সৌন্দর্য চর্চার হুকুম

পবিত্র কুরআনে মুমিন নারীদের জন্য 'তাবাররুজ' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাবারুরুজ শব্দের অর্থ-মুখমণ্ডল, শরীর, রূপ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ানো। ইসলামী পরিভাষায় মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্যকে প্রকাশ্যে পরপুরুষের সামনে প্রদর্শন করাকে তাবাররুজ বলে। (তাশরীহুল বুখারী)

বর্তমান যুগে কিছুসংখ্যক নারী ইউরোপীয় স্টাইলে অর্থাৎ বিধর্মীদের অনুকরণ করে, যেমন-বেপর্দা চলাফেরা, শরীরে কারুকার্য করা, পাতলা কাপড় পরিধান, মাথার চুল খাট করা, শার্ট-প্যান্ট ও সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রকাশ্যে পরপুরুষের সামনে চলাফেরা করছে। আজ নারীদের এই খোলামেলা চলাফেরা করার কারণে তারা হচ্ছে কামলিপ্সু অর্থাৎ খারাপ চরিত্রের অধিকারী পুরুষের হাতে লাঞ্ছিতা, হচ্ছে তারা ধর্ষণ, খুন, জোরপূর্বক বিয়ে এবং এসিড নিক্ষেপের শিকার।

পরপুরুষের সামনে মহিলাদের প্রকাশ্য সৌন্দর্য প্রদর্শন হারাম। কারণ, খাদ্য দেখে কিংবা তার ঘ্রাণ পেলেই একজন লোকের যেমন ক্ষুধার তীব্রতা বেড়ে যায়, তেমনিভাবে নারীরা যখন সেজেগুজে কারুকার্য করা পাতলা কাপড় পরিধান করে চলাফেরা করে, তখন তাদের দ্বারা পরিবেশ কলুষিত হয়। ফ্যাশনের নামে কেউ ওড়না কাঁধ থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুলিয়ে দেয়। আবার কেউ এক চিলতে কাপড় পরিধান করে-যা সামান্য বাতাসে উড়ে গিয়ে চুলগুলোকে এলোমেলো করে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। কেউ সামনের চুল ছোট করে কপালের উপর ঝুলিয়ে দেয়। আবার কেউ মাথার মুকুট পরে নামকেওয়াস্তে ওড়না দিয়ে তা ঢেকে রাখে। এরকম যে কোনভাবেই পর্দার বিধান লংঘন করা কবীরা গুনাহ ও হারাম।

দুঃখের বিষয়, যে ওড়না দিয়ে সৌন্দর্য ঢাকার কথা, সেই ওড়না আজ নারীরা সৌন্দর্য প্রকাশের জন্যই ব্যবহার করছে। আবার কাউকে দেখা যায়, বোরকা পরে সত্য, কিন্তু মুখ ঢাকে না। বরং সেজেগুজে মেকআপ করে ঘর থেকে বের হয়। আর তখনি শয়তান এদের সৌন্দর্যকে পরপুরুষের নিকট আরো আকর্ষণীয় করে তুলে। ফলে ঘটে যায় নানা অঘটন। ইসলামে এ ধরনের চলাফেরা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন- "হে নবী!) আপনি মুমিন নারীদের বলে দিন, তারা যেন নিজ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং নিজের লজ্জাস্থানকে হিফাজত করে (যিনা-ব্যাভিচার হতে) আর মহিলাগণ তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে না। তবে একান্ত অনিচ্ছায় যতটুকু প্রকাশ হয়ে পড়ে (যেমন বোরকার বহিরাংশ, তাতে দোষ নেই)। আর তারা যেন লম্বা চাদর (হিজাব, বোরকা) দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, মহিলা, নিজ মালিকাধীন বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-যারা মহিলাদের গোপন বিষয়ে বুঝেনা, তাদের ছাড়া অন্যদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, তাহলেই তোমরা সফল হবে। যাতে তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। (সূরা নূর, আয়াত-৩১)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-"তোমরা পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। অন্যথায় যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে যে, সে লালসা পোষণ করে মতলব হাসিলের চেষ্টায় থাকবে।"

(সূরা আহযাব, আয়াত-৩২)

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা গেল- পরপুরুষের সামনে নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন নাজায়িয। সুতরাং সাজ-গোজ করে বেপর্দাভাবে মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়া কোনক্রমেই জায়িয নয় এবং বাসা-বাড়ীতে থাকা অবস্থায়ও কোন গাইরে মাহরাম পুরুষের সামনে যাওয়া জায়িয নয়।

বস্তুত ঃ নারীদের যাবতীয় রূপ ও সৌন্দর্য কেবলমাত্র স্বামীর জন্য। স্বামীর চোখ, মন ও হৃদয়কে জুড়িয়ে দেয়ার জন্য নারীরা কেবল স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে মেয়েদের সুরেলা সুপ্রিয় মধুর আওয়াজ ও মিষ্টি ভাষা শুধু স্বামীর অন্তর জয়ের জন্য এবং প্রসাধনী দ্রব্য ব্যবহার করবে শুধু স্বামীর মনোরঞ্জনের নিমিত্তে। শুধু এক্ষেত্রেই নারী পারবে শরীয়তের সীমানার মধ্যে সৌন্দর্য চর্চা করতে।

কিন্তু সুগন্ধি প্রসাধনী ব্যবহার করে নারীরা বোরকা পরেও ঘর থেকে বের হতে পারবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যে মহিলা ঘ্রাণযুক্ত প্রসাধনী ব্যবহার করে বাইরে বের হয়, সে বভিচারিণী গণ্য হয়।" বলাবাহুল্য-তার ব্যবহৃত সুগন্ধি পুরুষদেরকে ফিতনায় ফেলে তার দিকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে। তাই নারীদের উচিত-আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা। নচেৎ

আল্লাহ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ তাদের উপর পতিত হবে।

তেমনিভাবে এমন সৌন্দর্য চর্চা জায়িয নয়-যার দ্বারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা আকৃতি বিকৃত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন- "আল্লাহর গজব ও অভিশাপ ঐসব নারীদের উপর পতিত হয়, যারা শরীরে চিত্র বা নাম খোদাই কিংবা অংকিত করার মাধ্যমে সমাজকে প্রলুব্ধ করে অথবা নিজ শরীরে তা গ্রহণ করে এবং যারা কপালের উর্দ্ধশে মাথার চুল উপড়িয়ে কপাল প্রশস্ত করে অথবা ভ্রুর লোম উপড়িয়ে তাকে সরু করে এবং যারা রেতি ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত ঘর্ষণ করে দাঁতকে সরু করে এবং দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। এ শ্রেণীর নারীরা রূপসজ্জার প্রবণতায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব ও গঠনের প্রকৃতি ও সৃষ্টিগত আকৃতি পরিবর্তন ও বিকৃত করে ফেলে রূপসজ্জার এ অবাঞ্ছিত চাকচিক্যের সাহায্যে এ নারীরা নিশ্চয় পরপুরুষের সামনে ফুটে উঠতে চায়। সুতরাং তারা লা'নত ও অভিশাপের যোগ্য।" (সহীহ বুখারী) সুতরাং মহিলাদের অনৈসলামী রূপ-সৌন্দর্য প্রদর্শনীর কুফল থেকে নিজের বেঁচে থাকা এবং সমাজকে হিফাজত করা, পর্দা পালন দ্বারা মহিলাদের ইজ্জত-সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা জরুরী। তেমনিভাবে বেপর্দার ফিতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচা এবং মনের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য মহিলাদের পরপুরুষের সামনে অঙ্গসজ্জা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।

সাজ সজ্জার ইসলামী বিধান

চাক চিক্য সৌন্দর্য এ সাজ সজ্জা এটা মুলত ইসলাম বহির্ভূত কোন কাজ নয় ববং ইসলাম এ বিষয়টির প্রতি আরো গুরুত্বারোপ করেছে। তাই তো রাসুলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন।

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

নিশ্চয় আল্লাহপাক সুন্দর এবং তিনি সুন্দর কে পছন্দ করেন সুতরাং যদি কেউ সৌন্দয্য ও সাজ-সজ্জা গ্রহন করে এটা তার জন্য নিন্দনীয় হবে না এবং প্রয়োজনীয় হবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে চাকচিক্য সৌন্দয্য ও সাজ সজ্জা যেন ইসলামের গণ্ডির বাইরে না চলে যায়।

বিশেষ করে চাকচিক্য সৌর্ন্দয্য ও সাজ সজ্যা করা মহিলাদের স্বভাব বৈশিষ্টের অনুকুলে প্রত্যেক মহিলারাই স্বভাবগত প্রবৃত্তির কারনে সুন্দর ও রুপসী হতে চায় নিজেকে অনুপমা রূপবর্তী হিসেবে তুলে ধরতে। তাই বলা হয় ইসলাম মহিলাদের এই কাংখিত বাসনা ও চাহিদার পরিপন্থী নয় নিষেধ করেনা সেজে গোজে পরিপাটি হতে পরিমার্জিত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে। তবে মনে

রাখতে হবে নারীর এই সাজ গোজ কেবল মাত্র হতে পারে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে অন্য কারো উদ্দেশ্যে নয়। আকর্ষনীয় পোশাক পরিচ্ছেদ সজ্জিত হওয়া সুগন্ধী মেখে সৌরভিত হওয়াতেও নিশেধ নেই। কিন্তু তাও হতে হবে একমাত্র স্বামীর জন্য।

মহিলাদের সাজ গোজ রুপ চর্চ্চা ইত্যাদি যদি স্বামীর উদ্দেশ্যে হয় তখন তা ইবাদত রূপে গণ্য হবে পক্ষান্তরে তা যদি ভীন পুরুষের জন্য হয় তাহলে তা দোষণীয় এবং কঠিন গোনাহের কাজ।

বিউটি পার্লারের ক্ষতি সমূহ

বিউটি পার্লারে গিয়ে আবিস্কৃত আধুনিক ফ্যাশন ও রুপ চর্চায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়ে থাকে।

১। মহিলাদের চেহারা শরীর ও চুলের প্রাকৃতিক সৌন্দয্য ও লাবন্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

২। অনর্থক টাকা পয়সা নষ্ট হয়।

৩। জীবনের মুল্যবান সময়ে নিশ প্রয়োজনে নষ্ট হয়।

৪। কোথাও কোথাও বিউটি শিয়ানরা পুরুষ হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের মাধ্যমে সাজ সজ্জা গ্রহন করা একেবারেই হারাম।

৫। বিউটি পার্লারের সাজানো কাজে নিয়োজিত বিউটিশিয়ানরা সাধারনত বেনামাযী পর্দাহীন উশৃঙ্খল এবং লজ্জা শরম হীন প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিউটি পার্লারে গেলে এ জাতীয় মহিলাদের সামনে নিজেদের উন্মুক্ত করে দিতে হয়, যা নৈতিক বিচারে ও নিন্দনীয়।

৬। সর্বপরি বিউটি পার্লারের সম্পর্কে কায়রো মেডিকেল কলেজের প্রফেসার ডা ঃ আঃ মুনয়ীম সাহেব বলেনঃ বিউটি পার্লারে গিয়ে চুল সেটিং করা ইউরোপীয় ফ্যাশনে চুলকে নানা রঙে রঙ্গিন করা চুল পরিস্কার করা ও এতে স্টাইল বা ডিজাইন করার জন্য যে সেটিং মেশিন ও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা এসব দ্রব্যে এমন সব পার্শ প্রতিক্রিয়া রয়েছে যা চুলের জন্য এবং চেহারার জন্য ক্ষতিকর, এরূপ কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ফ্যাশনের সীমারেখা

সাজ-সজ্জ্যা সম্পর্কে মহিলাদের তিনটি মৌলিক বিষয় স্মরন রাখতে হবে।

১। যে সকল কাজ শরীয়ত পরিপন্থী তা কোন ভাবেই করা জায়েজ নেই। যেমন চুল কাটা, মহিলাদের জন্য পুরুষের পোষাক পরিধান করা ইত্যাদি।

২। যে সকল বিষয় শরীয়ত অনুমোদিত সে সকল বিষয় স্বামীর পূর্ন আনুগত্য করা স্ত্রীর কর্তব্য। এমনটি হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রাঃ) বলেন স্বামীর নির্দেশ সত্বেও যদি স্ত্রীর বৈধ সাজ-গোজ না করে সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করার অধিকার রাখে।

৩। সর্বপোরী মহিলাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে তাদের সাজ-সজ্জা সব কিছু হতে পারে কেবল মাত্র স্বামীর জন্য। যদি সাজ-সজ্জা অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা হয় অথবা অহংকার ভাব প্রকাশের জন্য করা হয় তাহলে এধরনের সাজ-সজ্জা গ্রহন করা নাযায়েজ এবং হারাম।

মাথার চুল কাটা

ফ্যাশনের উদ্দেশ্যে চুলকে ছোট করা জায়েজ নেই। তবে যদি চুলের অগ্রভাগ ফেটে শাখা প্রশাখার সৃষ্টি হয় যার দরুন চুলের মধ্য জটিলতা দেখা যায় সেক্ষেত্রে চুলের অগ্রভাগ ছাটার অনুমতি রয়েছে। এছাড়া সাধারন ভাবে যদি চুল বলে নিচু হয়ে যায়, অথ্যাৎ চুলের অগ্রভাগে সামান্য কিছু চুল বেশি লম্বা বা খাটো অবস্থায় থাকে এক্ষেত্রে ও চুলের অগ্রভাগ থেকে ছোট সমান করার অবকাশ রয়েছে।

বব কাটিং চুল

মহিলাদের জন্য বব কাটিং চুল রাখা সম্পূর্ণ নাজায়েজ।

মহিলাদের জন্য চুল না কেটে বিভিন্ন ডিজাইন করে রাখার অবকাশ রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।

১। এর দ্বারা যেন কোন বি জাতী বা পাপাচারী মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ না করা হয়।

২। এটা হতে হবে শুধু স্বামীর উদ্দেশ্যে।

৩। এ কাজে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করা যাবে না।

৪। শরীয়াতের কোন নির্দেশ যেন লঙ্ঘন না হয়।

চুল বৃদ্ধির জন্য কাটা

অনেক মহিলাদের চুলের আগা ফেটে তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ফলে চুলের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তখন যদি সে চুলে অগ্রভাগ কেটে দেয় তাহলে চুল আবার বাড়তে শুরু করে, তাহলে এ অবস্থায় চুল বাড়ানোর জন্য অগ্রভাগ ছেটে দেওয়ার অবকাশ রয়েছে।

রোগ ব্যাধির জন্য চুল কাটা

যদি কোন মহিলার রোগের কারনে চুল কাটার প্রয়োজন হয় তাহলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে চুলকাটা জায়েজ আছে।

ভ্রু চিকন করা

আজ কাল সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মহিলারা ভ্রুর কিছু লোম উপড়ে ফেলে। যার ফলে ভ্রুদয় অর্ধ বৃত্ত রেখায় পরিনত হয়। এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে না যায়েজ। স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যও এমনটি করা জায়েজ নেই। তবে যদি ভ্রুর লোম অতিরিক্ত লম্বা হয়ে যায় এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে থাকে যার ফলে দেখতে খারাপ দেখা যায় তবে এক্ষেত্রে তা কেটে কিছুটা খাট করা যায়েজ আছে।

মহিলাদের গোফ-দাড়ী এবং চেহারার লোম পরিস্কার করা

কোন মহিলার মুখে যদি গোফ- দাড়ি গজায়, তা পরিস্কার করা শুধু জায়েজ নয় বরং অতি উত্তম, অনুরুপ ভাবে মুখ মন্ডলের লোম পরিস্কার করাও জায়েজ, তবে লোম পরিস্কারের ক্ষেত্রে উপড়ে না ফেলে হেয়ার রিমোভার পাউডার ব্যবহার করা শ্রেয়।

হাত পায়ের লোম পরিস্কার করা

মহিলাদের জন্য হাত পায়ের লোম পরিস্কার করাও জায়েজ তবে তা না উপড়িয়ে পাউডারের মাধ্যমে পরিস্কার করা শ্রেয়।

শরীরে চিত্রাংকন করা

শরীরে যে কোন ধরনের চিত্রাংকন করা বা করানো যায়েজ নেই। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে কঠিন ধমক দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা আলার অভিসম্পাত সে মহিলার উপরে পতিত হোক যে শরীরে চিত্রাংকন করে এবং চিত্রাংকন করায়। (মেশকাত ৩৮১ পৃ)

পর চুল ব্যবহার করা

মহিলাদের কখনো নিজেকে আকর্শনীয় করার জন্য চুলের সঙ্গে পর চুলা মিশিয়ে তাকে এক্ষেত্রে পরচুলা যদি মানুষের চুলের পরচুলা হয় তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েজ নেই পক্ষান্তরে পর চুলা যদি জীব জন্তুর চুল বা কৃতিম চুলের পরচুলা হয় তবে সেক্ষেত্রে তা ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে।

মেকআপ সামগ্রীর হুকুম

প্রসাধনী সামগ্রী ও মেকাপ ব্যবহৃদ অনেক জিনিস যেমন পাউডার ক্রীম লিপস্টিক, লোশন, নেইল পালিশ ইত্যাদি এসকল জিনিসের ব্যপারে যদি নিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া যায় যে, এগুলোতে এমন সব জিনিস ব্যবহার করা

হয়েছে যা শরয়ী দিক থেকে ব্যবহার করা হারাম যেমন, শুকরের চর্বি, অথবা মৃত জীব-জন্তুর চর্বি এবং একথাও নিশ্চিত ভাবে জানা যায় এগুলোকে কোন রাসয়নিক পদ্ধতিতে তার মুল থেকে রুপান্তর করা হয়নি, তাহলে ব্যবহৃত বস্তু হারাম ও নাপাক। সুতরাং এমতাবস্থায় এগুলোর ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে এগুলো হারাম বস্তুর ব্যবহার যদি নিশ্চিত ভাবে যানা যায় তাহলে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে এগুলোর ব্যবহার কে না জায়েজ বলা যাবে না। তবে যদি এগুলোতে হারাম জিনিসের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার সাথে সাথে একথাও নিশ্চিত ভাবে জানা যায় যে এগুলোতে ব্যবহৃত হারাম জিনিস রাসয়নিক পদ্ধতিতে তার মুলকে পরিবর্তন করা হয়েছে এক্ষেত্রে ও এ সকল সামগ্রীর বাহ্যিক ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে।

লিপষ্টিক ব্যবহার

আজকাল মহিলারা যে লিপষ্টিক ব্যবহার করে থাকে তা সাধারনত দুধরনের হয়ে থাকে।

১। কিছু লিপস্টিক এমন রয়েছে যা ব্যবহারে ঠোটের উপর কোন আবরনের সৃস্টি হয় না ফলে ওজু ও ফরজ গোসলের সময় স্বাভাবিক ভাইে চামড়া পর্যন্ত পৌছে যায়। এ জাতীয় লিপস্টিক ব্যবহার করা জায়েজ আছে।

২। তবে কিছু লিপস্টিক এমন আছে যা ব্যবহারে ঠোটের উপর আবরনের সৃষ্টি হয় ফলে অযু ও ফরজ গোসলের সময় তার নিচে পানি পৌছে না সুতরাং অযু ও গোসলের পূর্বে যদি এগুলো সহজে তুলে ফেলা যায় তাহলে এগুলো স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

পলকে রং লাগানো

চোখের পলকে যে রঙ আইব্রু লাগানো হয় যদি তা অযু ও ফরজ গোসলের সময় পানি পৌছার অন্তরায় না হয় তাহলে তা ব্যবহার করা যায়েজ। আর যদি পানি পৌছতে অন্তরায় হয় তবে অযু গোসলের সময় এগুলো ব্যহার করা জায়েজ নেই।

মাশকারা ব্যবহার করা

চোখের পলকে মাশকারা ব্যবহার করা ও জায়েজ তবে লক্ষ রাখতে হবে যাতে ওযু ও গোসলের সময় এর নিচে পনি পৌছে যায়।

নেইল পলিশ

নেইল পালিশ বা এ জাতীয় এমন কোন বস্তু যা ব্যবহারের ফলে অযু এবং গোসলের সময় তার নিচে পানি পৌছেনা, তাহলে অযু ও গোসলের সময়

এগুলো ব্যবহার করা যায়েজ হবে না। তবে যদি এগুলো এমন হয় যে এর নিচে পানি পৌছে যায় তাহলে এগুলো ব্যবহার করা জায়েজ।

বিঃ দ্রঃ উপরে উল্লেখিত জিনিসগুলো যদি অযু এবং গোসলের সময় কোন অন্তরায় না হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য এগুলো ব্যবহার করা যায়েজ আছে। তবে বর্তমানে যেহেতু এ সকল বস্তু বিজাতীদের কালচার হয়েগেছে এবং এগুলো ব্যবহারে অনেক অর্থ ব্যয় হয় এবং সময় নষ্ট হয় সুতরাং এগুলো ব্যবহার না করাই ভালো।

গুপ্ত লোম পরিষ্কার করা

গুপ্ত লোম যেমনি ভাবে পুরুষদের জন্য পরিস্কার করা জরুরী অনুরুপ ভাবে মহিলাদের জন্যও তা পরিস্কার করা জরুরী। এ লোম সপ্তাহে একদিন আর বিলম্ব হলে ১৫ দিনে ১ বার এর থেকে বিলম্ব হলে ৪০ দিনে একবার এর থেকে দেরী করা জায়েজ নেই। যদি কেউ ৪০ দিনের বেশী এ লোম পরিস্কার না করে তবে সে গুনাহগার হবে। এ লোম পরিস্কারের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য চুনা, পাউডার, ক্রীম, চিমটি ইত্যাদি ব্যবহার করা উত্তম। তবে যদি কেউ ব্লেড বা ক্ষুর দিয়ে পরিস্কার করে তবে তা জায়েজ আছে।

২১তম অধ্যায়

সুদের আলোচনা

সুদের সংজ্ঞা ও তার প্রকার ভেদ

আরবী রিবা শব্দটির বাংলা হচ্ছে সুদ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত হওয়া। তাই বলে সর্ব প্রকার অতিরিক্তই সুদ হবে না। যার পারিভাষিক অর্থ দ্বারা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে।

পারিভাষিক অর্থঃ ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ হিদায়ায় রয়েছে লেন-দেনকারী দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ কোনরূপ বিনিময় পরিশোধ না করে শুধুমাত্র শর্তেও ভিত্তিতে যে অতিরিক্ত অংশের মালিক হয়ে থাকে তাকে সুদ বলা হয়।

সুদের প্রকারভেদ

সুদ সাধারণত দু'প্রকার

১। অতিরিক্ত প্রদান জনিত সুদ

২। সময়ের ব্যবধান জনিত সুদ

(১) রিবাল ফজল বলা হয়, একই জাতীয় দ্রব্যের লেন-দেনের ক্ষেত্রে শর্তের ভিত্তিতে এক পক্ষকে কিছু অতিরিক্ত প্রদান করা।

(২) রিবান নাসিয়্যাহ একই জাতীয় দ্রব্যের লেন-দেনের ক্ষেত্রে শর্তের ভিত্তিতে সময়ের ব্যবধান জনিত কারণে অতিরিক্ত যা কিছু প্রদান করা হয় তাকে রিবান নাসিয়্যাহ বলে।

উপরোল্লিখিত উভয় প্রকার সুদই ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। হারাম হওয়ার সু-স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন, "আল্লাহ পাক ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।" কিন্তু মহান আল্লাহর এ চিরন্তন সত্য বিধানকে লংঘন করে যে বা যারাই অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে, সে সাময়িকভাবে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে কিন্তু চির সুখ-শান্তি হতে হয়েছে বঞ্চিত, পরিণামে পেয়েছে অশান্তি, জ্বালা-যন্ত্রণা।

কুরআন ও হাদীসে সুদ

মহান আল্লাহ সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি থেকে বাঁচানো, সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ও পরোপকারীর ন্যায় উত্তম গুণাবলী, মানব মনে সৃষ্টির জন্য সুদকে

চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি কালামে পাকে ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ পাক ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন, সুদকে হারাম করেছেন।"

সুদখোর। (কিয়ামত দিবসে) শয়তান স্পর্শিত ব্যক্তির ন্যায় উম্মাদ হয়ে উঠবে সুদ হারাম হওয়ার পর পূর্ববর্তী সুদ মওকুফ হওয়ার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বকেয়া অর্থ ছেড়ে দাও (তা হারাম)" সুদের নিষিদ্ধতা অমান্যকারীদের প্রতি আল্লাহ হুমকী প্রদর্শন করে আয়াত নাজিল করেন, "তোমরা যদি সুদকে পরিহার না কর, তাহলে শুনে নাও আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা।" কুফর ব্যতীত অন্য কোন বড় গোনাহর জন্য এ রকম মারাত্মক হুমকীর কথা কুরআনুল কারীমে আর নেই।

হাদীস শরীফে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন সুদখোর ও সুদ দাতাকে। -আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্বরতার যুগের সর্বপ্রকার সুদ হারাম হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুদের গুনাহ সত্তর থেকে বেশি। সুদের গুনাহ আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য। অন্যত্র আছে মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমতুল্য। উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা সুদ হারাম হওয়া স্পষ্ট।

সুদের ভয়াবহ চিত্র

ধ্রুব সত্য যেঃ কোন মানুষ এমনি এমনি অন্য কারো কাছে হস্ত সম্প্রসারিত করে না। বরং কোন বিপদাপদে পতিত হয়েই অন্যের দারস্থ হয়। তখন সুদখোরেরা তার এ বিপদকে স্বাগতম জানিয়ে এটাকে একটা অপূর্ব সুযোগ মনে করে চড়া সুদে টাকা দেয়। সামান্য ভ্রুক্ষেপও করে না তার মুছীবতের প্রতি। ফলে বিপদে পতিত ব্যক্তি একটা মুছীবত থেকে বাঁচতে গিয়ে আরেকটা মুছীবতে পা দেয়। ক্রমান্বয়ে তার মুছীবত বাড়তেই থাকে। অপরদিকে সুদখোর ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় থাকে। সময় আসলেই শুরু হয় তার উপর প্রচন্ড চাপ। কখনো নিয়ে যায় তার গরু, কখন ও তার আসবাব পত্র। এমনকি পাখও সুদখোরেরা ভিটেমাটি ছাড়াও করছে অনেককে সাম্প্রতিক কালে। ফলে সুদখোর হচ্ছে দিনে দিনে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। অনাহারী অর্ধাহারীর পেটে লাথি দিয়ে বিলাসবহল অট্টালিকায় বসে গুনছে সুদের টাকা। অপর দিকে দরিদ্রবেচারা দিনে দিনে আরো নিঃস্ব অসহায় হয়ে ঘুরছে উদভ্রান্তের ন্যায়। ঋণের বোঝা মাথায়

নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে সকাল-সন্ধ্যা। কনকনে শীতের খোলা আকাশের নীচে মানবেতর নিশীযাপন করছে। তারা কখনও বা অপমান সহ্য করতে না পেরে, আত্মহত্যাও করছে। আর ইহাই অধুনা পাশ্চাত্যের সেরা উপহার। কারণ তারাই গোটা দুনিয়াতে চাপিয়ে দিয়েছে এ সুদী কারবার। আন্ত র্জাতিক ভাবে সুদী কারবার তারাই বৈধ ঘোষণা করেছে।

আমরা ইসলাম প্রাক্কালে আইয়্যামে জাহেলিয়্যাতের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেও দেখতে পাই, সুদের এ ভয়াবহ পরিণাম বিরাজমান ছিল। সুদখোরের জুলুম নির্যাতনে জন সাধারণের প্রাণ ছিল উষ্ঠাগত। সুদের টাকা আদায় না হলে সমাধিস্থ করতে দিতনা মৃত দেহ। তাদের মন মগজে এটা বদ্ধমূল ছিল যে, শবদেহের মাথায় আঘাত করে হলেও আমাকে সুদের টাকা আদায় করতেই হবে। ফলে ইয়াতীমের আহাজারী, বিধবার নয়নের অশ্রু, শোকাহত আত্মীয় স্বজনের প্রতিশ্রুতি, কোন কিছুই তাদের পাষণ্ড হৃদয়ে সামান্য রেখাপাত করেনি। দয়ানুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ফলে ভিটে মাটি ছাড়া করতো ইয়াতীম, গরীব, অনাথ ও বিপদ গ্রস্থদেরকে, পিতৃহারা সন্তান, স্বামী হারা স্ত্রী, নিরুপায় হয়ে গৃহহারা হতো প্রায়ই। কতই না করুণ সে দৃশ্য।

অতএব স্পষ্টভাবে একথা বলা যায়, সুদীকারবার যখনই অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছে, তখনই সে অর্থনীতি জুলুম ও শোষণের হাতিয়ারে পরিগণিত হয়েছে।

সুদখোরের পরিণাম

জগত স্রষ্টা যেদিন বিচারকের আসনে সমাসীন হবেন, কিয়ামতের আদালত যেদিন সংঘটিত হবে। সুদখোরের দল সেদিন উম্মাদ অবস্থায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে। যা মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে এভাবে বর্ণনা করেছেন, "সুদখোরেরা শয়তান স্পর্শিত উম্মদ ব্যক্তির ন্যায় হাশরের ময়দানে উপনীত হবে।" প্রশ্ন হয়, কিন্তু কেন? সম্ভবত এর কারণ তারা দুনিয়াতে অর্থ লালসায় এমন বিভোর ছিল যে, কোন দরিদ্র, ইয়াতীম, অনাথের প্রতি সামান্যও তাদের দয়ার উদ্রেক হতো না, লজ্জা-শরম তাদেরকে পশুসূলভ আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারতো না। প্রকৃত পক্ষে জীবদ্দশায়ই তারা অন্সান ছিল।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোরের ভয়াবহ পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ আজ রাতে আমি দেখলাম, দুজন লোক আমার নিকটে আসল। আমাকে এক পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে যেতে লাগল, যেতে যেতে রক্তে পরিপূর্ণ এক নহরের পাড়ে পৌঁছালাম। অতপরঃ দেখতেপেলাম দুজন লোককে। একজন ঐ নহরের পাড়ে দাঁড়ানো, অন্যজন নহরের মাঝে। পাড়ে দাঁড়ানো লোকটির কাছে কিছু পাথর। নহরের

মাঝের লোকটি যখনই পাড়ে আসার ইচ্ছা করে তখনই পাড়ে দাঁড়ানো লোকটি অত্যন্ত স্বজোরে তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। ফলে সে লোকটি পূর্বের স্থানে চলে যায়। আবার আসতে চায়, আবার মারে। এভাবে তাকে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে। দয়াল নবী জিজ্ঞাসা করলেন, লোকটি কে? কেন তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে? উত্তরে বলা হলোঃ সে সুদখোর। তাই তাকে এমন শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

আহা! কতইনা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। কার সাধ্য আছে তা প্রতিহত করার। সেদিন মুক্তি পণ হিসাবে গোটা দুনিয়ার সম্পদ দিলেও গ্রহণ করা হবে না। তা জানিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন, "সেদিন কোন ঘুষ বা মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্বপ্নের ঘটনা অবিশ্বাস করার কোন প্রকার অবকাশ নেই। কারণ নবীগণের স্বপ্ন সত্য ও অহীর অন্তর্ভূক্ত।

সুদের গুনাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লা'নত

সুদ কবীরা গুনাহ। একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি সাতটি কবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে তার জন্য সু-সংবাদ হল জান্নাতের সকল দরজাই তাকে আহবান করবে, সে তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দরজা দিয়েই প্রবেশ করবে। উক্ত হাদীসে সে সাতটি কবীরাহ গুনাহর কথা উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, হত্যা করা, সচ্চরিত্রবান মেয়ের উপর যিনার অপবাদ দেয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং সুদ গ্রহণ করা।

অনেক হাদীসে সুদের গুনাহর পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে সর্বাধিক বড় গুনাহ শিরকের সাথে তুলন করেছেন। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সুদের গুনাহ সত্তর থেকেও বেশী। সুদের গুনাহ আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য। অনেক সাহাবী থেকে মায়ের সাথে যিনা করার সমতুল্য গুনাহ বলেও উল্লেখ আছে। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আবু হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত সুদের গুনাহ সত্তরের চেয়েও বেশী, তার মধ্যে নিম্ন পর্যায়ের গুনাহ হচ্ছে, নিজের মায়ের সাথে যিনা করা।

তাছাড়া দয়ালু নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিসম্পাত করেছেন, লা'নত করেছেন সুদখোরের প্রতি। হযরত ইবনে মাসউদ

(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, লা'নত সুদদাতা, সুদ গ্রহীতা, সাক্ষী ও লেখক সকলের উপরেই।

সুদ দ্বারা সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি

সুদ দ্বারা অবাধ শোষণের দ্বার উন্মুক্ত হয়। মানুষ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবচেতনভাবে অন্সাত সারে শোষিত হয়। শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে দরিদ্রতার জীবন-যাপন করছে অভাবী মানুষগুলো। আর সাধারণ মানুষের হাড় ভাঙ্গা মেহনতের পারিশ্রমিক শোষণ করে নিয়ে' অর্থের বিশাল পাহাড় গড়ে তুলছে। ফলে দেশের সম্পদ গুটি কতক পুঁজিপতির হাতে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সম্পদের স্বাভাবিক আবর্তনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। মানুষও বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে দুশ্রেণীতে- ১. শোষক তথা সমাজ পতি ২. শোষিত তথা সর্বসাধারণ।

সুদী অর্থ ব্যবস্থার ফলেই এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে চরম অলসতার শিকার। কারণ যে ব্যক্তি বিনাশ্রমে সুদের ভিত্তিতে অর্থলগ্নি করে ঘরে বসেই অজস্র অর্থ সম্পদ ও গাড়ী বাড়ীর মালিক হতে পারে, সে ব্যক্তি কোনক্রমেই মেহনত করতে প্রস্তুত হবে না। আর এ কারণেই উল্লেখ যোগ্য মানুষের মেধা ও শ্রম হতে দেশ বঞ্চিত। আর এটা দেশের উন্নয়নের অন্তরায়। তাছাড়া এ সম্পদ যেহেতু শ্রম দিয়ে উপার্জিত নয়, সেজন্য প্রবৃত্তির চাহিদা মেটাতে অন্যায়, অবৈধ পথে, অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না তারা। ফলে সমাজে বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যায় ও পাপাচার।

সমাজে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতা করার মনোবৃত্তি খতম হয়ে যায়। উপরন্তু সম্পদের লালসার মত খারাপ অভ্যাস গড়ে উঠে। ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ সম্পূর্ণ লোপ পায়। মানুষে মানুষে বিদ্বেষ ও শত্রুতার জন্ম নেয়। ফলে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, ব্যক্তি থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র, রাষ্ট্র থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রেই সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। রেহাই পায় না কেউ।

সুদভক্ষণকারী যে সমস্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয়

১. সুদ একটি কবীরা গুনাহ। আর সুদখোরের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এটাই যে, সুদ খাওয়ার কারণে চির অশান্তির আবাসস্থল জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কারণ মহান আল্লাহ নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছেন, সুদখোরদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

২. সুদখোর শুধু জাহান্নামেই প্রবেশ করবেনা বরং জাহান্নামে তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করা হবে।

৩. সুদখোর দয়াল নবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নতের উপযুক্ত।

৪. সুদখোর জাহান্নামে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি পাবে, তার মধ্যে এক প্রকার দেখবে, মায়ের সাথে যিনা করার শাস্তি।

৫. সুদখোর আল্লাহর রহমত ও বরকত হতে বঞ্চিত।

৬. মহান আল্লাহ সুদখোরদের শাস্তি দেয়ার লক্ষে বিষাক্ত সাপ সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো সুদখোরের পেটে অবস্থান করবে এবং সার্বক্ষণিক ভাবে দংশন করতে থাকবে।

৭. সুদের মাধ্যমে গোটা জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হয়। কারণ সুদের দ্বারা দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। ফলে পশু পাখিসহ সকলেই এ মহা বিপদে পতিত হয়।

৮. সুদখোরকে কিয়ামতে রাস্তার পার্শে ফেলে রাখা হবে। কাফিররা তাদের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তাদের শাস্তি দেখবে।

৯. সুদখোর কিয়ামতে শয়তান স্পর্শিত মাতাল ব্যক্তির ন্যায় উপস্থিত হবে।

১০.সুদখোর অল্প দিনেই আঙ্গল ফুলে কলা গাছ হয়ে গেলেও অল্প দিনের মধ্যেই সে সম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

১১. কিয়ামত দিবসে সুদখোরের অঙ্গহানী থাকবে।

১২. সুদখোর দুনিয়াতে সর্বদা বিপদ মুছীবতে দিন কাটাবে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হবে।

১৩. সুদী লেনদেন বেশী হওয়া কিয়ামতের আলামত।

১৪. সুদখোর মহান আল্লাহর সাথে পরোক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত। যা আল্লাহর কালামে এভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"তোমরা যদি সুদকে পরিহার না কর, তাহলে শুনে যাও আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা। আর একথা বর্ণনাতীত যে, যে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়, তার কি পরিণতি হবে। তাই সুদখোরদের শাস্তি হবে অত্যন্ত মারাত্মক।

আজ সুদী কারবার গোটা দুনিয়ায় চলছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। চলছে অর্থোপার্জনের অবাধ প্রতিযোগিতা। সুদের কারণে আজ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছে বিরাট বিপর্যয়। নৈতিক চরিত্রে নেমে এসেছে ধ্বংস। সুতরাং এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সুদ প্রথা বন্ধ না করলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত বাণীর বাস্তবায়ন ঘটতে থাকবে। নেমে আসবে দুর্ভিক্ষ, চলবে মুসলমানদের উপর অসহনীয় নির্যাতন। যা আজ সারা বিশ্বে দেখা যাচ্ছে।

অধুনা বিশ্বে মুসলামানদের মাঝে যেভাবে সুদ প্রবেশ করছে। এভাবে সুদী কারবার বাড়তে থাকলে কোন দিনও মুসলমানদের সাথে শান্তির সাক্ষাত লাভ হবে না। অশান্তির বেড়াজাল হতে পরিত্রাণও পাবে না। তাই আজ মুসলিম বিশ্বে কাংক্ষিত প্রত্যাশিত শান্তি ফিরিয়ে আনতে হলে, মুসলিম বিশ্ব কে সুদ মুক্ত করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

সুদ খোরের ভয়াবহ পরিণতি

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সুখময় স্বাচ্ছন্দময় জীবন যাপনের জন্য যেমনিভাবে উপকরণ দিয়েছেন তেমনিভাবে তা ভোগ করার জন্য দিয়েছেন সুষ্ঠ-সুন্দর ও বৈধ পদ্ধতি। সুতরাং কোন ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা জাতি যদি শুধু উপকরণ গুলোই গ্রহণ করে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বৈধ-অবৈধ বিধানের তোয়াক্কা না করে তাহলে সে ব্যক্তি, রাষ্ট্র বা জাতি কখনই সুখের সন্ধান পাবে না। শান্তি নামক সোনার পরিণতি তার হাতে ধরা দিবেনা। কারণ সুখ-শান্তি দাতা আল্লাহ। আর দাতা যেভাবে যা দিতে চান সে ভাবেই তা গ্রহণ করতে হয়। তাইতো মহান আল্লাহ মানব জাতিকে শান্তির সন্ধান দিতে গিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ "তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর।" ইসলাম পঞ্চ ভিত্তির সাথে সীমাবদ্ধ নয়। তা ঈমান ও আমলের অংশ বিশেষ। এর সাথে লেন-দেন, আচার-আচরণ চরিত্র ইত্যাদিতেও ইসলামের বিধান মানতে হবে।

মহান আল্লাহ সম্পদ উপার্জনের অনেক পন্থাই বাতলে দিয়েছেন। আবার অনেক পন্থাকে চিরতরে নিষিদ্ধও ঘোষণা করেছেন। তাইতো মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল আর সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।" যে পন্থায় আল্লাহ সম্পদ উপার্জনকে বৈধ করেছেন, সেই পন্থায় অর্থোপার্জন করলেই সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে অন্য পন্থায় পাওয়া যাবে না। যার জ্বলন্ত প্রমাণ অধুনা বিশ্বের সুদী কারবার। সাহাবায়ে কেরামের সোনালী যুগে সুদী কারবার ছিল না। ছিল তাদের মাঝে সুখ-শান্তি। যদিও দরিদ্র জন সাধারণ ছিল। কিন্তু তারা ছিল সৎ, পরোপকারী। বর্তমান মুসলিম সমাজে যতই সুদী কারবার বাড়ছে ততই মানুষ অসৎ স্বার্থপর লোভী ও মনুষত্বহীন পশুর ন্যায় হয়ে যাচ্ছে। এ সুদী কারবার যে অঞ্চলে যে রাষ্ট্রে যত বেশী প্রবেশ করেছে, সেখানের মানুষ ততবেশী মনুষত্বহীন হয়েছে। আর সুদখোর থেকে পরোপকার, নিঃস্বার্থ আচরণ ইত্যাদি গুণাবলী বিদায় নিয়েছে। আর সে স্থান দখল করেছে লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা ইত্যাদি পশু সাদৃশ্য আচরণ।

২২তম অধ্যায়

লেখাপড়া

ইলম হাসিল করার উপায়

সহীহ ইলম হাসিল করার পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ-

(ক) শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা উলামায়ে কিরামের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করবেন। যেমন- বেহেশতী জেওর, তা'লীমুদ্দীন, তা'লীমুল ইসলাম, হুকুকুল ইসলাম, হিকায়াতে সাহাবা, এক মিনিটের মাদরাসা, হায়াতুল মুসলিমীন, জাযাউল আ'মাল বা কর্মগুণে সুখ-দুঃখ ইত্যাদি। কোথাও কোন কিছু বুঝে না আসলে চিহ্ন দিয়ে রাখবে এবং কোন বিজ্ঞ আলিমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেবে।

(খ) অর্জিত ইলম- মসজিদ কিংবা মজলিসে কিতাব থেকে পড়ে শুনিয়ে দিবে।

(গ) বাড়ির মহিলা ও শিশুদেরকেও বলে দিবে।

(ঘ) যারা মসজিদে কোন কিছু শুনেছেন তারা সেগুলোকে মুখস্ত করে পরিবারের লোকদেরকে শুনিয়ে দিবে।

(ঙ) যে কোন কাজ করার প্রয়োজন হলে সেটার শরয়ী বিধান জেনে নিবে। পাড়ায় কিংবা আশপাশে কোন আলিম না থাকলে সেক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা লিপিবদ্ধ করে তার শরয়ী বিধান জেনে নিবে। এভাবে অনেক মাসআলা সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যেতে পারে।

২-যারা লেখা-পড়া জানেন না, তারা উপযুক্ত কোন লোক রেখে দিবে, যেন তার মাধ্যমে দ্বীনী কিতাবাদিশুনতে পারে। পানির প্রয়োজনের জন্য যেমন সকল গ্রাম ও বস্তিতে কূপ খনন করা হয়, অনুরূপ দ্বীনী কূপ অর্থাৎ আহলে ইলমের ব্যবস্থাও সর্বত্র করবে। বিস্তারিত দেখুন 'আশরাফুন নিযাম' কিতাবে।

বে-আমলি অর্থাৎ ইলম মোতাবেক আমল না হওয়ার কারণ

আমল না হওয়ার কারণ হল- রূহানী শক্তির দুর্বলতা ও স্বল্পতা। যেমন- কেউ মসজিদের পথ চিনে কিন্তু শারিরীক শক্তি না থাকার কারণে নামাযের জন্য মসজিদে যেতে পারে না, ঠিক অনুরূপ দ্বীনী বিষয়াদী জানা সত্ত্বেও আমল করতে পারে না রূহানী শক্তি না থাকার কারণে।

মেয়েদের দ্বীনী শিক্ষার গুরুত্ব

মানব সমাজের জন্য শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এমনকি জাতির মেরুদন্ডই হচ্ছে শিক্ষা সুতরাং কোন জাতি শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির আশা করতে পারে না। সভ্যতা ও সম্মানের প্রথম ধাপই হলো শিক্ষা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ ওহীর প্রথম বাণীই ছিল–

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

"পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আলাক)

ইসলামের পূর্বে গোটা দুনিয়া ছিল অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীতায় ভরপূর ঃ ইতিহাসে সে যুগকে চরিত্রহীনতার যুগ কিংবা কু-কর্মের যুগ বলে আখ্যায়িত করেছে। কাজেই বুঝা গেল সমস্ত অন্যায় ও চরিত্রহীনতার মূল হচ্ছে মূর্খতা। পক্ষান্তরে ইসলামের মূল নিয়মই হলো শিক্ষা-শিক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে তা দেন নি। সর্বপ্রথম হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে সাথে সাথে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ

"তিনি আদমকে শিক্ষা দিলেন সমস্ত কিছুর নাম, অতঃপর সেগুলো পেশ করলেস ফেরশ্তাদের কাছে"। সূরা বাকারা-১৩। অর্থাৎ আদম (আঃ) ও ফেরেশ্তাদের মধ্যে জ্ঞানের প্রতিযোগিতা হল। প্রতিযোগতিায় হযরত আদম (আঃ) বিজয়ী হলেন। তাঁর মস্তকেই পরানো হল। খিলাফতের মহামুকুট। তারপর আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ "হে আদম!তুমি তোমার সঙ্গিনীসহ জান্নাতে বসবাস কর"। (সূরা বাকারা-৩৫)

এখানে প্রাণিধানযোগ্য যে,প্রথমে হয়েছে তাঁর শিক্ষার ব্যাবস্থা এবং পরেই হয়েছে জান্নাতে থাকার বন্দোবস্ত। এ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহ পাকের কাছে শিক্ষা ব্যতীত মানুষ ও প্রাণীতে কোনই পার্থক্য নেই। হাদীস শরীফে আছে – আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর পিঠের ওপর প্রথমে ডান হাত রাখলে, নেক সন্তানেরা বের হয় এবং পরে বাম হাত রাখলে, সন্তানেরা বরে হয় অতঃপর সকলকে (রূহসমূহকে) যারান নমক উপত্যাকয় একত্র করে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেস ঃ "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই?

উত্তরে সকলেই এক বাক্যে বলেছিল ঃ "হ্যা (নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক) এর দ্বারাও আল্লাহর ইচ্ছা ছিল শিক্ষা দেয়া। অবস্থা এমন যে, সারা দুনিয়াটাই হলো একটা শিক্ষাসয়, আর সমস্ত মানব এর ছাত্র এবং নবীগণ হলেন

বিশেষ ছাত্র। আর আল্লাহ তা'আলা হলেন শিক্ষক। মূলত দুনিয়া সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যই শিক্ষা। অতঃপর ইবাদত এবং সামাজিক আদান প্রদান।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রের জন্য বৃত্তির প্রয়োজন হয়। তার খাবার ও অন্যান্য চাহিদা মেটাতে হয়। এ চাহিদা মেটানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন পানিভাগ ও স্থলভূমি। আর লেখা-পড়ার ব্যাপারে যে আলোর প্রায়াজন হয়, তা মেটানোর জন্য দিলেন চন্দ্র-সূর্য। আমরা যখন এ দুনিয়া থেকে কবর দেশে চলে যাব, তখন এই শিক্ষার আলোকেই আমাদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রশ্ন করা হবে, "তোমার প্রতিপালক কে?" বস্তুত সবচেয়ে বড় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে হাশরের ময়াদানে। তাতে কিছু লোক কামিয়াব হবে আর কিছু লোক হবে ব্যথা। যারা কামিয়াব হবে, তাদেরকে তার পরিণাম ভোগ করতে হবে। এ পরীক্ষা নারী-পুরুষ সকলেরই হবে।

মুসলমান নারী, পুরুষ প্রত্যেকের ওপর ইসলামী জ্ঞানার্জন ফরজ। কারণ পুরুষ কিংবা মহিলা উভয়ের ধর্মীয় সচেতনতা লাভ এবং আখলাক ও চরিত্রগত দিকের উন্নয়ন এবং ছোটদের সাথে স্নেহ-সূলভ ব্যবহার, বড়দের প্রতি আদব-কায়দা আর সম্মানসূচক আচারণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া উভয়ের জন্যই সমানভাবে বাঞ্চনীয় ও একইরূপ কর্তব্য। মানুষের সাথে উত্তম পন্থায় মেলা-মেশা লেন দেন এবং ইসলামী কৃষ্টি-কালচার আয়ত্ত করা উভয়ের জন্যই সমপর্যায়ের জরুরী। কাজেই প্রত্যেকই ব্যক্তির জন্য ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ইসলামে ফরজ করা হয়েছে, চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী।

বরং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেয়েদের বেলায় পুরুষের চাইতে অধিক। কেননা জাতির শিক্ষা একমাত্র মায়েদের ওপরই নির্ভরশীল। মা যদি মূর্খ হয়, তবে তার ভবিষ্যত প্রজন্মও বহুলাংশে মূর্খই থেকে যায়। অবশ্য কারো ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিজের প্রচেষ্টায় কেউ জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতী লাভ করলেও করতে পারে। মা যদি শিক্ষিতা ও আলিম হয় তবে সন্তানও তেমন হবে একথা স্বাভাবিকভাবেই বলা যায়। এজন্যই ইসলামে সন্তান জন্মের সাথে সাথে শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সর্ব প্রথম তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দেয়ার নিয়ম রাখা হয়েছে। যাতে রয়েছে তাওহীদ রিসালাত ও ইবাদাতের শিক্ষা। আযান ও ইকামাতের মধ্যে প্রতিটি মৌলিক বিষয়ের যেমনি শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে তেমনি حى على الفلاح অর্থাৎ কল্যাণের দিকে আস এ আহবানের মাধ্যমে শিক্ষার ফলাফলও জানিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। এ সকল বিষয়াবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে শিক্ষার মর্যদা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

যখন কোন বাচ্চার বয়স সাত বছরে পৌঁছে তখন তাকে ইবাদত সম্পর্কিত শিক্ষা দান করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা মহিলাদের দ্বারাই হওয়া সম্ভব। মা যখন দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতা হবেন, তখন তার সন্তানকেও দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের প্রতি দৃষ্টি রাখতে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সচেষ্ট হবে। যার ফলে বাল্য বয়সেই সন্তানের চরিত্র সুন্দর ও উন্নত হয়ে গড়ে উঠবে। মায়ের দ্বীনদারী, সৎকর্মপরায়ণতা ও উত্তম চরিত্রের বদৌলতে সন্তানও দ্বীনদার হয়ে যাবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মহিলাদের পার্থিব শিক্ষা অর্জন করা ঃ আল্লাহ তা'আলার বিধানে মেয়েদের জন্য জাগতিক বিষয়াবলীতে সাদাসিদা থাকা এবং বেশি চতুর না হওয়া মর্যাদার বিষয়। এর ব্যতিক্রম করা তাদের মান-মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী। কুরআনের আয়াতে এ কথার ইঙ্গিত আছে। (সূরা নূর ঃ আয়াত নং ২৩)

তাছাড়া যে সব ত্রুটির কারণে অধিকাংশ মেয়েলোককে জাহান্নামী বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি ত্রুটি হলো, চালাক-চতুর হয়ে স্বামীকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলা। আর আধুনিক শিক্ষার দ্বারা মেয়েরা খুবই দুরন্ত ও চতুর হয়ে এ ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়। সে হিসেবে মেয়েদের জন্য কুরআনে কারীম ও দ্বীনী ইলম শিক্ষা করার পর দৈনন্দিন জীবনের অতি প্রয়োজনীয় দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করাই যথেষ্ট। এর থেকে বেশি তাদের জন্য শোভনীয় নয় বরং তাদের মর্যদা ক্ষুণ্নকারী। (প্রমাণ ঃ ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত খঃ ১, পৃঃ ৩১৪)

বলা বাহুল্য, যে শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা বলা হয়, তা প্রাপ্তবয়স্কা নারীদের জন্য কোনক্রমেই শোভনীয় নয়, বরং পর্দাবিহীনভাবে শিক্ষাগ্রহণ করা বা সহ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা নাজায়িয ও হারাম এবং এটা ইংরেজরা কৌশলে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য একটি ফাঁদ পেতেছে। ফলে এর দ্বারা সমাজে নানাবিধ সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া মহিলাদের পার্থিব বিদ্যা বেশি শিক্ষা করা কোন জরুরী ও নয়। কারণ পার্থিব বিদ্যা বেশি অর্জনের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জীবিকা নির্বাহ ও উচ্চ মর্যাদা লাভ করা। আর জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব শরীয়তের পক্ষ থেকে পুরুষদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। কাজেই উক্ত কাজের দায়িত্ব মহিলাদের নিজের হাতে তুলে নেয়া বা তুলে দেয়া শরীয়ত পরিপন্থী। এছাড়াও মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার নিম্নরূপ কুফল রয়েছে।

মহিলাদের আধুনিক শিক্ষার কুফল

১। শরীয়াতের দৃষ্টিতে পুরুষ ও মহিলাদের কর্মক্ষেত্র যেহেতু ভিন্ন; সুতরাং, প্রত্যেকের শিক্ষা-দীক্ষা তার কর্মক্ষেত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। কুরআন-সুন্নাহর তা'লীম ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা-দিক্ষা এবং তার সিলেবাস কোনক্রমেই উভয়ের জন্য এক ও অভিন্ন হতে পারে না। ইসলাম উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ নিষেধ

করেনি; কিন্তু তা অবশ্যই এমন হতে হবে, যা তার কর্মজীবনে কাজে আসে। যাতে করে তার পড়াশুনার শ্রম বিফল ও ব্যর্থ না হয়। কেননা, অনর্থক শ্রম শরীয়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং কুরআনের মু'মিনদের একটি বিশেষ গুণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, "তারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে"। (সূরা মুমিনূন ঃ আয়াত ৩)

২। মহিলাদের জন্য দ্বীনী শিক্ষা বাদ দিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া খুবই ক্ষতিকর। কারণ অল্প বয়সে অন্তরে যা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তা আর কোন দিন দূর হয়না এবং তার দ্বারা প্রাাথমিক অবস্থাতেই অনৈসলামিক চিন্তা-চেতনার সৃষ্টি হয়।

৩। বাল্যকালে আধুনিক শিক্ষার প্রতিক্রিয়া তার শিরা-উপশিরায় বসে যাওয়ার কারণে পরবর্তীতে এর পরিবর্তন ঘটানো কঠিন হয়ে যায়।

৪। দ্বীনী পরিবারের মহিলাও যখন আধুনিক পরিবেশে যায় এবং সেখানের মেয়েদেরকে আধুনিক অবস্থায় দেখতে পায়, তখন তারাও ইসলামীক পোষাক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে, বিভিন্ন রকম সাজসজ্জা, বেশভূষা গ্রহণ করা আরম্ভ করে।

৫। লাজুকতা মহিলাদের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গুণ। আর আধুনিক শিক্ষা মহিলাদের এ লজ্জাকে ধুয়ে মুছে শেষ করে দেয়।

৬। পর পুরুষের সঙ্গে মহিলাদের দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশাতো দূরের কথা, কথা বলতে হলেও শক্ত ও নিরস ভাষায় বলার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এসেছে। কিন্তু আফসোসের বিষয়, নব্যশিক্ষিতা মহিলারা পর পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং কোমল কণ্ঠে কথা বলাকে ভদ্রতা মনে করে এবং আকর্ষণীয় করে কথা বলা শিক্ষা করাকে জ্ঞান শিক্ষা বলে মনে করে। অথচ এটাই আধুনিক শিক্ষার বিষয়।

৭। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে- اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ অর্থাৎ পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল (সূরা নিসা,আয়াত -৩৪) কিন্তু আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা শ্লোগান তুলেছে সমান অধিকারের, যা কুরআন-হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এটাও আধুনিক শিক্ষার বিষফল।

৮। আধুনিক শিক্ষা মহিলাদেরকে স্বামীর খেদমত না করা এবং স্বামীর অবাধ্য হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে তোলে।

৯। আধুনিক শিক্ষিতা মহিলারা স্বামীর ঘরে পর্দাতে থাকতে রাজী থাকে না। তারা অফিস-আদালতে চাকুরী করতে চায়। মহিলাদেরকে এসব কাজের

অনুমতি দেয়া হয়নি। ভূগোল শিক্ষা করার দ্বারা মনে বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করার বাসনা সৃষ্টি হয় এবং ঘর থেকে বের হওয়ার পথ সুগম হয়, যা মহিলাদের কাজ নয়। (প্রমাণ ঃ ইসলাহে খাওয়াতীন পৃ- ৪৩১)

১০। ইতিহাস শিক্ষা করার দ্বারা বড় বড় নাস্তিক মহিলার ন্যায় নিজেকে গড়ার মনোভাব পয়দা হয়।

তবে পর্দা ও শরীয়াতের হুকুম পর্দা-পুশিদা ঠিক রেখে পার্থিব বিদ্যাসমূহের মধ্যে প্রয়োজনমাফিক বিদ্যা গ্রহণ করা বৈধ। যেমন-হিসাব-নিকাশের প্রাথমিক বিদ্যা ও কিছু পরিমাণ লেখা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জন করা, হস্তশিল্প ও গৃহস্থালীর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করা মেয়েদের জন্য জায়িয আছে।

তেমনিভাবে পরিবারের পৃ'পোষক কোন পুরুষ লোক না থাকা অবস্থায় নিজের সতিত্ব রক্ষা করে পর্দার ভিতরে থেকে কিছু কামাই রোজগারের জন্য দ্বীনী বা দুনিয়াবী বিদ্যা শিক্ষা করা যেতে পারে। তবে এমন বিদ্যা অর্জন করা যা শিখতে ও প্রয়োগ করতে গেলে পর্দা ভঙ্গ হয় বা নিজের সতিত্বের উপর হুমকি আসে তা বৈধ হবে না।

২৩তম অধ্যায়

চিত্ত বিনোদন

শরীয়তের দৃষ্টিতে চিত্ত বিনোদন ও খেলাধুলা

ইসলামের নাম শুনলেই আমরা কেউ কেউ মনে করি শুধু নামাজ, রোজা, হজ্ব ও তাসবীহ তাহলীলের নামই হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম গ্রহণ করলেই বুঝি সব কিছু ছেড়ে দিতে হয়, আর মসজিদের কোণে বসে থাকতে হবে। এ কারণেই আমরা অনেকেই প্রকৃত ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈধ বিনোদন থেকে বঞ্চিত। আসলে বিষয়টি এমন নয়। ইসলাম হলো একটি সার্বজনীন ও সর্বাঙ্গীণ জীবন ব্যবস্থা। এতে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই; রস-কসহীন শুষ্ক জীবনযাপনের নামও ইসলাম নয়। ইসলাম এমন এক সার্বজনীন জীবনাদর্শ, যাতে মানুষ খুঁজে পায় জীবনের প্রতিটি ধাপের সুখময় কালচার। যার কানায় কানায় বিরাজিত আছে শান্তি আর তরঙ্গের হাতছানি।

চিত্তবিনোদন-খেলাধুলার কথা শুনলেই অনেকে হয়তো মনে করবেন, এসব আবার ধর্মে অনুমোদিত হয় কি করে? নিশ্চয়ই এটা ধর্মের ব্যাপারে অজ্ঞতা আর সংকীর্ণতারই পরিচয়।

মানুষ সামাজিক জীব। স্বভাবগতভাবেই আমরা একে অপরের স্নেহ, ভালোবাসা, দয়া, অনুরাগের মুখাপেক্ষী। শিশু কিশোরদের প্রতি স্নেহ, মায়া-মমতা, বড়দের প্রতি সম্মান, উলামাদের প্রতি শ্রদ্ধা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বৈধ হাসি, কৌতুক, আর আত্মীয়-স্বজন ও পত্নীর সঙ্গে নিষ্পাপ প্রেম বিনোদন নিয়েই সমাজ। আর এসব কিছু নিয়েই ইসলাম। তবে এর অর্থ এই নয় যে, বিকৃত বিনোদন আর পরকালবিমুখ হয়ে শুধু খেলাধুলায় মত্ত থাকবে সবাই। কারণ মুসলমানদের জীবন-মরণ সবইতো আখেরাতভিত্তিক। তাই অমূল্য সময় নষ্ট করে শুধু খেলাধুলায় সময় নষ্ট করার অবকাশ ইসলামে নেই।

আল কুরআনের দৃষ্টিতে ক্রীড়া-কৌতুক

ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীণ জীবন ব্যবস্থা। তাতে মানুষের মন, মেজাজ, চিন্তা, চেতনার প্রতিও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। শুধু তা-ই নয় সিজদায় পড়ে থাকা বা বৈরাগ্যতা অবলম্বন করা নয়; বরং ইসলামে যর্থার্থ অর্থে বৈধ বিনোদন, হাসি, কৌতুক. শারীরিক ও আত্মিক প্রশান্তিদায়ক খেলাধুলারও অনুমতি আছে। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে তা ভালো ও প্রশংসিতও বটে। যাতে অলসতা দূর হয়, চলে যায় অস্বস্তিবোধ, ফিরে আসে আবার নতুন আমেজ, উদ্যম, চেতনা,

ফুর্তি, শক্তি ও সাহস। ক্ষেত্র বিশেষ তা সঠিক উদ্দেশ্য পূরণ ও আদর্শ জীবন গঠনে বিরাট সহায়কও হতে পারে। তবে তা হতে হবে শরীয়ত সমর্থিত উদ্দেশ্যপূর্ণ ও অর্থবোধক। হতে হবে নির্মল নিষ্কলুষ। অনর্থক ও অবৈধ বিনোদন ও খেলাধুলা অবশ্যই বর্জনীয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে অলসতা আর মানসিক অবস্বাদগ্রস্ততা পছন্দনীয় নয়; বরং হাসোজ্জল চিত্ত প্রশান্তি প্রফুল্ল্যতাই কাম্য। এ জন্যই কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- " আল্লাহ তায়ালা চান তোমাদের জন্য সহজ করতে, তিনি তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না; (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য দ্বীনের মধ্যে কোন সংকীণতা কঠিনতা রাখেননি।"(সূরা হজ্জ-৭৮)

উক্ত আয়াতদ্বয়ে একথার প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে যে, নেক কাজে শক্তি ও স্পৃহা যোগাতে বৈধ ক্রীড়া-কৌতুকের অবকাশ ইসলামে রয়েছে।

হাদীসের দৃষ্টিতে চিত্তবিনোদোন ও খেলাধুলা আগুন থেকে বাঁচানোর অসাধারণ দরদ ও ফিকিরের সাথে সাথে তিনি দুনিয়ার সামান্য ও তুচ্ছ ক্ষতিকারক জিনিস থেকেও উম্মতকে হুঁশিয়ার করেছেন। তাইতো তিনি ইরশাদ করেন- "তোমরা হাতের আঙ্গুলের মাঝে কোন কিছু রেখে তা ছুরি দিয়ে কেটো না। কেননা হয়তো বা এতে হাত কেটে যাবে।"

তদ্রপ মানসিক প্রশান্তি, শারিরিক সুস্থতা ও শরীর চর্চার প্রতিও তিনি উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে 'এক সময় ঈদের দিন কয়েকজন হাবশী বালক ঢাল এবং বর্ষা নিয়ে খেলাা করছিল। এমন সময় তারা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে মনে সংকোচবোধ করল। তখন নবী কারীম স. তাদের লক্ষ্য করে বললেন- 'হাবশী শিশুরা! তোমরা খেলতে থাক। যাতে ইহুদী এবং খৃষ্টান সম্প্রদায় অনুধাবন করতে পারে যে আমাদের ধর্মে প্রস্ততা রয়েছে।' কোন কোন রেওয়াতে আছে প্রিয় নবী স. হাবশী শিশুদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন- "তোমরা খেলাধুলা কর, কারণ তোমাদের দ্বীনে কঠোরতা প্রকাশ পাক, সেটা আমি পছন্দ করি না"।

একবার ঈদের দিন কিছুসংখক কিশোরী খেলাধুলা করছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তখন তাদেরকে বাঁধা দিতে মনস্থ করলেন। এটা দেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেলেন- "হে আবু বকর! ওদের ছেড়ে দাও। আজ ঈদের দিন। যাতে ইহুদীরা অনুধাবন করতে পারে যে, আমাদের দ্বীনে প্রশস্ততা আছে। কারণ আমদেরকে এমন শরীয়ত দেয়া হয়েছে যেটি চরম ও শিথিল পন্থা হতে মুক্ত এবং সহজে পালনীয়।"

(কানযূল উম্মাল ১৪ খণ্ড/ ২১৪ পৃঃ) অন্য এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "মন এমনিভাবে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমনিভাবে অবসন্ন হয়ে পড়ে দেহ। অতএব এর জন্য হিকমতের পথসমূহ অন্বেষণ কর।" (আহকামূল কুরআন মুফতী শফী ৩য় খণ্ড/ ১৯৫ পৃঃ)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলে–" কখনো কখনো মনকে আনন্দ দান কর (চিত্ত বিনোদন কর)"। (আহকামূল কুরআন)

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজের কোন সাহাবাকে পেরেশান দেখতেন তখন কৌতুক-রসিকতা করে তার মনে আনন্দ দান করতেন। (মিরকাত ১/২১৮)

এক সাহাবী বর্ণনা করেন একবার আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। ঐ মুহূর্তে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে তাশরীফ আনলেন। মাথা মোবারকে তার পানির চিহ্ন। আমরা আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! আজকে আমরা আপনাকে খুব আনন্দিত দেখছি এর কারণ কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনে– হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বললেন, অতঃপর লোকেরা ধন ঐশ্বর্য সম্পর্কে আলোচনা করল। (যে ধারনা-সম্পদশালী হওয়া ভালো না খারাপ? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে তাদের জন্য বিত্তশলী হওয়া নিন্দনীয় নয়। বরং মুত্তাকীগণ বিত্তবান হওয়া প্রশংসনীয়। আর আনন্দ উপভোগতো আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম নেয়ামত।

(খেলকুদ আওর তাফবীহ কি শরঈ হাইসিয়াত পৃঃ১৮)

অন্য রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়ারা (রাঃ) বলেন- " রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন অপেক্ষা উত্তম এবং আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। উপকারী বস্তুর আশা রেখো। মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করো। অক্ষম হয়ো না।

(মুসনাদে আহমাদ মিরকাত ১০/ ৪১)

অন্য হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ স. অলসতা অক্ষমতা থেকে পানাহ চেয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতেন।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, আনন্দ ফূর্তি হাসী-খুশি, রস-রসিকতা, বিনোদন ইসলামে একেবারে বর্জনীয় নয়; বরং ক্ষেত্র বিশেষ পছন্দনীয়ও বটে। আর মনমরা, বিষন্নতা, অলসতা অবসাদ শরীয়তে অশ্যই নিন্দনীয় বিষয়। সুতরাং বৈধ কাজে স্পৃহা যোগাতে খেলাধুলা ও বিনোদনের নিষ্পাপ চর্চা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো ও পছন্দনীয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রিয়খেলা

বৈধ ও অর্থবোধক সকল প্রয়োজনীয় খেলারই অনুমতি ইসলামে রয়েছে। তারপরও শরীয়ত কোন কোন খেলার প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "এমন কোন খেলা নেই যাতে রহমতের ফেরেস্তা উপস্থিত হন না, শুধামাত্র তিনটি খেলা ব্যতীত।

১. স্বামী-স্ত্রীর সাথে (হাস্য-রসের খেলা)।

২. ঘোড়া দৌড় বা রেসকোর্স।

৩. তীরন্দাজী বা তীল মারার প্রশিক্ষণ। (কানযুল উম্মাল ১৪ খণ্ড৪১৪ পৃঃ)

এছাড়াও অন্য সনদে এরূপ বর্ণিত আছেঃ "মানুষ যেসব খেলাধুলা করে সবগুলোই বাতিল। কিন্তু তিনটি খেলা বাতিল নয়।

১। তীর ছোঁড়া (খেলা)।

২। ঘোড়া প্রশিক্ষণের (খেলা)।

৩। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হাসি-কৌতুকের (খেলা)। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ঃ ৩৩৬)

অন্য রেওয়ায়েতে চারটি খেলার কথা উল্লেখ রয়েছে- "আল্লাহ্‌র যিকিরের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন সব কিছুই ক্রীড়-কৌতুক। চারটি জিনিস ব্যতিত।

১। নিজ স্ত্রীর সাথে হাস্যরসের খেলা করা।

২। ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান করা।

৩। দুটি লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে নিশানা নির্ণয়ের লক্ষ্যে চলা।

৪। সাঁতার শিখা বা শিখানো। (কানযুল উম্মাল জামিউস সগীর ঃ ১৫/২২১

তীর বর্ষার খেলা

জিহাদের প্রস্তুতি ও মনের সজীবতা ফিরিয়ে আনতে তীর-বর্শার মাধ্যমে লক্ষ্যবস্তু নির্ণয় হল একটি প্রিয় খেলা। যা শিখলে শরীরে ফূর্তি আসে। মন হয় চাঙ্গা, আর দৃষ্টি হয় সতেজ। কাফেরদের বিরুদ্ধে অর্জিত হয় বিরাট শক্তি। তাইতো মহান রাব্বুল আলামীন ঘোষণা দিয়েছেন- " তোমরা প্রস্তুত কর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য। যা কিছু সংগ্রহ করতে পার, নিজের শক্তি-সামর্থের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। (সূরা আনফাল- ৬০)

এছাড়াও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "আল্লাহ তায়ালা তীর এর বদৌলতে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১। তীর প্রস্তুতকারী যে তীর তৈরীতে সাওয়াবের নিয়ত করে।

২। তীর নিক্ষেপকারী।

৩। তীর যে অপরের হাতে তুলে দেয়।

"হে লোক সকল! তোমরা তীরান্দাজী শিখো এবং বাহন চালানোর প্রশিক্ষণ নাও। অবশ্য বাহন চালানো অপেক্ষা আমার নিকট অধিক প্রিয় হল তোমাদের তীরন্দাজী শিখা। যে তীরন্দাজী শিখে তা পরিহার করল সে আল্লাহর না-শুকরী করল।" (সুনানে দারেমী মিশকাত ঃ ৩৩)

এছাড়াও যানবাহন চালনার প্রশিক্ষণ এবং সাঁতার প্রশিক্ষণ শরীয়তের দৃষ্টিতে একটি পছন্দনীয় খেলা। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,-মুমিনদের উত্তম খেলা হচ্ছে সাতার কাটা।

(কানযুল উম্মাল-১৫/২১১ ফয়যুল কাদীর-৪৮৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা অনাড়ম্বর মুজাহিদদের ন্যায় জীবনযাপন করতেন। সর্বদা জিহাদী শক্তিকে টিকিয়ে রাখতে তৎপর থাকতেন। আর যেহেতু সাঁতার দ্বারা শরীরের উৎকৃষ্ট ব্যায়াম হয়, তাই এক সময় একটি পুকুরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) সাঁতার কাটছিলেন। তিনি প্রত্যেক সাঁতারুর সাথী তৈরী করে দিলেন, যাতে প্রত্যেকে সাঁতার কেটে তার সাথীর নিকট পৌঁছেতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর (রাঃ) কে নিজের সাথী নির্ধরণ করলেন। তিনি সাঁতার কেটে তার সাথীর নিকট পৌঁছতে পারে। তিনি সাঁতার কেটে আবু বকর (রাঃ) এর নিকট পৌঁছে তার গলা জড়িয়ে ধরলেন। (মেশকাত শরীফ)

সাহাবাদের যুগে খেলাধুলা

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করা হল যে আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ কি হাসতেন ? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তাদের অন্তরে ঈমান ছিলো পাহাড়ের চেয়েও বিশাল। ইবনে সাদ (রাঃ) বলেন আমি সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি তারা লক্ষ্যবস্তুর মাঝে দৌড়াতেন। একজন অপরজনের সাথে কৌতুক করতেন। হাসাহাসি করতেন। তবে রাত এলে হয়ে যেতেন দুনিয়া ত্যাগী (আবেদ)।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন- একবার হযরত ফারুকে আযম (রাঃ) ও যুবাইর (রাঃ) অগ্রগামী হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, কাবার রবের শপথ! আমি বিজয়ী হয়েছি। পুনরায় কিছুদিন পর তাদের উভয়ের মাঝে প্রতিযোগিতা হল। আবার হযরত উমর (রাঃ) অগ্রগামী হয়ে ঐ কথাটাই বললেন, কাবার রবের শপথ! আমি বিজয়ী হয়েছি। (কানযুল উম্মাল ১৫/২২৪)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বললেন আল্লাহর কসম! আমি হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেখেছি তিনি আমার হুজরায় এসে দাঁড়ালেন। তখন কিছুসংখ্যক হাবশী মসজিদের বাহিরের আঙ্গিনায়) নেযা বা তীর দিয়ে খেলা করছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কান এবং স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখান থেকে হাবশীদের খেলা উপভোগ করছিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কারণে দাঁড়িয়ে থাকলেন, এতে দীর্ঘ সময় যে আমি নিজেই প্রত্যাবর্তন করলাম। এবার নিজেরাই একটু ভেবে দেখুন, খেলাধুলার প্রতি আসক্ত একজন স্বল্পরয়স্কা মেয়ে কত দীর্ঘ সময়ই না খেলা দেখতে থাকবে। বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮০/মুসনাদে আহমদ ১/৮৪) এছাড়ও আমাদের আকাবিরদের মধ্যেও জিহাদের স্পৃহা ও শারীরিক চর্চামূলক খেলাধুলার আমল পাওয়া যায়। যেমন হযরত শাহ ইসমাইল শহীদ (রঃ) যিনি প্রচণ্ড শীতের সকালে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটতেন। আর তীব্র গরমের সময় মসজিদের খোলা চত্বরে খালি পায়ে পায়চারী করতেন। অথচ ঐ সময় পানি আর চট দিয়েও সেই চত্বরে হাঁটা অসম্ভব হত।

সুতরাং কুরআন-হাদীস, সাহাবাদের (রাঃ) আমল ও ইজমা কিয়সের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণিত হল যে শরীয়তের দৃষ্টিতে খেলাধুলা আর চিত্ত বিনোদন একটি পছন্দনীয় কাজ।

ইসলামের দৃষ্টিতে বিনোদন

আমরা সাধারণ চিত্ত বিনোদন বলতে এমন কৌতুক রসিকতা বা অনুষ্ঠানকে বুঝি যা দ্বারা হৃদয় জুড়িয়ে যায়। আত্মায় প্রশান্তি আসে। ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা একটি নন্দিত কাজ। তবে শর্ত হলো, কৌতুক ম্যাজীক বা অনুষ্ঠান শরীয়ত বিবর্জিত হতে পারবে না। কাউকে কষ্ট বা আঘাতের জন্য হতে পারবে না। কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করা বা অনর্থক হতে পারবে না। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর সন্তানকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন-'হে ছোট ছেলে তোমার পাখিটি কি হল? আসলে তার পাখিটি হঠাৎ মারা গিয়েছিল যা নিয়ে সে খেলা করত। এ কথা শুনে সে হেসে দিল। তাছাড়াও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কৌতুকমূলক অনেক বর্ণনাই পাওয়া যায়, যা দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পেরেশান হৃদয়কে উৎফুল্ল করেছেন।

আজকের চিত্ত বিনোদন ও খেলাধুলা

আজ সমাজে খেলাধুলা ও বিনোদনের নামে যা চলছে, তার অধিকাংশই বরং বলা চলে পুরোটাই ইসলাম বিবর্জিত, শরীয়ত গর্হিত কাজে ভরপুর। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে ইসলামের মৌলিক বিষয় কি? আর আনুসংগিক বিষয় কি? আনুষাংগিক বা প্রাসঙ্গিক বিষয়কে লক্ষ্যবস্তু বানানো। এটাতো একটা চরম বোকামী ও নির্বোধের কাজ। খাবার খেতে বসে শুধু টক, ঝাল, মিষ্টি, সালাদ খেয়ে চলে আসলাম। আর পোলাও বিরানী মুখেও দিলাম না। এটা যেমন নিরেট অজ্ঞতা ও বোকামী তার চেয়েও অধিক হল নিজের অমূল্য সম্পদ সময়কে অহেতুক খেলাধুলা আর নির্থরক বিনোদনের পিছনে বিনষ্ট করে দেয়া। আর মানুষের যে প্রধান লক্ষ্যবস্তু আখেরাত বা পরকাল তার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা। ইসলামের মূল বিষয় হল পাঁচটি। ১। ঈমান দুরস্ত করা, ২। ইবাদত সুন্নত তরীকায় করা ৩। মুয়ামালাত বা রুজি রোজগার হালাল করা ৪। মুআশারাত তথা বান্দার হক আদায় করা ৫। আখলাক বা নিজ অন্তরের পরিশুদ্ধি সাধন করা। এছাড়া সকল বিষয় হল আনুষংগিক। যা কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু বা মূল বিষয় অর্জনে সহায়ক হয়।

খেলাধুলার মৌলিক বিধান

খেলাধুলা ও বিনোদন বৈধ হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে।

১। কুরআন-হাদীসে যেসব খেলা নিষেধ করা হয়েছে তা হতে পারবে না। যেমন ঃ দাবা কবুতর বাজী ইত্যাদি।

২। যে সকল খেলায় হারাম বা গুনাহের সংমিশ্রণ রয়েছে বা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তা হতে পারবে না। যেমন-সতর খোলা, নারী-পুরুষের অবাধ মিলন, জুয়া-বাদ্য, বাজনা, নাচ, গান, বিজাতীয় অনুকরণমূলক খেলাধুলা।

৩। যে খেলাধুলা ফরজ ওয়াজিব থেকে উদাসীন করে দেয়। নামাজ আদায়ে প্রতিবন্ধক হয়। (বুখারী শরীফ-ফতহুল বারী-১১/৯১)

৪। যে সব খেলা অর্থহীন উদ্দেশ্যবিহীন শুধু সময় কাটানোর জন্য খেলা হয়, শরীরের চর্চার জন্য নয় এ জাতীয় খেলাধুলা হতে পারবে না। কারণ কুরআন-হাদীসে নিরর্থক কাজের প্রতি অনীহা প্রকাশ করা হয়েছে।

৫। পক্ষ-বিপক্ষ হার-জিতের শর্ত না থাকতে হবে। হাদীসে আছে- "কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো তার নিরর্থক কাজকে ছেড়ে দেয়া।

এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যে সব খেলায় ইহকালীন বা পরকালীন উল্লেখযোগ্য কোন ফায়দা উদ্দেশ্য হয় সেগুলো জায়েয। তবে এক্ষেত্রে তা অবশ্য উপরের ৫টি শর্তানুসারে হতে হবে।

যেসব খেলাধুলায় পার্থিব বা পরকালীন কোন ফায়দা লক্ষ্য থাকে। কিন্তু তাতে শরীয়ত বিরোধী কাজের সংমিশ্রণ হয়, তাহলে তাও নাজায়েয। যেমন- জুয়া, বেপর্দেগী, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা ইত্যাদি। (ফাতওয়ায়ে শামী ৬/৪০৪)

সুতরাং, উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে আজকের সমাজে খেলাধুলা আর বিনোদনের নামে নাম যা চলছে, জন্ম দিবস, ভ্যালেন্টাইন উৎসব, পহেলা বৈশাখ, ইংরেজী নববর্ষ, টেলিভিশন, ভিসিআর, ডিস এন্টিনা, সিনেমা, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, পতিতাবৃত্তি, বিউটি পার্লার, সুন্দরী প্রতিযোগিতা মদপান, নেশাখোরসহ সকল ধরনের অপসংস্কৃতি বিনোদন খেলাধুলা নষ্টামী আর যৌনাচারের সমাচার। হারাম কাজে ভরপুর। এতে উপরে বর্ণিত ৫টি শর্ত পুরাপুরি পাওয়া যায় না। তাই এসবই হারাম ও নাজায়েয। এগুলোর সামান্য উপকারের থেকে বহুগুণ ক্ষতির দিক রয়েছে। তাই শরীয়ত এমন খেলার অনুমতি দিবে না।

বর্তমানে খেলার অপকারিতা

১। বর্তমানে খেলাধুলাকে মূল বিষয়বস্তু মনে করা হয়। অথচ তা মৌলিক বা মুখ্য কোন বিষয় নয়।

২। এসব খেলাধুলার খেলোয়াড় এবং ক্রীড়ামোদীদের মধ্যে অত্যাধিক লিপ্ততা ও গভীর মোনানিবেশতা লক্ষ্য করা যায়। যা জরুরী কাজ ও বান্দার হক আদায় প্রতিবন্ধক হয়।

৩। বর্তমানে খেলোয়াড়দের যেভাবে জাতীয় হিরো হিসেবে উপস্থাপন করা হয় তাতে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের শিশু-কিশোররা মুজাহিদ, উলামা, বিজ্ঞান, দার্শনিক ও জাতির সেবকদেরকে নিজের আদর্শ বানানোর পরিবর্তে খেলোয়াড়দেরকে আদর্শ বানাবে।

৪। এসব ক্রীড়ায় সাধারণত ফরজ নামাজের সময়,জুমআর দিন, রমযানের রোজার সময়, রমযানের রোজার প্রতি কোন খেয়াল করা হয় না। অথচ এগুলো ফরজে আইন।

৫। বর্তমানে খেলা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, শাসকবর্গ আর কালো টাকার মালিকদের দ্বারাই তা উপভোগ সম্ভব। যা মানুষকে দুনিয়ার মোহের দিকে ধাবিত করেছে।

৬। বর্তমানে খেলাধুলায় অফুরন্ত সময়ের অপচয় হয়। অথচ এ সময়ই হল মানুষের আখেরাতের সাফল্য অর্জনের চাবিকাঠি।

৭। অধিকাংশ ক্রীড়ায় নারী-পুরুষ-যুবক যুবতীদের অবাধ মেলামেশা হয়ে থাকে। নারীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে অপসংস্কৃতির বিভীষিকা সমাজকে প্রতিনিয়ত গ্রাস করছে।

৮। অধিকাংশ খেলায় সতরের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। পুরুষরা জাঙ্গিয়া পরে আর মেয়েরা অর্ধনগ্ন বা প্রায় নগ্ন হয়ে খেলায় অংশগ্রহণ করছে।

৯। খেলাধুলায় যে আসল উদ্দেশ্য ছিলো বিনোদন, তা চুরমার হয়ে স্টেডিয়াম আজ রণাঙ্গনে পরিণত হচ্ছে। শুধু তা-ই নয় খেলাধুলায়া হারজিত আজ জাতীয় জয়-পরাজয়ের বিষয় হয়ে গেছে। এজন্য দোয়া করা হয়, মান্নত মানা হয়। রাষ্ট্র প্রধান থেকে নিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত জয়-পরাজয়ের আনন্দে বা শোকে বার্তা পাঠান। মার্কেটে টেলিভিশনের জয় জয়কার শুরু হয়। সপ্তাহ এমনকি মাসের পর মাস রাতের ঘুম হারমে হয়ে যায় নিশিতে র‍্যলী বের হয়। গভীর রাতে মাঝে মাঝে উল্লাস আর শ্লোগানের বিকট আওয়াজ ভেসে আসে। অনেকে মনে করে খেলাধুলার জন্য মনে হয় টিভি দেখা জায়েয।

১০। বিভিন্ন রাষ্ট্রে খেলার উপর হারজিতের বাজি ধরে তাতে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় করা হয়।

১১। সবচেয়ে বড় অপকারিতা হল,-মুসলমান আজ জিহাদবিমুখ হয়ে যাচ্ছে, যা বিজয়ের সোপান। কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গ আর চিত্ত বিনোদনের কারণে

১২। খেলাধুলার জয়-পরাজয় উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি, সংঘর্ষ ও ভাংচুর ও হয়, লক্ষ্য করুন আজ খেলা কি রণাঙ্গন হয়নি? তাই মুসলমানের করুণ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে তওবা করে নতুন উদ্দমে ইসলামের রঙ্গে রঙ্গিন হওয়া উচিত।

উপসংহার ঃ শরীয়ত সমর্থিক খেলাধুলা ও চিত্ত বিনোদনের অবকাশ ইসলামে হয়েছে; বরং তা স্থান-কাল- ভেদে উত্তম ও প্রশংসনীয়। কিন্তু খেলাধুলা জীবনের মূল লক্ষ্য নয়। মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আখিরাত। খেলাধুলা প্রাসঙ্গিক বিষয়। খেলার জন্য জীবন নয়; বরং জীবনের সুস্থতার জন্য খেলা। তাই বলে খেলাধুলা না করলে তেমন ক্ষতিও হবে তা নয়।

আজ খেলার নামে গোটা বিশ্ব একই সময়ে বড় ভয়াবহ গজবের দিকে ধাবিত হচ্ছে। অনর্থক খেলা টিভি ডিস বর্জন করে আসতে হবে ইসলামের প্রকৃত সুশীতল ছায়ায়, তাহলেই আসবে শান্তি। দূর হবে অশান্তি বিশ্ব পাবে সঠিক পথের সন্ধান। পাবে স্বাচ্ছন্দ জীবন। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন।

২৪তম অধ্যায়

তাযকিয়ার গুরুত্ব

শরীয়তের অন্যান্য আহকাম যথাঃ নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। (নেসাবপরিমাণ মালের মালিকানা থাকার শর্তে) যেমন প্রত্যেক আকেল বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন তথা অবশ্য পালনীয়, তদ্রপ অন্তরের দশটি রোগ অর্থাৎ (১) লোভ, (২) অহেতুক কথা বলার আগ্রহ, (৩) অযথা ক্রোধ, (৪) হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা, (৫) কৃপণতা, (৬) পদের মোহ তথা বড়ত্ব কামনা, (৭) দুনিয়ার মোহ, (৮) তাকাব্বুর বা অহংকার, (৯) খোদপসন্দী তথা আত্মশ্লাঘা, (১০) রিয়া তথা প্রদর্শনী ও লৌকিকতা, এর চিকিৎসা করানোর মাধ্যমে সমস্ত জাহেরী গুনাহ তরক করা এবং অন্তরের দশটি ভাল গুণ তথা (১) তাওবা, (২) খোদাভীতি, (৩) যুহদ বা দুনিয়ার প্রতি অনিহা (৪) সবর বা ধৈর্যশীলতা, (৫) শুকর বা কৃতজ্ঞতা, (৬) এখলাস তথা নেক কাজে খালেস নিয়ত বা একনিষ্ঠতা, (৭) তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা, (৮) মহব্বত বা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা, (৯) তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি, (১০) মৃত্যু চিন্তা অর্জন করা এবং সর্বক্ষণ আল্লাহর ধ্যান ও স্মরণ রাখার সিফাত হাসিল করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর এরই নাম হচ্ছে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি। এ আত্মশুদ্ধি এমনই এক ফরয দায়িত্ব যে, আল্লাহ তাআলা এর গুরুত্ব বোঝাতে কুরআনে পাকের সূরা আশ-শামসে ১১ বার কসম খেয়ে এই আত্মশুদ্ধর কথা উল্লেখ করেছেন। যেই কসম অন্য কোন বিষয় বর্ণনার ক্ষেত্রে এতবার খাওয়া কুরআনে অন্য কোথাও নেই। তামাম আম্বিয়ায়ে কেরামে প্রধানতঃ যে চারটি দায়িত্ব ছিল তন্মধ্যে অন্যতম একটি হল আত্মার পরিশুদ্ধি।

আর কুরআনে অনেক আয়াত, রাসূলুল্লাহ সালুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অগণিত বাণী ও আমল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীনসহ সকল যুগের আউলিয়ায়ে কিরামের আমল ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দ্বারা একথা স্বীকৃত যে, আত্মশুদ্ধি তথা আত্মার রোগের চিকিৎসার জন্য এমন কোন শাইখের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা জরুরী যিনি অন্য শাইখের সোহবতে থেকে নিজের আত্মার পরিশুদ্ধি করেছেন। এক্ষেত্রে উত্তম হল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাইখের দ্বারস্থ না হয়ে এমন কোন একজনকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া, যার সাথে মনের

অধিকতর মিল আছে এবং যার প্রতি মনের আকর্ষণ বেশি যদিও তিনি তত প্রসিদ্ধ বা খ্যতিসম্পন্ন না হয়।

উল্লেখ্য, আত্মশুদ্ধির জন্য কারো সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখা জরুরী বটে যাকে বাইআতে হাকীকী বলে। তবে কোন শাইখের হাতে হাত দিয়ে বাইআত হওয়া বা তার মুরীদ হওয়া যাকে যাহেরী বাইআত বলে এটা জরুরী নয়; বরং এটা মুস্তাহাব ও বরকতের কাজ।

(প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ১১৯, আনআম- ১২০, বাক্বারা- ১২৯, সূরা আশ-শামস-৭-৯, ফাতাওয়ায়ে শামী-১/৪৩, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৩৯, মাহমূদিয়া-১৫/৮৮)

হক ও বাতিল পীরের পরিচয়

এদেশের মানুষ সাধারণত ঃ ধর্মপরায়ণ। তাদের এ ধর্মপরায়ণতার সুযোগ নিয়ে সমাজে বেশ কিছু ব্যবসায়ী পীরের আবির্ভাব ঘটেছে- যাদের ভিতর হক্কানী পীর (যারা আল্লাহর রাস্তার সঠিক পথ প্রদর্শক)-এর দশটি আলামত কোন একটিও পাওয়া যায় না। হক্কানী পীরের দশটি আলামত এই ঃ

১। পীর সাহেব তাফসীর, হাদীস, ফিক্হ ও ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিম হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃপক্ষে মিশকাত শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়েছেন পরিমাণ ইলম থাকা জরুরী।

২। পীরের আক্বীদা এবং আমল শরীয়াতের মুয়াফিক হওয়া অপরিহার্য। তাঁর স্বভাব-চরিত্র অন্যান্য গুণাবলী ওয রকম শরীয়াত চায়, সে রকম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৩। পীরের মধ্যে লোভ (টাকা-পয়সা, সম্মান-প্রতিপত্তি, যশ ও সুখ্যাতির, দুনিয়ার মুহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত।

৪। তিনি কোন কামিল পীরের খিদমতে থেকে ইসলাহে বাতিন (অন্তঃকরণে পরিশুদ্ধতা) এবং তরীকাত অর্জন করেছেন এমন হতে হবে।

৫। সমসাময়িক পরহেযগার-মুত্তাকী আলেমগণ এবং সুন্নাত তরীকার ওলীগণ তাঁকে ভাল বলে মনে করেন- এমন হতে হবে।

৬। দুনিয়াদার অপেক্ষা দ্বীনদার লোকেরাই তাঁর প্রতি বেশি ভক্তি রাখে- এমন হওয়া আবশ্যক।

৭। তাঁর মুরীদের মধ্যে অধিকাংশ এ রকম হতে হবে যে, তারা প্রাণপণে শরীয়াতের পাবন্দী করেন এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ-লালসা রাখেন না।

৮। তিনি এমন হবেন যে, মনোযোগের সাথে মুরীদের তা'লিম-তালকীন করেন এবং অন্তর দিয়ে এটা চান যে, তারা ভাল হোক। আল্লাহ এবং আল্লাহর

রাসূলের পায়রবী করেন। তিনি মুরীদদেরকে তাদের মতলব মত স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারেন না। তাদের মধ্যে যদি কোন দোষ দেখতে বা শুনতে পান, তবে তা যথারীতি (কাউকে নরমে কাউকে গরমে) সংশোধন করেন।

৯। তাঁর সুহবতে কিছু দিন থাকলে দুনিয়ার মুহব্বত কমে যায় এবং আখেরাতের চিন্তা-ফিকির বাড়তে থাকে।

১০। তিনি নিজেও রীতিমত যিকির শোগল করেন। অন্ততপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা রাখেন। (কেননা, নিজে আমল না করলে, অন্ততপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা না থাকলে, তা'লীম-তালকীনে বরকত হয় ন। (প্রমাণ ঃ কসদুল সাবীল, পৃঃ ৯)

সমাজের যে সকল পীর সাহেবের মধ্যে এ আলামতগুলো পাওয়া যাবে, তারাই হক্কানী পীর। যাদের মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে না; এরপরও পীর নাম ধারণ করে বসবে, তারা বাতিল, ভণ্ড ও ব্যবসায়ী। বর্তমানে তাদের দ্বারা মুসলমানদের অবশিষ্ট ঈমানটুকুও বরবাদ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

২৫তম অধ্যায়

মৃত্যু

মালাকুল মওত (মৃত্যু ও মৃত্যু-দুত) সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস হতে এখানে সংকলিত চল্লিশ হাদিস।

১। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা স্বাদ-আস্বাদন বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করো (তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান)। তাবরানীতে আছে ঃ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বিলিনকারী মৃত্যুকে ভুলে থেকো না। অন্য বর্ণনায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, যে ব্যক্তি দিনরাতে বিশবার মৃত্যুকে স্মরণ করবে শহীদের সাথে তার হাশর হবে। (তাবরানী)

২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মারা যায় এবং তার জানাযায় এমন চল্লিশ জন উপস্তিত থাকে যারা কোন শিরিক করে নি, আল্লাহ ওই ব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ (দোয়া) অবশ্যই কবুল করেন

(মুসলিম)

৩। হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের মুমূর্ষ ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকিন দাও।

(মুসলিম,আহমদ, অবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী)।

৪। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের একটি দল একটি জানাযার কাছ দিয়ে গেলেন। তারা মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেল ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। তারা (অন্য একটি) মৃত ব্যক্তির দুর্ণাম করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওয়াজিব হয়ে গেছে। ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, "কি ওয়াজিব হয়ে গেছে"? তিনি জবাব দিলেন ঃ যেমৃত্তে তোমরা প্রশংসা করলে তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। তোমরা হচ্ছো পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী

(বোখারী,মুসলিম)।

৫। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয় কলবসমুহে মরিচা পড়ে যেমন লোহাতে পানি

লাগলে মরিচা পড়ে। তখন লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটা পরিস্কার করার উপায় কি? তিনি বললেন, মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা এবং কোরান তোলাওয়াত করা (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান, মিশকাত)

৬। হযরত আবদুল ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যু মুসলিম ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি উপহার বিশেষ। (বায়হাকী, মুসতাদরাক) অন্য হাদিসে রয়েছে ঃ মৃত্যু মু'মিনের জন্য 'রায়হান' বা সুগন্ধি স্বরূপ।(মু'মিন মৃত্যুর পরেই তার আমলের অচিন্তনীয় প্রতিফল পাবে)।

৭। হযরত আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা মৃত্যুর কথা বেশিবেশিস্মরণ করবে। এর দ্বারা পাপ থেকে বিরত থাকা যায়। যদি সচ্ছলতার মধ্যে মৃত্যুর কথা স্মরণ কর সীমালংঘন থেকে বাঁচতে পারবে। যদি দারিদ্রের মধ্যে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে পারো তবে তুষ্টচিত্ততা অর্জন করতে পারবে (ইবনে আবিদ দুনিয়া)।

৮। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন মু'মিন বান্দার রূহ বের হয়, এর সাথে দু'জন ফেরেশতা সাক্ষাত করে এবং রূহ নিয়ে উভয়েই ঊর্ধ্বে আরোহন করে।

৯। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, তোমরা অসহনীয় অবস্থায় পতিত হয়ে মৃত্যু কামনা করো না। তবে বিপদাপদ বা অসহনীয় অবস্থায় বড়জোর এতোটুকু প্রার্থনা করতে পারো যে, "হে আল্লাহ, আমাকে ততোদিন বাঁচিয়ে রাখো, যতোদিন আমি সুন্দরভাবে চলতে পারি। আর তখনই আমাকে মৃত্যু দান করো, যখন তোমার বিবেচনায় জীবনের চেয়ে মৃত্যুই আমার জন্য শ্রেয় মনে করো। (বোখারী, মুসলিম)

১০। হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমানদার বান্দা যখন দুনিয়া হতে বিদায় নিয়ে আখিরাতের পথে যাত্রা শুরু করে তখন তার কছে আসমান হতে ফিরিশতারা আসেন। তাদের চেহারা এতো উজ্জল জ্যোতির্ময় যেন চেহারায় দীপ্তিময় সূর্য প্রতিভাত হচ্ছে। তাদের সঙ্গে বেহেশতের কাফন ও খশবু থাকে। তারা মু'মিন ব্যক্তির দৃষ্টি-সীমায় বসে যায়। অতঃপর মালাকুল মওত তার শিয়রে বসে তাকে বলে, হে নফসে মুতমাইন্নাহ (প্রশান্ত আত্মা) আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো। রূহ তখন এতো সহজে বের হয় যেভাবে মশকের ভেতর থেকে পানির ফোটা নির্গত হয়। যদিও তোমরা ব্যহ্যত এর বিপরিত দেখে থাকো। ফিরিশতারা এভাবে রূহ বের করে তাকে কিছুক্ষণের জন্যও

মালাকুল মাওতের হাতে না দিয়ে তৎক্ষনাৎ তাকে নিয়ে উর্ধ্বজগতের দিকে যাত্রা শুরু করে। ফিরিশতাদের কোন দলের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা জিজ্ঞেস করে, "এই পবিত্র রূহটি কার? বহনকারী ফিরিশতারা দুনিয়াতে তার উত্তম নাম ধরে পরিচয় দিয়ে বলে "অমুকের ছেলে অমুক"। এভাবে তাকে নিয়ে সব আসমান অতিক্রম করে সপ্তম আকাশে পৌঁছে। আল্লাহ তখন হুকুম জারি করেন যে, বান্দাটির নাম ইল্লিয়িনে লিপিবদ্ধ করো এবং কবরের সওয়াল-জবাবের জন্য তাকে পুনরায় যমিনে নিয়ে যাও। রূহকে দেহে প্রবিষ্ট করানো হয়। তখন দু'জন ফিরিশতা তাকে বসিয়ে প্রশ্ন করেঃ তোমার রবকে? তোমার দ্বীন কি? সে জবাব দেয় ঃ আমার রব 'আল্লাহ' এবং আমার দ্বীন 'ইসলাম'। তারা আবার প্রশ্ন করে ঃ এই মহাপুরুষ কে, যাঁকে তোমাদের মাঝে পাঠানো হয়েছিল। সে বলে ঃ তিনি আল্লাহর রাসুল আবার তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তুমি তা কি ভাবে জানলে ? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব কুরআন পড়েছি, এর উপর ঈমান এনেছি এবং এর সকল বক্তব্য অকাট্য সত্য বলে গ্রহণ করেছি। তখন আসমান হতে এক আওয়াজ আসেঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। তাকে বেহেশতি পোশাক পরিয়ে দাও। ফরাশ বিছিয়ে দাও। তার দিকে বেহেশতের দরজা খুলে দাও।

(আহমদ, আবু দাউদ, হাকিম, বায়হাকী)।

১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর নবী, মানুষের মধ্যে কে সব থেকে বেশি বুদ্ধিমান রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য বেশি বেশি প্রস্তুতি নিয়ে থাকে প্রকৃত পক্ষে তারাই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। তারাই দুনিয়ার সম্মান ও আখিরাতের মর্যাদা নিয়ে গেলো। (তাবরানী)

১২। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান হলো সে ব্যক্তি যে তার নিজের প্রবৃত্তিকে (নফসকে) আয়ত্ত করতে পারলো এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করতে পারলো। আর বোকা হলো সে ব্যক্তি যে নিজেকে প্রবৃত্তির অনুসরণ করালো অথচ আল্লাহর নিকট অনেক আশা রাখলো (তাবরানী)

১৩। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মৃত্যু যেহেতু কঠিন বেদনাদায়ক, তাই কোন মু'মিনের উচিত নয় সুনির্দিষ্ট সময়েরআগে মৃত্যু কামনা করা। বরং দীর্ঘ জীবনই তার কাম্য হওয়া উচিত। সুদীর্ঘ জীবনের নেক আমল ও অধিক হারে তাওবা-ইস্তিগফারের দরুন মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার সেসব

কৃত আমলের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দান করে মৃত্যু-যন্ত্রনা কিছুটা হলেও লাঘব করে দেন (বোখারী)

১৪। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেউ বিপদাপদে অধির হয়ে মৃত্যু কামনা করো না। কেননা মৃত্যুর সাথে সাথেই মানুষের আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মু'মিন ব্যক্তি যে পর্যন্ত জীবিত থাকে সে পর্যন্ত তার সৎকর্ম কিছু না কিছু বাড়তেই থাকে। (মুসলিম)

১৫। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন অবস্থাতেই মৃত্যু কামনা করবে না। কেননা যে বিভীষিকা তোমাদের সামনে অপেক্ষা করছে এবং যেসব বিষয় মৃত্যুর পর তোমাদের সামনে আসবে, সেসব নিঃসন্দেহে অতি ভয়ংকর। দীর্ঘ জীবন নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের আলামত। হয়তো এ সুযোগে আল্লাহতায়ালা তার পাপী বান্দাকে তাওবা করে তার সন্তুষ্টি অর্জন করার সুযোগ করে দিতে পারেন। (আহমদ, বায়হাকী)

১৬। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক লোক এসে আরজ করলো ইয়া রাসূলুল্লাহ, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে দীর্ঘ জীবসন লাভ করে উত্তম কাজকর্ম অতিবাহিত করেছে। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি জবাব দিলেন ঃ যে দীর্ঘ জীবন লাভ করে কুকর্মে অতিবাহিত করেছে। (আহমদ, হাকিম, তিরমিযী)

১৭। হযরত সাহাবী আম্মার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ উপদেশ গ্রহণের জন্য মৃত্যুর স্মরণই যথেষ্ট। (তাবরানী)

১৮। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ দুঃখ-কষ্টর সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে তার সে দুঃখ হালকা হয়ে যায়। তার মনে এমন ভাবের সৃষ্টি হয় যে, এ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। সুখ-সমৃদ্ধির সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে ভোগ-বিলাসের মত্ততা অনেক গুণে হ্রাস পায়। (তাবরানী)

১৯। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াটা মু'মিনদের জন্য কারাগার এবং দুঃখ-কষ্টের স্থান বিশেষ। মৃত্যুর সাথে সাথেই সে এই দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ করে।

২০। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যার গিফারীকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ নিঃসন্দেহে দুনিয়া মু'মিনদের জন্য কয়েদখানা সাদৃশ্য। কবর তার জন্য শান্তির নীড় এবং জান্নাত তার শেষ প্রত্যাবর্তনস্থান। অপর দিকে কাফিরদের জন্য দুনিয়া ভোগ-বিলাসের স্থান, কবর ভয়াবহ আযাব এবং জাহান্নাম তার প্রত্যাবর্তনস্থান হবে। (আবু নঈম)

২১। হযরত মাহমুদ ইবনে লাবল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি জিনিস মানুষ বেশি অপছন্দ করে কিন্তু এ দু'টিই তাদের জন্য বিশেষ কল্যাণকর। প্রথম মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মানুষ ভয় পায়। কিন্তু মৃত্যু মানুষকে অনেক ধরনের ফিতনার কবল হতে মুক্ত রাখে। দ্বিতীয়ত মানুষ দারিদ্রকে ভয় পায়। কিন্তু দুনিয়াতে ধন-সম্পদ যতো কম হবে আখিরাতে হিসাবও সে পরিমাণে হালকা হবে। (দায়লামী, মুসনদে ফিরদাউস)

২২। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখণ তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনটি কাজ এমন আছে যা মওতের পরও কার্যকর থাকে (১) সদকায়ে জারিয়া (এমন নেক কাজ, যার কল্যান-ফসল মানুষ ভোগ করে) (২) দ্বীনি ইলম যা মানুষের উপকার করে (যেমন কিতাবাদি রচনা, শিক্ষাদানে উত্তরাধিকার ইত্যদি) (৩) নেক সন্তান যে তার কল্যাণে দোয়া করে। (মুসলিম)

২৩। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনের মৃত্যুবরণ করাটা ঠিক সেরূপ, যেরূপ বাচ্চা মাতৃগর্ভ (সংকীর্ণতা ও অন্ধকার) হতে ভূমিষ্ট হয়ে উন্মুক্ত বিশাল দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মধ্যে পতিত হয়। (জামে তিরমিযী)

২৪। হযরত মোয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইয়াকিনওয়ালা কলব নিয় "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" সাক্ষ্য দিয়ে ইন্তেকাল করবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমদ, তাবারানী)।

২৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে তখন তাদেরকে সর্বপ্রথম "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" শিক্ষা দাও। কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পড়তে বলো। যে ব্যক্তির জীবনের প্রথম ও শেষ বাক্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হবে, সে হাজার বছর জীবিত থাকলেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। (বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান)

২৬। হযরত তালহা (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন ঃ আমি এমন একটি বাক্য জানি যে বাক্য কেউ মৃত্যুর সময় পাঠ করে মরতে পারলে, তার প্রাণ বের হওয়ার সে আরাম বোধ করবে। এ বাক্য হাশরে তার জন্যে নূরে পরিণত হবে। এমনকি তা তার দৃষ্টিপথে আসবে যা দেখে সে আনন্দিত হবে। বাক্যটি হচ্ছে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। (হাকিম, আবু ইয়ালা)

২৭। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তির মৃত্যুর সময় মালাকুল মওত এসে তার অঙ্গ-প্রতঙ্গ তন্নতন্ন করে খুঁজে ও কোন নেকির আলামত পেলো না। তার হৃদপিন্ড তালাশ করে কোন নেকির চিহ্ন পেলো না। শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলো যে তার জিহবার অগ্রভাগ তালুতে ঠেকে রয়েছে সে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার চেষ্টা করছিল। তার এই অন্তিম প্রয়াসের বরকতেই আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। (তাবরানী, বায়হাকী)

২৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তির দ্বারাও কিছু না কিছু গুনাহ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। নানা আপদ বিপদের মধ্য দিয়ে সেসব অপরাধের প্রতিকার হয়ে যায়। তারপরও যদি কোন গুনাহ বাকি থাকে তা মৃত্যু কষ্টের মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। (বায়হাকী, শোয়াবুল ঈমান)

২৯। হযরত তাফসিরবিদ তাবেঈ যাহহাক (মৃ. ১০৫ হি) বলেন, মৃত্যু-যন্ত্রনা সম্পর্কে নবী করিমকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ মৃত্যুর মা'মুলি একটু যন্ত্রনাও তারবারির একশ আঘাতের সমান হবে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

৩০। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, মৃত্যু-যন্ত্রনা সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তরবারির তিনশ'টি আঘাতের যন্ত্রনা একত্রিত করলে যা দাঁড়াবে, মৃত্যু-যন্ত্রনা তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টদায়ক বিবেচিত হবে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

৩১। হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে সংঘটিত অনেক ঘটনা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। তারেদ মদের মঝে অনেক আশ্চার্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এতকার ইসরাঈলীদের একটি জামাআত এক কবরস্থানে গিয়ে দু'রাকাত সা,ায পড়ে আল্লাহর নিটক ৱে মর্মে দোয়া করতে লাগলো যে, আল্লাহ যেন করবস্থানের কোন একজস মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তাদের সামনে উপস্থিত করেন। আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করলেন। তকরের ভিতর থেকে ঘোর কালো বর্ণের এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হলো। তার লালাটে সিজদার চিহ্ন ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা আমার নিকট কি

জানতে চাও? তার মৃত্যু-যন্ত্রনা সম্পর্কে জানতে চাইলে লোকটি বললো, "আজ থেকে শত বছর আগে আমার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর কষ্ট এখনো আমি অনুভব করছি। তোমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করো যেন আমাকে তিনি মুক্তি দেন" (আহমদ, ইবনে আবি শাইবা)। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তি যতোদিন কবরে থাকে ততোদিন পর্যন্ত মৃত্যু-যন্ত্রনার রেশ তার মধ্যে আব্যাহত থাকে (আবু নঈম) ইমাম আবদুর রহমান ইবনে আমার আওয়ায়ী (৮৮-১৫৭ হি) বলেন মৃত ব্যক্তি হাশরে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যু-যন্ত্রনার রেশ অনুভব করতে থাকবে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

৩২। হযরত ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তোমরা আপনজনের মৃত্যুর সময়টাতে কাছে থেকে তাদেরকে কলেমা পাঠ করতে সাহায্য করো। তাদের কানে জান্নাতের সুসংবাদ শোনাও কেননা, মৃত্যু-পথযাত্রী দুনিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় একটা দিশাহারা অবস্থায় পতিত হয়। এই নাজুক সময়টাতেই শয়তান তাদের খুব কাছাকাছি এসে পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট হয়, যেন সে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় ঈমান সহ নিয়ে যেতে না পারে। সেই আল্লাহর কসম যার কব্জায় মুহাম্মাদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রাণ, মৃত্যুর সময় মানুষের প্রতিটি ধমনীই গুরুতর কষ্টৎ পেয়ে থাকে। (আবু নাঈম)

৩৩। হযরত তা'মা ইবনে গাইলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সঃ) দোয়া করতেন এই বলে, "মাওলা, তুমি তো প্রতিটি রগ-রেশা, হাড়জোড়া এবং আংগুলের মধ্য থেকে রূহ বের করে আনো। মাওলা, মৃত্যুর সে কঠিন সময়ে আমাকে সাহায্য করে। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

৩৪। হযরত আবদুল মালিক আশআরী (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ায় বলেছেন, হে আল্লাহ, যে আমাকে রাসূল বলে বিশ্বাস করেছে তার জন্য মৃত্যুকে পরম মহব্বতের বস্তু করে দাও (তাবরানী)

৩৫। হযরত উবাইদা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যু-পথ-যাত্রী একজন সাহাবীর নিকট গেলেন। এই ব্যক্তি সম্পর্কে তিনি বললেন যে, তার প্রতিটি ধমনীতে ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে। এই অসহানীয় অবস্থায় আল্লাহর ফিরিশতারা তাকে আশ্বস্ত করছেন এই বলে যে, এর পর আর তাকে কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে না। অন্য একজনস সাহাবীর অন্তিম সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এখন কেমন বোধ হচ্ছে"? জাবাব দিলেন, "আমি আশা ও নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান রয়েছি"। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এই অবস্থায় আল্লাহ তাই করেন, বান্দা তাঁর নিকট যা আশা করে। আর যেসব

বিষয় থেকে বান্দা ভয় করে আল্লাহতায়ালা সেসব থেকে তাকে নিরাপদ রাখেন। (বায়হাকী)

৩৬। হযরত আনাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার যখন উর্ধ্বশ্বাস আরম্ভ হয়, তখন তার কষ্টের আর কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না শরীরের প্রতিটি জোড়া একটি অপরটি থেকে এই বলে পৃথক হতে থাকে যে, হাশরে পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়-কালের জন্য আমরা একে অন্যের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। (রিসালায়ে কুশাইরী)

৩৭। হযরত হযরত হাসা (রাঃ) বলেন ঃ মৃত্যুকালে যখন দম কণ্ঠনালিতে এসে ঠেকে তখনই বান্দার খুব বেশি কষ্ট হতে থাকে। তখন সে অস্থির হয়ে পড়ে আর উর্ধ্বশ্বাসের কষ্ট বর্ণনাতীত। কিন্তু শহীদদের এরূপ কষ্ট করতে হয় না। (ইবনে আবিদ দুনিয়া)

৩৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসটিতে দু'এক দিন বাদে সমগ্র মাসই রোযা রাখতেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলতেন ঃ এই মাসেই পরবর্তী এক বছরে যারা মৃত্যুবরণ করবে তাদের সকলের নাম আল্লাতায়লা তালিকাভুক্ত হবে, তখন আমিযেন রোযা অবস্থায় থাকি। (আবু ইয়ালা)।

৩৯। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি ললাটের ঘাম নিয়ে মৃত্যুবরণ করে (তিরমীযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম, বায়হাকী) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি দ্বারা যেসব ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় সেগুলো মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট থকলে পরই মৃত্যুর সময় তার ললাটি ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। (সুনানে সায়ীদ ইবনে মানসুর)

৪০। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা মৃত্যু-পথ-যাত্রীদের তিনটি আলামত লক্ষ্য করবে (১) যদি তার ললাট ঘর্মাক্ত হয়, (২) যদি চোখ দু'টি নিদ্রিত মানুষের চোখের মতো আনাথেকে বুজে আসে, (৩) যদি তার নাকমুখ ফোলে উঠে, তবে মনে করবে তার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হয়েছে। অন্যদিকে (১) যদি দেখো যে উট জবাই করার সময় যেমন মুখ দিয়ে গড় গড় আওয়াজ হতে থাকে, মৃত ব্যক্তির কণ্ঠনালী থেকে সেরূপ আওয়াজ বের হচ্ছে। (২) যদি দেখো তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করছে, (৩) যদি দেখো যে, তার শিরাগুরো ছাই বর্ণের হয়ে গেছে। তবে বুঝবে লোকটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাবে পতিত হয়েছে। (নাওয়াদিরুল রুসুল)

২৬তম অধ্যায়

জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ

জান্নাতের আলোচনা

জান্নাত আল্লাহ্ পাকের অসংখ্য সৃষ্টি থেকে এক অভুত পূর্ব সৃষ্টি। যা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে রেখেছেন। সৎকর্ম পরায়ন নেক কার মুমিনদের জন্য। জান্নাতের অসংখ্য নেয়ামতরাজী এবং সুখ-শান্তির উপকরনের নূন্যতম কিছু ধারনা। যদিও কিছু আয়াত এবং হাদীসের দ্বারা অনূমান করা যায় কিন্তু বাস্তবতা এটাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন যে

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنٌ رَأَتْ وَلَااُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ পাক বলেন, আমি সৎকর্ম পরায়ন ব্যক্তিদের জন্য জান্নাত এমনিভাবে সৃষ্টি করেছি যা কোন মানুষ কোনদিন চোখে দেখেনি, না কোন কান শ্রবন করেছে, চোখে দেখা এবং কানে শোনা তো দুরের কথা কোন মানুষের ভাবনার জগতেও তা ভাবতে পারেনি।

আল্লাহ্ পাক নিজেও বলে দিয়েছেন

فَلَاتَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

কেউ জানে না তার কৃত কর্মের কি কি নয়ন প্রীতিকর প্রতিদান লূকায়িত আছে।

মোদ্দাকথা জান্নাতের নিয়ামত সম্পর্কে নিঃশংকচে একটা কথাই বলা যেতে পারে যে যত ধরনের নেয়ামত রাজী হতে পারে বা যত ধরনের সুখ-শান্তি বিলাশিতার বস্তু আছে সব কিছুই আল্লাহপাক জান্নাতে সৃষ্টি করে রেখেছেন।

যেমন আল্লাহ্ পাক নিজেই বলে দিয়েছেন

وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَاتَدَّعُوْنَ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ

"ফেরেশতাগণ মুমিনদের লক্ষকরে বলবে জান্নাতে তোমাদের মনে যা চাবে তাই পাবে এবং যা দাবী করবে তাই সরবরাহ করা হবে এটা ক্ষমাশীল করুনাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন" এর সার মর্ম এই যে, তোমাদের প্রতিটি কামনা পূর্ণ করা হবে। তোমরা চাও বা না চাও।

উক্ত আয়াতে نزلا তথা আপ্যায়নের কথা বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন অনেক নেয়ামত ও জান্নাতে তোমরা পাবে যার আকাংক্ষাও তোমাদের

অন্তরে সৃষ্টি হবে না। যেমন মেহমানের সামনে এমন অনেক বস্তু ও আসে যার কল্পনা ও পূর্বে করা হয় না, বিশেষত যখন কোন বড়লোকের মেহমান হয়।

(মাযহারী)

মনের চাহিদা পূরণের বিবরণ দিতে গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জান্নাতী ব্যক্তি জান্নাতে যদি কোন পাখি উড়তে দেখে খাওয়ার কামনা করে তৎক্ষনাৎ তা ভাজা করা অবস্থায় সামনে আনীত হবে। কিছু বর্ননার দ্বারা বুঝাযায় যে, তাকে আগুন ও ধোয়া কোন কিছুই স্পর্শ করবে না। আপনা আপনি রান্না হয়ে সামনে এসে যাবে। (মাযহারী)

অন্যএক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি জান্নাতী ব্যক্তি নিজ গৃহে সন্তান জন্মের বাসনা করে তবে গর্ভ ধারণ প্রসব শিশুর দুধ ছানা এবং যৌবনে পদার্পন সব এক মূহুর্তের মধ্যে হয়ে যাবে।

(মাযহারী)

মূলত জান্নাতের সবকিছুই অকল্পনীয় যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন জান্নাতের নহর সম্পকে।

জান্নাতের নহর সমূহের বর্ণনা

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا

"এটা এমন একটি ঝর্ণা যা থেকে আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে তারা একে প্রাবহিত করবে"

অর্থাৎ জান্নাতীগণ জান্নাতের নহরকে যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে প্রবাহিত করতে পারবে। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

"পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে (তার অবস্থা নিম্মরূপ) তাতে আছে পানির নহর নির্মল দুধের নহর, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় পান কারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর"। অনুরুপ ভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জান্নাতে পানি, মধু এবং শরাবের ভিন্ন ভিন্ন নহর হবে

(তিরমীযি হাদীস মঃ ২৫৭১)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে,

اَنْهَارُ الْجَنَّةِ تَفْجُرُ مِنْ جَبَلٍ مِّنْ مِّسْكٍ

জান্নাতের নহর সমূহ মেশক এর পাহাড় থেকে প্রবাহিত হবে।

(মুছান্নাফেইবনে আবী শাইবাহ ৬/৬৭)

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) বলেন জান্নাতের নহর গুলির নিচে সমতল রুপার ফ্লোর হবে। এবং পানির মধ্য ছোট মারজান পাথর থাকবে এবং রুপার ফ্লোরে অল্প পরিমান মেশকের মাটি থাকবে। (ইয়াহয়ায়ে উলুমুদ্দীন ৫ ঃ ২৪৩)

জান্নাতের কৃক্ষরাজি এবং উদ্যান সমূহের বর্ণনা

জান্নাতে উদ্যানের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক নিজে ইরশাদ করেছেন। وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ "যে ব্যক্তি তার পালন কর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান।

অপর আয়াতে ইরশাদ করেছেন– وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ

এই দু'টি ছাড়া আরো ও দু'টি উদ্যান রয়েছে।

প্রথমোক্ত দুই উদ্যান কাদের জন্য এ কথা আয়াতে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই দুই উদ্যানের অধিকারী হবে, যারা সর্ববস্থায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে উপস্থিত হওয়ার ও হিসাব নিকাশ দেয়ার ভয়ে ভীত থাকে। ফলে তারা কোন পাপ কাজের কাছেও যায় না। বলা বাহুল্য এ ধরণের লোক বিশেষ নৈকট্যশীলগণই হবেন।

আর এই উদ্যান দ্বয়ের বৈশিষ্ট আল্লাহ পাক নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ অর্থাৎ উদ্যান দ্বয় ঘন শাখাপল্লব বিশিষ্ট হবে। এর অবশ্যম্ভবী ফল এই যে, এগুলো ছায়া ও ঘন ও শুনিবিড়ি হবে এবং ফলও বেশী হবে। অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

এবং এই উদ্যান দ্বয়ের মাঝে সর্বপ্রকার ফল থাকবে। এবং প্রত্যেক ফলের দুটি করে প্রকার হবে শুস্ক ও আদ্র অথবা সাধারন স্বাদ যুক্ত ও অসাধারণ স্বাদযুক্ত (মাযহারী)

অবশ্য পরবর্তীতে উল্লেখিত উদ্যান দ্বয়ের ব্যপারে যদি ও এমন কিছু বলা হয়নি তথাপি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মধ্যে জান্নাতের সব ধরণের উদ্যানের বৃক্ষের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন। জান্নাতের একটি বৃক্ষ এত বড় হবে যার ছায়া অতিক্রম করতে ১০০ বছর লেগে যাবে।

(তিরমীযি)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে জান্নাতের বৃক্ষের কাণ্ড স্বর্ণের বানানো হবে।

(তিরমিযী)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জান্নাতের ভূমি স্বর্নের হবে এবং মাটি হবে মেশকের এবং গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণ

এবং রৌপার এবং শাখা পল্লব বিভিন্ন ধরণের মোতির দ্বারা নির্মিত হবে। এবং এর নিচে সুস্বাদু ফল থাকবে।

যদি কেই দাড়িয়ে খেতে চায় তাও পারবে যদি বসে খেতে চায় তাও পারবে, অনুরুপ ভাবে যদি শুয়ে শুয়ে খেতে চায় তাতে ও কোন কষ্ট হবে না অর্থাৎ একজন জান্নাতী ঐ ফল খাওয়ার জন্য শুধু তার ইচ্ছাই যথেষ্ট হবে তাকে অন্য কোন কষ্ট করতে হবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহপাক নিজে ও বলে দিয়েছেন–وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا

"বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুকে থাকবে এবং এর ফলসমূহ তাদের আওতাধীন রাখা হবে।

অপর হাদীসে এসেছে জান্নাতে বৃক্ষ এমন ও থাকবে যাতে বিভিন্ন রঙ্গের ফল ধরবে এবং সে বৃক্ষের উপর এক ধরণের পাখি বসে থাকবে। এক জন জান্নাতী যখন ঐ পাখিটি খাওয়ার কামনা করবে সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি এসে তার দস্তার খানে পড়বে এবং সে ঐ পাখিটি খেয়ে ফেলবে।

জান্নাতের ফলের বিবরণ

জান্নাতের ফলের বিবরণ দিতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا

জান্নাত বাসীরা যখনই খাবার হিসাবে কোন ফল প্রাপ্ত হবে তখনই তারা বলবে এতো অবিকল সেই ফল যা ইতিপূর্বে ও আমরা লাভ করেছিলাম, বস্তুতঃতাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে" (বাকারা ২৬)

মূলত জান্নাত বাসীদেরকে একই আকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন ফল পারিবেশনের উদ্দেশ্য হবে পরিতৃপ্ত করা ও আনন্দ সঞ্চার। কিন্তু ফল সমূহ যদিও পরস্পর সাদৃশ পূর্ণ হবে তবে স্বাধ ও গন্ধ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। দুনিয়ার ফলের সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলবে না, শুধু নামে মিল থাকবে।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

"যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধ ও নয় দুনিয়ার সাধারণ ফলের অবস্থা এই যে, মওসুম শেষ হয়ে গেলে ফল ও শেষ হয়ে যায় কিন্তু জান্নাতের প্রত্যেক ফল চিরস্থায়ী হবে। কোন মওসুমের মধ্য সীমিত থাকবে না যেমনি ভাবে দুনিয়াতে বাগানের পাহাদার ফল ছিড়তে নিষেধ করে কিন্তু জান্নাতে ফল ছিড়তে কোন বাধা থাকরে না আল্লাহ পাক জান্নাতের এই অসংখ্য নিয়ামত আমাদেরকে দান করুন আমীন।

জান্নাতের খানা পরিবেশন

ফলছাড়া অন্যান্য যে খানা পিনা জান্নাতে পরিবেশন করা হবে এবং যে ভাবে পারিবেশন করা হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ وَّفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ

অর্থাৎ জান্নাত বাসীদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন তৃপ্ত হয়।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে

"তাদের (জান্নাতীদের) পরিবেশণ করা হবে রুপার পাত্রে এবং স্ফাটিকের মত পানপাত্রে। রুপালী স্ফাটিক পাত্রে। তাদের সেখানে পান করানো হবে যান জাবীল মিশ্রিত পানস পাত্র। এটা জান্নাত স্থল সালসাবীল নামক একটি ঝর্ণা।

জান্নাতে খানা পরিবেশন কারীদের বর্ণনা

পরিবেশন কারীদের গুনাবলী বর্ণানা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক নিজেই ইরশাদ করেন।

وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا

"তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ। আপনি তাদের দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মনি-মুক্তা।

জান্নাতের পোশাকের বর্ণনা

জান্নাতের পোশাক পরিচ্ছেদের বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

"তাদের (জান্নাতীদের) আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম"। অপর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যান সমূহে যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরীনি সমূহ প্রাবাহিত হবে। তাদেরকে তথায় স্বর্ণ কংকর ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে। এবং তথায় তাদের পোশাক হবে রেশমী।

অপর আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন।

যারা ঈমান স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে জান্নাত। তারেদ পদদেশে প্রবাহিত হবে নহর সমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংঘনে অলংকৃত করা হবে। এবং তারা

পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতবস্থায় যে,তারা সিংহাসনে সমাসীন থাকবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয় (কাহাফ)

জান্নাতে অলংকারাদীর বর্ণনা

জান্নাতের অলংকারের বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছন।

যদি জান্নাতের কোন ব্যক্তি দুনিয়ায় উদ্ভাসিত হতে এবং তার অলংকার প্রকাশ পেত তাহলে সূর্যের আলো কীরণ হীন হয়ে যেত যেমন সুর্য্যের আলোর সমনে তারকার আলো কিরণহীন হয়ে যায়। (নেহায়াঃ ২/৪৪২)

জান্নাতের চেয়ার টেবিল এবং বিছানার বর্ণনা

জান্নাতের চেয়ার টেবিল এবং বিছনা পাত্রের বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

"জান্নাতীগণ স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে হেলান দিয়ে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে।

জান্নাতীগণ থাকবে সমুন্নত শয্যায়। দ্বিতীয়ত এই বিছানা মাটিতে নয় পালঙ্কের উপর থাকবে। তৃতীয় স্বয়ং বিছানাও খুব পুরু হবে।

বিছানার পুর কেমন হবে এর বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন।

জান্নাতের বিছানা এত মোটা হবে যেমন আকাশ এবং যমীনের মাঝের স্থান যার মাঝে পাঁচশত বছরের দুরত্ব হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

"জান্নাতীগণ তারা সবুজ মসনদে এবং উৎকৃষ্ট মুল্যবান বিছানায় হেলান দিয়েবসবে"।

জান্নাতের রমনীগণ ও হুরের বিবরণ

জন্নাতের রমনীগনের সৌন্দয্য এবং পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন– وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ

"জান্নাতীগণের জন্য সেখানে শুদ্ধচারিনী রমনীকুল থাকবে"।

জান্নাতের পুত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন স্ত্রী লাভের অর্থ তারা হবে পার্থিব যাবতীয় বাহ্যিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও চরিত্রগত কুলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং প্রসাব পায়খানা রজঃস্রাব প্রভৃতি যাবতীয় ঘৃর্ণ বিষয়ের উর্ধ্বে। অনুরুপ ভাবে

নীতিভ্রষ্টতা চরিত্রহীতা অবধ্যতা প্রভৃতি আভ্যন্তরীন ত্রুটি লেশমাত্র ও তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে ন।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন সেথায় থাকবে আনতনয়না রমনীগণ কোন জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করেনি।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন। জান্নাতের হুরদের বৈশিষ্ট হবে এই যে, তারা হবে আয়তনয়না যে সব স্বামীর সাথে আল্লাহ পাক তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দিবেন তারা তাদের ছাড়া কোন ভিন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ) বর্ণনা করেণ যে, তারা তাদের স্বামীদের কে বলবে আমার পালন কর্তার ইয্যতের কসম, জান্নাতে তোমার চেয়ে উত্তম ও সুশ্রী পুরুষ আমার দৃষ্টি গোচর হয় না যে, আল্লাহ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন সমস্ত প্রশংসা তারই।

অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ "যেন তারা সুরক্ষিত ডিম"

আয়াতে জান্নাতের হুরগণকে লুকানো ডিমের সাথে তুলনাকরা হয়েছে কেননা আরবদের নিকট এই তুলনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিল যে, ডিম পাখার নিচে লুকানো থাকে তার উপর বাইরের ধুলিকনার কোন প্রভাব পড়ে না। ফলে তা খুব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে। এ ছাড়া রঙ সাদা হলুদাভাবে হয়ে থাকে যা আরবদের কাছে রমনীদের সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক রঙ হিসাবে গণ্য হত। তাই এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন।

জান্নাতীগণের কাছে থাকবে আনতনয়না সমরবয়স্কা রমনীগণ।

সমবয়স্কা হওয়ার উপকারিতা এই যে, তাদের পরস্পর ভালবাসা,সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক হবে। সপত্নী হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃনা থাকবে না। বলা বাহুল্য এটা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন- كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ সাদৃশ রমনীগণ।

এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যদি জান্নাতের কোন রমনী দুনিয়াতে প্রকাশ পেত তাহলে পুরা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যেত। তাদের ঘ্রানে পুরা দুনিয়া সুশোভিত হয়ে যেত এবং জান্নাতের একজন মহিলার মাথার এক টুকরা কাপড় দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। (বুখারী, তাজকিরাহ ১৯৮)

হযরত ইবনে মাসউদ (রঃ) বলেন জান্নাতের হুরগণ এত সুন্দরী হবে যে ৭০ জোড়া কাপড়ের ভিতর দিয়ে তাদের পা দেখা যাবে এমন কি তাদের পায়ের ভিতরে মগজ পর্যন্ত ঝকমক করতে থাকবে।

আহ্! আল্লাহ পাকের অপূর্ব সৃষ্টি জান্নাতের রমনীগণ কতইনা সুন্দর হবে!এবং তারা যখন জান্নাতী পুরুষদের লক্ষ করে বলতে থাকবে।

আমরা সবসময় থাকবে। কখনো যাব না। আমরা সবসময় আনন্দদয়ক হব কখনো বেদনাদয়ক হবে না। আমরা সবময় সন্তষ্ট থাকব কখনো অসন্তুষ্ট হব না। সৌভাগ্য তাদের যারা আমাদের হবে এবং আমরা তাদের হবে।

ফায়দা ঃ হে পুরুষ চিন্তা করে দেখুন জান্নাতের রমণীগণ কেমন হবে। তার তুলনা কি দুনিয়ার কোন সুন্দরী নারী হতে পারে? অথচ আজ আমরা দুনিয়ার এই নারীদের পিছনে আমাদের আখেরাতকে বিসর্জন দিতে দিধা করছি না। আমরা তাদের সন্তুষ্টির জন্য হারাম উপার্জন করছি। অথচ দুনিয়ার এই নারী আজ যদি আপনাকে ভালবাসা দেয় তাহলে কাল আপনাকে দুঃখ দিতে কোন দিধা করবে না। তারা যতই স্বামীকে বলে আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না, আমি তোমাকে কখনো বেদনা দিব না, আমি কখনো তোম্ার উপর রাগ করব না, আমি কোন দিন তোমাকে ভুলব না। অথচ এমন অনেক ঘটনা ঘটে থাকেযে সুযোগ পেলে স্ত্রী স্বামীকে একেবারেই ভুলে ধন-সম্পদ প্রভাব-প্রতিপত্তিদেখে অন্য স্বামীকে গ্রহণ করতে বিন্দু মাত্র দিধা করে না। অনেক নারীতো এমনও রয়েছে যারা প্রথমে কোন পুরুষকে নিজেই মেসেজের মাধ্যমে প্রস্তাব করে বিবাহ করে কিন্তু পরবর্তীতে যখন কোন ধনাঢ্য পীরের ছেলেকে পায় তখন সে তার পূর্বের স্বামীকে ভুলে যায়।

এখন একটু ভেবে দেখুন আমাদের জন্য কি দুনিয়ার এই নারীদের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করা উচিত হবে? যে আল্লাহ পাক জান্নাতে আমাদের জন্য কেমন কৃতজ্ঞ সুন্দরী রমনীগণ সৃষ্টি করে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের কি কর্তব্য নয়? যে, আমরা সেই মাওলা পাকের জন্য আমাদের জীবনকে উৎসর্গ করে দেই। আল্লাহপাক আমাদের তৌফিক দান করুন। আমিন।

হে নারী! জান্নাতী রমনীগণের বব্যহার, শিষ্টাচার নিতিকতা কি তোমার জন্য আদর্শ হতে পারে না? আল্লাহপাক যে খানে তোমাদের সৃষ্টি করেছে আনন্দ দেওয়ার জন্য তোমাদের স্বামীদেরকে। অথচ তোমরা তোমাদের জন্য নিবেদিত প্রান তোমাদের স্বামীদের কষ্টদিতে, তাদের ছেড়ে অন্য পরপুরুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে তাদের হারাম পন্থায় উপার্যন করতে বাধ্য করতে ও তোমরা দিধা

করনা। তোমরা তো মহান প্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি সৌন্দর্য ও শ্রেষ্টত্বের মানদন্ডে তুমি অতুলনীয়। তোমার সৌন্দর্যে এ বিশ্ব চরাচর। অপরুপ সৌন্দর্যে ভাসমান শ্রষ্টার এক ব্যতিক্রম ধর্মী সৃষ্টি। আহ! তোমার বাহ্যিক গুনাবলীর সাথে যদি তোমার নিতী নৈতিকতার পূর্ণ সমন্বয় ঘটত তাহলে সত্যিই তুমি হতে অবিস্মরনীয়। আল্লাহ পাক সকলকে আদর্শ রমনী রুপে জীবন যপন করার তৌফিক দান করুন।

জান্নাতের বালাখানার বর্ণনা

জান্নাতের বালাখানার বর্ণনা করতে গিয়ে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আয়াতে লিখিত وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন সেটি হল মোতির নির্মিত একটি বালাখানা। যার মধ্যে লাল রঙ্গের ইয়াকুত পাথরের ৭০ টি কক্ষ রয়েছে প্রতিটি কক্ষেই খাট এবং প্রতিটা বিছানায় উপর একজন করে হুর রয়েছে এবং প্রতিটি দস্তারখানের উপর ৭০ রকমের খাদ্য রাখা থাকবে এবং প্রতিটি কক্ষে ৭০ জন চাকর এবং চাকরানী থাবে। (মাজহারী ঃ ৪/২৬৪)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জান্নাতে এমন একধরণের ঘর থাকবে যার বাহির থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাইরে দেখা যাবে। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল এত সুন্দর ঘর কারজন্য ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন এ ঘর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য যারা নরম ভাষায় কথা বলবে ক্ষুদার্থদের খানা খাওয়াবে রমজান মাসে রোজা রাখবে। এবং যখন সব মানুষ ঘুমিয়ে থকে তখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নামাজ পড়বে।

(তিরমিযী)

জান্নাতীদের বিবরণ

জান্নাতিদের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন। জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদের বলা হবে এগুলোতে (জান্নাতে) তোমরা নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দুরকরে দিব তারা ভাই ভায়ের মত সামনা-সামনি আসনে বসবে। সেখানে তাদের মোটেই কষ্ট হবে না। এবং তারা সেখান থেকে বহিস্কৃত হবে না। আপনি আমার বান্দাদের জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালূ।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

সে দিন কিছু মুখমন্ডল হাসি খুশি ও সজীব হবে এবং তারা তাদের পালন কর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে।

এক হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যদি কোন জান্নাতী ব্যক্তির নখ দুনিয়াতে প্রকাশ পেত তাহলে পুরা পৃথিবী তার কিরনে আলোকিত হয়ে যেত। আর যদি কোন জান্নাতী দুনিয়ার বুকে উদ্ভাসিত হয়ে শুধু তার হাতের অলংকার প্রকাশ করত তাহলে সুর্যের আলো তার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যেত। (তিরমিযি)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন।

আল্লাহ পাক যেমনি ভাবে জান্নাতের কিছু বিবরণ তার বান্দাদের সে দিকে আকৃষ্ট করার জন্য দিয়ে দিয়েছেন। তেমিন ভাবে সেই জান্নাতের উপযুক্ত কারা হবে এদের বিবরণ ও দিয়ে দিয়েছেন।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন–

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

যে ব্যক্তি তার পালন কর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজকে নিবৃত্ত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ পাক জান্নাতীদের দুটি আলামত বর্ণনা করেছেন।

দুনিয়াতে প্রত্যেক কাজের সময় এরুপ ভয় করা যে।

১। আমাকে একদিন আল্লাহ পাকের সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে এবং প্রত্যেক কাজের হিসাব দিতে হবে।

সুতরাং এমন ভয় যার অন্তরে থাকবে সে কখনো মানুষকে হত্যা করতে পারে না, মিথ্যা বলতে পারে না মানুষকে ধোকা দিতে পারে না, মানুষের মনে কষ্ট দিতে পারে না মানুষের সাথে প্রতারণা করতে পারে না। এক স্বমীকে ছেড়ে ধনবল এবং জনবল দেখে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারেনা।

মোদ্দা কথা আল্লাহ পাকের কোন ধরণের কোন নাফারমানী সে করতে পারে না।

২। অবৈধ খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখা।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে এ দু'টি গুণ অর্জন করতে পারবে আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুসংবাদ দিয়েছেন। فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى অর্থাৎ জান্নাতই তার ঠিকানা

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন।

"যে কেউ আল্লাহ ও রাসুলের আদেশ মত চলবে তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন। যে গুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোত প্রবাহিত হবে তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا

নিশ্চয়ই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে সাফল্য উদ্যান, আঙুর, সমবয়স্কা পূর্নযৌবনা তরুনী এবং পূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় আসবে ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না। এটা আপনার পালন কর্তার পক্ষ থেকে যেথোচিত দান।

মোদ্দা কথা আল্লাহপাক তার অপূর্ক সৃষ্টি জান্নাত সৃষ্টি করেছেন সৎকর্ম পরায়ন মুমিন মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ পাক আমাদের উক্তগুণে গুনান্বিত করে জান্নাতের উপযুক্ত করে নিন। আমিন। (১লা বৈশাখ ১৪১৪বাংলা সংশোধন ১লা বৈশাখ ১৪১৫ বাংলা।)

বেহেশতী রমণীগণের গুণ-সৌন্দর্য

বেহেশত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে মুমিনদের জন্য এক কল্পনাতীত অমূল্য উপহার। খাঁটি দ্বীনদারগণ নশ্বর ধরণী পরিত্যাগ করে অনন্ত পরকালে পদাপর্ণের সাথে সাথে বেহেশতী এমন সুখ-স্বাচন্দ্য, হাসি-আনন্দ ভোগ করার প্রয়াস পাবেন, যা কখনো কোন চর্ম চক্ষু অবলোকন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং কোন মনুষ্য হৃদয় যার কল্পনাও করেনি।

পরকালে জান্নাতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা ঈমানদার বান্দাদেরকে যেসব পুরস্কার প্রদান করবেন, তন্মধ্যে অন্যতম পুরস্কার হলো-অসূর্যস্পর্শ বেহেশতী পত্নী লাভ। হাদীসের ভাষ্যমতে, "একজন নিম্নস্তরের জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়ার স্ত্রী ব্যতীতও বাহাত্তর জন বেহেশতী স্ত্রী লাভ করবে।" (মুসনাদে আহমাদ) হযরত আবু ই'আলা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-"বেহেশতীগণকে দু'জন মানবী স্ত্রী এবং সত্তর জন হুর স্ত্রী দেয়া হবে।" অপর এক বর্ণনা মতে, "একজন বেহেশতী পুরুষ দুনিয়ার স্ত্রীদের মধ্যে হতে বাহাত্তর জন স্ত্রী এবং হুরদের মধ্যে হতে বাহাত্তর জন সঙ্গীণী লাভ করবে।" (ইবনে মাজাহ)

এসব বর্ণনার আলোকে প্রতিভাত হয় যে, বেহেশতী পুরুষগণ অপরাপর নিয়ামত সমূহের পাশাপাাশি একাধিক জান্নাতী রমণী লাভ করবেন। তবে আমলের ব্যবধান হিসাবে বেহেশতী রমণীগণের সংখ্যায় তারতম্য হবে।

এ নশ্বর ধরণীতে অল্প বয়স্কা যুবতীদের দেহ বল্লরীর কান্তিময়তা মনোরম ও আকর্ষণীয় হয় বিধায় পুরুষগণ সাধারণতঃ নিজের বয়সের চেয়ে কম বয়সী কুমারী মেয়েদেওকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করতে বেশী পছন্দ করে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের সূচনা লগ্নে সঙ্গীণীর কম বয়স জনিত আনাড়ীপণা এবং সাংসারিক জীবনের অন্তিম পর্যায়ে প্রণয়ীর বার্ধক্যজনিত অবসাদ সুখের স্বপ্ন মিনার নির্মাণে বিঘ্ন ঘটায়। পক্ষান্তরে বেহেশতী রমণীগণ পুরুষদের সমবয়স্কা হবে, দৈহিক আকার -আকৃতিও হবে পুরুষদের সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই কম বয়সজনিত আনাড়ীপনা কিংবা বার্ধক্যজনিত অবসাদ তাদের মাঝে পরিলক্ষিত হবে না। বরং তারা রূপ-লাবন্য ও প্রেমাসক্তিতে পরিপূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে অনন্ত যৌবনা ও চিরকুমারী হবে এবং জান্নাতী পুরুষগণ সমবয়স্কা নব উদ্ভিন্না এসব তরুণীদেরকে বরণ করতে অত্যন্ত আগ্রহী হবেন। এ ব্যাপারে সূরা ওয়াকি'আয় মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-"আমি বেহেশতী নারীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে বানিয়েছি চিরকুমারী, কামিনী ও সমবয়স্ক-নেককারদের জন্য।" (সূরা ওয়াকি'আহ, আয়াত ঃ ৩৪-৩৮)

এ আয়াতে বর্ণিত চিরকুমারীর ব্যাখ্যায় হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) লিখেছেন- "পুরুষদের সঙ্গ লাভের পর পুনরায় সাথে সাথে তাদেরকে কুমারী করে দেয়া হবে।" তাই স্বামীগণ যখনই তাদের সাথে মিলবেন, তখনই তাদেরকে কুমারী পাবেন।

আর ইহকালে ঈমানদারও পরহেজগার নারীগণ যে বয়সেই ইন্তেকাল করুন, পরকালে তাদেরকে কুমারী ও যুবতী বানিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে এবং জান্নাতী গুণ ও রূপ-সৌন্দর্যে সুসজ্জিত করা হবে। এমনকি তাদের সৌন্দর্য জান্নাতী হুরদের চেয়েও বেশী আকর্ষণীয় হবে। তারা হবে বেহেশতী পুরুষগণের কাংখিত পবিত্র সঙ্গীণী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-"যারা পরহেজগার, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত-যার তলদেশে বহমান প্রস্রবণ। তারা সেখানে থাকবে চিরকাল। আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গীণীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাক স্বীয় বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন।"

(সূরা আলে ইমরান-১৫)

এ আয়াতের আলোকে উলামায়ে কিরামগণ বলেন-বেহেশতী স্ত্রীগণের দেহ-মন, ভিতর-বাহির, স্বভাব-চরিত্র সবই পরিচ্ছন্ন ও ত্রুটিমুক্ত থাকবে। তাই তাদের মুখে আসবে না লালা, লজ্জাস্থান দিয়ে নির্গত হবে না পেশাব-পায়খানা, বীর্য কিংবা হায়িজ-নিফাসের আবর্জনা। কখনো ময়লা হবে না তাদের দেহ বা পোষাক। অনুপম চরিত্র মাধুরীর অধিকারীণী এসব রমণীগন আন্তরিকতার সাথে

স্বামীর সেবায় রত, থাকবে। দুর্ব্যবহার, ছলনা, প্রতারণা ও অবাধ্যতাসহ সকল কষ্টদায়ক আচরণ থেকে তারা থাকবে বিমুক্ত।

দুনিয়াতে যেসব নারী ঈমানের সাথে ইন্তিকাল করবে, পরকালে তারা স্বীয় স্বামীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার স্ত্রী ছাড়াও বেহেশতী পুরুষদেরকে অনিন্দ্য সুন্দরী হুর দেয়া হবে। এ সকল হুরগণ রূপ-লাবণ্যে মানবী সঙ্গীণীদের থেকে ব্যতিক্রম হবে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে-"সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। অতএব,তোমরা (হে ইনসান ও জ্বিন!) তোমাদের পালনকর্তার কোন নিয়ামত সমূহকে অস্বীকার করবে? তারা হবে খীমায় অবস্থানকারিণী হুরগণ। অতএব, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্তার কোন নিয়ামত সমূহকে অস্বীকার করবে? ইতিপূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি কোন মানুষ ও জ্বিন।" (সূরা রহমান, ৭০-৭৪)

সূরা ওয়াকি'আয় মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-"তথায় থাকবে আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায় আনতনয়না হুরগণ।" (সূরা ওয়াকি'আহ, আয়াত ঃ ২২-২৩) সূরা সাফফাতে আল্লাহ পাক বলেন-"তাদের নিকট থাকবে আনতনয়না তরুণীগণ, যেন তারা সুরক্ষিত ডিম।" (সূরা সাফ্ফাত, আয়াত ঃ ৪৮-৪৯)

এসব আয়াত বিশ্লেষণ করে উলামায়ে কিরামগণ বলেছেন, সুনেত্রা হুরগণ-সুরক্ষিত মুক্তার মত শুভ্র ও পরিস্কার হবে। ধুলা-বালি ও ময়লা-আবর্জনা থেকে সুরক্ষিত হবে। তারা হবে আকষণীয়, সুবর্ণা ও চিত্তাকর্ষক রূপবতী। তারা সেখানে আপন বোনের মত পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে মিলেমিশে বসবাস করবে। হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পরিহার করে স্বামীর সেবায় নিয়োজিত থাকবে। সর্বদা তাদের নজর নিবন্ধ থাকবে স্বামীর প্রতি, অন্য কারো দিকে দৃষ্টিপাতের স্পৃহাও তাদের মনে উদয় হবে না।

এসব অপূর্ব রূপের ঝিলিক বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-এক সকাল বা এক বিকাল আল্লাহর পথে বের হওয়া ধারিত্রী এবং ধারিত্রীর মধ্যে যা কিছু আছে-তা থেকে উত্তম। আর বেহেশতী স্ত্রীদের কেউ যদি একবার জমিনের দিকে উকি মেরে তাকায়, তাহলে গোটা আসমান ও জমিন এবং এতদুভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সবই আলোকিত ও সুবাসিত হয়ে যাবে।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-"একজন বেহেশতী স্ত্রীর মাথার ওড়না সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীর মাঝে যা কিছূ আছে-তা হতেও অনেক মূল্যবান।" (বুখারী শরীফ)

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন-"বেহেশতী

রমণীদেন পায়ের গোছার উজ্জ্বল বর্ণ ও সুদৃশ্য মজ্জা সত্তর জোড়া কাপড়ের বাহির হতেও দৃষ্টিগোচর হবে। মহান আল্লাহ জান্নাতী নারীদের সম্পর্কে বলেছেন-তাদেরকে প্রবাল মুক্তা ও পদ্মরোগের মত গৌরাঙ্গী, অস্পরা সুন্দরী মনে হবে।" তিনি আরো বলের্ন-"মুক্তা এমন পাথর যে, তার ভিতর মালা বানিয়ে যদি বাহির হতে স্পষ্ট দেখতে চাও, তবে তা দেখতে পাবে।"

(তিরমিযী শরীফ)

বেহেশতী রমণীদের রূপের আতিশয্য বর্ণনার এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- "তারা যেন মুক্তা ও মারজান পাথর।" (সূরা রহমান, ৫৮)

এ আয়াতের তাফসীরে রাসূলে পাক, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "জান্নাতী পুরুষ যখন তার প্রেয়সীর চেহারার দিকে তাকাবে, তখন সে তার চেহারা আয়নার মত নির্মল-স্বচ্ছ দেখাতে পাবে। আর বেহেশতী নারী যে সব মণি-মুক্তার অলংকার ব্যবহার করবে, সেগুলোর সবচেয়ে নিম্নমানের মুক্তাটির নিখিল বসুন্ধরার পূর্ব দিগন্ত-হতে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত আলোকিত করতে সক্ষম। বেহেশতী রমণীদের পোষাক এত স্বচ্ছ ও পরিস্কার হবে যে, তার সত্তর জোড়ার ভিতর দিয়েও দৃষ্টি ভেদ করবে এবং ঐ পরিচ্ছেদের বাহির হতে চরণ গোড়ালীর হাড্ডি পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হবে।"

স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হতে পারে, একজন জান্নাতী পুরুষ যদি একাধিক প্রণয়িণী পায়, তবে একজন বেহেশতী নারী কত জন স্বামী পাবে? আসলে এ প্রশ্নটি যুক্তি সঙ্গত নয়। কারণ, নিখিল অবনীতে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকা গৌরবের বিষয় হলেও একজন আদর্শ নারীর একাধিক স্বামী থাকা অত্যন্ত দোষণীয় ও কলংকজনক জ্ঞান করা হয়।সুতরাং ইহজগতেই যখন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা একাধিক স্বামীকে চরম অপমানজনক ও আত্মমর্যাদাহানীকর বিবেচনা করে থাকে, তখন আখিরাতের মত চিরন্তন পবিত্র স্থানে কেমন করে এ ব্যবস্থাকে গৌরবের বিষয় মনে করবে?

এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে বেহেশতী রমণীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনার করা হয়েছে, তারা স্বীয় দৃষ্টি অবনিত রাখবে এবং স্বামী ব্যতীত কারো দিকে দৃষ্টিপাত করবে না। ফলশ্রুতিতে তারা এক স্বামীতেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হবে। তাই তাদের সম্পর্কে একাধিক স্বামীর প্রশ্ন উত্থাপন সম্পূর্ণ অবান্তর ও চরম নির্লজ্জত ও বটে।

আলোচনার এ পর্যায়ে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীতে একাধিক পতি বরণকারীণী মহিলাগণ জান্নাত কোন স্বামীর ছায়াতলে থাকবে? এ প্রশ্নর জবাব পেতেই হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন-"হে আল্লাহর রাসূল! যে মহিলা পর্যায়ক্রমে একাধিক স্বামী

গ্রহণ করে, পরকালে যদি সে এবং তার সরল স্বামী জান্নাতবাসী হয়, তবে জান্নাতে সে কোন স্বামী লাভ করবে?" জবাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-"এ ক্ষেত্রে উক্ত নারী কে স্বাধীনতা দেয়া হবে। তাই সে যাকে ইচ্ছা তাকেই বরণ করতে পারবে। সুতরাং দুনিয়াতে যে স্বামীর স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার সবচেয়ে উন্নত ছিল, সে তাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে আবেদন জানাবে-হেদয়াময় প্রতিপালক! অমুক স্বামী আমার সাথে সবচেয়ে ভালো আচরণ করেছে, আজ তাকেই আমার স্বামী বানিয়ে দিন।

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব)

মোটকথা, বেহেশতে কোন নারী বা পুরুষ সঙ্গীহীন থাকবে না। এমনকি ইহকালের অবিবাহিতা পুরুষ-মহিলাগণও আখিরাতে একে অপরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

এখন প্রশ্ন হলো-বেহেশতী রমণীদের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ হবে? মানবী স্ত্রী, না হুর প্রণয়িণী? এ প্রশ্নের জবাব পেতেই একদা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আরজ করলেন-"ইয়া রাসূলুল্লাহ! বেহেশতে দুনিয়ার ঈমানদার নারীগণ শ্রেষ্ঠ হবে, না হুরগণ?" জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন-"বেহেশতী হুরগণের তুলনায় পৃথিবীর ঈমানদার রমণীগণ এ পরিমাণ শ্রেষ্ঠ হবে-যেরূপ লেপের উপরের আবরণ ভিতরের আস্তরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর কারণ জানতে চাইলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-"যেহেতু দুনিয়ার মহিলাগণ নামায-রোযা আদায় করাসহ মহান স্রষ্টা দাসত্বের পরাকাষ্টা প্রদর্শন করেছে।"

অন্য রিওয়ায়াতে জানা যায়-দুনিয়ার নেককার রমণিগণ বেহেশতী হুরদের সরদার ও নেত্রী হবেন এবং এতেই তারা পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হবেন।

নারী ও পুরুষদের সেই জান্নাতী নিয়ামত লাভ করার পূর্বশর্ত হচ্ছে-মহান আল্লাহর হুকুম জীবনের সর্বস্তরে পালন পূর্বক পরিপূর্ণ ঈমান ও দ্বীনদারী গ্রহণ করা। আসুন, আমরা সকলে সেই জান্নাতের সাফল্যময় পথে চলি।

নেককারগণের জন্য বেহেশতের নিয়ামতসমূহ

আল্লাহ তা'আলা বনী আদমকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র সৃষ্টিকুলকে তাদের খিদমতে লাগিয়ে তিনি তাদেরকে তার ইবাদতের জন্য মনোনীত করেছেন। আর এর প্রতিদানে তাদের জন্য বেহেশতে বহু শান-শওকতপূর্ণ সুখময় জীবন ও অকল্পনীয় সুখ-সম্ভোগের ব্যবস্থা করেছেন-যদি তারা হয় ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ন।

কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

"যারা ঈমান গ্রহণ করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস"। (সূরা কাহাফ, ১০৭)

জান্নাতুল ফিরদাউস জান্নাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরে হল আল্লাহ তা'আলার আরশ। সৎকার্যের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান বানাবেন এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তাইতো ইরশাদ হয়েছে।

خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

"সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। কখনও স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না। (সূরা কাহাফ, ১০৮)

জান্নাতের এই স্থানটি তাদের জন্য অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নেয়ামত হিসেবে হবে।

وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ

"আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখেল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের স্থান হিসেবে জান্নাতে রয়েছে উত্তম বাস গৃহ।"

(সূরা সফ, ১২)

যারা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসস্থান দান করবেন। এসব বাস গৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-বাসনের সরঞ্জাম থাকবে ঃ

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا-

"পরহেজগারদের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা এই যে, তার নিম্নে ঝর্ণা সমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফল সমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও।" (সূরা রাদ, ৩৫)

জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ফল ও ছায়াসমূহ চিরস্থায়ী রাখবেন এবং তাদের জন্য বিশেষ কক্ষ তৈরী করবেন ঃ

أُولٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا

"তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে।"

(সূরা ফুরকান, ৭৫)

বেহেশতী বিশেষ নৈকট্য প্রাপ্তগণ এমন বালাখানা পাবেন-যা সাধারণ জান্নাতীগণের নিকট তেমনি দৃষ্টিগোচর হবে, যেমন পৃথিবীর লোকদের কাছে তারকা বা নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয়। (বুখারী)

হযরত আবু মালেক আশ'আরী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-"জান্নাতে এমন কক্ষ থাকবে, যার ভিতরের অংশ বাহির থেকে এবং বাহিরের অংশ ভিতর থেকে দৃষ্টিগোচর হবে। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ! এসব কক্ষ কাদের জন্য? তিনি বললেন-যে ব্যক্তি নম্র ও পবিত্র কথা বলে, মুসলমানকে সালাম করে, ক্ষুধার্তকে আহার করায় এবং রাত্রে যখন সবাই নিদ্রিত থাকে, তখন সে তাহাজ্জদের নামায পড়ে।" (মাযহারী)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন ঃ

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নিয়ামত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ।" (সূরা যমার, ২০)

তারা সে প্রাসাদের আমোদ-প্রমোদে মশগুল থাকবেনঃ

اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ

"জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে।" (সূরা ইয়াসীন, ৫৫)

তারা বালাখানায় চিত্তবিনোদনে মশগুল থাকবেন। যেহেতু সেখানে কোন ইবাদত থাকবে না এবং জীবিকা উপার্জনের কোন প্রয়োজন থাকবে না। এমন বেকার অবস্থায় মানুষ সাধারণতঃ অস্বস্তি বোধ করে। তাই বলা হয়েছে যে, জান্নাতীরা বিনোদনমূলক কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকবে তাদের সহধর্মীনীদেরকে নিয়েঃ

هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى الْاَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ

"তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে হেলান দিয়ে।"

(সূরা ইয়াসীন, ৫৬)

জান্নাতীরা হুরদেরকে নিয়ে বিভিন্ন প্রাসাদে এবং ছায়া বিশিষ্ট উদ্যানে অর্থাৎ পার্কে ভ্রমন করবে এবং অন্যান্য নিয়ামত সমূহ ভোগ করবে ঃ

لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ

"সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল মূল এবং যা চাবে তাই।"

(সূরা ইয়াসীন, ৫৭)

জান্নাতীরা যা চাবে, তাই পাবে। সেখানে প্রতিটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী উপস্থিত থাকবে।

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ

"তারা তথায় রেশমের আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।"

(সূরা রাহমান, ৫৪)

নেককার ব্যক্তিগণ বেহেশতে রেশমের বিছানায় হেলান দিয়ে রমণীদের সাথে খোশগল্প করবেনঃ

فِيْهِنَّ قٰصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

"তথায় থাকবে আনত নয়না রমণী গণ। কোন জ্বিন ও মানব পূর্বে যাদেরকে ব্যবহার করেনি।" (সূরা রহমান, ৫৬)

জান্নাতীগণ এমন রমনীদেরকে নিয়ে বেড়াবেন, সুখ-সম্ভোগ করবেন, যারা তাদের জন্যই নির্ধারিত থাকবেন। এসব রমনীকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ বা কোন জ্বিন স্পর্শ করেনি এবং ঐ রমনীগণ খুব সুন্দরী হবেন ঃ

فِيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

"তথায় থাকবে সচ্চরিত্র অনিন্দ্য সুন্দরী রমনীগণ।" (সূরা রহমান, ৪৯) জান্নাতী হুরগণ সবাই এই বিশেষণে বিশেষিতা হবেন।

বেহেশতীগণ যেখানে বসবেন, সেখানে থাকবে মূল্যবান বিছানা পত্র ঃ

مُتَّكِئِيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

"তারা সবুজ মাসনদে এবং উৎকৃষ্ট মূল্যবান বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে।"

(সূরা রহমান, ৭৬)

তাদের পরণে সবুজ রঙ্গের রেশমী বস্ত্র থাকবে এবং তাদের বিছানা ও বিলাস সামগ্রী তৈরী করা হবে উৎকৃষ্ট রেশমের দ্বারা।

يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ

"তথায় তারা স্বর্ণ নির্মিত মোতি খচিত কাংঘন দ্বারা অলংকৃত হবে এবং তাদের পোশাক হবে রেশমের।" (সূরা ফাতির, ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতীদেরকে প্রতিদান স্বরূপ স্বর্ণের কাংঘন এবং মুক্তার অলংকার পরাবেন এবং তাদের বস্ত্র হবে রেশমের।

দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য এই অলংকার হারাম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাদেরকে এই অলংকার দান করবেন। হযরত আবু ছাইদ খুদরী (রাঃ)

হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "জান্নাতীদের মস্ত মুক্তা খচিত মুকুট থাকবে। সেই মুক্তার নিম্নতমের আলো সমগ্র পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তে উদ্ভাসিত হবে।" (মাযহারী)

তাফসীরবিদগণ বলেন-প্রত্যেক জান্নাতীর হাতে একটি স্বর্ণ নির্মিত ও একটি রোপ্য নির্মিত কাংঘন থাকবে এবং তারা স্বর্ণের বালাখানাতে থাকবেনঃ

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ

"স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে তারা হেলান দিয়ে বসবে পরস্পর মুখামুখি হয়ে।"

(সূরা ওয়াকি'আ, ১৫)

বেহেশতবাসীগণ খুব আনন্দ করবেন। স্বর্ণের সিংহাসনে বসে হেলান দিয়ে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে আমোদ-প্রমোদ করবেন এবং খাদেমরা বিভিন্ন নেয়ামত নিয়ে ঘুরাফেরা করবেঃ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ

"তাদের নিকট ঘুরাফেরা করবে চির কিশোরেরা।" (সূরা ওয়াকি'আ, ১৭)

তাদের নিকট ঘুরাফেরা যে কিশোরেরা করবে, তারা সর্বদা কিশোর থাকবে। বয়সের কোন তারতম্য দেখা দিবে না। হুরদের ন্যায় এই কিশোরগণ জান্নাতে পয়দা হবে। তারা জান্নাতীদের খেদমতগার হবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, একজন জান্নাতীর নিকট হাজার খাদেম থাকবে। তারা প্রয়োজনীয় বস্তু নিয়ে সর্বদা খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ঃ بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ

"পানির পাত্র, কুঁজা ও খাঁটি সুরাপূর্ণ পেয়ালা হাতে নিয়ে তারা প্রস্তুত থাকবে।" (সূরাা ওয়াকি'আ ১৮) জান্নাতীদের এ সকল খাদেমরা শরবতের ও শরাবের গ্লাস নিয়ে ঘুরবে এবং ফল-মূল, গোশত ও বিভিন্ন খাবার নিয়ে উপস্থিত থাকবে ঃ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ

"তাদের পছন্দমত ফল মূল নিয়ে উপস্থিত থাকবে।" (সূরা ওয়াকি'আ ২০) "রুচিসম্মত পাখির গোশত নিয়ে (প্রস্তুত থাকবে)।" (সূরা ওয়াকি'আ, ২১) হাদীসে আছে, জান্নাতীগণ যখন যেভাবে পাখির গোশত খেতে চাবেন, তখন সে ভাবে প্রস্তুত হয়ে তাদের সামনে এসে যাবে। (মাযহারী)

জান্নাতীদের নিকট সর্বদা হুরগণ মনোরনের জন্য প্রস্তুত থাকবেন ঃ

وَحُوْرٌ عِيْنٌ كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ

"তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়।" (সূরা ওয়াকি'আ,২২-২৩) জান্নাতীগণ জান্নাতের বিলাস বহুল সিংহাসনে বসে হুরদেরকে নিয়ে আনন্দময় অবস্থায় থাকবেন এবং বিভিন্ন ফল-মূল ও পাখির গোশত ও সূরা নিয়ে মশগুল থাকবেন ঃ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ

"তথায় থাকবে কাঁটা বিহীন কুল বৃক্ষ।" (ওয়াকি'আ, ২৮)

জান্নাতের সুখ-আয়েশ সমূহ অসংখ্য, অদ্বিতীয় ও কল্পনাতীত।

জান্নাতের ফল-মূল দুনিয়ার মত হবে না। এগুলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু হবে। وَظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ "তথায় থাকবে কাঁদ কাঁদ কলা।" (ওয়াকি'আ, ২৯) وَطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ এবং দীর্ঘ ছায়া। (ওয়াকি'আ,৩০) হাদীসে আছে, এসব ছায়ায় অশ্বে আরোহণ করে শত শত বৎসরে তা অতিক্রম করা যাবে না। অর্থাৎ জান্নাতীগণ হুর এবং স্ত্রীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন পার্কে বেড়াবেন এবং আনন্দ করবেন। যেমন, দুনিয়াতে মানুষ গাছের ছায়ায়, পার্কে ঘুরতে বেশী পছন্দ করে। তেমনি ভাবে বেহেশতে উন্নতমানের ছায়া বিশিষ্ট পার্কের ব্যবস্থা থাকবে এবং এ পার্কের মধ্যে থাকবে পানির নহর প্রবাহিতঃ

وَمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ

"তথায় প্রবাহিত পানি ও প্রচুর ফল-মূল থাকবে।" (সূরা ওয়াকিয়া, ৩১/৩২) বেহেশতে বহু প্রকারের ফল হবে এবং প্রচুর পরিমাণে হবে। বাধাবিহীন সে ভোগ করবে ঃ لَا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ

"যা শেষ হবার নয় এবং নিষিদ্ধও নয়।" (ওয়াকিয়া, ৩৩)

দুনিয়াতে মওসুম শেষ হয়ে গেলে, ফল শেষ হয়ে যায়। কোন ফল শীতকালে, কোন ফল গ্রীস্মকালে পাওয়া যায়, অর্থাৎ মওসুমের সাথে ফলের সম্পর্ক। কিন্তু জান্নাতের প্রত্যক ফল চিরস্থায়ী হবে। কোন মওসুমের সাথে সম্পর্ক থাকবে না এবং ছিড়তেও কেউ বাধা দিবে না।

জান্নাতের বিভিন্ন স্থানে ঝুলন্ত ফরশ থাকবে। وَفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ

"আর থাকবে সমুন্নত শয্যার ফরশ।" (ওয়াকি'আ, ৩৪) এই ফরশগুলো পালংকের উপর বিছানো থাকবে। কারো মতে, বিছানা বলতে জান্নাতের শয্যা শায়িনী নারী বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, اِنَّآ اَنْشَاْنٰهُنَّ "জান্নাতী রমনীগণকে আমি বিশেষ রূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা ওয়াকি'আ, ৩৫)

জান্নাতী হুরদের সৃষ্টির বিশেষ প্রক্রিয়া এই যে, তাদেরকে প্রজনন ক্রিয়া ব্যতিরেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। দুনিয়ার যে সব নারী জান্নাতে যাবে, তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ রূপ এই যে, যারা দুনিয়াতে কুশ্রী কৃষ্ণাহী অথবা বৃদ্ধা ছিল, জান্নাতে তাদেরকে সুশ্রী, যুবতী ও লাবন্যময়ী করে দেয়া হবে। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসংগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-যে নারী দুনিয়াতে বৃদ্ধা, কুশ্রী, কৃষ্ণাঙ্গী ও শ্বেত

কেশিনী ও কদাকার ছিল, এই নতুন সৃষ্টি তাদেরকে অপূর্ব সুন্দর ষোড়শী যুবতী করে দিবেন।

আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের নারীদেরকে এমন রূপ ও লাবন্যময়ী করে সৃষ্টি করবেন যে, তাদের একটু রূপ যদি পৃথিবীতে প্রকাশ হত, তা হলে গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যেত। তারা হবে চির কুমারী। অর্থাৎ প্রত্যেক নারীই সঙ্গম-সহবাসের পর আবার কুমারী হয়ে যাবে। প্রত্যেক নারীর রূপ একটুও কমবে না। দুনিয়ার স্ত্রীরা ঐ হুর রমনীদের মত রূপসী হবেন এবং সমস্ত হুরদের তারা সর্দার হবেন। তারা স্বামী সোহাগিনী হবেন। বিভিন্ন রকমের চিত্তবিনোদন আমোদ-প্রমোদ করে তারা সর্ব অবস্থায় স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখবেন। জান্নাতের সমস্ত রমনীগণ সমবয়স্কা হবেন ঃ عُرُبًا اَتْرَابًا

"তারা কামিনী সমবয়স্কা।" (সূরা ওয়াকি'আ, ৩৭)

জান্নাতের স্ত্রীগণ স্বামী সোহাগিনী হবেন, স্বামী প্রেমিকা হবেন। দুনিয়ার নারীরা বিভিন্ন সময় স্বামীর উপর নারাজ থাকে, কিন্তু বেহেশতের রমনীগণ কখনও স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হবেন না।

বেহেশতের বহুবিধ অফুরন্ত নিয়ামতের মাত্র কিয়দাংশ বর্ণনা করা হল। তা-ও কেবল মানুষের বোধগম্য ভাষায়। অন্যথায় বেহেশতে মহান আল্লাহ এমন নাজ-নিয়ামত ও সুখ-ঐশ্বর্য রেখেছেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন-"আমি বেহেশতে নেককার মুমিন বান্দাদের জন্য এমন সুখ-সম্ভোগ, আরাম-আয়েশ ও নেয়ামত সমূহ প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনও দেখেনি, কোন কর্ণ কখনও শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে যার পরিধি অনুভুত হয়নি। এসবই রেখেছেন মহান আল্লাহ ঈমানদার-মুত্তাকীদের জন্য, সংকর্মশীলদের জন্য।

জাহান্নামের বিবরণ

জাহান্নাম আল্লাহ পাকের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। যেখানে শুধু শাস্তি আর শাস্তি, আযাব আর আযাব, যা আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন কাফের, মুশরিক, নাস্তিক, মুরতাদ বেঈমান নাফরমানদের জন্য যাদের বিবরণ আল্লাহপাক নিজেই দিয়েছেন-

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

অর্থ ঃ আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে তার দ্বারা বিবেচনা করেনা, তাদের চোখ রয়েছে তার দ্বারা দেখেনা, তাদের কান রয়েছে তার দ্বারা শোনে না। তারা চতুস্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল শৈথিল্য পরায়ণ।

উক্ত আয়াতে এই কথা বিবৃত করা হয়নি যে, তারা নিজেদের পানাহার থাকা-পরা ও নিদ্রা-জাগরণ বিলাসবহুল গাড়ি-বাড়ি প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন সম্পর্কিত বিষয়গুলোও দেখতে বা শুনতে পায় না; বরং তাদের সম্পর্কে আল্লাহপাক অন্যত্র বলে দিয়েছেন।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غَافِلُوْنَ

তারা পর্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, কিন্তু আখেরাত সম্পর্কে গাফেল।

আল্লাহ পাক আয়াতুল্লিখিত গুণাবলী সম্পন্ন লোকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমাদের রক্ষা করুন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আখেরাতকে সামনে রাখার তৌফিক দান করুন। আমীন।

জাহান্নামীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ পাক কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে তার নিকৃষ্টতা বর্ণনা করেছেন কোথাও বলেছেন-

اُولٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا

তাদেরই স্থান হবে নিকৃষ্ট এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

কোথাও বলেছেন- ثُمَّ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

"এরপর তাদের ঠিকানা হবে দোযখ। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।"

কোথাও বলেছেন– وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

"আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুত ঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান।"

কোথাও বলেছেন- وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতইনা নিকৃষ্ট অবস্থান! মোদ্দাকথা জাহান্নাম যে কত নিকৃষ্ট, ভয়ংকর এবং বিপদজনক স্থান তার কিছু কিছু বিবরণ কোরআনে কিছু আয়াত এবং হাদীস দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ يُصْهَرُ بِهٖ مَا فِىْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ

مِنْ حَدِيْدٍ كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ

অতঃপর যারা কাফের তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে এবং তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি আর তারা যখন অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হওযার ইচ্ছা করবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে দহন শাস্তি আস্বাদন কর।

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتَابِ وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ-

যারা কিতাবের প্রতি এবং যে বিষয় দিয়ে আমি পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি সে বিষয়ের প্রতি মিথ্যারোপ করে তারা সত্বরই জানতে পারবে, যখন বেড়ি ও শৃঙ্খল তাদের গলদেশে পড়বে। তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে অতঃপর তাদেরকে আগুনে জালানো হবে।

অন্যত্র আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا

এতে সন্দেহ নেই যে, আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি যে সব লোক অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে, আমি তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে তখন আবার আমি তা অন্য চামড়া দিয়ে পাল্টে দেব। যাতে তারা আযাব আস্বাদন করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী হেকমতের অধিকারী।

আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত মু'আয (রাঃ) বলেছেন যে, তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে তখন সেগুলো পাল্টিয়ে দেয়া হবে এবং এ, কাজটি এত দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হবে যে, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আর হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন–

আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে সত্তর হাজার বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে তখনই সেসব লোকদের বলা হবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও সাথে সাথে সেগুলো পূর্বের মত হয়ে যাবে। (মাযহারী, ২য় খণ্ড)

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

সে দিন জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা জাহান্নামীদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ দেশকে দগ্ধ করা হবে। (সে দিন বলা হবে) পুঞ্জীভূত এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে সুতরাং তোমরা যা পুঞ্জীভূত করে রেখেছিলে তা আস্বাদন কর।

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

مِنْ وَّرَائِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ

তার পিছনে জাহান্নাম রয়েছে। তাতে পুঁজ মিশানো পানি পান করনো হবে।

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِى النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ

সেদিন তাদেরকে (অপরাধীদেরকে) মুখ হেচড়ে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর।

অপর আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন–

ثُمَّ اِنَّكُمْ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ- لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ- فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ- فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ- فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ

অতঃপর হে বিভ্রান্ত অস্বীকারকারীরা তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে এবং তা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে পরে তোমরা পান করবে তার উপর অত্যুষ্ণ পানি। আর পান করবে তৃষ্ণার্ত উষ্ট্রের ন্যায়। কেয়ামতের দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন।

জাহান্নামের আগুনের তীব্রতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ার বুকে মানুষ যে আগুন ব্যবহার করে জাহান্নামের আগুন এর থেকে ৭০ গুণ বেশি তীব্র হবে।

(তিরমিযী-হাদীস ৮৬০২)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি এই মসজিদে এক লক্ষ লোক থাকে যার মধ্যে একজন জাহান্নামী ব্যক্তি যদি

শুধু শ্বাস ছাড়ে তাহলে মসজিদ এবং তার মধ্যে যারা থাকবে সকলকে জ্বালিয়ে দিবে। (তারগীব খ ৪-পৃ-৪৬২)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন জাহান্নামের আগুনকে প্রথম একহাজার বছর প্রজ্জলিত করা হয়েছে অতঃপর আগুন লালবর্ণ ধারণ করেছে পুনরায় এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করা হলে আগুন সাদা বর্ণ ধারণ করেছে পুনরায় এক হাজার বছর প্রজ্বলিত করা হলে আগুন কালো বর্ণ ধারণ করেছে।

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নাম এত গভীর হবে যদি তার উপর থেকে একটি পাথর ছুড়া হয় তাহলে তা নিচে পৌছতে ৭০ বছর সময় লাগবে। (তারগীব- ৪/৪৭০)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যদি কোন জাহান্নামী দুনিয়াতে আগমন করত তাহলে দুনিয়ার সমস্থ মানুষ তার ভয়ংকর চেহারা দেখে এবং দুর্গন্ধে মারা যেত। (তারগীব)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, জাহান্নামে জাহান্নামীরা এত বেশি ক্রন্দন করবে যে এক পর্যায় তাদের চোখের থেকে পানির পরিবর্তে রক্ত প্রবাহিত হতে শুরু করবে। (মুসলিম)

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, জাহান্নামীরা এত বেশি ক্রন্দন করবে যে তাদের চোখের পানি এমন ভাবে প্রবাহিত হতে থাকবে যদি কেউ চায় তাহলে সে তার মধ্যে নৌকা চালাতে পারবে। (তিরমিযী) মোদ্দাকথা জাহান্নাম হবে সব ধরণের স্বাস্তির একটি ভয়ংকর স্থান। যদি শুধু জাহান্নাম থেকে সুজ পরিমাণ জায়গা ছিদ্র করে দেওয়া হত তাহলে দুনিয়ার সমস্ত কিছু জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। যদি কোন জাহান্নামীর একটি পোশাক দুনিয়া এবং আকাশের মাঝে ঝুলিয়ে দেয়া হত তাহলে তার দুর্গন্ধে সমস্ত প্রাণী মারা যেত। জাহান্নামে পিপাসার তাড়নায় মানুষ যখন শুধু পানি পানি বলতে থাকবে তখন তাদের এমন পানি দেওয়া হবে যা পান করার সাথে সাথে তাদের পেটের সমস্ত নাড়ি-ভূঁড়ি গলে গলে পড়তে থাকবে। জাহান্নামীদের সব থেকে বড় কষ্ট এটা হবে যে তাদের সামনেই জান্নাত বিদ্যমান থাকবে যেখানে তাদের অনেক পরিচিত আত্মীয় স্বজন থাকবে অনেকের মা-বাবা জান্নাতে যাবে কিন্তু ছেলেমেয়ে জাহান্নামে যাবে অনেকের বাবা-মা জাহান্নামে যাবে, কিন্তু ছেলেমেয়ে জান্নাতে যাবে। অনেকের স্ত্রী জান্নাতে যাবে, কিন্তু স্বামী যাবে জাহান্নামে। অনেকের স্বামী যাবে জান্নাতে। কিন্তু স্ত্রী যাবে জাহান্নামে অনেক অধিনস্ত কর্মচারী যাবে জান্নাতে, কিন্তু স্যার যাবে

জাহান্নামে এমতাবস্থায় যখন প্রত্যেকে জাহান্নাম থেকে তার অপর সাথিকে জান্নাতে দেখবে তখন তাদের পরিতাপের অন্ত থাকবে না। এমন কি জাহান্নামিরা জান্নাতীদের বলবে–

وَنَادٰى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে ডেকে বলবে, আমাদের উপর সামান্য পানি নিক্ষেপ কর অথবা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন, তা থেকেই কিছু দাও। তারা উত্তরে বলবে আল্লাহ এই উভয় বস্তু কাফেরদের জন্য হারাম করেছেন।

আহ কতইনা দুঃখজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখন। বিশেষ করে এই কঠিন মুহূর্তে এমন আপনজন যাদের খুশি করার জন্য নিজেকে কত কষ্ট করতে হয়েছে যদি এমন মানুষের থেকে এই মুহূর্তে এমন একটি কথা শোনা যায় তখন কেমন হবে পরিস্থিতি। এজন্য একটি কথা খুব ভালভাবে জেনে রাখা দরকার দুনিয়াতে যে যতই প্রিয় হোক না কেন, যে যতই ভালবাসার পাত্র হোক না কেন, আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ পাকের বিধান লংঘন করে নিজের এই সকল প্রিয়জনকে খুশি করা কতই না বোকামীর কাজ। তাই একটু ভেবে দেখুন, আপনি কার সন্তুষ্টির জন্য অবৈধ উপার্জন করছেন, আপনি কার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহপাকের নাফরমানিতে লিপ্ত হচ্ছেন, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের খুশির জন্য ঘরে একটি টিভির ব্যবস্থা করছেন? আপনি কি এটি ভেবে দেখছেন যে পরকালের ভয়াবহ মুহূর্তে আপনার হিসাব আপনাকেই দিতে হবে। সুতরাং সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য হল যে কোন কাজের ক্ষেত্রে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে, এ কাজে আমার সব থেকে বেশি প্রিয়জন মহান আল্লাহ পাক খুশি হবেন কিনা যদি আল্লাহ পাক খুশি হন, কিন্তু দুনিয়ার কেউ খুশি না হন তার পরেও আপনি নির্দ্বিধায় কাজটি করতে পারেন। কারণ প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ পাকের খুশিকেই প্রকৃত খুশি মনে করে এবং আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টিকেই প্রকৃত অসন্তুষ্টি মনে করে।

আল্লাহ পাক অধমকে এবং সকল পাঠক পাঠিকাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।

জাহান্নাম থেকে মুক্তির আমল

জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য অন্যতম কাজ হলো কোন অবস্থায়ই আল্লাহ পাককে অসন্তুষ্ট করা যাবে না এবং সেই সাথে আল্লাহ পাকের নিকট তা থেকে মুক্তির জন্য দোয়াও করতে হবে। কেননা আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে নিজেই

তার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলী এবং আলামত বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

নেক বান্দা তারা যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, তার শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ।

অনুরূপভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উম্মতদিগকে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে যেমনভাবে কোরআন শিক্ষা দিতেন তেমনিভাবে এই দোয়াটিও শিক্ষা দিতেন।

অপর হাদীসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَاَلَ اللّٰهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ مِنَ النَّارِ (ترمزى)

অর্থাৎ ঃ হযরত আনাছ বিন মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট তিন বার জান্নাত প্রার্থনা করে জান্নাত তখন বলে, হে আল্লাহ এই ব্যক্তিকে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। আর যে ব্যক্তি তিন বার জাহান্নাম থেকে মুক্তি কামনা করে, জাহান্নাম তখন বলে, হে আল্লাহ এ ব্যক্তিকে আপনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দিন। (তিরমিযী)

হযরত আনাস (রাঃ) অপর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব থেকে বেশি এই দোয়া করতেন-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (بخارى- مسلم)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে স্বীয় করুণায় জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন।

২৭তম অধ্যায়

দোয়া দূরুদ ও মুনাযাত

দরূদ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ

হাদীস নং-১

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ

(طبرانى)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদটি পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফা'আত আবশ্যক। (তাবারানী)

হাদীস নং-২

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الْقَائِمَةِ وَالصَّلٰوةِ النَّافِعَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَأَرْضَ عَنِّىْ رِضًا لَاتَسْخَطُ بَعْدَهٗ أَبَدًا (مسند أحمد)

হাদীস নং-৩

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

হাদীস নং-৪

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَرَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (بيهقى)

হাদীস নং-৫

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (بخارى شريف)

হাদীস নং-৬

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (مسلم شريف)

হাদীস নং-৭

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌمَّجِيْدٌ (ابن ماجه)

হাদীস নং-৮

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (نسائى)

হাদীস নং-৯

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ(ابوداؤد)

হাদীস নং-১০

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌمَّجِيْدٌ (أبو داؤد)

হাদীস নং-১১

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (_ مسلم شريف)

হাদীস নং-১২

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (أبو داؤد)

হাদীস নং-১৩

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (مسلم شريف)

হাদীস নং-১৪

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَأَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (ابو داؤد)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এরূপ আগ্রহ করে যে, আমার পরিবার বর্গের প্রতি দরূদ পাঠ করার সময় পুরাপুরি ছওয়াব হাসিল করবে, তা হলে সে যেন এই দুরূদ পাঠ করে।

হাদীস নং-১৫

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَتَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ (طبرى)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার পক্ষে সাক্ষ দিব এবং তার জন্য শাফাআত করব।

হাদীস নং-১৬

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ تَرَحَّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا رَحِمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (سعايه)

হাদীস নং-১৭

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّارْحَمْ مُحَمَّدًا وَّاٰلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (سعايه)

হাদীস নং-১৮

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

হাদীস নং-১৯

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(نسائى ابن ماجه)

হাদীস নং-২০

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ (نسائى)

হাদীস নং-২১

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًى وَلَهٗ جَزَاءً وَلِحَقِّهٖ اَدَاءً وَاَعْطِهِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُوْدَ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ وَاجْزِهٖ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ اِخْوَانِهٖ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

(بخارى شريف)

হযরত ইবনে আবী আসেম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সাত জুমআ পর্যন্ত প্রতি জুমআয় সাত বার এই দুরূদ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে। (বুখারী শরীফ)

হাদীস নং-২২

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(بيهقى مستدرك حاكم مسند أحمد)

হাদীস নং-২৩

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْنَا مَعَهُمْ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْنَا مَعَهُمْ صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (دارقطنى)

হাদীস নং-২৪

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا جَعَلْتَهَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(مسند أحمد)

হাদীস নং-২৫

وَصَلَّى اللهُ عَلٰى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ (نسائى)

সালাম সংক্রান্ত হাদীস সমূহ

হাদীস নং-২৬

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (بخارى شريف)

হাদীস নং-২৭

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ اَلطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (مسلم نسائى)

হাদীস নং-২৮

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ ـ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (نسائى)

হাদীস নং-২৯

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (نسائى)

হাদীস নং-৩০

بِسْمِ اللهِ وَبِاللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَسْاَلُ اللهَ الْجَنَّةَ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ

(نسائى)

হাদীস নং-৩১

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

(مؤطا)

হাদীস নং-৩২

بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ خَيْرُ الْاَسْمَاءِ اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَاهْدِنِيْ

(معجم طبرانى)

হাদীস নং-৩৩

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ (ابوداؤد)

হাদীস নং-৩৪

بِسْمِ اللّٰهِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ الزَّاكِيَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ شَهِدْتُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ شَهِدْتُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (مؤطا)

হাদীস নং-৩৫

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكِيَّاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ (مؤطا)

হাদীস নং-৩৬

اَلتَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ الزَّكِيَّاتُ لِلّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ السلام علينا وعلى عباد الله الصَّالِحِيْنَ (مؤطا)

হাদীস নং-৩৭

اَلتَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادُ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ (طحاوى)

হাদীস নং-৩৮

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ (ابوداؤد)

হাদীস নং-৩৯

اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوٰتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ (مسلم)

হাদীস নং-৪০

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ (المستدرك للحاكم)

গোটা সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ আমল

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, প্রতি দিন সকাল বেলা এই দুরূদ শরীফ দশবার পড়ে নিলে এর ছওয়াব গোটা সৃষ্টিরাজির দুরূদ পড়ার বরাবর হবে।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ عَدَدَ مَنْ صَلّٰى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَا يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ (دار قطنى وابن ماجه)

দোয়ার আদব

এক. দোয়াকারীর পানাহার, লেবাস-পোষাক হারাম ও অবৈধ মাল থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এমন কি তার কোনো উপার্জনই হারামের নামগন্ধ থাকতে পারবে না। তার সকল পয়সাই হালাল উপায়ে অর্জিত হতে হবে।

দুই. ইখলাসের সাথে দোয়া-প্রার্থনা করবে। তাতে লোক দেখানো বা রিয়া থাকতে পারবে না। দোয়ার সময় আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার বা শরীক করবে না।

তিন. দোয়া করার পূর্বে কোন ভাল কাজ করে নিবে। অর্থাৎ দান-খয়রাত করে নিবে বা নফল নামায ইত্যাদি পড়ে নিবে।

চার. পাক-পবিত্রতার প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখবে। গোসল করতে না পারলে অন্ততঃ অযূ অবশ্যই করে নিবে।

পাঁচ. কিবলামুখী হয়ে 'আত-তাহিয়্যাতু'-এর পদ্ধতিতে বসে দোয়া করবে।

ছয়. দোয়ার প্রারম্ভে হামদ, সানা ও দুরুদ শরীফ পড়ে নিবে।

সাত. উভয় হাত উঁচিয়ে হাতের তালু প্রশস্ত করে এমনভাবে দু'হাত উপরের দিকে তুলবে, যাতে করে দুই বাহু এবং সীনা বরাবর হাত চলে আসে। দোয়া করার সময় হাত যেন বুকের সাথে চেপে না যায়; বরং দূরত্ব বজায় থাকে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

আট. অনাবৃত হাতে দোয়া করবে। হাতের উপর কাপড় বা অন্যকিছু থাকতে পারবে না বরং কোনো কারণবশতঃ কাপড়ের দ্বারা হাত ঢেকে গেলে তা সরিয়ে দোয়া করবে।

নয়. একাগ্রচিত্তে, অন্তরঙ্গভাবে, গভীর মনোনিবেশ সহকারে অত্যন্ত আদবের সাথে, অনুনয়-বিনয় করে, আকুলতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করে আল্লাহকে হাযির-নাযীর জেনে দোয়া করবে।

দশ. ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে কেঁদে কেঁদে দোয়া প্রার্থনা করবে।

এগার. 'আসমায়ে হোসনা' অর্থাৎ- আল্লাহর প্রতিটি গুণবাচক নাম জপে জপে, নিজের উত্তম কাজের দোহাই দিয়ে; নবী, রাসূল, সাহাবী তাবেয়ী, অলী-আওলিয়াদের অছিলা ধরে এইভাবে বলবে- 'হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ-অনুকম্পা, রহমত ও দয়ার অছিলা ধরে আমি দোয়া করছি। আমার অমুক অমুক কাজটি যদি তোমার গ্রহণীয় হয়ে থাকে, তাকে অছিলা ধরে আমি তোমার দরবারে দোয়া করছি, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও অলি-আওলিয়াদের অছিলা ধরে আমি দোয়া করছি, হে প্রভু! তুমি আমার দোয়া কবূল কর।'

বার. আস্তে আস্তে নিম্ন স্বরে দোয়া প্রার্থনা করবে।

তের. বারবার বলতে থাকবে। পাঁচবার, সাতবার, অন্ততঃপক্ষে তিন বার।

চৌদ্দ. দোয়ার শুরুতে নিজের সকল পাপ-পঙ্কিলতা অকপটে আল্লাহর দরবারে তুলে ধরবে। অন্যায়-অবিচার স্বীকার করবে এবং বলবে- 'হে প্রভু! আমি বড় গুনাহগার এবং পাপী বান্দাহ।'

পনের. দোয়ার সময় অন্তরে অনুশোচনার সঞ্চার করে অন্তরের একাগ্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে এবং আল্লাহ থেকে ভালোর আশা করবে। সকল পঙ্কিলতাকে ধূয়ে-মুছে দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীর আস্থা সহকারে দোয়ায় নিমগ্ন হবে।

ষোল. দোয়া করার সাথে সাথে আমীন বলবে। আর যদি দোয়াকারী ইমাম হন, তাহলে তো মুকতাদীদের অবশ্যই 'আমীন' বলতে হবে।

সতের. সকল ছোট-বড় বিষয়ে আল্লাহর দরবারেই দোয়া প্রার্থনা করবে।

আঠারো. এমন শব্দ দ্বারা দোয়া করবে, যার বাক্য ছোট হবে এবং অর্থ হবে ব্যাপক। আর বাক্যগুলোও এমন অর্থবহ হতে হবে, যার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নিহিত থাকে।

উনিশ. সকল মুসলমানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রথমে এ ব্যাপারে দোয়া তারপর অন্য বিষয়ে।

বিশ. দৃষ্টি নিম্নগামী করে খুবই নরম অন্তরে দোয়া করতে হবে। দোয়ার সময় হা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে না।

একুশ. দোয়ার মাঝে শব্দবিন্যাস, বাক্যচয়ন এবং ছন্দ পরিহার করতে হবে।

বাইশ. গানের মত সুর করে দোয়া করবে না। শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

তেইশ. সম্পর্ক ছিন্ন বা গোনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য দোয়া করবে না।

চব্বিশ. দোয়ার মাঝে আল্লাহর অপার রহমত, দয়া ও অনুগ্রহকে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখবে না। অর্থাৎ এমন বলবে না যে, আমার আহারের ব্যবস্থাটাই করে দাও, অন্য কারো নয়।

পঁচিশ. যে জিনিস আদৌ অর্জন করা সম্ভব নয় তার জন্য দোয়া করবে না। যেমন- আমাকে যৌবন ফিরিয়ে দাও, আমাকে মৃত্যু দিও না, আমার দেহটাকে ছোট করে দাও, সূর্য যেন আর উদিত না হয় ইত্যাদি।

ছাব্বিশ. দোয়া কবূল হওয়ার জন্য ছটফট এবং খুব তাড়াহুড়া করবে না। যেমন- দোয়ার পরপরই বলতে থাকা, 'এখনো দোয়া কবূল হচ্ছে না কেন? দ্রুত কবূল করলেই তো পারে, আমার দোয়া আসলেই কবূল হয় না' ইত্যাদি।

সাতাশ. দোয়া শেষে উভয় হাত চেহারার উপর বুলিয়ে দিতে হবে।

এছাড়াও দোয়া কবূল হওয়ার জন্য আরও বিভিন্ন আদব রয়েছে।

দোয়া কবূলের সময়

কুরআন, হাদীস, সাহাবায়ে কিরাম এবং সালফে সালেহীনের বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত সময়ে দোয়া কবূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে-

এক. শবে কদর অর্থাৎ রমযান মাসের ২১, ২৩, ২৫, ২৭, ২৯ তারিখের রাত্রে।

দুই. আরাফার দিন অর্থাৎ জিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখ।

তিন. পুরা রমযান মাস।

চার. শুক্রবার রাত।

পাঁচ. শুক্রবার দিন।

ছয়. শুক্রবার দিনের একটি বিশেষ মুহূর্ত। অবশ্য এই সময়টি নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে। এ ব্যাপারে ৪০ টির মত অভিমত পাওয়া যায়। তবে নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে ইমাম সাহেব খুৎবা প্রদানের লক্ষ্যে যখন মেহরাবে আরোহণ করেন, তখন থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত সময়টুকু দোয়া কবূলের বিশেষ সময়। আর সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত থেকে ولا الضالين এর তিলাওয়াতের সময়টুকুকে দোয়া কবূল হওয়ার আশাব্যঞ্জক সময় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ছাড়া শুক্রবার আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত

সময়ের যে কোন এক সময়ে দোয়া কবূল হওয়ার কথা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

সাত. রাতের প্রথম 'তৃতীয়াংশ' অর্থাৎ রাতকে তিন ভাগ করে প্রথম অংশে দোয়া করলে তা দরবারে ইলাহীতে গৃহীত হয়। ধরা যাক সন্ধ্যা হয় ছয়টায়, প্রভাতও ঠিক তাই। তখন রাত দশটার মাঝে মুনাজাত করতে হবে।

আট. রাতের শেষ তৃতীয়াংশে অর্থাৎ বারো ঘণ্টার রাত হলে দু'টা থেকে ছয়টা পর্যন্ত সময় হিসাব করতে হবে।

নয়. শেষ রাতের এক ষষ্ঠাংশ।

দশ. সুবহে সাদিকের সময়।

এগার. মুয়ায্যিন আযান দেয়ার সময়।

বার. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়।

তের. তাকবীর আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে।

চৌদ্দ. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ 'হাইয়্যা আলাস্ সালাহ' এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর। (যে ব্যক্তি বিপদে-আপদে, দুঃখে-কষ্টে জর্জরিত থাকে, বিশেষতঃ তার দোয়া কবূল হওয়ার উত্তম মওকা এটি)

পনের. জিহাদের ময়দানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর পর।

ষোল. মুসলিম বাহিনী যখন শত্রুবাহিনীর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত থাকে।

সতের. ফরয নামাযের অবস্থায়।

আঠারো. সিজদারত অবস্থায়।

উনিশ. তিলাওয়াতে কুরআনের পর।

বিশ. খতমে কুরআনের পর। অর্থাৎ যে ব্যক্তি কুরআন খতম করল তার দোয়া।

একুশ. ইমাম সাহেব যখন وَلَا الضَّالِّيْنَ পড়েন তখন।

বাইশ. যমযমের পানি পান করার সময়।

তেইশ. শেষ রাতে মোরগের ডাক শোনার সময়।

চব্বিশ. মুসলমানের ধর্মীয় বড় সমাবেশ। যেমন ঈদ, জুমআ এবং আরাফাতের ময়দানে।

পঁচিশ. যিকিরের মজলিসে।

ছাব্বিশ. মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে। অর্থাৎ যখন দেহ থেকে রুহ্ বিচ্ছিন্ন হতে থাকে এবং মানুষ তার চোখ-মুখ বন্ধ করতে থাকে তখন পাশে উপস্থিত লোকদের দোয়া।

সাতাশ. মুষলধারে বৃষ্টি চলাকালে।

আটাশ. কাবা ঘর দর্শনের সাথে সাথে।

দোয়া কবুল হওয়ার আশাব্যঞ্জক স্থান

বিভিন্ন রিওয়ায়েত এবং বর্ণনার দ্বারা নিম্নোক্ত স্থানে দোয়া কবূল হওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।

এক. ইসলামের পূণ্যময় স্থানসমূহে বসে।

দুই. বায়তুল্লাহ শরীফে বসে।

তিন. মসজিদে নববিতে।

চার. তাওয়াফের স্থানে।

পাঁচ. 'মুল্‌তাযাম' অর্থাৎ, 'হজরে আস্‌ওয়াদ' ও কা'বা ঘরের চৌকাঠের মধ্যবর্তী স্থানে।

ছয়. কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে।

সাত. যমযম কূপের পাশে দাঁড়িয়ে।

আট. সাফা ও মারওয়াহ্ পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে 'সায়ী' বা দ্রুত চলার সময়।

নয়. সাফা ও মারওয়াহ্ পাহাড়ের চূড়ায় উঠে।

দশ. মাকামে ইবরাহীমের পাদদেশে।

এগার. আরাফাতের ময়দানে, যেখানে হাজীগণ একত্রিত হয়ে থাকেন।

বার. মুয্‌দালিফা অর্থাৎ আরাফাতের ময়দান থেকে প্রত্যবর্তন শেষে যেখানে হাজীগণ রাত্রি যাপন করেন।

তের. মীনার প্রান্তর, হজ্ব শেষে হাজীগণ যেখানে তিনদিন অবস্থান করেন।

চৌদ্দ. ঐ তিন স্থানে যেখানে শয়তানকে উদ্দেশ্য করে প্রস্তর নিক্ষেপ করা হয়।

পনের. 'মীযাবে রহমত'-এর নীচে যেখানে কা'বার ছাদ থেকে পানি পড়ে।

ষোল. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবারকের পাশে দাঁড়িয়ে।

সতের. সূরায়ে আনআমের জালালী আয়াত যেখানে পাশাপাশি আল্লাহর নামটি দোয়ায় উল্লেখিত হয়েছে। প্রথম 'আল্লাহ' উচ্চারণ করার পর দোয়া করে দ্বিতীয় 'আল্লাহ' উচ্চারণ করতে হবে। (এইভাবে দোয়া করলে সে দোয়া কবূল হওয়ার বহু নজির রয়েছে।

যাদের দোয়া গৃহীত হয়

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের দোয়া কবূল হওয়ার সম্ভাবনার কথা বিভিন্ন রিওয়ায়েতে ও বর্ণনায় পাওয়া যায়।

এক. অতি নিগৃহীত পেরেশান-ব্যক্তির দোয়া।

দুই. মাযলুমের দোয়া। মাযলুম কাফির, মুশরিক, ফাসিক যেই হোক না কেন।

তিন. মাতা-পিতার দোয়া সন্তানের জন্য। সন্তান ভাল হোক বা মন্দ হোক।

চার. ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং ইনসাফগার বিচারকের দোয়া।

পাঁচ. আদর্শপরায়ণ ও সৎলোকের দোয়া। অবশ্য এ দোয়া সম্পর্কে ছিন্ন বা কোন পাপ কাজে জড়ানো থেকে মুক্ত হতে হবে।

ছয়. উত্তম চরিত্রবান ও আদর্শ সন্তানের দোয়া পিতামাতার জন্য।

সাত. মুসাফিরের দোয়া। সে দোয়া চাই নিজের জন্যই হোক বা অন্য কারো জন্য।

আট. এক মুসলমানের দোয়া অন্য মুসলমানের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। তবে তা সম্পর্ক ছিন্ন ও জুলূম নির্যাতনের স্বপক্ষে হতে পারবে না এবং কবূল না হওয়ার অভিযোগ করতে পারবে না।

নয়. ইফতারের সময় রোযাদারের দোয়া।

দশ. তওবাকারীর দোয়া।

এগার. রাতের বেলায় নিদ্রা থেকে জেগে যে ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করে-

لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُلِلّٰهِ وَلَااِلٰهَ اِلَّاهُوَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّابِاللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই জন্য। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান মহিয়ান। আল্লাহ ছাড়া কোন ক্ষমতা নেই, কোন শক্তি নেই। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।'।

বার. যে ব্যক্তি يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام বলে দোয়া প্রার্থনা করে।

তের. যে ব্যক্তি يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ বলে দোয়া শুরু করে।

চৌদ্দ. যে ব্যক্তি তিনবার জান্নাত চেয়ে দোয়া করে। তার জন্য জান্নাত আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে থাকে। 'হে আল্লাহ! আমার মাঝে তাকে একটু স্থান করে দাও।'

পনের. যে ব্যক্তি দোযখের আগুন থেকে তিনবার পানাহ চায়। তার জন্য দোযখ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে থাকে। 'হে আল্লাহ! তাকে আমার এই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো না'।

ষোল. হজ্ব পালনকারী হজ্বের পুণ্যময় আহকাম পালন শেষে যতক্ষণ বাড়ি প্রত্যাবর্তন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার দোয়া কবূল হতে থাকে।

সতের. যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

'তুমি (আল্লাহ) ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তোমার সত্তা পূতঃপবিত্র। নিশ্চয় আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।'

আঠার. যে ব্যক্তি আযানের পর আযানের জন্য নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করে, তার দোয়া।

উনিশ. যে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে দৈনন্দিন ২৭ বা ২০ বার ইসতিগফার পাঠ করে তার দোয়া নিশ্চিত কবূল হয়।

বিশ. যে ব্যক্তি দুনিয়ার সবকিছু কুরবানী করে আল্লাহর দেয়া জান, মাল নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয় সেই ব্যক্তির দোয়া কবূল হয়।

দোয়া কবূল হওয়ার লক্ষণ

দোয়া কবূল হওয়ার অনেক লক্ষণের কথা বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি লক্ষণ তুলে ধরা হল।

এক. ভয় লাগা, ভীতি সঞ্চার হওয়া, অন্তরের পরিবর্তন হওয়া, অসাধারণ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া।

দুই. দেহের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া, শিহরিয়ে উঠা।

তিন. চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়া।

চার. অন্তরের পরিবর্তনের পর প্রফুল্লতা অনুভব করা। হৃদয় ও মনের ক্লান্তি কেটে যাওয়া। আনন্দ ও খুশীর মনোভাব সৃষ্টি হওয়া। সবকিছু হালকা-পাতলা এবং ঝরঝরে মনে হওয়া। নিজের উপর থেকে কোন বিপদ কেটে যাওয়ার উপলব্ধি করা।

একটি পূর্ণ দোয়া

হযরত আবু উমামা (রাঃ) একদা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি তো অনেক দোয়াই বাতলে দিয়েছেন, কিন্তু সকল দোয়া তো স্মরণ থকে না। এমন এক সংক্ষিপ্ত দোয়া শিখিয়ে দিন, যা সকল দোয়াকে শামিল করে। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিম্নের এ দোয়া শিক্ষা দিলেন (তিরমিযী)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَئَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ (سَيِّدُنَا) مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

প্রভাত ও সন্ধ্যায় পড়ার দোয়া

(১) নিম্নের দোয়া তিন বার পড়বে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

উচ্চারণ ঃ (বিসমিল্লাহিল্লাজী লা-ইয়াদ্বুররু মাআ'ইসমিহী শাঈউন্ ফিল্ আর্দ্বী ওয়ালাফিছ্ছামাই ওয়া হুয়াচ্ছামীউল্ আলীমু)।

অর্থ ঃ ঐ আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাথে যার নামের সাথে কোন জিনিসই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। যমীনের মধ্যেও নয়, আবার আকাশের মধ্যেও নয় এবং তিনি (সবকিছু) শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

নিম্নের দোয়া তিন বার পড়বে

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

উচ্চারণ ঃ (আ'উজু বিকারীমাতিল্লা হিত্ত্বাম্মাতি মিন্ শার্‌রী মা খলাক্ব)

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণ বাক্যের আশ্রয় গ্রহণ করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ হতে।

(৩) সূরায়ে হাশরের আখেরী তিন আয়াতের আমল

হযরত মাআকেল বিন ইয়াছার (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে-ব্যক্তি সকাল বেলা প্রথমতঃ তিন বার 'আউযু বিল্লাহিছ্ছামী ইল্ আলী-মি মিনাশশাইত্বনির রাজীম' পড়িয়া অতঃপর সূরায়ে হাশরের আখেরী তিন আয়াত একবার পাঠ করে, আল্লাহ্পাক তাহার

জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করেন, যাহারা সেই সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার জন্য এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করতে থাকে। পরন্তু, ঐ দিনই যদি তাহার মৃত্যু হইয়া যায়, তা হলে সে শহীদের মর্তবা লাভ করে। অনুরূপ, কেহ যদি সন্ধ্যা বেলায় সেই একই নিয়মে উক্ত আমল করে, সেও একই ফযীলতের অধিকারী হইবে। অর্থাৎ সত্তর হাজার ফেরেশতা ঐ সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত তাহার জন্য এস্তেগফার করিতে থাকিবে এবং ঐ রাত্রেই যদি তাহার মৃত্যু হয় তবে সে শহীদের মর্তবা প্রাপ্ত হইবে।

(মেশকাত শরীফ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

আউযু বিল্লাহ সহ উক্ত আয়াতত্রয় নিম্নে উল্লেখিত হইল ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ (আ'উজু বিল্লাহিছ্ছামীইল আলীমী মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।)

অর্থ ঃ আমি বিতাড়িত শয়তান এর শংকাসমূহ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই, যিনি পরম শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ।

সূরায়ে হাশরের এবং আয়াতসমূহ অর্থাৎ "হুয়াল্লা-হুল্লাজী" পড়বে।

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ – هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ – هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

উচ্চারণ ঃ (হুয়াল্লা-হুল্লাজি লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া আ-লীমুল গাইবী ওয়াশশাহাদাতি হুয়ার রাহমানীর রাহীমী হওয়াল্লা-হুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহু আলমালীকুল কুদ্দুসুস সালামুল মোমীনুল মুহাইমীনুল আজীজুল জাব্বারুল মুতাকাব্বীরু সুবহানাল্লাহী আম্মা-ইউশরিকুনা হুওয়াল্লাহুল, খালিকূল বারিউল মুসাওউরুল্লাহুল আছমা-উল হুছনা ইউছাব্বীহু লাহু মা ফিছ্ছামাওয়াতী ওয়াল আরদ্বী ওয়াহুওয়াল আজীজুল হাকীমু)

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোন উপস্য নেই, তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন। তিনি পরম দয়ালু অসীমদাতা তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপস্য নেই, তিনিই একমাত্র মালিক, পবিত্র, শান্তি ও নিরাপত্তা দাতা, আশ্রয়দাতা, পরাক্রান্ত, প্রতাপশালী, মাহাত্ম্যশীল। তারা যাকে অংশীদার করে আল্লাহ তা'আলা তা থেকে- পবিত্র- তিনিই আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা, উদ্ভাবক,

রূপদাতা, উত্তম নামসমূহ তাঁরই নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবই তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রান্ত প্রজ্ঞাময়।

ফযীলত ঃ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) এর বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকালে তিন বার

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

(আউজুবিল্লা হিস্‌সামীইল আলীমী মিনাশ শাইত্বা-নীর রাজিমী) পাঠ করার পর সূরা হাশরের "হুওয়াল্লাহুল্লাজী" থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বশেষ তিন আয়াত পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন তার সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্যে রহমতের দোয়া করবে। সে দিন সে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে, সেও এই ফযীলত লাভ করবে।) (তিরমিযী)

(৪) বা (সকাল-সন্ধ্যায়) তিন বার সূরা ইখলাস ও তিন বার সূরা নাস পাঠ করবে।

ফযীলত ঃ (হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, একবার আমরা ঝড় বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারের এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তালাশে বের হলাম এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়! আমি বললাম, কি পড়ব? তিনি বললেন, তিন বার পড়বে "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ" কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক" ও "কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস" (শেষ পর্যন্ত)- যখন তুমি সকাল করবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যা করবে। ইহা প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।) (তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)

(৫) এর পর পড়বে।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ

উচ্চারণ ঃ (ফাসুব্‌হানাল্লাহি হীনা তুমছুনা তুছবীহুনা আলাহুল হামদু ফিছ্‌ছামা ওয়াতী ওয়ালআরদ্বী ওয়াআশিয়্যাঁও ওয়া হীনা তুজহীরুনা ইউখরিজুল হাইয়্যু মিনাল মায়্যিতি ওয়া ইউ খরীজুল মায়্যিতা মিনাল হাইয়্যি ওয়া ইউহয়িল আরদ্বা বা'দা মাউতিহা ওয়াকাজা লীকা তুখ রাজুনা)

অর্থ ঃ অতএব, তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সাকালে- এবং অপরাহ্নে, নাভোমন্ডলও ভুমন্ডলে তাঁরই প্রসংশা। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বহির্গত করেন, জীবিত থেকে মৃতকে বহির্গত করেন এবং ভূমির মৃত্যু পর তাকে পনুরুজ্জীবিত করেন। এভাবে তোমরা উত্থিত হবে।

(সূরা আররূম, আয়াত-১৭-১৯)

ফযীলত ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই আয়াত (অর্থাৎ উপরোক্ত আয়াত) পড়বে যখন সকালে উঠবে, সে লাভ করবে ঐদিনে যা তার ছুটে গিয়েছে। আর যে পড়বে উহা যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয় সে লাভ করবে যা তার ঐ রাতে ছুটে গিয়েছে। (আবুদাউদ শরীফ)

(৬) বা সকাল-সন্ধ্যায় শুধু নিম্নলিখিত "আয়াতুল কুরসী" পড়বে।

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ

উচ্চরণ ঃ আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু ওয়াল হাইউল্ ক্বাইউম লা তাখুজুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাওম লাহু মা ফিচ্ছামাওয়াতি ওয়া মা–ফিল আরদ্বি মান্ জাল্লাজী ইয়াশফাউ, ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহী ইয়া'লামু মা–বাইনা আইদীহিম্ ইল্লা বিমা–শা-আ ওয়াছিআ কুরসিয়্যুহুসাসামা– ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়ালা-ইয়াউদুহু হিফজুহুমা ওয়া হুয়াল আলিউল আমীম।

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক। তাঁর অনুমতি ছাড়া দৃষ্টির সামনে কিংবা পিছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তার জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোন কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান। (সূরা বাকারা আয়াত-২৫৫)

ফযীলত ঃ (এ আয়াতটি কোরআন কারীমের সর্ববৃহৎ আয়াত। হাদীসে এ আয়াতের অনেক ফযীলত ও বরকত বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে সবচাইতে উত্তম

আয়াত বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য এক হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোরআনের মধ্যে কোন আয়াতটি সবচাইতে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ? উবাই ইবনে কা'ব বললেন, তা হচ্ছে আয়াতুল কুরসী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা সমর্থন করে বলেলেন - হে আবুল মানযার! তোমাকে এ উত্তম জ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ।

নাসায়ী শরীফের এক বর্ণনাতে রয়েছে যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে লোক প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী নিয়মিত পাঠ করে, তার জন্য বেহেশতে প্রবেশের পথে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন অন্তরায় থাকে না। (অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে বেহেশতের ফলাফল এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করতে শুরু করবে)

(৭) আয়াতুল কুরসী এবং তারপর সূরায়ে মুমীনের এই আয়াত পড়বে

حٰمٓ - تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ - غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

উচ্চারণ ঃ (হা-মীম, তানজীলুল কিতাবী মিনাল্লাহিল আজীজীল্ আলীমি গাফিরিজজানবি ওয়াক্বাবীলীত তাওবী শাদীদিল ইক্বাবী জিত্বাওলী লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়া ইলাইহিল মাছীরু)।

অর্থ, হা-মীম, কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যিনি পরাক্রমশীল, সর্বজ্ঞ- পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তারই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।

(সূরা-আল-মূমীন-আয়াত ১-৪)

ফযীলত ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন। যে ব্যক্তি সকালে সূরা মু'মিন (অর্থাৎ সূরা গাফির) "ইলাই হিল মাছির" পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরছী পড়বে, ইহা দ্বারা তাকে হেফাজতে রাখা হবে সকাল পর্যন্ত। (তিরমিযী)

(৮) ভোর হওয়ার সাথে সাথে নিম্নের দোয়া পড়বে।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهٗ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ وَشَرِّمَا بَعْدَهٗ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ

مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِرَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبَرِ

উচ্চারণ ঃ (আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুল্‌কু লিল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লাহি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্‌ মুল্‌কু ওয়ালাহুল্‌ হাম্‌দু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইইন ক্বাদির। রাব্বি আস আলুকা খাইরা মাফি হাজালইয়াওমি ওয়া খাইরা মা-বা'দাহু ওয়া আউজুবিকা মিন শাররি মাফি হাজাল ইয়াওমি ওয়া শাররি মা-বা'দাহু রাব্বি আ'উজুবিকা মিনাল কাছলি ওয়াছুইল কিবরি রাব্বি আ'উজুবিকা মিন আজাবিন ফিন্নারি ওয়া আজাবিন ফিল ক্বাবরি)

অর্থ ঃ আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম এবং ভোর প্রবেশ করল। রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই শাসন, তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে প্রভু! আমি তোমার কাছে চাই এই দিনের মঙ্গল এবং যা কিছু এর পর আমার সামনে আসবে তার মঙ্গল। এবং আমি আশ্রয় চাই তোমার নিকট এই দিনের অমঙ্গল হতে, হে প্রভ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই দোজখের আজাব ও কবরের মধ্যে শাস্তি হতে।

(৯) (মুসলিম শরীফ)

(৯) অতঃপর এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبَرِ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল কাছলি ওয়াল হারামি ওয়াছুইল কিবারি ওয়া ফিতনা তিদ্‌দুনিয়া ওয়া আজা-বিল, ক্বাব্‌রি)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদ ও কবরের আজাব হতে। (মুসলিম শরীফ)

(১০) অথবা প্রভাত হওয়ার সাথে সাথে এই দোয়া পড়বে।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ وَفَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

উচ্চারণ ঃ (আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুল্‌কু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকা খাইরা হাজাল, ইয়াওমি ওয়াফতাহহু ওয়ানাসরাহু ওয়া বারাকাতুহু ওয়াহুদাহু ওয়া আ'উজুবিকা মিন্ শাররি মাফী'হি ওয়াশাররি মাবা'দাহু)

অর্থ, আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমি তোমার নিকট চাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। আল্লাহ আমি তোমার নিকট চাই, এই দিনের মঙ্গল-তার কামিয়াবী ও সাহায্য তার জ্যেতি ও তার বরকত ও তার হোদায়েত এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই তাতে যার থেকে অমঙ্গল রয়েছে তা হতে এবং তারপরে যে অমঙ্গল রয়েছে তা হতে। (আবু দাউদ শরীফ)

(১১) অথবা সকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ ঃ (আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ল-শারীকা লাহু লা ইলাহা ইল্লাহুওয়া ওয়া ইলাইহিন নুশুরু)

অর্থ, আমি এবং সমস্ত রাজ্য আল্লাহর উবাদতের জন্য সকাল করেছি এবং আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা তাঁর কোন শরীক নেই, তিনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই, তাঁর নিকট পুনরুত্থানের পর যেতে হবে। (বাযযার)

(১৩) অথবা সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهٖ وَاَنْ نَّقْتَرِفَ عَلٰى اَنْفُسِنَا سُوْءًا اَوْ نَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা ফাতিরিস্‌সামা ওয়াতি ওয়াল আরদ্বি আলিমিল গাইবি ওয়াশ্‌শাহা-দাতি রাব্বা কুল্লি শাইউন ওয়া মালীকাহু আশহাদু আন্নি লা-ইলাহা ইল্লা আনতা আ'উজুবিকা মিন শাররি নাফসী ওয়া শাররিশ শায়তানি ওয়া শিরকিহি ওয়া আন নাক্বতারিফা আ'লা আনফুসিনা সুআন আও নাজুররাহু ইলা মুসলিমিন।

অর্থ, হে আল্লাহ! আকাশ সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকারী, সকল অদৃশ্য ও দৃশ্য বিষয়ের জ্ঞাত। সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও মালিক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি

নফসের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে এবং শয়তানের (প্রতারণা ও ধোকার) ফাঁদ থেকে (আপনি আমাকে বাঁচিয়ে নিন এবং ইহা থেকে আশ্রয় চাইতেছি।) যে আমরা আপন নফসের উপর কোন ক্ষতি করি, বা অপর মুসলমানের উপর অপবাদ আরোপ করি।

(আবু দাউদ শরীফ ও তিরমীযী শরীফ)

ফযীলত ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত দোয়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সকাল-সন্ধ্যা পড়ার জন্য বলেছেন।

(১৪) সকাল সন্ধ্যায় চার বার এই দোয়া পড়বে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَ ئِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা আরাশিকা ওয়া মালা ইকাতিকা ওয়া জামীয়া খালকিকা বিআন্নাকা আনতাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি সকাল করেছি, আমি আপনাকে সাক্ষী করছি এবং আপনার আরশ বহনকারী ফেরশতাদেরকে, এবং আপনার সকল ফেরেশতাদেরকে, এবং আপনার সমস্ত সৃষ্ট জীবকে সাক্ষী করছি একথার উপর যে, আপনি আল্লাহ, আপনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং এ কাথার উপর যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দাহ এবং আপনার (প্রেরিত) রাসূল। (ত্বাবরানী আল আওছাত্ব)

(১৫) সকাল-সন্ধ্যায় চার বার এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَصْبَحْتُ اُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتِكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা ইন্নি আসবাহতু উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামলাতা আরশিকা ওয়া মালাইকাতিকা ওয়া জামীআ খালক্বিকা ইন্নাকা আনতা আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহদাকা লাশারীকা লাকা ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুকা ওয়ারাসূলুকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি প্রভাত করেছি, আমি আপনাকে সাক্ষী করছি এবং আপনার আরশ বহনকারীদেরকে এবং (সকল) ফেরেশতাদেরকে এবং আপনার সকল সৃষ্ট জীবকে সাক্ষী করছি একথার উপর যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযোগী নেই, আপনি (স্বীয় সত্বা ও গুণাবলীতে) উপমাহীন ও একাকী, আপনার কোন শরীক নেই এবং একথার উপর যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা এবং আপনার প্রেরিত পয়গাম্বর। (আবু দাউদ শরীফ)

(১৫) (১৬) এই দোয়াও সকাল সন্ধ্যায় পড়া উচিত।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِىْ وَاٰمِنْ رَوْعَتِىْ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِىْ وَمِنْ فَوْقِىْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আস আলুকাল আফিয়াতা ফীদদুনীয়া ওয়াল আখিরাতি আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দিনী ওয়া দুনিয়ায়া ওয়া আহলী ওয়া মালী আল্লাহুম্মাসতুর আওরাতী ওয়া আ-মিন রাওআতী আল্লাহুম্মাহফিজনী মিন বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়ামিন খালফী ওয়া আইয়ামিনী ওয়া আন শিমালী ওয়া মিন ফাওকী ওয়া আউজু বিআজমাতিকা আন উগতালা মিন তাহতী)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাত (উভয়ের) মধ্যে ভাল ও সুস্থতার প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ ! আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং নিজ দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে, নিজ ছেলে সন্তান, পরিবার-পরিজন ও ধন; সম্পদের মধ্যে নিরাপত্তা চাই, হে আল্লাহ ! আপনি আমার হেফাজত করুন আমার সামনের দিক থেকেও এবং পিছনের দিক থেকেও এবং আমার ডান দিক থেকেও এবং আমার বাম দিক থেকেও এবং আমার উপরের দিক থেকেও এবং আমার বাম দিক থেকেও এবং আমার উপরের দিক থেকেও এবং আমি আপনার বৃহত্তর আশ্রয় নিচ্ছি ইহা থেকে যে, আমাকে কোন আকস্মিক ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা হউক নীচের দিক থকে। (আবু দাউদ শরীফ)

(১৭) অথবা সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে।

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَايَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহয়ী ওয়াইউমীতু ওয়াহুয়া হায়য়ুল লা- ইয়ামুতু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লী শায়য়িন ক্বাদীরুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই, তারই সমস্ত রাজ্য এবং তার জন্যেই সকল প্রশংসা তিনিই জীবিত রাখেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন এবং তিনি স্বয়ং জীবিত যাঁর মৃত্যু নেই এবং সকল বস্তুর উপর তিনিই ক্ষমতাবান। (আবু দাউদ শরীফ)

(১৮) এ দোয়া ও সকাল- সন্ধ্যায় তিন তিন বার করে পড়া অত্যন্ত জরুরী।

رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

উচ্চারণ ঃ রাদ্বিনা বিল্লাহি রাববাওয়া বিল ইসলামি দীনাওঁ-ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবিয়্যান) (মুসনাদে আহমদ)

অর্থ ঃ আমরা আল্লাহকে আমার প্রভূ, এবং ইসলামকে স্বীয় দ্বীন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বীয় নবী মেনে নিয়েছি এবং আমি এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি।

ফযীলত ঃ হাদীস ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে এই দোয়াটি পড়বে, আল্লাহ তা'আলার উপর ঐ ব্যক্তির হক যে, তিনি তাকে কেয়ামতের দিন সন্তুষ্ট ও খুশী করে দেবেন।

১৯। অর্থ ঃ বা তিনবার সকাল-সন্ধ্যায় নিম্নের দোয়া পড়বে।

رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا

উচ্চারণ ঃ রাদীতু বিল্লাহি রাববাওঁ ওয়া বিল ইসলামি দিনাও ওয়া বি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবিয়্যান)।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহকে আমার প্রভু, এবং ইসলামকে নিজ দ্বীন, এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ নবী মেনে নিয়েছি এবং আমি এর উপর সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

২০। সাকাল-সন্ধ্যায় এই দোয়াও পড়া।

اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِىْ مِنْ نِعْمَةٍ اَوْبِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা মাআসবাহা লী মিন নিয়ামাতিন আও বিআহাদিমমিন খালক্বিকা ফামিনকা ওয়াহ্দকা লা-শারীকা লাকা ফালাকালহামদু ওয়ালাকাশ শুকরু)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে কোন নেয়ামত আমি বা আপনার কোন সৃষ্ট জীব আজ প্রভাতে পেয়েছি তা একমাত্র আপনার পক্ষ থেকেই দেয়া, আপনি উপমাহীন ও একক, আপনার কোন শরীক নেই, অতএব আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং আপনারই কৃতজ্ঞতা। (আবু দাউদ শরীফ)

(১৯) ২১। সাকল-সন্ধ্যায় তিন তিনবার এ দোয়াও পড়বে।

اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আ'ফিনী ফিবা'দানী আল্লাহুম্মা আ'ফিনী সাময়ি আল্লাহুম্মা আফিনী ফিবাসরী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে শারীরিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন, যে আল্লাহ ! আপনি আমার শ্রবণ শক্তিতে সুস্থতা ও শান্তি দান করুন, হে আল্লাহ আপনি আমার দৃষ্টি শক্তিতে সুস্থতা ও শান্তি দান করুন, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। (আবু দাউদ শরীপ)

(২০) ২২। এরপর তিন বার করে এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উজু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাক্বরি আল্লহুম্মা ইন্নী আ'উজুবিকা; মিন আযাবিল ক্বাবলে লা-ইলাহা ইল্লা আনতা)

অর্থ হে আল্লাহ; আমি কুফরী ও দরিদ্রতা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইতেছি। হে আল্লাহ ! আমি কবরের আযাব থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাইতেছি। আপনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই। (আবু দাউদ শরীফ)

২৩। বা সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়া উচিত। (২০)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ لَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ لَمْ يَشَأْلَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْاَحَاطَ بِكُلِّ شَيْئٍ عِلْمًا

উচ্চারণ ঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী লাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি মা-শা-আল্লাহ কানা লাম্ইয়া আ'শা লাম্ ইয়াকুন্ আ'লাম্ আন্নাল্লাহা আলা-কুল্লি শায়্য়িন কাদীরুন্ ওয়া আন্নাল্লাহা ক্বাদ আহাত্বা বিকুল্লি শায়ইন ইলমান)

অর্থ ঃ আল্লাহ (সকল প্রকার মন্দ থেকে) পবিত্র এবং তার জন্যই প্রশংসা, শক্তি ও ক্ষমতা তাঁর জন্যই, (তাই) আল্লাহ তা'আলা যা চেয়েছেন হয়েছে, আর যা চাননি তা হয়নি, আমি বিশ্বাস করি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান, এবং নিশ্চয়ই তার ইলম সকল বস্তুকে বেষ্টনকারী। (আবু দাউদ শরীফ)

(২৯)

اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَعَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى مِلَّةِ اَبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আসবাহনা আলা ফিত্বরাতিল ইসলামি ওয়া কালিমাতিল ইখলাসি ওয়া আলা দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা দীনি নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা-মিললাতি আবীনা ইবরাহীমা হানীফান মুসলিমান ওয়া মা-কানা মিনাল মুশরিকীনা)

অর্থ ঃ আমরা প্রভাত করেছি ইসলামের স্বভাবের উপর, ও ইসলামের কালেমার উপর এবং আমাদের নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্মের উপর ও আমাদের আদী পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর দ্বীনের উপর, যিনি তাওহীদের বিশ্বাসী ও মুসলমান ছিলেন, শিরিককারীদের দলভুক্ত তিনি ছিলেন না। (নাসাঈ শরীফ)

২৯। সকালবেলা এ দোয়া পড়া উচিত। কোন কোন হাদীসে সকাল-সন্ধ্যা উভয় সময় পড়তে বরা হয়েছে।

(২২)

يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اَصْلِحْ لِىْ شَأْنِىْ كُلَّهٗ وَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণ ঃ ইয়া-হায়য়্যু ইয়া-ক্বায়্যুম বিরাহমাতিকা আসতাগিছু আসলিহলী শা'নী কুল্লাহু ওয়ালাতাকিলানী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইনিন)

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বের ধারক। আমি প্রার্থনা করছি আপনার রহমতের ভিক্ষা চেয়ে, আপনি আমার সকল অবস্থাদী সংশোধন করেছেন, এবং এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার আত্মার দিকে অর্পণ করবেন না।

(নাসাঈ শরীফ)

ফযীলত ঃ মসিবতের সময় সেজদায় পড়ে এই দোয়াটি পড়া বড়ই কার্যকরী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় সেজদায় পড়ে এ দোয়াই পড়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা জয়লাভ করান।

৩০। প্রভাতে এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা রাববী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনা-আবদুকা ওয়া আনা-আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়াআদিকা মাছতাত্বা'তু আবূউ লাকা বিনিমা'তিকা আলায়য়্যা ওয়া আবূউ বিজামঁবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুজ জুনুবা ইল্লা আনতা আ'উজু বিকা মিন শাররি মা ছানা'তু)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনিই প্রভু, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা এবং আমি আপনার সাথে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির উপর যথা সম্ভব স্থির রয়েছি, আমি স্বীকার করতেছি আমার উপর আপনার যে কোন নেয়ামতের এবং আমি স্বীকার করতেছি আমার গুনাহের। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, কেননা, আপনি ব্যতীত কেউ গুনাহ সমূহ ক্ষমা করতে পারবে না। আমি আমার সকল প্রকার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করতেছি, (আপনি আমাকে বাঁচিয়ে নেন। (বোখারী শরীফ)

৩১। বা এই দোয়া প্রভাতে পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ اِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চরণ ঃ (আল্লাহুম্মা আনতা রাব্বি লা- ইলাহা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী ওয়া আনা আবুদকা ওয়া আনা আলা আহদিকা ওয়া ওয়াআদিকা মাসতত্বা'তু আ'উজুবিকা মিন শাররি মা ছানা'তু আবুউ বিনিমাতিকা আলায়য়্যা ওয়া আবূউ বিজামবী ফাগফিরলী ইন্নাহু লা- ইয়া গাফিরুজজুনুবা ইল্লা আনাতা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আপনিই আমার প্রভু। আপনি ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই, আপনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনারই বান্দাহ,

আমি যথাসম্ভব আপনার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির উপর স্থির রয়েছি। আমি আমার কৃত কর্মের মন্দ থেকে আপনার আশ্রয় চাইতেছি, আমার উপর আপনার যত নেয়ামত সমূহ আছে তার আমি স্বীকার করি এবং স্বীয় গুনাহ সমূহের ও স্বীকার করি, অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করে দেন, কারণ নিশ্চয় আপনি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারে না। (আবু দাউদ শরীফ)

৩২। সকাল-সন্ধ্যায় এ দোয়াটিও পড়া উচিত।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اَحَقُّ مَنْ ذُكِرَ وَاَحَقُّ مَنْ عُبِدَ، وَاَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِىَ وَاَرْأَفُ مَنْ مُلِكَ وَاَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ وَاَوْسَعُ مَنْ اُعْطِىَ اَنْتَ الْمَلِكُ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَالْفَرْدُ لَانِدَّلَكَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَكَ لَنْ نُطَاعَ اِلَّا بِاِذْنِكَ، وَلَنْ تُعْصٰى اِلَّا بِعِلْمِكَ تُطَاعُ فَتَشْكُرُ وَتُعْصٰى فَتَغْفِرُ وَاَقْرَبُ شَهِيْدٍ، وَاَدْنٰى حَفِيْظٍ، حُلْتَ دُوْنَ النُّفُوْسِ وَاَخَذْتَ بِالنَّوَاصِىْ وَكَتَبْتَ الْاٰثَارَ وَنَسَخْتَ الْاٰجَالَ، اَلْقُلُوْبُ لَكَ مُفْضِيَةٌ وَالسِّرُّ عِنْدَكَ عَلَانِيَّةٌ اَلْحَلَالُ مَا اَحْلَلْتَ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمْتَ وَالدِّيْنُ مَاشَرَعْتَ وَالْاَمْرُ مَا قَضَيْتَ ، وَالْخَلْقُ خَلْقُكَ اَلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَاَنْتَ اللّٰهُ الرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ ، اَسْئَلُكَ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِىْ اَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَلَكَ ، بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ، اَنْ تُقِيْلَنِىْ فِىْ هٰذِهِ الْغَدَاةِ اَوْفِىْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ وَاَنْ تُجِيْرَنِىْ مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা আহাক্কু মানযুকিরা ওয়া আহক্কু মানউবিদা ওয়া আনছারু মানিবতুগিয়া ওয়া আর আফু মাম্মালাকা ওয়া আজওয়াদু মান ছুঈলা ওয়া আওছাউমান আ'আত্বা আনতাল মালিকু। লা-শারীকা লাকা ওয়াল ফারদু লানিদ্দা লাকা কুল্লু শায়ইন হালিকুন ইল্লা ওয়াজহাকা লান নুত্বা'আ ইল্লা বিইজ নিকা ওয়ালা তু'আছা ইল্লা বিইলমিকা তুত্বাউ' ফাতাশকুরু তা'আছ ফাতাগফিরু আকরাবু শাহিদিন ওয়া আদনা হাফিজিন হুলতাদু'নান নুফুছি ওয়া আখাজতা বিন নাওয়াসি ওয়া কাতাবতালআছারা ওয়া নাছাখতালআজালা আলকুলূবু লাকা মুফজিয়্যাতুন ওয়াসসিররু ইনদাকা আলা-নিয়াতুল আলহালালু মা-আহালাল্তা ওয়াল হারামু মা-হাররামতা ওয়দদিনু মা শারা'তা ওয়াল আমরু মা- কাজায়তা ওয়াল খালকু খালক্বকা ওয়াল আবদু আবুদকা ওয়ানতাল্লাহুর

রাউফুর রাহীমু আসআলুকা বিনূরি ওয়াজহিকা আল্লাজী আশরাক্বতা লাহুচ্ছামা-ওয়াতু ওয়াল আরদু ওয়া বিকুল্লি হাক্বক্বিন হুওয়া লাকা ওয়াবি হাক্বাক্বিছ ছায়িলীন আলাইকা আন তুক্বিলানী ফী হাজিহিল গাদাতি আওফী হা-জিহিল আশিয়্যাতি ওয়া আন তুজীরানী মিননা নারি বিকুদরাতিকা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যাদেরকে স্মরণ করা হয় তাদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে বেশি স্মরণযোগ্য এবং যাদের ইবাদত করা যায় তাদের মধ্যে বেশি আপনি সবচেয়ে বেশি ইবাদতের উপযুক্ত এবং আপনি তাদের মধ্যে বেশি সাহায্যকারী- যাদের থেকে সাহায্য অনুসন্ধান করা যায় এবং আপনি সকল মালিক থেকে বেশি দয়াকারী এবং আপনি তাদের মধ্যে বেশি দানশীল- যাদের কাছে প্রার্থনা করা যায় এবং যারা দান করে আপনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানকারী। আপনি সকলের বাদশাহ। আপনার কোন শরীক নেই। আপনি একক তুলনাহীন। আপনার সত্বা ব্যতীত প্রত্যেক বস্তু ধ্বংসশীল। আপনার আদেশ ব্যতীত আপনার অনুসরণ করা যায় না এবং আপনার অজান্তে কোন গুনাহ করা যায় না অর্থাৎ আপনি সকল গুনাহ সম্পর্কে অবগত, আপনার আনুগত্য করা হলে আপনি তার সম্মান করেন এবং আপনার নাফরমানী করা হলে তাকে ক্ষমা করে দেন। আপনি সবচেয়ে বেশি নিকটতম পাহারাদার এবং সকলের আত্মাসমূহ আপনার অধীনে, সকল সৃষ্টজীব আপনারই নিয়ন্ত্রণে। সকলের আমলসমূহ এবং কাজসমূহ আপনি লিখে দিয়েছেন এবং সকালের মৃত্যুও আপনি লিপিবদ্ধ করেছেন, সবার অন্তর আপনার সামনে খোলা এবং (সকল) গোপন আপনার কাছে প্রকাশ্য, যা আপনি হালাল করেছেন তাই হালাল, আর যা আপনি হারাম করেছেন তাই হারাম, আর দ্বীন উহাই যা, আপনি স্থিরকৃত করেছেন, আর হুকুম উহাই যা আপনি হুকুম করেছেন। সকল সৃষ্টজীব আপনারই সৃষ্টি, সকল বান্দা আপনারই বান্দা, আপনিই মেহেরবান ও দয়ালু আল্লাহ, আমি আপনার সত্বার ঐ নূরের দ্বারা যার দ্বারা আকাশ ও যমীন অলোকিত এবং প্রত্যেকটি হক যা আপনার জন্য এবং প্রত্যেক ঐ হকের দ্বারা যা প্রার্থনাকারীদের আপনার উপর, আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি এই প্রর্থনাকারীদের আপনার উপর, আপনার কাছে প্রর্থনা করি যে, আপনি এই প্রভাতে বা এই সন্ধ্যায় আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আপনি নিজ পূর্ণ ক্ষমতায় আমাকে জহান্নাম তথা দোযখ থেকে নাজাত দিয়ে দেন। (ত্বাবরানী আল কাবীর)

বিঃদ্রঃ উপরোক্ত দোয়াটি সকালে পড়লে فِىْ هٰذِهِ الْغَدَاةِ (ফি হাজিহীল গাদাতি) পড়বে, আর সন্ধ্যায় পড়লে فِىْ هٰذِهِ الْعَشِيَّةِ (ফি হাজিহীল, আশিয়্যাতি) পড়বে।

৩৩। দৈনিক সকাল-সন্ধ্যায় সাতবার করে এ দোয়া পড়বে। (২৪)

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ (হাসবি আল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহুয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আজীম)

অর্থ ঃ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট তিনি ব্যতিত আর কারো উপাসনা নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি। (ইবনে সুন্নী)

ফযীলত ঃ যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ৭ বার করে এই দোয়াটি পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল পেরেশানী থেকে বাঁচাবেন।

শুধু প্রভাতে পড়ার দোয়া সমূহ

১। শধু প্রভাতে এই দোয়া পড়বে।

اَصْبَحْنَا وَاَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْكِبْرِيَاءُ وَالْعَظْمَةُ وَالْخَلْقُ وَالْاَمْرُ وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا يُضْحٰى فِيْهَا لِلّٰهِ وَحْدَهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوَّلَ هٰذَا النَّهَارِ صَلَاحًا وَاَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَاٰخِرَهُ نَجَاحًا اَسْئَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আসবাহনা ওয়া আসবাহাল মুলকু লিল্লাহ ওয়াল কিবরিয়ায়ু ওয়াল আ'জমাতু ওয়াল খালক্ব ওয়াল আমরু ওয়াল লাইলু ওয়ান নাহারু ওয়া মা-উয়াজহা ফীহিমা লিল্লাহি ওয়াহাদাহু আল্লাহুম্মাজআল আউয়ালা হাজান্নাহরি সালাহাও ওয়া আওসাতাহু ফালাহাও ওয়া আখিরাহু নাজাহান আসআলুকা খায়রাদ্‌দুনইয়া ওয়াল আখিরাতি ইয়া আরহামার রাহিমীন)

অর্থ ঃ আমরা প্রভাত করেছি এবং রাজত্ব প্রভাত করেছে আল্লাহর (ইবাদতের) জন্য, আর সমস্ত বড়ত্ব ও বুযর্গী, সৃষ্টি, উদ্ভাবন, রাত দিন এবং যা কিছু এ উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ রাত-দিনের মধ্যে প্রকাশিত হয় এ সব এক আল্লাহর জন্যই। হে আল্লাহ! আজকের প্রথম ভাগকে আমার জন্য ভালোর কারণ এবং মধ্যভাগকে সফলতার কারণ আর শেষ ভাগকে লাভের কারণ করুন। আমি প্রর্থনা করছি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গলের। হে আরহামার রাহিমীন তথা সবচেয়ে বেশি রহমকারী আল্লাহ। (মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা)

তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য দোয়া

১। যখন শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে উঠবে তখন এই দোয়া পড়বেঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُالسَّمٰوٰتِ وَا لْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُحَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ

اَنْتَ رَبُّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّيْ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اَنْتَ اللّٰهُ لَااِلٰهَ اِلَّااَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা কায়্যুমুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফী হিন্না ওয়ালাকাল হামদু আনতা মালিকুস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ালা কাল হামদু আনতা নুরুচ্ছামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফী হিন্না ওয়ালাকাল হামদু আনতাল হাক্কু ওয়া ওয়াআদুকাল হাক্কু ওয়ালিকা- উকা হাক্কু ওয়া কাওলুকা হাক্কু ওয়াল জান্নাতু হাক্কু ওয়ান নারু হাক্কুন ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্কুন ওয়ামুহাম্মাদুন হাক্কু ওয়াল জান্নাতু হাক্কু ওয়্যাননারু হাক্কুন ওয়ান নাবিয়্যুনা হাক্কুন ওয়া মুহাম্মাদুন হাক্কুন ওয়াচ্ছাআতু হাক্কুন আল্লাহুমা লাকা-আনতু ওয়া বিকা খাসামতু ওয়া ইলাইকা হাকামতু

আনতা রব্বুনা ওয়াইলাইকাল মাছিরু ফাগফীরলী মা কাদ্দামতু ওয়ামা আখখরাতু ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আনতা আলামু বিহি মিননী আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়াআনতাল মুআখখিরু আনতা ইলাহী লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়লা হাওলা ওলা কুওয়াত্বা ইল্লা বিল্লহি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমারই জন্য প্রসংশা, তুমিই আসমান সমূহ ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের রক্ষা কারী। তোমরই জন্য প্রশংসা তুমিই আসমান সমূহ ও যমীন এবং ইহাদের মধ্যে যা আছে তাদের বাদশাহ। তোমার জন্য প্রসংশা, তুমিই আসমান সমুহ ও যমীন এবং উহাদের মধ্যে যা, আছে তাদের নূর (আলো) তোমারই জন্য প্রশংসা তুমিই সত্য, তোমার ওয়াদা

সত্য, (পরকালে) তোমার সাক্ষাত সত্য, তোমার বাণী সত্য এবং বেহেশত সত্য, দোযখ সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্য এবং কেয়ামত সত্য, হে আল্লাহ! আমি তোমারই কাছে আত্মসমর্পণ করেছি তোমারই উপর ভরসা করেছি তোমারই প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি, এবং তোমারই কাছে বিচার প্রার্থনা করতেছি, তুমি আমাদের প্রভু, তোমারই কাছে প্রত্যাবর্তন করব অতএব আমাকে ক্ষমা কর যা, আমি পূর্বে করেছি এবং যা আমি পরে করেছি, যা আমি গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আমি করেছি বলে তুমি জান (অথচ আমি জানিনা) তুমিই (কাউকেও বা কিছুকেও) অগ্রগামী কর এবং তুমিই পশ্চাৎগামী কর। তুমি আমার প্রভু! তুমি ছাড়া উপাস্য নেই, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার কোন শক্তি ও সামর্থ নেই। (আবী আওয়ানা, বুখারী, মুসলিম প্রমুখ)

দোয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَوَنَشْكُرُكَ وَلَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ ঃ আল্লহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগ ফিরুকা ওয়ানু মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়া নুছনী আলাইকাল খাইরা, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরাকা, ওয়া নাখলাউ ওয়া নাতরুকু মাইয়্যাফজুরুকা আল্লহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুছাল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাসআ ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজু রাহমাতাকা ওয়া নাখশা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল কুফফারি মুলহিক্ব।

অর্থ ঃ হে খোদা! নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট সাহায্য চাই, তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করি, তোমার উপর ভরসা করি, তোমার সৎ প্রশংসা করি, তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমরা তোমার না শোকরী করি না এবং যাহারা তোমার অবাধ্য হয় আমরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করি, তাহাদের সহিত সম্পর্ক কর্তন করি। হে খোদা! আমরা কেবল তোমারই এবাদত করি, কেবল তোমারই জন্য নামায পড়ি, তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি, তোমার নিকট পৌছার চেষ্টা করি তোমাকে মান্য করি, তোমার

রহমত পাইতে আশা করি, তোমার আযাবকে মান্য করি, তোমার রহমত পাইতে আশা করি, তোমার আযাবকে ভয় করি- নিশ্চয়ই তোমার আযাব কাফীরদের জন্য নির্ধারিত।

জানাযা নামাযের দোয়া

'আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জানাযা নামায পড়লেন আমি তার জানাযা পড়ানো স্মরণ রাখলাম। উক্ত জানাযা নামাযে তিনি বলেছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ وَارْحَمْهُ وَعَافِهٖ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهٗ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهٗ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهٖ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهٖ وَاَهْلًا خَيْرًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَزَوْجًا خَيْرًا مِّنْ زَوْجِهٖ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

"হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করে দাও। তাকে তোমার রাহমতের ছায়াতলে স্থান দাও। তাকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, তাকে সম্মানের সাথে গ্রহণ কর। তার ঠিকানাকে (কবর) প্রশস্ত করে দাও। তাকে পানি, বরফ ও তুষারে গোসল করিয়ে গুনাহ থেকে এমনভাবে পাক ও পরিচ্ছন্ন করে দাও যেভাবে কাপড় ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়। তাকে দুনিয়ার ঘরের চাইতে উত্তম ঘর; দুনিয়ার অত্মীয়-স্বজনের চাইতে উত্তম আত্মীয়-স্বজন এবং দুনিয়ার জীবন-সঙ্গিনীর চাইতে উত্তম জীবনসঙ্গিনী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব থেকে আশ্রয় দান কর।

'আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন ঃ এ দোয়া শুনে আমি বললাম ঃ "আহ! এটা যদি আমার জানাযা হতো এবং রাসূল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের এ দোয়া আমার ভাগ্যে জুটতো"। কোন কোন বর্ণনাতে শেষের কথাগুলো এভাবে বর্ণিত হছে وَقِهٖ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ (তাকে কবর এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর)

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক জানাযা পড়লেন এবং এভাবে দোয়া করলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى

الْاِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ ـاَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

"হে আল্লাহ, আমাদের জীবিত ও মৃত, আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিত, আমাদের ছোট ও বড় এবং আমাদের নারী ও পুরুষ সবাইকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্য থেকে যাকে তুমি জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের ওপর জীবিত রাখ এবং যাকে মৃত্যু দান করবে তাকে ঈমানের ওপর মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ, তার সওয়াব থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না এবং পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।"

আযানের দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدِنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহি দ্বা ওয়াত্তিম্মাতি ওয়াছচ্ছালাতিল কাইমা, আতি মুহাম্মাদা নিল ওয়াসিলাতা, ওয়াল ফাদ্বিলাহ ওয়াবআসহু মাকামামমাহমুদা নিল্লাজি ওয়াআদতাহু, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মিআদ)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এ পূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের প্রভু! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অসিলা ও মর্যাদা দান করুন এবং পৌছান তাঁকে মাকামে মাহমুদে, যার ওয়াদা আপনি করেছেন, নিশ্চয় আপনার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় না। (বোখারী, আবু দাউদ)

হিদায়াত লাভের দোয়া সমূহঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল হুদা ওয়াত্তাক্বা ওয়াল আ'ফাফা ওয়াল গিনা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা নিশ্চই আপনার নিকট হিদায়াত চাই, তাক্বওয়া চাই, জীবনের সমুদয় কৃত পাপের জন্য

ক্ষমা চাই এবং প্রাচুর্য চাই।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هُدَاةً مُّهْدِيِّيْنَ وَلَا ضَالِّيْنَ وَلَا مُضِلِّيْنَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আলনা হুদাতাম মাহদীয়্যীনা ওয়ালা-দ্বীল্লীনা ওয়ালা-মুদ্বীল্লীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে হেদায়াত প্রাপ্তদের দলভুক্ত করুন এবং যে সমস্ত লোকের উছিলায় অন্য লোকও হোদায়েত প্রাপ্ত হয় আমাদেরকে সে সমস্ত লোকদের দলভুক্ত করুন। যারা স্বয়ং নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং যাদের কারণে অন্য লোকও পথভষ্ট হয় আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত কখনও করবেন না।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا وَاهْدِالنَّاسَ جَمِيْعًا وَاجْعَلْنَا سَبَبًا لِّمَنِ اهْتَدٰى

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইহ্দিনা ওয়া আহ্দিবিনা-ওয়াহ্দিন্নাছা জামীয়াওঁ ওয়াজ আলনা-সাবাবানা লিমানিহ তাদা। (আবু দাউদ)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে হিদায়েত দান করুন এবং আমাদের উছিলায় অন্যদেরকেও হিদায়েত দান করুন এবং গোটা মানব জাতিকে হিদায়েত দান করুন এবং যাদেরকে আপনি হিদায়েত দান করবেন তাদের হিাদায়েতের জন্য আপনি আমাদেরকে মাধ্যম বানান, উছিলা বানান।

اَللّٰهُمَّ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰئِكَ رَفِيْقًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম সিরাত্বাল লাজীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম মিনান নাবয়্যীনা ওয়াস সিদ্দীক্বীনা ওয়াশ শুহাদা-য়ি ওয়াস সালিহীনা ওয়া হাসুনা উলাইকা রাফীক্বা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সহজ-সরল সঠিক পথ (সিরাতাল মুস্তাক্বীম) প্রদর্শন করুন। ঐ সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে আপনি পুরস্কার দান করেছেন। অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও নেককারগণ (সালিহীন) তাঁরা কতই না উত্তম সাথী, উত্তম বন্ধু।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী ওয়া আহদিনী ওয়ার ঝুক্বনী ওয়া আ-ফিনী।

(আবু দাউদ)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমাকে হোদয়েত দান কর, আমাকে রিযিক প্রদান করা এবং আমাকে শান্তি ও স্বস্তি দান কর।

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইহদিনী ওয়া সাদ্দিদনী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়াত কর এবং সোজা করে দাও।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আ-ফিয়াতা ফিদদুনইয়া ওয়াল আখিরাতি।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা, শান্তি ও স্বস্তি কামনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লহুম্মাগ ফিরলী ওয়া আহদিনী ওয়ার ঝুক্বনী ওয়া আ-ফিনী। (আবু দাউদ)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমাকে হোদয়েত দান কর, আমাকে রিযিক প্রদান কর এবং আমাকে শান্তি ও স্বস্তি দান কর।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَمَا لِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আ-ফিয়াত ফী-দ্বীনী ওয়া দুনইয়ায়ী ওয়া আহলী ওয়া মালী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার দ্বীন-দুনিয়া, পবিার-পরিজন এবং আমার ধন-সম্পদের ব্যাপারে তোমার কাছে ক্ষমা, নিরাপত্তা ও স্বস্তি কামনা করছি।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَاَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলানা- ওয়ারহামনা- ওয়া আরদ্বী আ'ননা-ওয়া তাক্বাব্বাল মিন্না-আদখিলনাল জান্নাতা ওয়া নাজজিনা মিনান্নার ওয়া আসলিহ লানা-শা'নানা কুল্লাহু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাও, আমদের প্রতি দয়া কর, আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও, আমাদের ইবাদত বন্দেগী কবুল কর, আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দাও এবং আমদের সকল কাজ সঠিক করে দাও।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মা-ক্বাদ্দামতু ওয়ামা-আসরারতু ওয়ামা-আ'লানতু ওয়ামা-আসরাফতু ওয়ামা-আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী লা-ইলাহা ইল্লা-আনতা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার সেই গুনাহ সমূহ মাফ করে দাও, যেগুলো আমি পূর্বে করেছি, পরে করেছি, গোপনে করেছি, প্রকাশ্যে করেছি এবং যা কিছু বাড়া-বাড়ি করেছি, আর সে সব গুনাহও মাফ করে দাও যে সম্পর্কে তুমি আমার চেয়ে বেশী ভাল জান। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ اَمَلِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা মাগফিরাতাকা আওসাউ মিন জুনূবী ওয়া রাহমাতুকা আরজা ইনদী মিন আ'মালী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার ক্ষমা (মাগফিরাত) আমার গুনাহর তুলনায় অনেক বিস্তৃত এবং আমার আমলের চেয়ে তোমার রহমত প্রত্যাশা অনেক বেশী।

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আ'ফয়ূন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ হে আল্লহ! তুমি ক্ষমাকারী, তুমি ক্ষমা করা পছন্দ কর। অতএব আমায় ক্ষমা করে দাও। (এই দোয়াটি ক্বদরের রাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)- কে শিখিয়ে ছিলেন)।

মুসাফাহার দোয়া

يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ

উচ্চারণ ঃ ইয়াগফিরুল্লাহু লানা- ওয়া লাকুম।

অর্থ ঃ আল্লাহ আমাদের ও আপনাদেরকে ক্ষমা করুন।

কোলা-কুলি করার সময় পঠিত দোয়া

اَللّٰهُمَّ زِدْ مَحَبَّتِىْ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা যিদ মুহাব্বাতী লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার ভালবাসা আল্লাহ ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্য আরো বাড়িয়ে দাও।

✻ খানা বিষয়ক দোয়া সমূহ

খানা সামনে আসলে এই দোয়া পড়বে

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফী-মা রাযাকতানা ওয়াক্বিনা আজাবান্নার। (সুনানে আবু দাউদ)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য তোমার দেয়া রুযিতে বরকত দাও ও দোজখের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

খানার শুরুতে বলবে

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে বরকত চাহিয়া শুরু করলাম।

খানার শেষে বলবে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী আত্বআমানা-ওয়া সাক্বানা ওয়া জা'লানা-মিনাল মুসলিমীন।

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমাদিগকে খাওয়াইলেন ও পান করাইলেন এবং মুসলমান বানাইলেন।

খানা পাত্রে নেয়ার সময় এই দোয়া পড়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا خَيْرًا مِّنْهُ

উচ্চারণ ঃ আল্লহুম্মা বা-রিকলানা ফীহি ওয়া যিদনা-খাইরাম মিনহু।

(আবু দাউদ, তিরমিযী)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি এর মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং এর চেয়ে আরও ভাল খাদ্য দান কর।

শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা ভুলে গেলে পরে পড়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আওয়ালুহু ওয়া আখিরুহু। (আবু দাউদ)

অর্থ ঃ আল্লাহর নামে খাইতেছি খাওয়ার শুরুতেও শেষেও।

মাখ্লূকের সর্ব প্রকার অনিষ্ট ও অপকারিতা হইতে হেফাযতের দোয়া

হযরত আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, একদা গভীর অন্ধকার রাতে বৃষ্টিপাতের মধ্যে আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছল্লাম-এর খোঁজে বাহির হইলাম। খুঁজিতে খুজিতে তাঁহাকে পাইয়া গেলাম। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, (আব্দুল্লাহ্) তুমি পাঠ করিও। আমি বলিলাম, কি পাঠ করিব? হুযুর বলিলেন, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সূরায়ে কুল্ হুয়াল্লাহু

আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব ও কুল আউযু বিরাবিন্নাছ প্রতিটি তিন বার করিয়া পাঠ করিবে। তাহা হইলে সর্ব বিষয়ে ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। (মেশকাত শরীফ ১৮৮ পৃষ্ঠা।)

ব্যখ্যা ঃ বিখ্যাত মোহাদ্দেস হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) মেরকাত ৪র্থ খণ্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, আল্লামা ত্বীবী (রঃ) বলেন ঃ সর্ব বিষয়ে যথেষ্ট হইবে'–কথাটির দুইটি অর্থ হইতে পারে ঃ

১–সকল অনিষ্টকারীর সব রকম অনিষ্ট হইতে হেফাযতের জন্য ইহাই যথেষ্ট রক্ষাকবচ।

২–যে কোন অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে হেফাযতের জন্য এ ওযীফাই যথেষ্ট, এতদুদ্দেশ্যে ইহার পর আর কোন ওযীফা পড়ার দরকার থাকে না।

বর্তমানে মুসলমান কত পেরেশান, কত রকমের সমস্যায় জর্জরিত। কাহারও জ্বিন কিংবা ভূত-প্রেতের আক্রমণের পেরেশানী, কাহারও দুশমন কর্তৃক যাদু-বানটোনার পেরেশানী। কাহারও দোকান, কায়-কারবার কিংবা বিবাহ-হইতেছেনা। (ঘরের ভিতরে বা বাহিরে যে কোন ধরণের দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার আশংকা। যেমন, শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি বা গাড়ী-ঘোড়ার এ্যাক্সিডেন্ট ইত্যাদি) কেহবা প্রতিনিয়তই নিত্য-নতুন বালা-মুসীবত ও মুশকিলের সম্মুখীন হইতেছে। আমরা যদি প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় দুই-তিন মিনিটের এই ওযীফাটি আদায় করি, তাহা হইলে সর্ব প্রকার সমস্যা ও বালা-মুসীবত হইতে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই হেফাযত ও নিরাপদ থাকিব।

সূরায়ে-এখলাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

সূরা- ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ

সূরায়ে- নাছ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

শোয়ার সময়ের দোয়া সমূহ

১। হাদীস ঃ শোয়ার সময় অজু করে বিছানায় এসে অতঃপর লুঙ্গির আঁচল (বা কোন কাপড় দ্বারা) তিন বার বিছানা ঝাড়া, তারপর এই দোয়া পড়ে বিছানায় শোয়া।

بِاسْمِكَ رَبِّىْ وَضَعْتُ جَنْبِىْ وَبِكَ اَرْفَعُهٗ اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهٖ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

উচ্চারণ ঃ (বিসমিকা রাব্বী ওয়াদ্বা'তু জামবী ওয়া বিকা আরফাউ'হু ইন আমসাকতা নাফসী ফাগফিরলাহা ওয়াইন আরসালতাহা ফাহ্ফাযহা বিমা তাহফাযু বিহি ই'বাদাকাস সালিহীন)।

অর্থ ঃ আমার আল্লাহর নামের সাথে আমার শরীরকে রাখলাম এবং আপনার নামের সাথেই উহাকে উছাব যদি আপনি আমাকে মৃত্যু দান করেন তবে আমাকে ক্ষমা করে দিবেন আর যদি আমাকে জীবিত রাখেন তবে আমাকে হেফাজত করুন যার দ্বারা আপনার নেক বান্দাদের হেফাজত করে থাকেন।

(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

অতঃপর এই দোয়া পড়বে ঃ اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া।

অর্থ ঃ হে প্রভূ আমি তোমারই নামের সাথে মৃত্যুবরণ করব এবং তোমারই নামের সাথে জীবিত থাকব। (বোখারী শরীফ)

শোয়ার মধ্যে ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখে জেগে গেলে তার দোয়া

১। হাদীস ঃ যদি নিদ্রাবস্থায় কোন ভাল স্বপ্ন দেখে এবং চোখ খুলে যায় তবে এর ওপর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ) (অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য) বলবে। আর ঐ স্বপ্ন ঐ সব লোকের কাছে বর্ণনা করবে যারা তার সাথে ভালবাসা রাখে (যাতে তারা ভাল ভাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দেন)

(বুখারী ও মুসলিম)

২। হাদীস ঃ আর যদি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তবে নিজের বাম দিকে তিন বার থু থু ফেলবে বা ফুঁক দেবে এবং তিনবার নিম্নের দোয়াটি পড়ে আর কারো কাছে এই স্বপ্ন আলোচনা করবে না তাহলে এ স্বপ্ন কোন ক্ষতি করবে না, এবং যে পার্শ্বে শুইয়ে ছিল ঐ পার্শ্ব বদলাবে বা উঠে তাহাজ্জুদ এর নামাজ পড়বে।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ ঃ (আ'উজু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম)

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। (বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে বা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে তার দোয়া

১। যদি ঘুমের মধ্যে ভয় পায় বা কোন ভয়ানক বস্তু ও পেরেশানী অনুভূত হয় বা ঘুম হঠাৎ ভেঙ্গে যায় তখন এই দোয়া পড়বে

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

উচ্চারণ ঃ আ'উজু বিকালিমাতিল্লাহিত্তামাতি মিন গাদ্বাবিহী ওয়া ইক্বাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাজা- তিশশায়া তীন ওয়া আয়ঁ ইয়াহজুরূন)

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিতেছি আল্লাহর রোষ ও তাঁর শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে না পারে।

ফযীলত ঃ হদীস ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) এই "তা'আউজ তথা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়ার দোয়াটি আপন বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরকে শব্দে শব্দে হুবহু মুখস্ত করাতেন আর অবুঝ শিশুদের গলায় তাবীজ লিখে ঝুলিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ শরীফ)

✱ ঘুম থেকে উঠার পর দোয়াসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اِلَىَّ نَفْسِىْ وَلَمْ يُمِتْهَا فِىْ مَنَامِهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ، اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী রদ্দা ইলায়্যা নাফসী ওয়ালাম ইউমিতহা ফী মানা মিহা-আল হামদু লিল্লা-হিল্লাজী ইয়ুমসিকুসসামা ওয়াতি ওয়াল আরদা আন তাযুলা ওয়ালা ইন যালতা- আমসাকাহুমা মিন আহাদিম মিম বা'দিহি ইন্নাহু কানা তাকাআ আলাল আরদি ইল্লা বিইজনীহি। ইন্নাল্লাহা বিন্নাসি লারা উফুর রাহিম।

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং নিদ্রাবস্থায় আমাকে মৃত্যু দেননি। সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আকাশ ও যমীনকে স্বস্থান ত্যাগ করা হতে বিরত রেখেছেন। যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় আকাশ ও যমীন স্বস্থান ত্যাগ করে তবে তিনি ব্যতিত এমন কোন সত্তা নেই যে, তাদেরকে বিরত রাখতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বড়ই ধৈর্যশীল ও অতি ক্ষমাকারী। সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি আকাশকে নিজ অনুমতি ব্যতিত যমীনের উপর পতিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর অতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। (নাসাঈ শরীফ)

অতঃপর এই দোয়া পড়বে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ يُحْيِى الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ আলহামদুলিল্লা-হিল্লাজী ইউহয়িল মাউতা-ওয়া হুওয়া আ'লা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন এবং তিনি সব বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (মুছতাদরাকে হাকেম)

এই দোয়া পড়বে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ ঃ (আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আহয়া-না-বা'দামা-আমা তানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর)

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে জীবিত করেছেন (নিদ্রায়) মৃত্যু দান করার পর এবং তাঁর দিকেই পুনরুত্থানের পর ফিরে যাবে।

(বোখারী শরীফ)

বা এই দোয়া পড়বে।

لَااِلٰهَ اِلَّاانْتَ لَاشَرِيْكَ لَكَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِىْ وَاَسْاَلُكَ رَحْمَتَكَ اَللّٰهُمَّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قُلُوْبِىْ بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنِىْ

وَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা আনতা লা–শরীকা লাকা সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ইন্নী আসতাগফিরুকা লিজানবীওয়া আসআলুকা রাহমাতাকা আল্লাহুম্মা যিদ্‌নী ইলমান ওয়া লা-তুযিগ্‌ক্বালবী বা'দা ইজ হাদাইতানী ওয়াহাবলী মিল্লা দুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনাতাল ওয়াহহাব।)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আপনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আপনার কোন শরীক নেই, আপনি পবিত্র, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আমার গুনাহ ক্ষমা চাই, আপনার কাছে আপনার রহমত চাই, হে আল্লাহ! আমার ইলম (জ্ঞান) বৃদ্ধি করুন এবং আপনি আমাকে হেদায়েত করার পর আমার অন্তরকে পথভ্রষ্ট করবেন না এবং আপনি আমাকে আপনার দরবার থেকে (বিশেষ) রহমত দান করুন, নিশ্চয় আপনি মহা দাতা। (আবু দাউদ শরীফ)

এই দোয়া পড়বে।

لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল ওয়াহিদুল ক্বাহহার, রাব্বুস সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়ামা বাইনাহুমাল আ'যীযুল গাফ্‌ফার)

অর্থ ঃ এক আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি (সবার চেয়ে) শক্তিশালী, আসমান ও যমীনের এবং যা কিছু আসমান ও যমীনের মাঝে আছে (সবার) প্রভু, তিনি সবার উপর শক্তিমান ও প্রভাবশালী, বড়ই ক্ষমাশীল। (নাসাঈ শরীফ)

অযু করার পূর্বের ও পরের দোয়া সমূহ

১। যখন অজু করতে বসবে প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ) বলবে।

(আবু দাউদ শরীফ)

এরপর এই দোয়া পড়বে

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মাগফিরলি জামবি ওয়া ওয়াসি লী ফী দারী ওয়া বারিক লী ফী রিযক্বী)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমার (বাড়ী) ঘরে বিস্তৃতি দান করুন এবং রিযিকে তথা খাদ্যে বরকত দান করুন।

(নাসাঈ শরীফ)

২। অযু করা থেকে অবসর হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে তিন বার এই দোয়া পড়বে।

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ ঃ (আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা এবং রাসূল। (মুসলিম শরীফ)

৩। এর পর এই দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্তাউয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাত্বাহিরীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমাকে তাওবাকারীদের অর্ন্তভূক্ত করুন, এবং আমাকে খুব পাক-পরিস্কার ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্ত করুন। (তিরমিজী শরীফ)

৪। অথবা এই দোয়া পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ ঃ (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আনাতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আপনি পরম পবিত্র, আপনার জন্যই প্রশংসা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি পরম পবিত্র, আপনার জন্যই প্রশংসা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং (আপন গুনাহ সমূহ থেকে) তাওবা করি। (মুছতাদরাকে হাকেম)

৫। বা এই দোয়া পড়বে ঃ

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

উচ্চারণ ঃ (সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আপনি পরম পবিত্র। আপনারই সমস্ত প্রশংসা, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করছি। (ত্বাবরানী আল আওছাত্ব)

ঘরে প্রবেশ করা ও ঘর থেকে বের হবার দোয়াসমূহ

(১) যখন ঘরে প্রবেশ করবে বা ঘর থেকে বের হবে তখন নিম্নের দোয়া পড়বে। অতঃপর ঘরবাসীদেরকে সালাম করবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল্ মাউলাজি ওয়া খাইরাল মাখ্‌রাজি বিসসিল্লাহি ওয়াল জানা ওয়া বিসিমিল্লাহি খারাজনা ওয়া আ'লাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার নিকট উত্তম প্রবেশ স্থান ও উত্তম বের হবার স্থান প্রাথনা করতেছি। আল্লাহ্ তা'আলার নামে প্রবেশ করতেছি এবং আল্লাহর নামে বাহির হইতেছি এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা স্থাপন করতেছি। (আবু দাউদ শরীফ)

ঘর হতে বাহিরে যাওয়ার দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আ'লাল্লাহি লা-হাওয়া ওয়ালা কুওঁয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ সকল কাজের আরম্ভ আল্লাহর নামে। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। বিপদ-আপদ থেকে বেঁচে থাকার, মঙ্গল ও কল্যাণ লাভের সুযোগ সামর্থ নাই আল্লাহর রহমত ছাড়া।

বিপদ মুক্তির দোয়া

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা-জিউন। আল্লাহুম্মা আজিরনী ফী মুসিবাতী ওয়া আখলিফলী খাইরাম মিনহা। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা নিশ্চয়ই তারই দরবারে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ আমার এই বিপদের জন্য তুমি আমার প্রতিদান দাও। আর এর উৎকৃষ্ট বদলা আমাকে দান কর।

বিপদ মুক্তির জন্য ৪০ দিন পড়লে ফল লাভ হয়

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু ওয়া ইলাইকাল মুশতাকী ওয়া আনতাল মুসতাআ-নু ওয়ালা হাওলা ওয়া লা-কুওঁয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আজীম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তোমার জন্যই সমস্ত প্রশংসা এবং তোমার নিকটই যাবতীয় অভাব অভিযোগ প্রকাশ করিতেছি। একমাত্র তোমা হইতেই যাবতীয় সাহায্য প্রার্থনা করা যাইতে পারে এবং গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং তোমার ইবাদত করার শক্তি লাভ করা তোমার সাহায্য ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

বিপদ মুক্তির জন্য পরিক্ষীত আরেকটি দোয়া

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ – سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ – سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ – سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ – سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ – سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ – سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

উচ্চারণ ঃ সালামুন ক্বাওলাম মির রাব্বির রাহীম। সালামুন আ'লা নূহিন ফীল আলামীন। সালামুন আ'লা ইবরাহীম। সালামুন আ'লা মূসা ওয়া হারুন। সালামুন আ'লা ইলইয়াসীন। সালামুন আ'লাইকুম ত্বিবতুম ফাদখুলূহা- খা-লিদীন। সালামুন হিয়া হাত্তা মাত্বলায়িল ফাজরি।

অর্থ ঃ দয়াময় প্রভুর পক্ষ থেকে শান্তির বাণী। নূহ (আঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক এবং দুনিয়া বাসির প্রতি। ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। ইলয়াস (আঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। অতপর তোমারা উহাতে সব সময় শান্তির মধ্যে থাক। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত হাওয়া চালু থাকে।

নিম্নের দোয়া ১০০ বার পাঠ করলে বিপদ দূর হয়

لِلّٰهِ الْكَافِىْ قست الْكَافِىْ لِكُلِّ كَافِىْ كَفَا فِى الْكَافِىْ اِنَّمَا الْكَافِىْ وَاللّٰهُ الْحَمْدُ

উচ্চারণ ঃ লিল্লাহিল কাফী ক্বাসাতিতুল কাফী, লিকুল্লী কাফী, কাফাফীল কাফী, আনিমাল কাফী ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

অর্থ ঃ আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তোমার ইচ্ছাই যথেষ্ট। প্রত্যেকের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তুমিই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই তুমিই যথেষ্ট এবং সকল প্রশংসা শুধু তোমারই জন্য।

বিপদে নিম্নোক্ত আয়াতও পড়া যায়

لَا إِلٰهَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন।

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত ও সুস্পষ্ট মালিক আর কেউ নাই।

বিপদে নিম্নোক্ত আয়াত পড়লেও বিপদ দুর হয় ঃ

رَبِّ اِنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা- আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্ জ্বোয়ালিমিন।

অর্থ ঃ হে আল্লাাহ! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তুমি পবিত্র, মহান, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৬)

কোন কাজ কঠিন হলে পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ لَنَا اُمُوْرَنَا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইয়াসসির লানা উমুরানা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের কাজগুলো সহজ করে দাও।

মুছিবতের সময় পাঠ করার দোয়া

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِىْ فَاْجُرْنِىْ فِيْهَا وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا

উচ্চারণ ঃ ইন্না লিল্লাহি ওয়া আন্না ইলাইহি রা-জিউন। আল্লাহুম্মা ইন্দাকা আহতাসিবু মুসীবাতী ফাজিরনী ফীহা ওয়া আখলুফলী খাইরাম মিনহা।

(তিরমিযী)

অর্থ ঃ আমি, আমার যা কিছু আছে সবই আল্লাহর এবং সেই আল্লাহর কাছেই নিশ্চয়ই ফিরিয়া যাইবে সকলে। হে আল্লাহ আমার এই বিপদের ছওয়াব আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি। অতএব আমাকে সওয়াব দান কর এবং আমার যা চলিয়া গিয়েছে উহা অপেক্ষা ভালটি আমাকে দান কর।

বালামুসীবত থেকে মুক্তির লাভের দোয়া

যে কোন নামাযের পর সূরা কুরাইশ ৪১ বার পাঠ করলেও বিপদ দূর হয়।

কঠিন বিপদ-আপদ ও শত্রুর কবল হইতে হেফাযতের দোয়া

হযরত আবূ-হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট পানাহ চাও কঠিন বালা-মসীবত হতে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ হতে, ক্ষতিকারক ফয়সালা হইতে এবং দুশমনদের আনন্দ-উল্লাস হইতে।

অতএব, এসকল মুসীবত হতে হেফাযতের জন্য এভাবে দোয়া করবেঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

'জাহদুল-বালা' ঐ চরম-বিপদাপদকে বলে, যার ফলে মানুষ জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে পছন্দ করে। (মেরকাত ৫ম খণ্ড, ২২২ পৃষ্ঠা)

দুঃখ ও মনোকষ্টের সময়ে পড়ার দোয়া

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়তেন তখন আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন ঃ

لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ، لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি বিশাল আরশের অধিপতি। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি আসমানসমূহের, পৃথিবীর ও মহান আরশের রব।

সর্ব রকম আসমানী-যমীনি বালা-মুসীবত হইতে হেফাযতের দোয়া

হযরত আবান ইবনে- উসমান (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার যবানে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ যে-ব্যক্তি সকাল-বিকাল তিন বার করিয়া এই দোয়া পাঠ করিবে, কেউ এবং কিছুই তাহার কোন রূপ ক্ষতি করিবে না। দোয়া ঃ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

ইয়া হাইয়ু, ইয়া ক্বাইয়ুম বিরাহমাতিকা আছ্তাগীছ।

অর্থ ঃ 'হে চিরঞ্জীব, হে শক্তিধর রক্ষণকারী, তোমারই দয়ার উপর ভরসা করিয়া তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি।"

বিপদগ্রস্তকে দেখে নিরাপত্তার জন্য দোয়া

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে নীচের দোয়াটি পড়বে সে উক্ত বিপদে পতিত হবে না ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ اللّٰهُ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

"সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমার ওপর আপতিত বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন এবং তাঁর বহু সৃষ্টির ওপর আমাকে মর্যাদা দান করেছেন।" (তিরমিযী এটি বর্ণনা করে বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান)

নেআমত, আফিয়ত বা সুখ-শান্তি লাভ বিপদাপদ ইহতে নিরাপদ জিন্দেগী দোয়া ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে-উমর (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পানাহ চাহিতেছি আপনার দেওয়া নেআমাতের (বাদলহীন) ক্ষয়-লয় ও ধ্বংস হইতে, আপনার দেওয়া আফিয়তের (সুখ-শান্তি এবং সুস্থ-নিরাপদ দেহ-মন ও জীবনের) অশুভ পরিবর্তন হইতে, আকস্মিক বালা-মুসীবত হইতে এবং আপনার সর্বপ্রকার অসন্তুষ্টি হইতে।

(মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ ২১৭)

রোগ ও অসুস্থ কালীন সময়ের দোয়া সমূহ

রোগীকে দেখতে যেয়ে এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

لَابَاْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ

উচ্চারণ ঃ লা-বা-সা- তাহুরুন ইনশা আল্লাহ।

অর্থ ঃ ঘাবড়ানোর কারণ নেই আল্লাহ চাহেন তো এ রোগ ব্যাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন পবিত্রতা সাধনকারী।

রোগীর সুস্থতার জন্য এই দোয়া ৭ বার পড়বে ঃ

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

উচ্চারণ ঃ আসআলুল লাহা রাব্বাল আ'রশিল আজীমি আই ইয়াশফীকা।

অর্থ ঃ আমি মহান আল্লাহ পাকের কাছে প্রর্থনা করছি, যিনি আরশের মালিক, তিনি যেন তোমাকে শেফা দান করেন।

অসুস্থ হলে রোগ মুক্তির দোয়া

রোগ মুক্তির জন্য দুই রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। সামর্থ অনুযায়ী সদকা করতে হবে। বিজোড় সংখ্যায় আলহামদুর সূরা ও লা-হাওলা ওয়ালা কুওঁয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিয়িল আজীম পড়তে হবে। চার কূল ও আয়াতুল কুরসী পড়ে শরীরে ফূঁক দিতে হবে। নিম্নের দোয়া পড়তে হবে ঃ

اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِىْ لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ ঃ আযহিবিল বা-সা রাব্বিন নাসা ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা-শিফা-আ ইল্লা-শিফাউকা শিফা-আল লা-ইউগাদিরু সাক্বমা।

অর্থ ঃ হে মানুষের পালন কর্তা তুমি কষ্ট দূর করে দাও এবং একে আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য দান ছাড়া আর কোন আরোগ্য নেই। তুমি এমন আরোগ্য দান কর, যেন আর কোন রোগ বাকী না থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগীকে দেখে ডান হাত রোগীর গায়ে রেখে এই দোয়া করতেন।

দরূদে শিফা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَبِعَدَدِ كُلِّ عِلَّةٍ وَشِفَاءٍ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি সাইয়িদিনা মুহাম্মাদিন বিআদাদি কুল্লি দায়িন ওয়া দাওয়ায়িওঁ বিআদাদি কুল্লি ইল্লাতিন ওয়া শিফাইন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাহার বংশধরদের প্রতি মানবের যাবতীয় রোগ, ঔষধ ও আরোগ্য সংখ্যা পরিমাণ রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ কর।

রোগ মুক্তির জন্য এ দরূদ সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার করে পাঠ করলে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

রোগ মুক্তির আয়াতসমূহ ঃ (আয়াতের শিফা)

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ (١) وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ (٢)
يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ فِيْهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ (٣)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ (٤) وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ (٥) قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَاءٌ

উচ্চারণ ঃ ওয়া ইয়াশফি সুদুরা ক্বাওমিম মু'মিনীন। ওয়া শিফাউল লিমা ফি সুদুর। ইয়াখরুজু মিমবুতুনিহা শারাবুম মুখতালিফুন আলওয়ানুহু ফীহি শিফাউন লিন্নাস। ওয়া নুনাযযিলু মিনাল কুরআনী। মা-হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতুল্লিল মু'মিনীন। ওয়া ইজ মারিদতু ফাহুয়া ইয়াশফীন কুল হুয়া লিল্লাজীনা আমানু হুদাওঁ ওয়া শিফাউ।

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা ইমানদারগণের হৃদয় নিরাময় করিলেন। নিশ্চয়ই তোমাদের মানসিক রোগ সমূহের উপশমকারী ঔষধ আছে। উহাদের (মৌমাছিদের) পেট হইতে বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু) বহির্গত হয়। উহার ভিতরে মানুষের রোগ উপশকারী ঔষধ আছে। আমি কোরআন হইতে যা নাযিল করিয়াছি তা ঈমানদারদের নিমিত্ত আরোগ্য ও করুণা স্বরূপ। আর আমি যে সময় রুগ্ন হই তিনিই (আল্লাহ) আমাকে নিরাময় দান করেন। বল, ঈমানদারদের নিমিত্ত সৎপথ ও আরোগ্য আছে।

মাথা বেদনা থেকে আরোগ্যের দোয়া ঃ

لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ

(সূরা ওয়াকেয়া আয়াত -১৯)

এই আয়াত তিনবার পড়িয়া মাথায় দম করিলে ইনশাআল্লাহ সত্বর আরাম হবে।

কঠিন কঠিন রোগ হইতে হেফাযতের দোয়া

হযরত আনাছ্ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আল্লাহপাকের নিকট) এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট পানাহ চাই শ্বেত-রোগ হতে, উম্মাদগ্রস্ততা হইতে, কুষ্ঠ,-রোগ হতে এবং কঠিন-কঠিন ব্যাধি সমূহ হতে।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ৪০ বার এই আয়াত পড়বে

لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লা-আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ্ জ্বোয়ালিমিন। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই তুমি পবিত্র, মহান, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৭)

রোগীকে ডান দিকে ফিরায়ে দিয়ে দোয়া পড়বে

اَللّٰهُمَّ اَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِهِ وَاَنْتَ الشَّافِىْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আজহিবিল বাস রাব্বিন নাস ইশফিহী ওয়া আনতাশ শাফী লা-শিফাআ ইল্লা-শিফাউকা লা ইউগাদিরু ছাকামান। (সুনান)

অর্থা ঃ হে আল্লাহ! কষ্ট দুর কর। আয় মানুষের প্রতিপালক, এই রোগীকে শিফা দান কর, তুমিই শিফা দানকারী। তোমার শিফা ব্যতীত আর কোন শিফা নাই এমন শিফা দান কর যেন কোন রোগ না থাকে।

কর্জ হতে পরিত্রাণ এর দোয়া

ভোর সাতবার ও সন্ধ্যায় সাতবার করিয়া নিম্নোদ্ধৃত আয়াত পাঠ করলে খোদা তা'আলা কর্জ হতে পরিত্রাণ দিয়া থাকেন।

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

ঋণ পরিশোধ ও চিন্তা পেরেশানী দূর হওয়ার দোয়া

যদি কেউ কোন ঋণ বা দুনিয়াবী কোন চিন্তা ভাবনা ও পেরেশানীতে লিপ্ত হয়, তখন সকাল সন্ধ্যায় এই দোয়া পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উজুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল ইযনি ওয়া আ'উজুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাছলি ওয়া আ'উজু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখ্‌লি ওয়া আ'উজুবিকা মিন গালাবাতি দ্বাইনি ওয়া কাহরির রিজাল-)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই, দুঃখ ক্লেশ ও পেরেশানী থেকে এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, আপনার কাছে আশ্রয় চাই কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে, আপনার কাছে আশ্রয় চাই

ঋণের প্রভাব তথা বোঝা থেকে ও লোকদের ক্ষতি ও জুলুম থেকে। (আবু দাউদ শরীফ)

ঋণ পরিশোধের জন্য খুবই উপকারী দোয়া

ঋণ পরিশোধের জন্য এ দোয়াটি ও খুবই উপকারী।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْاَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ، اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهٖ، اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ اَنْ اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ-

উচ্চারণ ঃ (আল্লাহুম্মা রাব্বাসসামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরদ্বি ওয়া রাব্বাল আ'রশিল্ আজীমি রাব্বানা-ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ফা-লিক্বাল হাব্বি ওয়ান নাওয়া ওয়া মুন্যিলাত্ তাওয়াবাতি ওয়াল ইন্জীল ওয়াল ফুরক্বানা আ'উজুবিকা মিন্ শার্রি কুল্লি শাইয়িন আন্তা আ-খিজুবিনা সিয়াতিহী আল্লাহুম্মা আনতাল্ আওয়ালু ফালাইসা ক্বাব্লাকা শায়িন্ ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন ওয়া আনতাজ জাহিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইয়ান ওয়া আনতাল বাত্বিনু ফালাইসা দুনাকা শাইউন, আনিক্বদ্বি আ'ন্নাদ্দীনা ওয়াগ্ নিনা মিনাল ফাকরি)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আকাশ সমূহ ও যমীনের প্রভু, মহান আরশের প্রভু আমাদের প্রভু ও সকল 'বস্তুর প্রভু, শস্য বীজ ও খেজুর দানা ফুড়ে গাছ উৎপাদক এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন নাজিল কারক, আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই, যা আপনার অধিকারে আছে এমন প্রত্যেক মন্দ থেকে, হে আল্লাহ! আপনি প্রথম-আপনার নিকট আশ্রয় চাই, যা আপনার অধিকারে আছে এমন প্রত্যেক মন্দ থেকে, হে আল্লাহ! আপনি প্রথম আপনার পূর্বে কেউ ছিল না, আপনি শেষ-আপনার পরে কেউ থাকবে না, আপনি গোপন, আপনার চেয়ে গোপনতর কিছুই নেই এবং আমাদেরকে পরমুখাপেক্ষীতা থেকে হেফাযত করুন। (মুসলিম শরীফ)

রিযিক বৃদ্ধি ও ঋণ পরিশোধের দোয়া সমূহ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى

كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ* تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

উচ্চারণ ঃ ক্বুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মানতাশা-উ ওয়া তানযিউল মুলকা মিমমান তাশা-উ ওয়া তুইয্যু মান তাশা-উ ওয়া তুযিল্লু মান তাশা-উ বিয়াদিকাল খাইরা ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। তুলিজুল লাইলা ফিন্নাহারি ওয়া তুলিজুন্নাহারা ফিল লাইলি ওয়া তুখরিজুল হাইয়া মিনাল মায়্যিতি ওয়া তুখরিজুল মিনাল হাইয়্যি ওয়া তারজুক্বু মানতাশা-উ বিগাইরি হিসা-ব।

অর্থ ঃ বল, হে আল্লাহ! তুমি সমস্ত পৃথিবীর প্রভু, যাকে ইচ্ছা বাদশাহী প্রদান কর এবং যার নিকট হতে ইচ্ছা হয় বাদশাহী কেড়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা হয় সম্মান দান কর এবং যাকে ইচ্ছা হয় অপদস্ত কর, তোমার হস্তেই সর্ব মঙ্গল এবং নিশ্চয়ই তুমি সবার উপরে, সর্ব শক্তিমান। তুমি রাত্রকে দিনে পরিণত এবং দিনকে রাত্রে পরিণত কর, মৃত হতে জীবিতকে বাহির কর, তুমি জীবিত হতে মৃতকে বের কর এবং যাকে খুশী সীমাহীন রুজী দান করে থাক।

ঋণ ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হতে মুক্তির দোয়া

হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা এক ব্যক্তি এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বহু করয্ (ঋণ) ও বহু দুশ্চিন্তা আমাকে ঘিরে ধরেছে। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি দোয়া শিখিয়ে দিবনা, যা পাঠ করিলে আল্লাহপাক তোমার সকল করয পরিশোধ ও সমস্ত দুশ্চিন্তা দূরীভূত করিয়া দিবেন? সে বলিল, জ্বীহাঁ। হুযুর বললেন, তুমি সকাল-সন্ধ্যা এই দোয়া পাঠ করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট পানাহ্ চাই দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হতে; আরও পানাহ চাই অক্ষমতা ও অলসতা হতে, আরও পানাহ্ চাই ঋণের ভারে জর্জরিত হওয়া ও মানুষের চাপা-দাবির সম্মুখীনতা হতে।

(আবু দাউদ, মেশাকাত ২১৫ পৃঃ)

উক্ত লোকটি বলেন, আমি যথারীতি হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াছাল্লাম-এর কথা মত সকাল-সন্ধ্যায় এর আমল শুরু করিয়া দিলাম। ফলে, আল্লাহ্পাক

আমার সমস্ত করয্ আদায় এবং আমাকে সর্ব প্রকার চিন্তা-পেরেশানী হতে মুক্ত করে দিলেন।

ঋণ পরিশোধ ও শত্রু দমনের দোয়া

প্রত্যেক নামাযের পর ৭ বার ও সকাল-সন্ধ্যায় ৭ বার করে পড়লে ঋণ পরিশোধ হয় ও শত্রু দমন থাকবে।

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আ'লিয়্যিল আ'যিম।

অর্থ ঃ সর্ব শ্রেষ্ট মহা শক্তিশালী আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোন শক্তি নাই।

দুঃশ্চিন্তা ও ঋণ মুক্তির দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনী ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজযি ওয়াল কাসালী অআউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া আউযুবিকা মিন গালাবাতিদ দাইনি ওয়া কাহরির রিজাল।

(মেশকাত ও আবুদাউদ)

ঋণ পরিশোধের জন্য দোয়া

আবু ওয়ায়েল বলেন, হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে একজন মুকাতিব (নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তিতে আবদ্ধ) ক্রীতদাস এসে বললো, আমি চুক্তির অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়ে পড়েছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে সেই দোয়াটি কেন শেখাবো না যেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিখিয়েছিলেন? তোমার যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ ঋণ থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা পরিশোধ করে দিবেন। সে বললো ঃ আপনি অবশ্যই আমাকে সেই দোয়াটি শিখিয়ে দিন। হযরত আলী (রাঃ) তাকে এ দোয়াটি শিখিয়ে দিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাক ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়াগনিনী বিফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে হালাল পন্থায় এ পরিমাণ রিযিক দান কর, যা আমার জন্য যথেষ্ট হয় এবং হারাম উপার্জনের প্রয়োজন না হয়। আর তোমার অনুগ্রহে আমাদের স্বচ্ছল করে দাও, যেন তুমি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হতে হয়। (তিরমিযী)

জীবিকা অর্জন ও দারিদ্র মোচনের তসবীহ

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ يَوْمٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا

উচ্চারণ ঃ মান ক্বারাআ ওয়া-ক্বি'আতি কুল্লা ইয়াওমিন লাম তুসিব্হু ফা-ক্বাতুন আবাদা।

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি প্রতিদিন সূরা ওয়াক্বিয়া পড়বে, তাকে কখনো উপোষ করতে হবে না।

ঋণ থেকে মুক্তিলাভের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা কফিনী বিহালা-লিকা আন হারা মিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলীকা আম্মান সিওয়াক।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি আমায় হালাল রিজিক দান কর এবং হারাম রিজিক থেকে বাঁচাও। আর তোমার দয়া ও অনুগ্রহ বলে আমায় পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষা কর।

খারাপ ব্যধি থেকে মুক্তির দোয়া

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْاَسْقَامِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল বারসি ওয়াল জুনূনি ওয়াল জুযা-মি ওয়া সাইয়্যিইল ইসক্বা-ম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় কামনা করছি তোমার কাছে (শ্বেত, কুষ্ঠ, উম্মাদ রোগ, কুষ্ঠ রোগ ও সমস্ত খারাপ ব্যধি থেকে।

খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্তির দোয়া

জিয়াদ বিন ইলাকা (রাঃ) বলেন, রসূলে কারীম (সঃ) এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ ، وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ মুনকারা-তিল্ আখ্লা-ক্ব, ওয়াল্ আ'মা-লি ওয়াল আহওয়া-ই।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই খারাপ চরিত্র, খারাপ কাজ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে।

বরকতময় জীবিকা লাভের দোয়া

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِىْ بِمَا رَزَقْتَنِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَىٰ كُلِّ غَائِبَةٍ لِىْ بِخَيْرٍ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ক্বান্নি'নী বিমা-রাঝাক্বতানী ওয়া বা-রিক লী ফীহি ওয়াখলুফ আলা-কুল্লি গা-ইবাতিললী বিখাইর।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! যে জীবিকা তুমি দিয়েছ তার উপর আমায় সন্তুষ্ট করে দাও, তাকে আমার জন্যে বরকতময় কর এবং আমায় অদৃশ্য বস্তুর বিনিময় দান কর।

গুনাহ মাফের দোয়া

জীবনে চলার পথে মানুষের ভুল-ভ্রান্তির কারণে গুনাহ হয়ে যায়, আল্লাহ পাক গুনা মাফেরও ব্যবস্থা রেখেছেন। গুনাহ মাফের শ্রেষ্ঠ দোয়া।

সইয়্যিদুল ইস্তিগ্ফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ وَاَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা-আন্তা খালাক্বতানী ওয়া আনা আ'বদুকা ওয়াআনা আ'লা আহদিকা ওয়া ওয়াদিকা মাসতত্বা'তু। আউযুবিকা মিন্ শাররি মা-সানা'তু ওয়া আবূউলাকা বিনি'মাতিকা আ'লাইয়া ওয়াআবুউ বিজামবি ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুজ জুনূবা ইল্লা-আনতা

(বুখারী)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমিই আমার পালন কর্তা, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো। আর আমি তোমার বান্দা, আমি আমার

সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে কৃত-কর্মের অনিষ্ঠ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমাকে দেয়া তোমার সকল নেয়ামত স্বীকার করছি এবং আমার অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

ইস্তেগফার

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ ঃ আস্তাগ ফিরুল্লাহাল লাজী লা-ইলাহা ইল্লা-হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহি। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ আমি সেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব এবং সব কিছুর ধারক এবং আমি তাঁরই নিকট তাওবা করছি।

এ ভাবেও তাওবা করা যায় ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দিন।

উচ্চারণ ঃ ইয়া রাব্বিগফিরলী ঃ يَا رَبِّ اغْفِرْلِىْ

অর্থ ঃ আল্লাহ পাক আমাকে মাফ করে দিন।

এভাবেও তওবা করা যায়

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ ঃ আস্তাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি জামবিউঁ ওয়া আতূবু ইলাহি।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভূ আল্লাহর কাছে সমস্ত গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাওবা করছি।

اَللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِىْ وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আস্তাগফিরুকা লিজামবী ওয়া আসআলুকা রাহমাতাকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিজ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার রহমত কামনা করছি।

আল্লাহুর নিকট হতে ক্ষমা ও মাগফেরাতের ব্যবস্থাকারী দোয়া ঃ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্হু-কে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! নিশ্চয় আপনি অনেক অনেক ক্ষমাকারী, আপনি স্বার্থহীন-দয়াবান। আপনি ক্ষমা করতে ভালবাসেন (ক্ষমা করা আপনার অতি প্রিয় জিনিস)। অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

কোন কোন রেওয়াতে আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শবে-কদরে এই দোয়া করতে বলেছেন। অতএব, শবে-কদরে অধিক গুরুত্বের সাথে এ দোয়া করা উচিত। (জাওয়াহেরুল- বোখারী ৫৭০ পৃষ্ঠ)

গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি লাভের দোয়া।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই দোয়াটি বর্ণনা করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না-নাসআলুকা মূজিবা-তি রাহমাতিকা ওয়া'আঝা-ইমা মাগফিরাতিক, ওয়াস্ সালা-মাতা মিন কুল্লি ইসমিন ওয়াল গানীমাতা মিন কুল্লি বিররিন, ওয়াল ফাওঝা বিল জান্নাত ওয়ান নাজ্বা-তা মিনান নার।

মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার দোয়া

সহীহ মুসলিমে আবু হুমায়েদ অথবা আবু উসায়েদ থেকে বর্ণিত যে, মসজিদে প্রবেশের সময় প্রথমে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরূদ ও সালাম পড়বে এবং তারপরে এ দোয়া পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"হে আল্লাহ, আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও"।

আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে তখন পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে তোমার মেহেরবানী প্রার্থনা করছি"।

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর ইবনুল' আস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি মহান আল্লাহর কাছে, তার সুন্দর মর্যাদাপূর্ণ চেহারার এবং তার চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মাধ্যমে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 'আমর বলেন, কোন ব্যক্তি এ দোয়া পড়লে শয়তান বলে "এ ব্যক্তি সারাদিনের জন্য আমার ক্ষতি ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

কবর যিয়ারতের দোয়া

হযরত বুরায়দা বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের (রাঃ) বলতেন, তোমরা যখন গোরস্থানে যাবে তখন পড়বে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَا حِقُوْنَ- نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"এসব ঘরের বাসিন্দা মু'মিন ও মুসলমান, তোমাদের ওপর সালাম। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমরা তোমাদের সাথে এসে যোগ দেব। আমরা তোমাদের ও আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি"।

চাঁদ দেখার দোয়া

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ (প্রথম রাতের চাঁদ) দেখলে বলতেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ

"আল্লাহ সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে আল্লাহ, এ চাঁদকে আমাদের জন্য শান্তি, ঈমান ও নিরাপত্তার সাথে উদিত কর এবং যে কাজ তুমি পছন্দ করো ও সন্তুষ্ট হও সে কাজের তাওফীক লাভের কারণ বানাও। হে চাঁদ, আমাদের ও তোমার রব আল্লাহ"।

ইফতারের দোয়া

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন প্রকার লোকের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদারের ইফতারের সময়ের দোয়া, ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং মজলুমের দোয়া। (তিরমিযী ঃ হাদীসটি হাসান) ইবনে মাজাতে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আবী মুলায়কা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "রোযাদার ইফতারের সময় যে দোয়া করেন তা প্রত্যাখ্যাত হয় না।

ইবনে মুলায়কা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে ইফতারের সময় এ দোয়া পড়তে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْئٍ اَنْ تَغْفِرَلِىْ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার ঐ রহমতের অসীলা দিয়ে-যা সবকিছুকে পরিব্যাপ্ত করে আছে-তোমার কাছে আমাকে ক্ষমা করে দেয়ার প্রার্থনা করছি।

সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহে রেওয়ায়াত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযার ইফতার করার সময় এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

"হে আল্লাহ, আমি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রোযা রেখেছি এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করছি।

অপর একটি হাদীসে এ দোয়া এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْنَا، فَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"হে আল্লাহ, আমরা সবাই তোমার (সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে) রোযা রেখেছি এবং তোমার দেয়া রিযিকের দ্বারা ইফতার করছি। তুমি আমাদের থেকে তা কবুল করো। নিশ্চয় তুমি শ্রবণকারী ও মহাজ্ঞানী।

মজলিস শেষে পাঠ করার দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন মজলিসে বসে যেখানে বহুল পরিমাণে অশালীন ও অর্থহীন কথাবার্তা হচ্ছে, তাহলে উক্ত মজলিস থেকে ওঠার আগে সে নীচের দোয়াটি পড়বে। উক্ত মজলিসে যত ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে এ দোয়া তার সবকিছুর কাফ্ফারা হয়ে যাবে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

"হে আল্লাহ, তুমি অতীব পবিত্র। প্রশংসা তোমারই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার কাছে তওবা করছি।" (তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন, এটি হাসান ও বিশুদ্ধ)

গন্তব্য স্থান দেখে পাঠ করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা বারিকলানা ফীহা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য ইহার মধ্যে বরকত দান কর।

ফেরার পথে পাঠ করার দোয়া

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

উচ্চারণ ঃ আয়িবূনা তা-য়িবূনা আ'বিদূনা লিরাব্বিনা- হা-মিদূন। (মিশকাত)

বাড়ী থেকে বের হওয়ার দোয়া

সুনানে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় যে ব্যক্তি এ দোয়াটি পড়ে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

"আল্লাহর নামে (আমি বাইরে পা বাড়ালাম)। আল্লাহর ওপরেই আমি ভরসা করলাম, আল্লাহর সাহয্য ছাড়া কোন উপায় বা শক্তি হতে পারে না।

বাড়ীতে প্রবেশের দোয়া

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন ব্যক্তি যখন নিজের বাড়ীতে প্রবেশের সময় কিংবা খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে তখন শয়তান তার দলবলকে বলে لَامَبِيْتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ (এখানে তোমাদের জন্য না আছে রাত্রি যাপনের সুযোগ, না আছে খাদ্য) আর যদি প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে তা হলে শয়তান বলে اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ (তোমরা এখানে রাত্রি যাপনের সুযোগ লাভ করেছো আর যদি খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ না করে তাহলে শয়তান বলে ঃ اَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ (তোমরা এখানে রাত্রি যাপন ও খাদ্য গ্রহণ উভয় সুযোগই লাভ করেছো) সুনানে আবু দাউদে আবু মালিক আশয়ারী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যখন বাইরে থেকে তার বাড়ীতে আসবে তখন এই দোয়াটি পড়বে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

"হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে শুভ প্রবেশ ও শুভ নির্গমন প্রার্থনা করছি। আল্লাহর নামে আমি প্রবেশ করলাম, বের হলাম এবং আমাদের রব আল্লাহর ওপর নির্ভর করলাম।" তারপর সালাম দিবে।

দলীল ঃ হদীসটি সহীহ সনদে মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা, সহীহ ইবনে হিব্বান এবং মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলে বর্ণিত হয়েছে।

বাজারে প্রবেশের সময় পড়ার দোয়া

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের সময় এই দোয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ

"আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি এক ও অনুপম। তার কোন শরীক নেই সব কিছুর মালিকানা ও সার্বভৌমত্ব তারই। সব প্রশংসাও তারই জন্য নির্দিষ্ট। জীবন ও মৃত্যু তারই এখতিয়ারে। তিনি চিরঞ্জীব ও মৃত্যুহীন। তারই হাতে সকল কল্যাণ এবং তিনি সবকিছু করতে. ক্ষমতাবান।" পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশ লাখ নেকী লিপিবদ্ধ করে দেবেন, দশ লাখ গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং দশ লাখ মর্যাদা দান করবেন। (তিরমিযী)

হযরত বুরায়দা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গেলে এই দোয়া পড়তেন ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ السُّوْقِ وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا ـ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُصِيْبَ بِهَا، يَمِيْنًا فَاجِرَةً أَوْصَفْقَةً خَاسِرَةً

"আল্লাহর নামে আমি বাজারে প্রবেশ করছি। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এ বাজারের কল্যাণ এবং এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর এর অকল্যাণ এবং এর মধ্যে যা কিছু তার অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন এখানে আমি মিথ্যা শপথ না করি কিংবা কোন কিছু ক্রয়ের ক্ষতির শিকার না হই।"

সফরে যাত্রা করার দোয়া

তাবরানী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সফরে বের হওয়ার সময় দুই রাকআত নামায পড়ে সে এর চেয়ে উত্তম কিছু রেখে যায় না।

মুসনাদে ইমাম আহমাদে (রাঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সফরে যাত্রাকারী বাড়ীতে অবস্থানকারীদের জন্য এ দোয়া করবে ঃ

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

"আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করছি যার কাছে গচ্ছিত কিছুই নষ্ট হয় না।"

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলতে থাকলো, হে আল্লাহর রাসূল, আমি সফরে বহির্গত হওয়ার জন্য একদম প্রস্তুত হয়ে আছি। আমাকে উপদেশ দান করুন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَالتَّكْبِيْرِ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ

"আল্লাহকে ভয় করে চলো এবং যখনই কোন উচুঁ স্থানে থাকবে তখনই তাকবীর বলবে"। সেই ব্যক্তি যখন ফিরে যাচ্ছিলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এই বলে দোয়া করলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ

"হে আল্লাহ, তুমি তার পথের দূরত্ব সংকুচিত করে দাও এবং সফর তার জন্য সহজ করে দাও।"

যানবাহনে আরোহনের দোয়া

আলী ইবনে রাবিআ বলেন ঃ আমার দেখা ঘটনা, হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) এর জন্য সওয়ারী আনা হলো। তিনি রিকাবে পা রেখে বললেন ঃ بِسْمِ اللّٰهِ (আমি আল্লাহর নামে এর পিঠে আরোহণ করছি)। যখন তিনি সওয়ারীর পিঠে ঠিকভাবে বসলেন তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বললেন এবং কুরআনের এই আয়াত পড়লেন ঃ

سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

"অতীব পবিত্র নিষ্কলূষ সেই সত্তা যিনি এ জন্তুকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা নিজেরা একে বশ মানাতে সক্ষম হতাম না। আমাদেরকে আমাদের রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে।"

অতঃপর তিনবার আলহাদুলিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার বলে নীচের দোয়াটি পড়লেন ঃ

سُبْحَانَكَ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ اِنَّهُ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

"হে আল্লাহ, তুমি অতীব পবিত্র ও নিষ্কলুষ। আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ মাফ করতে পারে না।"

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে রওনা হওয়ার সময় যখন উটের পিঠে ঠিক হয়ে বসে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন, তারপর سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ আয়াত পড়তেন এবং এ দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى - اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ

"হে আল্লাহ্, আমার এ সফরে আমি তোমার কাছে নেকী, তাকওয়া এবং তোমার পছন্দীয় আমল করার প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ, আমার এই সফরকে আমার জন্য সহজ এবং এর দূরত্বকে সংকুচিত করে দাও। হে আল্লাহ্, আমি সফরের কষ্ট এবং পরিবারবর্গের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ, আমি সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ফিরে এসে পরিবার-পরিজন ও ঘরবাড়ীর করুণ অবস্থায় দেখা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

সফরকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দোয়া

ইউনুস ইবনে 'উবায়েদ বলেন, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অবাধ্য কোন সওয়ারী জন্তুর পিঠে উঠে নিচের আয়তটি তার কানে শুনিয়ে দিয়েছে আর আল্লাহর হুকুমে তা শান্ত হয়নি।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ (ال عمران)

"তারা কি আল্লাহর দ্বীনকে পরিত্যাগ করে আর কোন পথ ও পন্থা চায় অথচ আসমান ও যমীনের সব কিছুই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার আনুগত্য করছে? আর তার দিকেই তাদেরকে ফিরে যেতে হবে।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, এ বিষয়টি পরীক্ষিত। আমি এটি প্রয়োগ করেছিলাম এবং যেভাবে বলা হয়েছে ফলাফল তাই পাওয়া গেছে।

হযরত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, সফরকালীন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জনপদে প্রবেশ করতে মনস্থ করলে তা দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا ظَلَلْنَ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا اَقْلَلْنَ وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا اَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِيْنَ وَمَا ذَرَيْنَ اَسْاَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

হে আল্লাহ, হে সাত আসমান ও তার ভেতরের সবকিছুর ওপর ছায়া বিস্তারকারী আসমানের রব এবং সাত যমীন ও তার মধ্যকার যা কিছু তা ধারণ করে আছে তার রব এবং শয়তান ও যাদেরকে সে গোমরাহ করে আছে তার বর এবং বাতাস ও যা কিছু তা উড়িয়ে নিয়ে যায় তার রব, আমি তোমার কাছে এ জনপদের, জনপদের বাসিন্দাদের এবং জনপদে যা কিছু বিদ্যমান তার কল্যাণ প্রর্থনা করছি। আর এ জনপদ এবং এ জনপদে বিদ্যমান সবকিছুর অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জনপদে প্রবেশ করার সময় পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاحًا وَحَبِّبْنَا اِلٰى اَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحَ اَهْلِهَا اِلَيْهَا (الطبرانى بسند احمد)

হে আল্লাহ, এ জনপদকে আমাদের জন্য বরকতময় করে দাও। হে আল্লাহ এই জনপদের কল্যাণ থেকে আমাদের উপকৃত করো। এর অধিবাসীদের হৃদয়ে আমাদের জন্য ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদের হৃদয়ে এর উত্তম লোকদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও।

খাওয়া বিনতে হাকীম রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোথাও তাঁবু খাটিয়ে নিচের দোয়াটি পড়বে সেখান থেকে বিদায় হওয়ার পূর্বে নিশ্চিতভাবেই কোন কিছু তার ক্ষতি করবে না।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আমি আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের সাহায্যে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি"। (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আহমাদ, মালিক, ইবনে খুযায়মা)

আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সফরকালে কোথাও রাত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়তেন ঃ

يَا اَرْضُ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّمَا فِيْكَ وَشَرِّمَا خُلِقَ فِيْكَ وشرما يدب عليك واعوذ بالله من اسدواسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد

হে ভূমি, আমার ও তোমার রব আল্লাহ। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি তোমার অকল্যাণ থেকে, তোমার মধ্যে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে এবং তোমর ওপর যা বিচরণ করে তার অকল্যাণ থেকে। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি হিংস্র জন্তু থেকে, পাপী ও অপরাধীদের থেকে, সাপ ও বিচ্ছু থেকে, বাসিন্দা এবং জন্মদাতা ও জন্মগ্রহণকারীর অকল্যাণ থেকে।

নতুন কাপড় পরার সময় পড়ার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাজী কাসানী হাজা ওয়া রাজাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিন্নী ওয়া কুওয়াতা। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ আল্লাহ পাকের জন্যই সকল প্রশংসা, যিনি আমাকে ইহা পরিধান করাইলেন এবং আমার শক্তি ও ক্ষমতা ছাড়াই ইহা আমাকে দান করেছেন।

আয়নায় মুখ দেখার সময় পড়ার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَحَسِّنْ خُلُقِىْ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আনতা হাস্‌সানতা খালক্বী ফাহসিন খুলুক্বী। (নাসাঈ)।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আপনি আমার চেহারা যে রূপ সুন্দর করেছেন, চরিত্রও তদ্রুপ সুন্দর করে দিন।

ঈমানের সহিত মৃত্যুলাভের দোয়া

১. ঈমানের উপর কায়েম-দায়েম থাকা ও ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ফরয-নামাযের পর অত্যন্ত বিনয় ও আন্তরিকতার সহিত এই দোয়া পাঠ করিবে ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

অর্থ ঃ হে আমাদের মা'বূদ ও প্রতিপালক, তুমি যে আমাদিগকে হেদায়েত প্রাপ্ত করেছ, এর পর আমাদের অন্তর সমূহকে বক্র করিয়া দিওনা এবং

আমাদিগকে তোমার নিকট হইতে 'বিশেষ রহমত' দান কর। কেননা, নিশ্চয় তুমি মস্ত বড় দাতা ও নিঃস্বার্থ দাতা।

তাফসীরে-রূহুল-মাআনীতে লিখিয়াছে –

اَلْمُرَادُ بِهٰذِهِ الرَّحْمَةِ التَّوْفِيْقُ لِلْاِسْتِقَامَةِ عَلٰى طَرِيْقِ الْحَقِّ

নতুন ফল দেখে পড়ার দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ মওসূমের নতুন ফল উঠলে লোকজন যখন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করতেন, তখন তিনি এই দুয়া পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مَدِيْنَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ مُدِّنَا

"হে আল্লাহ, আমাদের ফলে বরকত দান করো। আমাদের শহরে বরকত দান করো। আমাদের সা'-তে বরকত দান করো এবং আমাদের 'মুদ্দে' বরকত দান করো।"

এর পর সেই ফলটি তিনি সর্বাপেক্ষা কমবয়সী শিশুকে দিতেন। (মুসলিম)

ঈমানের সাথে মৃত্যুর দোয়া

২. নিম্ন বর্ণিত দোয়াটিকে নিয়মিত ওযীফা করিয়া নিবে এবং সর্বদা অধিক পামিাণে পাঠ করিতে চেষ্টা করিবে ঃ

يَا حَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

অর্থ ঃ হে চিরঞ্জীব, যাহার বরকতে এ বিশ্ব-জগত জীবন প্রাপ্ত, হে শক্তিধর রক্ষণাবেক্ষণকারী, যাহার দয়ার উপর প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি বিন্দুর অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তোমারই রহমতের উসীলায় তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি। এই ইছিম্দ্বয়ের ভিতর ইছমে-আ'যমের তা'ছীর ও ত্বাকত রহিয়াছে। ঈমানে দৃঢ়তা ও ঈমান সহকারে মৃত্যুর জন্য এবং সর্বরকমের বিপদ ও পেরেশানী হইতে নাজাতের জন্য ইহা অব্যর্থ তদ্বীর। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন ধরনের বিষন্নতা, অস্থিরতা ও পেরেশানীর মুহূর্তে অধিকাংশ সময়ে এই দোয়া পাঠ করতেন। (মেশকাত শরীফ ২১৬ পৃষ্ঠা)

ঈমানের সহিত ১ম মৃত্যুর আমল

১ মেসওয়াক করার বরকতে কালেমা নসিব হয়।

বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা ইবনে-আবেদীন শামী (রঃ) একটি রেওয়ায়েত উদ্বৃত করিয়াছেন–

صَلٰوةٌ بِسِوَاكٍ اَفْضَلُ مِنْ سَبْعِيْنَ صَلٰوةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ (شامى جـ صـ ٨٤)

অর্থ ঃ মেসওয়াকওয়ালা অযূর দ্বারা এক রাকআত নামায, মেসওয়াক বিহীন অযূর সত্তর রাকআত নামায অপেক্ষা উত্তম ও অধিক সাওয়াব।

(ফাতাওয়া-শামী ১ম খণ্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা)

তিনি আরও লিখেছেন যে,

وَمِنْ مَنَافِعِهٖ تَذْكِيْرُ الشَّهَادَةِ عِنْدَالْمَوْتِ (شامى جـ١ صـ٨٥)

মেস্ওয়াকের সুন্নতের উপর আমলের বরকতে মৃত্যুর সময় কালেমায়ে-শাহাদত স্মরণ হয়ে যায়। (শামী ১ম খণ্ড, ৮৫ পৃষ্ঠা)

মেমওয়াক ধরার নিয়ম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে-মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা মতে মেসওয়াক ধরিবার সুন্নত নিয়ম এই যে, ডান হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলি মেসওয়াকের নিম্নভাগের নীচে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি উহার উপরিভাগের নীচে ও বাকী আঙ্গুল সমূহ মেসওয়াকের উপরে স্থাপন করিবে। (শামী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৫)

ঈমানের সাথে মৃত্যুর ২য় আমল

বর্তমান ঈমানের জন্য শোকর করা

অর্থাৎ আল্লাহপাক যে আমাদিগকে ঈমান নসীব করিয়াছেন, সেজন্য প্রত্যহ উহার শোকর আদায় করা। কারণ, আল্লহপাকের ওয়াদা রহিয়াছে যে, لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ নেআমতের শোকর আদায় করিলে অবশ্যই তিনি নেআমত বাড়াইয়া দিবেন। অতএব, বর্তমান ঈমানের শোকর আদায় করিলে অবশ্যই এতে ঈমানের মজবুতি ও উন্নতি সাধিত হইবে।

ঈমানের সাথে মৃত্যুর ৩য় আমল

কুদৃষ্টি হতে হেফাযত

কুদৃষ্টি হতে হেফাযতের বিনিময়ে 'হালাওয়াতে ঈমান'-এর (অর্থাৎ ঈমানের মাধুর্যের) ওয়াদা রয়েছে। অন্তরে একবার এই হালাওয়াত নসীব হইয়া গেলে আর কখনও তাহা ছিনিয়ে নেয়া হয় না। অতএব, ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভের সুসংবাদও এতে অন্তর্নিহিত রয়েছে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে-কুদসীতে এরশাদ করেছেন –

اِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ اَبْدَلْتُهُ اِيْمَانًا يَّجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهِ

(طبرانى عن ابن مسعود رضـ ـكنز العمال ج ٥ صـ٢٢٨)

অর্থ ঃ (আল্লাহপাক বলেনঃ) কুদৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত তীর। যে আমার ভয়ে তা বর্জন করিবে, এর বদলে আমি তাকে এমন ঈমান নসীব করব যার মুধুরতা সে তার অন্তরের মাধ্যে অনুভব করিবে। (কানযুল-উম্মাল ৫ম খণ্ড ২২৮ পৃষ্ঠা)

ঈমানের সাথে মৃত্যুর ৪র্থ আমল

আযানের পরের দোয়ায়ে-ওসীলা

আযানের পর যে দোয়াটি পড়া হয় তাকে দোয়ায়ে- ওসীলা বলে। আযানের সময় আযানের কালেমা সমূহের জওয়াব দিন। আযান শেষ হওয়ার পর প্রথমতঃ দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া তারপর নিম্নোক্ত দোয়ায়ে ওসীলা পড়ুন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি উক্ত নিয়মে এই দোয়া পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফাআত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যাবে।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রঃ) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, ইহাতে উক্ত ব্যক্তির ঈমানের সাথে মৃত্যু লাভের সুসংবাদ রয়েছে। কারণ, কোন কাফের-বেঈমান তো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফাআত পাবে না। তার শাফাআত হবে একমাত্র ঈমানদারদের জন্য। (মেরকাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৩)

ঈমানের সাথে মৃত্যুর ৫ম আমল ঃ

আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও মহব্বত দ্বারা ও মুসলিম শরীফের একাধিক রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহর জন্য আল্লাহওয়ালাদের সোহবত ও আল্লাহওয়ালাদের সহিত মহব্বতের বরকতে ঈমানের সহিত মৃত্যু লাভের আসমানী ফয়সালা হয়ে যায়।

রেওয়ায়েত ঃ ১ যাকেরীন তথা ছালেহীন ও ওলীআল্লাহদের মর্তবা সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে যে, এক ব্যক্তি তার নিজের কোন কাজের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে কিছুক্ষণের জন্য সালেহীন বা আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে যিকিরের মজলিসে বসল অতঃপর আল্লাহপাক যখন ফেরেশতাদের সম্মুখে ঐ সকল

যাকেরীনের জন্য ক্ষমার ঘোষণা দিলেন, ফেরেশতাগণ তখন বলতে লাগলেন, আয় আল্লাহ, অমুক ব্যক্তিটি তো নিছক নিজের কাজেই আসিয়াছিল এবং সেই সুবাদেই কিছুক্ষণ ওখানে বসেছিল। পরন্তু, সে গুনাহগারও। জবাবে আল্লাহপাক ইরশাদ করিলেন ঃ هُمُ الْقَوْمُ لَايَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ ইহারা আমার এমনই মাক্‌বূল ও মাহবূব বান্দা যে, এদের মজলিসে অংশগ্রহণকারীও (আমার রহমত হতে) বঞ্চিত হয় না। আমি আমার ঐ পাপী বান্দাটিকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

বিখ্যাত মোহাদ্দিস হাফেয ইবনে-হাজর আছকালানী (রঃ) বলেন ঃ

اِنَّ جَلِيْسَهُمْ يَنْدَرِجُ مَعَهُمْ فِىْ جَمِيْعِ مَا يَتَفَضَّلُ اللّٰهُ بِهٖ عَلَيْهِمْ اِكْرَامًا لَّهُمْ (فتح البارى ج ١١ صـ٢١٣)

অর্থ ঃ এ নিশ্চয় যে, আল্লাহপাক তার ওলীদিগকে যত নেআমত ও অনুগ্রহ দান করেন, তাদের সম্মানার্থে তাঁহাদের মজলিসে অংশ গ্রহণকারী এবং তাদের সহিত উঠা-বসাকারী বান্দাদিগকেও তিনি এসকল নেআমত দান করে দেন। যেভাবে মহামান্য মেহমানের খাতিরে তাঁর নগণ্য খাদেমকেও ঐ সকল সম্মানজনক খাদ্য-সামগ্রী দ্বারা আপ্যায়ন করা হয় যাহা মূলতঃ ঐ মেহমানের জন্যই তৈয়ার করা হয়ে থাকে। (ফাতহুল-বারী, খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা ২১৩)

তিনি আরও বলেন ঃ

اِنَّ الذِّكْرَ الْحَاصِلَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ اَعْلٰى وَاَشْرَفُ مِنَ الذِّكْرِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِحُصُوْلِ ذِكْرِ الْاٰدَمِيِّيْنَ مَعَ كَثْرَةِ الشَّوَاغِلِ وَوُجُوْدِ الصَّوَارِفِ وَصُدُوْرِهٖ فِىْ عَالَمِ الْغَيْبِ بِخِلَافِ الْمَلَائِكَةِ فِىْ كُلِّ ذَالِكَ (فتح البارى ١١/٢١٢)

"মানুষের যিকির ফেরেশতাদের যিকির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম। কারণ, মানুষ জগতের অসংখ্য ঝামেলা অসংখ্য বাধ-বিপত্তির মধ্যে থাকিয়াও এবং আল্লাহকেনা দেখিয়াও আল্লাহর যিকির করে, স্মরণ করে, আল্লাহকে ভুলিয়া যায় না। পক্ষান্তরে, ফেরেশতাদের ত কোন ভাবনা নাই, ঝামেলা নাই, বাধা-বিপত্তি নাই। পরন্তু, তাহারা আল্লাহপাককে দেখিতেছে এবং সেই হালতে তাহার যিকির করিতেছে।"

জাহান্নাম হতে মুক্তির দোয়া

হযরত মুসলিম তামীমী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে চুপে-চুপে বলেছেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায শেষ কর তখন কারো সাথে কথা বলার আগেই সাত বার এই দোয়া পাঠ করিও –

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ

যদি তুমি তাহা পাঠ কর, আর ঐ রাত্রেই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে 'মুক্তি' লিখিয়া দেওয়া হইবে। ফজরের নামাযের পরও যদি অনুরূপ (কাহারও সহিত কথা বলার আগেই) এই দোয়া পাঠ কর, আর ঐ দিনই তোমার মৃত্যু হইয়া যায়, তবে তোমার জন্য জাহান্নাম হইতে 'মুক্তি লিখিয়া দেওয়া হইবে। (আবূ দাউদ শরীফ, মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২১০)

যে দোয়ার ছাওয়াব এক হাজার দিন পর্যন্ত লেখা হয়

হযরত ইবনে-আব্বছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

গুরুত্ব পূর্ণ একটি দোয়া

যে ব্যক্তি (একবার) এ দোয়া পাঠ করবে, এর ছাওয়াব সত্তর (৭০) জন ফেরেশতাকে এক হাজার দিন পর্যন্ত ক্লান্ত-শ্রান্ত করে দিবে। অর্থাৎ এক হাজার দিন পর্যন্ত লাগাতার এর ছাওয়াব লিখতে লিখতে তারা ক্লান্ত হয়ে যান।

দোয়াটি এই جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَّا هُوَ اَهْلُهٗ

(তবরানী, তারগীব ও তারহীব, ফাযায়েলে দরূদ ৪৪ পৃষ্ঠা)

মুনাফিকী ও রিয়া হতে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَاِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার অন্তর আত্মাকে কঠোরতা হতে, আমার কার্যক্রম বা আচরণকে বাহ্যড়ম্বর হতে, আমার জিহ্বাকে মিথ্যা হতে এবং আমার চক্ষুকে বিশ্বাসঘাতকতা ও অসাধুতা হতে বিশোধিত ও বিমুক্ত করে দিন কেননা চক্ষু সমূহের চোরকে আপনি জানেন এবং যা কিছু অন্তর গোপন করে তাও জানেন।

আল্লাহ্‌র মহব্বত, আল্লাহ্‌র ওলীদের মহব্বত ও নেক্ আমলের তওফীক হাসিলের দোয়া

এমন একটি দোয়া যার বরকতে আল্লাহপাকের মহব্বত, আল্লাহর ওলীদের মহব্বত হাসিল হয় যে সকল আমলেরও উসীলায় আল্লাহর মহব্বত হাসিল হয়, ঐ সকল আমলেরও তওফীক নসীব হয় এবং অন্তরে আল্লাহ্‌র মহব্বত জান-মালের মহব্বতের চেয়ে অধিক ও গভীর হয়ে যায়। পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি যত প্রিয়, আল্লাহর মহব্বত তদপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে যায়।

হযরত আবূ-দারদা (রাঃ) একজন বিশিষ্ট সাহাবী, যিনি বড় আলেম ও ফকীহ ছিলেন। শাম দেশে বসবাস করতেন এবং দামেশ্‌ক ইনতেকাল করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস্-সালাম আল্লাহর নিকট এভাবে দরখাস্ত করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ

অর্থা ঃ হে আল্লাহ্, আমি আপনার মহব্বত চাই, আপনাকে যারা মহব্বত করে তাদের মহব্বত চাই এবং যে-কাজ, যে-আমল আমাকে আপনার মহব্বতের দিকে নিয়া যাবে সে আমলের ভিক্ষা চাই। হে আল্লাহ্, আপনার মহব্বতকে আমার নিকট আমার জান্ হতে, আমার আওলাদ-পরিজন হতে এবং ঠান্ডা পানি হতে অধিক প্রিয় বানিয়ে দিন।

(তিরমিযী, জাওয়াহেরুল- বোখারী ৫৭২)

দ্বীনের উপর অটল থাকার দোয়া

হযরত শাহ্‌র বিন হাওশাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত উম্মে-ছালাম রাযিয়াল্লাহু আন্‌হাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, হে উম্মুল-মো'মিনীন, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আইলাইহি ওয়াছাল্লাম যখন ঘরে অবস্থান করিতেন তখন তিনি অধিক সময় কোন্ দোয়া করিতেন? তিনি বলিলেন, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় এই দোয়া করিতেন

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ

অর্থ ঃ হে অন্তর সমূহের পবির্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনি আপনার দ্বীনের উপর অটল-অবিচল রাখুন।

(তিরমিযী শরীফ, জাওয়াহেরুল-রোখারী ৫৭১)

যে ব্যক্তি এ দোয়া করতে থাকবে এবং এর রবকতে ঈমানের সহিত মৃত্যু নসীব হইবে।

কবরের আযাব, দোযখ, ধন-দৌলতের খারাবি ও অভাব-অনটনের ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

উম্মুল-মোমিনীন হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা বর্ণনা করেন যে, হযরত রাসূলে-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাক্যাবলীর দ্বারা দোয়া করিতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِوَ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের সংকট হতে, দোযখের আযাব হতে এবং ধন-সম্পদ ও অভাব-অনটনের ক্ষতি ও অনিষ্ট হতে। (আবু দাউদ, তিরমিযী, জাওয়াহেরুল-বোখারী ৫৭০ পৃষ্ঠা)

হোদায়েত, তাক্ওয়া-পরহেযগারী, দুশ্চরিত্র হতে হেফাযত ও ধন-সম্পদ লাভের দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে-মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট হেদায়েত, তাক্ওয়া-পরহেযগারী, দুশ্চরিত্র হইতে হেফাযত ও ধন-সম্পদ প্রার্থনা করছি।

(জাওয়াহেরুল বোখারী ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوْفُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ ঃ ইন্নাল্লাহা বিন্নাসি লারাউফর রাহীম।

অর্থ ঃ অবশ্যই আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি স্নেহশীল ও দয়ালু।

ফযর ও মাগবিবের নামাযের পর- ৭ বার।

حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ ঃ হাসবিয়াল্লাহু লা- ইলাহা ইল্লা-হুওয়া আলাইহি তাওয়াক্কালতু ওয়াহুওয়া রাব্বুল আরশিল আজীম।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম। (বুখারী ও মুসলিম)

জামে' দোয়া (সর্বমুখী ভালাইর দোয়া)

ইহা এমন একটি দোয়া যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওতী ২৩ বৎসর যিন্দেগীর সমস্ত দোয়াই ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কারণ,

হযরত আবূ-উমামা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সম্মুখে অনেক-অনেক দোয়া করেছেন, কিন্তু আমাদের কয়েক জনের তন্মধ্য হতে একটি দোয়াও স্মরণ নেই। তাই, আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি তো অনেক দোয়া বলেছেন, কিন্তু তার কিছুই আমরা মনে রাখতে পারি নাই। তিনি বললেন, আমি কি তোমাদিগকে এমন একটি দোয়া শিখাইয়া দিব, যা আমার সমস্ত দোয়ার উপর পরিব্যপ্ত, যা আমার যাবতীয় দোয়া সমূহকে অন্তর্ভূক্তকারী? তোমরা এই দোয়া পড়িও ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَاَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ঐ সকল নেআমত ও ভালাই প্রথর্না করি যে সকল নেআমত ও ভালাইর জন্য তোমার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার দরবারে প্রার্থনা করেছেন এবং আমি তোমার আশ্রয় ও পানাহ্ চাই ঐ সকল বিপদ ও খারাবি হতে যে সকল বিপদ ও খারাবি হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন তোমার নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ফরিয়াদ ও মিনতি শ্রবণ এবং তা পূরণ করা যে তোমারই কাজ। আর পাপ-কর্ম হইতে বাঁচার কোন উপায় এবং নেক-কাজ করার কোন শক্তি নাই আল্লাহপাকের সাহায্য ব্যতীত। (জাওয়াহেরুল বোখারী ৫৭২ পৃষ্ঠা)

লা-হাওলা ওয়ালা-কুউআতা ইল্লা বিল্লাহ এর আমল।

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) আমাকে বলেছেন ঃ (আবু হুরায়রা,) لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ 'লা-হাওলা ওয়ালা কুউআতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশি বেশি পাঠ কর। কারণ, ইহা জান্নাতের রত্ন ভান্ডার।

সুদানের বাসিন্দা, সিরিয়ার মুফতী, উচ্চ মার্যদা সম্পন্ন তাবেঈ হযরত মাকহূল (রাঃ) তাঁহার নিজের উক্তিতে বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَا مَنْجَامِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ 'লা-হাওলা-ওয়ালা-কুউ-ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা মানজা মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি, পাঠ করিবে, আল্লাহপাক তার সত্তরটি অসুবিধা দূর করিয়া দিবেন। তন্মধ্যে সব চাইতে ছোট অসুবিধা হল অভাব-অনটন বা আর্থিক দৈন্য।

লা-হাওলার চারটি ফায়দা ও ফযীলত

১– লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ কালেমাটি আরশের নীচে অবস্থিত জান্নাতের একটি অমূল্য রত্ন-ভান্ডার। আর জান্নাতের ছাদ হইল আল্লাহপাকের আরশ। ইহা পাঠ করিলে নেক আমল ও সৎকর্ম সমূহ অবলম্বন করার এবং পাপাচার হইতে বাঁচার তওফীক মিলিতে থাকে। এই অর্থেই ইহাকে জান্নাতের রত্নভান্ডার বলা হইয়াছে।

২– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, লা-হাওলা ওয়ালা কুউআতা ইল্লা বিল্লাহ (দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কীয়) নিরানব্বইটি ব্যাধির ঔষধ, যার মধ্যে সর্বাধিক হালকা ব্যাধি হইল পেরেশানী

(চাই তা দুনিয়া সম্পর্কিত হউক কিংবা আখেরাত সম্পর্কিত)।

(মেরকাত, ৫ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠা)।

৩– বান্দা যখন এই কালেমা পাঠ করে, আল্লাহপাক তাহার আরশ হতে ফেরেশতাদিগকে সম্বোধন করে বলেন, আমার বান্দাটি আমার অনুগত ও ফরমাবরদার হয়ে গেছে, এবং অবধ্যতা ও সীমালংঘন পরিহার করে দিয়েছেন।

শিরকে খফী (সূক্ষ শিরক) হতে রক্ষাকারী দোয়া

শিরকে আক্রমণ অতি গোপনে, অত্যান্ত সূক্ষভাবে ঘটেয় যায়। অন্ধকার রাতে কালো-পাথরের উপর দিয়া কালো-পিপীলিকার চলাচল দৃষ্টিগোচর হওয়া কত কঠিন ও দুঃসাধ্য ব্যাপার? তদপেক্ষা অধিক সূক্ষভাবে, গোপন পথে, অলক্ষ্যে, সামান্য সামান্য অসাবধানতার মধ্য দিয়া মানুষের অন্তরে শিরক ঢুকে পড়ে। উম্মতের বড় বড় সবল ব্যক্তিগণও এই সূক্ষতর শিরক হতে খুব কমই রক্ষা পেয়ে থাকেন। তা হলে, দ্বীন-ঈমানে যারা দুর্বল, তাহাদের কি অবস্থা হতে পারে? (মেরকাত্, ১০ম খণ্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, পরম-প্রিয় হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কালো পাথরের উপর দিয়া পিপীলিকার পদ-চালনের চেয়েও অধিকতর সূক্ষ ও গোপনভাবে আমার উম্মতের ভিতর শিরক প্রবেশ করে। (কানযুল-উম্মাল ২য় খণ্ড, ৮১৬ পৃষ্ঠা)

এতদ শ্রবণে হযরত সিদ্দীক-এ-আকবর (রাঃ) খুবই ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং আরয করলেন

فَكَيْفَ النَّجَاةُ وَالْمَخْرَجُ مِنْ ذَالِكَ ؟

ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তা হলে ইহা হতে রক্ষা পাওয়া কিভাবে সম্ভব? নাজাতের কি উপায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি কি

তোমাকে এমন একটি দোয়া বলে দিবনা যা পাঠ করলে তুমি অল্প শির্ক, অধিক শির্ক, ক্ষুদ্র শির্ক, বৃহৎ শির্ক সর্বপ্রকার শির্ক হতে রক্ষা পাইয়া যাইবে? (يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ مَا يُذْهِبُ عَنِّىْ قَلِيْلَهُ وَكَثِيْرَهُ وَصَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ) তিনি বললেন, জ্বীহাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ অবশ্যই বাতলাইয়া দিন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনে তুমি এই দোয়া পাঠ করিও ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, তোমার নিকট আমি একান্ত ভাবে পানাহ চাই জানিয়া-শুনিয়া তোমার সাথে শিরক করা থেকে। আর না জেনে-না বুঝে শিরক্ হয়ে গেলে তজ্জন্য তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (কান্‌যুল-উম্মাল, ৮১৬ পৃষ্ঠা)

এক আযীমুশ-শান্ ওযীফা

মাগফেরাত, জান্নাত, ৭০ টি প্রয়োজন পূরণ ও দুশমনের উপর জয় লাভের আমল ঃ

এটি একটি অতি মূল্যবান ওযীফা। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সূরায়ে ফাতেহা, আয়াতুল-কুরছী, শাহিদাল্লাহু আন্নাহু--এবং আল্লহুম্মা মালিকাল-মুলকি নাযিল হইতেছিল তখন এগুলি আরশকে জড়িয়ে ধরে ফরিয়াদ করেছিল ঃ হে আল্লাহ, আপনি আমাদিগকে এমন এক জাতির উপর নাযিল করতেছেন যারা আপনার নাফরমানীতে লিপ্ত হবে। আল্লাহপাক ইরশাদ করলেন ঃ আমার ইয্যত ও প্রতাপের কসম, আমার সুউচ্চ মর্যাদার কসম, যারা প্রত্যেক ফরয নামাযের পর তোমাদিগকে তেলাওয়াত করবে, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিব, জান্নাতুল-ফেরদাউসে জায়গা দিব, রোজ তাহার সত্তরটি প্রয়োজন পূরা করে দিব যাহার মধ্যে সবচেয়ে 'ক্ষুদ্র প্রয়োজন' হল মাগফেরাত (বা গুনাহের ক্ষমা)।

(দাইলামী।)

কোন-কোন রেওয়ায়েতে ইহাও আছে যে, তাদেরকে আমি তাদের দুশমনদের উপর বিজয়ী করব।

(তাফসীরে-রূহুল-মাআনী, পারা ৩, পৃষ্ঠা ১০৬)।

আমল করার তরীকা

প্রথমঃ আলহামদু শরীফ, তারপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করিবেন।

আলহামদু শরীফ ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ – اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ – اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ – صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ – غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

আয়াতুল কুরছী ঃ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَالَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَؤُدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ

অতঃপর ঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ – لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ – اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ – وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

তারপর পড়িবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ইছমে-আ'যম

১. হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ছিলেন। এক ব্যক্তি নামায পড়তেছিল। নামাযের পর সে এই দোয়া পাঠ করল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاحَىُّ يَا قَيُّوْمُ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদ্রশ্রবণ করার পর সাহাবীগণকে বললেন, বলতে পার, লোকটি কিরূপ দোয়া পড়ল ?

সকলে বললেন, সেই যাতের কসম যার হাতে আমাদের জীবন, নিঃসন্দেহে সে ইসমে-আ'যমের দ্বারা দোয়া করিয়াছে যার সহিত দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় এবং যাহা কিছু প্রার্থনা করা হয় আল্লাহপাক তা দান করেন।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, রূহুল মাআনী ২৭ পারা, ১১০ পৃষ্ঠা)

লক্ষণীয় যে, রাসূলে-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম কসম করে বলেছেন যে, ইহা ইসমে আ'যম।

২. একদা এক ব্যক্তি এই দোয়া পাঠ করিতেছিল ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلَّااَنْتَ الْاَحَدُالصَّمَدُ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আমি আপনার দরবারে আমার আর্যি পেশ করছি এই উসীলায় যে, আমি আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই আল্লাহ, আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নাই। আপনি এমন মা'বূদ যিনি এক, লা-শারীক, বে-নিয়ায, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সকলেই তার মুখাপেক্ষী, এবং যিনি কারো জনকও নন, জাতকও নন, পিতা-মাতাও নন, সন্তান-সন্ততিও নন এবং যার কোন সমকক্ষ নাই, সমতুল্য নাই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করে ইরশাদ করলেন, সেই আল্লাহর কসম যার হাতে আমার জীবন, অবশ্যই সে ইসমে-আ'যম দ্বারা দোয়া করেছেন, যার উসীলায় দোয়া করলে আল্লাহপাক তাহা কবুল করেন এবং যাহা কিছু প্রার্থনা করা হয়, তিনি তা দান করেন।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কেহ যদি কোন শক্তিশালী ভিটামিন সেবন করে, তবে তাহার উপকার লাভের জন্য অবশ্যই তাহাকে বিষ পান হইতে বিরত থাকিতে হইবে। অনুরূপভাবে, উল্লেখিত ফাযায়েল বা দোয়া সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ উপকারিতা

তাহারাই হাসিল করিতে পারিবে যাহারা গুনাহ সমূহ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য যথার্থ চেষ্টা ও ফিকির করে, কখনও পদস্খলন ঘটিয়া গেলে কাল বিলম্ব না করিয়া তাওবা ও এস্তেগফার করে, সংশ্লিষ্ট গুনাহ বর্জন করে এবং অনুতাপ-অনুশোচনা ও রোদন করে। অতএব, উল্লেখিত দোয়া ও ওযীফা সমূহের দ্বারা পূর্ণমাত্রায় উপকৃত হওয়ার জন্য পাপাচার হতে বেচে থাকার জন্য যথার্থ চেষ্ট-ফিকির করা অত্যন্ত জরুরী।

অতি উপকারী কতগুলি বিষয়

এই সূরা পাঠ করিলে ১০ খতম কোরআনের ছাওয়াব ঃ

হযরত আনাছ (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি একবার সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করবে, আল্লাহপাক তাকে দশ বার কোর্‌আন খতম করার ছাওয়াব দান করবেন।

(তিরমিযী-শরীফ, মেশকাত শরীফ ১৮৭ পৃষ্ঠা)

এক মিনিটে এক খতম কোরআনের ছাওয়াব

হযরত আবুদারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাহু ফরমাইয়াছেন ঃ সূরায়ে এখলাছ একবার পাঠ করলে পবিত্র কোনরআনের এক তৃতীয়ংশ পাঠ করার ছাওয়াব পাওয়া যায়।

(মুসলিম শরীফ, মেশকাত শরীফ ১৮৫)

হাকীমুল-উম্মত, মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন, এই হাদীসের আলোকে বলা হয় যে, এই সূরা তিন বার পাঠ করলে এক খতম কোরআন শরীফের ছাওয়াব পাওয়া যায়।

এক হাজার আয়াতের ছাওয়াব

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূরায়ে আলহাকুমুত-তাকাছুর পাঠ করলে আল্লহপাক তাকে এক হাজার আয়াত পাঠ করার ছাওয়াব দান করেন। (তাফসীর-মাযহারী ১০ম খণ্ড)

এক শত নফল হজ্জের ছাওয়াব ঃ

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে ১০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার ছুবহানাল্লাহ পাঠ করবে, আল্লাহপাক তাকে এক শত নফল হজ্জের ছাওয়াব দান করবেন। (মেশকাত শরীফ ২০২পৃষ্ঠা।)

প্রতি কদমে ১ বৎসরের নফল রোযা ও ১ বৎসরের নফল নামাযের সাওয়াব

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি জুমআর দিনে (১) নিজের পোশাকাদি ভালভাবে ধুইবে (২) এবং গোসল করবে, (৩) আগে-আগে

মসজিদে যাবে, (৪) পায়ে হেটে যাবে, সওয়ার হইয়া নয়, (৫) ইমামের নিকটে গিয়া বসবে, (৬) মনেযোগের সাথে খোৎবা শ্রবণ করিবে, (৭) কোন অহেতুক কথা হইতে বিরত থাকিবে, (অতি সহজ এই ৭টি আমলের রবকতে) আল্লাহপাক তাহাকে তাহার প্রতি কদমের বিনিময়ে এক বৎসরের নফল নামায ও এক বৎসরের নফল রোযার ছাওয়াব দান করিবেন।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাছায়ী, ইবনে মাজাহ মেশকাত ১২২ পৃষ্ঠা।)

বাড়ী-ঘর, ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের, আগুন ও সব ধরনের বিপদ হইতে নিরাপদ থাকার দোয়া

কেহ আসিয়া হযরত আবুদার্‌দা (রাঃ)-কে সংবাদ দিল যে, আগুন লাগিয়া আপনার ঘর ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। হযরত আবুদারদা একেবারে কোনরূপ উদ্বিগ্ন না হইয়া বলিলেন, কখনও না, আল্লাহপাক কিছুতেই এরূপ করবেন না। কারণ, আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লাম-এর মুখে শুনেছি, যে ব্যক্তি দিনের শুরুতে এই দোয়াটি পাঠ করিবে, সে সন্ধা পর্যন্ত সকল বিপদ হতে হেফাযতে থাকবে, কোন বিপদই তাহাকে স্পর্শ করতে পারবেনা। আর সন্ধ্যায় পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকিবে না। আর সন্ধ্যায় পাঠ করিলে সকাল পর্যন্ত নিরাপদ থাকিবে। এক রেওয়ায়েতে আছে, তার নিজের মধ্যে, তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ও তার ধন-সম্পদের মধ্যে কোন বিপদ-আপদ দেখা দিবে না। আজ সকালে আমি এই দোয়াটি পাঠ করেছি। অতএব, আমার ঘরে কিরূপে আগুন লাগতে পারে? অতঃপর তিনি লোকদিগকে বললেন, তোমরা যেয়ে দেখে নাও। সকলের সঙ্গে তিনিও ঘটনাস্থলে পৌছে দেখলেন যে, সত্যই মহল্লায় আগুন লেগেছিল এবং হযরত আবুদারদার ঘরের চতুর্দিকের ঘর সমূহ পুড়ে গেছে দোয়াটি এই –

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ – اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا

অর্থ ঃ হে আল্লাহ, আপনি আমার রব, আপনি আমার পালনকর্তা। আপনি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। একমাত্র আপনার উপরই আমার ভরসা। আপনি আরশে আযীমের মালিক। আল্লাহ যা চান, তা হয়। আর তিনি যা চান না, তা হয় না। মহীয়ান্-গরীয়ান্ আল্লাহপাকের সাহায্য ব্যতীত না গুনাহ হইতে বাঁচার কোন উপায় আছে, না এবাদত করার কোন শক্তি আছে। আমি নিশ্চিত

ভাবে জানি যে, নিশ্চয় আল্লাহপাক সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং তাহার জ্ঞান সবকিছুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।

(উছ্ওয়ায়ে রাসূলে-আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩১১ পৃষ্ঠা।)

বিশেষ মুনাজাতসমূহ

১। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ও গঠন সম্পর্কে চিন্তাশীল লোকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই নিবেদন পেশ করে ঃ

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ

(ال عمران ١٩٣)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-ইন্নানা-সামি' না-মুনা-দিইয়াঁই ইয়ুনা-দী লিল্ ঈমা-নি আন্ আ-মিনূ বিরাব্বিকুম ফা আ-মান্না-রাব্বানা- ফাগফিরলানা- যুনুবানা-ওয়া কাফফির আন্না- সাইয়্যিআ-তিনা-ওয়া তাওয়াফ্ফানা- মা'আল আবরা-র।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমরা একজন আহবানকারীর আমন্ত্রণ শুনতে পেয়েছি, যে ঈমানের জন্যে আহবান জানাচ্ছিল (এবং বলছিল যে) তোমরা তোমাদের খোদাকে মেনে নাও; আমরা তাঁর দাওয়াত কবুল করেছি। অতএব, হে আমাদের পরোয়ারদিগার! (গাফলতির দরুণ) যে অপরাধ আমরা করেছিতা ক্ষমা করে আমাদের মধ্যে যা কিছু অন্যায় ও দোষত্রুটি রয়েছে, তা দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সঙ্গে আমাদের শেষ পরিণতি সম্পন্ন কর।

২। খোঁদার অনুগত বান্দারা তাঁর ফরমানের প্রতি এইভাবে আনুগত্য ঘোষণা করে ঃ

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ

(ال عمران ٥٣ঃ)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-আ-মান্না-বিমা-আনঝালতা ওয়াত তাবা'নার রাসূলা ফাক্তুবনা মা'আশা-হিদীন।

অর্থ ঃ হে খোদা! তুমি যে ফরমান নাজিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রসূলের অনুসরণ করার পন্থা কবুল করেছি। তুমি আমাদের নাম সাক্ষ্যদাতাদের সাথে লিখে নাও।

৩। ঈমানী দায়িত্ব পালনে আল্লাহর রহমত প্রার্থনা

মুমিন বান্দাগণ ঈমানী দায়ীত্ব পালনে আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে এভাবেঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-লা-তু আ-খিয্না-ইন্না সীনা-আও আখত্বানা- রাব্বানা-ওয়ালা-তা'হমিল 'আলাইনা ইসরান কামা-'হামল্তাহূ আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা-,রাব্বানা-ওয়ালা-তাহাম্মিলনা-মা-লা-ত্ব-ক্বাতা লানা-বিহি, ওয়া'ফু 'আন্না-ওয়াগফিরলানা-ওয়রাহামনা-আন্তা মাওলানা-ফানসুরনা আলাল কাওমিল কা-ফিরীন

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! ভুল-ভ্রান্তিবশতঃ আমাদের যা কিছু ত্রুটি হয়, তার জন্যে আমাদের শাস্তি দিও না। হে খোদা! আমাদের উপর সেই ধরনের বোঝা চাপিয়ে দিওনা, যে রূপ পূর্বগামী লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলে। হে খোদা যে বোঝা বহন করার শক্তি- ক্ষমতা আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিও না। (প্রভু হে !) আমাদের প্রতি উদারতা দেখাও আমাদের মাওলা আশ্রয়দাতা; কাফিরেদের উপর তুমি আমাদের সাহায্য দান কর।

৪। নবীদের সঙ্গী-সাথী ও আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী লোকেরা নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করেঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَافِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (ال عمران ١٤٧)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ ফিরলানা-ওয়া ইসরা-ফানাফী আমরিনা-ওয়া সাব্বিত আক্বদা-মানা-ওয়ানসুরনা-আলাল্ক্বাওমিলকা-ফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা কর, আমাদের কর্মকান্ডে তোমার নির্দিষ্ট সীমা যাকিছু লংঘিত হয়েছে তা মাফ কর, আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফিরদের মুকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

৫। আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী মুমিনদের তওফীক কামনা

নবীদের সঙ্গী-সাথী ও আল্লাহর পথে সংগ্রামীকারী লোকেরা নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (ال عمرام ١٤٧)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ্ ফিরলানা-যুনূবানা- ওয়া ইস্‌রা-ফানা-ফী আম্‌রিনা-ওয়া সাব্বিত আক্বদা-মানা-ওয়ানুসুরনা-আলাল ক্বাওমিওল কা-ফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! আমাদের ভুলত্রুটি ও অক্ষমতাকে ক্ষমা কর, আমাদের কর্মকান্ডে তোমার নির্দ্দিষ্ট সীমা যাকিছু লংঘিত হয়েছে তা মাফ কর, আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফেদের মুকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

৬। ঈমানদার ব্যক্তিদের আল্লাহ নির্ভরতার অভিব্যক্তি

ঈমানদার ব্যক্তিগণ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সথীদের ন্যায় আল্লাহর উপর নির্ভরতা ব্যক্ত করে নিম্নরূপ ভাষায় ঃ

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-আলাইকা তাওয়াক্কালনা- ওয়া ইলাইকা আনাবনা-ওয়া ইলাইকাল মাসীর।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! তোমার উপরই আমারা ভরসা ও নির্ভরতা রেখেছি, তোমার দিকেই আমরা প্রত্যাবর্তন করেছি এবং তোমার সমীপেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে ঃ

৭। মুমিন বান্দাদের জন্যে ফিরেশতাদের মাগফিরাত কামনা

আরশের নিকটবর্তী ফিরেশতারা ঈমানদার লোকদের জন্যে মাগফিরাত কামনা করে এই ভাষায় ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-ওয়াসি'তা কুল্লা শাইয়িন রা'হমাতাঁও ওয়া ইলমান ফাগফির লিল্লাযীনা তা-বূ ওয়াত্তাবা' উ সাবীলাকা ওয়াক্বিহিম আযাবাল জ্বা'হীম।

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! তুমি তোমার রহমত ও ইলম দ্বারা সকল জিনিসকে গ্রাস করে রেখেছ, অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোজখের আযাব থেকে বাঁচাও সেই লোকদেরকে যারা তাওবা করেছে এবং তোমাদের পথ অবলম্বন করে নিয়েছে।

৮। আল্লাহর কাছে মুমিন বান্দার হিকমত ও জান্নাত প্রার্থনা

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর প্রকৃত অনুবর্তী খোদার কাছে হিকমত প্রার্থনা করে এই ভাষায়।

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ (الشعراء)

উচ্চারণ ঃ রাব্বি হাবলী' হুকমাঁও ওয়াল 'হিক্বনী বিস্‌সা-লি'হীন।

অর্থ ঃ হে আমার খোদা! আমাকে হিকমত (জ্ঞান-বুদ্ধি) দান কর। আর আমাকে নেক লোকদের সাথে মিলিত কর।

৯। আপন পিতামাতা ও সন্তানদের জন্যে কৃতজ্ঞ বান্দার দোয়া

আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত লাভের পর কৃতজ্ঞ বান্দা ও সন্তানদের জন্যে দোয়া করে নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ
(ابراهيم ٤٠)

উচ্চারণ ঃ রাব্বিজ্ব' আলনী মুক্বীমাস সালা-তি ওয়া মিন যুরবিইয়াতী, রাব্বানা-ওয়া তাক্বাব্বাল দোয়া-ই।

অথ ঃ হে আমার খোদা! আমাকে নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী বানাও, আর আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও (এমন লোক বের কর, যারা এ কাজ করবে)। হে খোদা! আমার দোয়া কবুল কর।

১০। তারা আপন পিতামাতার জন্যে প্রার্থনা করে এই বলে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ
(ابراهيم ٤١)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানাগ ফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াক্বূমুল হিসা-ব।

অর্থ ঃ হে খোদা! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে-আর সব ঈমানদার লোকদেরকে সেই দিন ক্ষমা করে দিও, যেদিন হিসাব কার্যকর হবে।

১১। শয়তানী চক্রান্ত ও বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া

ঈমানদার ব্যক্তি শয়তানী চক্রান্ত থেকে সুরক্ষার জন্যে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এ ভাষায় ঃ

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنَ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ
(المؤمنون ت٩٧/٩٨)

উচ্চারণ ঃ রাব্বি আ'ঊযুবিকা মিন হামঝা-তিশ শায়া-তিন, ওয়া আ'ঊযুবিকা রাব্বি আইয়াহযুরূন।

অর্থ ঃ হে পরোয়ারদিগার ! আমি সব শয়তানের উত্তেজনা সৃষ্টি থেকে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। বরং হে আমার খোদা ! আমি তো তোমার কাছে তাদের আগমন থেকেও আশ্রয় চাই।

আল্লাহর খাঁটি বান্দা কোন ভ্রান্তির দরুন বিপদে নিপতিত হলে হযরত ইউনুস (আ)-এর ন্যায় পরিত্রান কামনা করে এ ভাষায় ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জা-লিমীন।

অর্থ ঃ নেই কোন মাবুদ তুমি ছাড়া, পবিত্র মহান সত্তা। আমি অবশ্যই অপরাধী-জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

১২। আল্লাহর নির্দেশ লংঘনের পর অনুতপ্ত বান্দাদের তওবা

আল্লাহর নির্দেশ লংঘনের পর তাঁর অনুতপ্ত বান্দারা আদিমানব হযরত আদম (আ) ও তাঁর স্ত্রীর ন্যায় ক্ষমা প্রার্থনা করে নিম্নরূপ ভাষায় ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ (الاعراف ٢٣)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা- জালামনা- আনফুসানা - ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা-ওয়া তার'হামনা-লানাকূনান্না মিনাল খা-সিরীন।

অর্থ ঃ হে খোদা ! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর জুলূম করেছি। এখন তুমিই যদি আমাদের ক্ষমা না কর এবং আমাদের প্রতি রহম না কর, তাহলে আমরা নিশ্চিতই ধ্বংস হয়ে যাব।

প্রকৃত মুত্তাকী ও জান্নাত প্রত্যাশী লোকেরা জাহান্নাম থেকে বাঁচার আকুতি জানায় এভাবে ঃ

رَبَّنَآ اِنَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(ال عمران ١٢)

উচ্চারণ রাব্বানা-ইন্নানা-আ-মান্না-ফাগফিরলানা-যুনূবানা-ওয়াক্বিনা-আযা-বান না-র।

অর্থ ঃ হে খোদা ! আমরা ঈমান এনেছি; আমাদের গুনাহ্-খাতাহ (দোষত্রুটি) মাফ কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।

দয়াময় আল্লাহর সচেতন বান্দারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্যে আরো প্রার্থনা জানায় ঃ

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

(الفرقان٢٥)

উচ্চারণ রাব্বানাস্ রিফ' আন্না- আযা-বা জাহান্নাম, ইন্না আযা-বাহা-কা-না গারা-মা।

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও; তার আযাব তো বড়ই প্রাণন্তকরভাবে লেগে থাকে।

১৩। কোন উত্তম কাজ সম্পাদনের পর মুমিনের দোয়া

ঈমানদার ব্যক্তি কোন মহোত্তম কাজ সম্পাদনের পর তার কবুলিয়তের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করে, যেমন করে মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আ) এবং তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) কাবাগৃহের প্রাচীর নির্মাণের পর দোয়া করেছিলেন এই ভাষায় ঃ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ (البقرة ١٢٧)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-তাক্বাব্বাল মিন্না- ইন্নাকা আনতাস সামীউল'আলীম।

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! আমাদের এই কাজকে তুমি কবুল কর (একে বকরত ও কল্যাণে পূর্ণ করে দাও নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা ও জ্ঞাত)।

১৪। যান-বাহনে আরোহনের সময় মুমিনদের খোদা-নির্ভরতা

মুমিন বান্দাগণ যান-বাহনে আরোহনের সময় আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করে বলে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ (الزخرف ١٣-١٤)

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাল লাযী সাখখারা লানা-হা-যা- ওয়ামা-কুন্না-লাহু মুক্বরিনীন, ওয়া ইন্না-ইলা-রাব্বিনা-লামুনক্বালিবূন।

অর্থ ঃ মহান পবিত্র তিনি, যিনি আমাদের জন্যে এই জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। নতুবা আমরা তো এগুলোকে বশ করতে পারতাম না। আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের খোদার নিকট ফিরে যেতে হবেই।

তারা নৌযানে আরোহনের সময় হযরত নূহ (আ)-এর ন্যায় নিবেদন করে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسٰهَا إِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (هود ٤١)

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হি মাজ্বরে-হা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বী লাগাফূরুর রাহীম।

অর্থ ঃ নূহ তাঁর অনুসারীকে নৌকা আরোহনের আদেশ দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহর নামেই এর চলা এবং এর স্থিতি। আমার খোদা বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

১৫। বিশাল শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় আল্লাহর সাহায্য কামনা

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ (البقرة ٢٥)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা- আফরিগ্ আলাইনা-সাবরাঁও ওয়া সাব্বিত্ আক্বদা-মানা- ওয়ানছুরনা- আলাল ক্বাওমিল কা-ফিরীন।

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং কাফিরদের উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর।

১৬। দোজাহানরে কল্যাণকামী বান্দাদের প্রার্থনা

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرة)

উচ্চারণ ঃ রাব্বানা-আ-তিনা-ফিদ দুনইয়া-হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতি হাসানাতাঁও ওয়াক্বিনা-আযা-বান্না-র।

অর্থ ঃ হে আমাদের খোদা! আমাদেরকে এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও আমাদেরকে কল্যাণ দাও; আর দোজখের আযাব থেকে আমাদের রক্ষাকর।

স্ত্রী-সংসর্গে যাবার দোয়া

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন আপন স্ত্রীদের সংসর্গে যাবে, তখন আল্লাহর কাছে এই দোয়া করবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জ্বান্নিবনাশ শাইত্বা-না ওয়া জ্বান্নিবিশ শাইত্বা-না মা-রাঝাক্বতানা।

অর্থ ঃ মহান আল্লাহর নামে। প্রভু হে! আমাদেরকে শয়তানের কবল থেকে নিরাপদ রেখ আর আমাদের নসীবে যা কিছু তুমি লিপিবদ্ধ করেছ (অর্থাৎ সন্তানাদি) তা থেকে শয়তানকে দূরে সরিয়ে রেখ।

প্রসবকালীন পড়ার দোয়া

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রসব বেদনা শুরু হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ও যয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-কে এ নির্দেশ দান করে তার কাছে পাঠালেন যে, তার কাছে গিয়ে আয়াতুল কুরসী ও নিম্নোক্ত দু'টি আয়াত তিলাওয়াত করো এবং সূরা ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দাও।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ، تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ – اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

"প্রকৃতপক্ষে তোমাদের রব আল্লাহ যিনি ছয়দিনে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করে তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা ঢেকে দেন। দিন রাতের পেছনে দৌড়িয়ে চলে। তিনি সূর্য, চাঁদ ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন যা তার নির্দেশের অনুগত। সাবধান! সৃষ্টি ও নির্দেশ তারই। অতীব কল্যাণময় আল্লাহ, সারা বিশ্বজাহানের রব ও পালনকর্তা। তোমাদের রবকে ডাকো মিনতিসহ ও চুপে চুপে। অবশ্যই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না"।

সন্তান ভূমিষ্টকালীন দোয়া

হাদীসের বর্ণানা থেকে জানা যায়, হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর যখন প্রসব-বেদনা শুরু হয়, তখন রসূলে আকরাম (সঃ) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ও জয়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)-কে তাঁর কাছে এই বলে প্রেরণ করেণ যে, তাঁর পার্শ্বে বসে 'আয়াতুল কুরসী' এবং নিম্নোক্ত দোয়া তিলাওয়াত করবে এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে তাঁকে ফুঁক দেবে ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

উচ্চারণ ঃ ইন্না রাব্বাকুমুল্লা-হুল লাযী খালাক্বাস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযা ফী সিত্তাতি আইয়্যা-মিন সুম্মাস তাওয়া-আলাল 'আরশ, ইয়ুগশিল লাইলান নাহা-রা ইয়াতলুবুহূ হাসীসাঁও ওয়াশ শাম্‌সা ওয়াল ক্বামারা ওয়ান্ নূজুমা মুসাখখারা-তিম বিআমরিহ, আলা-লাহুল খালকু ওয়াল আমরা তাবা রাকাল্ল হু রাব্বুল আ-লামীন। উদ'উ রাব্বাকুম তাযাররু আঁও ওয়া খুফইয়াতান তাদীন।

অর্থ ঃ নিঃসেন্দেহে তোমাদের প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ যিনি আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর বিশ্ব-সিংহাসনের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন এবং তারপর দিন রাতের পিছনে

ছুটে চলে আসে। তিনি সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন। সব তাঁরই নির্দেশের অনুগত। সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই। অত্যন্ত বকরতময় আল্লাহ, সমগ্র বিশ্বের মালিক ও প্রভু (তিনিই) আপন প্রভুকে ডাক কাঁধ কাঁধ কণ্ঠে ও চুপিসারে; তিনি সীমা লংঘনকরীকে কখনো পসন্দ করেন না।

সন্তান লাভের জন্য দোয়া ঃ

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

(সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত-৩৮)

কোন মছীবতে পড়লে পড়ার দোয়া

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (সূরা আল্ ইমরান)

সহজে প্রসব হওয়ার জন্য

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ- وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ – وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ- وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ

(সূরা ইনশেকাক ঃ আয়াত-৪)

সহজে প্রসব হওয়ার জন্য উক্ত আয়াত লিখিয়া বাম রানে বাঁধিবে। কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র খুলে ফেলবে।

রূযী-রোযগার বৃদ্ধির দোয়া ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ – تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (সূরা আল্ ইমারান ঃ আয়াত-২৬-২৭)

ফরয ও নফল নামাযসমূহের পর এবং শুইবার সময় পড়িতে থাকিলে রূযী-রোযগার বৃদ্ধি পায় এবং দরিদ্রতা দূর হয়।

নিদ্রা দমন

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ -اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ- وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ (সূরা আ'রাফা ঃ আয়াত ঃ ৫৪-৫৬)

ইহা পড়িয়া যদি নিদ্রা দমনের জন্য দো'আ করা হয়, তবে সহজে নিদ্রা দূর হইয়া যায়।

বৃষ্টি প্রার্থনার দোয়া

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাত উঠিয়ে অত্যন্ত বিনয় ও কান্নার সাথে এ দোয়া করতে দেখেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَّرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اٰجِلٍ

"হে আল্লাহ্, আমাদেরকে এমন বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত করো যা আমাদের সাহায্য করবে, আনন্দদায়ক ও সৌন্দর্য হবে; ক্ষতিকর নয়, উপকারী হবে এবং দেরীতে নয়, অবিলম্বে আসবে।

বৃষ্টির আগমন দেখে পড়ার দোয়া

সুনানে আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম আকাশের দিগন্তে মেঘের সামান্যতম আভাস দেখলে ও কাজ ছেড়ে দিতেন, এমনকি নামাযও ছেড়ে দিতেন এবং এই দোয়া পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ

"হে আল্লাহ, এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে আমি তা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অতিবৃষ্টিতে পড়ার দোয়া

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন জুম'আর দিন এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুতবা দিচ্ছিলেন। সে সম্বোধন করে বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, অর্থ-সম্পদ ও গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত উপায়-উপকারণ ও উৎস বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসমানের দিকে হাত তুলে বললেন ঃ

মেঘের গর্জন ও বিদ্যুত চমকানো-কালীন পড়ার দোয়া

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, তিনি মেঘের গর্জন শুনলে কথাবার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং কুরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতটি পড়া শুরু করতেন ঃ

يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ (الرعد -١٣)

"মেঘের গর্জন আল্লাহর প্রশংসার সাথে তার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে এবং ফেরেশতারা তার ভয়ে কম্পিত হয়ে তার পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে।"

(আর রা'দ-১৩)

হযরত কা'ব বলেন ঃ এ রকম পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি উপরোক্ত আয়াতটি তিনবার পড়বে সে মেঘের গর্জন থেকে নিরাপদ থাকবে। তিরমিযীতে আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের কড়কড় শব্দ শুনতেন তখন বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

"হে আল্লাহ আমাদেরকে তোমার গযব দিয়ে হত্যা করো না এবং তোমার আযাব দ্বারা ধ্বংস করো না। এমনটি হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে তোমার নিরাপত্তা দান করো।

ঝড়-ঝঞ্জাকালীন পড়ার দোয়া

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঝড়ঝঞ্জা হচ্ছে আল্লাহর ফুৎকার। তা রহমতও বয়ে আনে আবার আযাবও বয়ে আনে। তাই ঝড়ঝঞ্জা দেখলে খারাপ বলবে না। তা থেকে কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর এবং অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। (আবু দাউদ)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাল্লাম ঝড় শুরু হতে দেখলে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ

(صحيح مسلم)

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে এই ঝড়ের কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ প্রর্থনা করছি এবং

এর মধ্যে যা আছে তার অকল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

ক্রোধ প্রশমনের দোয়া ও পন্থা

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"যদি কখনো শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রর্থনা কর। তিনি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী।"

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ এর সময় পড়ার দোয়া

সহীহ বুখারী মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ সূর্য চন্দ্রগ্রহণ কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে ঘটেনা। তোমরা যখন কোন গ্রহণ লাগতে দেখবে, তখন আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করবে এবং দান-খয়রাত করবে।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুররহমান বিন সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করছেন ঃ রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন কালের একটি ঘটনা। আমি মদীনার বাইরে তীর চালনা করছিলাম। হঠাৎ সূর্যগ্রহণ শুরু হলো। আমি তীর-ধনুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে চলে আসলাম। তিনি তখন হাত উঁচু করে আল্লাহর তাসবীহ, প্রশংসা ও দোয়া করছিলেন। সূর্য রাহুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দোয়া করতে থাকলেন। এরপর তিনি জামা'আতের সাতে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন এবং তাতে দু'টি দীর্ঘ সূরা পড়লেন।

হাদীসের বর্ণনা অনুসারে এই নামাজের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নাতিদীর্ঘ খুতবা পেশ করেন। এতে তিনি বলেন

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقَبْرِ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا فَيُقَالُ

لَهُ ؛ نَمْ صَالِحًا فَقَدْ عَلِمْنَا اِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا وَاَمَّا الْمُنَافِقُ اَوِ الْمُرْتَابُ فَيَقُوْلُ ؛ لَاَدْرِىْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

অর্থ ঃ সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দুটি নিদর্শন মাত্র। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এতে গ্রহণ লাগেনা। তোমরা এরূপ পরিস্থিতি (গ্রহণ) দেখলে আল্লাহকে ডাকবে, তাকবীর উচ্চারণ করবে নামাজ পড়বে, সদকা দেবে। আমার কাছে অহী এসেছে ঃ কবরে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে, তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কি জানো ? মুমিন প্রত্যয়শীল ব্যক্তি-জবাব দেবে ঃ 'আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি এসেছেন সুস্পষ্ট নির্দেশ ও নিদর্শনাবলীসহ, আমরা তাঁর সত্যতা স্বীকার করেছি এবং তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছি। এরপর তাকে বলা হবে ঃ ভাল থাক, আমরা পূর্বেই জানতাম, তুমি মুমিন। কিন্তু মুনাফিক-সংসয়বাদী ব্যক্তি-এর জবাবে বলবে ঃ এই ব্যক্তি সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। আমি লোকদের কিছু বলতে শুনেছি এবং নিজেও তাই বলছি।

আয়ু বৃদ্ধির প্রার্থনা

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ دِيْنِىَ الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِىْ وَاَصْلِحْ لِىْ دُنْيَاىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَاشِىْ، وَاَصْلِحْ لِىْ اٰخِرَتِىَ الَّتِىْ فِيْهَا مَعَادِىْ ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِىْ فِىْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِىْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আসলিহ্ লী দ্বীনী, আল্লাযী হুয়া'ইসমাতু আমরী, ওয়া আসলিহ লি দিনীয়া আল্লাতী ফীহা-মা'আ-শী, ওয়াআসলিহ লি আখিরাতি আল্লাতি ফিহা সাআদি ওয়াজ্ব'আলিল হায়া-তা' ঝিয়া-দাতাল্ লী ফী কুল্লি খাইর্ ওয়াজ্ব'আলিল মাওতা রা-'হাতাল লী মিন্ কুল্লি শাররর্।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার দ্বীনকে আমার জন্যে সুমার্জিত করে দাও, যা আমার কাজের সুরক্ষাকারী; আমার দুনিয়াকে আমার জন্যে পরিশুদ্ধ করে দাও, যার মধ্যে রয়েছে আমার জীবিকা; আমার আখিরাতকে আমার জন্যে সুমার্জিত করে দাও, যেখানে আমায় ফিরে যেতে হবে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে আমার আয়ু বৃদ্ধি করে দাও আর প্রতিটি অনিষ্টকর কাজ থেকে। মৃত্যুকে আমার জন্যে আরামদায়ক করে দাও।

বার্ধক্য ও কার্পণ্য থেকে আশ্রয় কামনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বলে দোয়া করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَاوَالْمَمَاتِ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল 'আজ্‌যি ওয়াল কাসালি ওয়াল জুবনি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া'আ'ঊযু বিকা মিন আযা-বিল ক্বাবর, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন ফিতনাতিল মা'হইয়া-ওয়াল মামা-ত্।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে। আমি আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে এবং আশ্রয় চাইছি তোমার কাছে জীবন মৃত্যুর ফিতনা থেকে।

মাতা-পিতার জন্য রহমতের দোয়া

رب ارحمهما كما ربينى صغيرا

অর্থ ঃ হে রব! আমার মাতা পিতার উপর ঐরূপ দয়া করুন, করুণা করুন যে রূপ তাঁরা আমাকে ছেলে বেলায় দয়া ও মায়া মমতার সাথে লালন পালন করেছিলেন"।

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্যের দোয়া

رَبِّ اَعِنِّىْ وَلَا تُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَ لَاتَنْصُرْعَلَىَّ وَاهْدِ نِىْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِىْ

অর্থ ঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য করুন। আমার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করবে না। আমাকে সফলতা দান করুন, আমার প্রতিপক্ষকে দান করবেন না। আমাকে সত্য পথের পথিক করুন এবং সত্য পথকে আমার জন্য সহজ লভ্য করে দিন।

অপমৃত্যু ও যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَالتَّرَدِّىْ وَمِنَ الْغَرْقِ وَالْحَرْقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ يَّتَخَبَّطَنِىَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ لَدِيْغًاوَاَعُوْذُبِكَ مِنْ طَمْعٍ يَهْدِىْ اِلٰى طَبْعٍ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার মাথার ওপরে কিছু ধ্বসে পড়ার কারণে অথবা অন্য যে কোন কারণে আমি ধ্বংস হয়ে যাই, অথবা পানিতে ডুবে অথবা আগুনে জ্বলে মৃত্যুবরণ করি এ থেকে এবং বার্ধক্য জনিত কষ্টের হাত হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আশ্রয় চাচ্ছি শয়তান যেন মৃত্যুর সময় আমাকে গোমরাহ না করে। আর আশ্রয় চাচ্ছি আমি যেন দংশিত হয়ে না মরি। আমি আরও আশ্রয় চাচ্ছি লোভ লালসা হতে যা' মানুষকে কুপ্রবৃত্তির দিকে নিয়ে যায়।

বালা-মুসীবতের সময়কালীন দোয়া

হাদীস-১ ঃ হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "বিপদ থেকে মুক্তির কালিমাগুলো এই-

لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

হাদীস-২ ঃ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে কাসেম বিন আব্দুর রহমান বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যখন কোন পেরেশানী, চিন্তা ও দুঃখ-মুসীবত আসত, তখন তিনি এই কালিমাসমূহ পড়তেন-

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ

হাদীস-৩ ঃ হযরত আবু বকরাহ (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির এই দোয়া পড়া উচিত

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنِىْ اِلٰى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ - وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهٗ شَانَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فِىْ عَفْوٍ مِّنْكَ وَعَافِيَةٍ لَااِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ

হাদীস-৪ ঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন-যখন কোন দুঃখ-মুসীবত আসে, তখন এই দোয়া পড়-

لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

হাদীস-৫ ঃ হযরত আসমা বিনতে উমাইছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, যে কোন ব্যক্তির উপর দুঃখ-দুর্দশা, চিন্তা-পেরেশানী এসে পড়ে আর সে এই কালিমাগুলো পড়ে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার উপর থেকে কষ্ট-ক্লেশ উঠিয়ে নেন। কালিমাগুলো হচ্ছে-اَللّٰهُ رَبِّىْ لَا شَرِيْكَ لَهٗ

হাদীস-৬ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে কোন মুসলমানের উপর চিন্তা-পেরেশানী আসে আর তখন ঐ ব্যক্তি এই কালিমাসমূহ পড়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার চিন্তা-পেরেশানী দুর করে দেন। কালিমাগুলো হচ্ছে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِىْ فِىْ يَدِكَ مَاضٍ فِىَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِىَّ قَضَائُكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَلَكَ سَمَّيْتَ بِهٖ نَفْسَكَ اَوْ اَنْزَلْتَهٗ فِىْ كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهٗ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَئْثَرْتَ بِهٖ فِىْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِىْ وَجَلَاءَ حُزْنِىْ وَذَهَابَ هَمِّىْ

হাদীস-৭ ঃ হযরত ইসমাঈল বিন আবী ফুদায়েক (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-যখন আমার উপর দুঃখ-কষ্ট ও মুসীবত আসে, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট এসে বলেন, এই দোয়া পড়ুন-

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَىِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

হাদীস-৮ ঃ হযরত মুহাম্মদ বিন আলী (রাঃ) বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে একটি দোয়া শিক্ষা দিলেন, যা তিনি পেরেশানী ও দুঃখ-দুর্দশা অবস্থায় পড়তেন। তারপর হযরত আলী (রাঃ) তাঁর সন্তানদেরকে এই দোয়া শিখিয়ে দিলেন। দোয়াটি এই-

يَا كَائِنًا قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَيَكُوْنُ قَبْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَكَائِنٌ بَعْدَ كُلِّ شَىْءٍ اِفْعَلْ لِىْ كَذَا كَذَا

এর জায়গায় আপন উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করতে হবে।

হাদীস-৯ ঃ এক ব্যক্তি হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ) এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দরখাস্ত করল-আপনার সম্মানিত পিতা হযরত আলীর (রাঃ) নিকটে (কোন প্রয়োজনে) আমার জন্য সুপারিশ করুন। হযরত হাসান (রাঃ) উত্তর দিলেন-হযরত আলী (রাঃ) এখন এমন এক জায়গায় আছেন, যার মধ্যে তিনি ঐ সময় বসেন-যখন কোন পেরেশানী ও চিন্তা-ফিকির হয়।

আগত ব্যক্তি বলল-আমাকে ঐ জায়গার কাছে নিয়ে যান, যেন আমি তাঁর কথা শুনি। সে কাছে গেলে শুনতে পায়-

كٓهٰيٰعٓصٓ يَا نُوْرُ يَا قُدُّوْسُ يَا حَيُّ يَا رَحْمٰنُ

এগুলো তিনবার পড়ার পর আলী (রাঃ) এ দোয়া পাঠ করলেন-

اِغْفِرْلِى الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تَحُلُّ النِّقَمَ وَاغْفِرْ لِى الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تُغَيِّرُ النِّعَمَ وَاغْفِرْلِى الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تُوْرِثُ النَّدَمَ وَاغْفِرْلِىْ الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تَحْبِسُ الْقَسْمَ وَاغْفِرْلِىْ الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تُنْزِلُ الْبَلَاءَ وَاغْفِرْلِىْ الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تَهْتِكُ الْاَغْطِيَةَ وَاغْفِرْلِىْ الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَاغْفِرْلِى الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَاغْفِرْلِى الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تُمْسِكُ غَيْثَ السَّمَاءِ وَاغْفِرْ لِى الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تُظْلِمُ الْهَوَاءَ وَاغْفِرْلِىْ الذُّنُوْبَ الَّتِىْ تَكْشِفُ الْغِطَاءَ

হাদীস-১০ ঃ হযরত মুসা (আঃ) যখন ফির'আউনের নিকট গেলেন, তখন তিনি এই দোয়া করেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হুনাইন যুদ্ধে এই দোয়া করেন। সেটি প্রতিটি বিপদগ্রস্তের দোয়া। তা হচ্ছে-

كُنْتَ وَتَكُوْنُ وَاَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوْتُ نَامُ الْعُيُوْنُ وَتَنْكَدِرُ النُّجُوْمُ وَاَنْتَ حَيٌّ قَيُّوْمٌ وَلَا تَاْخُذُكَ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

১০টি বিষয় যেগুলোর পাবন্দীর দ্বারা দ্বীনের অন্যান্য হুকুম পালন করার তৌফিক হবে (ইন্‌শাআল্লাহ্‌)

১। তাকওয়া ও এখলাসের ইহতিমাম করা। তাকওয়ার খোলাসা হল-ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সমূহের পাবন্দী করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদী থেকে বিরত থাকা। আর এখলাসের সার কথা হল- প্রত্যেক কাজ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য করা।

২। জাহেরী গুনাহের মধ্য থেকে কু-দৃষ্টি, কু-ধারনা, গীবত, মিথ্যা, পর্দাহীনতা এবং শরীয়ত পরিপন্থী চাল-চলন ও লেবাস-পোষাক থেকে বিশেষভাবে বিরত থাকা।

৩। মন্দ ও দুঃস্বভাব সমূহের মধ্যে অনর্থক গোস্বা করা, হিংসা, গর্ব, অহঙ্কার,বিদ্বেষ ও লোভ লালসার ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা।

৪। একাকী ও জামাতবদ্ধভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের খুব ইহতিমাম করা। এর নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধানসমূহও ভালভাবে জেনে নিবে। ফাযায়েলে তাবলীগের ৫নং হাদীস থেকে ৭নং হাদীস পর্যন্ত বারবার পড়তে থাকবে। বিশেষ করে ৫নং হাদীসটি।

৫। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হওয়া, বিশেষ করে আঙ্গিনা ও দরজার সম্মুখের স্থানসমূহ, তন্মধ্যে আবার মসজিদ ও মাদরাসার আঙ্গিনা ইত্যাদি আরো বেশী লক্ষনীয়।

৬। নামাযের সুন্নাত সমূহের মধ্যে হতে কিরাত, রুকু, সিজদা এবং তাশাহহুদে আঙ্গুল উঠানোর পদ্ধতি শিক্ষা করা এবং আযান ও ইকামতের সুন্নত সমূহকে মনোযোগ সহকারে জেনে নিয়ে তার উপর আমল করা।

৭। অভ্যাসগত সুন্নাত সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা। যেমন- খাওয়া-দাওয়া, শয্যাত্যাগ, মেলামেশা ও উঠা-বসা ইত্যাদিতে সুন্নাত তরীকার উপর আমল করা।

৮। দৈনিক কমপক্ষে এক রুকু পরিমান তিলাওয়াত করা এবং এক্ষেত্রে কুরআনে কারীমের সৌন্দর্যে প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখা, অর্থাৎ ইজ্হার, মা'রুফ-মাজহুল ইত্যাদি নিয়ম-কানূনের প্রতি লক্ষ্য করা এবং প্রতি নামাযের শেষে কমপক্ষে এগারবার দুরূদ শরীফ পাঠ করা, অথবা দৈনিক কোন নামাযের সময় এ তাসবীহ তিনশত বার পড়া সবচেয়ে উত্তম।

৯। পেশোনী ও কষ্টকর পরিস্থিতিতে এই কথা চিন্তা করে শোকর আদায় করা যে, এর থেকে বড় মুসীবত ও পেরেশানীতে আক্রান্ত হইনি, যেমন- জ্বর এলে চিন্তা করা যে, প্রস্রাব বন্ধ হওয়ার মত মারাত্মক রোগ তো দেখা দেয়নি! প্যারালাইসিস, উন্মাদনা ও মানসিক রোগসমূহে তো আর আক্রান্ত হইনি! পাশাপাশি রাখা যে, রোগের কারণে গুনাহ্ মাফ হচ্ছে অথবা এর কারণে সওয়াব পাওয়া যাবে।

১০। নিজের দৈনন্দিনের যাবতীয় কাজ কর্মের অজানা বিষয়াদির শরয়ী বিধান জেনে নেওয়া। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কাজের জরিপ করা, অথাৎ যেটা করনীয় সেটা ফরয-ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ, মুস্তাহাব ও মুবাহের মধ্যে হতে, নাকি বর্জনীয়? অর্থাৎ কুফর, শির্ক, হারাম, মাকরূহে তাহরীমী কিংবা মাকরূহে তানযীহীর মধ্য হতে! আল্লাহ না করুন, যদি নিজের কোন কাজ বর্জনীয় ও পরিহার্য্য বলে জানা যায়, তাহলে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সেটাকে পরিহার করা।

দুর্দশা হতে মুক্তি লাভের সহজ উপায়

উম্মতের বিপন্নতা এবং নানা ধরনের বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশার আসল কারণ হল- আমাদের বদ আমল। যেমন- আল্লাহ তা'আলা ২৫ তম পারার সূরা শূরা'র চতুর্থ রুকুতে এ কথাই বলেছেন। যার ব্যাখ্যা মিশকাত শরীফের 'কিয়ামাতের আলামত' সম্পর্কিত অধ্যায়- এর অধীনে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। এই সমস্যার একমাত্র সমাধান হল- বদ আমল পরিহার করা। আর বদ আমল বা মন্দ কাজ সাধারনত দুই কারণে হয়ে থাকে। এক. সঠিক ইলম না থাকা। দুই. ইলম মোতাবেক আমল না থাকা।

আমলের তৌফিক কিভাবে হয়

আমলের শক্তি ও সামর্থ হয় মুহাব্বত কিংবা ভয়ের মাধ্যমে। এটাকে হযরত খাজা আযীযুল হাসান (রহ:) তাঁর ভাষায় বলেন-

অর্থাৎ প্রভৃতিতে শিকার করার ইচ্ছা থাকলে রাতভর তুমি প্রতিক্ষার প্রহর গুনতে থাক, নিজে নিজেই চোখ খুলে যায় বারবার তোমার। আর ফজরের নামায পড়াটা হয় বোঝার মত।

সকালে যদি হয় শিকারের পণ,
বিনিদ্র রাতে রয় বেচারার মন;
চোখ দু'টি খুলে যায় ভুলে বারে বার,
অথচ ফজর পড়া হয়ে যায় ভার।

আর ভয়ের দৃষ্টান্ত হলো- কেউ ঠাণ্ডার কারণে ঘর থেকে বের হতে চায় না, কিন্তু প্রশাসক তলব করলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাজিরা দেয়। তবে ভয়-ভীতির কারণে যে কাজ করা হয়, তা হয় কষ্ট সহকারে। আর মুহাব্বতের কারণে কৃত কাজ হয় উৎসাহ ও আনন্দের সাথে।

আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধি করার উপায়

আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও মুহাব্বত বৃদ্ধি করার উপায় হল-

আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা ও মুহাব্বত বৃদ্ধি করার উপায় হল-

(ক) আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহসমুহের কথা চিন্তা করবে। যেমন- তিনি মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পানাহার ও বসবাসের এমন ব্যবস্থা করেছেন যে. লাখো মানুষের ভাগ্যে জোটে না। অতৎপর ঈমানের

নিয়ামত দান করেছেন, তার পাশাপাশি অন্যান্য নেক আমল এবং সুস্থ সবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন।

(খ) যে কোন সময় নির্ধারণ করে আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধির আশায় একশতবার কালিমায়ে তাইয়্যেবা, একশত বার ইসতিগফার এবং একশত বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে এবং একই নিয়তে-

سُبْحَانَ اللهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اللهُ أَكْبَرُ

বিভিন্ন সময় অনির্দিষ্ট সংখ্যায় পাবন্দীর সাথে পড়বে।

(গ) যে কোন দ্বীনী কাজ করার সময় এই আশা রাখবে যে, এর দ্বারা আল্লাহর মুহাব্বত বৃদ্ধি পাবে। যেমন-অযু করার সময়, সালাম দেওয়ার সময় ইত্যাদিতে একই নিয়ত করবে।

(ঘ) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনী চর্চা করবে, তেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরামের ইতিহাস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনাদর্শও অধ্যয়ন করবে।

(ঙ) কোন আল্লাহওয়ালার সান্নিধ্য লাভ করবে এবং তাঁর সাথে চিঠি-পত্রের যোগাযোগ রাখবে।

অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির আমল

১। মৃত্যুর কথা চিন্তা করবে যে, আখিরাতের জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে কোন কোন আমল কাজে আসবে।

২। আল্লাহ তা'আলার কয়েদখানা অর্থাৎ জাহান্নামের অবস্থা ও স্বরূপ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে এবং এই ধ্যান করবে যে, ফরয আমল সমূহ ত্যাগ ও নাজায়েয কাজ করার কারণে এই শাস্তি ভোগ করতে হবে। জাহান্নামের বিচ্ছু কিংবা সাপ কাউকে দংশন করলে ত্রিশ বছর যাবৎ তার বিষ বলবৎ থাকবে। মুশরিকদের জন্য আগুনের সর্বনিম্ন শাস্তি হল আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে। যার উত্তাপে মস্তিষ্ক উত্তপ্ত ডেগের মত টগবগ করবে। অতএব, এমন আমল থেকে আত্মরক্ষা করবে যা কুফর ও শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

৩। আর বিশেষ কোন আল্লাহওয়ালার সোহবত ও সান্নিধ্য লাভ করবে। এসব আমল করার দ্বরা ইন্‌শাআল্লাহ প্রত্যেক মু'মিন ওলী হতে পারে। সকলে এগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করলে উভয় জাহানের সফলতা ও কল্যাণ অর্জিত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। আর বর্তমান যুগের বিশেষ হালতসমূহের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতিও অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

১- জামাতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইহতিমাম করা। বিশেষ করে ফজরের নামাযের জামাতের।

২- ফরয নামায সমূহের পরে কিংবা অন্য যে কোন সময় দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিজের এবং উম্মতের ইসলাহ্ ও মুসলমানদের জন্য রোনাযারী করে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য দোয়া করা। আর যদি কান্না না আসে তাহলে কাঁদার ভান করে দোয়া করবে।

৩- ফজর ও মাগরিবের পরে সূরা ইখলাস (কুলহুআল্লাহ শরীফ), সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিন তিন বার করে পাঠ করা।

৪- সব ধরনের গুনাহ্ হতে বিরত থাকার বিশেষ ইহতিমাম করা- যেগুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে 'দাওয়াতুল হক হারদুঈ'- এর পক্ষ হতে লিফলেট আকারে প্রকাশ করা হয়েছে (বক্ষমান পুস্তিকাতে সেটাকে সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে)। আর বিস্তারিত বিবরণ 'হায়াতুল মুসলিমীন' 'জাযাউল আ'মাল' বা 'কর্মগুণে সুখ-দুঃখ' ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এ কিতাব দু'টি হযরত হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কর্তৃক রচিত।

৫- কুতবুল আলম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া সাহেব (রহ.)- এর 'হিকায়াতে সাহাবা' নামক কিতাবটি পড়বে এবং অধমের 'আমাদের ধ্বংসের প্রতিকার' নামক বয়ান সংস্করণটি অধ্যয়ন করবে, সেটাকে নিজে শুনবে ও পরিবারের লোকদেরকে শুনাবে।

৬- বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কঠিন কাজে বুযুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া এবং তাদের পরামর্শ করা।

৭- কেউ জুলুম করলে উত্তম হল ক্ষমা করে দেওয়া এবং ধৈর্য্য ধারণ করা। যদি একান্ত বদলা নিতে চায়, তাহলে সেটাও জায়েয আছে, তবে জুলুমের বদলা নেওয়ার সময় যেন জুলুম হয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন- কেউ গালমন্দ করল,এর বদলা স্বরূপ তাকে প্রহার করা জুলুম। অনুরূপ কেউ কারো ভাইকে প্রহার করল, এর বদলা স্বরূপ প্রহারকারীর ভাইকে মারা হল- এটাও জুলুম। সুতরাং জুলূমের প্রতিশোধ নেওয়ার নিয়ম সম্পর্কে উলামায়ে কিরামকে জিজ্ঞাসা করে সে অনুযায়ী আমল করবে।

৮- আত্মরক্ষা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার যেসব জাহেরী উপকরণ রয়েছে, শরীয়ত ও রাষ্ট্রের নিয়ম- কানূনের প্রতি লক্ষ রেখে সেগুলো গ্রহণ করবে।

৯- হুকুকুল ইসলাম বা ইসলামের অধিকারসমূহ প্রত্যেককে উত্তমরূপে পাঠ করবে। প্রতিবেশীদের অধিকারের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখবে। বিশেষ করে

যদি প্রতিবেশী অমুসলিম হয়। হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, ঐ ব্যক্তি উচ্চ স্তরের মুসলমান,যার দ্বারা কারো কোন প্রকার কষ্ট না হয়। এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রহ.)বর্ণনা করেছেন।

১০-প্রত্যেক নামাযের সময় নিজের আমল সমূহের মুহাসাবা করবে। অর্থাৎ যাচাই করবে যে, নেক কাজ কতটুকু হয়েছে। অতঃপর সেগুলোর প্রতি শুকরিয়া আদায় করবে। আর মন্দ কাজের জরিপও করবে এবং সেজন্য তওবা ইস্তিগফার করবে। তওবার নিয়ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের কাছ থেকে জেনে নিবে।

১১- মন্দ কর্মকান্ড সমূহ থেকে বাধা প্রদানের জন্যও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্ট থাকা চাই। বিস্তারিত দেখুন- 'আমাদের ধ্বংসের প্রতিকার'।

১২-হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মু'মিনের জন্য নিজকে নিজে লাঞ্ছিত করা উচিৎ নয়। আরয করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ কথার মর্ম কি? ইরশাদ হল- নিজকে লাঞ্ছিত করার অর্থ হল- যে সমস্যা সামাল দিতে পারবে না, নিজকে সেটার সম্মুখীন করা। তিরমিযী

ফায়দা- কারণ স্পষ্ট, কেননা এরূপ করার দ্বারা পেরেশানী ও ঝামেলা বৃদ্ধি পায়। ঐ সকল কাজও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেগুলো নিজের শক্তি ও সামর্থের বাহিরের। বরং যদি কোন প্রতিপক্ষের তরফ হতেও কোন প্রকার হট্টগোল ও ফিতনা ফাসাদ প্রকাশ পায়, তাহলে হাকিম ও বিচারকদের মাধ্যমে তা প্রতিহত করবে। হয়ত বিচারক নিজে কোন ব্যবস্থা করবে, অথবা তোমাকে প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দেবে।

আর যদি বিচারকের পক্ষ থেকেই কোন অনাকাঙ্খিত ঘটনার সম্মুখীন হও, তাহলে ভদ্রতার সাথে নিজে কষ্টের কথা কিছু না হয়, তাহলে সবর করবে এবং কোন প্রকার কাজ কর্মের মাধ্যমে কিংবা যবানী বা লেখনীর দ্বরা মোকাবেলা করবে না বরং আল্লাহর নিকট দোয়া করবে যেন, তোমার মুসীবত দূর হয়ে যায়। আর যদি কোথাও অত্যাচারীরা এই অবকাশের পরও ক্ষান্ত না হয়; বরং জীবনের উপর আক্রমনোম্মুখ হয়, তাহলে তাদের মুকাবিলার জন্য মুসলমানরা দৃঢ়পদ হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় ফরয। যদিও মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ কম থাকুক না কেন। সারকথা হল- যথাসম্ভব ফিতনা-ফাসাদকে নিরাপদ উপায়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করবে।

দুঃখ দুর্দশা ও বিপদাপদের প্রতিকার দুনিয়া হল-দুঃখ-দুদর্শা ও চিন্তা-পেরেশানীর নাম, দুনিয়াতে বসবাস করলে কোন না কোন ধরনের চিন্তা ও পেরেশানীর সম্মুখীন অবশ্যই হতে হয়। সুতরাং কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট যেন না

আসে সেজন্য চেষ্টা করা নিছক অবান্তর। অবশ্য এটুকু হতে পানে যে, চিন্তা ও পেরেশানীর ক্রিয়াশীলতা হতে মুক্তি লাভ করা যাবে। অর্থাৎ পেরেশানী দেখা দেবে। কিন্তু তাতে নিজে পেরেশান বা চিন্তিত হবে না। শুধুমাত্র দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করলেই এটা হাসিল হতে পারে।

এক-আল্লাহ তা'আলা হাকিম বা অধিপতি, তিনি বান্দার উপর সব ধরনের হস্তক্ষেপ করতে পারেন। যা কিছু হয়, তাঁর হুকুমেই হয়। তার হুকুম ব্যতিত একটি ধূলিকনাও নড়তে পারে না।

দুই- আল্লাহ তা'আলা হিকমত ওয়ালা। তার কোন কাজ হিকমতশুন্য হয় না। তাতে অবশ্যই নানা ধরনের উপকারিতা থাকে। যেগুলো সম্পর্কে অবগতি লাভ করা মানুষের জন্য জরুরী হবে। যেন সবসময় অথবা খেয়াল করা মাত্রই স্মৃতিতে ভেসে উঠে। এরপর যে কোন কষ্টদায়ক ঘটনা সামনে আসলে সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করুন যে, এটা আল্লহর পক্ষ হতে হয়েছে। যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে। অতঃপর চিন্তা করুন যে, এতে অবশ্যই কোন না কোন কল্যাণ ও উপকারিতা নিহিত আছে। হয়ত সে সম্পর্ক আমি জানি না। এভাবে আমল করলে ইন্‌শাআল্লাহ্‌ শারিরীক কষ্ট হওয়া সত্ত্বে আন্তরিক ও মানসিক যন্ত্রনা হবে না।

এর দৃষ্টান্ত হল এমন যে, একজন বুঝ-জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অপারেশন হচ্ছে। তার শরীর অস্ত্রোপচারে কষ্ট হলেও সে মনে করে যে, এতে আমার কল্যাণ নিহিত আছে। এ কারণে সে ডাক্তার সাহেবের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে না। বরং তাকে ফিসও দিয়ে থাকে। আর এ অপারেশনই যদি কোন অবুঝ শিশুকে করা হয়, তাহলে সে এর উপকারিতা সম্পর্কে অবগত থাকার কারণে ডাক্তারকে গন্ধ পর্যন্ত করে থাকে। এ থেকে বুঝা যায় যে, কল্যাণ ও উপকারিতার কথা চিন্ত া করার দ্বারা স্থিরতা ও প্রশান্তি লাভ হয়। উক্ত কথা দু'টি কল্পনা করার পাশাপাশি দোয়ারও খুব ইহতিমাম করবে। কেননা, এটা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল বস্তু। পাশাপাশি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও সংযোজন করে নিলে আল্লাহর ফজলে অনেক দ্রুত আত্মিক অস্থিরতা দূর হয়ে শান্তি ও স্থিরতা হাসিল হবে।

১- অধিক পরিমাণে নফল নামায পড়বে।

২- আল্লাহর যিকির বেশি করবে। উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বদা যিকির করতে থাকবে। কোন সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয় আর বিশেষ কোন যিকিরও নয়। যেমন-

سُبْحَانَ اللهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

অথবা দুরূদ শরীফ শরীফ ইত্যাদি- যা মনে চায় তাই পাঠ করবে।

৩- বিপদাপদে আখেরাতের প্রতিদানের কথা চিন্তা করবে। যেমন- কোন ছোট শিশু ইন্তেকাল করলে এ কথা চিন্তা করবে যে, কিয়ামত দিবসে সে পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে।

৪- জীবিতদের মধ্যে যার সঙ্গে প্রণয় ভালবাসা রয়েছে, মৃত ব্যক্তির কথা মনে হলে তার কথা চিন্তা করবে।

৫- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ বেশি পাঠ করবে। দৈনিক এই ওযীফাটি কমপক্ষে পাঁচবার করে পাঠ করবে।

৬-'হায়াতুল মুসলিমীন' কিতাবের সবর ও শোকর অধ্যায়টি পড়বে। অনুরূপ 'তাবলীগে দ্বীন' কিতাবের 'সবর ও তাকবীব' অধ্যায় পড়বে।

৭- আল্লাহ ওয়ালা ও বুযুর্গদের, না হয় নেককারদের সান্নিধ্যে বসবে। এই মনে করে বসবে যে, তাহাদের অন্তরের যাবতীয় নূর ও বরকতের ঝলক আমার অন্তরেও পড়বে। আর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ না হলে তাদের ওয়ায নসীহত ও মালফুযাত অধ্যয়ন করবে।

কু-দৃষ্টি হতে বাঁচার জন্য কয়েকটি পরামর্শ

কু-দৃষ্টির ক্ষতিসমূহ এত মারাত্মক যে, অনেক সময় এতে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি বরবাদ হয়ে যায়। আজকাল এই রূহানী রোগে লিপ্ত হওয়ার উপায় ও উপকরণসমূহ ব্যাপক হারে বিস্তার লাভ করেছে। এ কারণে মনে হল যে, এর ধ্বংসাত্মক ক্ষতি ও তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে লিখে দিলে ক্ষতি হতে বাঁচা যাবে। যেমন- নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ করলে সহজেই দৃষ্টিকে সংযত রাখা যাবে।

১- মেয়েলোক গমন করলে ইহতিমামের সঙ্গে দৃষ্টিকে অবনত করে নিবে। চাই মনের যত বেশি চাহিদা ও প্রবল ইচ্ছাই থাক না কেন। এ বিষয়টির প্রতি আরেফে হিন্দ হযরত খাজা আবীবুল হাসান মজযূব (রহ.) এভাবে সতর্ক করেছেন-

২- যদি তবুও চোখ উঠে যায় এবং কারো প্রতি গিয়ে দৃষ্টি পড়ে, তাহলে তৎক্ষনাৎ চোখ নামিয়ে নিবে। চাই যতই কষ্ট হোক, এমনকি জীবন বের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাই হোক না কেন।

৩- এ কথা চিন্তা করবে যে, দৃষ্টি সংযত না করলে দুনিয়াতে লাঞ্ছনার আশঙ্কা রয়েছে এবং ইবাদতের নূর নষ্ট হয়ে যাবে ও আখেরাত বরবাদ হয়ে যাবে।

৪- কু-দৃষ্টি হয়ে গেলে কমপক্ষে চার রাকাত নফল নামায পড়ার অভ্যাস করে নিবে এবং সুযোগ অনুযায়ী কিছু না কিছু দান খয়রাত ও অধিক পরিমানে দুরূদ কিছু না কিছু দান খয়রাত ও অধিক পরিমানে দুরূদ পাঠের অভ্যাস ও সংকল্প করবে।

৫। এই কথার ধ্যান করবে যে, কু-দৃষ্টির অন্ধকারে অন্তর লয়প্রাপ্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়। আর এই অন্ধকার সহজে দূরীভূত হয় না।

৬-এই ধ্যান ও করবে যে, কু-দৃষ্টি হতে আকর্ষণ ও আকর্ষণ হতে মুহাব্বত ও মুহাব্বত হতে ইশক সৃষ্টি হয়ে যায়। আর না জায়েয ইশ্‌ক থেকে দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ হয়ে যায়।

৭-এই কথা চিন্তা করবে যে, কু-দৃষ্টির কারণে ইবাদত, যিকির ইত্যাদি থেকে ধীরে ধীরে আগ্রহ ও উৎসাহ কমে যায়। এমনকি ছুটে যাওয়ারও সম্ভাবনা আছে। অতঃপর এক পর্যায়ে এগুলোর প্রতি অনীহা ও বিশৃংখতা সৃষ্টি হয়।

শয্যাত্যাগ ও মসজিদে গমনের সুন্নাতসমূহ

(১) ঘুম হতে উঠার পর সর্বপ্রথম দোয়া পড়া অথবা মুখে কোন কোন যিকির জারি করা। (২) জুতা পরিধান করার ক্ষেত্রে ডান পা আগে পরা। (৩) হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে পানিতে দেওয়া। (৪) পায়খানায় যাওয়ার সময় দোয়া পড়া। (৫) পায়খানায় প্রথমে বাম পা দেওয়া। (৬) পায়খানায় পা-দানিতে ডান পা আগে রাখা, নামার সময় প্রথমে বাম পা নিচে রাখা। (৭) পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় দোয়া পড়া। (৮) সুন্নাত অনুযায়ী বাড়িতে ওযূ করা। (৯) বাড়ি থেকে সুন্নাত পড়ে যাওয়া, সুযোগ না হলে মসজিদে পড়া। (১০) বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া পড়া। (১১) ধীরে ধীরে যাওয়া দৌড়ে দৌড়ে না যাওয়া।

মসজিদে প্রবেশের সুন্নাতসমূহ

(১) বিসমিল্লাহ পড়া। (২) দুরূদ শরীফ পড়া (৩) দোয়া পড়া। তিনটিকে একসঙ্গে এভাবে পড়বে-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(৪) প্রথমে ডান পা মসজিদের ভেতরে রাখা। (৫) ই'তিকাফের নিয়ত করা।

মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নাত সমূহ

(১) বিসমিল্লাহ পড়া। (২) দুরূদ শরীফ পড়া। (৩) দোয়া পড়া এবাবে-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

(৪) মসজিদ হতে প্রথমে বাম পা বাহির করা (এবং জুতার উপর বাম পা রাখা। অতঃপর) (৫) প্রথমে ডান পায়ে জুতা পরিধান করা।

খাওয়ার সুন্নাত সমূহ

(১) কোন কিছু লেখা নেই এমন দস্তরখানা বিছানো। (২) উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধোয়া এবং না মুছে ফেলা। (৩) بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ বলা। (৪) ডান হাতে খাওয়া, বাম হাতে কখনো না খাওয়া। (৫) তিন আঙ্গুল দ্বরা খাওয়া, প্রয়োজনে বেশিও ব্যবহার করা যাবে। (৬) একই রকম খাবার হলে নিজের সামনে থেকে খাওয়া। (৭) কোন লোকমা পড়ে গেলে উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নেওয়া। (৮) প্লেট ও খাবারের পাত্র পরিষ্কার করে খাওয়া। (৯) হেলান দিয়ে না খাওয়া। (১০) খাবারের কোন দেষ বাহির না করা। (১১) খাওয়ার পরের দোয়া পাঠ করা-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে আবার দান করেছেন পান করিয়েছেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। (১২) প্রথমে দস্তরখান উঠানো, পরে নিজে উঠা। (১৩) দস্তরখান উঠানোর দোয়া পড়া- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জন্য অনেক অনেক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতপূর্ণ। হে আমাদের পরওয়া দেগার! আমরা এই খাবারকে যওথষ্ট মরে করে অথবা বিলকুল বিদায় নিয়ে বা তা থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে দস্তরখান উঠাচ্ছি না। (১৪) খাওয়ার শেষে উভয় হাত ধৌত করা অতঃপর এখন মুছে ফেলা নিষেধ নয়। (১৫) কুলি করা।

আত্মার দশটি ধ্বংসাত্বক গুপ্ত ব্যাধি

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে একমাত্র তাঁর এবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। মানব জাতি তার মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত দ্বারা আল্লাহর

সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাপৃত হয়। কিন্তু রূহ বা আত্মা পরিশুদ্ধ হওয়া ছাড়া এ লক্ষার্জনে কাংখিত সাফল্য লাভ হতে পারে না।

বস্তুতঃ আত্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির ইবাদত আল্লাহর দরবারে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় না। অন্তরের ধ্বংসাত্মক ব্যাধি বান্দার আমলের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ বলেন-"কেউ মুক্তি পাবে না ঐ ব্যক্তি ব্যতীত-যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে আগমন করে।"

নিম্নে আত্মার কয়েকটি গুপ্ত ব্যাধি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো। যাতে এ সকল ব্যাধি সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিয়ে আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করতে পারি।

এ সকল আত্মিক ব্যাধি থেকে রূহ বা আত্মা পবিত্র থাকলে, ইবাদতে পূর্ণ স্বাদ অনুভূত হয় এবং ইবাদতের পরিপূর্ণ ছাওয়াব লাভ হয়। পাশাপাশি দেহ-মনে শান্তি ও স্বস্তি হাসিল হয়। নিম্নে এ ব্যাধিগুলোর বিশ্লেষণ করা হচ্ছে-

হিরছ ও ত্বমা ঃ হিরছ ও ত্বমা উভয়ই প্রায় সমার্থবোধক শব্দ। হিরছ অর্থ-লোভ। ত্বমা হলো-নিজের অনেক ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আরো বাড়াবার লিপ্সা করা এবং এব্যাপারে হালাল-হারামের কোন বাছ-বিচার না করা। এ দু'টি মারাত্মক আত্মঘাতী ব্যাধি, যা আমল-আখলাককে ধ্বংস করে দেয়। প্রভাব-প্রতিপত্তি, অর্থ-সম্পদ, সুনাম-সুখ্যাতি; এমনকি অন্যের সুন্দরী মেয়ে কিংবা পত্নীর প্রতি লোভ মানুষকে দ্বীনের প্রতি অন্ধ করে দেয়। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "মুমিনদের মধ্যে যারা সংযমী, তারাই উত্তম। আর যারা লোভী, তারাই সর্বাপেক্ষা অধম।" (ছগীর) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন- "দুনিয়াদার মানুষের নিকট দু'টি মাঠ পূর্ণ অর্থ থাকলেও সে এর সাথে আরো একটি সংযোগ করতে সর্বদা চিন্তা ও কৌশল অবলম্বন করে।" নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন- "বার্ধক্যের সাথে সাথে দু'টি দ্রব্যের প্রতি মানুষের লোভ বৃদ্ধি পায়ঃ একটি হলো ধন-সম্পদ, অপরটি আয়ু।" (বুখারী, মুসলিম)

তাই নিজের ঈমান ও আমলের হিফাজত কল্পে লোভ-লালসা হতে দূরে থাকা সকলের কর্তব্য।

বুখ্‌ল ঃ বুখ্‌ল বা কৃপণতা একটি নিন্দণীয় স্বভাব। আল্লাহর দেয়া সম্পদ যথাযথ ব্যবহার না করে কিংবা নিজে সামান্যতম সম্পদও ভক্ষণ না করে শুধু জমা করে রাখাই হচ্ছে কৃপনতা। কৃপণ লোকেরা সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সম্পদ কমে যাবার ভয়ে যাকাত, ফিতরা, কুরবানী, কিংবা লিল্লাহ দান-খাইরাত ইত্যাদি না করে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে। তাদের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন- "যারা ধন-সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদের সেই ধন-সম্পদ অগ্নি-আজাব ধারণ করবে এবং তা দিয়ে তাদের পেট-পিঠে ছ্যাকা দেয়া হবে, আর বলা হবে-এঁই তোমাদের ঐ সকল ধন-দৌলত যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে। তোমাদের সেই পুঞ্জিভূত ধনের স্বাদ গ্রহণ কর।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "তোমরা লোভ ও কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে কৃপণতাই ধ্বংস করে দিয়েছে।" অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "ধোঁকাবাজ, কৃপণ এবং উপকার করে খোটা দানকারী ব্যক্তি কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"

হারাম ঃ হারাম বা অবৈধ কর্ম বর্জন করা সকল মুমিনের জন্য অপরিহার্য। ইসলামী নীতিমালা যেটাকে অনুমোদন করেনি, অবৈধ ঘোষণা করেছে, মুসলমানরা এরূপ কাজ কখনও করতে পারে না। এর গন্ডি ব্যাপক, যেমন- অবৈধ উপার্জন তথা সুদ, ঘুষ, অপরের সম্পদ আত্মসাৎ, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অবৈধ গান শোনা, শরীয়ত যা দেখতে নিষেধ করেছে, তা দেখা ও স্বাদ অনুভব করা প্রভৃতি। এ সকল ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদ দাতা, তার লেখক ও সাক্ষীগণের এবং ঘুষ দাতা, ঘুষ গ্রহিতা ও তার দালালের উপর অভিসম্পাত (লা'নত) করেছেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- "পানি সেচ দ্বারা উর্বর জমিতে যেরূপ ফসল জন্মে, গানের দ্বারাও সেরূপ অন্তরে মুনাফিকী জন্মে।" আল্লাহ পাক বলেন- "যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং সত্বরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।" (সূরা নিসা-১০)

গীবত ঃ গীবত বা পরনিন্দা হলো মুখে, কলমে, শরীরের যে কোন অঙ্গ দ্বারা অথবা ইশারা-ইংগিতের মাধ্যমে কারো কোন দোষের কথা সমালোচনা করা-যা শুনলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আঘাত পাবে।

গীবত একটি অত্যন্ত ভয়াবহ গুনাহ। অথচ এটা আমাদের দেশে ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়েছে। রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- "গীবত যিনার চেয়েও জঘন্য পাপ। কেননা, যিনা করে খাস দিলে তওবা করলে, আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতকারীকে কখনোই ক্ষমা করা হবে না-যতক্ষণ না যার গীবত করেছে, সে ক্ষমা করে।" (মিশকাত)

জ্বীনের থেকে রক্ষার আমলসমূহ

* একদা হযরত মুআজ বিন জাবাল (রাঃ) এর সঙ্গে এক জিনের কথোপকথন হলে জিন বলল, যদি কোন ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়ে কোন ঘরে অবস্থান করে জিন সেই স্থানে প্রবেশ করে না।

* একদা হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) এর সঙ্গে জিনের কথেপাকথন হলে তিনি জিনকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তোমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় কি? উত্তরে জীন বলল যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরছী পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে হিফাজত থাকবে। অর যে ব্যক্তি সন্ধ্যার সময় পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে হিফাজতে থাকবে।

অতঃপর হযরত উবাই ইবনে কাআব (রাঃ) উক্ত ঘটনা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিন সত্য বলেছে।

* হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ছদকায়ে ফিতরের দেখাশুনার কাজে নিয়োজিত করলেন। আমি দেখাশুনা করছিলাম ইতিমধ্যে একটি জিন এসে খাওয়া শুরু করে দিল আমি তাকে ধরে ফেললাম, এবং বললাম তোমাকে এখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট নিয়ে যাব সে বলল, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে দাও তাহলে তোমাকে আমি এমন কিছু শব্দ শিখিয়ে দিব যা তোমার উপকারে আসবে। হযরত আবু হুরায়রা সম্মতি দিলে সে বলল, যখন কোন ব্যক্তি ঘুমানোর উদ্দেশ্যে বিছানায় যাবে তখন যদি সে আয়তুল কুরসী পাঠ করে তাহলে সকাল পর্যন্ত তার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা নিয়োজিত করে দেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে উক্ত ঘটনা শোনালেন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এব্যাপারে সে সত্য বলেছে। যদিও সে মিথ্যাবাদি।

* হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) একবার তার বাগানে গেলেন। হঠাৎ তিনি একটি শব্দ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কে? উত্তর আসল আমি জিন। অভাবের তাড়নায় আপনার বাগানে ফল খেতে এসেছি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় দিনও যখন এমন ঘটনা ঘটল তখন হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ) তকে জিজ্ঞাসা করল, তোমদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় কি? উত্তরে জিন বলল আয়াতুল কুরসী পড়া।

* হযরত আবু হাশেম (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাত্রে কুফা থেকে বাইরে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সে ঝুপড়ীর মত একটি দৃশ্য দেখতে পেল, যার আশেপাশে কিছু লোকজন বসে আছে। অতঃপর সে নিজেকে আত্মগোপন করে তাদের কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করছিল। ইতিমধ্যে তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বলল, উরআ, বিন মুগীরাকে পেরেশানী করতে হবে। তখন তার কথায় তাদের থেকে এক ব্যক্তি উঠে বলল, আমি করব। এ বলে সে মদীনায় চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এসে বলল তাকে কোন ধরনের ক্ষতি করা বা পেরেশানী করা সম্ভব নয়। সকলে জিজ্ঞাসা করল কেন? উত্তরে বলল সে সকাল সন্ধ্যা এমন একটি দোয়া পড়ে যার কারণে তার ক্ষতি করা সম্ভব নয়। এবলে তারা ভিন্ন হয়ে গেল। পথিক ব্যক্তি তখন মদীনায় এসে হযরত উরআ (রাঃ) কে এই ঘটনা শোনালেন এবং সেই দোয়াটি জানতে চাইলেন তখন হযরত মুগীরাহ (রাঃ) এই দোয়াটি শোনালেন–

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

উচ্চারণ ঃ আমানতু বিল্লাহি ওয়া-কাফারতু বিল জিবতি অত-তাগুতি অ-সতাম্‌সাকতু বিল উর ওয়াতিল উছকা লান ফিছ্‌ছালাহা ওয়াল্লাহু সামীউন আলীম।

২৮তম অধ্যায়

প্রচলিত কুসংস্কার

কিছু লোক যেমন নিজের ব্যক্তিগত ফায়দা হাসিলের জন্য নকল ও জাল টাকা বাজারে ছাড়ে, অনুরূপ কোন কোন স্বার্থপর জাহেল লোক নিজস্ব স্বার্থ সিদ্বির জন্য কিছু কিছু ভ্রান্ত কথা ও প্রথার প্রচলন করে রয়েছে। যেন আহলে হক (সরল ও সঠিক পথগামীদের)- কে এর পরিপন্থী দেখে সাধারণ মানুষ ভুল ধারণা বশতঃ তাদের থেকে সহীহ কথা গ্রহণ করা ছেড়ে দেয় তাদের দিকে ধাবিত হয়। এ জাতীয় ভ্রান্ত ধারণা ও প্রথাসমূহকে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ) 'আগলাতুল আওয়াম' নামক এক কিতাব সংকলন করেছেন। সেটাকে আমি অধ্যায় ভিত্তিক বিন্যাস করেছি। যাতে করে মানুষ সহীহ্ ইলম সম্পর্কে অবগত হয়ে আক্বীদাগত ও ইলমী ভ্রান্তি সমুহ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। এখানে উক্ত পুস্তিকা হতে কিছু কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে অধমের পক্ষ হতে কিছু কিছু বিশ্লেষণ 'ফায়দা' শিরোনামের অধীনে লিখে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য 'অধ্যায় ভিত্তিক আগলাতুল আওয়াম' দেখুন।

১। আ'ম লোকদের নিকট প্রসিদ্ধ আছে যে, চেরাগের তেল নাপাক। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

২। প্রসিদ্ধ আছে যে, ইস্তিঞ্জার অবশিষ্ট পানি দ্বারা অযু করা যাবে না। অথচ এটা ছিল ভান্ত্ ধারণা।

৩। মুখে প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রসূতী মহিলা যতক্ষণ না গোসল করবে, তার হাতের কোন কিছু খাওয়া জায়েয নেই। আবার অনেকের ধারণা হায়েয ও নেফাসের সময় হাত নাপাক হয়ে যায়, এটাও ভুল কথা।

ফায়দা- অনুরূপ যে ব্যক্তির গোসল ফরয হয় তার হাতও নাপাক হয় না।

৪। কোন কোন সাধারণ লোক বলে থাকে যে, চল্লিশ দিনের ভিতর আঁতুড় ঘরে প্রবেশ করা স্বামীর জন্য জায়েয নেই। এর কোন ভিত্তি নেই।

৫। আ'ম লোকেরা বলে থাকে, যে মহিলা হায়েয কিংবা নেফাসের সময় মৃত্যুবরণ করে তাকে দুইবার গোসল দিতে হয়। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা।

৬। সাধারণ লোকদের ধারণা, আঁতুড় ঘরে চল্লিশ দিন যাবৎ নামায পড়া জায়েয নেই। যদিও এর পূর্বেই পাক-পবিত্র হয়ে যায়। অথচ এটা সম্পূর্ণ

শরীয়ত পরিপন্থী কথা। নেফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল চল্লিশ দিন। আর সর্বনিম্ন সময়ের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। যখনই পবিত্রতা হাসিল হবে, তখনই সামায পড়া আরম্ভ করবে।

৭। প্রসিদ্ধ আছে যে, শাওয়ালের ছয় রোযা রাখতে হলে। ঈদের পরদিন অবশ্যই প্রথমটি রাখতে হবে। অন্যথায় ছয় রোযা আদায় হবে না। এটা নিছক ভুল।

ফায়দা- ছয় রোযা শাওয়াল মাসের যে কোন সময় রাখতে পারবে। একত্রে হোক কিংবা পৃথক পৃথক হোক।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ছয় রোযা রাখল সে যেন ষাটটি রোযা রাখল। এ ধরনের বহু ফযীলত বর্ণিত আছে। সুতরাং এর জন্য হিম্মত করতে হবে।

৮। আ'ম মানুষের ধারণা হল- মহিলা মুরীদের জন্য পীরের সঙ্গে পর্দা জরূরী নয়। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। অন্যান্য পুরূষদের মত পীরও ভীন পুরূষ।

ফায়দা- সুতরায় পীরের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। যে পীর এর ব্যতিক্রম করবে সে খাঁটি পীর নয়।

৯। লোক মুখে প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বামী-স্ত্রী একই পীরের মুরিদ হওয়া ঠিক নয় কেননা এর কারণে পরস্পর ভাই-বোনে পরিণত হয়ে যায়। এটাও সম্পূর্ণ ভুল ধারণা।

ফায়দা- বরং খাঁটি পীর হলে এর দ্বারা দাম্পত্য জীবন আরো অনেক সুন্দর হয়ে যায়।

বিঃ দ্রঃ মুরিদ হওয়া ফরয নয়; বরং সুন্নাত। তবে নিজের ইসলাহ্ করানো অর্থাৎ গুনাহ্ পরিহার করা এবং সুন্নাতের উপর আমল করা ফরয। আর মুরিদ কার কাছে হতে হবে- এর বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'কস্‌দুস্ সাবীল' অথবা 'তাসহীলু কস্‌দিস সাবীল' দ্রষ্টব্য।

১০। প্রসিদ্ধ আছে যে, নামাযের আযান মসজিদের ডান দিকে এবং ইকামাত বাম দিকে দিতে হবে। এর কোন ভিত্তি নেই।

১১। প্রদ্ধি আছে যে, খটিয়ার উপর নামায পড়লে মানুষ বানর হয়ে যায়।শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই।

১২। প্রসিদ্ধ আছে যে, স্ত্রীর লাশ বহনকারী খাটিয়ার খুঁটিও স্বামী ধরবে না। অথচ এটা ভুল কথা। বরং অপরিচিত লোকদের চেয়ে স্বামীই বেশী অগ্রগণ্য।

১৩। প্রদ্ধি আছে যে, মৃত ব্যাক্তির লাশ যদি বাড়ি কিংবা মহল্লায় থাকে, তাহলে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করা গুনাহ্ এটাও অমূলক কথা।

১৪। কোন কোন মহিলা নামাযের পর এই মনে করে জায়নামাযের প্রান্ত গুছিয়ে ফেলে যে, শয়তান তাতে নামায পড়বে। অথচ এসব কথার কোন ভিত্তি নেই।

১৫। কারো কারো ধারণা, তাহাজ্জুদের পরে না শোয়া উচিৎ। কেননা, এর ফলে তাহাজ্জুদ চলে যায়। এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অথচ অনেকেই এই কারণে তাহাজ্জুদ থেকে মাহরূম থেকে যায়। কেননা, তাহাজ্জুদের পর সকাল পর্যন্ত জেগে থাকা কষ্টকর। সুতরাং ভাল করে জেনে রাখা উচিত যে, তাহাজ্জুদের পরে শয়ন করা জায়েয আছে।

ফায়দা- তাহাজ্জুদের নামায চার রাকাত। কমপক্ষে দুই রাকাত। অন্যান্য সুন্নাতের মতই তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে হয়।

১৬। সাধারণ লোকদের ধারণা, ই'শার নামাযের পূর্বে শয়ন করলে ই'শার নামায ক্বাযা হয়ে যায়। অর্থাৎ শোয়া থেকে উঠে নামায পড়লেও ক্বাযার নিয়ত করতে হবে। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভুল। অবশ্য ওজর ব্যতিত উক্ত সময় শয়ন করা ঠিক নয়। আর অর্ধরাত পরে ই'শার নামায পড়া মাকরূহ। তবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ই'শার নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

বিবাহের সংশোধনযোগ্য রসমসমূহ

দ্বীনের একটি সর্বসম্মত মৌলিক নীতি হল কোন বৈধ কিংবা মুস্তাহাব কাজে যখন কোন শরীয়ত পরিপন্থী কিংবা নামাজের কাজ পাওয়া যায়, তখন বৈধ ও মুস্তাহাব কাজও নাজায়েয হয়ে যায়।

আজকাল বিবাহ-শাদীতে জায়েয ও উত্তম কাজসমূহের সঙ্গে শরীয়ত পরিপন্থী এমন কিছু কার্য কলাপ মিশে গেছে যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে না। এসব বিষয়গুলোকে এখানে একত্র করে দেওয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানতে চাইলে 'ইসলাহুর রুসূম' নামক কিতাবটি অধ্যয়ন করুন, অত্যন্ত নির্ভরযেগ্য সমন্বিত ও বে- নযীর কিতাব।

ছেলে পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিবাহের সংশোধনযোগ্য বিষয়সমূহ

(১) (পয়নামা) মেহেদী পরার সামগ্রী নিয়ে যাওয়া (২) সামাজিক প্রথা অনুযায়ী এত অধিক পরিমান মানুষ নিয়ে যাওয়া, যেটাকে আমাদের পরিভাষায়

বরযাত্রী বলা হয়। (৩) দাওয়াতী মেহমানের অতিরিক্ত লোক নিয়ে যাওয়া। (৪) কনের কন্যা প্রদর্শনের উদ্দেশ্য উপহারসামগ্রী ও অন্যান্য বস্তু প্রেরণ করা বা সেটাকে আবশ্যক মনে করা (৫) জরির টুপি (যা বর-কনের মাথায় পরানো হয়) কিংবা মালা পরিধান করানো (৬) কনের ইজিন (অনুমতি) নেওয়ার সময় গায়রে মাহরাম পুরুষ যাওয়া এবং সেটাকে নিজের অধিকার বলে মনে করা (৭) গায়রে মাহরাম পুরুষরা (বিবাহের পূর্বে ও পরে) মেয়ের চেহারা দেখা ও দেখানো (৮) নাচ-গান ও পরে বাদ্য ইত্যাদি করা (৯) নগদ পয়নামা উসুল করা (১০) মহরের বিষয়টি যথাসময় পরিষ্কার না করা এবং সেটাকে দোষণীয় মনে করা এবং বিবাহের সময় বিবাদ করা (১১) লৌকিকতা ও প্রদর্শনী সূলভ ওলীমার দওয়াত করা (১২) মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে নিজেদের কাজের লোকদের জন্য বখশিশ তলব করা (১৩) দেন মহরকে গুরুত্বপূর্ণ মনে না করা এবং আদায়ের ব্যাপারে গাফলতী করা (১৪) ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করা, যার কারণে মেয়ে পক্ষ হেয় এবং পেরেশান হয় অথবা নিজেদের নাম-জশ ইত্যাদি হয়। (১৫) বিবাহ উৎসব উপলক্ষে শরীয়তের ফরয ও ওয়াজিব বিষয়াদির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা।

মেয়ে পক্ষের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিবাহের সংশোধনযোগ্য বিষয়সমূহ

(১) পয়নামা সামগ্রী দাবী করা (২) ছেলের জন্য উপঢৌকন ইত্যাদি প্রদর্শন করে পাঠানো এবং এটা জাহির করাকে পছন্দ ও জরুরী মনে করা (৩) কনের বাড়িতে বর-কনের অবস্থানের জন্য নির্ধারিত স্থানে অথবা প্রকাশ্যে লোকালয়ে বরের কাপড় পাল্টানো (৪) ছেলের পরিবর্তিত পূর্বের কাপড় পরিবর্তনকারীর হক মনে করে রেখে দেওয়া (৫) পাড়া-প্রতিবেশীকে নিয়ে ভোজন অনুষ্ঠান করা (৬) কনে বা তার সঙ্গে দেওয়া মালপত্র বিস্তারিতভাবে দেখানো অথবা প্রকাশ্যে দেওয়া (৭) শোকরানা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, বিবাহের পর বিনা প্রয়োজনে বরকে পানি অথবা শরবত ইত্যাদি পান করানো (৮) ছেলে পক্ষ হতে আয়োজক ও কাজের লোকদের জন্য বখশিশ আদায় করা (৯) বরের সামনে গায়রে মাহরাম মেয়েরা আগমন করা (১০) সেলামী ইত্যাদির নামে নগদ পয়নামা আদায় করা এবং সেলামীকে জরুরী মনে করা ও সেলামীর সময় আবশ্যকীয়ভাবে কোন কিছু দেওয়া (১১) সেলামীর উপঢৌকন প্রকাশ করে দেওয়া (১২) গান-বাদ্য ইত্যাদি করা (১৩) ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ক্রিয়াকলাপ করা যাতে পাড়া-মহল্লায় সুনাম-সুখ্যাতি বা প্রশংনা ছড়ায়(১৪) বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে শরীয়তের ফরয ও ওয়াজিবের প্রতি অবহেলা ও গাফলতী প্রদর্শন করা। বিঃ দ্রঃ বিস্তারিত দেখুন 'ইসলাহুর রুসূম'।

২৯তম অধ্যায়

আহ্কামে তাবলীগ

আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফ হতে তাবলীগ ও দ্বীন প্রচারের যে পরিমাণ গুরুত্ব ও তাকীদ এসেছে, তা আপনারা জেনে থাকবেন। মুজতাহিদ ইমামগণ এবং উলামায়ে কিরাম এ অধ্যায়ে আয়াত (হাদীস ও শরয়ী দলীল-প্রমাণের আলোকে যেসব মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছেন, এখানে সেগুলোা বর্ণনা করা হচ্ছে। এর পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হৃদয়াঙ্গম করে নেওয়া প্রয়োজন। সেটা হল- যেসব কাজ সম্পাদনের জন্য আল্লাহ তাআলা কিংবা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেটার পূর্ণ অনুকরণ করা একান্ত জরুরী। অন্যথায় সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহের ভাগী হতে হবে। যেমন- ঈদের দিনে কেউ রোযা রাখলে সওয়াবের স্থলে আযাব ও শাস্তির যোগ্য হবে কেননা, ঈদের দিনসমূহে রোযা রাখা হারাম। অনুরূপ সূর্য উদয় কিংবা অপরাহ্নের সময় নামায পড়া গুনাহের কারণ হবে। আর তেমনিভাবে খুৎবার সময় মৌখিকভাবে ওয়ায-নসীহত করা (যা তাবলীগ তথা আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের অন্তর্ভূক্ত) নিষেধ এবং গুনাহের কারণ, অনুরূপ খুৎবার সময় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর পবিত্র নাম শুনলে মুখে দুরূদ শরীফ পড়া এবং কোন বিশেষ দোয়া শুনে আমীন বলা কিংবা খুৎবার মাঝে মুখে দোয়া কামনা করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ এবং গুনাহ অথচ এগুলো খুৎবা ছাড়া অন্যান্য সময় সওয়াব ও পূণ্যের কারণ।

মাসআলা ঃ মন্দ কাজ হতে বাধা প্রদান করা এবং ভাল কাজের প্রতি পথনির্দেশ দান করা ফরযে কিফায়া। যদি কোন এলাকাতে কেউ এ কাজ না করে, তাহলে সবাই ফরয তরক করার গুনাতে লিপ্ত হবে। আর যদি কিছু সংখ্যক লোক এ কাজ আঞ্জাম দেয় এবং এতে সেখানখার প্রয়োজন পূরণ হয়ে যায়, তবে সবাই ফরয আদায়ের দায় হতে মুক্তি পাবে। আর নসীহতকারীদের জন্য রয়েছে আল্লহর পক্ষ হতে বিশাল প্রতিদান। মিরকাত ও তাফসীরে মাদারেক

মাসআলা ঃ যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে, বিশেষ কোন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ মন্দ কাজ বন্ধ করতে পারে না কিংবা ভাল কাজের পথনির্দেশ করতে পারে

না,তাহলে সে ব্যক্তির উপর ইসলাহ্ করা ফরযে আইন হয়ে যায়। যেমন- কোন মন্দ কাজ সম্পর্কে এককভাবে কেউ জানতে পারে কিংবা বাধা দানে সক্ষম হলে তার উপর বাধা দান করা ফরবে আইন। অনূরূপ স্ত্রী কিংবা সন্তান বা অধিনস্থ যথা ছাত্র ও মুরীদ কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হলে স্বামী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর তা থেকে বাধা প্রদান করা ফরযে আইন। -মিরকাত

মাসআলা ঃ ওয়াজিব ও আবশ্যকীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে তাবলীগ ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব ও অনাবশ্যক বিষয়াদির তাবলীগ মুস্তাহাব।-আশিয়্যাতুল লুমআত

মাসআলা ঃ উপদেশ দান ও পথনির্দেশ করা ফরয হয় দু'টি শর্ত সাপেক্ষে। এক. নসীহত গ্রহণের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে। দুই. কোন ধরনের ক্ষতির আশংকা মুক্ত হলে। এ দু'টি বিষয় পাওয়া গেলে নসিহত করা ফরয। অন্যথায় নয়।-মিরকাত, ইতহাফ, ফতোয়ায়ে আলমগীরী

মাসআলা ঃ উপরোক্ত দু'টি বিষয় না পাওয়া গেলে সেখানে নসীহত করা ফরয নয়; বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে হারাম।

মাসআলা ঃ যেখানে কোন গুনাহ ও অন্যায় কাজ হয়, কিন্তু তা থেকে বাধা প্রদান করলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে এবং গ্রহণের নিশ্চয়তাও নেই, সেখানে গমন করা নিষেধ। যেন উক্ত মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকা যায় এবং একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত এ ধরনের সভা-সমাবেশ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়। আর এ ধরনের সমাজ ও শহর থেকে অন্যত্র হিজরত করা জরুরী নয়। অবশ্য যদি উক্ত শহরে বসবাস করলে মন্দ ও গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকার কোন উপায় না থাকে, তাহলে সামর্থ থাকলে সেখান থেকে হিজরত করা ওয়াজিব।

মাসআলা ঃ যদি এ মর্মে প্রবল ধারণা থাকে যে, সদুপদেশ দান করলে গালমন্দ কিংবা অপবাদের সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে নসীহত না করা মুস্ত াহাব।

মাসআলা ঃ যদি প্রবল ধারণা হয় যে, উপদেশ দিলে শারিরীক নির্যাতন তথা মারধর করার সম্ভাবনা আছে এবং উপদেশ দানকারী এতে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারবে না; উপরন্তু পরস্পরে মারামারি ও বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে, তবে সে ক্ষেত্রেও সদুপদেশ পরিহার করা মুস্তাহাব। -ফতোয়ায়ে আলমগীর

মাসআলা ঃ আর যদি প্রবল ধারণা হয় যে, সদুপদেশ দান করলে মারধরের সম্মুখীন হতে হবে এবং উপদেশ দাতা ধৈর্য্য ধারণ করার ক্ষমতা রাখে এবং কারো নিকট অভিযোগ বা নালিশ করবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে নসীহত করা মুস্ত াহাব এবং সে ব্যক্তি মুজাহিদ। -ফতোয়ায়ে আলমগীরী

মাসআলা ঃ যদি প্রবল ধারণা হয় যে, মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে না- তাহলে মারধর কিংবা গালমন্দের সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে এমতাবস্থায় নসীহত করা মুস্তাহাব। কোন কোন উলামায়ে কিরাম বলেন- এমতাবস্থায়ও ওয়াজিব।-ইতহাফ

ইতহাফ প্রণেতা ওয়াজিব হওয়ার উক্তিকে অধিক স্পষ্ট বলেছেন। অধমের অভিমত হল ইতহাফ গ্রন্থকারের উক্তিকে প্রাধান্য দেওয়াই সতর্কতামূলক উপায়। অতএব, উপদেষ্টাগণ এই মতের উপর আমল করবেন। অর্থাৎ এ জাতীয় ক্ষেত্রে নসীহত করে দিবেন। আর কেউ এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিরবতা অবলম্বন করলে তার প্রতি কু-ধারণা বা প্রশ্নারোপ করা যাবে না। কেননা, হতে পারে তিনি মুস্তাহাবের করা যাবে না। কেননা, হতে পারে তিনি মুস্তাহাবের প্রবক্তা।

মাসআলা ঃ যদি এমন কোন ক্ষেত্র হয়, যেখানে সদুপদেশ দান করলে বা হক কথা বললে হত্যার আশঙ্কা রয়েছে এবং কেউ সেখানে হক কথা বলল ও তাকে হত্যা করে দেওয়া হল- তাহলে সে শহীদ হবে।-ফতোয়ায়ে আলমগীরী

মাসআলা ঃ যার উপর সদুপদেশ দেওয়া ফরয ছিল- সে তার দায়িত্ব পালন করার পর যদি অন্যায় কাজে লিপ্ত ব্যক্তি তা প্রহণ না করে, তাহলে পুনরায় নসীহত করা তার উপর ফরয নয়। (মিরকাত, আশিয়্যাতুল লুমআত)

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি নিজে কোন গুনাহে লিপ্ত থাকলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যায়েদ নিজে কোন গুনাহে লিপ্ত এবং একই গুনাহে অন্য কেউ লিপ্ত রয়েছে- এমতাবস্থায় সামর্থ থাকলে যায়েদের উপর সদুপদেশ দান করা ফরয।- ফতোয়ায়ে আলমগীরী

যায়েদের দায়িত্বে দুটি কাজ করা আবশ্যক ছিল। এক. সৎ কাজের নির্দেশ দান করা দুই. সৎকাজ করা অতএব, একটির ব্যাপারে ত্রুটি ও অবহেলা থাকলে অপরটিও রহিত হবে না, অবশ্য অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে বিস্তারিত দেখুন আশরাফুল হিদায়াত লি ইসলাহিল মুনকারাত'- এর প্রথম অধ্যায়ের আয়াত ও তৃতীয় অধ্যায়ের ১ ও ২ নং হাদিস।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি দখল যে, অপর কেউ কোন মন্দ কাজে লিপ্ত, এমতাবস্থায় তার উপর মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির পিতা কিংবা দায়িত্বশীল, মুরব্বীকে অবহিত করা উচিত ও আবশ্যক কিনা- এ প্রশ্নের জবাবে উলামায়ে কিরাম বলেছেন- যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির পিতা-মাতা

ও মুরুব্বীগণ উক্ত মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার সামর্থ রাখে- তাহলে অবহিত করা উচিত, অন্যথায় নয়। আর এ বিধানই প্রযোজ্য স্বামী ও স্ত্রী এবং শাসক ও প্রজা সাধারণের ক্ষেত্রে। -আলমগীরী

মাসআলা ঃ হযরত হানাফিয়া আবুল কাসেমকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ- যায়েদ দেখল যে, এক ব্যক্তি চুরি করছে, এমন পরিস্থিতিতে মালিককে চুরির ব্যাপারে অবহিত করা তার উপর আবশ্যক কি না? জবাবে তিনি বলেছিলেন যে, যদি যায়েদের ধারণা হয় যে, চোর তার উপর জুলুম করতে পারে, তাহলে অবগত করা জরুরী নয়, অন্যায় অবগত করবে। -ফতোয়ায়ে আলমগীরী

মাসআলা ঃ যদি পিতা পুত্রকে কোন কাজের নির্দেশ করতে চায়, আর সে তা অমান্য করার আশঙ্কা বোধ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে সরাসরি নির্দেশ না করে উৎসাহদানের ভাষায় বলবে- 'হে বৎস! এভাবে করা মুনাসিব হবে', তাহলে সন্তান পিতার অবাধ্যতার নাফরমানীর দরুণ আখিরাতের ক্ষতি হতে মুক্তি লাভ করবে। (আলমগীরী)

ফায়দা ঃ উক্ত মাসআলা হতে অপরিচিত ব্যক্তিকে নসীহত প্রদানে সতর্কতা অবলম্বনের জরুরত বুঝে আসে। এর সার কথা হল, মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে এভাবে পথনির্দেশ করবে যেন তার কোন দ্বীনী ক্ষতি সাধিত না হয়। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা 'আদাবে তাবলীগ' পুস্তিকায় উল্লেখ করা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

মাসআলা ঃ যেসব ফরয বা নিষিদ্ধ কাজ প্রসিদ্ধ ও পরিচিত, সেগুলোর ক্ষেত্রে (কেউ লিপ্ত হলে তার উপর) প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার সকলে সংরক্ষন করে। আর যেগুলো কিছটা সূক্ষ্ম, সেগুলোর ক্ষেত্রে প্রশ্ন আরোপ করার অধিকার শুধুমাত্র উলামায়ে কিরামেরই রয়েছে। সর্ব সাধারণ সে সম্পর্কে ভালভাবে সকল সীমা-রেখা না জেনে পশ্নারোপ করতে পারবেন না, আর উলামায়ে কিরামও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রশ্ন তুলতে পারেন ঐসবই বিষয়ের ক্ষেত্রে যেগুলোর (নিষিদ্ধ হওয়ার) ব্যাপারে মুজতাহিদগণ একমত পোষণ করেছেন। আর যেসব বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রশ্ন তোলা যাবে না।

মাসআলা ঃ সাধারণ মানুষের জন্য কামিল ব্যক্তিদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী না হওয়া উচিত। (অর্থাৎ তাঁদের কোন কাজ অন্যায় মনে হলেও প্রশ্ন আরোপ করা অনুচিত)। মিরকাত, ফতোয়ায়ে আলমগীরী

ফায়দা ঃ বরং কারো কোন কাজে সংশয় সৃষ্টি হলে কোন বিশেষজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হবে। উত্তম হল- সর্বাগ্রে যে আলিমের ব্যাপারে সংশয় হবে, তার শরণাপন্ন হওয়া। অনেক সময় সঠিক ইলম না থাকার কারণে মুসলমানদের মধ্যে প্রশ্ন দৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগের সাধারণ অবস্থা এটাই।

মাসআলা ঃ অন্যায় ও মন্দ কাজে লিপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশ ও ঘনিষ্ঠতা পরিত্যাগ করা উচিত। তবে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

-তাফসীরে বয়ানুল কুরআনঃ পারা-৪, রুকু-২,

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি অক্ষমতা কিংবা ফিৎনা ফাসাদের ভয়ে সদুপদেশ দান না করে কিন্তু উক্ত মন্দ কাজকে খারাপ মনে করে, সেও নাজাতপ্রাপ্ত মু'মিনদের অন্তর্ভূক্ত। -মিরকাত, মিশকাত শরীফ

ফায়দা ঃ কোন কোন সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করা হয়না। এটা মূলতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দ্বীনী কোন উপকারিতার স্বার্থে করা হয় এর বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের ২ ও ৩ নং হাদীস দ্রষ্টব্য। অতএব তড়িৎ কোন প্রশ্ন না করা উচিত।

বিস্তারিত জানার জন্য 'আশরাফুল হিদায়াত' কিতাবখানা আদ্যোপ্রান্ত অধ্যয়ন করুন।

৩০তম অধ্যায়

দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা

দাজ্জাল সম্পর্কে হুঁশিয়ারী ও তথ্যাবলী

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের মাঝেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে।" (মুসলিম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন, "আদম (আঃ) এর সৃষ্টির পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের মাঝে দাজ্জালের তুলনায় মারাত্মক আর কোন সৃষ্টি হবে না।" (মুসলিম) সুতরাং এ উম্মতের প্রতিটি মুমিনেরই উচিত হবে-দাজ্জাল সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিস্তারিতভাবে জানা, যাতে করে তার সৃষ্ট ভয়াবহ ফিতনা থেকে প্রত্যেকেই নিজের ঈমান-আকীদা ও আমলকে রক্ষা করতে পারে।

দাজ্জালের আবির্ভাব কিয়ামতের বড় আলামতসমূহের একটিই শুধু নয়, বরং কিয়ামতের বড় ১০টি যে আলামতের কথা সহীহ হাদীসে এসেছে, তার প্রথমটিই হল খুরুজে দাজ্জাল। তাছাড়া আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এমন কোন নবীই ছিলেন না, যিনি স্বীয় উম্মতকে এই কানা মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (বুখারী) সুতরাং আমরা বিশেষ করে যারা এই শেষ জামানার মুমিন, আমাদের প্রত্যকেরই উচিত হবে-এই দাজ্জাল সম্পর্কে যথাসম্ভব জানা এবং নিজেদেরকে সেই মারাত্মক ফিতনা থেকে বাঁচিয়ে রাখা।

খুরুজে দাজ্জাল বা দাজ্জালের আবির্ভাব প্রচুরসংখ্যক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু এমন একটি নিশ্চিত সত্য বিষয়টিও তার আবির্ভাবপূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখবেন। সে যুবক বয়সে আত্মপ্রকাশ করবে, কিন্তু জন্ম থেকে আত্মপ্রকাশ করা পর্যন্ত তার সম্পর্কে কোন কিছুই কেউ জানবে না। এ অবস্থায় দাজ্জাল জন্ম নিয়েছে কিনা, নিয়ে থাকলে সে এখন কোথায় আছে, তার বয়স কত ইত্যাদি বিষয়ের পিছনে ছোটাছুটি করা অনর্থক। কারণ, তার আত্মপ্রকাশপূর্ব পর্যন্ত তার পরিচিতি মানুষ থেকে গোপন রাখা হবে। এটি আল্লাহর অপার শক্তির একটি নমুনা যে, তিনি তার সৃষ্টির সব থেকে বড় ফিতনাটিকেও মানুষ থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গোপন রেখে দিবেন। দাজ্জালের আবির্ভাবকালীন সময়টা হবে এমন-যখন মানুষের ঈমানী শক্তি খুব দুর্বল থাকবে। মুমিন থাকবে অনেক, কিন্তু দাজ্জালের সন্দেহজনক বিষয় সমূহ দেখে তাদের অনেকেই তার পিছনে লেগে যাবে অর্থাৎ তখন মানুষের ঈমান হবে অতিশয় ক্ষীণ [redacted] অবিশ্বাসের মাঝে টলটলায়মান। এ কারণেই যখন মানুষের ঈমানী শক্তি ছিল প্রচুর যেমন-সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাবেঈন, তাবে তাবেঈন (রাঃ) সে সময়ে তার আবির্ভাব হয়নি।

নবী (আঃ) গণের আবির্ভাবের পূর্বে যেমন বিভিন্ন বরকত ও কল্যাণ প্রকাশিত হতে শুরু করত, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বে তার বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হবে। তখন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অভাব, বরকত কমে যাওয়া, ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, নানান বিপর্যয়, অশ্লীলতার ব্যাপক বিস্তার, বিবিধ হারাম কাজের ব্যাপক প্রচলন, শিরক-বিদ'আতের ছড়াছড়ি, ধর্মীয় ফিতনা ইত্যকার যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ ও বিপর্যয় সমগ্র পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে। নবী (আঃ) গণের সমর্থনে যেমন সমগ্র ফেরেশতা শক্তি তৎপর থাকতেন, তদ্রুপ দাজ্জালের সমর্থনে সমগ্র শয়তানী জগতই তৎপর হবে, শয়তানী শক্তিরই জয়-জয়কার হবে। সুতরাং বর্তমান সামগ্রিক অবস্থার বিচারে কি এ কথা বলা যায় না যে, সন্ধ্যার পরে রাত্রির আগমনের মতই দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ নিকটবর্তী?

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসের মাধ্যমে দাজ্জাল সম্পর্কে পুরোপুরি জানিয়ে গিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। সেই বিপুল হাদীস ভাণ্ডার থেকে আমি কিছু হাদীস কোথাও সংক্ষেপে, কোথাও বা পূর্ণরূপে বর্ণনা করছি-

দাজ্জালের আবির্ভাবপূর্ব তিন বছর

আসা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমার গৃহে থাকাকালে দাজ্জালের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। তিনি বললেন- "তার আর্বিভাবের পূর্বে তিনটি দুর্ভিক্ষ দেখা দিবেঃ এক বছর আকাশের বৃষ্টি এক-তৃতীয়াংশ কম হবে। অন্য বছর আকাশের বৃষ্টি দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পাবে এবং যমীনের উৎপাদন দুই তৃতীয়াংশ কমে যাবে। তৃতীয় বছর আকাশ থেকে এক ফোটাও বৃষ্টি হবে না এবং যমীনের ফসলও মোটেই হবে না। ফলে ক্ষুরবিশিষ্ট ও তৃণভোজী সকল জীব-জন্তু মারা যাবে।" (আহমদ, আবু দাউদ)

কোন বস্তু দাজ্জালকে বের করবে?

নাফি (রঃ) থেকে বর্ণিত, হাফসা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "দাজ্জাল যখন বের হবে, তবে কোন ব্যাপারে ক্রুদ্ধ হয়ে বের হবে।" (মুসলিম)

অন্য সূত্রে হাফসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "কারো প্রতি ক্রোধই প্রথমে দাজ্জালকে মানুষের সামনে বের করে নিয়ে আসবে।" (মুসলিম)

দাজ্জাল কোথা থেকে বের হবে?

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সে (দাজ্জাল) ইরাক ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী খুল্লাহ নামক স্থান

হতে আবির্ভূত হবে। সে ডানে-বামে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! অবিচল থাকবে---(মুসলিম)

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বলেছেনঃ দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলীয় কোন স্থান থেকে বের হবে। স্থানটির নাম হল খুরাসান। (তিরমিযী শরীফ)

এ বিষয়ে আবু হুরাইরা ও আয়েশা (রাঃ) থেকেও হাদীস বর্ণিত আছে

দাজ্জালের পিতা-মাতার বিবরণ

আব্দুর রহমান ইবনে আবু বাকরা তার পিতা আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে-তাদের কোন সন্তান হবে না। পরে তাদের এক কানা শিশুর জন্ম হবে। যা হবে সবচেয়ে ক্ষতিকর ও অত্যন্ত অনুপকারী। তার চোখ তো হবে নিদ্রিত, কিন্তু অন্তর হবে না। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পিতা-মাতার বিবরণ দিলেন। বললেনঃ তার পিতা হবে লম্বা-পাতলা গড়নের। তার নাকটা যেন পাখির ঠোঁট। তার মা হবে স্থূলকায়, সুদীর্ঘ স্তনবিশিষ্ট মহিলা। (তিরমিযী শরীফ)

দাজ্জাল হবে ইয়াহুদী

ইবনে সাইয়্যাদ একদিন আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এ কথা বলেননি যে, দাজ্জাল ইয়াহুদী হবে? ইবনে সাইয়্যাদের এ কথাকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) অস্বীকার করেননি। সুতরাং বোঝা যায় যে, দাজ্জাল ইয়াহুদী বংশোদ্ভুত হবে।

দাজ্জালের আকার-আকৃতি

সালিম (রাঃ) এর পিতা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-"একদা আমি স্বপ্নে কাবাঘর তাওয়াফ করছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তিকে দেখলাম-তার গায়ের রং লাল বর্ণ, খুব মোটা, মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং তার ডান চোখ টেড়া-তার চোখ যেন-ফুলা আংগুরের ন্যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম-এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হল দাজ্জাল। (বুখারী)

নাওয়াস ইবনে সাম'আন কিলাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে দাজ্জালের আলোচনা করেন এবং বিষয়টির ভীষণতা ও নিকৃষ্টতা সবকিছু তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দাজ্জাল হল এক যুবক। তার চুল অতিশয় কোঁকড়ানো, চোখ তার স্থির! সে আব্দুল উযমা কাতানসদৃশ হবে..। (তিরমিযী)

দাজ্জাল কানা হবে

উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তোমাদের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণনা

করেছি, এতদসত্ত্বেও আমার ভয় হয়, তোমরা তাকে চিনতে পারবে না। (জেনে রাখ-) মাসীহ দাজ্জাল হবে বেটে। তার পদক্ষেপ হবে দীর্ঘ। মাথার চুল হবে কুঞ্চিত। আর সে হবে কানা। তার চোখ হবে সমতল, যা উপরে উঠে থাকবে না নীচেও থাকবে না। এরপরও যদি তোমরা সন্দিহান হও, তবে জেনে রাখ- তোমাদের রব-আল্লাহ কানা নন। (কারণ, তিনি তো সর্বপ্রকার ত্রুটি মুক্ত। তাই দাজ্জাল যখন কানা হয়েও নিজেকে খোদা-রব বলে দাবী করবে, তখন তার মিথ্যাবাদীতা সহজেই ধরা যাবে।" (আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি তোমাদের নিকট গোপন নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা কানা নন, কিন্তু দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। তার এই চোখটি হবে ফোলা আংগুলের মত।" (বুখারী)

দাজ্জালের কপালে 'কাফির' লেখা থাকবে

হযরত হুযাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "দাজ্জালের চক্ষু ফোলা হবে এবং তার চোখে পুরু নখ থাকবে এবং উভয় চোখের মাঝখানে আলাদা আলাদা ভাবে (কাফির) লেখা থাকবে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিন ব্যক্তি এ কথা পাঠ করতে পারবে।" (মুসলিম)

দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না

আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইবনে সাইয়্যাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জালের কোন সন্তান হবে না? তিনি বলেন, আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি।

(মুসলিম)

এ সম্পর্কে মুসলিম ও তিরমিযীতে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়-দাজ্জাল হবে বিবাহিত, কিন্তু তার কোন সন্তানাদি থাকবে না। এটিও তার রব-প্রতিপালক না হবার ব্যাপারে একটি প্রমাণ কারণ, সে নিজেই খুঁতধারী ও অক্ষম।

দাজ্জালকে চাক্ষুস দেখা যাবে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, তোমরা জেনে রাখ-তোমাদের কোন ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতিপালককে দেখতে সক্ষম হবে না। (মুসলিম) আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি যে, দুনিয়ার জীবনের এই ধ্বংসশীল চোখ দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখা যাবে না। কিন্তু দাজ্জালকে খালি চোখে দেখা যাবে। এটিও তার রব-খোদা না হবার একটি প্রমাণ।

দাজ্জালের সাথে যা থাকবে

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দাজ্জাল (লোকদেরকে গোমরা করার জন্য) নিজের সংগে পানি ও আগুন নিয়ে বের হবে। মানুষ বাইরে থেকে যেটাকে পানি মনে করবে, আসলে সেটি হবে জ্বলন্ত আগুন। আর মানুষ যেটিকে আগুন ধারণা করবে, আসলে সেটি হবে ঠান্ডা মিষ্টি পানি। সুতরাং তোমরা যে কেউ সেই দাজ্জালের যুগ পাবে, সে যেন যেটিকে আগুন দেখতে পায়, তাতে প্রবেশ করে। কেননা, তা হবে সুস্বাদু মিষ্টি পানি। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি কথা বলব না? সেই কথাটি অতীতের কোন নবীই তার জাতিকে বলেননি। আর তা হল, নিশ্চয় সে হবে কানা। সে বেহেশত ও দোযখের সদৃশ সংগে নিয়ে আসবে। তখন সে যেটিকে বলবে বেহেশত, প্রকৃতপক্ষে তা হবে দোযখ। (বুখারী, মুসলিম)

দাজ্জালের সাথে জান্নাত ও জাহান্নাম সদৃশ দু'টি প্রতারণার বস্তু থাকবে। চোখে যেটিকে জান্নাত মনে হবে, সেটি আসলে জাহান্নাম; আর যেটিকে জাহান্নাম বলে মনে হবে, সেটি হবে জান্নাত। বস্তুতঃ দাজ্জালের সময়কাল মুমিনদের ঈমানের পরীক্ষা এভাবেই নেয়া হবে যে, তারা তাকে চোখকে বিশ্বাস করে তার অনুসরণ করে, নাকি নিজের চোখকে অবিশ্বাস করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাকে বিশ্বাস করে সেটির অনুসরণ করে। আসলে ঈমানের প্রকৃত অর্থই হল এটা। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা বা নির্দেশের বিপরীত হয়, তাহলে নিজেকে অবিশ্বাস করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথাকেই বিশ্বাস করবে।

দাজ্জালের সময়কার দৃশ্যকে কল্পনা করলে সত্যি সত্যি অন্তরে ভীতি সঞ্চার হয়। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করার তাকে রক্ষা করবেন। যেমন-তিনি ইবরাহীম (আঃ) কে নমরুদের আগুন থেকে রক্ষা করেছিলেন।

দাজ্জালের বাহন

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দাজ্জাল একটি ফকফকে সাদা বর্ণের গাধায় সওয়ার হয়ে বের হবে, যার উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থানটি সত্তর বা চল্লিশ চরড়া হবে।

(বাইহাকী)

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে (দাজ্জাল) একটি গাধায় চড়ে ভ্রমণ করবে, যার উভয় কানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে চল্লিশ হাত। (আহমদ)

দাজ্জালের বাহন হবে একটি গাধা-যার রঙ হবে সাদা। এটির উভয় কানের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে সত্তর হাত বা চল্লিশ হাত। অনেকের মতে, এটি কোন বিমানও হতে পারে, যাতে করে সে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবে।

দাজ্জালের দাবী কি হবে?

আবু উমামা বাহিলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন দাজ্জাল সম্পর্কে আমাদের কাছে ভাষণ দিয়ে বললেন-"সে (দাজ্জাল) প্রথমে বলবে যে, সে একজন নবী, কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই। এরপর সে বলবে, আমি তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তোমাদের কেউই প্রতিপালক আল্লাহকে কখনও দেখতে পারবে না।

(ইবনে মাজাহ)

দাজ্জাল সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে

ফাতিমা বিনতে কায়িস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নামায শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এর কাছে তামীমদারী (রাঃ) এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তামীমদারী প্রথমে খৃষ্টান ছিল। সে আমার নিকট এসে বাই'আত গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। তামীমদারী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এক সামুদ্রিক সফরে বের হয়ে ঝড়ের কবলে পড়ে এক দ্বীপে যেয়ে পৌছান। সেখানে তিনি দাজ্জালের সাক্ষাত পান। দাজ্জাল তাকে বলে-"এখন আমি নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মসীহ দাজ্জাল। অতি সত্বরই আমি এখান থেকে বাইরে যাবার অনুমতি পেয়ে যাব। বাইরে যেয়ে আমি সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করবো। চল্লিশ দিনের ভেতর এমন কোন জনপদ থাকবে না-যেখানে আমি প্রবেশ না করব। তবে মক্কা ও তায়্যিবা (মদীনা)- এ দু'টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দু'টির কোন একটিতে প্রবেশের ইচ্ছা করব, তখন এক ফেরেশতা উন্মুক্ত তরবারী হস্তে সামনে এসে আমাকে বাধা দিবেন। এ দু'টি স্থানে সকল রাস্তায় ফেরেশতাদের পাহারা থাকবে।" (মুসলিম)

দাজ্জাল মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মক্কা-মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সমস্ত শহরেই দাজ্জাল অনুপ্রবেশ করবে। তবে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা, এ দুই শহরের প্রতিটি রাস্তায়ই ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে এর পাহারাদারীতে নিয়োজিত থাকবেন। অবশেষে দাজ্জাল মদীনার একটি নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করবে। তখন মদীনাতে তিনবার ভুমিকম্প হবে। যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক ও কাফির মদীনা থেকে বের হয়ে তার নিকট চলে যাবে।" (মুসলিম)

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে এর সাথে আরো আছে যে, "দাজ্জাল এসে জুরফের এক অনুর্বর ভূমিতে অবতরণ করবে এবং এখানেই সে তার শিবির স্থাপন করবে। যার ফলে প্রত্যেক মুনাফিক পুরুষ ও মহিলা তার নিকট চয়েল যাবে।" (মুসলিম)

দাজ্জালের অনুসারী কারা হবে

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ " ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুগামী হবে, তাদের গায়ে থাকবে কালো চাদর।" (মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য কবুল করবে, তাদের মাথায় থাকবে সবুজ বর্ণের নিকাব।" (শরহে সুন্নাহ)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-"যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। আল্লাহর কসম, মানুষ ধারণা করবে যে, সে নিজে ঈমানদার, কিন্তু দাজ্জালের সন্দেহজনক বিষয়সমূহ দেখে সেও তার অনুসারী হয়ে যাবে। কেননা, তার কাছে সন্দেহ নিক্ষেপকারী বিভিন্ন বস্তু থাকবে।" (আবু দাউদ)

দাজ্জালের অনুসারী হবে মূলতঃ ইয়াহুদী। তারপরও এই উম্মতের মুনাফিক লোকেরা তার অনুসারী হবে। অনেক দুর্বল ঈমানদারও তার ভেলকীতে পড়ে তার অনুসারী হয়ে যাবে।

দাজ্জালসৃষ্ট বিপর্যয়

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, সে ডান-বামে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা তখন ঈমানের ওপরে অটল থাকবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে পৃথিবীতে কত দিন অবস্থান করবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যেদিন এক বছরের সমান হবে, তাতে একদিনের সালাতই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? জবাবে তিনি বললেন, না। বরং তোমরা এদিন হিসেবে ঐ দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে।

আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! দাজ্জাল পৃথিবীতে কেমন করে চলবে? তিনি বললেন, বাতাসে পরিচালিত মেঘের ন্যায়। সে এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে কুফরীর দিকে আহবান করবে। তারা তার উপর ঈমান আনয়ন

করবে এবং তার ডাকে সাড়া দিবে। অতঃপর সে আকাশকে হুকুম করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং ভূমিকে নির্দেশ দিবে, ভূমি গাছপালা ও শস্য উদগম করবে। এরপর সন্ধ্যায় তাদের গবাদি পশুগুলো পূর্বের তুলনায় অধিক লম্বা, কুজ, প্রশস্ত স্তন ও উদরপূর্ণ অবস্থায় তাদের নিকট ফিরে আসবে।

অতঃপর দাজ্জাল অপর এক সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে আসবে এবং তাদেরকে কুফরীর প্রতি আহবান করবে। তারা তার কথাকে উপেক্ষা করবে। ফলে সে তাদের নিকট হতে ফিরে চলে যাবে। অমনি তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষ ও পানির অনটন দেখা দিবে এবং তাদের হাতে তাদের ধন-সম্পদ কিছুই থাকবে না। তখন দাজ্জাল এক পতিত স্থান অতিক্রমকালে তাকে সম্বোধন করে বলবে, তুমি তোমার গুপ্তধন বের করে দাও। তখন যমীনে ধন-ভান্ডার বের হয়ে তার চারপাশে একত্রিত হতে থাকবে, যেমন-মৌমাছি তাদের সর্দারের চারপাশে সমবেত হয়।

তারপর দাজ্জাল এক যুবককে ডেকে আনবে এবং তাকে তরবারি দিয়ে দু'টুকরো করবে। অতঃপর আবার ডাক দিলে বিছিন্ন সেই টুকরো দু'টো একত্রিত হয়ে হাসিমুখে তার সামনে আসবে। দাজ্জাল এই সকল কাণ্ড-কীর্তি করতে থাকবে (মানুষকে গোমরাহ করার জন্য) (মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ)

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে জনৈক গ্রাম্য লোকের নিকট এসে বলবে-আচ্ছা বলতো, আমি যদি তোমার মৃত উট জীবিত করে দেই, তাহলে তুমি কি আমাকে তোমার রব বলে বিশ্বাস করবে? সে বলবে, অবশ্যই বিশ্বাস করব। অতঃপর শয়তানগুলো তার উটগুলোর চেয়েও সুন্দর স্তন বিশিষ্ট ও মোটাতাজা উটের রূপ গ্রহণ করে উপস্থিত হবে। এভাবে ভ্রাতৃহারা ও পিতৃহারা লোকের নিকট এসে দাজ্জাল বলবে যে, আচ্ছা, আমি যদি তোমার পিতা ও ভ্রাতাকে জীবিত করে দেই, তাহলে আমি যে তোমার রব, তা কি তুমি বিশ্বাস করবে? সে বলবে, অবশ্যই। তখন শয়তান তার পিতা ও ভাইয়ের রূপ ধারণ করে তার নিকট আসবে।" (আহসান)

দাজ্জাল কতদিন থাকবে

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে পৃথিবীতে কত দিন থাকবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত। এর প্রথম দিনটি এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিনটি একমাসের সমান এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনসমূহের মতই হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল!

যেদিন এক বছরের সমান হবে, তাতে একদিনের সাতালই কি আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? জবাবে তিনি বললেন না, বরং তোমরা এদিন হিসেবে ঐ দিনের পরিমাণ নির্ধারণ করে নিবে। (মুসলিম, তিরমিযী)

ইবনে মাজাহর এক বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দাজ্জালের অবস্থান হবে চল্লিশ বছর, যার এক বৎসর হবে এক মাসের সমান এবং এক মাস হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অবশিষ্ট দিনগুলো এত তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হবে যে, তোমাদের কেউ যদি মদীনার এক পাশের গেটে থাকে, তবে অপর পাশের গেটে সন্ধ্যার পূর্বে সে পৌঁছাতে পারবে না।

তবে সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, তার অবস্থান হবে চল্লিশ দিন-যার প্রথম দিন এক বছরের সমান, দ্বিতীয় দিন এক মাসের সমান, তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান এবং চতুর্থ দিন থেকে অবশিষ্ট দিনগুলো হবে স্বাভাবিক দিনগুলোর মতই।

মূলতঃ দাজ্জালের যাদুর প্রভাবেই এরকম মনে হতে থাকবে, যেন সূর্যের উদয়-অস্ত বোঝা যাবে না। এরকম দিনগুলোতে সময় হিসাব করে আমাদেরকে দিন-তারিখ ঠিক রাখতে হবে এবং নামায-রোযা যথারীতি আদায় করতে হবে।

বস্তুতঃ দাজ্জাল হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত দাজ্জালের অবস্থান হবে স্বাভাবিক দিনের হিসেবে এক বৎসর দুই মাস চৌদ্দ দিন।

দাজ্জালের বিনাশ

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মাসীহ দাজ্জাল পূর্বদিক থেকে আগমন করে মদীনায় প্রবেশ করতে চাইবে। এমনকি সে উহুদ পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এরপর ফেরেশতারা তার চেহারার গতি সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবেন এবং সেখানেই সে ধ্বংস হবে।" (বুখারী, মুসলিম)

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারয়াম তনয় ঈসা (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। তিনি দুই ফেরেশতার কাধের উপর ভর করে গোলাপী রঙ-এর জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশক নগরীর পূর্বদিকের শুভ্র মিনারার উপর অবতরণ করবেন। যখন তিনি তার মাথা ঝুঁকাবেন, তখন বিন্দু ঘাম তার শরীর থেকে গড়িয়ে পড়বে। তিনি যে কোন কাফিরের নিকট যাবেন, সে-ই তাঁর শ্বাসের বাতাসে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁর দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যাবে, তাঁর শ্বাসও ততদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে 'বাবেলুদ' নামক স্থানে গিয়ে পাকড়াও করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন।" (মুসলিম, তিরমিযী)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ " আমার উম্মতের মধ্যেই দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আমি জানি না- চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর। এ সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মারয়াম তনয় ঈসা (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। তার আকৃতি উরওয়া ইবনে মাসউদের অনুরূপ হবে। তিনি দাজ্জালকে তালাশ করে ধ্বংস করে দিবেন।" (মুসলিম)

দাজ্জালের আবির্ভাবের পরে ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন, তিনি দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন এবং বর্তমান ইসরাঈলের লুদ বা লিডিয়া নামক বিমানবন্দরের গেটে তাকে হত্যা করবেন।

দাজ্জালের ভয়ে মুমিনরা আত্মগোপন করবে

উম্মে শারীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যাবে। এ কথা শুনে উম্মে শারীক বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেদিন আরবের লোকেরা কোথায় থাকবে? উত্তরে তিনি বললেন ঃ তখন তারা সংখ্যায় কম হবে। (মুসলিম)

দাজ্জালের আবির্ভাবে করণীয়

১। দাজ্জাল থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাজ্জালের খবর শুনবে, সে যেন তার থেকে দূরে থাকে। যে ব্যক্তি তার কাছে যাবে, সে তাকে সত্যবাদী মনে করে তার অনুসারী হয়ে যাবে। কেননা, তার কাছে সন্দেহ নিক্ষেপকারী বিভিন্ন বস্তু থাকবে। (আবু দাউদ)

২। সূরা কাহাফ বেশী বেশী তিলাওয়াত করতে হবে। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা পাবে।" (মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আহমদ) অন্য সূত্রে বর্ণিত আছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহাফের শেষ দশ আয়াত পাঠ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা হতে রক্ষা পাবে।" (মুসলিম, আহমদ)। তিরমিযীর অপর একটি বর্ণনায়, প্রথম তিন আয়াত পাঠের কথা বলা হয়েছে।

৩। আল্লাহর কাছে দাজ্জাল থেকে পানাহ চাইবে। কেননা, বহু সহীহ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাজ্জালের ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন এবং তিনি এরূপ দোয়া উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যেমন, আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দোয়া করতেন- "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে

জাহান্নামের ফিতনা থেকে পানাহ চাই, জাহান্নামের আযাব থেকে পানাহ চাই, কবরের ফিতনা, কবরের আযাব, ধন-সম্পদের ফিতনা এবং দারিদ্র্যের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট পানাহ চাই। আমি আপনার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে পানাহ চাই। (মুসলিম)

৪। মক্কা বা মদীনায় বসবাস করা নিরাপদ। কেননা, বহু সহীহ হাদীস থেকে এই কথা জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতিরোধের কারণে দাজ্জাল মক্কা ও মদীনাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

৫। ঘটনাক্রমে দাজ্জালের ফিতনায় পতিত হলে দাজ্জালের আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করতে হবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- তোমাদের যে কেউ দাজ্জালকে পাবে, তার উচিত-দেখতে আগুনের মত বস্তুটিতে ঝাঁপিয়ে পড়া। কারণ, আসলে তা হচ্ছে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু পানি।"

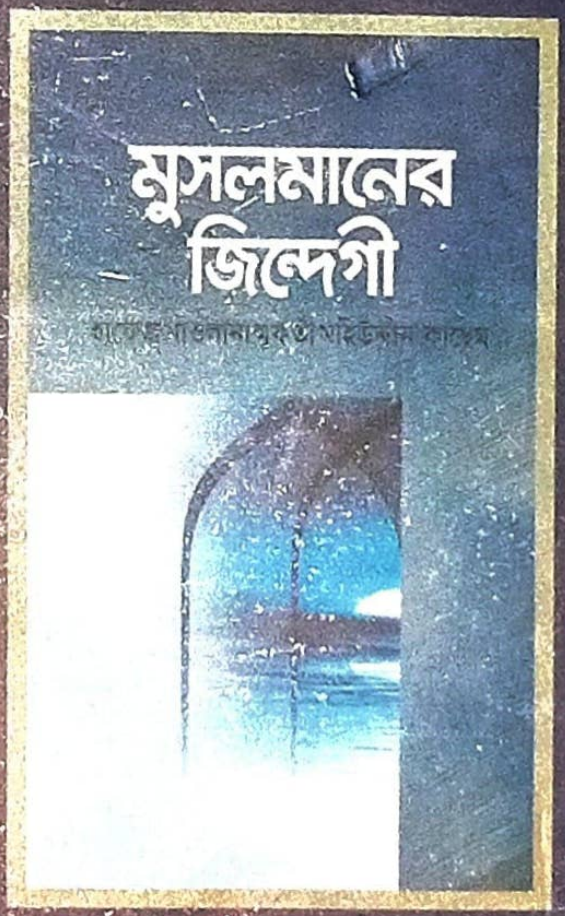
(বুখারী, মুসলিম)

৬। দাজ্জালকে অস্বীকার ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে হবে। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ওপর ঈমান আনবে, তাকে সত্য বলে জানবে এবং তার আনুগত্য মেনে নেবে, সে ঈমান হারা কাফির হয়ে যাবে, সে অবস্থায় তার অতীতের কোন পূণ্যই কোন কল্যাণে আসবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে এবং তাকে মিথ্যা বলে জানবে, তার ঈমান সুরক্ষিত থাকবে, যে অবস্থায় অতীতের কোন পাপের জন্য তাকে জবাবদিহী করতে হবে না। (আহমদ)



মানুষের মনে কষ্ট দিও না।

—মহিউদ্দীন কাছেম



design : naimul haider ■ shaj creation

আল্লাহর দান লাইব্রেরী

ISBN : 984-8439-05-7